নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের গ্রন্থাবলী

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ
চৈত্র, ১৩৫৯



বসুমতী - সাহিত্য - মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২,

মূল্য তিন টাকা

প্রকাশক ও মুদ্রাকর
শ্রীশশিভূষণ দত্ত,
বসুমতী প্রেস,
কলিকাতা।

এ যুগের অভিশাপ

কাউণ্ট লিও টলষ্টয়



ভূমিকা

টলষ্টয়ের জগৎ-খ্যাত উপন্যাস Kreutzer Sonataর এই বঙ্গানুবাদের নাম ইচ্ছা করিয়াই 'এ যুগের অভিশাপ' রাখিলাম। এই উপন্যাসের অন্তরালে টলষ্টয় যে-কথাটি ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এই নামকরণ করিয়াছি।

স্ত্রীর ব্যভিচারে সংক্ষুব্ধ হইয়া স্বামী স্ত্রীকে খুন করে, সেই খুনী স্বামী তাহার বিবাহিত জীবনের সমস্ত নিগূঢ় কাহিনী, হত্যার সমস্ত সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়া নিজেই বর্ণনা করিতেছে···এই হইল উপন্যাসের মূল ঘটনা। কিন্তু মহাশিল্পী যে-ভাবে এই কাহিনীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন, এই কাহিনীর অবকাশে য়ুরোপের বর্ত্তমান সামাজিক জীবনের বিরুদ্ধে বজ্র-নির্ঘোষে যে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে সমগ্র য়ুরোপ সচকিত হইয়া উঠে। এই একখানি বই গত যুগে একটা সমগ্র মহাদেশের চেতনার মূলে যে তীব্র স্পন্দন জাগাইয়া তোলে, তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত সাহিত্য-জগতে বিরল।

জগতে যে সব সাহিত্যিক মহাকালের হাতে রাজ-টীকা লাভ করিয়াছেন, টলষ্টয় তাঁহাদের একজন। এই একটি লোক, তাঁহার সমগ্র জীবনের সাধনা দিয়া সাহিত্যকে এক নূতন ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছেন। এক সুবিপুল নূতন দায়িত্ব সাহিত্যিকের উপর দিয়া গিয়াছেন। তাই টলষ্টয়ের সাহিত্য বিশ্ব সাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। যদিও তিনি রুশ ভাষায় রুশ-সাহিত্যই সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রত্যেক রচনার মধ্যে দেশাতীত এক বিরাট আদর্শ-বোধ রহিয়া গিয়াছে, যাহার জন্য প্রত্যেক দেশের লোকই তাঁহাব সাহিত্যের মধ্যে একটা আত্মীয়তার স্পর্শ পাইয়া থাকেন। বিশেষ করিয়া তাঁহার চিন্তাধারা, তাঁহার আদর্শবাদের সহিত প্রাচ্য-মনেরই অধিকতব নিকট সম্পর্ক। তাই টলষ্টয়ের সাহিত্যের বিষয়-বস্তু ভারতবাসীর কাছে এত প্রিয়। কারণ, তাঁহার মন ভারত-মনেরই পরমাত্মীয়। জীবনের অন্য আর এক ক্ষেত্রে এই কথা আজ ঐতিহাসিক সত্যরূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে। যে মহাপুরুষের আদর্শবাদে আজ ভারতবর্ষ নব-জীবনের স্বাদ গ্রহণ করিতে চলিয়াছে, সেই মহাত্মা গান্ধী একদা টলষ্টয়ের রচনা ও আদর্শবাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন।

য়ুরোপের বর্ত্তমান সভ্যতার আত্ম-স্ফীত বিস্তারের মহা-উল্লাসের মধ্যে টলষ্টয় পুরাকালের ঋষিদের মতন আসিয়া আবির্ভূত হইলেন, স্পষ্ট নির্ভীক কণ্ঠে ধ্বনিয়া তুলিলেন, সেই আত্ম-স্ফীত সভ্যতার বিরুদ্ধবাণী। মানুষের মনের গহন গুহায় লুক্কায়িত মানবের অমৃতত্বকে আবার বিভ্রান্ত জগতের সম্মুখে উদঘাটিত করিয়া তুলিয়া ধরিলেন। য়ুরোপ সচকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল।

টলষ্টয়ের প্রত্যেক রচনার মধ্যে তাঁহার সেই একোদ্দিষ্ট সাধনার স্পষ্ট ছাপ আছে। তাঁহার প্রত্যেক রচনাই হইল বিদ্যুৎ-ময় প্রাণের প্রকাশ। তাহাকে স্বীকার করিতে না পার, কিন্তু তাহাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইবার উপায় নাই।

এবং তাঁহার সমগ্র রচনার মধ্যে এই Kreutzer Sonata হইল তাঁহার প্রাণ-শক্তির সর্ব্বোত্তম প্রকাশ।

এ যুগের অভিশাপ

"কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যদি কেউ কাম-দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে কোন নারীকে, দেহের সঙ্গমের আগেই অন্তরে সে করেছে সেই নারীর সঙ্গে যৌন-ব্যভিচার।"

—ম্যাথু, ৫ম—২৮

বসন্তকাল সবেমাত্র পড়েছে। দুটি পুরো দিন আর একটি রাত চলেছি ট্রেনে, প্রাণান্তকর ক্লান্তির মধ্যে। কাছের যাত্রীরা ক্রমাগত উঠছে আর নামছে; তার মধ্যে আমি ছাড়া আর তিনটি প্রাণী, যেখান থেকে যাত্রা সুরু হ'য়েছে সেখান থেকে সমানে এই কামরাতে আছে। সেই তিনজনের মধ্যে একজন হলেন মহিলা, আজ আর তাঁকে তরুণী বলা যায় না এবং তেমন আকর্ষণীয়ও কিছু নন, অনবরত সিগারেট খাচ্ছেন, গায়ে পুরুষদের পরিধেয় লম্বা কোট, মাথায় ছোট্ট ফেল্ট্-হ্যাট, মুখের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলে স্পষ্ট দেখা যায়, বহুদিনের বহু বেদনার সুগভীর ছাপ; দ্বিতীয়জন তাঁরই সহযাত্রী একজন পুরুষ-বন্ধু, বছর চল্লিশ বয়স, রীতিমত বাচাল, পরনে চটকদার নতুন-তৈরী পোষাক; তৃতীয় সহযাত্রীটি খর্বাকৃতি, চঞ্চল, ব্যতিব্যস্ত-ধরণের লোক, বয়সের দিক্ থেকে বৃদ্ধ বলা যায় না অবশ্য, কিন্তু ইতিমধ্যেই কোঁকড়ানো চুলে চুণকাম সুরু হয়ে গিয়েছে। অন্য যাত্রীদের স্পর্শ এড়িয়ে তিনি এক কোণে একলা বসে আছেন···চোখের দৃষ্টি অনবরত এক বস্তু থেকে অপর বস্তুর ওপর যেন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পরিধানে একটা পুরানো ওভারকোট, দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কোন হাল-ফ্যাসানের দাজ্জির তৈরী, কোটের সঙ্গে লাগানো আস্ট্রাখান কলার, তার সঙ্গে মানিয়ে মাথায় আস্ট্রাখান টুপী। কোটের নীচে জ্যাকেট এবং তার তলায় পাড়-বসানো শার্ট, রাশিয়ান শার্ট বলে যা পরিচিত। ভদ্রলোকটির একটা বৈশিষ্ট্য দেখলাম—মাঝে-মাঝে গলা দিয়ে অদ্ভুত-ধরণের এক আওয়াজ করে উঠছেন, কতকটা ছোট্ট কাসির মত, যেন কাসতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন। এতটা পথ যে চলে এলাম, দেখি, লোকটি সহযাত্রীদের সঙ্গে আলাপ করবার সমস্ত সুযোগ সযত্নে এড়িয়ে চলেছেন। অনেকেই আলাপ করবার চেষ্টা করেছে কিন্তু তাদের সব কথার উত্তরে শুধু কোনরকমে একটা রুক্ষ হাঁ-হুঁ দিয়েই সেরেছেন। পাছে কথা বলতে হয় বলে বই পড়তে সুরু করে দেন, কিংবা আনমনে সিগারেট খেতে খেতে জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে থাকেন, কিংবা একটা পুরোনো ব্যাগ থেকে খাবার জিনিসপত্র বার করে, একটু-আধটু কিছু খান, নিজের চা নিজেই তৈরী করে নেন। মাঝে-মাঝে মনে হয়েছে, তাঁর এই স্বেচ্ছাকৃত একাকিত্বে বোধ হয় তিনি নিজেই ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছেন; তাই দু-একবার তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা যে আমি করিনি, তা নয়; তবে যখনি আমাদের চোখাচোখি হয়, এমন অনেক বারই হয়েছে, কারণ, ভদ্রলোকটি একটু দূরে ঠিক আমার সামনাসামনি আসনেই বসেছিলেন—প্রত্যেক বারই তিনি হয় বই-পড়ায় নতুন করে মনঃসংযোগ করেছেন, নতুবা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থেকে আমার দৃষ্টির আমন্ত্রণকে উপেক্ষা করেছেন।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার দিকে একটা বড় ষ্টেশনে গাড়ীটা এসে থামতে দেখি, এই বায়ুগ্রস্ত ভদ্রলোকটি কামরা থেকে নেমে চায়ের জন্যে গরম জল সংগ্রহ করে ফিরলেন। নতুন-পোষাক-পরা যাত্রীটি, পরে জানলাম যে, তিনি একজন উকীল, সহযাত্রী বান্ধবীটিকে নিয়ে ষ্টেশনের রিফ্রেসমেণ্ট রুমে চা-পান

করতে ঢুকলেন। সেই অবসরে কামরায় কতকগুলি নতুন যাত্রী উঠে পড়লো, তাদের মধ্যে দীর্ঘাকৃতি একজন বৃদ্ধ, পরিষ্কারভাবে দাড়ি-গোঁপ কামানো, দেখলেই বোঝা যায়, ব্যবসাদার লোক, সারা মুখ রেখায় ভরা, গায়ে মস্তবড় কারের কোট, আমেরিকার চামড়ার তৈরী, মাথায় দিব্য ছুঁচলো সুতির ক্যাপ, যেখানে সেই উকীল আর তাঁর বান্ধবী বসেছিলেন, তার সামনেই এসে বসলেন। বসার সঙ্গে-সঙ্গেই এক অল্পবয়সী তরুণের সঙ্গে কথা বলতে সুরু করে দিলেন, তরুণটি খুব সম্ভব কেরাণী হবে এবং তাঁর সঙ্গে-সঙ্গেই কামরায় ঢোকে।

আমি তার বিপরীত দিকে একেবারে এক কোণে বসেছিলাম এবং ট্রেনটা থেমে ছিল বলেই, মাঝখান দিয়ে যখন কেউ চলাচল করছিল না, তখন তাদের কথাবার্তা অংশত বেশ স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছিলাম। ব্যবসাদার লোকটিই প্রথম কথা বলতে সুরু করেন, পরের ষ্টেশনের কাছাকাছি কোথাও তাঁর জমিজমা আছে, তাই দেখতে চলেছেন। সাধারণত এসব ক্ষেত্রে যা হয়, এখানেও তাই সুরু হলো, বাজার-দরের কথা, ব্যবসার কথা, মস্কোর বাজারের হাল-চাল, সেখান থেকে উঠলো নিজ্‌নী নভোগোরডের মেলার কথা। মেলার কথা উঠতেই কেরাণী যুবকটি সেই মেলায় স্থানীয় কোন বিশিষ্ট ধনী-ব্যবসাদারের মদ-খাওয়া এবং আনুষঙ্গিক নারী-ঘটিত ব্যাপারের গল্প সুরু করে দিল, কিন্তু তার গল্প তাকে শেষ করতে না দিয়েই বৃদ্ধলোকটি তাঁর যখন বয়স-কাল ছিল, সেই সময়কার কুনাভিন মেলায় পুরাকালে যে-সব স্ফূর্তি হতো, তার গল্প আরম্ভ করে দিলেন। তাতে তিনিও অবশ্য লিপ্ত ছিলেন এবং সে-কথা সগর্বেই তিনি ঘোষণা করলেন। সেই কুনাভিন মেলায়, আজও বলতে তাঁর আনন্দ উছলে পড়ছে, সেই ধনী ব্যবসাদার লোকটি আর তিনি মত্তাবস্থায় এমন একটা কাণ্ড করেছিলেন, যা বলতে গেলে কানে কানে বলা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। সেই কথা না শুনে সঙ্গের কেরাণীটি আনন্দে অট্টহাস্য করে উঠলো—তার সেই হাসির শব্দে কামরার এ-কোণ থেকে ও-কোণ পর্য্যন্ত দুলে উঠলো; সঙ্গে-সঙ্গে বৃদ্ধটিও দুই কষের দুই হলদে দাঁত বের করে হেসে কেটে পড়লেন। আসন ছেড়ে কামরার দরজার কাছে গিয়ে মনে করলাম, যতক্ষণ না গাড়ী আবার ছাড়ে, ততক্ষণ প্লাটফর্ম্মে নেমে বরঞ্চ একটু পায়চারি করি। নামতে যাবো, এমন সময় দেখি, সেই মহিলা-সহযাত্রীটি তাঁর বান্ধবের সঙ্গে গল্পে মশ্‌গুল হয়ে ফিরছেন।

আমাকে দেখে বাচাল উকীল ভদ্রলোকটি বলে উঠলেন, "নামছেন কি, সময় তো নেই—সেকেণ্ড বেল্ দিল বলে!"

ভদ্রলোক ঠিকই বলেছিলেন। ট্রেনের শেষ বরাবর যেতে না যেতেই ঘণ্টা বেজে উঠলো। তাড়াতাড়ি ছুটে ফিরে এলাম। দেখি, সেই উকীল আর তাঁর সঙ্গিনীটি তেমনি মশ্‌গুল হয়ে কথা বলে চলেছে। তাঁদের সামনে যে বৃদ্ধ ব্যবসায়ীটি বসে ছিলেন, তিনি সোজা সামনের দিকে চেয়ে মাঝে-মাঝে নিজস্ব ভঙ্গীতে ঠোঁট নেড়ে চলেছেন।

উকীল ভদ্রলোকটির পাশ দিয়ে আমার আসনের দিকে যেতে যেতে শুনলাম, তিনি মৃদু হেসে মন্তব্য করছেন, "তারপর মেয়েটি সোজা সব কথা তার স্বামীকে জানিয়ে দিল···অতঃপর সে আর কোন মতেই তার সঙ্গে বাস করতে পারবে না, বাস করতে চায়ও না···কারণ···"

গল্পের অবশিষ্ট অংশ আমি আর শুনতে পেলাম না, কারণ আমি আসনে এসে বসার সঙ্গে সঙ্গে অন্য যাত্রীরা মাঝখানে ভিড় করে দাঁড়ালো। তারপর গার্ড এলো—তার পেছনে এলো মালপত্র নিয়ে একজন কুলী। কিছুক্ষণের জন্যে তাই নিয়ে এমন গোলমাল আর চেঁচামিচির সৃষ্টি হলো যে, তাঁদের কথাবার্তার একটা বর্ণও আর বুঝতে পারলাম না।

গোলমাল থেমে যাওয়ার পর উকীল ভদ্রলোকটির কণ্ঠস্বর আবার স্পষ্ট হয়ে উঠলো, কিন্তু তাঁরা তখন কথার প্রসঙ্গ বদলে ব্যক্তিগত কথা থেকে সাধারণ বিষয় নিয়ে আলোচনা সুরু করেছেন। উকীল ভদ্রলোকটি ডাইভোর্স সম্পর্কে তাঁর মতামত জাহির করে বলছিলেন, সারা য়ুরোপে এখন এই ডাইভোর্সের সমস্যা নিয়ে সাধারণ লোক পর্য্যন্ত রীতিমত উদ্‌গ্রীব ও চিন্তান্বিত হয়ে উঠেছে এবং রাশিয়াতে এখন আদালত বেশীর ভাগ রায়ই বিবাহ-বিচ্ছেদের স্বপক্ষে দিচ্ছে। হঠাৎ কথা বলতে বলতে উকীল ভদ্রলোকের হুঁস হলো যে, সারা কামরার মধ্যে একমাত্র তাঁরই কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে,—তাই হঠাৎ কথা-বলা বন্ধ করে, বৃদ্ধলোকটির দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করে উঠলেন,—"কি বলেন, সেকালে এসব কিছুই ছিল না—অন্ততঃ আমার তাই বিশ্বাস, কি বলেন?"

এই প্রশ্নের উত্তরে ব্যবসাদার ভদ্রলোকটি কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ট্রেন ছেড়ে দিল। তখন তিনি মাথা থেকে টুপীটা খুলে, হাত দিয়ে বুকে ক্রুশের চিহ্ন করে নিঃশব্দে যেন প্রার্থনা

আওড়াতে আরম্ভ করে দিলেন। অগত্যা উকীল ভদ্রলোকটি বাইরের দিকে চেয়ে ভদ্রতার খাতিরে অপেক্ষা করতে লাগলেন, যতক্ষণ না তাঁর ধর্ম্মকার্য্য শেষ হয়। প্রার্থনা শেষ হলে, ব্যবসাদার ভদ্রলোকটি যথারীতি আবার তিনবার সারা অঙ্গে ক্রশের চিহ্ন গ্রহণ করে মাথায় টুপীটি ঠিক করে রাখলেন, তারপর নিজের আসনে সুবিধামত হেলে দুলে ঠিক করে বসে নিয়ে উত্তর দিলেন—"সেকালেও এ-সব ঘটতো, তবে আজকালকার মত ঘন-ঘন ঘটতে না। এখন অবশ্য এত ঘন-ঘন না হয়ে উপায়ান্তর নেই—কারণ, এখন আমরা সুসভ্য হয়েছি, আশ্চর্য্য-রকম সুসভ্য হয়েছি।"

ক্রমশ ট্রেনের গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানারকমের অদ্ভুত শব্দ সব জেগে উঠতে লাগলো, সেইজন্যে কামরার ভেতরে তাঁদের কথাবার্ত্তা শোনা একরকম অসাধ্য হয়ে উঠলো। কিন্তু তাঁদের এই আলোচনা শুনতে আমার রীতিমত ভালই লাগছিল, সেইজন্যে বাধ্য হয়েই আমি তাঁদের কাছ ঘেঁষে এগিয়ে গেলাম। আমার নিকট-প্রতিবেশী উদগ্র বায়ুগ্রস্ত সেই ভদ্রলোকটির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, এই আলোচনায় তাঁরও ঔৎসুক্য যেন জেগে উঠেছে। নিজের জায়গা না ছেড়ে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন, কি করে তাদের কথাবার্ত্তা শোনা যায়।

ওষ্ঠে ক্ষীণ-হাসি এনে মহিলাটি জিজ্ঞাসা করে উঠলেন, "আপনি যে বলছিলেন, আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা এর জন্যে দায়ী, কি করে? আগে যে বিয়ে হতো, বর-কনে বিয়ের আগে কেউ কাউকে জানতে পারতো না, সে-বিয়ে যে আজকালকার বিয়ের থেকে ভাল ছিল, এ-কথা নিঃসন্দেহে কিছুতেই বলা যায় না। পরস্পর পরস্পরকে ভাল লাগে কি না, কিংবা ভাল লাগতে পারে কি না, তার কিছুই তারা জানতো না, তবুও তাদের বিয়ে করতে হতো তাকে, যাকে তারা আদৌই জানে না, চিনে না, তার ফলে বিয়ের মন্ত্রের মধ্য দিয়ে বরণ করে নিতো তারা সারা জীবনের অশান্তিকে। আপনার মতে সেইটে কি খুব বাঞ্ছনীয় অবস্থা ছিল?"

মহিলাটির প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ব্যবসাদার ভদ্রলোকটি নিজের কথারই পুনরুক্তি করলেন, "আজকাল লোকে সভ্য হয়েছে, আশ্চর্য্য-রকমের সব সভ্য হয়েছে।"

কথা বলার সময় লক্ষ্য করলাম; মহিলাটির দিকে তিনি রীতিমত ঘৃণার দৃষ্টিতেই চেয়েছিলেন।

মৃদু হেসে উকীল জিজ্ঞাসা করে উঠলেন—"বিবাহিত জীবনের গ্লানির সঙ্গে শিক্ষা-ব্যবস্থার যে কি সম্পর্ক, অনুগ্রহ করে যদি একটু বুঝিয়ে বলেন, বিশেষ বাধিত হব।"

ব্যবসাদার কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু মহিলাটি বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—"যাই বলুন, সেকাল আর ফিরে আসছে না···কিছুতেই না···।"

—"আহা, ওঁর যা বক্তব্য, ওঁকে তা বলতে দিন্।" মহিলাটিকে বাধা দিয়ে উকীল বলে ওঠে।

স্বতঃসিদ্ধ শাস্ত্রোক্তির মত ব্যবসাদার ঘোষণা করেন, "শিক্ষা থেকেই জন্মগ্রহণ করে বিমূঢ়তা—"

মহিলাটি অধীর-আগ্রহে প্রতিবাদ করে ওঠেন—"যারা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে না, বিয়ের নামে তাদের যারা একসঙ্গে বেঁধে দেয়, তারাই আবার সকলের চেয়ে বেশী অবাক্ হয়ে যায়, যখন দেখে সেই বিয়ের ফলে স্বামী বা স্ত্রী কেউই সুখী হতে পারলো না।"

কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে মহিলাটি একবার উকীলের দিকে, আর একবার সেই কেরাণীর দিকে যেন মৌন-সমর্থনের জন্যে দৃষ্টিপাত করেন। ব্যবসাদার ভদ্রলোকটিকে বাক্য-বাণে বিদ্ধ করবার জন্যেই তিনি বলে চলেন—"শুধু জন্তুদেরই ঐরকম ভাবে মালিকের ইচ্ছেয় জোড় বেঁধে দেওয়া চলে। মানুষ তো আর জন্তু নয়—প্রত্যেক পুরুষ বা প্রত্যেক মেয়ের একটা স্বতন্ত্র ভাল-লাগা না-লাগা আছে, একটা স্বতন্ত্র বাসনা-কামনা আছে।"

ব্যবসাদার ভদ্রলোকটি প্রতিবাদ করে ওঠেন—"এ-রকম ভাবে কথা বলা আপনার উচিত নয়। মানুষ পশু নয়, তা সবাই জানে এবং সেইজন্যেই মানুষ আইন-কানুন তৈরী করেছে।"

—"ঠিক কথাই। কিন্তু বলতে পারেন, সে-ক্ষেত্রে কি করে একত্র বাস করা যায়?"

মহিলাটি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করে ওঠেন। তাঁর ধারণা যেন তিনি খুব নতুন কথাই কিছু বলেছেন।

পরম-বিজ্ঞের মত গম্ভীরকণ্ঠে ব্যবসাদার উত্তর দেন—"সেকালে এই সব ব্যাপার নিয়ে বড় একটা কেউ মাথা ঘামাতো না। আজকাল এটা যেন একটা ফ্যাসান হয়ে উঠেছে। স্বামি-স্ত্রীর সংসারের মধ্যে যেই একটা কিছু সমস্যা বা অসুবিধা দেখা দেয়, অমনি স্ত্রী রুখে উঠেন, 'আমি তোমার সঙ্গে বাস করতে চাই না—!' এমন কি চাষীদের মধ্যেও এই ব্যারাম ছড়িয়ে পড়েছে, তারাও ভদ্রলোকদের দেখাদেখি এই সব বলতে-কইতে আরম্ভ করেছে। একটা কিছু হোক

না, অমনি চাষার বউ স্বামীর মুখের ওপর শুনিয়ে দেবে, 'এই রইলো তোর জামা-কাপড়, আমি চল্লুম জ্যাকের সঙ্গে। তোর চেয়ে তার মাথার চুল ঢের-ঢের ভাল।' এই তো হলো ব্যাপার। মেয়ে-মানুষের মনে যদি ভয়ই না থাকলো, তা হলে সে কিসের মেয়ে-মানুষ ?"

কেরাণী ভদ্রলোকটি একবার উকীলের দিকে, একবার মহিলাটির দিকে, আর একবার আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। হাসতে ইচ্ছে করলেও সাহস করে হাসতে পারে না। ঠোঁটের কোণে জমিয়ে রাখে। হাসবার বা কিছু বলবার আগে সে বুঝতে চেষ্টা করে, ব্যবসাদারের বক্তব্য শ্রোতারা কি-ভাবে গ্রহণ করলো, সেই বুঝেই সে প্রতিবাদ করবে, কিংবা হেসে সমর্থন জানাবে।

মহিলা জিজ্ঞাসা করে ওঠেন—"ভয় ? ভয় বলতে আপনি কি বলতে চান ?"

—"বাইবেলে বলেছে, 'প্রত্যেক স্ত্রী তার স্বামীকে ভয় করবে', এখানে ভয় বলতে যা বোঝায়, তাই—।"

তিক্তকণ্ঠে মহিলা প্রতিবাদ করে ওঠেন—"সে সব যুগ বহু দিন হলো চলে গিয়েছে, বুঝেছেন মশাই।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি জবাব দিয়ে ওঠেন— "না ম্যাদাম, সে-সব যুগ চলে যেতে পারে না। পুরুষের বুকের পাঁজরা থেকেই আদিম নারীর জন্ম হয়েছিল এবং যত-দিন সৃষ্টি থাকবে, ততদিন এই কথাই সত্য হয়ে থাকবে।"

কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে বৃদ্ধ এমন জোরে ঘাড় নাড়তে থাকেন যে, কেরাণীটির স্থিরবিশ্বাস হয়ে যায় যে, এই বিতর্কে বৃদ্ধই জয়ী হয়েছে—অতএব সে এখন নিশ্চিন্তে হাসতে পারে। তাই বৃদ্ধের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তার ঠোঁটের কোণে জমান হাসি ফেটে পড়ে।

এত সহজে মহিলাটি পরাজয় স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না। শ্রোতাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে তিনি যেন আপনার মনে বলে ওঠেন—"তাই বটে, এই সম্পর্কে তর্ক করতে গেলেই পুরুষদের মুখে ঐ এক বুলি— ; পুরুষ, তারা নিজেরা স্বাধীন থাকবে, প্রয়োজন হলে তার জন্যে আন্দোলন করবে, আর মেয়েদের বাড়ীর ভেতর খিল দিয়ে আটকে রাখবে। নিজেদের পুরোমাত্রায় স্বাধীনতা ভোগ করতে যাতে অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটী না হয়, সেদিকে পুরুষদের চেষ্টার এতটুকু কমতি নেই।"

—"তার জন্যে কারুর অনুমতি বা অনুমোদনের প্রয়োজন আমাদের নেই। একথা বিশেষ করে স্মরণ রাখবেন, পুরুষ-মানুষ তার বাড়ীর বাইরে যে ব্যভিচার করে, তার ফলে তার সংসারে কোন নতুন সন্তানের আবির্ভাব হয় না। কিন্তু স্ত্রীলোক অর্থাৎ বিবাহিতা পত্নী বাইরের অনাচারের কলঙ্ক অসহায়ভাবে ঘরের মধ্যে বহন করে আনে—সে-ক্ষেত্রে প্রকৃতিগত ভাবে সে অসহায়—।"

প্রত্যেক শব্দটি ব্যবসাদার ভদ্রলোকটি স্পষ্ট উচ্চারণ করে এমন গম্ভীর ভাবে জোর দিয়ে বললেন যে, শ্রোতাদের ওপর তার প্রভাব স্পষ্টই প্রতিভাত হয়ে উঠলো। এমন কি, মহিলাটিও পরাজয় অনিবার্য্য হয়ে উঠছে বুঝে বিচলিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু তবুও তিনি কিছুতেই হার মানতে রাজী নন।

—"তবুও, সব মেনে নিলেও একথা আপনাকে স্বীকার করতেই হবে যে, মেয়েদেরও দেহ রক্ত-মাংস দিয়েই তৈরী—পুরুষের মতন তারও মন বলে একটা জিনিস আছে। যদি সে দেখে, তার স্বামীকে সে ভালবাসতে পারলো না, সে কি করবে তখন ?"

চোখ ঘুরিয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করে ব্যবসাদার তপ্তকণ্ঠে বলে ওঠেন—"যদি স্বামীকে ভালবাসতে না পারে ? তাতে বিচলিত হবার কি আছে ? ভালবাসতে শিখবে—সেই হবে তার কর্ত্তব্য।"

এই অপ্রত্যাশিত যুক্তি বিশেষ করে কেরাণী ভদ্রলোকটির মনঃপূত হওয়ায় আনন্দে একটা ভাষাহীন আওয়াজ তার গলার ভেতর থেকে আপনা হতে বেরিয়ে পড়ে।

মহিলাটি প্রতিবাদ করেন—"তাই বটে। কিন্তু কথা হলো, ভালবাসা শিখতে যে তার মনই চাইবে না। অন্তরে যদি ভালবাসা না থাকে, তবে জগতের কোন চেষ্টাতেই তাকে আনা সম্ভব নয়।"

হঠাৎ মাঝখান থেকে উকীল জিজ্ঞাসা করে ওঠেন—"বেশ, যদি প্রমাণিত হয়ে যায় যে, স্ত্রী স্বামীর বিশ্বাস হারাবার মত কাজ করেছে, তা হলে ?"

তার উত্তর আসে বৃদ্ধের কাছ থেকে—"সে-প্রসঙ্গ এখানে ওঠে না। যাতে সে-রকম কোন ব্যাপার না ঘটতে পারে, তার জন্যে প্রত্যেক স্বামীরই ব্যবস্থা করতে হবে।"

—"কিন্তু এরকম তো প্রায়ই হয়, স্বামীর সমস্ত সতর্কতা সত্ত্বেও এই জাতীয় ঘটনা ঘটে—তখন কি হবে ?"

ব্যবসাদার জবাব দেন—"অন্য যেখানেই তা হোক না কেন, আমাদের সমাজে তা হয় না—"

হঠাৎ সবাই নীরব হয়ে যায়। কেরাণী স্বাম

পরিবর্ত্তন করে আরো একটু কাছে এগিয়ে এসে বসে। যেন সকলের আড়ালে পড়ে থাকতে সে চায় না। ঈষৎ হাসির সঙ্গে সে এবার বলতে সুরু করে—"একটা ব্যাপার আমাদেরই মধ্যে ঘটেছিল—রীতিমত কেলেঙ্কারীর ব্যাপার এবং একটু জটিলও বটে। শুনুন,—যে স্ত্রীলোকটির কথা বলছি, তাকে অবশ্য, যাকে বলে একটু আলগা-ধরণের মেয়ে তাই বলা যায়। নানারকমের ছিল তার খেয়াল। তার স্বামী-বেচারা ছিল,—চলতি ভাষায় যাকে বলে ভালমানুষ—বুদ্ধি-শুদ্ধির অবশ্য কোন গোলমাল ছিল না। স্ত্রীলোকটি গোপনে দোকানদার এক ছোঁড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি সুরু করে দিল। স্বামী জানতে পেরে ভালকথায় তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বারণ করে, কিন্তু তাতে কোন ফলই হয় না। স্ত্রীলোকটি নিজের খেয়ালমত যা খুশী তাই করে বেড়াতে আরম্ভ করে। শেষকালে ব্যাপার এতদূর গড়ালো যে, লুকিয়ে স্বামীর পকেট থেকে পয়সা-কড়ি চুরি করতে লাগলো। শেষকালে একদিন স্বামী প্রহার দিল। তার ফলে কি হলো ভাবছেন? দিন-দিন তার মতিগতি আরো খারাপ হয়ে যেতে লাগলো, শেষকালে একটা অখৃষ্টান বাজে লোক—একটা ইহুদী, তার সঙ্গে পালিয়ে গেল। এখন আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করছি, বলুন তো, তার স্বামী কি করবে? বেচারা তার সম্পর্ক একেবারে মুছেই ফেলেছে—অবিবাহিত লোকদের মত একলাই এখন বসবাস করছে, ওধারে স্ত্রীলোকটি ক্রমশঃ পাঁকের মধ্যে ডুবেই চলেছে—।"

বৃদ্ধ গর্জ্জন করে ওঠেন—"স্বামীটা হলো একটা আস্ত গাধা। গোড়াতেই যখন সে জানতে পারলো তখন যদি উত্তম-মধ্যম দিয়ে সায়েস্তা করতো, আমি হলফ করে বলতে পারি, দেখতে, আজ সে তার পাশেই আছে। কথাটা কি জান, যখনি দেখবে, তারা সুরু করেছে, তখনি—একেবারে গোড়াতেই আটকে দিতে হবে। কথায় বলে না, মাঠে ঘোড়াকে আর ঘরে স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করতে নেই।"

এই সময় পরের ষ্টেশনের জন্য টিকিট সংগ্রহ করতে গার্ড এসে উপস্থিত হলো। বৃদ্ধ তার টিকিট দিয়ে দিল।

—"ঠিক বলেছেন স্যার, সময় থাকতে স্ত্রীলোককে বশ করতে হয়, নইলে একটু ফাঁক দিয়েছেন কি সব সাবাড়।"

আর চুপ করে থাকতে না পেরে আমি বলে উঠলাম—"কিন্তু এই কিছুক্ষণ আগে আপনি যে বলছিলেন কুনাভিন মেলায় পুরুষদের কাণ্ডকারখানার কথা, তার সঙ্গে এর সঙ্গতি কোথায়?"

উত্তরে বৃদ্ধ বলে উঠলেন—"ওঃ, সে হলো একটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার!" বলেই নীরব হয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরেই এঞ্জিনের তীব্র বংশী-ধ্বনি বেজে উঠলো। আসনের তলা থেকে একটা ব্যাগ টেনে বার করে নিয়ে গায়ের ফারের কোটটা ভাল করে জড়িয়ে বৃদ্ধ উঠে পড়লেন। মাথা থেকে টুপীটা ঈষৎ মুক্ত করে গাড়ী থেকে বেরিয়ে প্লাটফর্ম্মে নেমে পড়লেন।

বৃদ্ধের অবতরণের সঙ্গে-সঙ্গে আবার সুরু হলো বচসা। সকলেই একসঙ্গে যে যার বক্তব্য বলতে সুরু করে দিল।

বৃদ্ধকে লক্ষ্য করে কেরাণী বলে উঠলো—"সেকালের আমলের জবরদস্ত বাড়ীর কর্ত্তা—।"

মহিলাটি সমর্থন করলেন—"শাসনের নামে প্রাণান্তকর অত্যাচার—স্ত্রীলোক আর বিবাহ সম্বন্ধে কি বর্ব্বর ধারণা!"

উকীল মন্তব্য করলেন—"সত্যি, বিবাহ সম্পর্কে য়ুরোপের সুসভ্য চিন্তাধারা থেকে আমরা এখনো বহু দূরে পিছিয়ে পড়ে আছি।"

ভদ্রমহিলাটি নিজের শেষ বক্তব্যের সূত্র ধরে বলতে সুরু করলেন—"আসল কথা কি জানেন, একান্ত আশ্চর্য্যের ব্যাপার যে, এই-জাতীয় পুরুষেরা আজও পর্য্যন্ত বোঝেন না যে, প্রেমহীন বিবাহ বিবাহই নয়। প্রেমই হলো বিবাহের আসল মন্ত্র এবং সেই হলো ধর্ম্মসিদ্ধ বিবাহ, যার পেছনে আছে প্রেমের অনুমোদন।"

কেরাণী গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনে, যেন কথাগুলো মনে গেঁথে রাখতে চেষ্টা করছে, কারণ, ভবিষ্যতে অন্য কোন জায়গায় এই সব লাগ-সই ভাল-ভাল কথা প্রয়োগ করবার দরকার হতে পারে।

মহিলাটির বক্তব্যের মাঝখানে হঠাৎ একটা কিসের যেন আওয়াজ হলো, জোর করে হাসি বা কান্না চাপতে গেলে যে রকম আওয়াজ হয়। ফিরে চেয়ে দেখি, আমাদের সহযাত্রী সেই অর্দ্ধ-শুভ্রকেশ বাক্যহীন নিঃসঙ্গ লোকটি কথাবার্ত্তার ফাঁকে কখন আমাদের অজ্ঞাতে আমাদের খুব কাছেই উঠে এসে বসেছেন। তাঁর মুখের মধ্যে উজ্জ্বল চোখ দুটি দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, আমাদের এই আলোচনা তাঁকে রীতিমত আকৃষ্ট করেছে। আসনের পেছন দিকে হাতের উপর ভর দিয়ে ভদ্রলোকটি উঠে দাঁড়িয়ে

আছেন···দেখলেই মনে হয় যেন খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন···সমস্ত মুখটা লাল হয়ে উঠেছে···তার মধ্যে বেদনার আকুঞ্চন-রেখা স্পষ্টই চোখে ধরা পড়ে।

উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করে ওঠেন, "প্রেম ···কি ধরণের প্রেমের কথা বলছেন? কি সে প্রেম যা বিবাহকে ধর্ম্মের মর্য্যাদা দেয়?"

ভদ্রমহিলা প্রশ্নকর্ত্তার উত্তেজিত অবস্থা লক্ষ্য করে যথাসম্ভব মধুর এবং সহজ সুস্থভাবে উত্তর দিতে চেষ্টা করেন,—মানে, আসল সত্যিকারের ভালবাসা। যদি সেই রকম ভালবাসা পরস্পরের মধ্যে থাকে, তাহলেই বিবাহ সম্ভব।"

ভদ্রলোকটির দুটি উজ্জ্বল চোখ যেন আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ঠোঁটের কোণে বিচিত্র এক কুণ্ঠিত হাসি দেখা দেয়। জিজ্ঞাসা করেন, "কিন্তু কোন্‌টা আসল সত্যিকারের ভালবাসা? কি তার সংজ্ঞা?"

কণ্ঠস্বরের পেছনে যেন ভীরু কুণ্ঠা কাঁপতে থাকে।

ভদ্রমহিলা প্রত্যুত্তর দেন, "এর আবার সংজ্ঞা কি? আসল ভালবাসা যে কি, সবাই তা জানে।"

—"অন্ততঃ আমি জানি না···আপনি যদি অনুগ্রহ করে বুঝিয়ে বলেন, প্রেম বলতে···" ভদ্রলোক প্রশ্ন শেষ করতে পারেন না।

ভদ্রমহিলা বলে ওঠেন, "কেন, এ তো অতি সহজ ব্যাপার!"

কিন্তু তার বেশী কিছু আর বলতে পারেন না। হঠাৎ নীরব হয়ে গিয়ে, কয়েক মুহূর্ত্ত যেন কি চিন্তা করে নেন। তারপর বলতে সুরু করেন, "প্রেম কি? প্রেম হলো, পরস্পর পরস্পরকে একান্ত করে পাওয়া, যেন তাদের দুজনের বাইরে জগতের আর কোন লোকের কোন অস্তিত্ব নেই।"

ভদ্রলোক হঠাৎ হেসে ওঠেন, "একান্ত করে পাওয়া! কতক্ষণের জন্যে? এক মাসের জন্যে? দুদিনের জন্যে? না, আধঘণ্টার জন্যে?"

ভদ্রমহিলা গম্ভীরভাবে উত্তর দেন, "আমি বেশ বুঝতে পারছি, আপনি মুখে যা বলছেন, তার আড়ালে যেন অন্য কিছু বোঝাতে চাইছেন।"

—"না, না, অন্য কিছু নয়। আপনারা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন, আমি সেই বিষয়ের কথাই বলছি।"

উকীল ভদ্রলোকটি মহিলার পক্ষ সমর্থন করবার জন্য ওকালতী কায়দায় বলে উঠলেন, "ভদ্রমহিলার বক্তব্য হলো, প্রথমতঃ,—বিবাহ সেইখানেই হওয়া উচিত, যেখানে পরস্পরের মধ্যে একটা স্নেহের বন্ধন আগে থাকতে নির্দ্দিষ্ট থাকে···তা তাকে স্নেহই বলুন আর প্রেমই বলুন···কিম্বা অন্য যে-কোন নামে তাকে অভিহিত করুন। এবং এই অনুরাগ যদি বর্ত্তমান থাকে, তাহলেই বিবাহ হলো ধর্ম্ম-সিদ্ধ, নতুবা নয়। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর বক্তব্য হলো, যে-বিবাহ এই স্বাভাবিক অনুরাগের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সে-অনুরাগকে যে নামেই অভিহিত করুন না কেন, সে-বিবাহের মধ্যে এমন একটা উপাদানের অভাব থেকে যায়, যার জন্যে তা পরস্পরকে স্থায়ীভাবে বেঁধে রাখতে পারে না।"

এইখানে ভদ্রমহিলার দিকে ফিরে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "আপনার বক্তব্য আমি ঠিক মত বোঝাতে পেরেছি তো?"

ভদ্রমহিলা ঘাড় নেড়ে অনুমোদন জ্ঞাপন করেন।

উকীল উৎসাহিত হয়ে আবার বলতে আরম্ভ করেন, "তারপর কথা হলো···"

কিন্তু বেশী দূর আর অগ্রসর হতে পারেন না···সেই উজ্জ্বল-দৃষ্টি নিঃসঙ্গ ব্যক্তির চোখ দুটি জ্বলন্ত কয়লার মতন জ্বলে ওঠে। ভেতরের অধীরতা আর রোধ করে রাখতে পারেন না, বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, —"না··· আমিও ঠিক সেই কথাই বলছি··· পরস্পরের আকর্ষণের কথা···পরস্পরের অনুরাগের কথা···কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো, কত কাল এই আকর্ষণ স্থায়ী হতে পারে?"

ঘাড় দুলিয়ে ভদ্রমহিলা উত্তর দিয়ে ওঠেন, "কত কাল মানে? কেন, দীর্ঘকাল ধরে, অনেক ক্ষেত্রে সারা জীবন ধরে থাকে···"

—"হাঁ, থাকে, কিন্তু শুধুই নভেলে, বাস্তব জীবনে নয়। প্রকৃত অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, পরস্পরের এই আকর্ষণ বড় জোর বছর কয়েক থাকে, তাও খুব কম ক্ষেত্রে; সাধারণতঃ কয়েক মাস, কয়েক সপ্তাহ, কয়েক দিন, কয়েক ঘণ্টা মাত্র তার আয়ু···"

ভদ্রলোক কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে সকলের মুখের দিকে চেয়ে দেখেন···তাঁর ধারণা, তাঁর এই উক্তিতে সকলেই বিস্ময়-সচকিত হয়ে উঠেছে···

তিনজন একসঙ্গে প্রতিবাদ করে বলে ওঠে, এ-কথা কি করে আপনি বলতে পারেন? ক্ষমা করবেন···কিন্তু···"

এমন কি কেরাণীটিও প্রতিবাদসূচক আওয়াজ করে ওঠে।

—"হাঁ···হাঁ··· আমি জানি আপনারা প্রতিবাদ করবেন। আপনারা আলোচনা করছেন যা হওয়া

উচিত, তার কথা···আমি বলছি, যা ঘটছে বা ঘটে তার কথা। প্রত্যেক সুন্দরী নারীর জন্যে, যাকে আপনারা প্রেম বলছেন, তা প্রত্যেক পুরুষই অনুভব করে।"

ভদ্রলোক রীতিমত জোর গলায় বলে ওঠেন।

—"ছিঃ, এ ধরণের কুৎসিত কথা উচ্চারণ করাও অন্যায়। নিশ্চয়ই মানুষের জীবনে প্রেম আছে, অনুরাগ আছে, যে প্রেম, যে-অনুরাগের আয়ু শুধু মাস ধরে বা সপ্তাহ ধরে গোনা চলে না···সারা জীবন ব্যাপে থাকে তার আয়ু। তাই নয় কি?" ভদ্রমহিলা সকলের দিকে মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করেন।

—"কখনই নয়। যদিও এ রকম ব্যাপার কচিৎ কখন দেখা যায় যে, একজন পুরুষ সারা জীবন ধরে একটি নারীকেই কামনা করে গেল—কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে ষোল-আনা সম্ভাবনা থেকে যায় যে সে অন্য কোন পুরুষকে কামনা করবেই। চিরকাল জগতে এই হয়ে এসেছে এবং আজকে আমাদের এই পৃথিবীতে এই যুগেও তাই হচ্ছে।"

কথা শেষ করার সঙ্গে-সঙ্গে পকেট থেকে সিগারেট-কেস্ বার করে ভদ্রলোক ধূমপান করতে সুরু করে দেন।

বিজ্ঞের মত উকীল মন্তব্য প্রকাশ করে, "আকর্ষণটা পারস্পরিক।"

তৎক্ষণাৎ ভদ্রলোক প্রতিবাদ করে ওঠেন, "না, তা হতে পারে না। এক গাড়ী সর্ষের মধ্যে কোন দুটো সর্ষে ঠিক পাশাপাশি এক জায়গায় বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। তা ছাড়া, সম্ভব অসম্ভব নিয়ে কথা নয়, কথাটার মূলে আসল যে কথাটা রয়েছে, সেটা হলো, দেহের ক্ষুধা, কামনার পরিতৃপ্তি। সারা জীবন ধরে একজন আর একজনকে ভালবেসে যাবে, সেকথা বলাও যা, আর একটা মোমবাতি সারাজীবন ধরে অনির্বাণ জ্বলবে, সে-কথা বলাও তাই।"

কথাটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক জোরে একটান ধোঁয়া টেনে নেন। ভদ্রমহিলা প্রতিবাদ করে ওঠেন, "আপনি যে-ভালবাসার কথা বলছেন, সে হলো অন্য ধরণের ভালবাসা, নিছক কামনা। যে-ভালবাসা, একই আদর্শের সংযোগে, একই আত্মিক প্রেরণার মিলনে গড়ে ওঠে, সে-ভালবাসার অস্তিত্ব আপনি স্বীকার করেন না?"

গলায় সেই বিচিত্র আওয়াজ করে ভদ্রলোক বলে ওঠেন, "একই আদর্শের সংযোগ? আদর্শ না হয় দুজনের এক হলো, তাই বলেই কি একসঙ্গে শুতে হবে? ক্ষমা করবেন, কথাটা একটু হয়ত কুৎসিত শোনালো কিন্তু দুজনের আদর্শ এক হলেই দুজনে পাশাপাশি শুয়ে থাকবে, এ ধারণা কি করে করতে পারেন?"

উকীল মধ্যস্থতা করতে ওঠেন, "আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আমি বলতে বাধ্য হবো, জগতের বাস্তব ঘটনা কিন্তু আপনার বিপক্ষেই সাক্ষ্য দেয়। একথা আমাদের মানতেই হবে, বিবাহ আমাদের মধ্যে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। সমগ্র মানব-সমাজ, অন্ততঃ তার অধিকাংশই, বিবাহকে বরণ করে নিয়েছে এবং বহু বহু লোক দীর্ঘকাল ধরে বিবাহিত জীবনের মধ্যে থেকে রীতিমত সম্মানিত জীবনই যাপন করছেন।

অর্দ্ধ-শুভ্র-কেশ ভদ্রলোকটি হেসে উঠলেন, "একটু আগেই আপনারা বলছিলেন, বিবাহ হলো প্রেমের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যে মুহূর্তে আমি বললাম যে দৈহিক আকর্ষণ ছাড়া তার মধ্যে আর কিছু নেই, আপনারা প্রমাণ করতে উঠলেন যে, যেহেতু মানব-সমাজে বিবাহের অস্তিত্ব আছে, সেই হেতুই তার মধ্যে আছে প্রেমের অস্তিত্ব। এটা কি প্রমাণ হলো? আর তা ছাড়া, আজকালকার বিবাহ···প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

উকীল প্রতিবাদ করে, "মাফ করবেন, আপনি আমার কথা বুঝতে পারেন নি। আমি শুধু এইটুকুই বলতে চেয়েছিলাম যে, বিবাহ বহুকাল থেকে মানব-সমাজে চলে আসছে এবং আজও চলছে···"

—"বিবাহ চলে আসছে···আজও চলছে! সত্যি কথাই, কিন্তু কেন চলছে? যে সব জাতি বিবাহের মধ্যে দেখেছে মানব-দৃষ্টির বাইরে অলৌকিক সত্তার ইঙ্গিতকে, যারা স্বীকার করে নিয়েছে বিবাহের মধ্যে ধর্ম্মের অনুশাসনকে, যে-অনুশাসন তারা বিশ্বাস করে ভগবানের নির্দ্দিষ্ট বিধি বলে, প্রকৃত বিবাহ তাদের মধ্যেই ছিল এবং আজও তাদেরই মধ্যে আছে, আমাদের মধ্যে নয়। আমাদের দেশে যারা বিবাহ করে, তারা এই সব ব্যাপারের কোন ধারই ধারে না, তাদের চেতনার মধ্যে এই জাতীয় গভীর কোন অতীন্দ্রিয় ধারণার অস্তিত্বই নেই, তাদের কাছে বিবাহ হয় প্রতারণা, না হয় অত্যাচার। যেখানে প্রতারণাই প্রবল, সেখানে পরস্পর পরস্পরকে সহ্য করে চলে। কিছুদিন অনায়াসে কেটেও যায়। স্বামী আর স্ত্রী সেক্ষেত্রে সমাজকে প্রতারণা করে, সকলকে বোঝাতে চায় যে তারা প্রকৃত বিবাহ-বন্ধনের মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে নিয়ে সুখেই আছে, কিন্তু আসলে যা চলছে

তা হলো বহু-বিবাহ এবং বহু-স্বামিত্ব। খুবই কুৎসিত কিন্তু তবুও তা অসহনীয় নয়। স্বামী আর স্ত্রী বাহ্যত আজীবন একত্র বাস করবার শপথ যেখানে গ্রহণ করেছে অথচ যেখানে বিবাহের দ্বিতীয় মাস থেকেই বুঝতে পারে যে তারা পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে না, সম্পর্ক ছিন্ন করবার জন্যে অন্তর ব্যাকুল হয়ে উঠলেও যেখানে বাহ্যত একত্র বাস করতে বাধ্য হতে হয়, সেখানে জীবন নরকের মতই ভয়াবহ হয়ে ওঠে, তার অসহ্য নাগপাশ-বন্ধনের জ্বালা ভুলতে আকণ্ঠ সুরাপান করে, নিজেকে মেরে ফেলতে হয়, নতুবা কোন এক ক্ষিপ্ত মুহূর্তে নিজের হাতে নিজের জীবনকে, হয় গুলী দিয়ে, না হয় বিষ দিয়ে বিনষ্ট করে ফেলতে হয়···কোথাও বা পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করেই পরস্পরের কাছ থেকে মুক্তি অর্জন করে···এবং এই দ্বিতীয় দলের লোকই সংখ্যায় বেশী···”

কথা বলতে বলতে উত্তেজনায় কথার বেগ এত তীব্র হয়ে ওঠে যে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে আর কাউকে কোন মন্তব্য করবার অবকাশই দেন না ভদ্রলোক···

এর পর আমরা কেউই আর কোন কথা বলতে পারি না। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হতে থাকে।

আলোচনা ক্রমশঃ বেয়াড়া রকম উত্তপ্ত হয়ে উঠছে দেখে তাকে শান্ত করবার জন্যে উকীল উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন। সেই অস্বস্তিকর নীরবতা ভঙ্গ করে দু-পক্ষকেই শান্ত করবার জন্যে তিনি মন্তব্য করেন, “অবশ্য বিবাহিত জীবনে এই ধরণের সমস্যা যে ঘটে, তাতে কোন সন্দেহ নেই···”

ধীরে, সংযত কণ্ঠে সেই অর্দ্ধ-পক্ক-কেশ ভদ্রলোক বলেন, “আমার মনে হচ্ছে, আমার পরিচয় আপনি জানেন···”

—“না···সে-সৌভাগ্য আমার ঘটে নি!”

—“তাতে দুঃখ করবার কোন কারণ নেই···কারণ এমন কিছু সেটা সৌভাগ্য নয়। আমার নাম পদ্‌নিশেফ···বিবাহিত জীবনে যে-ধরণের সমস্যার কথা আপনি বলছেন সে-সমস্যার সম্মুখীন আমাকে হতে হয়···এবং তার যা পরিণাম, তা আমারও ভাগ্যে ঘটেছে···আমার স্ত্রীকে আমি হত্যা করেছি···”

কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক সকলের মুখের ওপর দ্রুত দৃষ্টি বুলিয়ে যান। কিন্তু হঠাৎ কেউই কোন মন্তব্য প্রকাশ করতে পারেন না। আমরা সকলেই নীরব হয়ে যাই।

গলায় সেই বিচিত্র আওয়াজ করে ভদ্রলোক আবার বলতে আরম্ভ করেন, “সে যাই হোক···পরিণামে সেই একই জিনিষ দাঁড়ায়। মাফ করবেন, আমার উপস্থিতি দিয়ে আপনাদের আর আমি বিব্রত করতে চাই না।”

একটা কিছু উত্তর দেওয়া উচিত, এই ধারণায় উকীল বলে ওঠে, “না, না, ও-সব কথা আপনি ভাবছেন কেন···মোটেই তা নয়···মোটেই তা নয়।”

কিন্তু “মোটেই তা নয়” বলতে, তিনি কি বোঝাতে চাইছিলেন, তা তাঁর নিজের কাছেই স্পষ্ট ছিল না। পদ্‌নিশেফ, কিন্তু সে কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে, সেখান থেকে উঠে নিজের আসনে গিয়ে বসলো।

ভদ্রমহিলার পার্শ্ববর্তী যাত্রী চাপা গলায় তাঁর কানের কাছে ফিস্-ফিস্ করে কি সব বলতে লাগলেন।

পদ্‌নিশেফের সামনেই আমি বসেছিলাম। কিন্তু এক্ষেত্রে কি বলা উচিত হবে, তা ঠিক করতে না পেরে চোখ বন্ধ করে বসে রইলাম, যেন ঘুমবার চেষ্টা করছি। বই পড়বো যে, তেমন আলোও তখন ছিল না। অন্ধকার হয়ে আসছে সব। এই ভাবে পরের ষ্টেশনে গাড়ী এসে পৌঁছল। ভদ্রমহিলা আর তাঁর সঙ্গের সহযাত্রীটি গার্ডের সঙ্গে পরামর্শ করে অন্য কামরায় চলে গেলেন। কেরাণীটি হাত-পা ছড়াবার জায়গা পেয়ে পরমানন্দে ঘুমিয়ে পড়লো। পদ্‌নিশেফ, সারাক্ষণ চা-পানের সঙ্গে সিগারেট টেনে চলেছিল···আগের ষ্টেশনেই সে নিজের হাতে নিজের চা তৈরী করে নিয়েছিল। কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকার পর যেই চোখ খুলেছি, অমনি দেখি, পদ্‌নিশেফ, আমার দিকে চেয়ে গম্ভীর ভাবে আমাকেই সম্বোধন করে বলতে আরম্ভ করেছে,—“আমি যে কি, এখন তা জানতে আপনার বাকি নেই। যদি আমার মতন লোকের সামনে বসে থাকতে আপনার বিরক্ত লাগে, আমি এখান থেকে উঠে যেতে পারি।”

—“সে কি কথা! মোটেই না! ওসব ধারণা অনুগ্রহ করে মনেই আনবেন না!”

—“বেশ, তাই যদি হয়···তাহলে আসুন, দুজনে মিলেই চা-পান করা যাক্···একটু কড়া হবে···চলবে তো?”

এই বলে পদ্‌নিশেফ, একটা পাত্রে খানিকটা চা ঢেলে দেয়।

—“কথা বলতে হয় বলেই ওরা কথা বলে···কিন্তু ওদের সব কথা ভুয়ো···মিথ্যে···”

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করি,—“কোন্ কথা বলছেন?”

—"ঐ যে, যে-কথা নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা হচ্ছিল···ঐ ওদের প্রেমের কথা আর তার আনুষঙ্গিক সমস্ত ব্যাপার। আপনার কি ঘুম পাচ্ছে?"

—"না, মোটেই না।"

—"বেশ, আপনার যদি বিরক্তি না লাগে, তাহলে শুনুন, ঐ যে-প্রেমের কথা ওঁরা বলছিলেন, ঐ প্রেমের জন্যেই আমি যা করেছি, তা করতে এক রকম বাধ্য হই। শুনবেন?"

—"বিলক্ষণ! বিরক্ত হব কেন? যদি বলতে আপনার কোন কষ্ট না হয়,—"

—"মোটেই না। চুপ করে থাকাই কষ্টদায়ক। আর একটু চা নিন? খুব কড়া লাগছে কি?"

সত্যিই চা-টা অসম্ভব রকম কড়া ছিল, প্রায় বিয়ারের মতন। কিন্তু পূরো একটি গ্লাস খেয়ে ফেললাম। ঠিক সেই সময় গার্ড মাঝখান দিয়ে চলে গেল। তাকে দেখেই পদ্‌নিশেফ বিরক্ত হয়ে তার সেই বিচিত্র আওয়াজ করে উঠলো। এবং যতক্ষণ সে চলে না গেল, ততক্ষণ কথা বন্ধ করে রইলো।

—"বেশ, তা হলে, আমার কাহিনী আমি বলবো আপনাকে···কিন্তু সত্যি আপনি বিরক্ত হবেন না তো?"

আমি তাকে আশ্বাস দিলাম, আনন্দিত চিত্তেই আমি তার কাহিনী শুনবো। কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করে থাকার পর, দুহাত দিয়ে মুখটা একবার ভাল করে ঘষে নিয়ে বলতে সুরু করে:

"বিয়ের আগে, অন্য পাঁচজনের মতই সমাজে আমাদের নিজের শ্রেণীর মধ্যেই বসবাস করতাম। অর্থাৎ আমি ছিলাম জমিদার, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সদস্য এবং এক সময় আমার নামের সঙ্গে রীতিমত একটা রাজ-উপাধিও ছিল, মার্শাল অফ দি নোবল্‌স্‌। বিয়ের আগে পর্য্যন্ত আমাদের সমাজের লোকেরা যেভাবে জীবনযাপন করে, আমিও সেইভাবে জীবন-যাপন করতাম, অর্থাৎ নীতির কোন বালাই ছিল না এবং আমাদের দলের আর পাঁচজন যেমন ধরে নিয়েছিল যে সেভাবে জীবনযাপন করাই হলো স্বাভাবিক কর্ত্তব্য, আমিও ঠিক তাই ভাবতাম। তাই নিজের সম্বন্ধে একটা উঁচু ধারণাই ছিল, মনে করতাম আমি একটা আদর্শস্থানীয় ব্যক্তি এবং আমার চরিত্রের মধ্যে বিন্দু-মাত্র ত্রুটী নেই। আমার সমবয়সী এবং আমার সমান মর্য্যাদা যাদের ছিল, তাদের অনেকের মত আমি আত্ম-সুখকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে ধরে নিই নি, কখনও কোন নারীকে স্বেচ্ছায় প্রলুব্ধ করে নষ্ট করি নি, কিম্বা কোন বিকৃত ক্ষুধাও আমার ছিল না। আমি যা কিছু পাপ করতাম, তা রীতিমত মেপে করতাম, স্বল্প মাত্রায় এবং ভদ্রভাবে, স্রেফ স্বাস্থ্যের জন্যে। যে-সব স্ত্রীলোক প্রেমে উন্মাদ হয়ে আমাকে জড়িয়ে ফেলতে পারে, তাদের সযত্নে এড়িয়ে চলতাম। অবশ্য, যতদূর মনে পড়ে, হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে একটু-আধটু প্রেম এসেও গিয়েছিল কিন্তু আমি এমনই ব্যবহার ক'রতাম, যেন আমি সে-সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ। এবং এই ধরণের আচরণ যে নৈতিক দিক থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ, সে-সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহই ছিল না; উপরন্তু নিজের আচরণে নিজে রীতিমত গর্ব্ব অনুভব করতাম।"

হঠাৎ এখানে এসে সে থেমে গেল এবং গলা দিয়ে সেই অদ্ভুত আওয়াজ করে উঠলো। বুঝলাম, যখনি তার মনে কোন নতুন আইডিয়া আসে, তখনই এই রকম অদ্ভুত শব্দ সে করে ওঠে।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সে আবার বলতে আরম্ভ করলো, "কিন্তু এইটেই ছিল আমার চরিত্রের আসল নীচতা। দেহগত ব্যাপারই সব-কিছু নয়; যেখানে পরস্পরের মধ্যে আন্তরিকতা থাকে, সেখানে নৈতিক দায়িত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত মনে করাই হলো অন্যায়। এই নৈতিক বন্ধনকে অস্বীকার করাই ছিল আমার প্রধান কৃতিত্ব। আমার মনে আছে, একবার একজন স্ত্রীলোককে যথারীতি অর্থ-উপহার দিয়ে দায়মুক্ত হতে পারি নি বলে, কি নিদারুণ অস্বস্তিই না ভোগ করেছিলাম··· সম্ভবত স্ত্রীলোকটি আমাকে ভালবেসে ফেলেছিল। যতক্ষণ না কিছু টাকা গছাতে পারলাম, ততক্ষণ মনে এতটুকু শান্তি আনতে পারিনি। অর্থাৎ টাকাটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে আমি বিনা বাক্যব্যয়ে বুঝিয়ে দিলাম যে অতঃপর তার সম্বন্ধে কোন নৈতিক দায়িত্ব আমার নেই।"

হঠাৎ সে জোর গলায় বলে উঠলো, "আমার মতের সঙ্গে আপনার যে মিল আছে, তা জানাবার জন্যে ঘাড় নাড়বার কোন দরকার নেই আপনার। আমি ভাল রকমই জানি ঐ কায়দা। প্রত্যেক পুরুষমানুষ, তার মধ্যে আপনিও আছেন, অবশ্য জানি না আপনি যদি কোন অসাধারণ সাধুপুরুষ হন, তাহলে অবশ্য আলাদা কথা, নতুবা আমি জানি সব পুরুষমানুষেরই ঐ মত। সব জায়গাতেই এই একই ব্যাপার। ক্ষমা করবেন আমাকে, কিন্তু এটা সত্যিই বড় ভয়ঙ্কর।"

—"কোন্‌টা ভয়ঙ্কর?" জিজ্ঞাসা করে উঠি।

—"স্ত্রীলোক এবং তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক

সম্বন্ধে যে গভীর আত্ম-প্রবঞ্চনা আমরা করে চলেছি। সত্যি, এ বিষয়ে কোন কথা বলতে গেলে, আমি আর শান্ত হয়ে কথা বলতে পারি না। এমন একটা ব্যাপার একদিন ঘটে গেল, যা থেকে আমার চোখের পর্দা খুলে গেল এবং তারপর থেকে আমি সমস্ত ব্যাপার এক আলাদা আলোতে দেখতে শিখি। যা কিছু ছিল, সব যেন উল্টে গেল · সম্পূর্ণ উল্টে গেল…"

কথা বন্ধ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। হাঁটুর ওপর কনুই ভর দিয়ে আবার বলতে সুরু করলো। অন্ধকারে তার মুখের চেহারা স্পষ্ট চোখে পড়ছে না। ট্রেনের অবিরাম ঘড়-ঘড় শব্দের ওপরে শুধু কানে এসে লাগছে তার গুরুগম্ভীর মিঠে আওয়াজ…

২

—"বিশ্বাস করুন, বহুদিন বহু মর্মবেদনা ভোগ করার পর, আমি বুঝতে পারলাম, এই অন্যায়ের মূল কোথায়। সেই যন্ত্রণা, সেই মর্মদাহ ভোগ না করলে হয়ত বুঝতে পারতাম না। যেদিন থেকে জানতে পারলাম, কি করা উচিত, সেদিন থেকে নিঃসন্দেহ ভাবে বুঝলাম যা করেছি, তা কতখানি বীভৎস অন্যায়।

"গোড়া থেকেই আপনাকে বলি, কখন কি ভাবে সুরু হলো এই ব্যাপার, যার পরিণাম গিয়ে দাঁড়ালো আমার জীবনের সেই ভয়াবহ ঘটনায়। তখন আমার বয়স ষোলো পুরো হয়নি, আমি সেই মারাত্মক পথে প্রথম পা বাড়ালাম। তখনও আমি স্কুলের ছাত্র, আমার বড় ভাই কলেজে পড়ছে। এর আগে, স্ত্রীলোক কি তা আমি জানতাম না, তবে তাই বলে, আমি যে একেবারে নিষ্পাপ শিশুটি ছিলাম, তা-ও নয়। আমাদের সমাজের সেই বয়সের অধিকাংশ হতভাগ্য ছেলের মতন সে-দাবী করবার অধিকার তখনই আমি হারিয়েছি। প্রায় দু'বছর আগে আমার সঙ্গীদের কৃপায় আমার মন কলুষিত হয়ে গিয়েছিল, এবং স্ত্রীলোকের কথা ভাবতে গেলেই আমার মন টন্-টন্ করে উঠতো। অবশ্য কোন বিশিষ্ট স্ত্রীলোকের চিন্তা তখনও জাগে নি, স্ত্রীলোকমাত্রেই আমার মনে একটা অস্বস্তি জাগাতো।

"ভাই, যখনই একলা থাকতাম, আমার মনে নানা-রকম কুৎসিত ভাবনা মূর্ত্তি ধরে উঠতো। আমাদের সমাজের শতকরা নিরানব্বুই জন ছেলে এই সম্পর্কে যেভাবে নিজেকে ক্ষয় করে, আমিও তাই করতে সুরু করে দিলাম। ভীষণ ভয় করতে লাগলো, মনে মনে রীতিমত যন্ত্রণা হতো, হাত জোড় করে কত প্রার্থনা করলাম, কিন্তু পতন আমার হলো। সুতরাং ইতিমধ্যেই আমি মনের দিক থেকে নষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম, অবশ্য আমি একাই নিজেকে ক্ষয় করে চলেছিলাম। অন্য কাউকে আমার সঙ্গে জড়িয়ে আমার অধোগতির সাথী করবার সুযোগ তখনও আসেনি।

"এ-হেন মানসিক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যখন চলেছি তখন আমার দাদার এক বন্ধু, ফুর্ত্তিবাজ ছোকরা, যাদের সাধারণতঃ বলা হয়, চমৎকার ছেলে অর্থাৎ নিষ্কর্ম্মা বদমায়েস, ইনি আমাদের মদ খেতে এবং জুয়ো খেলতে ইতিমধ্যেই দীক্ষা দিয়েছিলেন, একদিন রাত্রিবেলা সকলে মিলে মদ্যপান করার পর, আমাদের মন্ত্রণা দিলেন, চল্, আজ 'সেখানে' যাবো। এবং আমরা গেলাম। আমার দাদাও সে-রাত্রির আগে পর্য্যন্ত কলঙ্কহীনই ছিল, সে-রাত্রি তারও পতন হলো। ষোলো বছরের নাবালক আমি, কি করছি, তার ফলাফল কি, তা না জেনেই সে-রাত্রি সকলের সঙ্গে অন্ধকার গহ্বরে নেমে পড়লাম।

"আমার যাঁরা গুরুজন ছিলেন, তাঁরা কেউ একবারও আমাকে সতর্ক করে দেননি যে, আমি যা করছি তা অন্যায় এবং সব চেয়ে বড় কথা হলো, আজকের যুগের ছেলেদেরও সে-বিষয়ে স্পষ্ট কোন কথা বলা হয় না। তবে যদি বলেন, বাইবেলে দশম অনুজ্ঞাতে তা বলা হয়েছে, সেখানে আমার বক্তব্য হলো, স্কুলে ছেলেরা শুধু পরীক্ষায় পাশ করবার জন্যেই তা মুখস্থ করে এবং তাও এমন কিছু নয় যে না পড়লে পাশ করা যাবে না কিংবা ল্যাটিন ব্যাকরণের সূত্রের মতন অপরিহার্য্যও নয়। অন্ততঃ আমার বিষয়ে আমি বলতে পারি, আমার অভিভাবকরা কেউই আমাকে বলেননি যে আমি যা করছি তা অন্যায়। বরঞ্চ উল্টে, যাঁদের আমি শ্রদ্ধা করতাম, তাঁদের মুখ থেকে শুনেছি যে, আমি যা কিছু করছি, তা ঠিকই আছে। আমি জানতে পারলাম, যদি কোন রকমে একবার এইভাবে বাসনা চরিতার্থ করতে পারি, তা হলে আমার সমস্ত ছটফটানি, সমস্ত যন্ত্রণা বিদূরিত হয়ে যাবে। একথা আমি লোকমুখে শুনেছি এবং বইতেও পড়েছি। আমার অভিভাবকেরা কেউই বলতে আসেন নি যে, আমার সংবাদ ভুল। যে সব লোককে আমি চিনতাম, তারা তাদের কৃতকর্ম্মকে একটা বীরত্বের সামিল মনে করতো, সুতরাং চারদিক থেকে একথা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে, এ কাজের

স্য ভালই হবে। খারাপ কিছু হতে পারে, সে সম্বন্ধে আমার কোন আশঙ্কাই কি ছিল না? খারাপ যা কিছু হতে পারে, তা আগে থাকতেই জানা থাকে এবং লোকপালক পরম সদাশয় গভর্ণমেণ্ট সে-সম্বন্ধে ভেবে-চিন্তে ব্যবস্থাও করে রেখেছেন। এই জাতীয় সমস্যা তত্ত্বাবধান করবার জন্যে গভর্ণমেণ্ট থেকে মাইনে-করা ডাক্তার নিযুক্ত থাকে। খুবই উচিত ব্যবস্থা। স্বাস্থ্যের পক্ষে কি দরকার তা একমাত্র ডাক্তারেরাই বলতে পারে এবং এই সামাজিক চরিত্রের পেছনে তাদেরই অনুমোদন থাকে। আমি ব্যক্তিগত ভাবে জানি, এই জাতীয় ব্যাপারে ডাক্তারেরা যে ব্যবস্থা দেয়, গর্ভ-ধারিণীরা অকুণ্ঠভাবে তা পালন করে। বিজ্ঞানই এর জন্যে দায়ী।"

আমি বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করে উঠি, "কেন, বিজ্ঞান কিসে দায়ী?"

সে উত্তর দেয়, "বিজ্ঞান দায়ী নয়? ডাক্তারেরাই তো বিজ্ঞানের মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। স্বাস্থ্য ভাল রাখবার এই সব বিধানের প্রবর্তন করে তাঁরা আমাদের যুবকদের জাহান্নামে টেনে নিয়ে চলেছেন। তাঁদের না হলে যেন দুনিয়া চলবে না, এমন একটা ভঙ্গী করে তাঁরা রোগ নিরাময় করে চলেছেন।"

জিজ্ঞাসা করি, "রোগ নিরাময় করাতে কি অপরাধ হলো?"

—"কি অপরাধ হলো শুনবেন? রোগের চিকিৎসা করতে তাঁরা যে পরিশ্রমটা করেন, তার শত ভাগের এক ভাগ যদি তাঁরা প্রয়োগ করতেন, সমাজ থেকে এই সব অন্যায় আবদার টেনে দূর করে ফেলে দেবার জন্যে, তাহলে বহু দিন আগেই এই সব রোগ অদৃশ্য হয়ে যেতো। কিন্তু তা নয়। এই সমস্ত অন্যায়ের মূলোৎপাটন করবার জন্যে নয়, যারা অন্যায় করবে তারা যাতে এই অন্যায়ের প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়, তারই গ্যারাণ্টি দেবার জন্যে তাঁরা প্রাণপাত করে পরিশ্রম করছেন। তার ফলে, এই অন্যায় বেঁচে থাকবারই প্রেরণা পাচ্ছে। কিন্তু যে-কথা আমি বলতে চাইছি, এ তা নয়। আমি যে-কথা আপনাকে বিশেষ করে বোঝাতে চাইছি, সেটা হলো, আমার ভাগ্যে যা ঘটেছিল, দশ ভাগের ন' ভাগ লোকের ভাগ্যে ঠিক তাই-ই ঘটে এবং শুধু যে তা আমাদের শ্রেণীতেই, তা নয়, সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক স্তরে, এমন কি চাষাদের মধ্যেও আজ তা সংক্রমিত হয়েছে। আমি যে যৌবনের স্বভাবসুলভ প্রেমের দোহাই দিয়ে আত্ম-প্রবঞ্চনা করতে পারবো, তারও সম্ভাবনা ছিল না। বিশ্বাস করুন, আমার যে পতন হলো, তার মূলে প্রেম বা ভালবাসা কিছুই ছিল না। তার মূলে ছিল, যাঁদের মধ্যে আমি বাস করতাম, যাঁদের শ্রদ্ধেয় বলে জানতাম, তাঁদেরই প্রভাব। যে কারণে আমি নিজেকে অধঃপতিত মনে করি, তাঁরা সে কারণটিকে সম্পূর্ণ বৈধ এবং প্রয়োজনীয় মনে করতেন এবং কেউ কেউ তাকে একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার বলে শুধু যে ধর্তব্যের মধ্যেই আনতেন না, তা নয়, তাঁরা মনে করতেন, তরুণ যুবকের পক্ষে ওটা একান্ত নির্দোষ একটা খেলা। সুতরাং, এ-কথা তখন আমার মনেই আসেনি যে, সেই ঘটনা থেকে আমার অধঃপতনের কোন সম্ভাবনা থাকতে পারে। যেমন সহজ ভাবে আমি সিগারেট খেতে বা মদ্যপান করতে শিখি, তেমনি সহজ ভাবেই ধরে নিয়েছিলাম যে এটাও খানিকটা আনন্দের এবং খানিকটা স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় জিনিষ। কিন্তু সেদিন সেই প্রথম রাত্রিতে, জীবনের সেই প্রথম পাপাচরণে আমার মনে কোথা থেকে একটা রহস্যময় বেদনার অনুভূতি জাগে। আমার মনে আছে, যে-মুহূর্তে আমার কামনা নিঃশেষিত হয়ে গেল, আমি কেমন যেন অবর্ণনীয় এক বিষাদে অভিভূত হয়ে পড়লাম, মনে হলো, খানিকটা যেন ডাক ছেড়ে কাঁদি। সত্যি, সেদিন আমার সেই শৈশব-সুপবিত্রতার অপমৃত্যুতে যদি প্রাণ ভরে কাঁদতে পারতাম! সেদিন প্রাণে যে ময়লা দাগ কেটে গেল, জানি শতাব্দীর জলধারায় তা আর ধুয়ে শুভ্র করা যাবে না।

"যাঁরা পবিত্র, যাঁরা নিষ্পাপ, তাঁরা যে সহজ দৃষ্টিতে নারীকে গ্রহণ করতে পারেন, সেদিন হতে আমার নয়ন থেকে সে-দৃষ্টি চলে গেল। যারা আফিঙ খায়, যারা মাতাল, যারা দিবারাত্র তামাক টানে, তারা যেমন আর জীবনে কখনও স্বাভাবিক হতে পারে না, তেমনি যারা আমার মতন অধঃপতিত হয়, তারাও জীবনে আর সহজ হতে পারে না। তাদের মনে তখন ময়লা ছোপ পড়ে যায়। যে আফিঙখোর বা মাতাল, তার চোখ-মুখ ভঙ্গী বা ব্যবহার দেখলেই যেমন তা বোঝা যায়, তেমনি যারা অধঃপতিত তাদেরও মুখ-চোখ দেখলেই তাদের চেনা যায়। ক্রমশঃ তাদের হাব-ভাব বদলাতে বদলাতে একে-বারে স্বাভাবিক হয়ে যায়। হয়ত কেউ কেউ চেষ্টা করে মোটামুটি লক্ষণগুলো চেপে রেখে খানিকটা

আত্ম-সম্মান বজায় রাখতে পারে। অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, শেষ পর্য্যন্ত হয়ত নিজের মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব চলতে থাকে কিন্তু নারী-জাতির সঙ্গে যে স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকা উচিত, যে-সম্পর্ক আমরা দেখি সহোদর আর সহোদরার মধ্যে, সেই সহজ, সুন্দর সুমধুর সম্পর্ক আর সে কোন মতেই ফিরে পায় না।

"ক্রমশঃ আমি কামুক হয়ে উঠলাম এবং কামুকই রয়ে গেলাম। সেই কামুকতা নিয়ে এলো আমার সর্বশেষ সর্বনাশ···

"সেই রাত্রির ঘটনার পর আমি একটু একটু করে গভীরতর পাঁকে ডুবে যেতে লাগলাম। এখানে মনে রাখবেন, আমি যে সব অনাচারের কথা বলছি, সে শুধু আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব হয়েছিল সেই সম্পর্কেই! আমার সঙ্গীরা কিন্তু আমাকে কতকটা নিষ্পাপ শিশু মনে করতো এবং তার জন্যে তারা অনবরত আমাকে বিদ্রূপও করতো। সেই বিদ্রূপের মধ্যে রীতিমত ঘৃণা আর তাচ্ছিল্যও মেশানো থাকতো। কিন্তু আমার কাহিনীর পরিবর্ত্তে যদি শুনতেন এ যুগের ধনীর দুলাল যুবকদের কথা, প্যারিসবাসীদের কথা, না জানি আপনি কি ভাবতেন! অথচ এই জাতীয় ব্যভিচারীর দল, তার মধ্যে আমি নিজেকেও বাদ দিচ্ছি না, যাদের ভেতরটা হাজার রকম পাপের হাজার রকম দাগে বীভৎস হয়ে উঠেছে, দিব্যি সন্ধ্যাবেলা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নিখুঁত পোষাকে সর্বাঙ্গ ঢেকে, সুন্দর করে দাড়ি-গোঁপ কামিয়ে, অঙ্গে সুবাস মেখে, কেমন স্বচ্ছন্দে ভদ্র-সমাজে উৎসব-সভায়, সান্ধ্য-আসরে ঘুরে-ফিরে বেড়ায়, যেন পবিত্রতার জীবন্ত সব মূর্ত্তি! কি চমৎকার!

"একবার কল্পনা করে দেখুন, আজকাল সমাজে কি ব্যাপার ঘটছে এবং তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন, কি হওয়া উচিত ছিল। কি হওয়া উচিত জানেন? যদি আমার বাড়ীতে, এই জাতীয় কোন ভদ্রলোক সান্ধ্য-উৎসবে এসে হাজির হন এবং আমার ভগিনী বা কন্যার সঙ্গে যদি দেখি আলাপ করতে অগ্রসর হয়েছেন, তাহলে আমার উচিত, তাঁকে ভালভাবে জানি বলেই, তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে আড়ালে ডেকে নিয়ে তাঁর কানে কানে বলা, বন্ধু, আমি জানি কি ভাবে আপনি জীবন যাপন করেন, রাত্রিবেলায় কোথায় কাদের সঙ্গে আপনি বাস করেন তা আমার অজানা নেই···এ জায়গা আপনার উপযুক্ত বিচরণ-ক্ষেত্র নয়। এখানে নিষ্পাপ নিষ্কলুষ কুমারী মেয়েরা রয়েছেন, অতএব, দূর হোন্!···এই জিনিষটিই হওয়া উচিত। কিন্তু তার বদলে যা হয়, সেটাও শুনুন। এই জাতীয় কোন লোক যখন আমার বাড়ীতে এসে আমার ভগিনী বা কন্যার কোমর জড়িয়ে ধরে নৃত্য করেন, তখন যদি আমি জানি সে লোকটি ধনবান্ এবং প্রতিপত্তিশালী, তাহলে আমরা সে-দৃশ্য দেখে আনন্দে হেসে উঠি। কি নিদারুণ লজ্জার কথা! আর কতদিন আমাদের অপেক্ষা করে থাকতে হবে যেদিন এই ভয়াবহ সামাজিক প্রবঞ্চনা, এই জঘন্য মিথ্যার জাল ছিন্ন করে পাপমুক্ত হতে পারবে সমাজ?"

থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার গলায় উপর্য্যুপরি সেই বিচিত্র আওয়াজ শুনতে পেলাম। আর একবার চা তৈরী করলো। সত্যি কথা বলতে কি, এ রকম কড়া চা আমি ইতিপূর্ব্বে আর খাই নি, কাছে কোথাও জল পাবারও সম্ভাবনা ছিল না যে মিশিয়ে পাতলা করে নেবো। দু'পাত্র যা খেয়েছিলাম, তাতেই আমার শরীর যথেষ্ট উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, তাতে কোন সন্দেহই ছিল না। যত চা খেতে লাগলো, ততই যেন সে গরম হয়ে উঠতে লাগলো। তার কণ্ঠস্বর আরো যেন মোলায়েম আর তাজা হয়ে উঠলো। এক জায়গায় স্থির হয়ে বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারছিল না। এখান থেকে সেখানে উঠে আবার সেখান থেকে আমার পাশে এসে বসছিল। কখনও টুপীটা মাথা থেকে খুলে পাশে রাখে, আবার কখন তুলে নিয়ে মাথায় দেয়। গাড়ীর ভেতর অন্ধকার আরো যেন নিবিড় হয়ে উঠে। সেই নিবিড়তর অন্ধকারে মনে হয়, তার মুখের চেহারা যেন ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হয়ে চলেছিল।

সে আবার বলতে সুরু করে, "এই ভাবে ক্রমশঃ আমার বয়স ত্রিশ হয়ে এলো। বহুদিন থেকে মনে সাধ ছিল, বিবাহ করে সংসারী হবো এবং যতদূর সম্ভব পবিত্রভাবে সাংসারিক জীবন যাপন করবো। এক মুহূর্ত্তের জন্যেও সে-আশা মন থেকে নির্বাসিত করি নি। এই আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে, একটি বিবাহযোগ্যা তরুণী মেয়ে সযত্নে সন্ধান করে ফিরছিলাম। আমার স্ত্রীর সৌভাগ্য যে নারীর হবে, তাকে সন্দেহাতীত ভাবে নিষ্কলুষ হতে হবে, তাই একান্ত সতর্ক ভাবেই মেয়ে বাছতে সুরু করলাম। অনেক মেয়েরই সন্ধান পেলাম কিন্তু তারা কেউই আমার উপযুক্ত অমলিন বলে মনে হলো না, তাই তাদের অবজ্ঞাভরেই প্রত্যাখ্যান করি। অবশেষে একদিন আমার অনুসন্ধান জয়যুক্ত হলো··· এমন একজনের দেখা পেলাম, আমার বিবেচনায় সে সত্যিই আমার উপযুক্ত অমলিন বলে মনে হলো।

"পেন্জার এক জমিদারের দুই মেয়ে ছিল, তার

মধ্যে একটি সহসা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। এক সময় জমিদারের অবস্থা খুবই ভাল ছিল কিন্তু ইদানীং ভাগ্যবিপর্য্যয়ে খুবই বিপন্ন ও অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা সে আর আমি নদীতে বোটে করে বেড়াচ্ছিলাম। সন্ধ্যার ছায়া ঘন হয়ে এলো, চাঁদের অস্পষ্ট কোমল আলো নদীর জলে এসে পড়েছে, সেই আলোয় পথ দেখে বাড়ী ফিরছি, সে আমার পাশেই বসে আছে···হঠাৎ সেই সন্ধ্যার আলোয় কুঞ্চিত কেশদামের দিকে চেয়ে, তার আঁট-করে-পরা জামার ভেতর থেকে সুগঠিত দেহের যৌবনরেখা মনে হলো অপূর্ব, অনিন্দ্যসুন্দর! মুগ্ধ-আনন্দে সে-কথা তাকে প্রকাশ করে জানাতে গিয়ে হঠাৎ মনে হলো, যাকে খুঁজছি, এই সেই নারী। আমি বুঝতে পারলাম, সে-রাত্রি আমি যা কিছু অনুভব করেছি, তার প্রত্যেকটি স্পন্দন পর্য্যন্ত সে যেন অন্তরে উপলব্ধি করতে পেরেছিল। এবং সে-রাত্রি আমার মনে যে-চিন্তা বা যে অনুভূতির স্পন্দন জেগেছিল, আমার ধারণায় তা দিব্য মহান্ বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু আসলে যে-বস্তু আমার কল্পনার মূলে ছিল, সে হলো তার কুঞ্চিত কেশদাম, তার সেই অঙ্গলীন আবরণ, আর তার ঘনতর সান্নিধ্যের লোভ।

"সৌন্দর্য্য আর শুচিতা যে এক, একথা যারা কল্পনা করে তারা যে কতখানি বিভ্রান্ত, তা কে বলবে? সুন্দরী স্ত্রীলোক, যতক্ষণ মুখ বন্ধ করে থাকে, ততক্ষণই ভাল। যখন তারা কথা বলে, অপদার্থ কথাই বলে, কিন্তু আমরা তা শুনেও শুনতে পাই না···আমাদের কানে তখন মধু-বর্ষণ করতে থাকে। যত অপদার্থ কথাই বলুক, যত জঘন্য কাজই করুক, তবু কি একটা আনন্দ পাবার মোহ সে-সম্বন্ধে আমাদের অচেতন করে রাখে। যদি কোন বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক এই জাতীয় কোন কথা বা কাজ সযত্নে এড়িয়ে চলে, আর সেই সঙ্গে সে যদি সুন্দরী হয়, তাহলে আমরা স্থির সিদ্ধান্ত করে নিই যে, উক্ত মহিলা নীতি ও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আমিও সেই বিশ্বাসে বিমুগ্ধ-বিস্ময়ে সে-রাত্রি বাড়ী ফিরলাম, স্থির বিশ্বাস হলো যে, সে-নারী শুধু সুন্দরীই নয়, নৈতিক চরিত্রের দিক থেকে আদর্শস্থানীয়া, সুতরাং আমার পত্নী হবার যোগ্যা। পরের দিনই আমি বিবাহের প্রস্তাব করলাম।

"ভাবের কি বিচিত্র গোঁজামিল! শুধু আমাদের সমাজেই নয়, জনসাধারণের মধ্যে যে-কোন স্তরেই, হাজার-করা যত লোক বিয়ে করে, তার মধ্যে এমন একজনও থাকে না যে, ডন জুয়ানের মত বিয়ের রাত্রির আগে বহু-বিবাহিত-রাত্রির স্বাদ না ভোগ করেছে। একথা অবশ্যি সত্য যে, এখন নাকি এমন অনেক যুবকের সন্ধান পাওয়া যায়, সে-কথা আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেও জানি, যারা সতীত্বকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা ও স্বীকার করে এবং মনে করে না যে সেটা একটা উপহাসের বস্তু। ভগবান তাদের ভাল করুন! কিন্তু আমাদের সময় দশ হাজার যুবকের মধ্যে এই রকম একটিকেও পাওয়া যেতো না। প্রত্যেকেই বেশ ভাল রকম করেই জানে, এই হলো আমাদের সমাজের স্বাভাবিক অবস্থা কিন্তু তবুও সকলে একথা মন থেকে স্বীকার করবে না।

"প্রত্যেক নভেল খুলে দেখুন, দেখবেন নায়কের মনস্তত্ত্বের তন্ন-তন্ন বিশ্লেষণ রয়েছে সেখানে, যে সব বন-উপবন বা নদ-নদীর ধার দিয়ে এই সব নায়ক বিচরণ করে, তাদেরও নিখুঁত বর্ণনা দেখতে পাবেন। কিন্তু যখন সেই নায়কের প্রেম বর্ণনা করা হয়, তখন একবারও কেউ ভুলে লেখে না যে, সেই নায়কের সে সম্পর্কে কোন পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছিল কি না! অথবা যদি এই জাতীয় কোন নভেল সত্যিই থাকে, তাহলে প্রাণপণে চেষ্টা করা হয়, যাতে সে-নভেল তরুণীদের হাতে না যায়। প্রথমত একটা অজুহাত তাদের সামনে উপস্থিত করা হয় যে, যে-অনাচারের আগুনে শহরবাসী বা গ্রাম্য লোকদের অর্দ্ধেক জীবন জলে-পুড়ে আজ ক্ষার হয়ে যাচ্ছে, সে-জিনিসটাই না কি মিথ্যে, অর্থাৎ বাস্তব জগতে তার না কি অস্তিত্ব নেই। কাল-ক্রমে এই ছলনায় আমরা এতদূর অভ্যস্ত হয়ে উঠি যে, আমরা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করতে আরম্ভ করি যে আমরা সকলেই সাধু পুরুষ এবং আমরা যে-জগতে বাস করছি, তার মাটীতে এসব অনাচার জন্মায় না। একান্ত দুঃখের বিষয়, সকলের চেয়ে বেশী করে এবং একান্ত সত্য বলে এই জিনিসটা মেনে নেয় বেচারা মেয়েরা। আমার হতভাগ্য সহধর্ম্মিণীরও সেই বিশ্বাস ছিল। বিয়ের পর, বিয়ের আগে পর্য্যন্ত লেখা আমার ডায়রী তাঁকে দেখালাম। তা থেকে আমার পূর্ব-জীবনের আভাস খানিকটা তিনি পাবেন। বস্তুত তাঁর সঙ্গে দেখা হবার আগে আর একটি মেয়ের সঙ্গে আমার যে-ঘটনা ঘটে ডায়রীর শেষের দিকে তার উল্লেখ ছিল। বাইরে থেকে অপরের মুখে শোনার চেয়ে আমি ভেবেছিলাম নিজে থেকেই জানানো ভাল। আমার স্পষ্ট মনে আছে, ডায়রী পড়ে সেই সব ব্যাপার যে আমি সত্যি করেছি, তা জেনে, তিনি ভয়ে, বিস্ময়ে এবং হতাশায় অভিভূত হয়ে পড়েন। মনে হলো যেন

আমার সঙ্গে সেই মুহূর্তেই সকল সম্পর্ক তিনি ছিন্ন করতে চান।"

জিজ্ঞাসা করে উঠি, "তা থেকে তিনি বিরত থাকলেন কেন?"

আবার গলায় সেই অদ্ভুত আওয়াজ করে কিছুক্ষণের জন্যে ভদ্রলোক চুপ করে রইলো। দু'এক চুমুক চা খেয়ে নিল। তারপর হঠাৎ চীৎকার করে বলে উঠলো, "তা যদি হতো তো ভালই ছিল···আমার উপযুক্ত শাস্তি হতো···"

৩

"কিন্তু আসল কথা তা নয়। আমার বক্তব্য হলো, এই জাতীয় ব্যাপারে মেয়েরাই সত্য সত্য প্রতারিত হয়। তাঁদের স্বামীদের কাছ থেকেই এ যুগের মেয়েদের মায়েরা প্রথম নষ্ট হয় এবং সমস্ত ব্যাপারটা জেনে যায়, কিন্তু জানা সত্ত্বেও তাঁরা ন্যাকা সেজে থাকেন, যেন পুরুষ মানুষেরা অন্যায় কি তা জানে না। অথচ তাঁরা নিজেরাই এমন সব ব্যবহার করেন, যার সঙ্গে তাঁদের সেই ধারণার কোন সামঞ্জস্য থাকে না। কোথায় কখন কি টোপ ফেললে তাঁদের নিজেদের জন্যে এবং তাঁদের কন্যাদের জন্যে মানুষ ধরতে পাবা যায়, তা তাঁরা ভাল রকমই জানেন।

"মেয়েরা খুব ভাল রকম ভাবেই জানে,' যাকে সাধারণতঃ আমরা বলি, কাব্যিক প্রেম, চির-জীবনের প্রেম, তা কোন নৈতিক গুণের উপর নির্ভর করে না, সে-প্রেম জন্মায় প্রয়োজন মত ঘন-ঘন দেখাশোনার ওপর, যে ষ্টাইলে চুল প্রসাধন করা হয়, যে ছাঁদে পোষাকের কাট তৈরী হয়, তারই ওপর। প্রমাণ-স্বরূপ, যে কোন অভিজ্ঞ "কোকেট" স্ত্রীলোকের সামনে এই সমস্যাটি উপস্থিত করে, তার জবাব শুনতে চান,—দুটি কুৎসিত পরিস্থিতির মধ্যে যদি তাকে পড়তে হয়, প্রথম পরিস্থিতি হলো, যে লোকটিকে সে আকর্ষণ করতে চাইছে, তার সামনে একজন প্রমাণিত করে দিল যে, সে হৃদয়হীনা, প্রবঞ্চনাকারিণী, এমন কি চরিত্রহীনা। দ্বিতীয় পরিস্থিতি হলো, যে লোকটিকে সে আকর্ষণ করতে চাইছে তার সামনে একটা সেকেলে-ধরনের অতি কুৎসিত পোষাকে তাকে আবির্ভূত হতে হবে। জিজ্ঞাসা করুন তাকে, এই দুটি পরিস্থিতির মধ্যে সে কোন্‌টিকে বরণ করতে বাধ্য হতে পারে? বিনা দ্বিধায় সে প্রথম পরিস্থিতিকেই গ্রহণ করবে। তার কারণ, সে নারী ভাল করেই জানে, পুরুষরা মুখে যে-সব বড় বড় ভাবের কথা উচ্চারণ করে, মনে তা তারা আদৌ বিশ্বাস করে না, এবং নারী-সম্পর্কে তারা যা চায়, তা শুধু স্রেফ সেই নারীর দেহটা, তাই তারা মেয়েদের মধ্যে যে কোন উচ্চভাবের অভাব দেখুক, সে সম্বন্ধে তারা সর্ব্বদাই ক্ষমা করতে প্রস্তুত কিন্তু তাদের দেহকে যাতে অশোভন দেখায়, কুৎসিত দেখায়, তা তারা সহ্য করতে চায় না। প্রত্যেক কোকেট্ নারী সচেতন ভাবে এই কথাটা জানে, প্রত্যেক নিরীহ তরুণী অচেতন ভাবে তা উপলব্ধি করে। তাই স্ত্রীলোকের পোষাকে আজকাল দেখতে পান, জামার পেছন দিকটা এমন ভাবে কাটা যে পিঠের অংশ-বিশেষ নগ্ন দেখা যায়, জামার সামনের অংশ এমনভাবে তৈরী যে, কাঁধ, হাত, এমন কি বক্ষসীমান্ত পর্য্যন্ত মুক্ত দেখা যায়। স্ত্রীলোকেরা, বিশেষ করে তাঁদের মধ্যে যাঁরা পুরুষদের পাঠশালায় পাস করে বেরিয়েছেন, তাঁরা ভাল রকম ভাবেই জানেন, পুরুষের মুখে ভাবের উচ্চ আলোচনা একান্ত শূন্যগর্ভ আওয়াজ, পুরুষের কামনার একমাত্র লক্ষ্য হল নারী-দেহ এবং যা কিছু সেই দেহকে মোহনীয় করে তাদের সামনে তুলে ধরতে পারে। এবং এই দিব্য জ্ঞানের সঙ্গে নিখুঁত ভাবে সামঞ্জস্য রেখে তারা যা-কিছু করবার তা করে।

"আজ যে সব চিরাচরিত রীতি-নীতি আর অভ্যাস আমাদের স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছে, যদি সেগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, সত্যিকারের ভেবে দেখি, আমাদের সমাজের যাঁরা শীর্ষ-স্থানীয়, তাঁরা কি ভাবে জীবন যাপন করে চলেছেন, তাহলে দেখবো যে, তা পুরোমাত্রায় জঘন্য। আপনি সে-কথা বিশ্বাস করেন না? বেশ, আমি আপনাকে প্রমাণ করে দিচ্ছি। আপনার ধারণা, আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকেরা যে সব সুবিধা-সুযোগের অন্বেষণ করেন, তার সঙ্গে বারবিলাসিনীদের রীতি-নীতির যথেষ্ট প্রভেদ আছে কিন্তু আমার কাছ থেকে আপনি শুনুন, আপনার সে-ধারণা ভুল···এবং আমি যে কেন এত বড় একটা কথা বলছি, তা আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

জীবনের লক্ষ্য যাদের স্বতন্ত্র, যারা এই মানবীয় অস্তিত্বের একটা স্বতন্ত্র মূল্য ধার্য্য করতে শিখেছে, তাদের সমস্ত কাজ-কর্ম্ম, তাদের বাইরের সমস্ত সাজ-সজ্জা আয়োজনের মধ্যে সেই অনুযায়ী একটা সঙ্গতি নিশ্চয়ই দেখা যাবে। সেই সূত্র অনুযায়ী আমাদের সমাজের উচ্চ-স্তরের যাঁরা স্ত্রীলোক, তাঁদের সঙ্গে হতভাগ্য পতিত নারীকুলের তুলনা করে দেখুন। কি দেখতে পাচ্ছেন?

সেই প্রসাধন, সেই অঙ্গরাগ, সেই ল্যাভেণ্ডার আর গোলাপে সুবাসিত দেহ, সেই অর্দ্ধ-নগ্ন বক্ষ, উন্মুক্ত বাহু আর স্কন্ধ, সেই পেছনদিককার পিঠ-খোলা জামার আমন্ত্রণ, সেই হীরে-জহরতের লোভ, সেই চাকচিক্যময় অলঙ্কারের মোহ, সেই নিভৃত উল্লাস, সেই সঙ্গীত, নৃত্য, আলো···বারবনিতারা যেমন এই সব জিনিসের সাহায্যে পুরুষকে আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে, তাঁরাও ঠিক তাই-ই করেন। কোন প্রভেদ নেই উদ্দেশ্য আর প্রয়োগ-কলায়।"

৪

"অতঃপর সেই পিঠ-কাটা জামা, সেই কুঞ্চিত অলকদাম, সেই অর্দ্ধ-নগ্ন দেহ-রেখার জালে আমিও জড়িয়ে পড়লাম। শহরে যেমন আগুনের আঁচে অসময়ে ফল পাকায়, আমিও তেমনি যে পরিবেশের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছিলাম, তাতে বয়স হওয়ার আগেই তরুণ প্রেমিকরূপে পরিপক্ক হয়ে উঠবার সুযোগ পেয়েছিলাম। সুতরাং আমাকে জালে ফেলা খুব সহজ ব্যাপারই ছিল। বরাতগুণে দুবেলা প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে-সব খাদ্য আমরা গ্রহণ করি, এবং সে-খাদ্য রীতিমত দেহের উত্তাপ-বর্দ্ধক, তার সঙ্গে যোগ করুন আমাদের ষোল-আনা দৈহিক অকর্ম্মণ্যতা। তার যোগফল কি হতে পারে, একবার ভেবে দেখুন!

"আপনি হয়ত শুনে বিস্মিত হচ্ছেন বা হচ্ছেন না, তাতে কিছু যায়-আসে না কিন্তু কথাটা সত্যিই ভেবে দেখবার মতন। আমিও যে তখন বুঝতে পেরেছিলাম, তা নয়। ইদানীং মাত্র আমি তা উপলব্ধি করতে পেরেছি। এবং আমার চারদিকে যখন চেয়ে দেখি, সবাই এই সহজ সত্যটি সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন, তখন সত্যিই গভীর বেদনায় অন্তর মুহ্যমান হয়ে পড়ে।

"গত বসন্তকালে আমাদের অঞ্চলে এক রেলের বাঁধের ওপর এক দল চাষী কাজ করছিল। সাধারণ একজন বলিষ্ঠ চাষী, যখন তার ক্ষেতে অল্প-স্বল্প পরিশ্রম করে, তখন তার খাদ্য হিসাবে সে গ্রহণ করে রুটী আর পেঁয়াজ এবং তাতেই সে বলিষ্ঠ, কর্ম্মঠ এবং সুস্থ থাকে। যখন রেলে কাজ করতে আসে তখন সে কোম্পানীর কাছ থেকে খাদ্য হিসাবে পায় খানিকটা পোরিজ আর দিনে আধ-সেরটাক মাংস। এই যে আধ-সের মাংস সে খায়, তার দরুণ দিনে ষোলো ঘণ্টা সে খাটে, তার মাংস-পেশী যতদূর বইতে পারে, ততদূর পর্য্যন্ত বোঝার ভার তাকে বইতে হয়। আর আমরা, বাড়ীতে বসে, শীকারের পাখী, মাছ, মাংস, পর্য্যাপ্ত ভাবে তার সঙ্গে আরো নানান রকমের শরীর-গরম-করা খাদ্য নিয়মিত গ্রহণ করে থাকি, এবং তার সঙ্গে থাকে মদ। এখন আমার জিজ্ঞাস্য হলো, এত সব খাদ্য হয় কি? দেহের কোন স্বাভাবিক কর্ম দরুণ, এই সব খাদ্য দেহের মধ্যে অতিরিক্ত উত্তাপের সৃষ্টি করে, অস্বাভাবিক উত্তেজনা জাগায়; সেই উত্তাপ আর উত্তেজনা আমাদের অপ্রাকৃত অলস জীবনের মধ্যে দিয়ে তার মুক্তিপথ অন্বেষণ করে এবং তারই ফলে আমরা প্রেমে পড়তে থাকি।

"সুতরাং আমিও প্রেমে পড়লাম, যেমন আর পাঁচজন পড়ে এবং প্রেমে পড়লে যে-সব অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, আমাকেও তার মধ্যে দিয়ে যেতে হলো। গভীর উচ্ছ্বাস, ভালবাসা, দীর্ঘশ্বাস, কবিতা, সবই লক্ষণ-অনুযায়ী বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু আসলে প্রেমের সংঘটন হলো, একদিকে মেয়ের মায়ের কলা-কৌশল আর একদিকে দরজীর জামা তৈরী করবার কায়দা; একদিকে টেবিল-ভর্ত্তি ডিনার, আর একদিকে জীবন-ভরা আলস্য। যদি সেদিন মা আমার সঙ্গে মেয়েকে বিনা-দ্বিধায় বোটে সান্ধ্য-ভ্রমণ করতে না ছেড়ে দিতেন, যদি দরজীরা রাত-জেগে সরু কোমরের নীচে এবং ওপরে দেহ-রেখাগুলো স্পষ্ট ফুটিয়ে তোলার জন্যেই পোষাক তৈরী না করতো; যদি আমার স্ত্রী সাধারণ গাউনে সহজভাবে বাড়ীতে থাকতেই ভালবাসতেন; আর আমার দিক্ থেকে যদি আমি সহজ স্বাভাবিক কর্ম্মময় জীবন যাপন করবার শিক্ষা পেতাম, তাহলে আমার প্রেমে পড়বারও কোন প্রয়োজন হতো না এবং তার ফলে আনুষঙ্গিক যে সব ঘটনা ঘটলো, তাও ঘটবার কোন অবকাশই থাকতো না।

"এখন আসল ব্যাপারে আসা যাক্। সে-সময় আমার যা মনের অবস্থা ছিল, তার সঙ্গে সেই বোটে সান্ধ্য বিহার এবং চোখের সামনে সেই কাম-উদ্রেককারী সজ্জা, সমস্ত মিলে ব্যাপারটাকে বেশ পাকিয়ে তুললো। এর পূর্ব্বে ঠিক এই রকম যোগাযোগ হয়ত আরো কুড়ি বার সংঘটিত হয়েছিল, কিন্তু তখন আমার মনে কোন রেখাপাত করতে পারেনি। এবার কিন্তু যোগাযোগটা সার্থক হয়ে উঠলো এবং আমি রীতিমত একটা ফাঁদের মধ্যে পড়ে গেলাম।

"আমি যদি বলি, আজকাল যেভাবে বিবাহের আয়োজন করা হয়, সেটা ফাঁদ পাতারই সামিল, মনে করবেন না যে আমি রহস্য করছি। আজকাল যেভাবে বিবাহের আয়োজন হয়, তার মধ্যে সহজ স্বাভাবিকতা কোথায়? মেয়ে বড় হলো, তার বিয়ে দিতে হবে।

যদি সে-মেয়ে একেবারে হত-কুৎসিত না হয়, তাহলে এর মধ্যে বিশেষ সমস্যা আর কি আছে? অসংখ্য পুরুষও রয়েছে, যারা বিয়ে করতে ইচ্ছুক। সেকালে তাই এ নিয়ে বিশেষ কোন হাঙ্গামা হতো না। মেয়ে বয়স্থা হলে, বাপ-মা পাত্রের অনুসন্ধান করে ব্যবস্থা করতেন। এখনও পর্য্যন্ত সেই ভাবেই মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে, চীনেদের মধ্যে, ভারতবাসীদের মধ্যে, মুসলমানদের মধ্যে, নিম্নশ্রেণীর রাশিয়ানদের মধ্যে, অর্থাৎ পৃথিবীর জনসংখ্যার একশো ভাগের মধ্যে নিরানব্বুই ভাগের লোকদের মধ্যে এই ভাবেই মেয়েদের বিবাহ হয়ে চলেছে। এই একশো ভাগের এক ভাগ লোকের কিংবা তার চেয়েও কম, এক শ্রেণীর অংঃপতিত লোকদের মগজে হঠাৎ একটা ধারণা গজিযে উঠলো যে এই ভাবে এই সমস্যার সমাধান ঠিক হচ্ছে না, একটা নতুন-কিছু ব্যবস্থা বার করতে হবে। এবং তাঁরা যে নতুন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করলেন, তার বিশেষত্ব কি হলো? মেয়েরা সেজে-গুজে বসে থাকে, বিবাহার্থী যুবকেরা বাজারে সওদা কিনতে আসার মতন তাদের কাছে আসা-যাওয়া সুরু করে। তাদের মধ্যে একজনকে তাকে বেছে নিতে হবে। মেয়েরা ভয়ে-ভাবনায় চুপটি করে বসে থাকে, ইচ্ছে গেলেও মুখ ফুটে বলতে পারে না, ওগো, আমাকে নিয়ে যাও; ওকে নয়, দোহাই তোমার, আমাকে নিয়ে যাও, দেখ না, আমার কাঁধ কি রকম নরম, গোল···আমার কোমর কি রকম সরু! ইতিমধ্যে আমরা, অর্থাৎ পুরুষেরা নিয়মিত ঘোরাফেরা করি, তাদের বাছাই করে দেখি এবং প্রত্যেকে মনে মনে আত্মপ্রসাদ অনুভব করি এই ভেবে যে, আর যে-কেউই ফাঁদে পড়ুক আমি ফাঁদে পড়ছি না বাবা! এই ভাবে নিশ্চিন্ত মনে ঘোরাফেরা করি, সব বন্দোবস্ত মনের মতন হওয়ার দরুণ খুশীই হই, তার মধ্যে হঠাৎ কখন একজন না একজন দু'কদম এগিয়ে যায় এবং ফাঁদের মধ্যে পড়ে যায়!"

জিজ্ঞাসা করি, "আপনি কি চান? আপনি কি চান, মেয়েরাই এগিয়ে এসে ছেলেদের কাছে প্রস্তাব করবে?"

তিনি উত্তর দেন, "সত্যি কথা বলতে কি, আমি কি চাই, তা আমি জানি না···শুধু এই কথাটাই মনে হয়, যদি স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সমানাধিকারই বজায় রাখতে হয়, তা হলে সে অধিকারটা যেন উভয়ত সত্যিই সমান হয়!

"যদি পেশাদার ঘটকদের দিয়ে বিবাহের আয়োজন আজ মনে হয় অপমানজনক, তাহলে বলবো, তার পরিবর্ত্তে যে-ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করেছি, তা তার চেয়ে হাজার গুণ অপমানজনক। পুরানো ব্যবস্থায় অধিকারই বলুন বা ভাগ্যই বলুন, উভয় পক্ষেই সমান ছিল, কিন্তু আধুনিক ব্যবস্থায় মেয়ের অবস্থা দাঁড়িয়েছে, বাজারে বিক্রীর ক্রীতদাসীর মতন, কিংবা শুধুই একটা লুঠের জিনিস।

"কোন মেয়ের মাকে বা সেই মেয়েকেই তার মুখের সামনে সোজা সত্যি কথাটা বলুন দেখি, তাদের এই সমস্ত আয়োজন, তার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বামী নামক একটি জীবকে কোন রকমে ফাঁদে ধরা! ব্যস্! তাহলেই গিয়েছেন আর কি! এত বড় অপমান তাঁদের কি সাহসে আপনি করতে পাবেন? অথচ তাঁরা সকলেই তাই করে চলেছেন এবং তাছাড়া তাঁদের করবারও আর কিছুই নেই। সত্যি যখন দেখি, একান্ত অল্প বয়সের নিরীহ সব ছোট-ছোট মেয়েরা এই ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, মনে ভয়াবহ আতঙ্ক জেগে ওঠে। একেই তো ব্যাপারটা সত্যই অত্যন্ত শোচনীয়, তবুও যদি সেটা প্রকাশ্য ভাবেই জেনে-শুনে সোজাসুজি করা হতো, তাহলে এত কুৎসিত লাগতো না। আগা-গোড়া ব্যাপারটা একটা জঘন্য প্রবঞ্চনা!

"কোন মেয়ের মা হয়ত গদগদকণ্ঠে বলে উঠলেন, ও হো! দি অরিজিন্ অফ্ স্পিসিস্"।*

—আমার লিলি, উঃ, ছবি আঁকতে কি যে ভালবাসে!

—কি, এক্জিবিশনে একবার তোমরা দুজনে ঘুরে বেড়িয়ে আসবে নাকি? সত্যি, কত কি যে শেখা যায় সেখানে। ট্রয়কাতে চড়া, কি মজা! তারপর থিয়েটার, কনসার্ট, সত্যি, চমৎকার!

—আমার লিলি, গানের জন্যে একেবারে পাগল!

—ওমা! সে কি কথা! এ হতে পারে না, নিশ্চয়ই তোমারও সেই মত!

—বোটে করে সন্ধ্যাবেলায় বেড়ানো! ও হো··· সে তো অপূর্ব্ব, সত্যি অপূর্ব্ব!

"এই সব উচ্ছ্বাসের পেছনে যে মনোভাবটি উহ্য

---

* ডারউইনের লেখা জগৎ-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ, যে গ্রন্থ থেকে সুরু হলো নতুন বৈজ্ঞানিক চিন্তার ধারা, যে জগৎ-সৃষ্টির ব্যাপারে ভগবান্ বলে কিছু নেই, এই জড় জগৎ ক্রম-বিবর্ত্তনের ধারা অনুযায়ী স্বয়ং সৃষ্ট হয়েছে। সে-যুগের শিক্ষিত লোকদের স্থানে-অস্থানে এই বইখানির নাম উচ্চারণ করা একটা ফ্যাসান ছিল, যেন তা দ্বারা তাঁরা বোঝাতে চাইতেন যে তাঁরা প্রগতিশীল এবং উচ্চ-শিক্ষিত।

থাকে, সর্বক্ষেত্রেই সেটি এক। ভাষায় রূপ দিলে সেটা এই দাঁড়ায়,

—ওগো, আমাকে নাও, দয়া করে আমাকে নাও!

—না, কিছু শুনবো না, আমাকে নিতেই হবে!

—আমার লিলিকে তুমি নাও!

জঘন্য, যাচ্ছেতাই মিথ্যাচার!"

ইতিমধ্যে পাত্রের চা ফুরিয়ে যায়। সাজ সরঞ্জাম একে একে আবার তুলে ফেলতে সুরু করেন।

৫

চা আর চিনি একটা ব্যাগের ভেতর পুরে রেখে আবার বলতে আরম্ভ করেন: "এখন কথা হলো, এই ভাবে স্ত্রীলোককে উঁচুতে তুলে দিয়ে যে-সমস্যা দাঁড়িয়েছে, তাতে করে আজ সমগ্র জগৎ ব্যাতব্যস্ত হয়ে পড়েছে।"

—"স্ত্রীলোককে উঁচুতে তুলে দিয়ে, মানে? যা-কিছু অধিকার বা সুযোগ সে তো সব পুরুষদেরই দখলে!" জিজ্ঞাসা করে উঠি।

তাড়াতাড়ি ভদ্রলোক জবাব দিয়ে ওঠেন: "হাঁ, হাঁ, সেই কথাই আমি আপনাকে বলছি, শুনুন! একটা বিচিত্র ব্যাপার গড়ে উঠছে, একদিকে স্ত্রীলোকদের যতদূর সম্ভব নীচুতে আটকে রেখেছি, তেমনি আর একদিকে তারা সকলের ওপর মাথা তুলে রয়েছে। এই দিক দিয়ে দেখলে, স্ত্রীলোকদের অবস্থা ঠিক ইহুদীদের মতন। ইহুদীরা যেমন সামাজিক প্রতিপত্তি এবং অন্য নানান দিক থেকে ক্ষমতা পেয়ে নিজেদের সামাজিক নির্য্যাতনের খানিকটা পুষিয়ে নেয়, স্ত্রীলোকরাও ঠিক তাই করে। ইহুদীরা যেন বলতে চায়, ও! আমাদের বেণে বলে তোমরা তুচ্ছ করো! বেশ, বেণে হয়েই তোমাদের ওপর আমরা আধিপত্য করবো! তেমনি স্ত্রীলোকেরাও ভাবে, ও! তোমাদের হুকুমে আমাদের শুধু তোমাদের খেয়াল-খুশীর যন্ত্র হয়ে থাকতে হবে! বেশ, সেই ভাবেই তোমাদের ওপর আমরা আধিপত্য করবো!

"স্ত্রীলোকদের যে ভোট দেবার কিংবা আদালতে কাজ করবার অধিকার নেই অথবা এটা-সেটাতে যোগদান করবার ক্ষমতা নেই, তাতে তার আসল অধিকারের অস্বীকৃতির কথা ওঠে না; আসল ব্যাপার হলো, যৌন-সম্পর্কের ওপর যে সব সামাজিক কাজ বা দায়িত্ব নির্ভর করে, সেখানে সে পুরুষের অধীন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, স্বামি-নির্বাচনে তাকে পুরুষের জন্যেই অপেক্ষা করে থাকতে হবে।

"আপনি বলবেন যে এই সব অধিকার স্ত্রীলোকের ওপর দেওয়া একটা বীভৎস ব্যাপার হবে। বেশ, তাহলে পুরুষদের সে-সব অধিকার কেড়ে নেওয়া হোক্। আজকাল সেগুলো পুরুষদেরই একচেটে অধিকার বটে, কিন্তু এই ক্ষতি পুষিয়ে নেবার জন্যে স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ইন্দ্রিয়-বৃত্তি নিয়ে খেলা করে এবং এই ইন্দ্রিয়-ভোগের ভেতর দিয়ে এমন ভাবে তাদের দাবিয়ে রাখে যে, নির্বাচনের অধিকারটা শুধু একটা মৌখিক প্রথায় পরিণত হয়। প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে তাই জিনিসটা যা দাঁড়ায়, তাতে স্ত্রীলোকই হলো আসল নিবাচক এবং যখন একবার এই বিজয়-রীতি তার আয়ত্ত হয়ে যায়, তখন তা নিয়ে সে যথেচ্ছাচার করে এবং পুরুষের ওপর একটা ভয়ঙ্কর অধিকার সে তখন বিস্তার করে।"

জিজ্ঞাসা করি: "এই যে স্ত্রীলোকদের বিজয়-রীতির কথা বললেন, এই আশ্চর্য্য ক্ষমতার প্রকাশ আপনি কিসে দেখলেন?"

ভদ্রলোক জবাব দেন: "সব জিনিষে, সর্বত্র। উদাহরণস্বরূপ শহরের দোকানগুলোর পাশ দিয়ে হেঁটে যান, দেখতে পাবেন। জানলায় যে-সব জিনিস সাজিয়ে রাখা হয়, তার পেছনে কত যে টাকা খরচ হয়েছে, তা হিসেব করেও বলা কঠিন এবং সেগুলো তৈরী করতে পুরুষদের কি পরিশ্রমই না করতে হয়েছে। দোকানের ভেতরে ঢুকে সেই সব জিনিস পর্য্যবেক্ষণ করে দেখুন, দেখবেন, তার দশ ভাগের এক ভাগও পুরুষদের জন্য নয়। জীবনের বিলাস-উপকরণের যে বিরাট ব্যবসা জগৎ-জুড়ে চলেছে, তার অস্তিত্ব এবং তার প্রসার একমাত্র নির্ভর করছে স্ত্রীলোকদের প্রয়োজনীয়তার ওপর। কারখানাগুলোর কথা ভেবে দেখুন। তাদের অধিকাংশ শুধু তৈরী করছে অপদার্থ সব অঙ্গ-আভরণ, না হয় সাজ-সজ্জা, আসবাব-পত্র না না হয় খেলনা···স্ত্রীলোকদের জন্যে। নারীর মুহূর্ত্তের খেয়ালের খোরাক জোগাবার জন্যে লক্ষ লক্ষ লোক, বংশপরম্পরায় ক্রীতদাস হয়ে, কারখানার কারাগারে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করে চলেছে। সম্রাজ্ঞীর মত নারী, মানবতার দশ ভাগের ন'ভাগকে কারাগার আর উদয়াস্ত পরিশ্রমে অভিশপ্ত করে রেখে দিয়েছে।

"নারীর অধিকার হরণ করা এবং তাদের অধঃপাতে নিয়ে যাবার জন্যে এই ভাবে নারী পুরুষদের ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে চলেছে। তাদের সমস্ত কলা-কৌশলের একমাত্র লক্ষ্য হলো, আমাদের মধ্যে

যে দুর্নীতি-প্রবণতা লুকিয়ে থাকে, তাকে জাগিয়ে তোলা এবং সেই ভাবে জাগিয়ে তুলে, তাদের একমাত্র লক্ষ্য হলো যে ফাঁদ বিস্তার করে তারা রাখে তাতে আমাদের ফেলা। হাঁ, আমি যে অস্বাভাবিক সামাজিক অবস্থার কথা বলেছি, তার মূলে রয়েছে এই ব্যাপারই। স্ত্রীলোক আজ নিজেকে পুরুষের সম্ভোগ-বস্তুরূপে এমন ভয়ঙ্কর শক্তিশালী করে তুলেছে যে, কোন পুরুষই শান্ত সহজভাবে তার সম্মুখীন হতে পারে না। যখনই কোন পুরুষ স্ত্রীলোকের সম্মুখীন হয়, তখনই তার যাদু-শক্তির কাছে মাথা নুইয়ে ফেলে, তার সমস্ত ইন্দ্রিয়-বৃত্তি যেন নিমেষে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যায়। এমন কি, আমার আগের বয়সে, যখনই নাচের পোষাকে সুসজ্জিত কোন নারীর সামনে গিয়ে পড়তাম, কেমন যেন চঞ্চল উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠতাম। এখন অবশ্য সেই জাতীয় দৃশ্য দেখলে আমি ভেতর থেকে শিউরে উঠি; কারণ, তার মধ্যে আমি স্পষ্ট দেখতে পাই, জনসাধারণের প্রত্যক্ষ অকল্যাণ, একটা স্পষ্ট বিপদের আশঙ্কা···আইনত যে-রকম বিপদের সম্ভাবনা সমাজে থাকা উচিত নয়। মনে হয়, তক্ষুণি পুলিশ ডেকে আনি, চোখের সামনে যে মহা-আতঙ্ক নড়ছে ফিরছে তা থেকে আমাদের রক্ষা করার জন্যে তাকে অনুরোধ করি, হয় তাকে সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও কিংবা চিরকালের মত দূর করে দাও।"

হঠাৎ মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে হেসে উঠে বলেন: "শুনে আপনার হাসি পাচ্ছে, না? কিন্তু বিশ্বাস করুন, এতে হাসবার কিছুই নেই। হয়ত এমন এক সময় আসবে এবং আমার মনে হয় তা খুব শীগ্‌গিরই আসবে, যখন মানুষ এই ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝতে শিখবে এবং অবাক্ হয়ে নিজেদের জিজ্ঞাসা করবে, কি করে সমাজে মানুষ জেনে-শুনে এই রকম বিপদকে প্রশ্রয় দিত? এক মুহূর্তের জন্যেও এই আত্ম-প্রতারণায় নিজের মনকে ভোলাতে কি পারেন যে, এই যে দেহকে সুসজ্জিত করার ব্যাপারে সমাজ স্ত্রীলোকদের সঙ্গে নিঃশব্দে ষড়যন্ত্র করে চলেছে, এটা কি শুধু প্রত্যক্ষভাবে পুরুষের কামনাকে জাগাবার জন্যে নয়? এবং তার মধ্যে কি সমাজের বিপদের কোন আশঙ্কা নেই? যেন, স্ত্রীলোকের অধিকার আছে, প্রকাশ্যভাবে পথে-ঘাটে, সদর রাস্তায়, অলি-গলিতে চারদিকে ফাঁদ পেতে রাখবার এবং বিশ্বাস করুন, যা হচ্ছে, তার চেয়েও ভয়ঙ্কর! আমি জিজ্ঞাসা করি, ভাগ্যের ওপর সে-সব খেলার হার-জিত নির্ভর করে, জুয়ো বলে আইনতঃ তাদের বন্ধ করা হয়েছে, স্ত্রীলোকেরা যখন স্বেচ্ছায় প্রলুব্ধকারী পোষাক পরে ঘুরে বেড়ায়, তখন আইন কেন তাকে নিষিদ্ধ করে না? জুয়োর হার-জিতের খেলার চেয়ে তা সহস্রগুণ মারাত্মক!

৬

"ঠিক এই একই ভাবে আমি নিজে ফাঁদে ধরা পড়ি। লোকে যাকে বলে প্রেমে পড়া, আমারও ভাগ্যে তাই ঘটলো। যাকে ভালবেসেছিলাম, তাকে যে শুধু মনে হতো আমার স্বপ্নের আদর্শ নারী বলে, তা নয়, যতবার আমি তার কাছে প্রেম নিবেদন করতে গিয়েছি, ততবার আমি নিজেকেও মনে করেছি, পুরুষ-রতন বলে। আসল কথা কি জানেন? জগতে এমন কোন বদমায়েস লোক নেই, তা সে যতদূর বদমায়েসই হোক্ না কেন, যে তার চেয়েও নিকৃষ্টতর আর একটিকে খুঁজে বার করতে না পারে এবং তাতে করে আত্মশ্লাঘার সে একটা কারণ খুঁজে পায়।

"ঠিক তাই ঘটে আমার বেলায়। আমি টাকার জন্যে বিয়ে করি নি। আমার পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে অনেককেই দেখেছি, স্ত্রীর অর্থের লোভে অথবা স্ত্রীর প্রতিপত্তিশালী বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনের লোভে তারা বিয়ে করেছে, কিন্তু আমার নির্বাচনের মধ্যে লাভের বা লোভের কোন অংশ ছিল না। আমি ছিলাম ধনী, আমার স্ত্রী ছিলেন দরিদ্র। সেই হলো আমার আত্মশ্লাঘার প্রথম কারণ। আর একটি ব্যাপার, যার দরুণ আমি সমান আত্মশ্লাঘা বোধ করতাম, সেটা হলো, আমি দেখেছি অনেকেই বিয়ের পরও সমানভাবে উচ্ছৃঙ্খল জীবন চালিয়ে যাবে, এই ধারণা নিয়েই জেনে-শুনে বিয়ে করে। আমি কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করি যে বিয়ের পর কোন মতেই স্ত্রীর বিশ্বাস নষ্ট করবার মতন কোন কাজই করবো না এবং তার দরুণ নিজের সম্বন্ধে যে কি উচ্চ ধারণাই পোষণ করতাম তা বলে বোঝান যায় না। হাঁ, সেই জন্যেই নিজেকে দেবশিশু বলে সগর্বে জাহির করতাম!

"আমাদের এন্‌গেজমেন্ট-কাল * খুব অল্প দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় এবং আজও সে-কথা স্মরণ করতে আমার লজ্জায় মাথা হেট হয়ে যায়। কি জঘন্য কেটেছে সে-সময়টা! আমরা ভেবেছিলাম যে, আত্মিক

* খৃষ্টান য়ুরোপীয় রীতি অনুসারে আসল বিয়ের আগে, পাত্র আর পাত্রী অঙ্গুরী-বিনিময়ের দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে বিয়ে করতে অঙ্গীকার-বদ্ধ হয়। সেই সময় থেকে বিয়ের আগের দিন পর্য্যন্ত হলো, এন্‌গেজমেন্ট-কাল।

ভালবাসার সংযোগেই আমরা দু'জনে একত্র হয়েছি। কিন্তু আমাদের ভালবাসা বা মিলনের মধ্যে যদি কোথাও এতটুকু আত্মার সংস্পর্শ থাকতো, তা হলে আমাদের কথাবার্ত্তায় তা ফুটে উঠতো। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, তার কোন প্রমাণই পাওয়া গেল না। যখন দুজনে নিভৃতে থাকবার সুযোগ পেতাম, তখন কি কথা বলবো তা যেন এক গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়াতো। মনে মনে ভেবে ঠিক করতে হতো কি বলবো, বলতামও, তারপর আবার চুপচাপ হয়ে যেতাম, তারপর আর মাথা খুঁড়লেও আর কিছু খুঁজে পেতাম না। বলবার মতন নতুন আর কিছুই ছিল না। সামনে যে নব-জীবন আমাদের অপেক্ষায় ছিল, সে-সম্পর্কে যা-কিছু বলবার বা ভাববার, ভবিষ্যৎ জীবনের যা-কিছু পরিকল্পনা, সবই বলা হয়ে গিয়েছে। নতুন আর কি বলা যায়? যদি আমরা মানুষ না হয়ে জন্তু হতাম, তাহলে অন্তত এটুকু জানতাম যে কথা বলবার কোন প্রয়োজন নেই আমাদের। কিন্তু যেহেতু আমরা জন্তু নই, সেহেতু কথা বলতে আমরা বাধ্য, যদিও বলবার মতন কোন কথাই আর খুঁজে পেতাম না। এর সঙ্গে যোগদান করুন, রাশি-রাশি মিষ্টি খাওয়া, ডিনার দেওয়া, জঘন্য সব প্রথা। বিয়ের আয়োজন সম্পর্কে যত সব বিরক্তিকর ব্যাপার, যেমন ধরুন, বিয়ের পর থাকবার জায়গার ব্যবস্থা, আমার স্ত্রী সকাল বেলা কি পোষাক পরবেন, তার তালিকা প্রস্তুত করা, আমি নিজে সেদিন কি পোষাক পরবো, কি অঙ্গরাগ ব্যবহার করবো, ইত্যাদি···।

"অবশ্য, কিছুক্ষণ আগে যে বৃদ্ধ ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটি নেমে গেলেন, তিনি যে-রকম বিবাহের কথা বলছিলেন, আমাদের পুরানো রাশিয়ান গির্জ্জার যাঁরা ফাদার, তাঁদের উপদেশ এবং বিধান অনুযায়ী সে-ধরণের বিবাহে বিছানা-মাদুর, যৌতুক, খাট-পালঙ্ক ইত্যাদি ব্যাপার ধর্ম্মানুমোদিত বিবাহের অনুষ্ঠানেরই সাধারণ অঙ্গবিশেষ। কিন্তু আমাদের দেশে যাঁরা বিয়ে করেন, তাঁদের দশ জনের মধ্যে ন'জন গির্জ্জার ধর্ম্মানুষ্ঠানকে মেনে চলেন, কেন না, তার ফলে বিয়েটা একটা সামাজিক স্বীকৃতি পায়, এই মাত্র। আমি জোর করে বলতে পারি, অধিকাংশ বিবাহিত লোকই বিবাহের সময় গির্জ্জার অনুষ্ঠানকে অল্প-বিস্তর একটা সর্ত্ত বলে মনে করেন, যে-সর্ত্ত পালন করার মধ্যে তাঁরা একটি মেয়েকে অধিকার এবং ভোগ করবার ক্ষমতা পান।"

৭

"এই ভাবেই প্রত্যেকের বিবাহ হয় এবং আমারও হয়ে গেল। তারপর সুরু হলো সেই বহু-নন্দিত মধু-চন্দ্রিমার কাল। নামটার মধ্যেই একটা 'বেথস্'* স্পষ্ট হয়ে রয়েছে।

"একদিন প্যারিস শহরে ঘুরে এটা-ওটা-সেটা দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা সাইন-বোর্ড নজরে পড়লো, একটি দাড়িওয়ালা স্ত্রীলোক আর একটা সিন্ধু-ঘোটকের মূর্ত্তি তৈরী করে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। ব্যাপারটা কি দেখবার জন্যে ভেতরে ঢুকলাম। ভেতরে গিয়ে দেখি, দাড়িওয়ালা স্ত্রীলোক বলে বাইরে যে বিজ্ঞাপন টাঙানো হয়েছে, আসলে সেটি হলো মেয়েদের পোষাকে দাড়িওয়ালা একজন পুরুষমানুষ এবং একটা কুকুরের গায়ে সিন্ধু-ঘোটকের চামড়া জড়িয়ে একটা স্নানের টবে তাকে বসিয়ে রাখা হয়েছে। সমস্তটাই একটা বিরাট ধাপ্পা। যখন বেরিয়ে আসছি, তখন সার্কাসের মালিক মহাসম্মানে আমাকে বাইরের দরজা পর্য্যন্ত স্বয়ং এগিয়ে দিয়ে গেলেন এবং বাইরের অপেক্ষমান জনতাকে উদ্দেশ্য করে আমাকে দেখিয়ে বলে উঠলেন, এই ভদ্রলোকটিকেই জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন·· ইনি এইমাত্র নিজে দেখে বেরুচ্ছেন···কি অপূর্ব্ব জানোয়ার! চলে আসুন! চলে আসুন! মাত্র এক ফ্রাঙ্ক মাথা-পিছু! আমি প্রতিবাদ করে বলতে পারলাম না যে, যা দেখে এলাম, তা কিছুই নয়,—বলতে কেমন যেন সঙ্কোচ হলো এবং সার্কাসের মালিক আমাকে দেখেই বুঝেছিল, প্রতিবাদ করতে আমার সঙ্কোচই হবে। মধু-চন্দ্রিমার সমগ্র বিসদৃশতার মধ্যে দিয়ে যাকেই যেতে হয়েছে, ঠিক এই রকমই তার অভিজ্ঞতা হয়েছে···ঠিক এমনি ভাবেই তারা অপরকে সাবধান করে দেওয়া থেকে সঙ্কোচে বিরত হয়েছে। আমিও সে-সম্বন্ধে তখন কারুরই স্বপ্ন ভাঙতে চেষ্টা করি নি কিন্তু আজ সেই সত্য প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হবার আর কোন কারণই দেখি না; আজ মনে হয়, এই ব্যাপার সম্বন্ধে যা সত্য, তা অবিলম্বে জগৎকে জানানো একান্ত প্রয়োজনীয়।

* য়ুরোপীয় অলঙ্কার-শাস্ত্রে 'বেথস্' হলো একটা রসচ্যুতি। যখন একটা ভাব স্বাভাবিক ভাবে সর্ব্বোচ্চ বিকাশের চূড়ায় ওঠে, সেইখানেই তার পরিসমাপ্তি ঘটা উচিত। কিন্তু তারপরও যদি কেউ সেই উচ্চস্তর থেকে আবার সেই ভাবের জের টানতে আরম্ভ করে, অথবা তার সঙ্গে গরমিল কোন ভাব জুড়ে দেয়, তাহলে তাকে বলে 'বেথস্'।

"সে-সত্য হলো, মধু-চন্দ্রিমার মধ্যে কোন মধুই নেই, একান্ত ক্লান্তিকর, জঘন্য এবং সর্বোপরি বিবক্তিকর, অসম্ভব রকম বি'ক্তিকর। আমার মনে পড়ে, ছেলে-বেলায় যখন প্রথম আমি সিগারেট খেতে শিখছিলাম, সেই সময়, সিগারেটের ধোঁয়া টানার সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে গা-বমি করে এলো, মনে হলো যেন জ্বর আসছে, মুখ দিয়ে অনবরত লালা কাটতে লাগলো, তাড়াতাড়ি সমস্ত লালা গিলে খেয়ে ফেললাম এবং প্রাণপণ চেষ্টা করে দেখাতে চাইলাম যে, ব্যাপারটা হাঁ, বেশ আরামপ্রদই বটে।"

—"মধু-যামিনী সম্পর্কে বড় বিচিত্র কথা আপনি বলছেন,"—অনুযোগ করে উঠি, "আপনি যদি বলেন দুটি প্রাণীর একত্র বাস করার ফলে বমি-বমি ভাব জাগে, তাহলে আমরা মনুষ্য জাতির বৃদ্ধি কি করে আশা করতে পারি?"

—তা বটে, কিন্তু নিরুপায়! কেন, মনুষ্যজাতি যদি নিশ্চিহ্নই হয়ে যায়?

আপনার মনে তিক্তকণ্ঠে ভদ্রলোক শেষের কথা কয়টি পুনরুক্তি করেন…"আমি যে প্রতিবাদ করবো, তা যেন তিনি আগে থাকতেই জানতেন!"

"আপনি যদি প্রচার করেন, সন্তান-প্রসব নিয়ন্ত্রণ করা দরকার, যাতে করে ইংরেজ লর্ড-শরীরে চর্বি জমা করবার মাল-মশলা বিনা-বাধায় পেয়ে যান, কেউ আপনাকে তিরস্কার করবে না। কিন্তু নীতির দোহাই দিয়ে যদি সন্তান-প্রসব নিয়ন্ত্রণ করবার কথা একবার মাত্র তুলেছেন, দোহাই ভগবান! চারদিক থেকে কি চীৎকারই না জেগে উঠবে।"

হঠাৎ থেমে গিয়ে, আলোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভদ্রলোক বলে উঠলেন, "মাপ করবেন, ঐ আলোটা চোখে বড় লাগছে…যদি ঢাকনাটা নামিয়ে দিই, আশা করি আপত্তি করবেন না?"

—"তাতে আমার কিছু যায়-আসে না," জানাতেই ভদ্রলোকটি তাড়াতাড়ি আসন থেকে উঠে, সব কাজেই তাঁর এই তাড়াহুড়ো ভাব, আসনের ওপর দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে আলোর ওপর পশমি ঢাকনাটা টেনে দিলেন।

যে-কথা উঠছিল আমি তার প্রতিবাদ করলে, ব্যবহারিক জগতে যদি প্রত্যেক মানুষ জীবন-ধারা পরিচালনের নীতি হিসাবে ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহলে অচিরকালের মধ্যেই পৃথিবীতে মনুষ্য জাতি দুর্লভ হয়ে উঠবে।

কয়েক মুহূর্ত ভদ্রলোক চুপ করে রইলেন। আমার সামনের আসনে দু'পা ফাঁক করে ছড়িয়ে দিয়ে, হাঁটুর ওপর হাতের কনুই রেখে ভদ্রলোক স্থির হয়ে বসলেন। বললেন, "আপনার প্রশ্ন হলো, 'মনুষ্য জাতি তা হলে কি করে বেঁচে থাকবে?' কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, "মনুষ্য-জাতির বেঁচে থাকবার দরকারই বা কি?"

বিস্মিত হয়ে বলে উঠি "দরকার? তা না হলে আমাদের অস্তিত্বই তো থাকে না।"

—"কিন্তু কেন আমাদের অস্তিত্ব থাকবে?"

—"কেন থাকবে? বেঁচে থাকবো বলেই থাকবে!"

"বেশ, তাহলেই কথা আসে, আমরা কি নিয়ে বেঁচে থাকবো? যদি কোন উদ্দেশ্য না থাকে, যদি কোন লক্ষ্য না থাকে, শুধু বেঁচে থাকবার জন্যেই যদি জীবন ধারণ করা হয়, তা হলে বেঁচে থাকার কোন সঙ্গত কারণই থাকে না। এবং তাই যদি হয়, তাহলে শোপনহায়ার এবং বৌদ্ধ দার্শনিকেরা অভ্রান্ত সত্য কথাই বলেছেন। অপর পক্ষে, যদি মানব-অস্তিত্বের মূলে কোন লক্ষ্য থাকে, কোন উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে সেই লক্ষ্যে পৌছানর সঙ্গে সঙ্গে, বা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনেরও শেষ হয়ে যায়। এটা তো স্বতঃসিদ্ধ কথা…"

আপনাব মনে শেষ কথাটা ভদ্রলোক আবার উচ্চাবণ করেন,…উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কণ্ঠস্বরে যে উচ্ছ্বাস ফুটে ওঠে, তা থেকে বোঝা যায় যে তিনি তাঁব এই সিদ্ধান্তকে রীতিমত গুরুত্ব দান করেন।

"হাঁ, এটা স্বতঃসিদ্ধ কথাই! এখন আমার কথাগুলো বেশ করে বিচার করে দেখুন। এই মানব-অস্তিত্বের উদ্দেশ্য যদি সুখ-শান্তি, প্রীতি বা ভালবাসা হয়, বা যে-কোন নাম দিয়েই তাকে অভিহিত করুন না কেন, পুরাকালে যে সব সাধু-সজ্জন বা ভগবানের প্রেরিত পুরুষেরা এসেছিলেন, তাঁরা যে বার বার ঘোষণা করে গেলেন, প্রেমে সব মানুষকে এক হতে হবে, হাতের তলোয়ারকে ভেঙে লাঙলের ফলা তৈরী করতে হবে, কেন তা বাস্তবে পরিণত হলো না আজও পর্য্যন্ত? কিসে তা পেলো বাধা? তার একমাত্র উত্তর হলো, মানুষের কামনার পাহাড়ে আঘাত লেগে বার বার এই সব আদর্শ ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। এই সব কামনার মধ্যে সব চেয়ে শক্তিশালী, সব চেয়ে বেশী ক্ষতিকারক, সব চেয়ে যে নিজেকে সব সময় জাহির করে আছে, সে হলো আমাদের ইন্দ্রিয়জ কামনা। সুতরাং আমরা যদি এই সব কামনার, বিশেষ করে এই ইন্দ্রিয়জ কামনার মূলোৎপাটন করতে পারি, তাহলেই জগতের কল্যাণ

সম্পর্কে সেই সব ভবিষ্যৎবাণী সফল হয়ে উঠবে। প্রেমের সূত্রে মানুষ আবার এক-পরিবার-ভুক্ত হবে, মানব-অস্তিত্বের চরম লক্ষ্যে সেদিন মানুষ পৌঁছে যাবে এবং যখন আর এই পৃথিবীতে মানুষের এই ধারাবাহিক অস্তিত্বের কোন প্রয়োজনই হবে না।

"যতদিন না এই মনুষ্য জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, ততদিন তার অস্তিত্বের প্রেরণার জন্যে তার সামনে একটা আদর্শ থাকবেই। এবং সে-আদর্শ কখনো কুকুর-শিয়ালের আদর্শ হতে পারে না, কোন রকমে সন্তান-উৎপাদন করে যাওয়া, কোন রকমে সংখ্যা বাড়ানো। সে-আদর্শ হলো মহৎ কল্যাণের আদর্শ, যে কল্যাণ শুধু সম্ভব সংযমের দ্বারা, তিতিক্ষার দ্বারা, সুপবিত্র সম্বন্ধ-বোধের দ্বারা। এই আদর্শের দিকেই আমরা বরাবর অগ্রসর হয়ে এসেছি এবং আজও অগ্রসর হয়ে চলেছি।

"কিন্তু মনে করুন, ভগবান যদি এই আদর্শ-সিদ্ধির জন্যে মানুষকে যেমন মরণশীল করে গড়ে তুলেছেন, তেমনি মরণশীলই করতেন অথচ তাদের মধ্যে কোন কামনা-বাসনা না থাকতো? কিম্বা যদি তাদের অমর করেই গড়ে তুলতেন? প্রথম ব্যবস্থাই যদি সত্য হতো, তাহলে মানুষ তার জীবনের আদর্শকে উপলব্ধি না করেই মরে যেতো এবং বাধ্য হয়ে ভগবানকে তখন তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে কোন নূতনতর সৃজন-ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হতো। অপরপক্ষে মানুষ যদি অমর হয়েই জন্মাতো, তাহলে অনুমান করা যেতে পারে যে শত-সহস্র বর্ষ পরে একদিন হয়ত তারা সেই আদর্শকে উপলব্ধি করতে পারতো, তখন আর তাদের অস্তিত্বের কোন সার্থকতাই থাকতো না। তখন তাদের নিয়ে কি করা যেতে পারতো? তার চেয়ে এখন যে-ব্যবস্থা আছে, সেইটেই অপেক্ষাকৃত ভাল।

"হয়ত আমি যে-ভাবে এই সব কথা বললাম, তা আপনি অনুমোদন করেন না। হয়ত আপনি একজন বিবর্ত্তনবাদী। কিন্তু তাই যদি হ'ন তবুও আমার মূল বক্তব্য সম্বন্ধে আপনি দ্বিমত হতে পারবেন না। প্রাণি-জগতের এই অস্তিত্বের প্রতিযোগিতায় মানুষ সকলকে ছাড়িয়ে সবার ওপরে উঠেছে। এই জীবন-প্রতিযোগিতায় নিজেদের অটুট রাখবার জন্যেই মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে মৌচাকে কেন্দ্রীভূত মৌমাছিদের মতন, অযথা শুধু বংশ বৃদ্ধি করে ছড়িয়ে পড়লেই চলবে না। এবং এই মৌমাছিদের মতনই, আমাদের মধ্যে থেকে সেই মানুষের দলকে গড়ে তুলতে হবে, যারা যৌনিকে বাদ দিয়েই জীবন ধারণ করতে শিখবে; যাদের লক্ষ্য হবে আত্ম-সংযম, এবং আজ যেভাবে আমাদের সমাজ ইচ্ছা করে কামনাকে জাগাবার জন্যে যে-সব আয়োজনের সৃষ্টি করছে, সে-সব আয়োজনকে তারা বর্জ্জন করতে শিখবে!"

কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করে থাকার পর ভদ্রলোক আবার বলতে আরম্ভ করলেন:

"জিজ্ঞাসা করছেন, মানুষ একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে কি না? নিশ্চয়ই যাবে। জীবনকে যেদিক থেকেই দেখুন না কেন, যে-ভাবেই তাকে গ্রহণ করুন না কেন, তার এই চরম পরিণাম সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কি আছে? মৃত্যুর মতনই তা স্থির, অবধারিত। পৃথিবীর যত ধর্ম্মমত আছে, সব এই বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, অচিরে হোক কিম্বা কল্প-কল্পান্ত দূরে হোক্, এই পৃথিবী একদিন প্রলয়ে শেষ হয়ে যাবে। বর্ত্তমান বিজ্ঞানেরও সেই মত। যদি মানুষের নীতি-ধর্ম্ম সেই কথাই প্রচার করে, তাতে বিস্মিত হবার কি আছে?

"কামনা, তা তাকে যেমন করেই সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখুন না কেন, তা হোলো পাপ, ভয়াবহ অকল্যাণ, যে অকল্যাণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে; আজ যেমন আমরা তাকে নিয়ে সস্নেহে লালন-পালন করছি, কামনা তার যোগ্য বস্তু নয়। বাইবেলে যে বলেছে, যে-ব্যক্তি কোন নারীর দিকে কামনার দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে, আসল সহবাসের আগেই সেই দৃষ্টি দিয়ে সে কাম-সম্ভোগের অপরাধে অপরাধী হয়, একথা যে শুধু অপরের স্ত্রী সম্বন্ধে প্রযোজ্য তা নয়, নিজের স্ত্রী সম্বন্ধেও তা ষোল-আনা প্রযোজ্য। বর্ত্তমান জগতে যে-ভাবে সমাজ-ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে, তাতে এই মতবাদের উল্টো ব্যবস্থাই কার্য্যকরী হয়ে চলেছে। এই যে আমাদের বিয়ের পর মিথুন-যাত্রা, গুরুজনেরা দাঁড়িয়ে থেকে তরুণ দম্পতীকে সমাজ থেকে, পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে একলা থাকবার জন্যে পাঠিয়ে দেয়, এটা শুধু অবাধ ভোগ-লালসা চরিতার্থ করবার আইনসম্মত একটা ব্যবস্থা ছাড়া আর কি?"

৮

"কিন্তু, যে-অনাচার আমরা করি, তার প্রত্যেকটির জন্যে স্বতন্ত্র শাস্তি মাপা আছে। মধুচন্দ্রিমার জীবনকে সফল করে তোলবার জন্যে চেষ্টার কোন ত্রুটিই করি নি কিন্তু সব ব্যর্থ হয়ে গেল। শুধু একটা লজ্জার গ্লানি, তিক্ত বিরক্তি, এই শুধু লাভ

হলো। কয়েক দিন যেতে না যেতেই বুঝলাম, এ শুধু একটা অসহ্য যন্ত্রণার অবরুদ্ধ-জীবন।

"খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। একদিন, বোধ হয় সেটা বিয়ের তিন দিন কি চার দিন পরেই হবে, দেখি, আমার স্ত্রী যেন বিরক্ত হয়ে বসে আছেন; তার কারণ কি জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে আমি তাঁকে আদর করে আলিঙ্গন করলাম। আমার ধারণা, যেন এ ছাড়া তাঁর আর কোন কাম্য আমার কাছ থেকে নেই। কিন্তু তিনি আমার হাত সরিয়ে দিয়ে হঠাৎ কেঁদে উঠলেন। অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার? কি যে ব্যাপার, তা তিনি প্রকাশ করে বলতে পারলেন না, কিন্তু আমি স্পষ্ট বুঝলাম যে তিনি বিষণ্ণ এবং ক্লান্ত বোধ করছেন। আমাদের দুজনের আসল সম্পর্কটা যে কি, তার স্বরূপ হয়ত তখন তার স্নায়ুর কাছে প্রকট হয়ে উঠেছে।

"স্বাভাবিক ভাবে যেটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হচ্ছিল, সেটা কিন্তু জ্ঞানত কথায় প্রকাশ করতে পারছিলেন না। আমি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যেতে লাগলাম। উত্তরে শুধু একবার অস্পষ্টভাবে যা বললেন, তা থেকে বোঝা গেল যে মার জন্য মন কেমন করছে। আমি সে কথাটা সত্য বলে মনে করতে পারলাম না, তাই মার কথা একেবারে উত্থাপন না করেই সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলাম। মনের দিক দিয়ে তিনি যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, মার কথাটা মাত্র তারই ইঙ্গিত, একথাটা তখন বুঝতেই পারলাম না। কিন্তু মার কথা উত্থাপন করলাম না দেখে তৎক্ষণাৎ তিনি চটে গেলেন, যেন আমি তাঁর কথা বিশ্বাস করলাম না, এই অভিযোগ। বলে উঠলেন, আমি এখন দেখছি, তুমি আমাকে ভালবাসো না। উত্তরে আমি তাঁকে মৃদু ভর্ৎসনা করলাম, বড় খামখেয়ালী তুমি! সঙ্গে সঙ্গে দেখি, তাঁর মুখের চেহারা বদলে গেল। মুখের বিষণ্ণতা স্পষ্ট বিরক্তিতে পরিণত হয়ে গেল এবং ক্রুদ্ধ ভাষায় তিনি অভিযোগ করতে সুরু করে দিলেন যে, আমি নাকি স্বার্থপর এবং নিষ্ঠুর। স্থিরদৃষ্টিতে তাঁর দিকে ফিরে চাইলাম। দেখলাম, সমস্ত মুখের রেখা স্পষ্ট প্রাণহীন হিম হয়ে উঠেছে, মৈত্রীর চিহ্ন মাত্র সেখানে নেই⋯এমন কি সে-মুখ দেখে বলা যায় যে, তিনি আমাকে স্পষ্ট ঘৃণাই করছেন।

"আজও মনে পড়ে, সেই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে কি এক আতঙ্কে মন ছেয়ে গেল। কেন এই পরিবর্তন? কি করে সম্ভব হলোই বা তা? প্রেম! আত্মার আত্মায় মিলন! কোথায় গেল সে-সব? তার বদলে এ-সব কি হলো? মনের মধ্যে আপনা থেকে জিজ্ঞাসা জেগে উঠলো, এ-ও কি হতে পারে? এই কয়েক দিন আগেও যে-নারীকে চিনতাম, এ তো সে-নারী নয়!

"তবুও তাঁকে শান্ত করবার জন্যে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝলাম যে সে দুর্ভেদ্য হিম-প্রস্তরের বিষাক্ত বাধা টলাবার ক্ষমতা আমার নেই; এই বোধের সঙ্গে সঙ্গে এক দুর্দমনীয় ক্ষিপ্ততা পেয়ে বসলো আমাকে এবং তার ফলে দুজনেই দুজনকে জঘন্য ভাষায় গালাগাল দিয়ে উঠলাম।

সেই প্রথম ঝগড়ার যে ছাপ মনে রয়ে গেল, "তা অবর্ণনীয়, ভয়াবহ! অবশ্য এটাকে আমি ঝগড়া বলেই উল্লেখ করছি, কিন্তু আসলে সেটা তা ছাড়া অন্য আর কিছু। সেটা হলো স্রেফ আমাদের দুজনের মাঝখানে যে বিরাট গহ্বর লুকিয়ে ছিল, তার হঠাৎ আবিষ্কার। প্রেম বলতে যা ছিল, তা নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল, এখন দুজনার যা আসল সম্পর্ক তাই দুজনার সামনে পরিস্ফুট হয়ে উঠলো, দুটি আত্মকেন্দ্রিক প্রাণী, পরস্পর পরস্পরের সম্পূর্ণ অজানা।

"তাই আমাদের দুজনের মধ্যে যে ঝগড়াটা হলো, সেটা আসলে ঝগড়া নয়, সেই প্রথম পরস্পর দেখতে পেলাম, পরস্পরের সম্পর্ক কি! অবশ্য তখনও সেটা সম্পূর্ণ দেখতে পাইনি, দেখেছিলাম মাত্র তার আভাস এবং তখনও সম্পূর্ণভাবে বুঝি নি যে, সেই বিরূপতা, সেই হিম প্রাণহীনতা, সেইটেই আমাদের আসল সম্পর্ক। বিয়ের প্রথম অবস্থায় এই জাতীয় ঝগড়ার দরুণ যে মানসিক তিক্ততা জাগে, তা আবার অচিরকালের মধ্যে প্রেমের বাষ্পে সাময়িক ভাবে ঢাকা পড়ে যায় এবং তখন মনে হয়, সত্যিই সামান্য একটা মনোমালিন্য ঘটে গেল, ভবিষ্যতে আর কখনো এমন ভুল-বোঝাবুঝি হবে না। আমিও ঠিক সেইভাবেই নিজেকে বুঝিয়েছিলাম।

"কিন্তু এক মাস যেতে না যেতেই, আর এক নতুন পর্বের আয়োজনের মুখে, আবার যেন মনে হলো, পরস্পর পরস্পরের কাছে নিষ্প্রয়োজন হয়ে উঠেছি এবং তার ফলে আর একবার ঝগড়া হলো। এই দ্বিতীয় মনোমালিন্যের রেখা প্রথম অভিজ্ঞতার চেয়ে আরো গভীরভাবে মনে পড়লো। মনে মনে ভাবলাম, তাহলে সেই প্রথম ঝগড়াটা নিতান্ত আকস্মিক ব্যাপার নয়। কোন একটি বিশেষ কারণ থেকেই তার উৎপত্তি

হয়েছিল এবং যখনি সেই কারণটি প্রকট হয়ে উঠবে, তখনই এই ঝগড়াও আবার দেখা দেবে। দ্বিতীয় ঝগড়ার এত গভীরভাবে আন্দোলিত হবার আর একটা কারণ ছিল যে, অতি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে সেটির সূচনা হয়। সামান্য টাকার ব্যাপার নিয়ে, যে-টাকার ব্যাপারে আমার মনে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ ছিল না, বিশেষ করে আমার স্ত্রী-সম্পর্কে তো নয়ই। মনে আছে, তিনি ব্যাপারটাকে এমন বড় করে দেখলেন যে, যেহেতু আমার টাকা আছে, সেহেতু, তাঁর ধারণা যে, আমি সেই টাকার আধিক্যের দরুণ তাঁর ওপর আধিপত্য জাহির করতে চাইছি। এ অভিযোগ যে কতদূর ভিত্তিহীন, কুৎসিত, নীচ এবং অস্বাভাবিক, তা আমি জানতাম।

"আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল, অসভ্য বলে তাঁকে ভর্ৎসনা করলাম। তিনিও প্রত্যুত্তরে সেই কথাই ফিরিয়ে দিলেন এবং মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম সেই প্রাণহীন ক্রুর বিরূপতার রেখা, যা প্রথম ঝগড়ার দিনে দেখেছিলাম, এবারেও তাঁর মুখে স্পষ্ট হয়ে তা ফুটে উঠেছে।

"মনে পড়ে, আমার বাবার সঙ্গে, আমার ভায়ের সঙ্গে মাঝে-মাঝে আমি ঝগড়া করতাম; কিন্তু যে বিষাক্ত ঘৃণা আমার স্ত্রী আর আমার মাঝখানে এই ঝগড়ার ফলে দেখা দিল, সেখানে তার চিহ্নমাত্র ছিল না। কিন্তু, এবারেও, কিছুদিন পরেই আমাদের এই পারস্পরিক ঘৃণার সম্বন্ধের কথা তথাকথিত প্রেমের আচ্ছাদনে ঢাকা পড়ে গেল এবং আমি আবার আমার মনকে এই বলে বোঝালাম যে, এই দুটি ঝগড়াই ভুল বশতঃ ঘটে গিয়েছে, সামান্য ভুল-বোঝাবুঝি যা অনায়াসেই ঠিক করে নেওয়া যায়। কিন্তু তৃতীয় এবং তারপরে চতুর্থ কলহের আগমনে আমার সে ভ্রান্তি আকাশে মিলিয়ে গেল। আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখলাম যে, এই কলহ কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়, ভুল-বোঝাবুঝি নয়, একান্ত অনিবার্য্য কার্য্যকারণের যোগফল এবং যা হয়েছে, তা না হয়েই পারে না এবং এই রকমই বারে বারে হবে···

"সেই সম্ভাবনার অনিবার্য্যতার সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত অন্তর যেন জমে হিম হয়ে গেল। এতদিন নিজের মনে মনে বিবাহিত জীবন যেভাবে কাটাবো বলে কল্পনা করে রেখেছিলাম, আজ প্রকৃত ক্ষেত্রে তার সম্পূর্ণ বিপরীত জীবন যাপন করবার আশঙ্কায় মন ভারাক্রান্ত হয়ে এলো এবং সে-ভার আর এক কারণে আরো গুরুতর বোধ হতে লাগলো। সে কারণটি হলো, আমার তখন ধারণা ছিল যে আমি শুধু একাই এই ভাবে স্ত্রীর সঙ্গে নিত্য কলহে বিপন্ন জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছি, অন্য বিবাহিত লোকেরা আমার চেয়ে ঢের বেশী সৌভাগ্যশালী। তখন আমি জানতাম না যে, এই হলো বিবাহিত জীবনের সর্বসাধারণ সংস্করণ এবং প্রত্যেকেই মনে করে যে তারই ভাগ্য বিশেষভাবে শুধু তাকেই প্রবঞ্চিত করেছে, যেমন আমি নিজে ভাবতাম। তখন আমি জানতাম না যে, প্রত্যেক বিবাহিত লোকই তাদের ভেতরকার এই অবস্থা বাইরের অন্য লোকের কাছ থেকে, এমন কি নিজেদের কাছ থেকেও লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে।

"আমার ক্ষেত্রে, বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই এর সূচনা হয় এবং প্রতিদিন অগ্রসর হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা আরো সঙ্গীন এবং ভয়াবহ হয়ে উঠতে থাকে। আমাদের বিবাহিত জীবনের প্রথম সপ্তাহ থেকেই অন্তরের অন্তরতম স্থলে আমি বুঝতে পারি যে আমি ফাঁদে পড়ে গিয়েছি, বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে আমার মনে যে কল্পনা ছিল, তার সঙ্গে তার বাস্তব অভিজ্ঞতার কোন মিলই নেই; আনন্দের উৎসের পরিবর্ত্তে আমার বিবাহ আমার কাছে এক দুঃসহ ভার বলে বোধ হতে লাগলো। কিন্তু অন্য আর পাঁচ জনের মতই সে কথা আমি তখন স্বীকার করতে চাইলাম না, বাইরের লোকের কাছে তো নয়ই, এমন কি আমার নিজের কাছেও নয়।

"এখন যখনি সেকথা ভাবি, রহস্যের মতই সেই কথা বারে বারে মনে হয়; কি করে সেই সব বাস্তব ঘটনার প্রতি অন্ধ হয়ে থাকতে পেরেছিলাম। ব্যাপারটা যে কত গুরুতর দাঁড়িয়েছে, তা একটা ব্যাপার থেকেই নিঃসন্দেহাতীত ভাবে বোঝা যেতো, সে ব্যাপারটা হলো, এই সব ঝগড়ার উপলক্ষ সব সময়ই অতি তুচ্ছ। এত হাস্যকর ভাবে তুচ্ছ যে, ঝগড়ার পর প্রায়ই মনে করতে পারতাম না, কেন ঝগড়া হয়েছিল। আমাদের দুজনের মধ্যে যে আন্তরিক মানসিক বিরূপতা অবিচ্ছেদ ভাবেই বেড়ে চলেছিল, তাকে পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ করতে হলে যে-সব বৃহৎ অনুলক্ষের সৃষ্টি করা প্রয়োজন ছিল, আমাদের বুদ্ধি ও বিচার-শক্তি সে-অনুযায়ী তীব্র ছিল না। তার চেয়ে মজার ব্যাপার ছিল, যে-সব অছিলা আশ্রয় করে আমাদের দুজনার আবার মিল ঘটতো। দুটো মিষ্টি কথা, যা-হোক একটা কিছু কারণ দেখানো, এমন কি দু'-এক ফোঁটা চোখের জল। কিন্তু তার মধ্যে আবার এমন ব্যাপারও ঘটতো, মনে করতে আজও ঘৃণার

আমার মন ভরে যায়, তুমুল ঝগড়ার মধ্যে দুজনে দুজনকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিলাম···কিন্তু পরক্ষণেই দুজনে আবার নীরব হয়ে যেতাম···এবং সেই নীরবতাকে ভরিয়ে তুলতো হাসি, চুম্বন এবং আলিঙ্গন।"

৯

ঠিক সেই মুহূর্তে দুজন নতুন যাত্রী উঠলো। গাড়ীর এক কোণে গিয়ে তারা বসবার যোগাড় করলো। যতক্ষণ না তারা আসনে সুস্থির হয়ে বসলো, ততক্ষণ পদনিশেফ চুপ করে রই লা।

আসন ঠিক করে নিয়ে বসার দরুণ তাদের চলা-ফেরা থেকে যে শব্দ উঠছিল, তা থেমে গেল। থামার সঙ্গে-সঙ্গেই সে আবার বলতে সুরু করলো, যেখানে শেষ করেছিল ঠিক তার পর থেকেই···সামান্য একটা কথাও যেন সে বাদ দিতে চায় না।

সে বলতে সুরু করলো, "এই ব্যাপার সম্পর্কে আসল কোন্ জায়গাটায় মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, জানেন? মুখের কথায় প্রেমকে যে ভাবে বর্ণনা করা হয়, তাতে তার চেয়ে বড় আদর্শ বা তার চেয়ে উন্নততর কোন অনুরাগ আর হতে পারে না কিন্তু কার্য্যতঃ প্রতিদিনের জীবনে সেই প্রেমের যে চেহারা ফুটে ওঠে, তার কথা মনে পড়লে বা মাত্র উল্লেখ করতে গেলে মন ঘৃণায় ভরে যায়। প্রকৃতি যে তার মধ্যে এই জঘন্য বিসদৃশতা সৃষ্টি করেছে, তার মূলে পর্য্যাপ্ত হেতু আছে। কিন্তু আমার কথা হলো, যদি সত্যিই তা জঘন্য হয়, তবে তা লুকোবার দরকার কি? গলা উঁচু করে স্পষ্ট ভাষায় তা স্বীকার করা উচিত। তা না করে, মানুষ উল্টে প্রচার করে বেড়ায় যে তার চেয়ে উন্নত, তার চেয়ে গৌরবজনক আর কিছু নেই।

"বিস্মিত হয়ে নিজের মনে নিজেকেই জিজ্ঞাসা করি, এই যে পরস্পরের প্রতি মারাত্মক বিতৃষ্ণা, কোথায় কি থেকে এর উৎপত্তি হলো? অথচ তার কারণ যে কি, তা দিবালোকের মত স্বচ্ছ বোধ হলো। এই যে বিতৃষ্ণা, আমি জানি, এ শুধু অন্তরের প্রতিবাদেরই রূপান্তর। একজনের স্বভাবকে চেপে মেরে ফেলে আধিপত্য করতে চায় আর একজনের স্বভাব। এবং দুজনের মধ্যে কেউ তা সহ্য করবে না। তাই এই পারস্পরিক বিতৃষ্ণা। যখন এই বিতৃষ্ণার মুখোমুখী দাঁড়াতে বাধ্য হলাম, তখন তার তীব্রতায় বিমূঢ় হয়ে গেলাম। অথচ আমরা ঘৃণা ছাড়া পরস্পরকে আর কিছু দিতেও পারতাম না। দুজন খুনে যেমন এক পাপে, এক অন্যায়ে জড়িত থাকার দরুণ মনে মনে পরস্পরকে ঘৃণা করে, এ ঠিক সেই জাতীয় ব্যাপারই!

"হয়ত আপনি ভাবছেন যে আমি অবান্তর কথা তুলছি। মোটেই না। আমার স্ত্রীকে আমি কি করে খুন করলাম, তারই কাহিনী পর্য্যায়ক্রমে আপনাকে জানাচ্ছি। আদালতে আমার বিচারের সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কি অস্ত্র দিয়ে কি ভাবে আমার স্ত্রীকে আমি খুন করেছিলাম। তারা মূর্খ, তারা ভেবেছিল যে ৫ই অক্টোবর তারিখে, একটি বিশেষ দিনে একটি বিশেষ অস্ত্র দিয়ে আমি আমার স্ত্রীকে খুন করেছিলাম। কিন্তু আসলে সেদিন আমি তাকে খুন করি নি। তার বহু বহু আগে, আজ এই মুহূর্তে ঠিক যেমন ভাবে অন্য বহু স্বামী তাদের স্ত্রীদের খুন করেছে, আমিও সেই ভাবে আমার স্ত্রীকে খুন করি। হাঁ, অবাক্ হচ্ছেন কি? বহু স্বামী, বহু কেন, তাদের মধ্যে অধিকাংশই খুন করছে তাদের স্ত্রীদের!"

জিজ্ঞাসা করে উঠি, "কেমন ভাবে?"

"এর চেয়ে অসম্ভব ব্যাপার আর কিছু কল্পনা করা যায় না, যে জিনিস সব মানুষই জানে স্বতঃসিদ্ধ সত্য এবং প্রত্যক্ষ বলে অথচ কেউ তা চোখে দেখতে পায় না; যে-সব জিনিস প্রত্যেক ডাক্তারের জানা উচিত এবং যা লোকদের জানিয়ে দেওয়া তাদের কর্ত্তব্য, সেই একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপারে তারাই সব চেয়ে নীরব হয়ে থাকে।

"আসলে ব্যাপারটা জটিল নয়। খুব সহজ। পৃথিবীতে পুরুষদের যত সংখ্যা, নারীদের সংখ্যাও প্রায় তার সমান। এ থেকে একটি মাত্র সিদ্ধান্তই আপনা থেকে সত্য হয়ে উঠেছে। নিম্নতর প্রাণীরা প্রবৃত্তির বশে সেই সত্যকেই পালন করে চলে এবং সেই সত্যকে আবিষ্কার করার জন্যে মানুষের কোন অসাধারণ প্রজ্ঞার প্রয়োজন হয় না। সে সত্য হলো, আত্মসংযম একটা অপরিহার্য্য প্রাকৃতিক নিয়ম। অতি সহজ বলেই বোধ হয় আজও পর্য্যন্ত মানুষ তা আবিষ্কার করতে পারে নি। আমাদের রক্তকণিকার মধ্যে দৃষ্টির অগোচর যে সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রাণী আছে, তা বিজ্ঞান খুঁজে বার করেছে, খুজে বার করেছে প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে যত সব অপ্রয়োজনীয় অসম্ভব ব্যাপার; কিন্তু এই সহজ সত্যটুকুকে উপলব্ধি করবার মতন মনোবৃত্তি সে আজও খুঁজে বার করতে পারে নি। আপনি নিশ্চয়ই শোনেন নি যে বৈজ্ঞানিকেরা এই জাতীয় কোন তত্ত্বের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত আছেন?

"সুতরাং এই সমস্যা থেকে নিজেকে মুক্ত

করার পক্ষে স্ত্রীলোকদের দিক্ থেকে দুইটি মাত্র উপায় আছে। প্রথমটি হলো, যখনি প্রয়োজন হবে তখুনি জননী হবার যে স্বাভাবিক শক্তি তার আছে, তাকে চিরকালের মত নষ্ট করে ফেলা, দ্বিতীয়টি অবশ্য সত্য কথা বলতে কি, এই বিপদের সম্ভাবনা থেকে একেবারে মুক্ত হবার ঠিক পথ নয়। সেটা হলো, আর কিছু নয়, প্রাকৃতিক নিয়মের প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ। স্ত্রীলোককে তার সন্তানকে লালন-পালন করতে হয়, আবার সেই সঙ্গে তার স্বামীর রক্ষিতার কাজ করতে হয়। আমাদের সমাজে যে সব মূর্চ্ছা আর নাড় ভেঙ্গে-যাওয়ার কথা শুনি আর চাষীদের মধ্যে যে-সব ব্যাপার ঘটে মালিকানী স্বত্বের নামে, সকলের মূলে এই ব্যাপার। রাশিয়ার সমাজের এই হলো চেহারা। মনে করবেন না যে য়ুরোপের অন্য অঞ্চলে তা আলাদা। যে-সব স্ত্রীলোক এই মালিকানী স্বত্বের ক্রীতদাসী এবং যারা প্রফেসর চারকোর ডিস্‌পেনসারীতে মহিলা-রোগী হিসাবে চিকিৎসার জন্যে যান, তারা দু'জনেই সমান পঙ্গু। আজ পৃথিবী ভর্ত্তি এই জাতীয় পঙ্গু-স্ত্রীলোকে।

"একটু স্থির হয়ে যদি বিচার করে দেখা যায় যে, একজন স্ত্রীলোক যখন গর্ভবতী হয় কিংবা যখন বুকে করে কোন শিশুকে সে লালন-পালন করে, যে-শিশুর মধ্যে দিয়ে জগতের জীবচক্র এগিয়ে চলেছে, তাহলে দেখা যাবে যে সেই সামান্য ব্যাপারটির মধ্যে কি বিরাট, কি সুমহান্ একটা প্রয়োজনীয় ব্যাপার ঘটে চলেছে। এখন কথা হলো, এই একান্ত প্রয়োজনীয় এবং সুপবিত্র কর্ত্তব্যে বাধা পড়ছে এবং কিসের জন্যে এই বাধা? কি এই বাধা? তবুও আমরা স্বাধীনতার বুলি কপ্‌চাই···নারীর অধিকার সম্পর্কে বড় বড় বক্তৃতা দিই। তা যদি হয়, তাহলে নরমাংসভোজী অসভ্যরাও বলতে পারে, যাদের আমরা ধরে নিয়ে এসে খাইয়ে-দাইয়ে মোটা করে অবশেষে খেয়ে ফেলি, তাদের স্বাধীনতা, তাদের অধিকার সম্বন্ধে মনে কোরো না আমরা মোটেই ভাবি না!"

এ জাতীয় উক্তি এর আগে জীবনে আমি শুনি নি। স্বভাবতই তাই মনে গভীর রেখাপাত করলো।

জিজ্ঞাসা করলাম, "কিন্তু আপনি কি বলতে চান? যদি আপনার কথা ঠিক হয় তাহলে স্বামি-স্ত্রীর সম্পর্ক পৃথিবী থেকে উঠে যায় এবং পুরুষ মানুষ, আপনি তো জানেন···"

আমার কথা শেষ না হতেই সে বলে ওঠে, "জানি। আপনি যা বলতে চাইছেন, আমি জানি সেটা হলো, বিজ্ঞানের মহা-পুরোহিত আপনাদের ডাক্তার-প্রভুদের অতি প্রিয় যুক্তি। নারী যে-জন্যে পুরুষের কাছে অপরিহার্য্য বলে এই ডাক্তারেরা ঘোষণা করে থাকেন, যদি কোন রকমে নারীদের মধ্যে থেকে সেই অপরিহার্য্যতাটাকে বাদ দিয়ে দেখানো সম্ভব হতো তাহলে এই ডাক্তারদের দেখিয়ে দিতাম, তাঁরা তখন কি বলেন! অপরিহার্য্যতা! একটা মানুষকে দিনের পর দিন নানা রকম যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দাও যে, শরীরের পক্ষে মদ হলো অপরিহার্য্য, বুঝিয়ে দাও যে তামাক ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না, আফিং খাওয়াটা একটা প্রয়োজনীয় জিনিস, দেখবে আপনা থেকেই জগতে এই সব জিনিস অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছে। মানুষের কি দরকার তা কি সৃষ্টির সময় ভগবান্ জানতেন না? না, সে-সময় ডাক্তারদের পরামর্শ নেন নি বলে, সৃষ্টি-কার্য্যে তিনি সমস্ত গোলমাল করে ফেলেছেন?

"আসল প্রশ্নটা দাঁড়াচ্ছে, দুটো পরস্পর-বিরোধী অবস্থার কি করে সামঞ্জস্য বিধান করা যায়। কি করে এই সমস্যার সমাধান করা যায়? ডাক্তারের ওপর নির্ভর করে থাকুন, তাঁরা সমস্ত কেটে-ছেঁটে সমান করে দেবেন এবং তাঁরা তাই করলেন···তাঁরা এই সমস্যার একটা সমাধান বার করলেন। হায়, যদি কেউ এই পাপিষ্ঠগুলোকে তাদের জোচ্চুরির জন্যে আদালতে তুলতে পারতো! এখন পর্য্যন্ত তা সম্ভব হয় নি বটে, কিন্তু এই তার উপযুক্ত সময়। আর বিলম্ব হলে মহা অনর্থ ঘটবে। দেখছেন তো, ইতিমধ্যে আমরা কোথায় এসে পড়েছি? লোকে পাগল হয়ে যাচ্ছে···নিজের হাতে নিজের মাথার খুলিকে উড়িয়ে দিচ্ছে এবং সব এই বিশেষ সমাধানের জন্যেই। এই ব্যবস্থার এই পরিণাম!

"বনের পশুরা তাদের প্রবৃত্তির বশেই জানে যে তাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্য দিয়ে তাদের বংশ-ধারা বেঁচে চলেছে এবং চলবে এবং সেই জন্যে তারা এই সম্পর্কে কতকগুলো আইন-কানুন আপনা থেকেই মেনে চলে। একমাত্র মানুষই তা মেনে চলে না। মেনে চলতে জানে না। পৃথিবীর অর্দ্ধেক মানুষকে তারা ধ্বংস করে পঙ্গু করে ফেলেছে···সত্য এবং আনন্দের পথে যে-নারী হবে তার প্রত্যক্ষ সহায় ও সহচরী, তাকে সে পরিবর্ত্তিত করে গড়ে তুলছে আনন্দ আর অগ্রগতির মহাশত্রুরূপে। আপনার চারিদিকে চোখ চেয়ে দেখুন এবং বলুন, কে বা কিসে মানুষের অগ্রগতিকে বিপন্ন করে তুলেছে? নারী। এবং তারপর নিজেকে প্রশ্ন করুন, কেন তারা এই ভাবে মানবতার

মহাশত্রুর কাজ করছে? উত্তর একটু আগেই দিয়েছি।"

উত্তেজিত হয়ে আসন থেকে সে ওঠে পড়ে। ঘাড় নেড়ে বার বার নিজের মনে যেন বলতে থাকে, হাঁ, হাঁ...

ভেতরের উত্তেজনাকে প্রশমিত করবার জন্যে পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরায়...

১০

"অন্য আর পাঁচ জনের মতই সংসার করে চলেছিলাম...তবে আমার দুর্দৈব, আমি নিজেকে একটু স্বতন্ত্র মনে করতাম। যেহেতু আমি পরস্ত্রী গমন করতাম না, সেহেতু আমার পরম গর্ব ছিল যে, আমি নিষ্কলুষভাবেই সাংসারিক জীবন যাপন করছি, নৈতিক দিক থেকে আমি আদর্শস্থানীয়, অনিন্দনীয় আমার জীবন। তবে দাম্পত্যকলহের ফলে মাঝে-মাঝে যে শান্তি ব্যাহত হতো, তার জন্যে মনে মনে স্ত্রীকেই দায়ী করতাম। তার চরিত্রের জন্যেই এই অশান্তি। অবশ্য এ কথা বলাই বাহুল্য যে, দোষটা ষোল আনাই তার নয়। অন্য আর পাঁচ জন স্ত্রীলোকের মতন, মানে অধিকাংশ স্ত্রীলোকের মত-ই সে ছিল। আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকেরা যে ভূমিকা অভিনয় করে, সেই অনুরূপ শিক্ষাই সে পেয়েছিল এবং সেই জাতীয় পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই মানুষ হয়েছিল। অর্থাৎ আমাদের ধনী সমাজের মেয়েরা যে ধরণের শিক্ষা পেয়ে থাকে, তার শিক্ষা তা থেকে স্বতন্ত্র কিছু ছিল না।

"স্ত্রী-শিক্ষার নতুন নতুন পরিকল্পনা সম্বন্ধে বুলি কপ্‌চানো আজ-কাল ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এই সব পরিকল্পনাই হচ্ছে বাজে, সম্পূর্ণ নিরর্থক জিনিস। বর্ত্তমান সমাজে একমাত্র নারীর যৌনগত সার্থকতার দিকে লক্ষ্য রেখেই তার শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা হয় এবং পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের যে ভাবে দেখে, সেই ভাবেই স্ত্রীশিক্ষা রূপ নেয় এবং আজকের সমাজে পুরুষেরা নারীকে কি চোখে দেখে, সে-সম্বন্ধে কেউই অজ্ঞ নয়। সুরা, সুন্দরী আর সুর...ছন্দে কবিতায় কবিরা এই কথাই প্রচার করেন। প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক যুগের কবিতা পড়ুন, চিত্র-বিদ্যা আর স্থপতি-শিল্পের প্রত্যেকটি সৃষ্টি অনুসন্ধান করে দেখুন, দেখবেন, প্রেমের কবিতা আর ভিনাস আর ফ্রিনীর মূর্ত্তি... সমাজের সর্ব্বোচ্চ স্তর থেকে নিম্নতর স্তর পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্র দেখবেন, নারী শুধু পুরুষের সুখের যন্ত্র।

"এবং সেই সঙ্গে লক্ষ্য করবেন, শয়তানদের ধাপ্পাবাজী। নারীকে এই ভাবে অপমানিত করেই তারা সন্তুষ্ট নয়, সমস্ত ব্যাপারটা অতি সযত্নে এবং কৌশলে এক ছদ্ম-আবরণে ঢেকে রেখেছে। সেই জন্যেই আমরা দেখি, প্রাচীন কালে বীর-পুরুষ নাইটরা সারা দেশময় ঘুরে বেড়িয়ে নারীর মহিমাকে রক্ষা করেছেন, কারণ নারীকে তাঁরা দেবী বলে পূজা করতেন। আমাদের যুগেও পুরুষরা নারীকে সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখাতে কম যান না, গাড়ীতে কোন মহিলা উঠলে তাই তাড়াতাড়ি তাঁরা উঠে স্থান ছেড়ে দেন, তাঁর হাত থেকে রুমাল পড়ে গেলে না-বলতেই কুড়িয়ে দেন, কেউ কেউ আবার তার চেয়ে কয়েক ধাপ এগিয়ে নাগরিক জীবনের দায়িত্বপূর্ণ পদে, দেশের শাসন-ব্যাপারে নারীর অধিকারকে স্বীকার করতে গররাজি হন না। কিন্তু এই সমস্ত স্বীকারোক্তি এবং অধিকার দেওয়া-নেওয়ার লম্বা-লম্বা কথা সত্ত্বেও জাগতিক ক্ষেত্রে নারীর সার্থকতা ও স্থান অপরিবর্ত্তনীয়ই রয়ে গিয়েছে। সেদিনও সে যা ছিল আজও সে তাই আছে, পুরুষের সম্ভোগের বস্তু। এবং সে-কথা নারী নিজে খুব ভাল ভাবেই জানে।

"ঠিক এই অবস্থা ও ব্যবস্থা, কাজে ও কথার মধ্যে ঠিক এই রকম পার্থক্য আমরা দেখতে পাই ক্রীতদাস-প্রথায়। বহু মানুষের বাধ্যতামূলক পরিশ্রমের ফল ভোগ করবে মুষ্টিমেয় লোক, এই হলো ক্রীতদাস-প্রথা! মানুষকে শৃঙ্খলিত করে তার কাছ থেকে সস্তায় কাজ আদায় করে নেবার মোহ যত দিন না মানুষ মন থেকে বিসর্জ্জন দিতে পারবে, যতদিন না মানুষ এই প্রবৃত্তিকে ঘৃণ্য জঘন্য বলে বুঝতে পারবে, ততদিন পর্য্যন্ত পৃথিবীতে চলবে ক্রীতদাস-প্রথা। তবে হ্যাঁ, ক্রীতদাস-প্রথা আজ উঠে গিয়েছে, তার অর্থ হলো সভ্য মানুষ ক্রীতদাস-প্রথার বাইরের খোলসটাকে বর্জ্জন করেছে, যার ফলে আজ প্রকাশ্য বাজারে ক্রীতদাস কেনা-বেচা আইনতঃ দণ্ডনীয়। তাতে করেই মানুষ নিজেকে বুঝিয়েছে যে ক্রীতদাস-প্রথা পৃথিবী থেকে আজ উঠে গিয়েছে কিন্তু তারা ভুলেও একবার ভেবে দেখে না, সেদিনও যেমন ছিল, আজও সেই জঘন্য প্রথা ঠিক তেমনই আছে...যত দিন মানুষ পরের পরিশ্রমের সুযোগে স্বার্থসিদ্ধি করাকে ধর্ম্মসঙ্গত এবং ন্যায্য মনে করবে তত দিন পর্য্যন্ত এই প্রথা তেমনই থাকবে এবং তাকে প্রতিদিনের জীবনে কাজে লাগাবার লোকের অভাবও হবে না।

"নারীর দাসত্বপ্রথা সম্বন্ধে ঠিক এই একই অবস্থা। পুরুষের ভোগ্য সামগ্রীরূপে তার অস্তিত্বকে পুরুষ

ভাষ্য বলে স্বীকার করে নিয়েছে এবং এই স্বীকৃতির ওপর ভিত্তি করেই ঘটা করে তাকে ভোটের অধিকার দেওয়া হচ্ছে, সমাজের দায়িত্বপূর্ণ পদে তাকে অধিষ্ঠিত করবার আন্দোলন হচ্ছে। কিন্তু পুরুষ সমানভাবেই তাকে ভোগ্যা-বস্তু হিসাবে দখল করে আছে এবং সেই আদর্শ অনুসরণ করেই তার সমস্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করছে। শৈশব থেকে তার নারীত্ব বিকশিত হওয়া পর্য্যন্ত সময়ে তার মনে সেই ধারণাই অনুপ্রবিষ্ট করানো হচ্ছে। এই ভাবে তার রূপান্তর ঘটে চলছে। নারী হয়ে উঠছে নীতিহীন জঘন্য ক্রীতদাসী, পুরুষ হয়ে উঠছে নীতিহীন জঘন্য ক্রীতদাস-চালক। বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ে, হাসপাতালে, সর্ব্বত্র তাকে দিচ্ছি ভোটের অধিকার কিন্তু ভেতরে তার স্থান আগে যা ছিল তাই-ই থাকছে। আজ তাই প্রয়োজন তাকে বোঝান, সে যেখানে নিজেকে নিয়ে এসেছে, সে তার আসল স্থান নয়, দেখবে আবার সে নিজেকে উন্নততর জীব হিসাবে দেখতে শিখবে কিন্তু স্কুল আর কলেজের শিক্ষায় তার সে পরিবর্ত্তন আনতে পারবে না। এই পরিবর্ত্তন তখনই সম্ভব হবে, যখন পুরুষরা নারী সম্বন্ধে তাদের ধারণার পরিবর্ত্তন করতে পারবে, যখন নারীরাও নিজেদের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ভাবে ভাবতে শিখবে এবং এই বিষয়ে সাহায্য করতে পারে একটা পরিবর্ত্তিত সামাজিক আবহাওয়া, যেখানে নারী বুঝতে পারবে তার নারীত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশ হচ্ছে তার নিষ্কলুষ কৌমার্য্যে, যেটাকে আজ সে মনে করে হেলায় নষ্ট করবার জিনিস। যত দিন না এই মতের পরিবর্ত্তন ঘটছে, তত দিন যে-ধরণের শিক্ষাই তাকে দেওয়া হক না কেন, সে আজ যা আছে, তাই-ই থাকবে। তার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে, কি করে বহু পুরুষকে বিমুগ্ধ ক'রে তার মধ্যে থেকে তার সুবিধা মত একজনকে বেছে নেওয়া যায় এবং সে-ক্ষেত্রে একজন মেয়ে যে অপর মেয়ের চেয়ে অঙ্কশাস্ত্রে পণ্ডিত, বা তার চেয়ে ভাল এস্রাজ বাজাতে পারে, তাতে এক বিন্দু ইতর-বিশেষ কিছু হয় না। আজ-কাল নারী তখনই সুখী হয়, তার যা-কিছু কাম্য সবই মনে করে সে পেয়ে গিয়েছে, যখন সে দেখে যে, পুরুষকে বিমুগ্ধ করবার মতন তার শক্তি আছে। এই হয়ে আসছে এত কাল ধরে, এবং তাই-ই হয়ে চলবে। আমাদের সমাজের অবিবাহিত নারীদের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে আছে এবং বিবাহের পর এই ধারণা নিয়েই সে স্বামীর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। যখন সে কুমারী থাকে, তখন এই ধারণাই তার মনের মধ্যে সব চেয়ে বড় হয়ে থাকে; কারণ, যত বেশী পুরুষকে তার জালের মধ্যে ধরতে পারবে, ততই তার বেছে নেওয়ার সুবিধা হবে। বিবাহিত অবস্থাতেও এই ধারণা তার সমান বলবৎ থাকে, কারণ সে ভাবে, তাহলেই সে তার স্বামীর ওপর আধিপত্য বজায় রাখতে পারবে। একমাত্র একটি ঘটনায় এই ধারণা কিঞ্চিৎ ব্যাহত হয়, সাময়িক ভাবে তার মনের তলায় চলে যায়, সে ঘটনা হলো সন্তান-সম্ভাবনা। এবং তা-ও কোন-কোন ক্ষেত্রে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া ঘটে না, কারণ জননী যারা হয় তাদের মধ্যে রাক্ষসীও বহু থাকে, যারা নিজের সন্তান নিজে লালন-পালন করতে অস্বীকার করে এবং এ-সব ক্ষেত্রে সহায়রূপে আবার আবির্ভূত হন সেই ডাক্তার।

"আমার স্ত্রী প্রথম সন্তান-প্রসবের পর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এলেন মহামহিম ডাক্তার মহাশয়, তিনি নির্লিপ্ত বৈরাগ্যে রোগীকে স্পর্শ করে পরীক্ষা করে দেখলেন (তার জন্যে অবশ্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে হলো এবং সঙ্গে-সঙ্গে পারিশ্রমিকস্বরূপ দক্ষিণাও দিতে হলো) এবং আদেশ করলেন যে, রোগিণী যেন সন্তানকে স্তন্যদান না করেন। এই আদেশের ফলে একমাত্র যে উপায় ছিল, যা দিয়ে তিনি কোকেট্রির * হাতে থেকে সত্যিই মুক্ত হতে পারতেন, তা বন্ধ হয়ে গেল। সুতরাং আমাকে একটি ধাইকে ভাড়া করে নিযুক্ত করতে হলো নিজের ছেলেকে স্তন্য দেবার জন্যে। অর্থাৎ আর একটি নারীর দারিদ্র্য এবং অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাকে তার সন্তানের কাছ থেকে টাকা দেখিয়ে সাময়িক ভাবে টেনে নিয়ে আসা হলো এবং তার পরিবর্ত্তে তাকে মাথায় নতুন টুপী দিয়ে আর নতুন লেসের পোষাক পরিয়ে ভুলিয়ে রাখা হলো। এ কথা অবশ্য প্রসঙ্গত উল্লেখ করলাম। আসল কথা হলো, এই ভাবে জননীর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করার ফলে আমার স্ত্রীর মনের মধ্যে সুপ্ত কোকেট-পনা পূর্ণমাত্রায় জাগ্রত হয়ে উঠলো এবং তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া-রূপে আমার মধ্যে ঈর্ষ্যার জ্বালা শত গুণ বেড়ে উঠলো। তার জন্যে বিবাহিত-জীবনে এক মুহূর্ত্তেরও শান্তি পাইনি এবং ক্রমশঃ তার যন্ত্রণা এক রকম অসহ্য হয়ে উঠলো। এই যে ঈর্ষ্যার জ্বালা, এটা যে শুধু

---

* এই ফরাসী কথাটি ইংরেজী ভাষায় স্বাভাবিক ভাবেই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। মনে হয় বাংলা ভাষাতেও কথাটিকে সশরীরে গ্রহণ করাই ভাল। কারণ, কোকেট বলতে যে ধরণের নারীকে বোঝায় বাংলা ভাষায় এক কথায় তাকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

আমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তা নয়; আমি যে ভাবে আমার স্ত্রীর সঙ্গে বাস করছিলাম, সেই ভাবে যে-সব স্বামীকে তাদের স্ত্রীর সঙ্গে বাস করতে হয়, তাদের প্রত্যেককেই এই যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যেতে হয়।"

১১

"আমার বিবাহিত-জীবনে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও ঈর্ষ্যার এই উন্মত্ত জ্বালা থেকে মুক্ত হতে পারি নি। তার মধ্যে এমন একটা সময় গিয়েছে যখন মনে হয়েছে, এই যন্ত্রণায় যেন প্রাণান্ত হয়ে যাবে। আমার প্রথম সন্তান হওয়ার পর ডাক্তারের পরামর্শে স্ত্রী যখন সন্তান-পালনের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হলেন, সেই সময়টা ঠিক ঐ রকম প্রাণান্ত যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে আমাকে যেতে হয়।

"সেই সময়ে আমার ঈর্ষ্যা যে এতখানি তীব্র হয়ে ওঠে, তার দুটা কারণ ছিল। প্রথম হলো, এই ভাবে সন্তান-পালনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করার দরুণ আমার স্ত্রীর মধ্যে একটা অস্বস্তি দেখা দিল; যে-সব স্ত্রীলোক এই ভাবে স্বাভাবিক জীবনকে এড়িয়ে চলে, তাদেরই মধ্যে এই জাতীয় এক রকমের বিচিত্র অস্বস্তি জেগে ওঠে। দ্বিতীয় হলো, স্ত্রীকে যখন দেখলাম অনায়াসে এই রকম ভাবে জননীত্বের দায়িত্বকে সরিয়ে রাখতে, তখন স্বভাবতই আমার মনে অজ্ঞাত-সারেই একটা ধারণা জেগে উঠলো, তাহলে হয়ত স্ত্রীর দায়িত্বও সে এমনি অনায়াসে সরিয়ে রাখতে পারে। বিশেষ করে, তাঁর স্বাস্থ্য তখন সম্পূর্ণ অটুটই ছিল এবং পরে দেখেছি, ডাক্তারের আদেশ অগ্রাহ্য করে যখন তিনি তাঁর পরবর্ত্তী সন্তানদের স্তন্যদান করেছেন, তখন তাঁর স্বাস্থ্যের বিন্দুমাত্র কোন ক্ষতি হয়নি।"

বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, "আপনি দেখছি ডাক্তারদের বড় বেশী ভালবাসেন!"

কারণ, যখনি দেখেছি ভদ্রলোক ডাক্তারদের কথা উল্লেখ করেছেন, তখনি তাঁর কণ্ঠস্বর কেমন যেন তিক্ত হয়ে উঠেছে।

ভদ্রলোক উত্তর দিয়ে উঠলেন, "ভাল লাগা বা না-লাগার কথা নয়। আমার স্ত্রীর জীবন এই ডাক্তারেরাই সম্পূর্ণ ভাবে নষ্ট করে দিয়েছে এবং আজও এই মুহূর্ত্তে তারা শত-সহস্র এই রকম স্ত্রীর জীবন ভেঙ্গে চুরমার করে দিচ্ছে। সুতরাং কার্য্য ও কারণের এই সংযোগ অবজ্ঞা করতে পারি না। অবশ্য এ-কথা একান্ত স্বাভাবিক যে, উকীল বা অন্য বৃত্তিধারীদের মতন ডাক্তারেরাও তাদের জীবিকা অর্জ্জনের জন্যে চেষ্টা করবে। তা তাঁরা করুন কিন্তু তাঁরা যদি অপর লোকের সাংসারিক জীবনের মধ্যে মাথা না গলান তাহলে আমি আমার বাৎসরিক আয়ের অর্দ্ধেক খুশী হয়ে তাঁদের দিয়ে দিতে রাজী আছি এবং আমি বলতে পারি, আমার দেখাদেখি আরো অনেকেও তা দিতে পারেন। তাঁরা তাঁদের নিয়ে থাকুন, অপরকেও শান্তিতে থাকতে দিন। আমি বহু ঘটনা জানি, যেখানে তাঁরা অপারেশন করবার অছিলায়, হয় অজাত-ভ্রূণস্থ শিশুকে মেরে ফেলেছেন, না হয় তার জননীকে মেরে ফেলেছেন। অথচ কোন দিন কেউ এই সব হত্যা-কাণ্ডের জন্যে কোন জবাবদিহি চায় না, যেমন ধারা ইনকুইজিশনের নামে যে-সব হত্যাকাণ্ড হয়ে গিয়েছে, হত্যাকাণ্ড বলে কেউ তাদের গণনা করে না। কারণ, সেগুলো নাকি হয়েছে মানবতার কল্যাণের জন্যে! চিকিৎসক-বৃত্তিধারীরা জগতে যে কত অনাচার করে চলেছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। কিন্তু সে-সব অনাচারও অতি তুচ্ছ বোধ হয়, যদি তার সঙ্গে তুলনা করা যায়, যে নৈতিক অধোগতি, বস্তুতান্ত্রিকতার যে কালো ছাপ তারা নারীর মধ্যে দিয়ে জগতে ছড়িয়ে দিচ্ছে। যদি তাঁদের উপদেশ মতো কাজ করতে হয় ...তাঁরা সর্ব্বদাই উপদেশ দিচ্ছেন তোমার চারিদিকে যেখানে পা ফেলবে, সেখানে অসংখ্য মারাত্মক জীবাণু সব তোমাকে আক্রমণ করবার জন্যে ওঁত পেতে বসে আছে...তাহলে প্রতিবেশীর নিকটে যাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়...মানুষের কাছ থেকে মানুষকে অনবরত দূরে সরে যেতে হয়। যদি নিষ্ঠাসহকারে ডাক্তারের কথা মেনে চলতে হয়, তাহলে প্রত্যেক মানুষকে দূরে দূরে আলাদা উঠতে বসতে হয়, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে, এক মুহূর্ত্তের জন্যে হাতে কারবলিক এসিডের সিরিঞ্জ না থাকলে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। ইদানীং আবার শুনছি নাকি, তাঁরা আবিষ্কার করেছেন কারবলিক এসিডও নাকি অচল। এ-কথা অবশ্য কথাপ্রসঙ্গে উঠলো বলেই বলছি। কিন্তু আসল যে বিষ তাঁরা ছড়াচ্ছেন, তা হলো মানুষের নৈতিক অধোগতি—বিশেষ করে স্ত্রীলোকের। আজ যদি কেউ কাউকে বলে, বন্ধু, তুমি এলোমেলো ভুল জীবন যাপন করছো...সুন্দরতর জীবন কামনা কর। সেটা নিতান্ত সেকেলে অপ্রয়োজনীয় বাতুলতার মত শোনাবে। নিজেকে হোক অথবা অপরকে হোক, এই জাতীয় উক্তি আজ আর কেউ করে না। যদি তুমি অন্যায় জীবন যাপন কর, তার কারণ ডাক্তারেরা খুঁজে বার করে

তোমাকে বলে দেবে, তোমার স্নায়ু-কেন্দ্রের মধ্যে কোথায় কি-যেন গোলমাল হয়ে গিয়েছে; সুতরাং তোমাকে ভাল হতে হলে, বিশেষতঃ ডাক্তারের কাছে স্নায়ুর চিকিৎসার জন্যে আত্মসমর্পণ করতে হবে, তিনি তোমাকে ওষুধ লিখে দেবেন, এক শিলিং দিয়ে কিনে যথা-নির্দ্দেশ গ্রহণ করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। যখন দেখবে, তাতে অবস্থা আরো খারাপ হয়ে আসছে, তখন আরো ডাক্তার, আরো বড় ডাক্তার, আরো বেশী ওষুধ খেতে হবে। অপূর্ব্ব ব্যবস্থা!

"কিন্তু কথা উঠলো বলেই এই প্রসঙ্গ তুলতে হলো। আমার বক্তব্য হলো, আমার অন্য যে-সব ছেলেমেয়ে পরে হলো তাদের নিজে স্তন্যদান করার ফলে আমার স্ত্রীর শরীর ও মনের কোন ক্ষতি হওয়া দূরে থাকুক, রীতিমত ভালই হলো এবং আমার দিক থেকে যে ঈর্ষ্যার জ্বালায় আমাকে পুড়ে মরতে হচ্ছিল, এই সময় তার হাত থেকেও অনেকটা রেহাই পেলাম। যদি আমার স্ত্রী তা না করতেন, তাহলে হয়ত যে বিপদ শেষকালে একদিন ঘটলো, বহু আগেই তাহা সঙ্ঘটিত হয়ে যেতো। নবজাত শিশুরা তাঁকেও সেদিন বাঁচিয়েছিল, আমাকেও বাঁচালো। আট বছরের মধ্যে পাঁচটি সন্তান তিনি প্রসব করেন এবং প্রত্যেকটিকেই নিজে স্তন্যদান করেছিলেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করে উঠলাম, "এখন তারা সব কোথায়? তারা মানে আপনার ছেলেপুলেরা?"

হঠাৎ আমার দিকে আতঙ্কিত-দৃষ্টি তুলে ভদ্রলোক বলে উঠলেন, "ছেলেরা? আমার ছেলেরা?"

"ক্ষমা করবেন, হয়ত আমার এই প্রশ্নতে আপনার মনে কোন নিদারুণ স্মৃতিকে জাগিয়ে তুললাম!"

"না···তা নয়। তাদের মামী আর তাদের মামারা তাদের ভার নিয়েছিল। আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি তাদের দিয়েছি কিন্তু তার বদলে আমার নিজের ছেলেমেয়ের তত্ত্বাবধানের ভার তারা আমার উপর দিতে চায় নি। দেখছেন তো, আমি উন্মাদ, বাতিকগ্রস্ত লোক। আমি আজ তাদের কাছ থেকে দূরে, আরো দূরে সরে যাচ্ছি। আমি গিয়েছিলাম, কিন্তু তারা কিছুতেই তাদের আমার কাছে ছেড়ে দেবে না। যদি তারা আমার তত্ত্বাবধানে থাকতো, তাহলে তাদের আমি এমন ভাবে গড়ে তুলতাম যাতে তারা তাদের বাপ-মায়ের ছাঁচ এতটুকু না পায়। ঠিক সেই জিনিসটাই তারা চায় না। তারা চায় আমরা যেমনটি ছিলাম, তাদেরও ঠিক সেই রকমটি করে গড়ে তুলতে। নিরুপায়। তারা স্বভাবতঃই আমাকে অবিশ্বাস করবে, চেষ্টা করবে আমার কাছ থেকে আমার ছেলেদের সরিয়ে রাখতে। তা ছাড়া, এটাও অবশ্য ভেবে দেখবার বিষয়, তাদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবার মতন শক্তি আমার আছে কিনা। আমার ধারণা, আমার তা নেই। আজ আমি পঙ্গু···একটা ধ্বংসাবশেষ মাত্র। তবে আমি জানি···হাঁ···আমি জানি এবং তার মধ্যে কোন সন্দেহই নেই যে, লোকে যা বুঝতে দেরী করবে, আমি আজ তা অনায়াসেই বুঝতে পারবো। হাঁ, আমি জানি, আমার ছেলেমেয়েরা তাদের আশে-পাশে যে-সব বর্ব্বর অসভ্য ঘুরছে ফিরছে, তাদের মতন হয়ে উঠবে। আমি তাদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করেছিলাম···তিন বার··· দেখা করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারি নি। এখন আমি চলেছি, সকলকে ছেড়ে দূরে দক্ষিণ-অঞ্চলে, সেখানে আমার নিজস্ব একটা ছোট বাড়ী আর বাগান আছে। আজ আমি যা জেনেছি, আমি যা শিখেছি, হাঁ, আমি জানি, তা শিখতে, তা জানতে এখনো ওদের অনেক সময় লেগে যাবে। সূর্য্যে কতটা পরিমাণে লোহা আছে কিংবা অন্য সব গ্রহ-উপগ্রহে কোন্ ধাতুটা কতটা পরিমাণে আছে, তা জানা খুব বেশী কঠিন নয় আজ; কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশী কঠিন আজ, নিজেদের ব্যবহারের মধ্যে কোথায় আছে দুর্নীতির বীজ, তাকে খুঁজে বার করা। এই যে আপনি অনুগ্রহ করে আমার বক্তব্য শুনছেন, জানবেন তার জন্যে আমি কম কৃতজ্ঞ নই আপনার কাছে!"

১২

"এইমাত্র আপনি ছেলেদের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন···ভেবে দেখুন, তাদের সম্বন্ধেই কি সব ভ্রান্ত ধারণা চারদিকে প্রচার করা হয়! শিশুরা হলো ভগবানের আশীর্ব্বাদ, শিশুরা হলো জীবনের আনন্দ। এখন ব্যাপার যা দাঁড়িয়েছে, তাতে এই উক্তি সর্ব্বৈব মিথ্যা হয়ে গিয়েছে। একদা হয়ত তা চরম সত্য ছিল, কিন্তু আজ বহুদিন হলো, তা থেকে বিন্দু-বিন্দু করে সমস্ত সত্য নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে। আজ শিশুরা হলো শুধু যন্ত্রণার কারণ, তা ছাড়া আর কিছু নয়। অধিকাংশ গর্ভধারিণীই সে-কথা মনে-মনে উপলব্ধি করেন এবং অসতর্ক মুহূর্ত্তে কেউ-কেউ তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে বলেও ফেলেন। আমাদের সমাজে সচরাচর যে-কোন ছেলেমেয়ের মাকে জিজ্ঞাসা করুন, যাঁরা প্রাচুর্য্যের মধ্যেই জীবন যাপন করেন, তাঁর কাছ থেকে আপনি শুনতে পাবেন, পাছে ছেলেমেয়েরা অসুখে-বিসুখে মরে যায়, সেই ভয়ে তাঁরা ছেলেপুলে

যাতে না হয়, তাই চান ; যদি জন্মায়, তা হলে তাদের স্তন্যদান করতে বিমুখ হন এই ভয়ে যদি তার ফলে তাঁদের অতিরিক্ত মায়া পড়ে যায়, তার জন্যে হয়ত তাঁদের বহু অশান্তি ভোগ করতে হবে। কল্পনায় তাঁরা শিশুর আবির্ভাব চিন্তা করে সুখ পান, তার সেই ছোট্ট দুটি হাতের আবেদন, তার সেই ছোট্ট দুটি পায়ের টল্‌টল্‌ চলা···কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশী যন্ত্রণা তাঁরা বোধ করেন, ছেলেমেয়ের অসুখে বা মৃত্যুতে নয়, তাদের অসুখ হতে পারে বা তারা অকালে মরে যেতে পারে, সেই আশঙ্কায়। তাই দুদিকের পাল্লা ওজন করে বিচার করে দেখে তাঁরা স্থির করেন যে, ছেলেপুলে থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল এবং তাঁদের এই সিদ্ধান্ত তাঁরা প্রকাশ্য ভাবে বুক ফুলিয়ে, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন এবং জগৎকে বোঝাতে চান যে শিশু-প্রীতি বশতঃই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে তাঁরা বাধ্য হয়েছেন এবং এই অনুভূতির জন্যে তাঁরা রীতিমত একটা গর্ব্ব অনুভব করেন ; এই সিদ্ধান্তের জন্যে যেন তাঁদের উচ্চ প্রশংসাই পাওনা, এই রকম একটা ভাব দেখান। তাঁরা একবারও ভেবে দেখেন না যে, তাঁদের এই যুক্তির আড়ালে যা রয়েছে, সে হচ্ছে স্রেফ আত্ম-প্রীতি ; শিশু-প্রেমের গন্ধ তার মধ্যে নেই। শিশুর দরুণ যে অশান্তি তাঁরা পেতে পারেন, তারই আশঙ্কায় তাঁদের প্রেম সঙ্কুচিত হয়ে যায় এবং সেই আশঙ্কার বশেই তাঁরা যা পেতে চান তাকেই অস্বীকার করেন। যাকে ভালবাসি, তার জন্যে তাঁরা নিজেদের আত্মোৎসর্গ করতে পারেন না ; যে অনাগত প্রিয় আসছে, নিজের সুখের জন্যে উল্টে তাকেই অস্বীকার করেন। একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে, এটা ভালবাসা নয়, এটা হলো স্বার্থপরতা।

"অপরপক্ষে সম্ভ্রান্ত পরিবারের এই সব জননীদের স্বার্থপরতার জন্যে তাদের নিন্দা করতেও মন চায় না, যখন দেখি, ডাক্তারদের কৃপায় এই সব ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের জন্যে সত্যিই যে উদ্বেগ আর অশান্তি তাঁদের ভোগ করতে হয়। আজ এই মুহূর্ত্তে, যখনই মনে পড়ে আমার বিবাহিত-জীবনের প্রথম কয়েক বছর আমার স্ত্রী ছেলেপুলেদের নিয়ে যে কি অবিচ্ছেদ অস্বস্তির মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হয়েছিলেন, তখনই শিউরে উঠি। তাদের নিয়েই সর্ব্বক্ষণ তাঁর সব চিন্তা, সব ভাবনা জড়িয়ে থাকতো। সত্যি বলতে কি, তাকে মানুষের জীবন বলা যায় না, কুকুর-বেড়ালের জীবন। অষ্টপ্রহর এক অনাদি বিপদ ঘাড়ের ওপর চেপে বসে আছে, মাঝে মাঝে হয়ত কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় কিন্তু নিষ্কৃতি পেয়ে হাঁপ ছেড়ে উঠতে না উঠতেই আবার ঠিক তেমনি ভাবে ঘাড়ের ওপর চেপে বসে, মনে হয়, এই বুঝি সব শেষ হয়ে গেল। এই ভাবে মনে হয় যেন অনাদিকাল পর্য্যন্ত চলবে···একটু করে স্বস্তি পাওয়া আবার তার পর মুহূর্ত্তেই অধিকতর বিপদের মধ্যে ডুবে যাওয়া, ঠিক যেমন অবস্থা হয় সাগরে নিমজ্জমান ভগ্ন-তরী নাবিকের। মাঝে মাঝে মনে হতো, এই সমস্ত ব্যাপার বোধ হয় আমার স্ত্রীর তৈরী করা জিনিস, ছেলেদের ব্যাপার নিয়ে তিনি যে এতখানি নার্ভাস হয়ে পড়তেন, এটা শুধু আমার ওপর তাঁর আধিপত্য বজায় রাখার একটা ফিকির মাত্র, তার কারণ দেখেছি, ছেলেদের ব্যাপার নিয়ে যখনই কিছু গণ্ডগোল বাধতো, তখন বাধ্য হয়েই তাঁর কথামত সমস্ত ব্যাপারে আমাকে সায় দিতে হতো, সেই সূত্রে তাঁর আর আমার মধ্যে বহু দ্বন্দ্বের অবসান আপনা থেকেই ঘটে যেতো এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে তিনিই জয়ী হতেন। সেই জন্যে মনে হতো, তিনি যা কিছু বলতেন বা যা কিছু করতেন, সে-সব যেন একটা পূর্ব্ব-পরিকল্পিত সুনির্দ্দিষ্ট প্ল্যান অনুযায়ীই করতেন। কিন্তু আসলে আমার এ অনুমান ভুলই ছিল। ছেলেদের অসুখ-বিসুখ এবং স্বাস্থ্য নিয়ে তিনি রাতদিনই মরণান্ত অস্বস্তি আর যন্ত্রণার মধ্যে থাকতেন এবং তাতেই তাঁর জীবন যেন নিঃশেষে তিনি ক্ষয় করে ফেলতেন এবং সেই সঙ্গে আমার জীবনও, আমি মনে করতাম, এই সংসারের জন্যেই আমাকেও বিলিয়ে দিতে হচ্ছে। সাধারণ মা যেভাবে ছেলেপুলেকে খাওয়ানো দাওয়ানো, নাওয়ানো, শোয়ানোতে জীবনপাত করে, আমার স্ত্রীরও ছেলেপুলেদের জন্যে সেই তীব্র একাগ্র আসক্তি ছিল। পশুরাও ঠিক এমনি ভাবে তাদের শিশুদের আঁকড়ে থাকে। কিন্তু তাদের সঙ্গে মানুষের তফাৎ হলো, মানুষের মতন তাদের তো কল্পনা বা বিচারশক্তির কোন বালাই নেই। তারা তার হাত থেকে স্বভাবতঃই অব্যাহতি পেয়েছে। মনে করুন না, সামান্য মুরগীর কথা···তার বাচ্ছাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তার মনে এতটুকু দুশ্চিন্তার অবকাশ নেই, কিসে কি-ভাবে তার বাচ্ছারা অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, কি করে সম্ভাব্য ব্যাধির হাত থেকে বাচ্ছাদের মুক্ত রাখতে পারা যায়, সে-সম্বন্ধে তার বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই। যে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ বৃথাই আশা করে যে সে তার সন্তানদের রক্ষা করতে পারে, তার কোন চিন্তাই তার মনে আসে না, তাই তার বাচ্ছারা তার কাছে আতঙ্কের বস্তু নয়। তার স্বভাবে যা আসে তাই

দিয়েই সে তার বাচ্চাদের দেখা-শোনা করে এবং সেই জন্যেই বাচ্চাদের দেখা-শোনা করতে তার অন্তর থেকে ভাল লাগে এবং স্বভাবতঃই তার বাচ্চারা তাই তার কাছে শুধু আনন্দের জিনিসই হয়ে থাকে। যখন কোন বাচ্চা অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন তার কর্ত্তব্য কারুর কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করে আসতে হয় না, প্রকৃতি স্বয়ং জানিয়ে দেয় সে ক্ষেত্রে তার সহজ কর্ত্তব্য কি। তখন সে শুধু অসুস্থ বাচ্চাটিকে তার কাছে নিয়ে তার নিজের দেহের উত্তাপে তাকে উত্তপ্ত করে রাখে, নিজে কুড়িয়ে এনে তাকে খাওয়ায় এবং তাতেই সে জানে, তার যা করা কর্ত্তব্য সবই সে করেছে। যদি তার সমস্ত যত্ন সত্ত্বেও বাচ্চাটি মরে যায়, সে জিজ্ঞাসা করে না, কেন সে মরে গেল, কোথায় বা সে মরে গেল। কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে শুধু অস্পষ্ট চীৎকার করে, তারপর থেমে যায়। আবার যেমন চলছিল, তেমনি চলতে আরম্ভ করে।

"কিন্তু হতভাগ্য মানুষের পক্ষে, বিশেষ করে আমার স্ত্রীর পক্ষে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দাঁড়ায়। ছেলেদের অসুখ-বিসুখের ব্যাপার ছাড়া, তাদের নিয়ে নানান রকমের সমস্যা নিত্য-নতুন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে; যেমন ধরুন, কি করে তাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা যায়, কি করে তাদের মনকে সত্যি ভাবে গড়ে তোলা যায়। এই সব সমস্যা সম্পর্কে আমার স্ত্রীর আশে-পাশে রাত-দিন অসংখ্য মতামত সব ঘুরে বেড়াতো এবং এক-একটি সমস্যা নিয়ে কত যে পরস্পরবিরোধী মত ও বিধান তাঁদের শুনতে হয়, তা বলে শেষ করা যায় না। এই ভাবে ছেলেদের এই করা উচিত···এই এই জিনিস তার জন্যে চাই ···অন্য আর কিছু হলে চলবে না; কেউ হয় ত আবার বললেন, ওটা অচল···ওতে চলবে না···এখন এই নতুন নিয়ম চলেছে·· তাতে এটা-ওটা-সেটা চাই···আর তা না হলে চলবেই না···ইত্যাদি। ছেলেদের পোষাক পরানো, নাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, হাঁটানো, কতটুকু হাওয়া কি-ভাবে কখন তারা নেবে, প্রত্যেক সপ্তাহে এই নিয়ে একটা-না-একটা নতুন মতের দেখা মিলতো। যেন পৃথিবীতে শিশুরা এইমাত্র গতকাল থেকে জন্মাতে সুরু করেছে। হয়ত কোন ছেলের খাওয়া-দাওয়ার কোন গোলমাল হলো কিংবা হয়ত ঠিক সময়ে তাকে স্নান করানো হয় নি, তার জন্যে তার অসুখ হলো। আমার স্ত্রী ভাবতে সুরু করে দিলেন যে, তার জন্যে নিশ্চয়ই তিনি দায়ী; কারণ, যা তাঁর করা উচিত ছিল, যতখানি সাবধানতা তাঁর অবলম্বন করা উচিত ছিল তা হয়ত তিনি করেন নি।

"সুতরাং, ছেলেপুলেরা যখন সুস্থ অবস্থায় থাকতো তখন তাদের বিঘ্ন বলে মনে হতো; যখন তারা অসুস্থ হয়ে পড়তো তখন জীবন দুর্ব্বিসহ হয়ে উঠতো, মনে হতো যেন নরকে বাস করছি। আমরা একটা সিদ্ধান্ত ধরে নিয়েছি যে, ব্যাধি মাত্রই চিকিৎসা দিয়ে আরোগ্য করা যায় এবং তার জন্যে একটা আলাদা বিজ্ঞান আছে, যার কার্য্য হলো রোগ নিরাময় করা এবং সেই বিজ্ঞানের ভার যাঁদের ওপর অর্থাৎ যাঁরা সব রোগ নিরাময় করতে পারেন, তাঁরাই ডাক্তার নামে পরিচিত। অবশ্য প্রত্যেক ডাক্তারই যে সব রোগ সম্পূর্ণ ভাবে নিরাময় করতে পারেন, তা নয়; কিন্তু ডাক্তারদের মধ্যে যাঁরা সেরা, তাঁরা নাকি তা পারেন। তাই ছেলে-পুলের যদি অসুখ হয়, তাহলে সমস্যা দাঁড়ায় কি করে সেই সেরা ডাক্তারের সাহায্য পেতে পারা যায়। যদি তা সম্ভব হয়, তাহলেই ছেলে বাঁচলো। যদি আপনি সময় মত তাঁকে না পান, যদি ধরুন তিনি কোন দূর-অঞ্চলে বাস করেন, যেখান থেকে ঠিক-সময় মত তাঁকে আনানো সম্ভব হলো না, তাহলেই সব নষ্ট হয়ে গেল, ছেলেটির জীবন আপনাকে হারাতে হলো। ডাক্তার সম্বন্ধে এই যে অন্ধ-বিশ্বাস, এ শুধু যে আমার স্ত্রীরই ছিল, তা নয়; আমাদের সমাজের প্রত্যেক স্ত্রীলোকেরই এই বিশ্বাস। মাঝে-মাঝে এই জাতীয় খোস-গল্প স্ত্রীর কানে এসে পৌছত, 'আহা, বেচারা মিসেস্ এ-র তিন-তিনটে ছেলে মারা পড়লো, ডাক্তার স্লেড্‌কে ঠিক সময় মত আনানো হয় নি বলে···ডাক্তারের পরামর্শে পেট্রভদরা সময় থাকতে নিজেদের আলাদা করে নিতে পেরেছিল, যে যার আলাদা-আলাদা হোটেলে গিয়ে বাস করার দরুণ এ-যাত্রা ছোঁয়াচ থেকে তারা বেঁচে গেল···যারা আলাদা থাকার ব্যবস্থা করতে পারে নি, তাদের ছেলেপুলেরা মারা গেল···মিসেস্ অমুকের ছোট মেয়েটা খুব দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল, ভাগ্যিস্ ডাক্তারের কথা শুনে তারা দক্ষিণ-অঞ্চলে বায়ু-পরিবর্ত্তনে গিয়েছিল, তাই মেয়েটা আবার বেঁচে উঠলো।' এই সব কথা শোনার ফলে তাঁর ছটফটানি আরো বেড়ে উঠতো···ডাক্তার আইভান জাকারিয়াভিচ্‌কে যদি ঠিক সময় মত না পাওয়া যায়, যদি ঠিক সময় মত তাঁর ব্যবস্থা অবলম্বন না করা হয়,

তাহলে ছেলেমেয়েগুলোর অবস্থা কি হবে? কিন্তু ডাক্তার আইভান যে কি ব্যবস্থা কখন দেবেন সে-সম্বন্ধে কারুরই কোন স্থির ধারণা কিছু ছিল না, ডাক্তার আইভান নিজেই সে-সম্বন্ধে কি বলবেন তা তিনি নিজেই জানতেন না; কারণ তিনি নিজে বেশ ভাল ভাবেই জানতেন এবং এখনো জানেন যে, এ-সম্বন্ধে তিনি নিজে কিছুই জানেন না, সত্যিকারের কোন সঠিক সাহায্য তিনি করতে পারেন না; তাই একমাত্র কাজ যা তিনি করতে পারেন বা করেন, সেটা হলো কোন রকমে এটা-ওটা-সেটা করে তাঁর সম্বন্ধে রোগীর বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখা, যাতে করে লোকে অবিশ্বাস করতে পারে না যে, তিনি যা বলেছেন সে সম্বন্ধে তিনি নিজে কিছুই জানেন না।

"আমার স্ত্রী যদি পুরোদস্তুর পশু-ধর্ম্মী হতেন, তাহলে এই ব্যাপারে নিজেকে এতখানি উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলবার তাঁর কোন দরকারই হ'তো না। যদি তিনি পুরোদস্তুর মানুষই হতেন, তাহলে ভগবানের ওপর বিশ্বাস করেই তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন, যেমন থাকে অজ্ঞ চাষী-রমণীরা। বিপদ্ যখন ঘনিয়ে আসে, বড় জোর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তারা বলে, ভগবান দিয়েছেন, তিনিই আবার কেড়ে নিলেন, তাঁর বিধানই জয়যুক্ত হলো। এই বিশ্বাস যদি তাঁর থাকতো, তাহলে তিনি জানতেন যে, জগতের সব লোকের, তার মধ্যে তাঁর নিজের ছেলেমেয়েরাও আছে, মঙ্গল-অমঙ্গল মানুষের আয়ত্তের বাইরে ভগবানের হাতেই নির্ভর করছে এবং ছেলেমেয়েদের অসুখ নিবারণ করা বা তাদের মৃত্যু আটকানোর কোন ক্ষমতাই যে তাঁর নেই, এই কথাটা বোঝবার জন্যে তাঁকে তখন এই রকম ভাবে মস্তিষ্ককে উত্তপ্ত করতে হতো না। কিন্তু সে-বিশ্বাস তাঁর ছিল না। তাই তাঁর অবস্থা একান্ত জটিল হয়ে উঠেছিল। জগতের মধ্যে সব চেয়ে দুর্ব্বল অসহায় যে জীব-শিশু, যাদের সামনে-পেছনে অগণন বিপদ সর্বদাই হাঁ করে আছে, তাদের রচনা করবার ভার যেন তাঁর ওপরই আছে। সেই অসহায় শিশুদের সঙ্গে তীব্র আরণ্যক স্নেহ-প্রবৃত্তি দিয়ে তিনি বাঁধা পড়ে গিয়েছিলেন। এই অসহায় শিশুরা তাঁর স্নেহের আওতায় ছিল বটে, কিন্তু তাদের কি করে বিপদ্-আপদ্ থেকে দূরে রাখা যায়, তার উপায় তাঁর জানা ছিল না···সে-উপায় ছিল সম্পূর্ণ অজানা এমন সব লোকদের কাছে, যাদের পরামর্শ বা উপদেশ রীতিমত চড়া দাম দিয়ে কিনতে না পারলে পাওয়া যায় না, এমন কি অনেক সময় দাম দিয়েও পাওয়া যায় না, সুতরাং অস্থির হয়ে নিজেকে বিব্রত করে তোলা ছাড়া তাঁর আর গত্যন্তর ছিল না এবং তাই তিনি বিচ্ছেদবিহীন ভাবে করতেন। ঠিক যে-সময় আমাদের দুজনার মধ্যে ঝগড়ার মিটমাট হয়ে গিয়ে, নতুন করে শান্তিতে জীবন-যাপন করবার কোন নতুন ব্যবস্থা করছি···হয়ত একটা ভাল বই নিয়ে পড়তে বসবো। ঠিক সেই সময় হঠাৎ খবর এলো যে ভাসার অসুখ হয়েছে, মেরীর পেটের ভেতর ভয়ানক যন্ত্রণা হচ্ছে, আন্দ্রির গায়ে না মুখে চুলকুনির মতন কি-সব বেরিয়েছে, ব্যাস, সব ভেঙ্গে গেল···নতুন করে আবার সুরু হলো আত্মগ্লানির পালা। শহরের কোন্ অঞ্চলে কোথায় কোন্ ডাক্তার থাকেন, কোন্ বিশেষজ্ঞকেই বা ডাকা যায়, কোন্ ঘরেই বা অসুস্থ ছেলেটাকে আলাদা করে রাখা হবে, এই নিয়ে পড়ে গেল তাড়াহুড়ো আর দুশ্চিন্তা। তারপর সুরু হলো আবার সেই অনাদিচক্র, ইনজেক্‌শনের পর ইন্‌জেক্‌শন, ঘণ্টায় ঘণ্টায় টেম্পারেচর নেওয়া এবং লিখে রাখা, প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনের পর প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন, শিশির পর শিশি, ডাক্তারের পর ডাক্তার এবং এই পর্য্যায় শেষ হতে না হতেই, আবার হয়ত কোথা থেকে হঠাৎ আর একটা কিছু বিপত্তি মাথা-তুলে উঠতো,···এইভাবে শান্ত সাংসারিক জীবন যাপন করা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে উঠলো।

"তা ছাড়া, আর এক কারণে, ছেলেপুলেদের জন্যে আমাদের দুজনের ঝগড়া বাধতো। প্রত্যেকেরই এক একটি ছেলের প্রতি একটা আলাদা টান থাকতো এবং তাকে উপলক্ষ করেই দুজনের ঝগড়া জমে উঠতো। আমি সাধারণতঃ আমার বড় ছেলে ভাসাকে এই উপলক্ষে কাজে লাগাতাম, আমার স্ত্রী তাঁর দিক্ থেকে যখন সুযোগ পেতেন, আমার মেয়ে লীজাকে নিয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া বাধাতেন। ক্রমশঃ তারা যখন বড় হয়ে উঠতে লাগলো, তখন আমরা দুজনেই তাদের প্রত্যেককে যে-যার দলের লোক হিসাবে টানতে সুরু করে দিলাম; শত্রুপক্ষ এবং মিত্রপক্ষ হিসাবে তারাও আমাদের বেছে নিতে শিখলো এবং তাদের এই আনুগত্য বজায় রাখবার জন্যে আমরা দুজনেই চেষ্টার ক্রুটী করতাম না। তার ফলে, তাদের লালন-পালনের যে ক্রুটী ভয়াবহ ভাবে হতে লাগলো, আমাদের নিত্য সংগ্রামের মধ্যে সে-কথা একবারও আমাদের মনে পড়তো না। বড় ছেলেটি অধিকাংশ সময় আমার দলেই যোগদান করতো এবং আমার হয়েই তার মা'র সঙ্গে ঝগড়া করতো, মেয়েটি যেমন মা'র মতন দেখতে-শুনতে হয়েছিল, তেমনি আমার বিরুদ্ধে সব সময় তার মা'র পক্ষই গ্রহণ করতো।"

১৩

"এই ভাবে দিনের পর দিন চলতে চলতে ক্রমশঃ আমাদের সম্পর্ক প্রকাশ্য শত্রুতায় পরিণত হয়ে এলো। শেষকালে অবস্থা এ-রকম দাঁড়ালো যে, আগে যেখানে মত-বিরোধিতার জন্যে শত্রুতা জাগতো, এখন সেখানে শত্রুতার জন্যেই মত-বিরোধিতা জাগতে সুরু করলো। তিনি যে-কোন মতই প্রকাশ করুন না কেন, বা যে-কোন বাসনার কথাই জানান না কেন, আমি তার বিরোধিতা করবার জন্যে আগে থাকতেই প্রস্তুত হয়েই থাকতাম এবং তাঁর দিক্ থেকেও তিনি আমার সব ব্যাপারে অনুরূপ ব্যবস্থাই অবলম্বন করতেন। আমাদের বিবাহের চতুর্থ বৎসরে এক রকম মনে মনে আমরা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, পরস্পরকে বুঝে শান্তিতে জীবন যাপন করবার আর কোন আশা বা সম্ভাবনাই নেই, আর কোন দিন আমরা কোন বিষয়ে একমত হতে পারবো না ; সুতরাং তার জন্যে আর কোন চেষ্টা করার কোন প্রয়োজনই নেই। সংসারের প্রতি-দিনের অতি সাধারণ বিষয়ে আমরা দুজনে সব সময়েই বিপরীত মত পোষণ করতাম এবং প্রাণপণ চেষ্টা করতাম যে যার মতকে আঁকড়ে ধরে থাকতে। বিশেষ করে ছেলে-পুলেদের ব্যাপার নিয়ে। সে-সম্পর্কে আমার যে-সব ধারণা ছিল, আমি জানতাম, সেগুলো এমন কিছু অপরিহার্য্য নয়, যা ত্যাগ করলে আমার বিশেষ কোন ক্ষতি হবে, কিন্তু যেহেতু আমার স্ত্রী তার বিরুদ্ধ মত পোষণ করতেন এবং সেই সব মত অস্বীকার করা মানে পরোক্ষভাবে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করা, সেই জন্যেই আরো বিশেষ করে আমি তাদের আঁকড়ে থাকতাম। আর যাই কিছু তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে করি, ছেলেদের লালন-পালনের ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে কিছুতেই একমত হতে পারতাম না। তাঁর দিক থেকেও, তিনি ঠিক এইভাবেই তাঁর নিজের মতকে আঁকড়ে ধরে থাকতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, এই ভাবে আমাকে প্রতিবাদ করে তিনি যথাকর্ত্তব্যই পালন করে চলেছেন, আমিও নিজেকে ভাবতাম নির্দ্দোষ, আমার ব্যবহারিক চরিত্রে কোথাও বিন্দুমাত্র ত্রুটী নেই। যখন দুজনে একত্র থাকতে বাধ্য হতাম, তখন দুজনেই কেমন যেন একেবারে নীরব হয়ে যেতাম, এবং মূক-প্রাণীরা যেভাবে নীরবে কথাবার্ত্তা চালায়, অনেকটা সেইভাবেই আমরা পরস্পর পরস্পরকে বোঝাতে চেষ্টা করতুম।

"'এখন ক'টা বাজতে পারে' : 'শুতে যাবার সময় বোধ হয় হলো'...'আজ রাত্তিরে ডিনারে কি খাওয়া যেতে পারে ?' 'কোথায় এখন যাওয়া যায় ?' 'আজকের কাগজ কি পড়া হয়েছে ?' 'ডাক্তারকে কি ডেকে পাঠাতে হবে ?' মেরীর গলায় ব্যথা করছে'... এই জাতীয় কথোপকথনের বাইরে যদি কখন ভুলে এক-পা বেশী বাড়িয়েছি, অমনি ঝুড়ি-চাপা ঝগড়া মাথা তুলে ফোঁস্ করে উঠেছে। হয়ত সামান্য কফি খাওয়া নিয়ে, কিম্বা হয়ত টেবিলের ঢাকনাটা কিম্বা খেলার তাস-জোড়া তাতেই হাতাহাতি লেগে যেতে পারে ; কিংবা তিক্ত কথার বাণ দুদিক্ থেকে সমানে ছুটতে পারে। অর্থাৎ যে-সব জিনিসের সঙ্গে জীবনের বিশেষ কোনই যোগ নেই, তাতেই এই অনর্থক ঝগড়া জেগে উঠতে পারে। আমার নিজের দিক্ থেকে আমি বলতে পারি, আমার স্ত্রীর প্রতি ঘৃণায় আমার শিরা-উপশিরায় রক্ত টগবগ করে ফুটতো। অতি তুচ্ছ ব্যাপার, হয়ত তিনি চা ঢালছেন, কিম্বা কাজ করতে করতে পা দোলাচ্ছেন, খাবার জন্যে মুখে চামচে তুলছেন, ঠোঁট সরু করে চা আস্বাদন করছেন, তাতেই আমার মন ঘৃণায় ভরে উঠতো, যেন প্রত্যেকটি কাজের আড়ালে একটা মারাত্মক কোন অন্যায় তিনি করে চলেছেন। সে-সময় কিন্তু আমি লক্ষ্য করি নি যে, এই সব ঘৃণার লগ্নগুলি ঠিক নিয়ম করে পর্য্যায় মাফিক আসতো এবং যাকে আমরা বলি প্রেম, সেই প্রেমের সঙ্গে তার একটা ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।

"কোন্ সময়ে কতটা উত্তাপের মাত্রা হবে, তারও যেন একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম হয়ে গিয়েছিল। প্রেমের এক পালা হয়ে যাবার পরই আসতো ঘৃণা করার পালা। যে-বার প্রেমটা একটু বেশী হতো, সে-বার অনুবর্ত্তী ঘৃণার পালাটা দীর্ঘতর হতো। যে-বার ঘৃণার পালাটা তেমন জোরালো হতো না, পরবর্ত্তী প্রেমের পালাটাও সে-বার তেমন তীব্র হতো না। সে-সময় আমরা জানতাম না যে, এই প্রেম আর ঘৃণা, এ দুটিই হলো একই প্রবৃত্তির দুটো আলাদা দিক্ মাত্র।

"যদি সেদিন নিজেদের মনের অবস্থার কথা বুঝতে পারতাম, তাহলে জীবন-ধারণ করে থাকা এক ভয়াবহ ব্যাপার হয়ে উঠতো। কিন্তু সেদিন আমরা তা বুঝতে পারি নি। যারা অসংযত জীবন-যাপন করে, এইটেই হলো তাদের মুক্তির পথ, আবার এইটেই হলো তাদের শাস্তি। তারা ইচ্ছা করেই তাদের মনের সামনে একটা মেঘের কুণ্ডলী সৃজন করে তাদের জীবনের সেই ভয়াবহ দৈন্যকে আচ্ছাদন করে রাখবার জন্যে এবং আমরা সেইভাবেই নিজেদের চোখের উপর নিজেরাই ঠুলি তৈরী করে জীবন-যাপন করে

চলেছিলাম। জীবনের সেই নিষ্ঠুর বাস্তবতাকে ভুলে থাকবার জন্যে আমার স্ত্রী সমগ্র মন দিয়ে সংসারের কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে চেষ্টা করতেন, বাড়ীর আসবাব-পত্র, ছেলেমেয়েদের পোষাক, তাদের পড়াশোনা, স্বাস্থ্য, এই নিয়েই তিনি অষ্টপ্রহর ব্যস্ত থাকতেন। আমার দিক্ থেকেও নিজেকে ব্যস্ত রাখার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আমি ঠিক করে নিয়েছিলাম। সেটা হলো আমার নেশা। আমার প্রতিদিনের কাজের নেশা, খেলার নেশা, তাসের নেশা। এইভাবে আমরা দুজনেই যে-যার নিজের কাজে সারাক্ষণ ব্যস্ত হয়ে থাকতাম এবং যে-যার কাজের নেশায় যতখানি মেতে থাকতাম, ঠিক ততখানি পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণার চোখে দেখতাম।

"মাঝে-মাঝে আমি নিজে নিজেই বলতাম, 'তুমি তো মুখ ভার করে দিব্যি আছ, কিন্তু তুমি ভুলে গিয়েছ কাল সারারাত ধরে তুমি যে-সব কাণ্ড-কারখানা করেছ, তার দরুণ মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা আমাকে ভোগ করতে হয়েছে এবং এই মানসিক অবস্থায় এখন আমাকে কমিটীর সভায় যোগদান করতে যেতে হবে।' স্ত্রীর দিক্ থেকে, তিনি যে শুধু মনে-মনেই ভাবতেন, তা নয়, জোরগলায় প্রকাশ্য ভাবেই বলে উঠতেন, 'তোমার তো ভাবনা-চিন্তার কোন বালাই নেই, কাল সারারাত ছেলেটাকে নিয়ে একবারও চোখের পাতা এক করতে পারি নি।'

"স্নায়বিক দুর্বলতা, হিষ্টিরিয়া, হিপ্‌নটিজিম্ এবং ঐ জাতীয় ব্যাপার নিয়ে যে-সব নতুন-নতুন মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলো যে শুধুই একটা অবাস্তব অসম্ভব ব্যাপার, তা নয়, সেগুলো হলো রীতিমত পেজোমি, মারাত্মক উদ্ভুটে ব্যাপার। একথা আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি, যদি চারকোর কাছে আমাদের দুজনের ব্যাপার উপস্থিত করা হতো, তাহলে তিনি নিঃসন্দেহাতীত ভাবে আমার স্ত্রীকে বলতেন হিষ্টিরিয়া ব্যাধিগ্রস্ত এবং আমাকে বলতেন, 'এ্যাব্‌-নরম্যাল' অর্থাৎ আমার স্নায়ু আর প্রবৃত্তি-কেন্দ্রগুলি সাধারণ লোকের তুলনায় স্বতন্ত্র এবং তক্ষুণি তার চিকিৎসা সুরু করে দিতেন। আসলে কিন্তু ওষুধ দিয়ে সারাবার মত কোন ব্যাধিই আমাদের মধ্যে ছিল না।

"এইভাবে আমরা একটা অবিচ্ছিন্ন ধোঁয়া আর কুয়াসার মধ্যে বাস করে চলতে লাগলাম, কোথায় আছি, কেমন আছি, তা দেখবার বা বোঝবার কোন বাসনা আমাদের ছিল না। এবং পরে যে ঘটনা একদিন ঘটে গেল, সেদিন যদি তা না ঘটতো, তাহলে হয়ত বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত এই ধারণা নিয়েই বেঁচে থাকতাম যে, খুব উল্লেখযোগ্য কিছু না হলেও, ব্যক্তিগত ভাবে রীতিমত একটা নিষ্কলুষ জীবন আমি যাপন করে চলেছি। অন্ততঃ আমার মধ্যে অন্যায় কিছু নেই, এটা আমার স্পষ্ট ধারণাই ছিল। হীনতা আর জঘন্য মিথ্যার সমুদ্রতলে আমি অসহায় ভাবে ডুবে চলেছিলাম, তার কোন অস্তিত্বই তখন বুঝতে পারতাম না। আমরা দুজনে ছিলাম একই শৃঙ্খলে বাঁধা দুজন কারাবন্দীর মতন, তাদেরই মতন সেই শৃঙ্খলের টানে পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করতাম। পরস্পরের জীবনকে বিষাক্ত করে তুলতে পরস্পরের চেষ্টার কোন ত্রুটী ছিল না। কিন্তু সেদিকে আমরা দুজনেই চোখ বন্ধ করে থাকতাম। তখন আমি জানতাম না যে শতকরা নিরানব্বুই জন বিবাহিত লোক এই জাতীয় একই নরকবাস ভোগ করে। এই জাতীয় নরকে আমি যে নিজে ডুবে আছি, সেকথা আমি নিজেই তখন জানতাম না, তাই অপরের সম্বন্ধেও তা চিন্তা করতে পারতাম না।

"বাঁধা-ধরা সাধারণ জীবনই হোক কিংবা কোন অসংযত উচ্ছৃঙ্খল জীবনই হোক, তার মধ্যে লক্ষ্য করলে একটা আশ্চর্য্য জিনিস দেখা যায় ঘটনা-সংযোগের বিচিত্র নিয়ম। উদাহরণ-স্বরূপ ধরুন, ঠিক যে মুহূর্ত্তে স্বামি-স্ত্রীর জীবন পরস্পরের চেষ্টাতে দুর্ব্বহ হয়ে উঠছে, ঠিক সেই সময় দরকার পড়লো, ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থার জন্যে শহরে গিয়ে থাকার···সেখানে নাকি সুশিক্ষার অনুকূল ব্যবস্থা সব আছে।"

হঠাৎ কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে সে নির্ব্বাক্ হয়ে বসে থাকে। গলায় সেই অদ্ভুত আওয়াজ আবার শোনা যায়, শুনলে মনে হয় যেন চাপা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ! ট্রেন তখন একটা ষ্টেশনের কাছাকাছি এসে পড়েছিল।

হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, "ক'টা বেজেছে এখন?"

ঘড়িতে দেখলাম, তখন রাত দুটো।

জিজ্ঞাসা করে বসলো, "আপনার ক্লান্তিবোধ হচ্ছে না?"

বললাম, "না, আমার তো তা বোধ হচ্ছে না, তবে মনে হয় আপনি শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন।"

বললো "আমার যেন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছে···মাফ করবেন, সামনের ষ্টেশনে একটু নেমে জল খেয়ে আসবো···"

ষ্টেশনে এসে গাড়ী থামতেই ভদ্রলোক গাড়ী থেকে

নেমে পড়লেন। একলা বসে মনে মনে উল্টে-পাল্টে দেখছি, ভদ্রলোক এতক্ষণ যা বললেন এবং ভাবতে ভাবতে এমনি তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম যে, ভদ্রলোক কখন পেছনের দরজা দিয়ে আবার আসনে এসে বসেছেন, তা লক্ষ্যই করি নি।

১৪

"আমি জানি, আমার আসল বক্তব্য থেকে আমি বার বার সরে গিয়ে অন্য কথা বলছি, কিন্তু আসল কথা কি জানেন? সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে এতদিন ধরে··· আর এমন গভীরভাবে আমি চিন্তা করেছি যে, আজ অনেক ব্যাপার আমি সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখতে শিখেছি এবং সেই জন্যে সমস্ত ব্যাপারটা খুঁটি-নাটি শুদ্ধ আপনার কাছে তুলে ধরতে চাই।

"হাঁ, যে কথা বলছিলাম, গাঁ ছেড়ে আমাদের শহরে চলে আসতে হলো। যাদের মনে শান্তি নেই, তারা গাঁয়ের চেয়ে শহরের আলো-বাতাসে তবু খানিকটা জোর করে নিশ্বাস নিতে পারে। একশো বছর ধরে একজন লোক শহরে বাস করে যেতে পারে, অথচ একদিনের জন্যেও তার মনে হবে না যে, ভেতর থেকে বহু দিন হলো সে মরে গিয়েছে···তার গা থেকে পচা মাংসের গন্ধ বেরুচ্ছে। আত্মবিশ্লেষণ করে দেখবার সময় তার নেই, সর্ব্বদাই সে ব্যস্ত···সমাজে যাওয়া-আসা আছে, নানান্ রকমের কর্ত্তব্য আছে···নানান শিল্প-সামগ্রী, ছেলেমেয়ের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা, শতেক রকমের কাজ। এই সব ব্যাপারে অষ্ট-প্রহর লোক-জন আসা-যাওয়া করে, তার বদলে তাকেও সেই সব লোকের বাড়ী গিয়ে হাজির হতে হয়, অমুক লোকের সঙ্গে দেখা করা, অমুকের কি বক্তব্য তা শোনা···হাজার রকমের ভব্যতার দায়িত্ব। শহর মাত্রেই একজন না একজন স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি থাকেন, কোথাও বা একজনেরও বেশী থাকেন, সেই শহরে থেকে তাঁদের দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করবার চেষ্টা না করা নিদারুণ কর্ত্তব্যহানির মধ্যেই গণ্য হয়। তা ছাড়া, এটা-সেটা শরীরের নানান্ অসুবিধা আছে, শহরে যখন প্রত্যেক বিষয়ের একজন করে আলাদা বিশেষজ্ঞ আছেন, তখন তাঁদের কাছে পরামর্শ বা চিকিৎসার জন্যে না যাওয়া মূর্খতারই সামিল। নিজের না হয়, অন্ততঃ ছেলেদের জন্যেও তা করতে হয়। তার ওপর ছেলেদের স্কুলের মাষ্টার, গৃহশিক্ষক বা গভর্ণেস আছেন, তাঁদের সঙ্গেও দেখা-শোনা করতে হবে বৈ কি। এই সমস্ত ব্যাপারের যোগফল যা দাঁড়ায়, সেটা হলো একটা শূন্যগর্ভ বিরাট মিথ্যাচার।

"আমাদের প্রতিদিনের একত্র বাসের ফলে যে যন্ত্রণার সৃষ্টি হতো, ক্রমশঃ শহর-বাসের ফলে তার অনুভূতির তীব্রতা কমে আসতে লাগলো। গাঁ থেকে শহরে এসে বসবাস স্থাপন করার মধ্যে প্রথম-প্রথম একটা মধুর আনন্দের অবকাশ পাওয়া যায়, চিত্ত-বিনোদনের একটা নতুন উপায়···নতুন বাড়ীতে জিনিসপত্র গোছ-গাছ করা, সাজানো···এবং তার জন্যে গাঁ আর শহরের মধ্যে দিনকতক যাতায়াত করা, এর মধ্যে মানসিক যন্ত্রণার কথাটা আপনা থেকেই চাপা পড়ে যায়।

"শহরে আসার পরের বছরের শীতকালে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল, যা না ঘটলে হয়ত আমার পরবর্ত্তী জীবনের কোন ঘটনাই আর সম্ভব হতো না। আমার স্ত্রীর স্বাস্থ্য খুব ক্ষণ-ভঙ্গুর ছিল, তাই হতভাগা পাজী ডাক্তারগুলো তাঁকে নিষেধ করলো, যেন পুনরায় আর তিনি গর্ভবতী না হন এবং কি করে সেই আদেশ তিনি পালন করতে পারেন, তার ব্যবস্থাও তাঁকে শিখিয়ে দিলেন। সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে জঘন্য বিসদৃশ লাগলো এবং প্রতিবাদ করলাম কিন্তু আমার কথা বা পরামর্শ তিনি একেবারেই কানে তুললেন না··· ডাক্তারদের কথা তাঁকে মেনে চলতেই হবে। চাষীদের কাছে ছেলের প্রয়োজন আছে, যদিও ছেলেপুলে মানুষ করতে তাদের রীতিমত দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়, কিন্তু যেহেতু তাদের ছেলের দরকার, সেই হেতু তাদের স্ত্রী-সহবাসে কোন বাধা নেই। আমাদের পক্ষে, যাদের দু'-একটি ছেলে-মেয়ে হয়ে গিয়েছে, তাদের পক্ষে ছেলের আর কোন সার্থকতা নেই। পরিবর্ত্তে, নতুন সন্তান হওয়া মানে নতুন ঝঞ্ঝাট, অর্থের দিক্ থেকে তো বটেই। এক কথায়, তারা হলো একটা ভার। সুতরাং আমরা যে জীবন যাপন করি, তার কোন সার্থকতা নেই। হয়, কৃত্রিম উপায়ে ছেলে হওয়ার দায় থেকে মুক্তি অর্জ্জন করতে হবে, নতুবা তার চেয়ে যা অধিকতর কুৎসিত, তাদের মনে করতে হবে দুর্ভাগ্য বলে, শুধু আমাদের দায়িত্বহীনতার ফল। কিন্তু এই কথা চিন্তা করার কোন অধিকারই আমাদের নেই। নৈতিক বিচারের দিক থেকে আজ আমরা এতদূর অধঃপতিত হয়েছি যে, নৈতিক অভাবের কোন বোধই আমাদের নেই। আমাদের সমাজের অধিকাংশ শিক্ষিত লোক উপরিউক্ত মতবাদের কাছে এরকম ভাবে আত্মসমর্পণ করেছে যে, তাঁরা অন্তরে বিবেকের বিন্দুমাত্র প্রতিরোধ অনুভব করেন না। এ সম্পর্কে কোন অনুশোচনার সম্ভাবনাও আশা করা যায় না; কারণ,

আমাদের জীবনে বিবেক বলে কোন জিনিসের অস্তিত্বই আজ নেই। বিবেক বলতে আমরা একমাত্র জিনিস যা আজ বুঝি, সেটা হলো জনমতের চেতনা, ফৌজদারী আইনের গণ্ডীর মধ্যে যা আবদ্ধ। সুতরাং এক্ষেত্রে দুজনের মধ্যে কারুরই অনুশোচনায় বিদ্ধ হবার কোন কারণ থাকে না। সমাজে মুখ দেখাতে কারুরই লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই। কারণ সকলেই এই কাজ করে থাকেন।...মিসেস্ পি...আইভান জেকেরেভিচ...সকলেই। ফৌজদারী আইনকেও ভয় করবার কিছু নেই। গাঁয়ের কুৎসিত মেয়েগুলো আর যারা সৈনিকের স্ত্রী, তারাই তাদের নব-জাত শিশুদের পুকুর বা পাতকুয়ার মধ্যে বিসর্জ্জন দেয় এবং এই জাতীয় ভয়ঙ্কর চরিত্রের মেয়েদের আইনতঃ সাজা দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়, নিশ্চয়ই খুব উচিত বিধান। কিন্তু আমরা শহরে, এ-সব ব্যাপার রীতিমত ভব্যভাবে করি, সম্মান বজায় রেখে করি!

"দেখতে-দেখতে আরও দু'বছর কেটে গেল; তার মধ্যে দেখা গেল, ডাক্তাররা যে-সব ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বলেছিলেন, তার ফল ফলতে আরম্ভ করেছে। আমার স্ত্রীর চেহারা আগের থেকে ঢের ভাল হলো; আগের থেকে ঢের বেশী মোহনীয় হয়ে উঠল তাঁর রূপ, শীতান্ত দিনের মাধুর্য্যের মত। সে-কথা তিনি নিজেও জানতেন এবং সেই জন্যে নিজের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা একটা বিশেষ পরিবর্ত্তিত আকার ধারণ করছিলো। এক ধরণের রূপ আছে, যা আকর্ষণ করে, অপরের অন্তরে আলোড়ন এনে দেয়, আমার স্ত্রীর মধ্যে সেই রূপ ফুটে উঠতে লাগলো। ত্রিশ বছরের যে নারী, সু-খাদ্য ও জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্যে যে গড়ে ওঠে, যাকে সন্তান-পালনের কোন ঝামেলা বা দায়িত্ব ভোগ করতে হয় না, তার মধ্যে একটা বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ফুটে ওঠে, আমার স্ত্রীর মধ্যেও তা দেখা দিল। তিনি যেখানে যেতেন, সেখানেই চুম্বকের মতন পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। এতকাল ধরে যে খেয়ালী ঘোড়াকে লাগামের টানে বয়ে আসতে হয়েছে, হঠাৎ যদি তার লাগাম সরিয়ে নিয়ে তাকে দু'বেলা বসিয়ে রীতিমত ভাবে খাওয়ানো-দাওয়ানো হয় এবং আস্তাবলে তাকে অলস করে রেখে দেওয়া হয়, তার যে অবস্থা হয়, আমার স্ত্রীরও সেই রকম অবস্থা এসে দাঁড়ালো। আমাদের শতকরা নিরানব্বুই জন স্ত্রীলোকের ওপর যেমন কোন সুখদ-শাসনের ব্যবস্থা নেই, আমার স্ত্রীর ওপরও তেমনি কোন শাসনের বন্ধন আর রইলো না। সে-কথা বুঝতে পারার সঙ্গে-সঙ্গে মন আতঙ্কে ভরে উঠলো।"

১৫

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক জানলার কাছে এসে দাঁড়ালেন।

'ক্ষমা করবেন,'—আপনার মনে যেন বলে ওঠেন। তারপর তিন-চার মিনিট ধরে সেই অবস্থায় জানালার বাইরে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার আমার সামনের আসনে এসে বসলেন।

মুখের দিকে চেয়ে মন হলো যেন হঠাৎ মুখটা বদলে গিয়েছে। চোখে এক সকরুণ দৃষ্টি, ঠোঁটের কোণে এক অদ্ভুত ধরণের হাসি ফুটে উঠেছে।

"একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু আমার কাহিনী আমি বলবোই। এখনো যথেষ্ট সময় আছে, এখনো ভোর হয় নি।"

একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে ভদ্রলোক আবার বলতে আরম্ভ করলেন, "হাঁ, আমার স্ত্রীর দিন-দিন শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগলো। যেদিন থেকে সন্তান-হওয়া বন্ধ করেছিলেন, সেদিন থেকে একটু স্থূলকায়াও হয়েছিলেন এবং তাঁর সেই ব্যাধি—ছেলেমেয়েদের নিয়ে অষ্টপ্রহর দুর্ভাবনায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকা—সেটাও অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগলো। মনে হলো তিনি যেন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

"হাঁ, তাঁকে দেখে তখন মনে হতো, যেন তিনি সচেতন হয়ে উঠেছেন, যেমন সচেতন হয়ে ওঠে মাতাল পান-উন্মত্ত রাত্রির পরের দিন সকালবেলা, বুঝতে পারে না সুরার অচেতন অবস্থার মধ্যে দিয়ে কখন বিধাতার একটা সম্পূর্ণ রাত্রি অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে! তেমনি যেন কিসের উন্মাদনায় তিনি ভুলে গিয়েছিলেন একটা সুন্দর অস্তিত্বের সম্ভাবনার কথা...যে-সম্ভাবনা সেই মুহূর্ত্তে তাঁর ধারণায় তাঁর জীবনে সত্য হয়ে উঠেছিল। 'আমি এবার থেকে চেষ্টা করবো যাতে এই সুখ-সম্ভাবনা আর ফাঁকি দিয়ে চলে যেতে না পারে: সময় অতিক্রত ছুটে চলেছে...এ সুযোগ চলে গেলে আর সুযোগই আসবে না।' আমি অন্ততঃ তখন মনে করতাম যে, আমার স্ত্রী ঐ রকমই কিছু ভাবছেন বা অনুভব করছেন। এ ছাড়া যে তাঁর অন্য কোন ভাবনা-চিন্তা হতে পারে না, সে সম্বন্ধে আমার স্থির বিশ্বাস জন্মে যায়। কারণ যে-শিক্ষা তিনি পেয়ে এসেছিলেন, তাতে মনে একমাত্র ধারণাই জন্মাতে পারে যে, জগতে কামনা করবার মতন একটিমাত্র

জিনিস আছে এবং সে-জিনিস হলো তথাকথিত "প্রেম"। বিবাহের মধ্যে দিয়ে তিনি অবশ্য সেই প্রেমের কথঞ্চিৎ আস্বাদ পেয়েছিলেন, কিন্তু সেটা তাঁর কামনার তুলনায় তেমন কিছু বেশী নয়···যতটা পাওয় যেতে পারে বলে নিজের মনকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, নিশ্চয়ই তার চেয়ে কম। তা ছাড়া বিবাহের মধ্যে দিয়ে আসার দরুণ তাঁকে [illegible] ব্যর্থতা, বহু আশা-ভঙ্গের বেদনা এবং যন্ত্রণা-ভোগ করতে হয়েছিল, বিশেষ করে সন্তান হওয়ার যন্ত্রণা যা তাঁর কুমারী-স্বপ্নের মধ্যে ছিল না। শেষোক্ত যন্ত্রণায় তিনি ক্লান্ত এবং পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন; অবশেষে সদাশয় ডাক্তারেরা এসে মাতৃত্বের যন্ত্রণা থেকে কি করে অব্যাহতি লাভ করা যায়, তা তাঁকে শিখিয়ে দিয়ে বাঁচালেন। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে ডাক্তারদের ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন এবং সেই ব্যবস্থার ফলে কালক্রমে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠলেন। পুনরুজ্জীবিত হয়ে বুঝলেন, বেঁচে যদি থাকতে হয়, তাহলে একমাত্র প্রেমের জন্যই বেঁচে থাকতে হবে।

"কিন্তু ঈর্ষ্যা আর ঘৃণায় যে স্বামীর সঙ্গ তিক্ত-বিষাক্ত হয়ে উঠেছে, সে-স্বামীর সঙ্গে প্রেমের সম্ভাবনা তিনি কল্পনাই করতে পারলেন না, তাই তিনি আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখতে লাগলেন, নতুন কোন প্রেমের, যে প্রেম হবে তাঁর মতে আদর্শ বিশুদ্ধ প্রেম। একটা অনির্দ্দিষ্ট আশার অস্পষ্ট কামনায় তিনি চারদিকে কৌতূহলী হয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন, অন্ততঃ আমি তখন তাই মনে করেছিলাম। আমি এই ব্যাপারটা স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করেছিলাম এবং তার দরুণ আমার মনে যে অস্বস্তির সৃষ্টি হলো, তাকে নিবারণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। বিশেষ করে যখন জানলাম, সেই সময় তিনি যখনি কোন সুযোগ পেতেন, তখনি অপর লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় এই জাতীয় কথারই উল্লেখ করতেন, উদ্দেশ্য যাতে সেই-সব কথা অপর লোকের মারফৎ আমার কানে এসে পৌছয়। অথচ আমি জানি, তার এক ঘণ্টা আগে তিনি ঠিক তার উল্টো কথাটাও বলতে পারতেন! উদাহরণ-স্বরূপ তিনি প্রায়ই বলতেন, খানিকটা রহস্য করে, খানিকটা গম্ভীর ভাবে, যে ছেলেপুলেদের জন্যে মায়ের এই আকুতি, এটা একটা নিছক ভ্রান্তি, বেঁচে থাকার সম্পূর্ণ সুখের স্বাদ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে ছেলেদের জন্যে নিজের যৌবনকে বিসর্জ্জন দেওয়া দুর্ভাগ্যেরই কথা। ছেলেপুলেদের দেখাশোনা করার আগ্রহও সেই সময় তাঁর কমে আসতে লাগলো ···তার বদলে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত শ্রীবৃদ্ধির দিকেই বেশী নজর দিতে লাগলেন, যদিও সে-ব্যাপারটা চেষ্টা করতেন সংগোপন করে রাখতে। সেই সঙ্গে নিজের সাধ-আহ্লাদ সম্বন্ধেও তিনি রীতিমত সজাগ হয়ে উঠলেন; যৌবনে যে-সব বিদ্যা আয়ত্ত করতে পারেন নি, এখন আবার নতুন করে তার দিকে নজর দিলেন। উদাহরণ-স্বরূপ উল্লেখ করতে পারি, তিনি আবার নতুন করে সঙ্গীত-বিদ্যার অনুশীলনে মন দিলেন, এক সময়ে তিনি অল্প-বিস্তর কৃতিত্বের সঙ্গে পিয়ানো বাজাতে পারতেন। আমার জীবনের সেই মহা বিপত্তির প্রথম সূত্রপাত এই ব্যাপার থেকেই শরীরী হয়ে উঠলো।"

হঠাৎ আবার জানালার দিকে ফিরে কিছুক্ষণ বাইরে শূন্য ক্লান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো; বেশ বুঝলাম, মনে-মনে চেষ্টা করছে আত্ম-সংবিৎ বজায় রাখবার জন্যে।

"হাঁ, এই উপলক্ষেই সেই ব্যক্তিটি রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন।"

কথা বলতে গিয়ে কথা জড়িয়ে যেতে লাগলো, গলার ভেতর থেকে দুবার শুনলাম তাঁর সেই বিচিত্র আওয়াজ। আমি বেশ বুঝতে পারলাম, সেই লোকটির নাম উচ্চারণ করতে অথবা তার সম্বন্ধে উল্লেখ করতে তাঁর রীতিমত কষ্ট হচ্ছে। ভেতর থেকে কি-যেন একটা বাধা তাঁকে নীরব করে রাখতে চাইছিল, কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় সে-বাধার বেড়া ভেঙ্গে বুক বেঁধে আবার বলতে শুরু করলেন, "আমার মতে লোকটা অত্যন্ত হীনপ্রকৃতির ছিল। আমার জীবনে সে যে-বিপর্য্যয় আনে, তার জন্যেই যে তাকে এই ভাবে দেখছি, তা নয়, সত্যিই লোকটা স্বভাবতই হীন-প্রকৃতির ছিল। সেই লোকটা যে এতখানি অপদার্থ ছিল, তা থেকে শুধু বোঝা যায় যে, আমার স্ত্রীও কতখানি কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানহীন হয়ে পড়েছিলেন। যদি সে-লোকটা না আসতো, আমি জানি, আর এক জন কেউ হয়তো জুটতো। ব্যাপারটা যে এই রকম হবে, তা ভাগ্যেই নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল।"

আবার কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে ভদ্রলোক নীরব হয়ে যায়।

"লোকটা সঙ্গীত নিয়ে চর্চ্চা করতো···বেহালা বাজাতো···খানিকটা ওস্তাদ ধরণের, খানিকটা সৌখীন বাজিয়ে। তার বাবা জমিদার-শ্রেণীরই লোক, আমার বাবার প্রতিবেশী ছিল···বহু দিন আগেই তিনি যথা-সর্ব্বস্ব খুইয়ে নিঃসম্বল হয়ে গিয়েছিলেন। লোকটার

তিন ছেলে; প্রত্যেক ছেলের জন্যে এ-দিক্ ও-দিক্ থেকে তিনি আলাদা আলাদা বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন। সব চেয়ে ছোট ছেলেটাকে প্যারিসে তার ধাই-মা'র কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেখানে ছেলেটা একাডেমী অফ্ মিউজিকে ভর্ত্তি হয়; কারণ তার নাকি সঙ্গীতের দিকে বিশেষ ঝোঁক ছিল। সেখান থেকে পাস করে ষ্টেজের কন্সার্টে বেহালাবাদকরূপে জীবিকা অর্জ্জন করতো। আসলে লোকটা ছিল যাকে বলে…"

একটা অতি ক্রুর মন্তব্য করতে গিয়ে পদ্নিশেফ্ বহু কষ্টে আত্মসংবরণ করে নিলো এবং এই আত্মসংবরণের চেষ্টার ফলে ঝড়ের মত দ্রুত সে আবার বলে চললো, "আমি অবশ্য জানতাম না, লোকটা সে-সময় কি ভাবে জীবন-যাপন করতো; শুধু এইটুকু জানি যে, সেই বছর সে রাশিয়ায় ফিরে আসে এবং আমার বাড়ীতেই তার সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়। বাদামের মতন গড়ন, ভিজে-ভিজে চোখ, লাল রঙের মুখ, ঠোঁটের কোণে হাসি…মোম দিয়ে সরু-করা গোঁফ, হালফ্যাসানে মাথার চুল কাটা; মিষ্টি-মিষ্টি ভালমানুষী মুখ, যে-ধরণের মুখের চেহারা দেখে মেয়েরা বলে, দেখতে মন্দ নয়। ছিপছিপে গড়ন, বেমানান নয়। অবস্থা বুঝে লোকটা একেবারে অন্তরঙ্গ হয়ে যেতে পারতো, অথচ যদি দেখতো যে তেমন কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না বা যাবে না, তক্ষুণি কিন্তু নিজের মর্য্যাদা বজায় রেখে থেমে যাবার কায়দাও ষোল-আনা জানতো। প্যারিসের হালফ্যাসান অনুযায়ী পায়ে বোতাম-আঁটা বুট, গলার নেকটাই সব সময়ই উৎকট কড়া রঙের অর্থাৎ আমার বক্তব্য হলো, বিদেশীরা প্যারিসে গিয়ে যে-সব ছোটখাট বৈশিষ্ট্য আত্মস্থ করতে প্রলুব্ধ হয়, লোকটা পুরামাত্রায় তা নিজের অঙ্গে বহন করে আনে। মেয়েরা এই সব ফ্যাসানের নতুনত্বে অতি সহজেই আকৃষ্ট হয় এবং তাদের চোখে এই সব ফ্যাসানধারীরা উন্নততর জীব বলে প্রতিভাত হয়। ব্যবহারিক দিক্ থেকে লোকটার মেজাজ সব সময়ই খুব নরম আর মোলায়েম ছিল। পুরানো নজীর উল্লেখ করে কথা বলবার একটা কায়দা লোকটার ছিল…টুকরো-টুকরো কথা এমন ভাবে অসমাপ্ত রেখে বলতো যে, তার বাকিটা আপনি যেন অনায়াসে তার হয়ে বলে দিতে পারেন, সে যে সম্বন্ধে কথা বলছে, আপনি যেন সে-সম্বন্ধে সব কিছুই জানেন, তার টুকরো কথা থেকে যেন বাকি কথাগুলো আপনা থেকে আপনার মনে পড়ে যাচ্ছে। এই সেই ব্যক্তি, যে তার সঙ্গীত নিয়ে আমার পথে এসে দাঁড়ালো এবং এই হলো আমার পরবর্ত্তী জীবনের সমস্ত ঘটনার মূল কারণ।

"আদালতে আমার বিচারের সময়, মামলার সমস্ত ব্যাপার এমন ভাবে জুড়ে সাজানো হয়েছিল যাতে বোঝা যায় যে, আমি ঈর্ষ্যার জ্বালায় আমার স্ত্রীকে খুন করেছিলাম। কিন্তু আমি বলছি তা নয়—এর মধ্যে আরো অনেক জিনিস আছে, যেগুলোকে বাদ দিয়ে ধরা যায় না। বিচারকদের মনে ধ্রুব বিশ্বাস হয়ে যায় যে, আমার স্ত্রী আমার প্রতি অন্যায় করেছিলেন এবং আমার লাঞ্ছিত আত্মসম্মান-বোধকে রক্ষা করবার জন্যেই আমার স্ত্রীকে আমি খুন করতে বাধ্য হই এবং সেই জন্যেই আমি মুক্তি পাই। বিচারের সময় আমার দিক্ থেকে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলাম, সত্যি যা ঘটেছিল অকপটে তাই প্রকাশ করতে; কিন্তু আমার সেই প্রচেষ্টাকে তাঁরা অন্য অর্থ করলেন, তাঁরা ভাবলেন আমার স্ত্রীর সুনামকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার বাসনা থেকেই আমি সেই সব কথা বলছি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, সেই বাজিয়ে লোকটার সঙ্গে আমার স্ত্রীর সম্পর্ক, সত্যি-মিথ্যা যাই ঘটে থাকুক না কেন, তাতে আমার বা আমার স্ত্রীর কিছুই যায় আসেনি। আসল যে জিনিসটা এর মধ্যে ছিল, তা আপনাকে ইতিপূর্ব্বে বলেছি। এবং সেটি হলো, কার্য্য-কারণের সংযোগে আমার আর আমার স্ত্রীর মাঝখানে যে অতলস্পর্শী গহ্বর প্রতিনিয়ত গভীরতর হয়ে উঠছিল, তারি সৃষ্টি। পরস্পরের ঘৃণার সেই নিদারুণ ভয়াবহ মানসিক উত্তেজনার মধ্যে সামান্য একটা স্ফুলিঙ্গই এই অগ্নিকাণ্ডের পক্ষে যথেষ্ট হতো। সেই সময় তাঁর সঙ্গে আমার ঝগড়া প্রায় নিত্য ঘটনা হয়ে উঠেছিল এবং প্রত্যেকবারই তা বীভৎসতর হয়ে দেখা দিত এবং প্রত্যেকবারই তার সাময়িক পরিসমাপ্তি ঘটতো তীব্র কামের উৎপীড়নে। যদি সে লোকটা আমাদের মাঝখানে না আসতো, অন্য যে-কোন লোক এলেও অভিনয় শেষ পর্য্যন্ত এমনি নিখুঁতই হতো। ঈর্ষ্যার উপলক্ষ যদি না থাকতো, অন্য যে-কোন উপলক্ষ আবিষ্কার করলেও চলতো। আমি যে-কথা জোর করে বলতে চাইছি, সেটা হলো যে-সব স্বামী আমার মতন জীবন যাপন করে, শীগ্গিরই হোক অথবা দেরীতে হোক, একদিন না একদিন তাদের হয় আত্ম-বিলাসে গা ভাসিয়ে দিতে হবে, নতুবা স্ত্রীদের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে বাস করতে হবে, নইলে হয় আত্মহত্যা করে মরতে হবে, নতুবা আমি যা করেছি তাই করতে হবে অর্থাৎ স্ত্রীদেরই খুন

করতে হবে। যদি এমন কোন লোক দেখতে পাওয়া যায়, তাদের জীবনে এর কোনটাই করবার দরকার হয় নি, তাহলে বুঝতে হবে, তারা হলো ব্যতিক্রম, কালেভদ্রে সে-রকম দু'-একটা উদাহরণ হয়ত্ দেখতে পাওয়া যায়। যে ভাবে ঘটনার পরিসমাপ্তি আমি ঘটাই, তার আগে বহুবার আমি আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করেছিলাম, আমার স্ত্রীও কয়েকবার বিষ-খাবার আয়োজন করেছিলেন।"

১৬

"শেষ বিপত্তি ঘটবার ঠিক আগে ঐ জাতীয় একটা ব্যাপার ঘটে যায়। ঝগড়া-ঝাঁটি মিটমাট হয়ে যাবার সময়, একবার আমরা খুব অল্প সময়ের জন্যে একটা শান্তির চুক্তি করে বসবাস করছিলাম। সেই শান্তি-ভঙ্গের কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে না পেয়ে আমরা একটা কুকুরকে নিয়ে একদিন আলোচনা করছিলাম; কুকুরটা, আমি বললাম, একজিবিশনে একটা মেডেল পেয়েছিল। তিনি প্রতিবাদ করে বললেন, না মেডেল পায় নি, তবে ভাল বলে একটা সার্টিফিকেট পেয়েছিল এবং তাই থেকেই আবার দুজনের মধ্যে ঝগড়া সুরু হয়ে গেল...এক বিষয় থেকে আর এক বিষয় নিয়ে, প্রত্যেক পদে পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পরের অভিযোগও বেড়ে চললো। 'হাঁ, হাঁ, সে কথা আমি অনেক কাল আগেই জেনেছি...জানি; আজকাল তুমি তো ঐ রকম বলবেই।' 'না, আমি বলি নি, বলেছ তুমি নিজে!' 'না, আমি ও-সব কিছুই বলি নি।' 'তাহলে বলতে চাও, আমি মিথ্যাবাদী?' ইত্যাদি ইত্যাদি। এইভাবে ব্যাপারটা এমন উগ্র হয়ে উঠলো যে, আর এক মিনিট পরেই, মনে হলো, এমন হাতাহাতি সুরু হয়ে যাবে, যাতে হয় মরতে হবে, না হয় মারতে হবে। আপনি স্পষ্ট বুঝছেন এখুনি সেই ভয়াবহ মুহূর্ত্ত ঘাড়ের ওপর এসে পড়বে, এবং তার আতঙ্কে মন শিউরে ওঠে...প্রাণপণে হয়ত চেষ্টা করবেন নিজেকে সংবরণ করে রাখতে, কিন্তু কোথা থেকে ঘৃণার তরঙ্গে সমস্ত চেতনা ডুবে যায়। তাঁর অবস্থা হয়ত আমার চেয়ে আরও বেশী খারাপ হয়ে এসেছিল, আমি যা-কিছু বলি না কেন, তার একটা কদর্থ তিনি করবেনই এবং তাঁর প্রত্যেক কথাটা তখন বিষ-মাখানো হয়ে যায়। আমার অন্তরের যে-সব পুরানো ক্ষত ছিল এবং যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন, ইচ্ছে করেই তিনি এমন সব কথা বলতেন, যাতে করে সেই সব ক্ষত থেকে আবার রক্ত ঝরে পড়ে। এই ভাবে ঝগড়া ক্রমশঃ সঙ্কটজনক হয়ে ওঠে। অবশেষে আমি চীৎকার করে উঠে আদেশ করি, 'চুপ, কর!' ঘর থেকে ছুটে তিনি বেরিয়ে যান, আমিও তার পিছু-পিছু ছুটি তাঁকে ধরে থামাবার জন্যে।

"আমার অংশ ধরে তাঁকে টেনে ধরতেই তিনি এমন ভঙ্গী করে ওঠেন, যেন আমি তাঁকে প্রহার করছি। চীৎকার করে ছেলেদের ডাকেন, ওরে! তোদের বাবা আমাকে মারছে দেখ! আমি আরো গলা বার করে চীৎকার করে উঠি, খবরদার, মিথ্যা কথা বলো না! তিনিও ঠিক তেমনি উঁচু গলায় জবাব দেন, বলি, এই তো আর প্রথমবার নয় যে, তুমি এ-রকম করছো! ছেলেগুলো ছুটে তাদের মার কাছে আসে। তিনি তাদের ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করেন আর আমি চীৎকার করে বলি, খুব হয়েছে, আর ন্যাকামি করতে হবে না! 'তোমার কাছে সবই তো ন্যাকামি। মানুষকে তুমি স্বচ্ছন্দে খুন করে বলতে পার যে, সে ন্যাকামি করে মরে পড়ে আছে! আমার আর তোমাকে চিনতে বাকি নেই...আমি জানি, আমাকে খুন করতেই তো তুমি চাও!'

"উত্তরে আমি চীৎকার করে বলে উঠি, 'মরলে তো বাঁচি! যেমন মরে পড়ে থাকে রাস্তার কুকুরগুলো!' আমার মুখ থেকে সেই ভয়ঙ্কর কুৎসিত কথা যে কি করে বেরিয়ে পড়লো, ভাবতেই আমি নিজে অবাক হয়ে গেলাম। বলা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমি ছুটে আমার পড়বার ঘরে এসে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম এবং সিগারেটের পর সিগারেট খেতে লাগলাম। সেখান থেকে আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, পাশের ঘরে তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবার আয়োজন করছেন। বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে উঠলাম, কোথায় যাওয়া হচ্ছে? তাঁর দিক থেকে কোন উত্তরই এলো না। 'গোল্লায় যাও', নিজের মনে বলে উঠি.. তার পর পড়বার ঘরে ফিরে এসে শুয়ে পড়ে সিগারেট টানতে থাকি। মাথার মধ্যে প্রতিশোধ নেবার হাজার রকমের ফিকির ঘুরতে থাকে। যা হয়ে গেল বা যা বলে ফেলেছি, কি করে এখন তাকে ভালভাবে আবার শোধরানো যায়, তার জন্যে নানান্ রকমের কায়দা-মাফিক ফন্দী ভেবে বার করতে লাগলাম। সিগারেটের পর সিগারেট খাই, আর তাই ভাবি। এক-একবার মনে হয়, তাঁর কাছ থেকে ছুটে পালিয়ে যাই, কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাকি, আমেরিকায় দেশান্তরী হই। মনে মনে তার প্লানও ঠিক করে ফেলি কি করে তাঁর কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে

বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া যায়; কল্পনায় ধরে নিই যে, কোন রকমে একবার তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে বিচ্ছিন্ন হতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে; তখন আবার নতুন কোন সুন্দরী এবং সচ্চরিত্রা নারীর সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করে দিয়ে সুখে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করতে পারবো। এখন কথা হলো কি উপায়ে তাঁর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়? স্বাভাবিক ভাবে যদি তিনি এখন মরে যান, তাহলে তো কথাই নেই, নতুবা ডাইভোর্সের জন্যে আবেদন করতে হবে। মনে মনে চিন্তা করে দেখি, কি করে ডাইভোর্সটা ঘটিয়ে তোলা যায়। কিছুক্ষণ পরেই চেতনা হয়, অবান্তর আমি চিন্তা করে চলেছি, যা ভাবা উচিত, আমি তা ভাবছি না। কিন্তু এ চেতনা ভাল লাগে না, ধোঁয়া দিয়ে তাকে ঘোলাটে করে তুলতে চেষ্টা করি।

"ইত্যবসরে সংসারের কাজকর্ম্ম যথানির্দ্দিষ্ট পথেই এগিয়ে চলেছিল। ছেলেদের গভর্নেস্ এসে জিজ্ঞাসা করে, ম্যাদাম্ কোথায়? তিনি কখন ফিরবেন? বেয়ারা এসে জিজ্ঞাসা করে, চা দেবো কি এখন? উঠে খাবার ঘরে গিয়ে বসি। ছেলেমেয়েরা সেইখানেই ছিল। তারা আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, তাদের চোখে জিজ্ঞাসার সঙ্গে নীরব ভর্ৎসনাও ফুটে ওঠে, বিশেষ করে লীজার, কারণ ইদানীং বাড়ীতে যা-কিছু ঘটছে, তা বোঝবার মতন বুদ্ধি তার হয়ে এসেছে। নীরবে আমরা চা-পান করি···তিনি এখনও ফিরে এলেন না। সারা সন্ধ্যাটা চলে যায়, তবুও তাঁর দেখা নেই। ক্রমশঃ দুটো বিপরীত ভাবধারা পালা করে আমার মনকে দোলাতে থাকে। একটা হলো রাগ, সেই শেষকালে ফিরে আসবেন, শুধু ছেলেদের আর আমাকে এই সাময়িক অনুপস্থিতি দিয়ে যন্ত্রণা দেওয়া; দ্বিতীয়টা হলো ভয়, হয়ত তিনি আর ফিরবেন না, আত্মহত্যা করবেন। গিয়ে যে তাঁকে খুঁজে নিয়ে আসবো, কিন্তু কোথায় যাব? তাঁর বোনের ওখানে? সেখানে গিয়ে তাঁর খোঁজ করা আমার দিক থেকে কেমন যেন বেয়াড়াই লাগলো। আর তাছাড়া, আমায় ব'য়ে গেল, আমাকেই যদি তিনি আঘাত করতে পারেন, তা না হয়, নিজেকে একটু আঘাত করলেনই। আর তাছাড়া যদি এখন আমি এখানে-ওখানে তাঁকে খুঁজে খুঁজে ঘুরে বেড়াই, তাহলে তো তাঁর হাতেই আরো বেশী করে গিয়ে পড়বো···তিনি যখন বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি তো মনে-মনে সেই আশা নিয়েই গিয়েছিলেন যে, আমি তাঁর পিছু-পিছু তাঁকে খুঁজতে বেরুবো এবং আমি যদি তাই করি, তাহলে পরের বার তিনি তো আরো তেজ করে এই সব কাণ্ড করবেন। কিন্তু যদি তিনি তাঁর বোনের বাড়ী না গিয়ে থাকেন? ঘড়িতে এগারোটা বেজে গিয়েছে। বারোটা বাজলো। শোবার ঘরে যেতে পারলাম না। বিছানায় একলা শুয়ে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে থাকার কোন মানেই হয় না। ভাবি, কোন একটা কাজ নিয়ে যদি ব্যাপৃত থাকা যায়—যেমন ধরুন, চিঠি লেখা বা বই পড়া। কিন্তু তা করতে গিয়ে দেখলাম, কোন-কিছু করাই তখন আমার পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং পড়বার ঘরে একা অপেক্ষা করে বসেই রইলাম···উন্মাদ রাগের জ্বালায় ভেতরটা ছিঁড়ে যাচ্ছিল···কান খাড়া করে শুনছি, যেখান থেকে একটুখানি শব্দ উঠছে···সত্যিকারের শব্দের সঙ্গে কাল্পনিক শব্দও মিশে যাচ্ছে। রাত তিনটে হয়ে এলো ···চারটে···তবুও তখন ফিরলেন না। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম যখন ভাঙলো, তখনও দেখি, তিনি ফেরেন নি। বাড়ীতে যেমন যা হয়, ঠিক তাই হয়ে চলেছে। শুধু সকলের চোখে-মুখে একটা বিভ্রান্ত অসন্তোষের চিহ্ন, সকলেই যেন কটমট করে আমার দিকে চেয়ে আছে, সেই নীরব জিজ্ঞাসু-দৃষ্টি দিয়ে আমাকে ভর্ৎসনা করে বলতে চাইছে, যা-যা ঘটেছে বা ঘটছে, তার জন্যে আমিই দায়ী। ইতিমধ্যে আমার মনের মধ্যে তখন চলেছে তুমুল দ্বন্দ্ব রাগ আর ভয়ের মধ্যে, রাগ যে, তিনি এই ভাবে বাড়ী ছেড়ে চলে গেলেন,—ভয় যে, হয়ত খারাপ কিছু ঘটে গিয়েছে। এগারোটার সময় তাঁর দূতরূপে দেখি তাঁর ভগিনী গাড়ী করে এসে উপস্থিত হলেন এবং ঠিক এর আগেও যে-ভাবে যা হয়েছে, এবারেও আবার ঠিক সেইভাবেই তার পুনরাবৃত্তি হতে চললো। 'দিদির মনের অবস্থা বড়ই খারাপ! কি ব্যাপার? কি হলো আবার?' 'কিছুই নয়।' তাঁর অসম্ভব মেজাজই দায়ী···আমি জোর করে তাঁর ভগিনীকে জানাই যে, আমি কিছু করি নি। ভগিনী বলেন, 'হাঁ, সব স্বীকার করলাম, কিন্তু এভাবে তো আর বেশীদিন চলতে পারে না।' আমি উত্তরে জানাই, 'সেটার জবাব তিনি দিতে পারেন, আমার বলবার কিছু নেই। আমার দিক্ থেকে প্রথমে আমি সাধতে পারবো না। যদি ছাড়া-ছাড়ি করতে হয়, বেশ তো···' কার্য্যকরী কোন-কিছু ব্যবস্থা না করেই তাঁর ভগিনী ফিরে চলে গেলেন। আমি জোর করেই তাঁকে শুনিয়ে দিয়েছিলাম যে, এ ক্ষেত্রে আমি প্রথমে সাধতে পারবো না; কিন্তু তিনি চলে যাবার পর ঘর থেকে বেরিয়ে ছেলেমেয়েদের ম্লান-বিষণ্ণ

মুখ দেখে আমার সে-সঙ্কল্প দূর হয়ে গেল, আমিই প্রথম না হয় গিয়ে সাধবো। সিগারেটের ধোঁয়া বার করতে করতে অস্থিরভাবে পায়চারী করে বেড়াই। যাবার সময় ইচ্ছা করেই খানিকটা সুরা গ্রহণ করলাম, নিজের হাস্যকর অবস্থা নিজের কাছে লুকোবার জন্যে ইচ্ছে করেই মদের আশ্রয় নিতে হলো।

"তিনটের সময় তিনি নিজে গার্ড়ী করে এসে উপস্থিত হলেন। আমাকে দেখে তিনি কোন কথাই বললেন না। আমি ধরে নিলাম যে, তিনি হয়ত মিট-মাট করে নেবার কথাই মনে-মনে ঠিক করে এসেছেন, তাই আমি তাঁকে গিয়ে বললাম যে, তাঁর কুৎসিত ভর্ৎসনা দিয়ে তিনিই আমাকে উত্তেজিত করে তুলেছিলেন। এই থেকে আবার সুরু হয়ে গেল ঝগড়া। আমার দিকে ফিরে চাইতেই দেখলাম, তাঁর কঠিন মুখে মিটমাট করবার কোন চিহ্নই নেই, সমস্ত মুখটা অসম্ভব যন্ত্রণায় থম্‌-থম্‌ করছে। তিনি জানালেন যে, তিনি মিটমাট করবার সর্ত্ত শোনবার জন্যে ফিরে আসেন নি। তিনি ফিরে এসেছেন, ছেলেমেয়েদের তাঁর সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে, এইভাবে একসঙ্গে বাস করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয়। এই কথা শুনে আমি তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে, দোষটা মোটেই আমার নয়, তাঁর রূঢ় কথার দরুণ তিনিই আমাকে উত্তেজিত করে তুলেছিলেন। আমার দিকে চেয়ে বিজয়িনীর মতন তিনি বলে উঠলেন, 'খুব হয়েছে, বোঝাতে চেষ্টা করো না যে, তুমি তোমার ব্যবহারের জন্যে অনুতপ্ত!' তার উত্তরে আমি বললাম, 'এই জাতীয় মিলনান্তক নাটক আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না।' এই কথা শুনে তিনি কি বলে যে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন, তার এক বর্ণও বুঝতে পারলাম না। ছুটে তিনি তাঁর ঘরে গিয়ে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। বার-কয়েক দরজায় ধাক্কা মেরে যখন কোন সাড়া পেলাম না, রেগে নিজের ঘরে চলে গেলাম। আধ ঘণ্টা পরে লীজা কাঁদতে-কাঁদতে আমার কাছে এসে বললো, 'কি হয়েছে, মা-মণির সাড়া পাচ্ছি না কেন?' তাকে নিয়ে তাঁর ঘরের সামনে গেলাম, জোরে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলাম, হুড়কোটা আল্‌গা ভাবে দেওয়া ছিল বলে খুলে গেল। সোজা বিছানার কাছে গিয়ে দেখি, তিনি এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে শুয়ে আছেন, গায়ের জামা আধখানা খোলা, পায়ের বুটজুতো পায়েই আছে। বিছানার ধারে ছোট টেবিলের ওপর একটা খালি বোতল, বোতলে আফিঙ ছিল। চেষ্টা-চরিত্র করে তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে দেখি, তাঁর দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

অগত্যা সে-যাত্রা আবার উভয় পক্ষই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করলাম। কিন্তু আমাদের দুজনারই মনের ভিতর সেই পুরানো ঘৃণা একই ভাবে রয়ে গেল, লাভের মধ্যে তার সঙ্গে এবার যুক্ত হয়ে রইলো একটা নিদারুণ অস্বস্তির যন্ত্রণা, যা এই কলহের দরুণ দুজনকেই সমানে ভোগ করতে হয়েছে। দুজনেই মনে মনে জানতাম, এ কলহে অপর পক্ষই দোষী। কিন্তু যে-রকম করে হোক্‌ এর একটা মীমাংসা করা দরকার এবং সে-মীমাংসা সাময়িক ভাবে আমরা করে নিতে বাধ্য হই। জীবন আবা সেই পুরোন দাগ ধরে নির্দ্দিষ্ট পথে এগিয়ে চলতে লাগলো।

"কিন্তু এই জাতীয় কলহ কখনও বা এর চেয়েও নিদারুণ, নিয়মিত সংঘটিত হতে লাগলো, কখন সপ্তাহে একবার, কখনও মাসে একবার, কখন প্রতিদিন একবার। এবং প্রত্যেক বারই সেই এক পুরাতন কাহিনী, তার মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন নেই। ক্রমশঃ ব্যাপার এতদূর সঙ্গীন হয়ে উঠল যে, আমি বিদেশে যাবার পাসপোর্টের জন্যে দরখাস্ত পর্য্যন্ত করলাম। সে-বার ঝগড়াটা দুদিন পর্য্যন্ত গড়ালো কিন্তু সে-বারেও তা কোন রকমে একটা মনগড়া কৈফিয়ৎ আর জবাবদিহিতে মিটমাট হয়ে গেল এবং আমার আর বিদেশে যাওয়া হলো না।"

১৭

"এই ধরণের জীবন যখন যাপন করে চলেছি, আমাদের দুজনার সম্বন্ধ যখন এই রকম এসে দাঁড়িয়েছে, ঠিক সেই সময় সেই লোকটি এসে উপস্থিত হলো, ট্রুকাচেভেস্কী তার নাম। মস্কোতে আসার সঙ্গে-সঙ্গে একদিন সকালবেলা আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এলো। চাকর এসে খবর দিতে, তাকে ভেতরে নিয়ে আসতে বললাম। ইতিপূর্ব্বে তার সঙ্গে আমার এক রকম ঘনিষ্ঠতাই ছিল। কিন্তু এখন দেখলাম পুরানো সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও সে আমার সঙ্গে রীতিমত সন্তর্পণে মেপে-জুকে ব্যবহার করতে লাগলো এবং যেভাবে সম্বোধন করতে লাগলো কিংবা যে-সুরে কথা বলতে সুরু করলো, নিকট-বন্ধুর সঙ্গে কেউ তা করে না। আমার দিক্‌ থেকে আমিও তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে, আমি তাকে সাধারণ পরিচিত লোকের মতই গ্রহণ করতে পারি। দেখলাম, সে ব্যাপারটা সহজেই বুঝে নিল। এবং কি ভাবে আমার সঙ্গে ব্যবহার করবে, সে-সম্বন্ধে তার মনে আর কোন সন্দেহের অবকাশই রইলো না।

"যে মুহূর্ত্তে তাকে আবার নতুন করে দেখি, সেই মুহূর্ত্ত থেকেই তাকে দেখে আমার বিতৃষ্ণা জাগে। কিন্তু কি এক অনির্দ্দিষ্ট মারাত্মক রহস্যময় শক্তির প্রভাবে আমি তার কাছ থেকে সে ব্যাপারটা লুকোতেই চেষ্টা করলাম···উল্টে এমন ব্যবহার করতে লাগলাম, যাতে সে আরো আমার দিকে আকৃষ্ট হয়। খুবই সহজ ব্যাপার ছিল, যেমন সে এসেছিল, তেমনি সাধারণ ভাবে তাকে অভ্যর্থনা ক'রে দু'-এক কথা ব'লে গম্ভীর ভাবে তাকে বিদায় দিতে পারতাম···আমার স্ত্রীর সঙ্গে তাকে পরিচয় করিয়ে দেবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু না, তার বদলে তার সঙ্গে তার সঙ্গীত-চর্চ্চার বিষয়ে আলোচনা করলাম···সে নাকি বাজানো ছেড়ে দিয়েছে, কোথা থেকে সে-কথা আমি শুনেছিলাম, তাও তাকে জানালাম। তার উত্তরে সে আমাকে জানালো যে, আমি যা শুনেছি, তা মিথ্যে···ইদানীং সে এত কসরৎ করছে যে, জীবনে আর কোনদিন সে এমন ভাবে কসরৎ করে নি···এবং তার কথা থেকে সে আমার কথা উত্থাপন করলো···আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল যে, আমিও একদিন বাজনা নিয়ে রীতিমত কসরৎ করতাম। সেই সূত্রে আমাকে বলতে হলো, আমি আর ইদানীং বাজাই না, তবে আমার স্ত্রী একজন বেশ ভাল বাজিয়ে, সঙ্গীতজ্ঞ। আশ্চর্য্যের ব্যাপার, পরে সব-কিছু জানাজানির পর, তার সঙ্গে যে-সম্পর্ক দাঁড়ায়, প্রথম দিন থেকেই আমার সঙ্গে যেন তার সেই সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেল। তার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় আমাকে রীতিমত আড়ষ্ট হয়ে থাকতে হয়। সে বা আমি যা-কিছু বলতাম, তার প্রত্যেক কথাটি আলাদা করে ওজন করে দেখতাম এবং প্রত্যেক কথাটার এমন একটা স্বতন্ত্র তাৎপর্য্য দেবার চেষ্টা করতাম, যার সঙ্গতি অন্ততঃ তখন কোথাও আমার জানা ছিল না। আমার স্ত্রীর সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলাম·· স্বভাবতই তৎক্ষণাৎ সঙ্গীত নিয়ে কথাবার্ত্তা উঠলো এবং সে আমার স্ত্রীকে জানালো যে, তিনি যদি পিয়ানো বাজান, তাহলে সে তার সঙ্গে বেহালা নিয়ে সঙ্গত করতে রাজী আছে। সেদিন সকালবেলা এবং তারপর থেকে প্রত্যেক দিনই, আমার স্ত্রীকে অদ্ভুত সুমার্জ্জিত মনে হতে লাগলো, তাঁর রূপ যেন আরো মোহনীয় হয়ে উঠলো। একথা স্পষ্টই বোঝা গেল যে, প্রথম থেকেই লোকটাকে তাঁর ভাল লেগে গিয়েছিল। তাছাড়া, বেহালায় সে তাঁর সঙ্গে সঙ্গৎ করবে, এই ব্যাপারটার সম্ভাবনায় তিনি উল্লসিত হয়ে উঠলেন; এতখানি উল্লসিত হয়ে উঠলেন যে, তাঁর সঙ্গে বাজাবার জন্যে থিয়েটার থেকে একজন বাজিয়েকে তিনি ভাড়া করে আনালেন। তিনি যে উল্লসিত হয়েছেন, তা তাঁর দৃষ্টি থেকেই বোঝা যেত; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আমার সঙ্গে তিনি চোখাচোখী হতেন, আমার মনের কথা বুঝতে তাঁর দেরী হতো না এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মুখের চেহারা বদলে যেতো। সেইখান থেকে সুরু হলো প্রবঞ্চনার খেলা। আমি বেশ বড় করে হাসলাম, দেখাতে চেষ্টা করলাম, আমি যেন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি।

"লম্পট লোকেরা যে ভাবে সুন্দরী স্ত্রীলোকের দিকে চায়, দেখলাম ঠিক সেই ভাবে লোকটা আমার স্ত্রীর দিকে চেয়ে আছে কিন্তু মুখে এমন একটা ভাব দেখালো যেন, তার আসল আকর্ষণ হচ্ছে যে-কথা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, স্রেফ সেই কথাই, কিন্তু আসলে সে-ব্যাপার সম্বন্ধে তার মনে কোন ঔৎসুক্যই ছিল না। আমার স্ত্রীর দিক্ থেকে আমি দেখলাম, তিনি চেষ্টা করছিলেন নিজেকে নিস্পৃহ দেখাতে, কিন্তু আমার মুখের ক্ষীণ বক্রহাসি আর লোকটার সেই লোলুপ দৃষ্টি দেখে তিনি মনে-মনে বিব্রত হয়ে উঠছিলেন। আমার মুখের সেই হাসির মানে কি, তা তিনি ভাল করেই জানতেন। যে-মুহূর্ত্তে আমার স্ত্রী লোকটাকে দেখেছিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই আমি দেখেছি, তাঁর চোখে এক-অদ্ভুত আলো জ্বলে উঠেছে, আমি স্পষ্ট অনুভব করেছি, একটা অদৃশ্য বৈদ্যুতিক শক্তি তাদের দু'জনকে এক সঙ্গে এমন ভাবে বেঁধে ফেলে যে, তাদের দুজনের হাসি আর চাউনি একতালে বাঁধা পড়ে যায়। লজ্জায় আমার স্ত্রীর মুখ রাঙা হলে, লোকটারও মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠতো, আমার স্ত্রী হাসলে দেখতাম, লোকটাও হাসতো। সঙ্গীতের কথা নিয়ে খানিকটা আলোচনা হলো···তারপর উঠলো প্যারিসের কথা··· টুকরা-টুকরা অতি- অপ্রয়োজনীয় সব বিষয়···। যাবার জন্যে লোকটা টুপীটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো··· একবার আমার স্ত্রীর দিকে, আর একবার আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে যেন অপেক্ষা করে দেখতে লাগলো আমরা কি করি বা বলি। আজও স্পষ্ট সে-মুহূর্ত্ত আমার মনে পড়ে···সেই কয়েক সেকেণ্ড সময়··· সেই সময়টুকুর মধ্যে আমি ইচ্ছে করলে তাকে আমাদের বাড়ীতে দ্বিতীয়বার আর পদার্পণ না করার জন্যে বলতে পারতাম এবং সেই মুহূর্ত্তে যদি তা পারতাম তাহলে আর জীবনের এই দুর্দ্দৈব ঘটে উঠতে পারতো না। কিন্তু তার পরিবর্ত্তে আমি একবার লোকটার দিকে, আর একবার আমার স্ত্রীর দিকে শুধু নীরবে চেয়ে দেখলাম। দৃষ্টি দিয়ে আমার স্ত্রীকে

যেন বোঝাতে চাইলাম, এক মুহূর্ত্তের জন্যেও একথা মনে করে আত্মপ্রসাদ অনুভব করো না যে, আমি এই লোকটার দরুণ ঈর্ষ্যান্বিত হয়ে উঠেছি। লোকটিকেও নীরব-দৃষ্টি দিয়ে যেন আশ্বস্ত করলাম, তুমি জেনে যাও, তোমাকে ভয় করবো, এতো দুর্ব্বল আমি নই। সুতরাং আমি নিজেই লোকটাকে সন্ধ্যাবেলা আসবার জন্যে নিমন্ত্রণ করলাম, বললাম, আসবার সময় বেহালাটা সঙ্গে করেই আনবেন, আমার স্ত্রীর সঙ্গে বাজাবার জন্যে। আমার স্ত্রী অবাক্ হয়ে আমার দিকে চাইলেন, লজ্জায় তাঁর দুই গণ্ড রক্তিম হয়ে উঠলো, কেমন যেন ভীত আর চঞ্চল হয়ে আয়োজনটার প্রতিবাদ করতে চাইলেন। বললেন, ওঁর সঙ্গে বাজাবার মতন বিদ্যে তাঁর তো নেই! তাঁর এই প্রতিবাদে আমার জেদ আরো বেড়ে উঠলো, আমি জোর করেই ভদ্রলোককে আসতে বললাম। আমার মনে আছে, ভদ্রলোক যখন পিছন ফিরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, ভদ্রলোকের মাথার পেছন দিক্‌টা দেখে আমার কি-যেন একটা বিচিত্র অনুভূতি জেগে উঠলো। কিছুতেই নিজের কাছ থেকে এ-কথাটা লুকোতে পারলাম না যে, লোকটার উপস্থিতি আমাকে শুধু যন্ত্রণা দিয়েই গেল। মনে ভাবলাম, অন্ততঃ এটুকু ক্ষমতা এখনো আমার আছে, ভবিষ্যতে এমন ব্যবহার করতে পারি, যাতে লোকটার আসা-যাওয়া সম্বন্ধে আর আমাদের উৎপীড়িত হতে হবে না। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে পড়লো, সে-রকম ব্যবহার করার মানে হলো, স্বীকার করা যে, লোকটাকে আমি সত্যিই ভয় করি। আসলে কিন্তু আমি তাকে আদৌ ভয় করি না; আর তা ছাড়া, সে-রকম ব্যবহার করা আমার দিক্ থেকে খুব ভব্যও হবে না। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে লোকটি পাশের ঘর থেকে জামা নিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। যাতে করে আমার স্ত্রী শুনতে পান, এমনি ভাবে সেই ঘরে গিয়ে আবার লোকটিকে আমি সন্ধ্যেবেলা আসবার জন্যে অনুরোধ করলাম এবং স্মরণ করিয়ে দিলাম, যেন বেহালাটি আনতে সে ভোলে না। আমাকে কথা দিল যে, সে নিশ্চয়ই আনবে···

"সন্ধ্যেবেলা সে এলো এবং তারা দুজনে একসঙ্গে অনেকক্ষণ বাজালো; কিন্তু প্রথম দিক্‌টা তাদের বাজনা একেবারে খাপছাড়া হয়ে যেতে লাগলো। আমি নিজে রীতিমত সঙ্গীত ভালবাসি, তাই এই আয়োজন সানন্দেই গ্রহণ করেছিলাম। তাদের সুবিধার জন্যে আমি নিজে গানের বইটা রাখবার জন্যে ষ্ট্যাণ্ড ঠিক করে দিই এবং সেখানে দাঁড়িয়ে স্বহস্তে দরকার মত পাতা উল্টে দিতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মিলিত চেষ্টার পর তারা দুজনে গোটা-দুই গানের গৎ আর মোজার্টের একটা সোনাটা বাজালো। লোকটা সত্যি অপূর্ব্ব সুন্দর বাজালো; তার বাজনার মধ্যে এমন একটা সূক্ষ্ম পরিশুদ্ধ রসবোধের পরিচয় পেলাম, যার চিহ্ন কিন্তু তার চরিত্রের মধ্যে দেখতে পাই নি। বলা বাহুল্য, আমার স্ত্রীর চেয়ে ভদ্রলোক ঢের বেশী ভাল বাজালো এবং যাতে তিনি ক্ষুণ্ণ না হন, কায়দা করে দরকার মত তাঁকে চালিয়ে নিয়ে চললেন। রীতিমত সম্মান দেখিয়ে তাঁর বাজনার উল্টে প্রশংসাও করিলো। আমার স্ত্রীর দিক থেকে, আমার মনে হলো, তিনি যেন বোঝাতে চাইছিলেন যে, বাজনা বাজানো ছাড়া তাঁর আর বিশেষ কোন আগ্রহ কিছু নেই এবং তিনি যতদূর সম্ভব সহজ সরলভাবেই ব্যবহার করবার চেষ্টা করেছিলেন। আমার দিক্ থেকে, যদিও আমি দেখবার চেষ্টা করছিলাম যে, সঙ্গীত সম্বন্ধেই আমার সমস্ত আগ্রহ, কিন্তু ভেতরে ভেতরে সারা সন্ধ্যাটা সেদিন ঈর্ষ্যার জ্বালায় জ্বলে-পুড়ে মরছিলাম।

"আমার এই যন্ত্রণা যে তীব্রতর হয়ে উঠেছিল, তার কারণ, আমি জানতাম যে, আমার ওপর আমার স্ত্রীর সেই পুরোন বিরাগ ঠিক তেমনি আছে, সেটা এখন প্রায় একটা স্থায়ী অস্বস্তিতে পরিণত হয়ে গিয়েছে; অপর পক্ষে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর সুযোগ-সুবিধা আমার চেয়ে ঢের বেশী; বাইরের দিক্ থেকে তার চেহারা ঢের বেশী সুসজ্জিত; আর তা ছাড়া সে নবাগত, নতুন এবং সকলের ওপর কথা হলো, আমার স্ত্রীর অন্তরে রেখাপাত করবার মতো তার ছিল নিঃসংশয় সঙ্গীত-প্রতিভা। এই সব কারণের সঙ্গে আমি ভেবে দেখলাম, আরো কতকগুলি এমনি ব্যাপার সংযুক্ত হয়ে যাবে, যার ফলে এই লোকটি শুধু যে আমার স্ত্রীর অন্তরে রেখাপাত করবে, তা নয়, তাঁকে নিঃসন্দেহাতীত ভাবে জয় করে নেবে। একসঙ্গে বাজানোর দরকার, এই অজুহাতে তারা এখন পরস্পর পরস্পরের কাছে থাকবার অনায়াস সুযোগ পেয়ে যাবে এবং মানুষের মনের ওপর সঙ্গীতের একটা স্বতন্ত্র প্রভাব আছে, বিশেষ করে বেহালার; আবেগ-প্রবণ মনের ওপর বেহালার মতন প্রভাব বিস্তার করতে আর দ্বিতীয় যন্ত্র নেই। এই-সব কথা আপনা থেকে মনের ভিতর তোলপাড় হতে লাগলো এবং তার ফলে যন্ত্রণার হাত হতে কিছুতেই নিষ্কৃতি পেলাম না। কিন্তু তবু, এই সব ব্যাপার জানা সত্ত্বেও, হয়ত বা এই সব ব্যাপার জানার দরুণই, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেখলাম কোন্ এক অদৃশ্য শক্তি যেন আমাকে বাধ্য করলো, বাইরের দিক্ থেকে তার সঙ্গে অত্র

ব্যবহার করবার জন্যে, এমন কি, লোকটাকে উল্টে আপ্যায়িত করবারই চেষ্টা করলাম। এই স্নেহ-দেখানোর পেছনে কি উদ্দেশ্য ছিল, তা আজ স্পষ্ট করে নির্দ্দেশ করতে পারি না, হয়ত আমার স্ত্রী আর সেই লোকটাকে সেইভাবে বোঝাতে চেয়েছিলাম যে, কোন কারণে বা আশঙ্কায় আমি বিচলিত হই নি; অথবা সেইভাবে নিজেই চেয়েছিলাম নিজেকে প্রবঞ্চনা করতে। সে যাই হোক্, এ কথাটা সত্যি যে, তখন থেকেই লোকটার সঙ্গে আমার সম্পর্ক সহজ বা সরল হতে পারে নি।

পাছে মনের মধ্যে লোকটাকে খুন করে সরিয়ে ফেলবার প্রবৃত্তি জাগে, সেই জন্যেই তার সঙ্গে বাধ্য হয়েই আন্তরিক এবং অন্তরঙ্গ ব্যবহার করতে চেষ্টা করি। সেদিন রাত্রিতে তাই তাকে ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করলাম, সঞ্চিত সেরা মদ পাত্র ভরে পরিবেশন করলাম, উচ্ছ্বসিত হয়ে তার বাজনার প্রশংসা করলাম, স্নিগ্ধ-স্নেহমাখা হাসি দিয়ে তাকে আবার আমন্ত্রণ জানালাম, সামনের রবিবার সন্ধ্যার সময় স্ত্রীর সঙ্গে আবার বাজাতে এবং তারপর এইখানেই আহার করতে। সেই সঙ্গে জানালাম যে সেদিন তার বাজনা শোনাবার জন্যে আমার কয়েকজন সঙ্গীত-প্রিয় বন্ধুদেরও নিমন্ত্রণ করে আনাবো···এই ভাবে সেদিনের পালা শেষ হলো···।"

হঠাৎ পদ্‌নিশেফের গলা আবেগে রুদ্ধ হয়ে এলো, আসন থেকে উঠে পড়ে সে নড়ে আর এক জায়গায় গিয়ে বসলো এবং তার গলা থেকে সেই অদ্ভুত আওয়াজ আবার শোনা গেল।

নিজেকে সংযত করবার প্রাণপণ চেষ্টা করে সে আবার বলতে সুরু করলো, "আশ্চর্য্য, লোকটার উপস্থিতিতে আমার মধ্যে কি নিদারুণ আলোড়নের সৃষ্টিই না হয়েছিল! এই ঘটনার তিন-চার দিন পরে, এক্‌জিবিশন দেখে বাড়ী ফিরছিলাম···বাড়ীতে পা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে হঠাৎ বুকের মধ্যে কি-রকম যেন ভার বোধ হতে লাগলো, যেন একটা বিশ-মণি পাথর কে চাপিয়ে দিল হঠাৎ। কেন যে হঠাৎ সে-রকম হলো, প্রথমে ভেবেই ঠিক করতে পারলাম না। পরে মনে পড়লো, বাড়ীর ভেতর ঢুকে পাশের ঘরে হঠাৎ নজর পড়াতে এমন একটা জিনিস দেখলাম, যাতে করে সেই লোকটার কথাই আমার মনে জেগে ওঠে। নিজের পড়বার ঘরে এসে যখন বসলাম, তখন বুঝতে পারলাম সে-জিনিসটা কি এবং যা দেখেছি, সেটা ঠিক দেখেছি কি না, তা যাচাই করবার জন্যে আবার উঠে গিয়ে দেখে এলাম। হাঁ, আমি ভুল দেখিনি···সেই লোকটার ওভার-কোট···আলনায় টাঙানো··· রীতিমত একটা দামী সৌখীন ওভার-কোট। লোকটার সম্পর্কে আমি এতদূর বাতিকগ্রস্ত হয়ে পড়ি যে, তার সম্পর্কে কোন-কিছু একটা নজরে পড়লেই, ভাল করে জানবার আগেই আমার মন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠতো। বেয়ারাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম। হাঁ, ঠিকই, লোকটা এসেছে। সেখান থেকে উঠে আমার শোবার ঘরের দিকে চললাম, সোজা বৈঠক-খানার ভেতর দিয়ে নয়, ছেলেদের পড়বার ঘরের ভেতর দিয়ে পাশ কাটিয়ে। আমার ছোট মেয়ে লীজা যেন একটা কি বই নিয়ে পড়ছিল, আর নার্স টা আমার সর্ব্ব-কনিষ্ঠ শিশুটিকে নিয়ে টেবিলের ধারে বসে কি-একটা জিনিসের আচ্ছাদন-বস্ত্র বুনছিল। বৈঠকখানার দিকের দরজা খোলাই ছিল এবং পিয়ানোর আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম এবং সেই সঙ্গে কানে আসছিল অস্পষ্ট তাদের দুজনের কথাবার্ত্তা। কান খাড়া করে শোনবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পিয়ানোর শব্দ থেকে আলাদা করে তাদের একটি কথাও বুঝতে পারলাম না। স্পষ্টই বুঝতে পারলাম যে, কথাবার্ত্তার সময় যে পিয়ানো বাজানো হচ্ছে, সেটা ইচ্ছে করেই বাজানো হচ্ছে···কথা-বার্ত্তার শব্দকে···হয়ত চুম্বনের শব্দকে···চাপা দেবার জন্যেই। ভগবান্‌ই জানেন সেই মুহূর্ত্তে আমার মধ্যে যেন অরণ্যের সমস্ত হিংস্র পশু একসঙ্গে জেগে উঠলো। মাথার মধ্যে মারাত্মক কি-সব কথা ঘুরে বেড়াতে লাগলো। সেই মুহূর্ত্তে যে জ্বালা আমার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, আজ এত দূরেও তার কথা ভাবতে আমি ভয়ে শিউরে উঠছি।

"আমার হৃদয় যেন সঙ্কুচিত হয়ে ক্রমশঃ স্থির হয়ে গেল···মনে হলো যেন হাতুড়ির মতন কে বুকে সশব্দে আঘাত করছে। প্রত্যেক ঘৃণা আর আক্রোশের অসহ্য আত্মপ্রকাশের মধ্যে সংগোপনে কোথায় লুকিয়ে থাকে নিজের প্রতি এক অসহায় করুণার ভাব। মনে-মনে ভাবতে শিউরে উঠলাম, ছি, ছি, ছেলেপুলেদের সামনে.. এই নার্সের সামনেই! নিশ্চয়ই আমার মুখের মধ্যে ভয়ঙ্কর কিছু ফুটে উঠেছিল, তাই লীজা আমার দিকে ভয়ে কাঠ হয়ে চেয়ে রইলো। মনে-মনে নিজেকেই জিজ্ঞাসা করলাম, এখন কি করা আমার উচিত? ভেতরে যাব? না, চেষ্টা করেও তা পারলাম না। যদি এখন

ভেতরে যাই, ভগবানই জানেন, কি করতে কি করে ফেলবো! অথচ সেখান থেকে নড়ে চলে যেতেও পারছিলাম না। নার্স্টা আমার মুখের দিকে এমনভাবে চেয়ে দেখলো, যেন সে আমার অবস্থা বুঝতে পেরেছে।

"মনে-মনে ঠিক করলাম, ভেতরে না গিয়ে আমি পারি না···দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। লোকটা পিয়ানোর কাছেই বসে ছিল, লম্বা হাতের আঙুল দিয়ে পিয়ানোর গৎটা তোলবার চেষ্টা করছিল, পিয়ানোর আর এক কোণে আমার স্ত্রী দাঁড়িয়েছিলেন, সামনে কতকগুলো গানের কাগজ ছড়ানো। আমার স্ত্রীই প্রথম আমাকে দেখতে পেলেন এবং ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে চাইলেন। তিনি কি আমাকে দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন? তাঁর বাইরের স্থৈর্য্য শুধু একটা নিপুণ অভিনয়ের ভঙ্গী? না, সত্যি সত্যিই, তাঁকে যে রকম স্থির দেখাচ্ছে, ভেতরেও তিনি ঠিক তেমনি স্থির অবিচলিত আছেন? মনে মনে ভেবে ঠিক করতে পারলাম না। তবে একটা বিষয় লক্ষ্য করলাম, আমাকে দেখে তিনি একটুও নড়লেন না, কোন রকম চঞ্চলতার কোন লক্ষণ দেখা গেল না; যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেখানে সেইভাবে দাঁড়িয়েই রইলেন·· শুধু দেখলাম, যেন লজ্জায় একটু আরক্তিম হয়ে উঠলেন। আমাকে লক্ষ্য করে স্ত্রী বলে উঠলেন, ভালই হয়েছে, তুমি এসে পড়েছ···সামনের রবিবার কি বাজাবো, এখনো আমরা তা ঠিক করে উঠতে পারছি না। যে-গলায় তিনি আমাকে এই কথা বললেন, আমি জানি, আমার সঙ্গে তিনি যদি একলা থাকতেন, তাহলে কখনই সে-সুরে বলতে পারতেন না। সেই কণ্ঠস্বরের নতুনত্বের সঙ্গে এবং তাঁদের দুজনকে বোঝাবার জন্যে তিনি যেভাবে "আমরা" কথাটা ব্যবহার করলেন, তাতেই আমি উত্তপ্ত হয়ে উঠলাম। নীরবে আমি লোকটিকে অভিবাদন জানালাম, তার প্রত্যুত্তরে সে আমার হাত ধরে কর-মর্দ্দন করলো এবং বিন্দুমাত্র ভূমিকা না করে আমাকে জানালো যে, রবিবারের জন্যে সে সঙ্গে করে কতকগুলো সঙ্গীত নিয়ে এসেছে; কিন্তু এখনো পর্য্যন্ত ঠিক করে উঠতে পারে নি, কোন্‌টা বাজাবে···কোন ভারী ক্লাসিকাল জিনিস, যেমন বিটোফেনের কোন সোনাটা, না হাল্কা অন্য কোন জিনিস! লক্ষ্য করলাম, লোকটা ঈষৎ হেসেই আমার সঙ্গে কথা বললো···আমার মনে হলো, সে-হাসি যেন আমাকে ব্যঙ্গ করবার জন্যেই। অবাবদিহিটা এমন স্বাভাবিক আর এত সরল হলো যে, তাতে কোন খুঁত বার করা সম্ভবই নয় এবং সেই জন্যেই আমি বুঝলাম যে, সেটা আদৌ সত্যি নয়···আমাকে প্রবঞ্চনা করবার জন্যে তারা নিশ্চয়ই কোন বন্দোবস্তের কথা আলোচনা করছিল।

"আমার মত ঈর্ষ্যাপরায়ণ লোকের কাছে···আমাদের সমাজে আমার মত অধিকাংশ পুরুষই ঈর্ষ্যাপরায়ণ··· এমন কতকগুলো সামাজিক রীতি-নীতি আছে, যা কার্য্য-গতিকে একান্ত বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়···এই সব সামাজিক রীতি-নীতির দরুণই পুরুষ আর নারী মারাত্মক ভাবে কাছাকাছি আসতে পারে অথচ তার জন্যে কোন বাধা-নিষেধ কোথাও থাকে না। আজকে আমাদের সমাজের এই রকমই ব্যবস্থা যে, নাচের সময় পুরুষ আর নারীর অঙ্গাঙ্গী সান্নিধ্য, ডাক্তার আর তার নারী-রোগীদের পরস্পর নৈকট্য···শিল্পী, চিত্রকর আর গায়কদের মধ্যে পুরুষ আর নারীর একত্র সংমিশ্রণ কেউ যদি বাধা দিতে যায়, তাহলে জগৎশুদ্ধ লোক তার পেছনে হাততালি দেবে।

"দুটি মানুষ জগতের পবিত্রতম শিল্পকলা অর্থাৎ সঙ্গীত-অনুশীলন করছে—একসঙ্গে; এই অনুশীলনের জন্যে পরস্পরের যেটুকু সান্নিধ্য প্রয়োজন, তার মধ্যে বিন্দুমাত্র কদর্য্যতা কোথাও থাকতে পারে না···একমাত্র অতি-মূর্খ, অতি-ঈর্ষ্যাপরায়ণ যে স্বামী, সেই তার মধ্যে নিন্দনীয় কিছু দেখতে পায়। অথচ নিঃসন্দেহাতীত ভাবে সকলেই এ কথা জানে যে, এই সব ব্যাপারকে কেন্দ্র করেই, বিশেষ করে সঙ্গীত অনুশীলনের ব্যাপার নিয়েই আমাদের সমাজের অধিকাংশ কদর্য্য অনাচার সংঘটিত হয়।

"বুঝতে পারলাম, আমার নিজের অস্বস্তি দিয়ে তাদের দুজনকে আমি বিপন্ন করে তুলেছি। অনেকক্ষণ ধরে আমি চুপ করেই থাকলাম, একটা কথাও বলতে পারলাম না। ইচ্ছা হলো, দুজনকে প্রাণভরে গালাগাল দিই, লোকটাকে বাড়ী থেকে এক্ষুণি তাড়িয়ে দিই, কিন্তু তা পারলাম না। তার বদলে মনে হলো, আমার উচিত তাদের সামনে এমনি ভাব দেখানো যে, আমি বন্ধুর মতনই তাদের স্নেহের চোখে দেখছি এবং কার্য্যতঃ আমি নিজেকে তাই দেখাবারই চেষ্টা করলাম। আমি এমন ভাব দেখালাম যে, তাদের বক্তব্য সম্বন্ধে আমার কোন বিরূপতাই নেই। লোকটাকে দেখে আমার মনে যন্ত্রণার যতখানি তীব্রতা জেগেছিল, ঠিক সেই অনুপাতেই বাহ্যিক ভদ্রতা দেখাবার একটা ঝোঁক হঠাৎ পেয়ে বসলো। সঙ্গীত-নির্ব্বাচন সম্পর্কে তার রস-বোধের ওপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে, সেই

লোকটাকে মধুর ভাবে জানালাম এবং আমার পন্থা অনুসরণ করতে স্ত্রীকেও অনুরোধ করলাম। আতঙ্কিত মুখ নিয়ে হঠাৎ সেই ঘরে ঢুকে পড়ার দরুণ যন্ত্রণাদায়ক যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিলাম, যতক্ষণ না আবার স্বাভাবিক অবস্থায় তা ফিরে এলো, ততক্ষণ লোকটা থেকে গেল; কিন্তু আমি ঢোকবার পর সে যে মুখ বন্ধ করেছিল, তা আর খোলে না। লোকটা বিদায় নিয়ে চলে গেল, ভাবটা যেন, কালকের গান যখন ঠিক হয়েই গেল, তখন আর থাকবার দরকার কি। আমার কিন্তু স্থির বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে, কালকের গানের ব্যবস্থার ব্যাপারটা তাদের কাছে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকই ছিল। ভব্যতা দেখাবার জন্যে লোকটাকে পাশের ঘর পর্য্যন্ত আগিয়ে দিয়ে এলাম এবং বিদায়ের সময় তার নরম শাদা হাতের সঙ্গে আমার হাত মিলিয়ে অস্বাভাবিক রকম জোর দিয়েই করমর্দ্দন করলাম... আমার সাংসারিক জীবনের সুখ আর শান্তি যে ধ্বংস করতে এসেছে, তার সঙ্গে এই রকম ভদ্র ব্যবহার না করে থাকতে পারি ?"

১৮

"সেদিন সারাক্ষণ আমার স্ত্রীর সঙ্গে আর একটিও কথা বলতে পারি নি। চেষ্টা করেও পারি নি। তাঁর সান্নিধ্য আমার মধ্যে ঘৃণার এমন দুরন্ত আবেগের সৃষ্টি করছিল যে নিজের সম্বন্ধে নিজেই আতঙ্কিত হয়ে উঠছিলাম। রাত্রিতে খাবার সময় ছেলেপুলেদের সামনে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, করে আমি গাঁয়ে যাবার সঙ্কল্প করেছি। (পরের সপ্তাহে জেলা বোর্ডের সভায় যোগদান করবার জন্যে বাধ্য হয়ে আমাকে গাঁয়ে যেতে হয়) উত্তরে কোন্ তারিখে যাব, জানালাম। যাবার সময় আমার কি লাগতে পারে জানতে চাইলেন। আমি বললাম, কিছুই লাগবে না এবং যতক্ষণ খাওয়া না শেষ হলো ততক্ষণ চুপ করেই বসে রইলাম। খাওয়া শেষ হলে নীরবে টেবিল থেকে উঠে আমার পড়বার ঘরে গিয়ে বসলাম। ইদানীং, আমার ঘরে তিনি আসতেন না, বিশেষ করে দিনের বেলায়। আমি শুয়ে শুয়ে নিজের মনে নিষ্ফল রাগে ফুলছিলাম, এমন সময় আমার মগজে এক অদ্ভুত বীভৎস ধারণা জেগে উঠলো, উরিয়ার স্ত্রীর মতন তিনি হয়ত আসবেন তাঁর পাপের কথা আমার কাছ থেকে লুকোবার চেষ্টা করবার জন্যে, নইলে এমন অসময়ে আমার ঘরে আজ তিনি আসবেন কেন? ক্রমশঃ তাঁর পায়ের শব্দ আরো যেন কাছে এলো...তাহলে সত্যি সত্যি তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন? তাই যদি হয়, তাহলে আমি যা ভেবেছি, তাই তো ঠিক। তা হলে তিনি...দুরন্ত ঘৃণায় মন ভরে উঠলো। শব্দ আরো কাছে এলো। হতেও বা পারে, তিনি বৈঠকখানা ঘরে যাচ্ছেন। না· হঠাৎ শুনলাম আমার ঘরের দরজার কব্জা শব্দ করে উঠলো ...সামনেই দেখি, তাঁর সুদীর্ঘ, সুঠাম দেহ, মুখে ভীরু সঙ্কোচের চিহ্ন; যদিও তিনি প্রাণপণে লুকোবার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু তাঁর মুখের চেহারা দেখে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে আমার ওপর তাঁর মায়াজাল বিস্তার করবার বাসনা নিয়েই এসেছেন, তার অর্থ যে কি তা জানতে আমার বাকি ছিল না। নিশ্বাস বন্ধ করে থাকতে চেষ্টা করলাম...দম বন্ধ হয়ে আসবার মতন হলো। এক দৃষ্টিতে নীরবে তাঁর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সিগারেট-কেস থেকে সিগারেট বার করে খেতে আরম্ভ করলাম। আমার গায়ের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে সোফায় আমার পাশে এসে বসলেন এবং মৃদু কণ্ঠে বললেন, বা রে, এ কেমন ধারা ব্যবহার? একজন লোক এলো, তোমার সঙ্গে একটু নিরিবিলি বসে দুটো কথা কইবে, আর তুমি কি না সিগারেট বার করে খেতে আরম্ভ করলে? আমি ইচ্ছে করেই গা-টা একটু সরিয়ে নিলাম, যাতে করে তাঁর দেহের সঙ্গে কোন সংস্পর্শ না থাকে। তিনি বলে উঠলেন, 'ও, আমি বুঝতে পেরেছি, রবিবার দিন আমি ওর সঙ্গে বাজনা বাজাবো বলে তুমি আমার ওপর বিরক্ত হয়েছ।' আমি উত্তর দিলাম, 'না, মোটেই নয়, সে জন্যে আমি কিছুমাত্র বিরক্ত হই নি।'

তিনি জবাব দিলেন, 'বললেই হবে! তুমি কি মনে করছ, আমি তা দেখতে পাচ্ছি না?'

—'তা যদি দেখতে পেয়ে থাক, তোমার দেখার তারিফই করবো। আমার দিক থেকে আমি যা লক্ষ্য করছি, সেটা হলো, তুমি একটা পুরোদস্তুর ককেটের মত ব্যবহার সুরু করেছ.....'

—'যদি এই রকম রূঢ় ভাষায় আমাকে গালাগালিই দাও, তাহলে আমি চললাম......'

—"যাও, কিন্তু একটা কথা বিশেষ করে মনে রেখো, এই সংসারের মর্য্যাদা যদি তোমার কাছে প্রিয় বলে না মনে হয়, তা হলে আমার কাছে তুমি প্রিয় হয়ে থাকতে পার না, আমার সংসারের মর্য্যাদাই আমার কাছে সব চেয়ে বেশী প্রিয়!'

—'কি? কি বলতে চাও তুমি?'

—'দোহাই ভগবান! তুমি এ ঘর থেকে এখন চলে যাও···শুধু এই কথাই বলতে চাই···যাও···'

"আমি জানি না তিনি সত্যিই আমার কথা বুঝতে পারছিলেন, না, না-বুঝতে পারার ভাণ করছিলেন, তবে এটা বুঝতে পারলাম যে আমার কথায় তিনি রীতিমত অপমানিত বোধ করলেন। তিনি সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালেন কিন্তু চলে গেলেন না। ঘরের মাঝ-বরাবর দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, ক্রমশঃ তুমি যে-রকম ব্যবহার করছো, তা সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠছে···তোমার চরিত্র যে-রকম দাঁড়াচ্ছে, তাতে স্বর্গ থেকে দেবকন্যা এলেও তোমার সঙ্গে ঘর করতে পারবে না।······

"এবং তিনি ভাল রকমই জানতেন আমাকে কি ভাবে কোথায় আঘাত করলে রীতিমত আমার লাগবে, তাই তিনি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, আমার নিজের ভগিনীর প্রতি আমি একবার কি-রকম অন্যায় ব্যবহার করেছিলাম। একবার রাগে আমার মেজাজ এত খারাপ হয়ে যায় যে আমার ভগিনীকে আমি অতি রূঢ়ভাবে তিরস্কার করেছিলাম। সে ব্যাপারের স্মৃতি আমার মনে পরম বেদনার মতই থেকে গিয়েছিল। সে কথা তিনি জানতেন বলেই, তিনি বেছে-বেছে সেই ক্ষতস্থানেই আমাকে আঘাত করলেন।

"তিনি উপসংহারে জানালেন, নিজের ভগিনীর সঙ্গে যে ঐ রকম ব্যবহার করতে পারে, সে যে আমার সঙ্গে এ-রকম ব্যবহার করবে, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই।

"মনে মনে ভাবলাম, আমাকে অপমান করে, আঘাত করে, লাঞ্ছিত করেই যে তিনি তৃপ্ত হবেন, তা নয়, তাঁর আসল উদ্দেশ্য হলো দেখানো, এ-সবের জন্যে আমিই দায়ী। সেই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে মনে তাঁর ওপর এ-রকম নিদারুণ ঘৃণা জমে উঠতে লাগলো যে, জীবনে এর আগে ততখানি তীব্রভাবে আর কখনো ঘৃণা করি নি। এই জীবনে প্রথম ইচ্ছে হলো, অন্তরের এই ঘৃণাকে বাইরে দৈহিক ভঙ্গীতে প্রকাশ করি। আমি উঠে দাঁড়ালাম, পায়ে পায়ে তাঁর দিকে এগিয়ে চললাম কিন্তু তক্ষুনি মনে হলো আমি শুধু অন্ধ রাগের বশবর্ত্তী হয়ে কাজ করতে চলেছি; মনের মধ্যে প্রশ্ন জেগে উঠলো, এইভাবে নিজেকে রাগের হাতে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হচ্ছে কি? সেই মুহূর্ত্তেই মনের মধ্যে তার উত্তর পেলাম, হাঁ, ঠিকই হচ্ছে, কারণ, এতে তিনি অন্তত ভয় পাবেন। তাই তাকে আর বাধা দিতে চেষ্টা না করে, যাতে তার শিখা আরো জ্বালাময় হয়ে ওঠে, তার জন্যে মনে মনে তাকে আরো তাতিয়ে তুলতে লাগলাম···যতই তা মনের মধ্যে তীব্রতর হয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, ততই একটা বিচিত্র আনন্দে মন ভরে ওঠে।

"চীৎকার করে উঠি, 'আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও নইলে খুন করে ফেলবো!'"

"কাছে এগিয়ে গিয়ে তাঁর হাত চেপে ধরলাম। ইচ্ছে করেই গলার আওয়াজ সপ্তমে তুলে চীৎকার করে উঠলাম, গলার আওয়াজ দিয়ে যেন মনের রাগের মাত্রা বুঝিয়ে দিতে চাই। নিশ্চয়ই সে-সময় আমাকে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল, কারণ দেখলাম, তিনি ভয়ে এমন অভিভূত হয়ে পড়লেন যে, সেখান থেকে নড়ে চলে যাবার শক্তি আর তাঁর ছিল না। শুধু তিনি বললেন, 'ভাসা, কি হয়েছে তোমার?' আরো জোরে চীৎকার করে উত্তর দিলাম, 'জানি না···আমার কাছ থেকে সরে যাও! আমাকে পাগল না করে তুমি ছাড়বে না দেখছি! যাও···তা না হলে, যা ঘটবে, আমি তার জন্যে এতটুকু আর দায়ী হবো না!'

"আমার সমস্ত আক্রোশকে এই ভাবে মুক্ত করে দিয়ে আমি যেন অভিভূত হয়ে পড়লাম। একটা অঘটন কিছু করবার জন্যে একটা দুর্বার বাসনা জেগে উঠলো, যা থেকে উনি বুঝতে পারবেন আমার মনের এই উন্মাদজ্বালা কতখানি তীব্র হয়ে উঠেছে আজ।

"এক দুর্দমনীয় বাসনা হলো, তাঁকে প্রহার করবার, খুন করবার···কিন্তু সেই সঙ্গে এ-ও জানতাম যে, তা হয় না, তা সম্ভব নয়। সেই জন্যে ভেতরের দুর্দ্দান্ত বাসনাকে মুক্ত করে দেবার জন্যে পাশের টেবিল থেকে একটা কাগজ-চাপা তুলে নিয়ে, তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেখানকার মাটিতে সজোরে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম, চীৎকার করে উঠলাম, সরে যাও আমার কাছ থেকে! কাগজ-চাপাটা ছোঁড়বার সময় আমি লক্ষ্য রেখেই ছুঁড়ি, যাতে তাঁর গায়ে না লাগে। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে বারাণ্ডায় আমার দিকে চেয়েই দাঁড়িয়ে রইলেন, আর আমি সামনে হাতের কাছে যা-কিছু পেলাম, মোম-দানি, দোয়াত, সব ছুঁড়ে ফেলে দিতে দিতে চীৎকার করতে লাগলাম, দূর হও, সরে যাও···নইলে, যা হবে তার জন্যে আমি দায়ী নই! তিনি সেখান থেকে সরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমার উন্মাদনাও বন্ধ হয়ে গেল। ঘণ্টাখানেক পরে নার্স এসে আমাকে জানালো যে, তাঁর হিষ্টিরিয়া হয়েছে। তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি, তিনি একবার কাঁদছেন আর একবার হাসছেন, কোন কথাই বলতে

পারছেন না, সর্বাঙ্গ তাঁর ভীষণ কাঁপছে। দেখে মনে হলো, অভিনয় নয়, সত্যিই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

"ভোরের দিকে তিনি প্রকৃতিস্থ হলেন এবং আবার আমাদের ঝগড়ার মিটমাট হয়ে গেল…মিটমাট হয়ে গেল, সেই প্রেরণার প্রভাবেই যাকে লোকে বলে 'ভালবাসা'। মিটমাট হয়ে যাবার পর সকালবেলা তাঁর কাছে যখন আমি স্বীকার করলাম যে, ট্রুকাচেভেস্কীর ওপর ঈর্ষ্যার দরুণই আমি উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম, তিনি কিছুমাত্র বিব্রত না হয়ে সহজভাবেই অট্টহাস্য করে উঠলেন, তাঁর কাছে কথাটা অসম্ভব হাস্যকর মনে হলো; তিনি বললেন, তার মতন একটা লোকের ওপর যে তাঁর অনুরাগ পড়তে পারে, একথা মনে করাই অস্বাভাবিক। কোন সম্ভ্রান্ত নারীর পক্ষে তার গানে আনন্দ পাওয়া ছাড়া, তার কাছ থেকে অন্য আর কিছু আশা করা কি সম্ভব? যদিও সকলকে নিমন্ত্রণ করা হয়ে গিয়েছে, তবুও, তুমি যদি চাও, তাহলে বলো, আমি তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করে দিচ্ছি, এমন কি রবিবার দিনও। আমি তাকে একটা চিঠি লিখে জানিয়ে দেবো যে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি, ব্যস্, সব হাঙ্গামাই মিটে যাবে। আর তাই যদি হয়, তাহলে এ-ব্যাপারে, আসল মজার কথা হলো যে, লোকটা নিজেকে এতখানি বিপজ্জনক সত্যি মনে করবে কিনা! আমার দিক থেকে অন্ততঃ আমি একথা বলতে পারি যে, আমার মধ্যে এতখানি দম্ভ আছে যে, আমার সম্পর্কে অন্য লোককে ঐ রকম চিন্তা করতে দিতেই আমি পারি না। এবং তিনি যে মিথ্যা বলেছিলেন, তা নয়। তিনি যা বললেন, তিনি তা সত্য বলেই আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন। এবং তিনি এই ভাবে চেষ্টা করছিলেন, লোকটার বিরুদ্ধে তাঁর নিজের মনে একটা বিরূপতাকে গড়ে তুলতে, যার সাহায্যে তিনি, লোকটার আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন। কিন্তু তিনি তা পারেন নি! সব কিছুই তাঁর বিপক্ষে গিয়ে দাঁড়ালো, বিশেষ করে তাঁর পরাজয়ের কারণ হলো, ঐ মারাত্মক সঙ্গীত।

"এই ভাবে সেদিনকার ব্যাপার মীমাংসিত হয়ে গেল এবং রবিবার যথানির্দিষ্ট নিমন্ত্রিতরা সকলে এলেন এবং তাঁরা দুজনে একসঙ্গে বাজালেন।"

১৯

"একথা অবশ্য বলাই বাহুল্য যে, আমি ছিলাম অতিরিক্ত দাম্ভিক। নিজেকে জাহির করার এই দম্ভ বাদ দিয়ে চলা আমার পক্ষে এক রকম অসম্ভব ব্যাপার ছিল। তাই রবিবার দিন, আমার শক্তি অনুযায়ী আমি চেষ্টা করেছিলাম একটা রাজকীয় ভোজ দেবার। এবং সমস্ত আয়োজন সেই মতই কায়দামাফিক করা হয়েছিল। এমন কি কতকগুলো জিনিস আমি নতুন করে কিনে আনলাম এবং নিজে নিমন্ত্রিতদের বাড়ী গিয়ে আহ্বান জানিয়ে এলাম। সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ নিমন্ত্রিতরা একে একে এসে উপস্থিত হতে লাগলো এবং লোকটাও, হীরে-বসানো বোতামওয়ালা শার্ট পরে ফিটফাট সান্ধ্য-পোষাকে এসে উপস্থিত হলো! বেশ সহজভাবেই লোকটা সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে বেড়াতে লাগলো; যে যা প্রশ্ন করে হেসে তৎক্ষণাৎ তাতে সায় দেয়; তুমি যা-কিছু বলতে চাও বা করতে চাও, তা যেন সে আগে থাকতেই জানে এবং সে-ও ঠিক মনে মনে যেন তাই-ই ভাবছিল। তার চরিত্রের মধ্যে যা কিছু ত্রুটী বা দৈন্যতা আমি নিশ্চিন্ত এবং নিরুদ্বেগ আনন্দের সঙ্গেই সেদিন সন্ধ্যাবেলা লক্ষ্য করছিলাম; কারণ, সেই সব ত্রুটী বা দৈন্য আমাকে প্রমাণ করে দিচ্ছিল যে, সে যে-নিম্নস্তরের লোক, সেখানে নেমে আমার স্ত্রী কখনো তার প্রতি অনুরক্ত হতে পারে না। সুতরাং তার প্রতি ঈর্ষ্যা পোষণ করার আমার কোন কারণই থাকতে পারে না। ঈর্ষ্যার যন্ত্রণায় মানুষ যতখানি যন্ত্রণা পেতে পারে, আমি তার সবটাই ভোগ করেছিলাম, তাই এখন তার হাত থেকে আমি মুক্ত হতে চাই। আর তা ছাড়া, আমার স্ত্রী আমাকে যে আশ্বাস দিয়েছিলেন, সে-আশ্বাসকেও আমাকে স্বীকার করে নিতে হয়েছিল এবং আমার স্থির বিশ্বাস হয় যে আমার স্ত্রী আমাকে মিথ্যা স্তোক দেন নি। কিন্তু, তা সত্ত্বেও, যতই আমি মন থেকে ঈর্ষ্যাকে দূরে রাখতে চেষ্টা করি না কেন, আমি কিছুতেই সেদিন আমার স্ত্রী বা সেই লোকটার সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারছিলাম না। খাওয়া-দাওয়ার পর যতক্ষণ না সঙ্গীত আরম্ভ হলো, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই ভাবেই কেটে গেল। সব সময়েই আমার দৃষ্টি তাদের দুজনের ওপর ছিল, তাদের চলা-ফেরা, তাদের দৃষ্টি যেন তন্ন-তন্ন করে বিচার করে দেখছিলাম। আসল খাওয়ার ব্যাপারটা, সাধারণত ডিনার যে রকম আড়ষ্ট ও বিরক্তিকর দাঁড়ায়, ঠিক তেমনিই হলো, গতানুগতিক, বিরক্তিকর। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সঙ্গীত আরম্ভ হলো। সেই সঙ্গীত-সম্মেলনের প্রত্যেকটি ঘটনা, অতি তুচ্ছতম ব্যাপারও,

আজ পর্যন্ত স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পাই। কেমন ভাবে বেহালার বাক্সোটা লোকটা নিয়ে এলো, কেমন করে বাক্সোটা খুলল, বাক্সোর উপরে একটা ঢাকনা ছিল, কে এক জন তার মহিলা-বন্ধু তাকে তৈরী করে দিয়েছিল, কেমন ভাবে বাক্সো থেকে যন্ত্রটা বার করে তাতে সুর ঠিক করতে লাগলো, আজও স্পষ্ট সব মনে পড়ে। মনে পড়ে আমার স্ত্রী উদাসীন নিস্পৃহভাবে পিয়ানোর সামনে এসে বসলেন কিন্তু তাঁর সেই নিস্পৃহ উদাসীনতার আড়ালে আমি স্পষ্ট লক্ষ্য করলাম, তিনি তাঁর ভীরু লজ্জাকেই লুকোতে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন, কারণ তাঁর নিজের বিদ্যার দৌড় সম্বন্ধে তাঁর মনে একটা স্বাভাবিক ভীরুতা ছিল। মনে পড়ে পিয়ানোর সামনে বসার সঙ্গে সঙ্গে বেহালা আর পিয়ানো থেকে প্রাথমিক আয়োজনের সুর নির্গত হলো, পিয়ানোর ওপরে ষ্টাণ্ড থেকে গানের বই-এর পাতা সরানোর আওয়াজ এলো, তারপর, তারা দুজনে পরস্পর পরস্পরকে একবার দেখে নিয়ে মিলিত-ভাবে নিমন্ত্রিতদের দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বাজাতে আরম্ভ করলো···সে-ই প্রথমে তন্ত্রীতে সুর তুললো···সঙ্গে সঙ্গে তার মুখটা গম্ভীর হয়ে এলো··· কাণ পেতে যেন সে বেহালা থেকে যে শব্দ উঠছে, তাকে অনুসরণ করছে, তারপর ধীরে ধীরে হাত চালাতে সুরু করলো···পিয়ানো তার প্রত্যুত্তরে বেজে উঠলো···কনসার্ট আরম্ভ হলো···"

হঠাৎ পদনিশেফ্ এখানে থেমে গেল এবং কয়েক-বার তার গলা থেকে সেই বিচিত্র আওয়াজ বেরিয়ে এলো। কথা বলতে গিয়ে, হঠাৎ অনুনাসিক শব্দ করে থেমে গেল, কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলো। তার-পর আবার বলতে সুরু করলো :

"বিটোফেনের ক্রইট্জার সোনাটা তারা বাজাচ্ছিল। তার প্রথম মুখটা আপনার মনে আছে? এঁ্যা···মনে নেই? উঃ···এক বিচিত্র সঙ্গীত··· বিটোফেনের এই সোনাটা···বিশেষতঃ তার প্রথম অংশটা। এমনিতেই সঙ্গীত হলো এক বিচিত্র জিনিস। আমি বুঝতে পারি না। সঙ্গীত কি? কি তার প্রভাব? তার যে প্রভাব আমরা সচরাচর দেখতে পাই, কি করেই বা তা সম্ভব হয়?

"লোকে বলে, সঙ্গীত আমাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, আমাদের অন্তরাত্মাকে উন্নত করবার জন্যে। সম্পূর্ণ বাজে কথা। আমাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, নিশ্চয়ই করে এবং তা ভয়ঙ্কর ভাবেই করে, কিন্তু অন্তরাত্মার উন্নতির সঙ্গে তার কোন যোগ নেই। অন্তত আমার নিজের সম্বন্ধে আমি অকুণ্ঠভাবেই এই কথা বলতে পারি। সঙ্গীত অন্তরকে উন্নতও করে না, অবনতও করে না, এ শুধু করে তাকে উত্তেজিত। আমি যা বলতে চাইছি, কেমন করে আপনাকে তা বোঝাব? সঙ্গীত আমাকে বাধ্য করে আমার নিজের সত্তাকে ভুলে যেতে, এমন একটা অবস্থায় আমাকে নিয়ে যায়, যেখানে আমার কোন অধিকার আমার নিজের ওপর থাকে না। আমার অনুভূতির মধ্যে যা নেই, সঙ্গীতের এই সম্মোহনের ফলে আমি মনে করি যে, আমি তাই অনুভব করছি; যা আমার বোধের মধ্যে নেই, আমি মনে করি যে আমি তাই বুঝছি; এবং যা আমার ক্ষমতার বাইরে, আমি মনে করি যে তাই আমার করা সম্ভব। কথাটা আমি আর একটা ব্যাপার দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করছি···হাই তোলা বা হাসি যে ভাবে আমাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, সঙ্গীতও ঠিক সেইভাবেই কাজ করে। চোখে ঘুম না থাকলেও, সামনে কাউকে হাই তুলতে দেখলে, আমাদেরও হাই তুলতে ইচ্ছা জাগে; হঠাৎ যদি শুনি এক দল লোক হাসছে, তাদের হাসির আওয়াজ কাণে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমারও হাসি পায়, যদিও হাসির উপলক্ষ কিছু তখন আমার সামনে থাকে না। সেই সঙ্গীতের রচয়িতা সেই সঙ্গীত-রচনার সময়ে তাঁর মনের যে অবস্থা ছিল, তাঁর রচিত সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে আমাদের সেই অবস্থায় নিয়ে গিয়ে ফেলে। তখন তার অন্তরের সঙ্গে আমার অন্তর এক হয়ে যায় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমিও মনের এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থায় পরিভ্রমণ করে বেড়াই। কিন্তু কেন যে আমার মনের সেই অবস্থান্তর ঘটছে, তা আমি জানি না। যিনি সেই সঙ্গীত রচনা করেছিলেন, এক্ষেত্রে যেমন ধরুন, বিটোফেন ক্রইটজার সোনাটা রচনা করেছেন, তিনি জানতেন, কেন তিনি মনের সেই অবস্থায় ছিলেন। এবং তাঁর মনের সেই অবস্থার দরুণই তিনি কতকগুলো জিনিস করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং সেই জন্যেই এই সঙ্গীত রচনার মধ্যে তাঁর সেই মনের অবস্থার একটা সার্থকতা তাঁর কাছে ছিল। কিন্তু আমার কাছে তার কোন সার্থকতাই নেই। তাই যে সঙ্গীত আমরা শুনি, তা শুধু আমাদের মধ্যে একটা অসম্পূর্ণ চাঞ্চল্যেরই সৃষ্টি করে শুধু, কোন কিছু সম্পূর্ণ করে গড়ে তোলে না। কিন্তু সামরিক সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তা হয় না। সামরিক সঙ্গীত শোনার সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যরা নড়তে আরম্ভ করে, সেই সঙ্গীতের সঙ্গে তাল রেখে তাদের পা ওঠা-নামা করে এবং সেই-ভাবেই সেই সঙ্গীতের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

"যখন নৃত্য-সঙ্গীত বাজানো হয়, লোকে তার ছন্দে তালে নাচতে আরম্ভ করে, তখন সে ক্ষেত্রেও একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। গির্জ্জার ভেতরে যখন "মাস্" বাজানো হয়, তখন অন্তরের সঙ্গে একটা ধর্ম্মভাবের সংযোগ হয় এবং সেখানেও তার একটা সার্থকতা পাওয়া যায়। কিন্তু এ ছাড়া, অন্য সব ক্ষেত্রে সঙ্গীত শুধু অন্তরে একটা উদ্দেশ্য-বিহীন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে, সেই চাঞ্চল্যের প্রেরণায় মানুষ কি করবে, সেই চাঞ্চল্য কি ভাবে নিজেকে রিক্ত করবে, তার কোন নির্দ্দেশই থাকে না। এই জন্যেই সঙ্গীত মাঝে-মধ্যে মারাত্মক হয়ে ওঠে। চীন দেশে সঙ্গীত রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে এবং তাই থাকাই উচিত। যার যখন খুশী সে যদি সম্মোহন বিদ্যার প্রভাবে লোককে বিমূঢ় করে তাকে দিয়ে যে-কোন কাজ করিয়ে নেয়, তাহলে কোন আইন কি তা সহ্য করবে? বিশেষ করে, সেই সম্মোহন-কর্ত্তা যদি, ধরুন উদাহরণস্বরূপ এমন কোন লোক হয়, যে প্রকৃতই অসৎ এবং দুর্নীতিপরায়ণ?

"তাই যারা এ অস্ত্র ব্যবহার করতে জানে, তাদের হাতে এর চেয়ে মারাত্মক অস্ত্র আর কিছু হতে পারে না। এই ক্রুইট্জার সোনাটার কথাই ধরুন। একটা বদ্ধ বৈঠকখানা ঘরে, যেখানে মেয়েরা হাঁটু-তোলা স্বল্পবাস পোষাকে ঘোরাফেরা করছে, সেখানে এই সোনাটার প্রথম মুখটা বাজানো কি ঠিক? সেই বাজনা শোনার পর, উচ্ছ্বসিত হয়ে সবাই মিলে হাত-তালি দিল, তারপর টেবিলে বসে আইস্-ক্রীম খেতে খেতে আধুনিকতম কুৎসা নিয়ে আলোচনা করতে বসলো—এটা কি ঠিক? জীবনের যে সব অন্তরঙ্গ নিগূঢ় মুহূর্ত্ত খুব কমই দেখা দেয়, এ সঙ্গীত হলো সেই সব মুহূর্ত্তের জন্যেই এবং তখনও দেখতে হবে এই সঙ্গীতের ভাব অনুযায়ী কোন প্রয়োজনীয় কাজ সেখানে করবার মত আছে কিনা, তবেই এই সঙ্গীত বাজানো চলতে পারে। এই সঙ্গীত বাজানোর উদ্দেশ্য হলো, আমাদের স্নায়ুকে উত্তেজিত করে তুলে ভাবসঙ্গত কোন কর্ত্তব্যে প্রণোদিত করা, এই সঙ্গীত বাজানোর ফলে আমাদের মধ্যে এমন কতকগুলো অনুরাগ বা প্রেরণাকে জাগিয়ে তোলা হয় যার পরিপূরক কোন কর্ত্তব্য যদি সেখানে না থাকে···তা হলেই তার ফল বিষময় হতে বাধ্য হয়।

"অন্ততঃ এই সঙ্গীত আমার ওপর ভয়ঙ্কর প্রভাব বিস্তার করেছিল। মনে হলো আমার মধ্যে যেন জেগে উঠলো নূতনতর সব অনুভূতি, আমার সামনে কে যেন হঠাৎ তুলে ধরলো নবীনতর সম্ভাবনার আশা, যার কথা কোন দিন এর আগে স্বপ্নেও ভাবিনি। আমার অন্তরের মধ্যে কে যেন গুঞ্জন করে উঠলো, এতদিন ধরে যেভাবে ভেবে এসেছি, যেভাবে জীবন যাপন করে এসেছি, তা ভুল, তার পরিবর্ত্তে এই যে-সুর আজ মনে জেগে উঠলো, এ যেন জাগিয়ে তুললো নতুনভাবে জীবনকে ভাববার দেখবার সম্ভাবনার আশাকে! কিন্তু কি যে এই নতুনতর সম্ভাবনা কি তার স্বরূপ, তার কোন স্পষ্ট অভিজ্ঞান অবশ্য তখন জানতাম না কিন্তু একটা নতুনতর জীবনের অস্তিত্বের সম্ভাবনাই হৃদয়কে উদ্বেল করে তুললো। যে-সব লোককে আমি জানতাম, চিনতাম, আমার স্ত্রী এবং সেই সঙ্গে সেই লোকটিও, এক সম্পূর্ণ নতুন আলোকে যেন আমার সামনে দেখা দিল। সোনাটার প্রথম মুখটার পর তার পরবর্ত্তী অংশও তারা বাজালো। তার মধ্যে বিশেষ নতুনত্ব কিছু ছিল না, বিশেষ করে তার উপসংহারটা আমার কাছে খুব দুর্বলই লাগলো। তারপর সমাগত নিমন্ত্রিতদের অনুরোধে তারা দুজনে আর্ণেষ্টের একটা সঙ্গীত আর খানকতক হালকা ধরণের জিনিস বাজালো কিন্তু প্রথম শোনা সোনাটার সেই আরম্ভ আমার মনের ওপর যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার শতাংশের এক অংশ প্রভাবও মনের ওপর পড়লো না। সেদিন সন্ধ্যার বাকি সময়টা আমি বেশ খোস-মেজাজেই ছিলাম। সেদিন সন্ধ্যায় আমার স্ত্রীকে যতখানি সুন্দর লেগেছিল, এর আগে আর কোন দিন তাঁকে সে রকম সুন্দর দেখিনি। সেই দুই চোখের বিদ্যুৎ-আভা, পিয়ানো বাজাবার সময় তার সেই গম্ভীর সুসংযত ভঙ্গী, সারা দেহের সেই উচ্ছৃঙ্খল পেলবতা, এবং সঙ্গীত শেষ করার পর তাঁর সেই স্নিগ্ধ-মধুর মৃদু হাসি, যা তাঁর সমস্ত দেহসৌষ্ঠবকে আলোকিত করেছিল, সেদিন যেন তা সুন্দরতর হয়ে আমার চোখে ফুটে উঠেছিল। দুচোখ ভরে তা দেখলাম এবং তার কোন স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা করবার কোন প্রবৃত্তি তখন জাগেনি। আমি জানতাম, এই সঙ্গীতের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আমার মনে যে নতুন অনুভূতির আনন্দ জেগে উঠেছে, তিনিও তাঁর মনে সেই অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব আনন্দের অনুভূতি উপভোগ করছেন, তাঁরও মনের জগতে অস্পষ্টভাবে সেই নতুন চেতনা খেলা করে বেড়াচ্ছে। সেদিনকার সেই সঙ্গীত-সম্মেলন সম্পূর্ণ সার্থকভাবেই শেষ হয়ে গেল··· নিমন্ত্রিতরা যে-যার ঘরে ফিরে গেল।

"আমি যে দুদিনের জন্য গাঁয়ে চলে যাচ্ছি, সেকথা ট্রুকাচেভস্কী জানতো বলে বিদায়ের সময় সে-কথা

উল্লেখ করে বললো, আবার সে যখন মস্কোতে আসবে, তখন যেন আজকের সন্ধ্যার এই আনন্দের পুনরাবৃত্তির সুযোগ থেকে সে বঞ্চিত না হয়। তার কথা থেকে আমি অনুমান করলাম যে, আমার অনুপস্থিতিতে আমার বাড়ীতে সে আসতে চায় না এবং এই অনুমানের ফলে চিত্তে খানিকটা শান্তিই পেলাম! এবং এই থেকে স্পষ্টই বোঝা গেল যে, আমি ফিরে আসার আগেই সে মস্কো ছেড়ে চলে যাবে, সুতরাং তার সঙ্গে আর আমার এখন দেখা-সাক্ষাতের কোন সম্ভাবনাই নেই। এই প্রথম অবিমিশ্র আনন্দে তার করমর্দ্দন করলাম এবং আজকের সন্ধ্যার আনন্দদানের জন্যে ধন্যবাদ জানালাম। আমার স্ত্রীর কাছ থেকে সে যখন বিদায় নিলো, সেই বিদায়-সম্ভাষণের মধ্যে অস্বাভাবিক বা অশোভন কিছুই দেখতে পেলাম না। আমার স্ত্রী আর আমি, দুজনেই এই সঙ্গীত-আয়োজনের দরুণ অন্তরে তৃপ্তিই বোধ করলাম।"

২০

"দুদিন পরে আমার স্ত্রীর কাছ থেকে যথারীতি বিদায় নিয়ে পরম নিশ্চিন্ত ও তৃপ্ত অন্তরে গাঁয়ের দিকে যাত্রা করলাম। গাঁয়ে গেলেই আমি প্রচুর কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতাম···সেখানে যেন একটা নতুন জীবনের স্বাদ পেতাম, একটা স্বতন্ত্র ছোট-খাটো জগৎ, যে-জগতে আমাকে সচরাচর বাস করতে হয়, তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সেখানে আমার দফতরে, দিনে দশ ঘণ্টা করে দুদিন উপরি উপরি পরিশ্রম করলাম। গাঁয়ে যেদিন এসে পৌঁছাই, তার পরের দিন, আমার দফতরে বসে আছি, এমন সময় একটা আমার হাতে দেওয়া হলো, আমার স্ত্রীর লেখা ।, তৎক্ষণাৎ চিঠিটা খুলে পড়লাম, চিঠিতে ছেলেদের কথা, নার্সের কথা, এই কদিন তিনি যে-সব কেনা-কাটা করেছেন তার বিশদ বিবরণ সমস্তই লিখেছেন এবং চিঠির সব শেষে, যেন একান্ত একটা তুচ্ছ সংবাদ-রূপে জানিয়েছেন, 'ট্রুকাচেভেস্কী এসেছিল···যে সঙ্গীতটার কপি আমাকে দেবো বলেছিল, সেটা সঙ্গে করে এনেছিল···আমার সঙ্গে আবার বাজাতে চাইলো কিন্তু আমি রাজী হয় নি।' এখন কথা হলো, কোন সঙ্গীতের কপি দিয়ে যাওয়া সম্পর্কে সে কোন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কিনা, সে-সম্বন্ধে আমি কোন কিছুই স্মরণ করে উঠতে পারলাম না···বরঞ্চ আমার স্পষ্ট ধারণা হয় যে, সে আমাদের কাছ থেকে পুরোপুরি ভাবেই বিদায় নিয়ে গিয়েছিল। তাই এই সংবাদটি আমার কাছে খুব সুখকর বোধ হলো না। কিন্তু তখন আমার হাতে এত কাজ ছিল যে সেই ব্যাপার ভাবতে বসার কোন সময়ই ছিল না। কাজ সেরে সন্ধ্যাবেলায় নিজের বাড়ীতে ফিরে সেই চিঠিটা আবার ভাল করে পড়লাম। আমার অসাক্ষাতে ট্রুকাচেভেস্কী যে আমার বাড়ীতে এসেছে, এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে চিঠির সমস্ত সুর আমার কাছে যেন রহস্যময় বোধ হতে লাগলো। আমার মনের মধ্যে ঈর্ষ্যার সেই উন্মাদ পশু আবার ক্ষিপ্ত হয়ে তার নিজের বিবরে গর্জ্জন করে উঠলো এবং পাছে সে আমাকে পেয়ে বসে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিলাম।

"মনে মনে বলে উঠলাম, কি জঘন্য এই ঈর্ষ্যার অনুভূতি! আমার স্ত্রী যা লিখেছেন, তার মধ্যে অস্বাভাবিক এমন কি আছে? কিছুই তো নেই। মনকে এই ভাবে বুঝিয়ে আমি শুয়ে পড়লাম এবং কালকে যে-সব কাজ শেষ করতে হবে মনে মনে তার একটা নির্ঘণ্ট করতে লাগলাম। যখন জেলা-বোর্ডের কাজে গাঁয়ে আসতাম, নতুন পরিবেশের দরুণ তাড়াতাড়ি ঘুমুতে পারতাম না···কিন্তু সেদিন রাত্রিতে খুব তাড়াতাড়িই ঘুমিয়ে পড়লাম।

"হঠাৎ ঘুমের মধ্যে, বিদ্যুতের ছোঁয়া লেগে যেমন লোকে চমকে ওঠে, তেমনি চমকে হঠাৎ জেগে উঠলাম। জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই দেখি, ঘুমের অবচেতন অবস্থার মধ্যে আমার স্ত্রীর কথাই ভাবছি, তাঁর সঙ্গে আমার ভালবাসার কথা, ট্রুকাচেভেস্কীর কথা সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে। তাদের দুজনকার সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে রাগে আর আতঙ্কে আমার মন যেন নিষ্পেষিত ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে—তবু প্রাণপণ বলে চেষ্টা করলাম, যুক্তি দিয়ে মনকে বোঝাতে। নিজের মনেই বলে উঠলাম, কি হাস্যকর এই সন্দেহের বাতিক! যে-সব সন্দেহ করছি, বাস্তব জগতে তার ভিত্তি কোথাও নেই! কি করে আমার স্ত্রীকে এত হীন ভাবতে পারলাম? একদিকে একজন অপদার্থ লোক, যাকে বলা যেতে পারে সামান্য একজন ভাড়াটে বাজিয়ে···চরিত্রহীন র আর একদিকে এক সম্ভ্রান্ত রমণী, একটা বিরাট সংসারের সুযোগ্যা কর্ত্রী··· আমার স্ত্রী। অসম্ভব! সম্পূর্ণ অসম্ভব! এই হলো চিন্তার একটা ধারা। কিন্তু তার পাশেই দেখি বয়ে চলেছে স্বতন্ত্র আর একটা ধারা···সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল তার বক্তব্য। কেন অসম্ভব কিসে? কেনই বা তা ঘটতে না পারে? সে লোকটা অবিবাহিত, খাওয়া-পরার ভাবনা নেই, চেহারার দিক থেকে ছিপছিপে

সুমার্জ্জিত, তার ওপর নীতির কোন বালাই নেই, তার জীবনের আদর্শ হলো, সামনে যা এসে পড়ে, যদি আনন্দ পাও তা লুঠে নাও। এবং তাদের দুজনের মধ্যে যোগসূত্ররূপে রয়েছে সঙ্গীত, ইন্দ্রিয়-ভোগের সব চেয়ে পরিমার্জ্জিত উপকরণ। কিসের প্রভাবে লোকটা ভব্যতার নির্দ্দিষ্ট সীমা-রেখার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখবে? তেমন কোন কিছুই তার তো মনে নেই। উল্টে, তার উত্তেজনাব খোবাক তাব চারদিকে। আর আমার স্ত্রী? কি দিয়ে তৈরী তিনি? যেমন রহস্যময়ী ছিলেন, তেমনি রহস্যময়ীই রয়ে গিয়েছেন। আমি তো তাঁকে সত্যি জানি না। আমি জানি তাঁকে শুধু প্রবৃত্তিব বন্দী জীব বলে। প্রবৃত্তিব বন্দী যে জীব, সংযম তার কোথায়?

"তখন আমাব চোখের সামনে ভেসে উঠলো তাদের দুজনেব মুখ, সেই স্মরণীয় রবিবার দিন সঙ্গীত-সম্মেলনে শেষ সঙ্গীতগুলো বাজানোর সময় ঠিক যে-রকম দেখেছিলাম। আজ যেন মনে পড়তে লাগলো, সে মুখের মধ্যে দেখেছিলাম উদগ্র কামনারই দীপ্তি। হায! এ সব দেখে-শুনে, মূর্খ আমি, কেন শহর ছেড়ে গাঁয়ে চলে এলাম? যতই তাদের মুখ মনে পড়ে, ততই এক প্রশ্ন মনেব মধ্যে বড় হয়ে উঠতে থাকে···এটা কি দিবালোকের মতন স্বচ্ছ বোধ হচ্ছে না যে, সেদিন সে-রাত্রিতে তাদের দুজনার মধ্যে বোঝাপড়া শেষ হয়ে গিয়েছিল? তাদের মধ্যে আর কোন বাধা যে কোথাও ছিল না, স্পষ্ট কি তাদের মুখে সে-কথা সেদিন লেখা ছিল না? তাদের দুজনের মুখে, বিশেষ করে আমাব স্ত্রীর মুখে যে স্মিত হাস্য লেগেছিল, সে তো স্পষ্ট লজ্জারই চিহ্ন, যা ঘটে গিয়েছে তারই লজ্জিত স্মৃতি? মনে পড়তে লাগলো, পিয়ানোব দিকে যখন আমি এগিয়ে গেলাম, রক্তিম মুখ থেকে ধীবে ঘাম মুছে তিনি স্নিগ্ধ হেসে উঠলেন, ভীরু তৃপ্তিব সুকোমল হাসি। তখন থেকেই তারা দুজনে দুজনার দিকে চোখ তুলে চেয়ে দেখতে আর পারছিল না···খাবার সময়, যখন লোকটা আমার স্ত্রীর গেলাসে জল ঢেলে দিচ্ছিল, সেই সময় আবার তারা সংগোপনে পরস্পর পরস্পবের চোখের দিকে চাইলো। সেই মুখ, সেই দৃষ্টি, সেই সলজ্জ দুর্ব্বল হাসি, মনে পড়তেই ভেতর থেকে সর্ব্বাঙ্গ যেন কেঁপে উঠলো। আমার কাণে কে যেন বললো, হাঁ গো হাঁ, তাদের মধ্যে এখন সব ঘটনাই ঘটে গিয়েছে। সেই সঙ্গে আর এক কাণে আর একটা আওয়াজ যেন এলো, তুমি অর্দ্ধ-উন্মাদ হয়ে গিয়েছ, তুমি কি জান না, তা কখনই হতে পারে না? সেই অন্ধকার এক ঘরে, সেই বিভীষিকাময় চিন্তার কবলে পড়ে, এক বিচিত্র ভয়ঙ্কর অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলাম। হঠাৎ দেশলাই নিয়ে একটা কাঠি জ্বালালাম···সেই ক্ষণ-আলোকে সেই ছোট্ট ঘরের চারিদিকের হলদে রঙের দেয়ালের দিকে চেয়ে এক অবর্ণনীয় আতঙ্ক আমাকে পেয়ে বসলো। পরস্পর-বিরোধী চিন্তাধারার মধ্যে পড়ে যখন লোকে কোন মীমাংসার সূত্রই খুঁজে পায় না, তখন যেমন সিগারেটের পর সিগারেট খেয়ে যায়, আমিও তেমনি আমার চেতনাকে অবলুপ্ত কবে দেবার জন্যে যাতে করে সেই আপাত-দ্বন্দ্ব আর চোখে না পড়ে, সিগারেটের পর সিগারেট খেয়ে যেতে লাগলাম। সে রাত্রিতে চোখে আর ঘুম এলো না। ভোর পাঁচটার সময় বিছানা থেকে উঠে পড়লাম, জোর কবে ঠিক করলাম যে সেই দুর্ব্বহ মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে কিছুতেই নিজেকে আর রাখবো না, দাবোয়ানকে ডেকে আদেশ কবলাম, ঘোড়া ঠিক করতে। দফতরে তাড়াতাড়ি একটা চিঠি লিখে জানালাম যে, 'এক জরুরী কাজেব জন্যে মস্কো থেকে হঠাৎ আমাব ডাক এসেছে, তাই আমাকে চলে যেতে হচ্ছে। আমাব অনুপস্থিতিতে আমার জায়গায় অন্য আর কোন সভ্য যেন কাজটা চালিয়ে নেয়।' আটটার সময় ঘোড়াব গাড়ীতে চেপে বসলাম। গাড়ী ছেড়ে দিল।"

২১

এমন সময় ট্রেণের কামরার ভেতর রেলেব কণ্ডাক্টর এসে দেখলো যে কামরার মোমবাতি গর্ত্তে ঢুকে গিয়েছে, ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিয়ে চলে গেল। পরিবর্ত্তে আর একটা মোমবাতি আর জ্বাললো না। বাইরে তখন দিনের আলো একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে আসছে। যতক্ষণ কণ্ডাক্টর কামরার ভেতর ছিল, পদনিশেফ চুপ করেই রইলো, মাঝে-মাঝে শুধু তার দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাচ্ছিলাম। কণ্ডাক্টর চলে যেতে, আধ-অন্ধকারে দুজনে চুপ করে বসে রইলাম। জানলার শার্সির ঝাঁকানির শব্দ আর ট্রেণের চাকার আর্ত্তনাদের সঙ্গে নিদ্রিত কেরাণীটির একঘেয়ে নিয়মিত নাক-ডাকার আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। ভোরের সেই আবছা অন্ধকারে পদনিশেফের চেহারা স্পষ্ট করে চোখে পড়ছিল না। সে আবার বলতে সুরু করলো, বক্তব্যের সকরুণতার সঙ্গে সঙ্গে তার আওয়াজও তীব্রতর হয়ে উঠলো।

"ঘোড়ার গাড়ীতে ত্রিশ মাইল যাওয়ার পর রেলে উঠতে হবে, রেলে আধ ঘণ্টা লাগবে। সেই ত্রিশ

মাইল ঘোড়ার গাড়ীতে আসতে চমৎকার লাগলো। হিমের শারদ প্রভাত···চারিদিকে আলো ঝলমল করে উঠছে রোদ···চমৎকার মসৃণ রাস্তা, রাস্তার ওপর সূর্য্যের আলো ঝিকমিক করে উঠছে···বাতাসে আরাম লাগছে। ভালই লাগলো সে-পথটা ঘোড়ার গাড়ীতে। সকাল হতেই গাড়ী ছেড়ে দিল এবং গাড়ী ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনটাও হাল্কা হয়ে এলো। চারিদিকে মাঠ-ঘাট দেখতে দেখতে, পথের মধ্যে যে-সব লোকজন পায়ে হেঁটে চলাচল করছিল তাদের দেখতে দেখতে, আমার গন্তব্য সম্বন্ধে আমি সাময়িকভাবে যেন বিস্মৃত হয়ে গেলাম। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, আমি যেন বেড়াতে বেরিয়েছি; যে-সব ঘটনায় আমি বাধ্য হয়ে হঠাৎ এই প্রত্যাবর্ত্তন করছি, যেন বাস্তব জগতে কোথাও তাদের কোন অস্তিত্ব নেই। এবং এইভাবে যে নিজেকে ভুলে থাকতে পেরেছিলাম, তার জন্যে মনে এক বিচিত্র তৃপ্তি বোধ করি। যে উদ্দেশে যাচ্ছি, যখনি তার কথা মনে পড়ে যেতো, তখনি মনকে বোঝাতে চেষ্টা করতাম, সে-সম্বন্ধে এখন ভেবে কোন লাভ নেই, যা করবার তা পরে-পশ্চাতে ভেবে করা যাবে'খন। যখন ষ্টেশনের আধাআধি এসেছি, তখন হঠাৎ গাড়ীর চাকাটা ভেঙ্গে গেল। মেরামত করবার জন্যে থামতে হলো। এই আকস্মিক ঘটনাটি যত তুচ্ছ মনে করে-ছিলাম, পরে দেখলাম যে, সেটা মোটেই তা নয়··· পথে এই দেরী হয়ে যাওয়ার দরুণ নির্দ্দিষ্ট এক্‌স্‌প্রেস ট্রেণটা ধরতে পারলাম না। বাধ্য হয়েই কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করে থাকার পর এক প্যাসেঞ্জার ট্রেণে মস্কো আসতে হলো। সেই জন্যে যেখানে ভেবেছিলাম যে ভোরবেলা এসে পৌঁছব, পৌঁছলাম মধ্য-রাত্রিতে। বাড়ীতে যখন এসে পৌঁছলাম, তখন রাত একটা বাজে।

"সারা পথ প্রাণপণ চেষ্টা করে যে চিন্তাকে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলাম, সেই চিন্তাই আমার অজ্ঞাতে সারা পথ আমাকে ক্ষেপিয়ে নিয়ে এসেছে। ক্রমশঃ নিজের সন্দিগ্ধ চিন্তার জালে নিজে এমনভাবে জড়িয়ে পড়ি যে, সেই চিন্তার হাত থেকে মুক্ত হবার জন্যে আত্মহত্যার কথাও চিন্তা করি। কিন্তু আমার মৃত্যুর পর আমার স্ত্রী জীবিত থাকবেন, সেই লোকটা জীবিত থাকবে, এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই ভয়াবহ ঈর্ষ্যার জ্বালা সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে যে অনিশ্চয়তা ছিল, তাতে যেন আরো বেশী করে আমার মন উত্তেজিত হয়ে উঠতে থাকে।

"ট্রেণ থেকে নেমে যখন বাড়ী যাবার জন্যে আবার ঘোড়ার গাড়ীতে উঠলাম, তখন হঠাৎ মনে পড়লো, আমার সমস্ত বিছানা-পত্র ভুলে ফেলে এসেছি ট্রেণে। তার জন্যে আবার ফিরে যাওয়া সম্ভব হলো না···না, এখন আমাকে বাড়ি যেতে হবে আগে। ষ্টেশন থেকে বাড়ী পর্য্যন্ত, এই রাস্তাটুকু কি ভাবে এসেছিলাম, আজ আর তা কিছুতেই মনে করতে পারি না। কি তখন ভাবছিলাম? কি বা ছিল আমার ইচ্ছা? কিছুই মনে পড়ে না।

"শুধু মনে পড়ে, এইমাত্র চেতনা মনের মধ্যে জাগ্রত হয়েছিল যে সামনেই এমন কিছু একটা ঘটতে চলেছে, যার সঙ্গে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের মর্ম্মান্তিক যোগ আছে। সে ঘটনা যে শুধু আমার চিন্তার মধ্যেই ছিল, না, তার ছায়া আগে থাকতে আমার মনের মধ্যে এসে পড়েছিল, কিছুই বলতে পারি না।

"দরজার সামনে এসে গাড়ী থামলো তখন রাত প্রায় একটা হবে। রাস্তার ধারের দরজার কাছে দেখি দু'-একজন গাড়োয়ান দাঁড়িয়ে, যেন ভাড়া নেবার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। সেই কথাই আমার স্বভাবত মনে হলো, কেন না দেখলাম, খোলা জানলা দিয়ে ভেতরে আলো জ্বলছে, দেখলাম, বৈঠকখানা ঘরে, বারাণ্ডার দিকের জানলায়, সবগুলোতেই দিব্য আলো জ্বলছে। এত রাত্রিতে বাড়ীতে এ-রকমভাবে আলো জ্বলছে কেন, সে সম্বন্ধে মনে কোন আলোড়ন আনবার চেষ্টা না করে, বাড়ীর ভেতর ঢুকলাম, এবং দরজার বাইরে কলিং-বেল টিপলাম। দ্বাররক্ষী জর্জ্জ এসে দরজা খুলে দিল। লোকটা খুব কাজের এবং আদৌ অসাধু প্রকৃতির নয়, তবে একেবারে নির্বোধ। প্রথম জিনিস যা নজরে পড়লো, পাশের ঘরে আলনায় সেই ওভার-কোটটা ঝুলছে···তার সঙ্গে টুপী আর কোটও রয়েছে। স্বভাবতই তাতে আমার বিস্মিত হয়ে যাওয়াই উচিত ছিল কিন্তু আমি বিন্দুমাত্র বিস্মিত হলাম না, কারণ, মনে মনে এতক্ষণ ধরে এই ব্যাপারই অনুমান করে আসছিলাম। জর্জ্জকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কে এসেছে?' সে উত্তর দিল, 'ট্রুকাচেভেস্কী।' মনে মনে শুধু বললাম, ঠিক এই ব্যাপারই তো ভাবছিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আর কেউ এসেছে?' উত্তর এলো, 'না, আর কেউ আসে নি।' তার কণ্ঠস্বর থেকে আমি বুঝলাম সে যেন আমাকে আশ্বাস দিতে চাইছে, আমাকে খুশী করবার জন্যেই যেন বলছে, সন্দেহ করবার মত আর কেউ-ই আসেনি। নিজের মনেই বলে উঠলাম, ঠিক হয়েছে! জিজ্ঞাসা করলাম,

'ছেলেরা ?' জর্জ্জ জানালো, 'ঘুমোচ্ছে ?' তাকে বাড়ী থেকে সরিয়ে ফেলবার জন্যে আদেশ করলাম, 'এক্ষুনি ষ্টেশনে ছুটে যাও···আমার বেডিঙ ফেলে এসেছি !' কালবিলম্ব না করে জর্জ্জকে রাস্তায় বের করে আমি সদর দরজা বন্ধ করে দিলাম। আমি সম্পূর্ণ একা এবং যা-হোক কিছু-একটা এখুনি আমাকে করতে হবে, এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে এক ভয়াবহ বিচিত্র অনুভূতি পেয়ে বসলো···সমগ্র দেহ-মন সে অনুভূতির আক্রমণে কেঁপে উঠলো। কিন্তু কি করবো ? কি ভাবেই বা করবো ? তখনও পর্য্যন্ত আমার মনে সে সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না, শুধু এই কথাই তখন স্থির সত্য বলে মনে স্বীকার করে নিয়েছিলাম যে, তাদের দুজনের মধ্যে যা-কিছু ঘটবার তা সম্পূর্ণভাবেই ঘটে গিয়েছে, আমার স্ত্রীর অপরাধ সম্বন্ধে দ্বিধা করবার আর কোন অবকাশই নেই···এবং সে অপরাধের জন্যে তাঁকে কালবিলম্ব না করে শাস্তি দিতেই হবে···চিরকালের মত তাঁর সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। ইতিপূর্ব্বে আমার মনে দ্বিধা আসতো, কোন কিছু ঘটলেই মনে মনে ভাবতাম, হয়ত ব্যাপারটা সত্যি নয়, হয়ত আমারই ভুল হয়েছে কোথাও··· কিন্তু সেদিন সে-মুহূর্ত্তে সে-জাতীয় কোন দ্বিধাই আর আমার মনে জাগলো না। সমস্ত কিছু যেন অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে স্থিরীকৃত হয়ে গিয়েছে। সেই লোকটার সঙ্গে এই ভাবে একা একা···আমার সম্পূর্ণ অজান্তে···আর এই রাত্রিতে··· এ থেকে একটিমাত্র সিদ্ধান্তই করা যায়, তারা এমন এক অনুভূতির আবেষ্টনীর মধ্যে আছে, যাতে মানুষ জগতে আর সব-কিছু ভুলে যায়। অথবা তার চেয়েও ভয়াবহ, এই চরম দুঃসাহসিকতার পথ যে তারা অবলম্বন করেছে, সেটা ইচ্ছে করেই ধীরে-সুস্থে হিসেব করেই তারা করেছে। তারা ভেবেছে, এই ভাবে প্রকাশ্যে সেই মহাপাপ-অভিসন্ধি যদি তারা চরিতার্থ করে তাহলে সন্দেহ করবার অবকাশই আর থাকবে না। অতি পরিষ্কার, স্বচ্ছভাবেই তা বোঝা যাচ্ছে···কোন সন্দেহ বা ভুল এতে হতে পারে না। একমাত্র একটা চিন্তা অস্বস্তিকর মনে হতে লাগলো, যদি তারা এই অবকাশে কোন রকমে পালাবার পথ কিছু বার করে ফেলে, আমার চোখে ধুলো দেবার জন্যে যদি কোন নতুন ফন্দী আবিষ্কার করে, যার ফলে আমার প্রত্যক্ষ অনুভূতির এই সাক্ষ্য মিথ্যা হয়ে যেতে পারে ! হাতে-নাতে তাদের এই পাপ হয়ত আর তখন ধরা না যেতেও পারে।

"যাতে কালবিলম্ব না করে তাদের দুজনকে একসঙ্গে ধরতে পারি, সেই জন্যে উঠোন দিয়ে না গিয়ে সোজা বারাণ্ডা ধরে ছেলেদের খেলাঘরের ভেতর দিয়ে পা টিপে-টিপে যে-ঘরে তারা বসেছিল, সেই দিকে অগ্রসর হলাম। পাশাপাশি দুটো ছোট ঘর ছেলেদের জন্যে ছিল। প্রথম ঘরটার এসে দেখি, ছেলেরা অকাতরে ঘুমুচ্ছে। দ্বিতীয় ঘরে নার্স ঘুমুচ্ছিল, মনে হলো যেন সাড়া পেয়ে সে নড়ে উঠলো, বুঝি জেগে উঠে বসে। জেগে উঠে যদি সে দেখে কি ব্যাপার হচ্ছে, তাহলে আমার সম্বন্ধে সে যা ভাববে, তা ধারণা করতে আমার বিলম্ব হলো না। এই কথা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে গভীর এক আত্ম-করুণায় দু'চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এলো ; পাছে ছেলেরা জেগে ওঠে এই আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি পেছন ফিরে তেমনি সন্তর্পণ পায়ে ছুটে আমার পড়বার ঘরে এসে সোফায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম··· নিজেকে রোধ করতে না পেরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম।

"আমি···জীবনে যে-লোক অমর্য্যাদাকর কোন কিছু করে নি···যার মা-বাপ সেই সম্ভ্রান্ত আদর্শ আমরণ বজায় রেখে গিয়েছেন···নিজের সংসারের আবেষ্টনীর মধ্যে যে সারা জীবন ধরে পারিবারিক শান্তির স্বপ্ন দেখে এসেছে···সেই আমি···স্বামী হিসাবে যে কোন দিন স্ত্রীর অবিশ্বাসের বিন্দুমাত্র কারণ ঘটায় নি··· তাকে কিনা আজ এই দৃশ্য দেখবার জন্যে বেঁচে থাকতে হলো ? আর···আমার স্ত্রী···পাঁচ-পাঁচটি সন্তানের জননী, সে কিনা একজন সামান্য বাজনা-দারের বুকে নিজেকে বিলিয়ে দিল···শুধু সে-লোকটার ঠোঁট দুটো এখনো রঙীন আছে, তাই ! না, সে-নারী কখনই মানবী নয়, সে হলো—

"আর যে-ঘরে তাঁর ছেলেরা শুয়ে আছে, যে-ছেলেদের জন্যে তিনি সারা জীবন ধরে কি ভালবাসাই না দেখিয়ে এসেছেন···তার পাশের ঘরেই তিনি এই সব করছেন ! আর আমার চোখে ধুলো দেবার জন্যে কি চিঠিই না তিনি লিখেছিলেন ? কি করে বলবো, কত দিন ধরে এ রকম চলছে ? হয়ত গোড়া থেকেই এই ভাবে চলছিল গোপনে। আজ রাত্রিতে না এসে যদি কাল সকালে যেমন আসবার কথা ছিল, তেমনি আসতাম, তাহলে এই নারীই তো হাস্যমুখে আমাকে গ্রহণ করতো, আমার জন্যে দেখতাম পরিপাটী করে তিনি চুল বেঁধেছেন, ক্ষীণ কটিদেশকে সুকৌশলে পরিস্ফুট করে পোষাক পরেছেন, মদালস মধুর অবসাদে আমাকে আলিঙ্গন করছেন···নার্সটা কি মনে করবে ?

আর লজ্জা? বেচারা লীলা, সে-ই বা কি ভাববে? লীলার আজ সে-বয়স হয়েছে, যখন সে আশে-পাশের ঘটনা একটু-আধটু বুঝতে শিখেছে। নিজের মনে ধিক্কার দিয়ে উঠলাম, হায় রে নির্লজ্জ...হায় রে লম্পট!

"সোফা থেকে ওঠবার চেষ্টা করলাম কিন্তু উঠতে পারলাম না। বুকের ভেতর এত জোরে হৃদ্‌স্পন্দন হচ্ছিল যে পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারছিলাম না। হয়ত মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে যাব··· মরে যাব! আমার স্ত্রী, সেই হবে আমার মৃত্যুর কারণ! আমার মৃত্যুতে তার তো কিছু যায়-আসে না? কিন্তু না, আমার এই হঠাৎ মৃত্যু তার কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য যে হবে, তা হতে দেবো না···সে-সুখ থেকে অন্তত তাকে বঞ্চিত করবো! কিন্তু এ কি করছি? এখানে এই ঘরে বসে আমি এই সব ভাবছি, আর ঠিক এই মুহূর্তে তারা দুজনে সামনের ঘরেই পরমানন্দে খাচ্ছে, হাসছে, আর···কেন, কেন সেই সময়ই তাকে আমি গলা টিপে মেরে ফেললাম না? কোন্ সময়ে? মাত্র এক সপ্তাহ আগে, এই ঘর থেকে যেদিন তাকে বার করে দিয়েছিলাম, নিষ্ফল রাগে যখন এই ঘরের জিনিসপত্রই ভেঙে চুরমার করেছিলাম? স্পষ্ট মনে পড়ছে, সে-সময় আমার মনের অবস্থা কি রকম ছিল। শুধু যে মনে পড়ছে নয়, ঠিক সেদিনকার মতনই তাকে প্রহার করবার, মেরে ফেলবার তীব্র উন্মাদনা আবার জেগে উঠছে।

সেদিনকার মতন আজও, মনের মধ্যে থেকে এক নিমিষের মধ্যে অন্য সব ভাবনা-চিন্তা যেন উবে গেল— একমাত্র চেতনা জেগে রইলো, একটা কিছু করতেই হবে···"

২২

"প্রথম যে কাজ করলাম, সেটা হলো, পা থেকে বুট জুতোটা খুলে ফেলা। সামনের দেয়ালের গায়ে আমার বন্দুক আর ছোরাগুলো টাঙানো ছিল···মোজা-পরা পায়ে দেয়ালের কাছে গিয়ে একটা দামাস্কাস ছোরা নামিয়ে আনলাম···ভীষণ ধারালো···আনকোরা নতুন, এর আগে আর ব্যবহার করা হয়নি। খাপ থেকে খুলে বার করলাম। খাপটা হাত ফসকে সোফার পেছন দিকে পড়ে গেল···মনে আছে, তখন আর সেটা খুঁজতে চেষ্টা না করে, মনে মনে বলেছিলাম, থাক্, পরে খুঁজে দেখা যাবে, না হয়, মনে করবো হারিয়ে গিয়েছে। ওভারকোটটা গায়ের ওপর ছিল, সেটাকে খুলে রেখে দিলাম। ধীরে···অতি সন্তর্পণে চললাম, সেইখানে। কোন রকম শব্দ না করে হামাগুড়ি দিয়ে দরজার সামনে এসে, হঠাৎ সজোরে দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেললাম···

"আজও স্পষ্ট মনে পড়ে, তাদের দুজনের মুখের চেহারা। এত স্পষ্টভাবে মনে থাকবার কারণ হলো, তাদের সেই মুখের চেহারা দেখে, সেদিন আমার মনে চরম উল্লাস জেগে উঠেছিল। আমি যা আশা করেছিলাম, তাদের মুখে তাই-ই দেখতে পেলাম, আতঙ্কের ছাপ, ভয়ার্ত দৃষ্টি। যে মুহূর্তে তাদের চোখ আমার ওপর এসে পড়লো, সেই মুহূর্তেই তাদের মুখে একসঙ্গে ভয় আর নৈরাশ্যের যে-রেখা ফুটে উঠলো,—জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তার স্মৃতি আমি বহন করে চলবো। লোকটা টেবিলের সামনে বসেছিল, আমাকে দেখবা মাত্র দেয়ালের দিকে পিঠ করে উঠে দাঁড়ালো। তার চোখ-মুখের রেখা থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল যে কি নিদারুণ আতঙ্কই না তাকে পেয়ে বসেছে। আমার স্ত্রীর মুখেও সেই এক অনুভূতিই ফুটে উঠেছিল কিন্তু মনে হলো, সে-মুখের মধ্যে যেন আরো কিছু একটা লুকিয়ে আছে। সেই আরো-একটা-কিছু যদি দেখতে না পেতাম, যদি জানতাম সে-মুখের মধ্যে আতঙ্ক ছাড়া আর কিছু নেই···তাহলে হয়ত সেদিন পরে যা ঘটেছিল, তা না ঘটতেও পারতো। শুধু এক লহমার জন্যে, মাত্র এক লহমা···তাঁর মুখে এমন একটা ভাব ফুটে উঠেছিল, যা থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, যে-সঙ্গসুখ তিনি নির্ব্বিবাদে ভোগ করছিলেন, আমার এই অকস্মাৎ আবির্ভাবে তাতে বাধা পড়ে গেল এবং সেই অব্যাহত সুখ থেকে বঞ্চিত হওয়ার দরুণই তাঁর মুখে আপনা থেকে হতাশার রেখা ফুটে উঠেছে। তাঁকে দেখে আমার মনে হলো, তাঁর অন্তরে তখন একটিমাত্র চিন্তা ছিল, একটি মাত্র বাসনা, সে-বাসনা হলো সেই নিরিবিলি আনন্দ-রস-ভোগে যেন কেউ বাধা না দেয়। লোকটার মুখের ভাব একটু পরেই পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল, তার চোখে এক নীরব জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফুটে উঠলো, আমার স্ত্রীর দিকে চেয়ে বিনা ভাষায় সে যেন জিজ্ঞাসা করে উঠলো, মিথ্যে কথা বলে এখন কি বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব? যদি সম্ভব হয়, তাহলে এখুনি আরম্ভ করা ভাল। আর যদি তা সম্ভব না হয়, তা হলে একটা-যেন-কিছু ঘটে যাবে···কি সেটা? আমি দেখলাম, আমার স্ত্রীর মুখে প্রথমে যে বিরক্তি আর হতাশার ভাব ফুটে উঠেছিল, লোকটার সঙ্গে চোখাচোখি হতে তা পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল···লোকটার জন্যে এক দারুণ দুর্ভাবনা যেন তাঁর মুখে ফুটে উঠলো। ছোরাটা

পেছন দিকে লুকিয়ে দরজার সামনে যে কয়েক মুহূর্ত আমি দাঁড়িয়েছিলাম, দেখি লোকটা ক্রমশ আমার দিকে চেয়ে চেয়ে মৃদু হেসে উঠলো এবং চেষ্টা করে গলায় এমন একটা তৈরী-করা নির্লিপ্ততার সুর নিয়ে এসে কথা বলতে সুরু করলো যে তা পরিণামে হাস্যকর বোধ হতে লাগলো।

—এই আমরা সঙ্গীত সম্পর্কে আমাদের—লোকটা বলতে আরম্ভ করলো।

সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রী বলে উঠলেন, 'সত্যি, কি আশ্চর্য্য!'

"যেন লোকটার কাছ থেকে এই ইঙ্গিতের অপেক্ষায়ই তিনি এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। কিন্তু সেই লোকটা বা আমার স্ত্রী, দুজনের মধ্যে কেউ-ই তাদের বক্তব্য শেষ করতে পারলো না। এক সপ্তাহ আগের যে মত্ত উন্মাদনা আমাকে পেয়ে বসেছিলো, আজ আবার আমাকে তা পেয়ে বসলো। ধ্বংস করবার জন্যে, খুন করবার জন্যে, সেই উন্মাদ-জ্বালার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে এক দুর্বার দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা আমাকে পেয়ে বসলো এবং সর্ব-দেহ-মন আমি তার কাছে সমর্পণ করে দিলাম।

"তারা যে কথা বলতে আরম্ভ করেছিল, তা আর তারা শেষ করতে পারলো না। অতি সযত্নে ছোরাটা পেছন দিকে লুকিয়ে রেখে স্ত্রীর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম···লুকিয়ে রাখতে হয়েছিল এই জন্যে যে দেখতে পেলে যদি লোকটা বাধা দেয়! আমি ঠিক করেছিলাম, ঠিক তাঁর স্তনের তলায় পাঁজরায় আঘাত করবো। আঘাত করবার চিন্তা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই এই জায়গাটাকেই আঘাত করবার জন্যে আমি ঠিক করে রাখি। যখন আমার স্ত্রীর বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি, তখন লোকটা বুঝতে পারে আমি কি করতে চলেছি··· তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে তারস্বরে চীৎকার করে উঠলো, 'কি সর্ব্বনাশ করছো, ভেবে দেখ! কে আছ? কে আছ, সাহায্য কর!'

"কোন কথা না বলে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আমি লোকটার দিকে ছুটে গেলাম। আমার চোখের সঙ্গে তার চোখ মিলতেই, দেখলাম, এক নিমেষের মধ্যে লোকটা যেন শাদা কাগজের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল··· তার সেই রক্তিম ঠোঁট একেবারে রক্তশূন্য শাদা হয়ে গিয়েছে···চোখ দুটো থেকে যেন অস্বাভাবিক জ্যোতি বেরিয়ে আসছে এবং চরম আশ্চর্য্যের ব্যাপার, লোকটা তাড়াতাড়ি পিয়ানোর তলায় ঢুকে পড়লো এবং সেখান থেকে ছুটে ঘর থেকে পালিয়ে গেল।

"তার পিছু-পিছু ছুটলাম, কিন্তু মনে হলো আমার বাঁ হাতের ওপর যেন অসম্ভব রকম ভারি কি একটা ঝুলছে। আমার স্ত্রী! তাঁকে ছাড়িয়ে যাবার জন্যে প্রাণপণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করলাম, কিন্তু আমার সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও দেখলাম তাঁকে ছাড়িয়ে আমি যেতে পারলাম না; সেই অকস্মাৎ বাধা, তাঁর সমস্ত দেহের বোঝার টান, তাঁর স্পর্শ জগতের ঘৃণ্যতম জিনিসের মত যে স্পর্শ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চাই—সমস্ত কিছু আমাকে আরো উন্মাদ করে তুললো। পিছন ফিরে দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে বাঁ হাত দিয়ে তাঁকে ধাক্কা মেরে সজোরে কনুই দিয়ে তাঁর মুখে আঘাত করলাম। তিনি চীৎকার করে উঠলেন···বাধ্য হয়েই আমার হাত ছেড়ে দিলেন।

"তাকে ধরবার জন্যে ছুটতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়লো, সেই অবস্থায় মোজা-পরা খালি পায়ে নিজের স্ত্রীর প্রেমিকের পেছনে পশ্চাৎধাবন করা একটা হাস্যকর ব্যাপারই হয়ে দাঁড়াবে। সেই উন্মাদ অন্ধ আক্রোশ সত্ত্বেও তখন পর্য্যন্ত অপর লোকে আমার ব্যবহার দেখে কি ভাববে, সে-মানসিক অভ্যাস দূর হয় নি। জীবনের এমন বহু দিন গিয়েছে, যখন এই অন্ধ মানসিক অভ্যাসই আমাকে পরিচালিত করেছে।

তাই তার পেছনে না ছুটে আমি ফিরে স্ত্রীর কাছে এলাম! সোফার ওপর শুয়ে পড়ে আহত চক্ষুর ওপর দু'হাত রেখে আমার দিকে তিনি চেয়ে রইলেন। তাঁর মুখে দেখলাম ভয় আর ঘৃণা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে··· যেন তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড় শত্রু আমি—ফাঁদে ধরা পড়লে ফাঁদের দিকে চেয়ে ঠিক ইঁদুরের চোখে এই রকমই দৃষ্টি ফুটে ওঠে। অন্তত আমি তাঁর মুখে দেখলাম সেই আতঙ্ক আর ঘৃণা···অপরকে ভালবাসার দরুণ যে আতঙ্ক আর ঘৃণা আমার প্রতি জাগতে পারে। সেদিন সে মুহূর্ত্তে যদি তিনি কোন কথা না বলে অন্ততঃ চুপ করে থাকতেন তাহলে হয়ত সে মুহূর্ত্তে আমি নিজেকে সম্বরণ করে নিতে পারতাম, যা ঘটে গেল, তা হয়ত তখন না ঘটতেও পারতো।

"কিন্তু হঠাৎ তিনি কথা বলতে সুরু করে দিলেন এবং যে হাতে ছোরাটা ছিল, সেই হাত থেকে ছোরাটা কেড়ে নিতে চেষ্টা করতে লাগলেন।

'ভেবে দেখ কি করতে চলেছ···তার আর আমার মধ্যে কিছু ঘটে নি···কিছু না···আমি তোমার কাছে শপথ করে বলছি···কিছু ঘটে নি।' হয় ত তখনও আমি ইতস্ততঃ করতাম, যদি তিনি শেষের ঐ তিনটি কথা না উচ্চারণ করতেন। কিছু ঘটে নি থেকে

আমি ধরে নিলাম যে তার উল্টোটাই ঘটেছে…যা ঘটবার তা সবই ঘটে গিয়েছে। তাঁর কথার একটা জবাব দেওয়া দরকার। যে মানসিক উত্তেজনার চূড়ায় নিজেকে নিয়ে এসেছিলাম, জবাবটা সেখানকার অবস্থার অনুপাতেই হওয়া উচিত।

"বাঁ হাত দিয়ে তাঁর হাতের কব্জী সজোরে ধরে আমি চীৎকার করে উঠলাম, 'এখনো মিথ্যে কথা? নরকের কীট…'

"কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করে তিনি হাত ছাড়িয়ে নিলেন। তখনো আমার হাতের মুঠোর মধ্যে ছোরাটা ধরে আছি…সেই অবস্থায় ছুটে আর এক হাত দিয়ে তাঁর গলা টিপে ধরে তাঁকে সোফার ওপর ফেলে দিলাম… গলা টিপে মেরে ফেলবার জন্য উদ্যত হলাম। কিন্তু স্ত্রীলোকের দেহ এত কঠিন হয়? মনে হলো, তাঁর গলা যেন কাঠের মতন শক্ত। দু'হাত দিয়ে তিনি গলা থেকে আমার হাতটা টেনে ছাড়ালেন… এই মুহূর্তের জন্যেই যেন আমি অপেক্ষা করে-ছিলাম…সঙ্গে সঙ্গে অন্য হাতের উদ্যত অস্ত্র বাঁ দিকে ঠিক তাঁর পাঁজরের তলায় সজোরে বসিয়ে দিলাম…

"এ-হেন ক্ষেত্রে লোকে যখন বলে যে সাময়িক উন্মত্ততার প্রেরণায় তারা কি করছে সে-সম্বন্ধে তাদের কোন চেতনাই থাকে না, হয় তারা ধাপ্পাবাজী দেয় নয় মিথ্যেকথা বলে। আমি কি করছি বা করতে চলেছি, সে-সম্বন্ধে আমার সম্পূর্ণ চেতনা ছিল, এক মুহূর্তের জন্য আমি সে-সম্বন্ধে অচেতন হই নি। অন্তরের জ্বালার শিখাকে বাতাস দিয়ে যতই উগ্র করে তুলি, ততই চেতনার আলো ভেতরে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকে, এমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে অন্তরের গহনতম গুহা পর্য্যন্ত তাতে আলোকিত হয়ে ওঠে, সুতরাং আমি যা-কিছু করছি সমস্তই স্পষ্ট দেখতে বাধ্য হয়েছি। আমি যা করতে চলেছিলাম, তা যে তার আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি জানতাম, তা নয়, কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে আমি সেই কাজে হাত দিয়েছি, সেই মুহূর্ত্তে আমি সচেতন হয়ে উঠেছি, আমি জেনেছি যে আমি কি করছি…সেই জন্যে এ কথা আমি অনুতাপ করে বলতে পারি যে, আমি ইচ্ছে করলে তখন হয়ত হাত তুলেও নিতে পারতাম। ধরুন না কেন, আমার স্পষ্ট বোধ ছিল যে আমি তাঁর পাঁজরার তলাতেই আঘাত বসিয়েছি এবং এক্ষুণি ছোরা পাঁজরার ভেতরে ঢুকে যাবে। যে-মুহূর্ত্তে আমি এই কাজ করছিলাম, সেই মুহূর্ত্তেই আমি বুঝতে পারি যে একটা ভয়াবহ ব্যাপার আমি করতে চলেছি, জীবনে যা কখনো করি নি এবং যার দরুণ হয়ত ভীষণ ফলাফল ভোগ করতে হবে। কিন্তু সেই চেতনাটুকু বিদ্যুৎ-ঝলকের মত শুধু এক নিমেষের জন্যেই জেগে উঠেছিল, এত কাছাকাছি যে বলা চলে, সেই চেতনা আর তার অনুবর্ত্তী হত্যাকাণ্ড প্রায় এক-সঙ্গেই সংঘটিত হয়। কিন্তু সেই ঘটনা সম্বন্ধে আমার চেতনা সুতীব্র ভাবেই স্পষ্ট ছিল। মনে পড়লেই আজও আমি স্পষ্ট অনুভব করি, ছোরাটা ভেতরকার করসেটে যেন ক্ষণিকের জন্য মৃদু বাধা পেলো, তারপর আর একটা কিসে যেন একটু বাধা লাগলো, তারপর নরম মাংসের ভেতর দিয়ে ছোরাটা সোজা ভেতর ঢুকে গেল। দু'হাত দিয়ে তিনি ছোরাটাকে ধরতে গেলেন কিন্তু আটকাতে পারলেন না…

"সেই মারাত্মক মুহূর্ত্তে যে-সব অনুভূতি আমার মনকে আচ্ছন্ন করেছিল, পরে কারাগারে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাই নিয়ে ভাবতাম, তার প্রত্যেকটি সূক্ষ্মতম অনুভূতি পর্য্যন্ত মনে করতে চেষ্টা করতাম। ইতিমধ্যে একটা নৈতিক বিপ্লব আমার মনের মধ্যে সংঘটিত হয়ে যায় এবং তার ফলে আমার বহু ধারণার আমূল পরিবর্ত্তন হয়ে যায়। আমার মনে পড়ে, খুন করবার ঠিক এক সেকেণ্ডও হবে না, আমি ভয়ঙ্করভাবে সজাগ ছিলাম যে আমি খুন করতে চলেছি, একজন স্ত্রীলোককে খুন করছি, আত্মরক্ষায় সম্পূর্ণ অক্ষম একজন স্ত্রীলোক… আমার নিজের স্ত্রী। মনের সেই অবস্থা যে কতদূর ভয়ঙ্কর তা কথায় বলে বোঝান যায় না…আমার মনে আছে, তাঁর দেহের মধ্যে ছোরাটা ঢুকিয়ে দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আমি তাড়াতাড়ি সেটা তুলে নিতে চেষ্টা করি, যেন সেইভাবেই, যা হয়ে গেল তা থেকে নিজেকে প্রতিনিবৃত্ত রাখা সম্ভব হতে পারে। তারপর কয়েক মুহূর্ত্ত নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকি…কি ব্যাপারটা দাঁড়ালো দেখবার জন্যে…যা ঘটে গিয়েছে, তাকে ফিরিয়ে আনা আর সম্ভব কি না।

"হঠাৎ তিনি লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন, চীৎকার করে ডাকলেন, 'নার্স, নার্স, আমাকে খুন করছে ও।' গোলমাল শুনে নার্স ইতিমধ্যেই বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমি তখনও পর্য্যন্ত নিশ্চল স্থির দাঁড়িয়েছিলাম, অসম্ভব হলেও আশা ছিল, হয়ত যা ঘটে গিয়েছে, তা ফিরে আসবে। হঠাৎ দেখি, ভেতরের জামা ভিজে রক্ত ঝরে পড়ছে।

"সেই মুহূর্ত্তে বুঝতে পারলাম, যা ঘটে গিয়েছে,

তা আর কোন উপায়েই ফিরে আসবে না। সেই সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলাম, যা ঘটে গিয়েছে, তাকে ফিরিয়ে আনবারও কোন দরকার নেই। ঠিক এই জিনিসই ঘটবে বলে আমি আশা করেছিলাম এবং এই জিনিসই ঘটা উচিত হয়েছে। তিনি যতক্ষণ না পড়ে গেলেন, ততক্ষণ আমি তেমনি দাঁড়িয়ে রইলাম। নার্সটা ছুটে তাঁকে ধরতে এলো, হায় ভগবান! এতক্ষণ পর্যন্ত ছোরাটা আমার হাতেই ছিল··· নার্সের কথায় ছোরাটা ফেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

"নার্স বা স্ত্রীর দিকে না চেয়ে নিজেকেই নিজে বলে উঠলাম, উত্তেজিত হলে চলবে না···যা করছি, তা ভেবে-চিন্তেই করতে হবে।

"নার্সটা চীৎকার করে কেঁদে বাড়ীর ঝীকে ডাকলো। বারাণ্ডা দিয়ে গিয়ে ঝিকে তার মনিবাণীর কাছে পাঠিয়ে দিয়ে আমি আমার নিজের ঘরের দিকে চললাম। নিজেকেই নিজে জিজ্ঞাসা করলাম, এখন কি করবো? তার উত্তর তৎক্ষণাৎ পরিস্ফুট হয়ে উঠলো। সেখান থেকে উঠে পড়বার ঘরে গিয়ে দেয়াল থেকে রিভলভারটা নামালাম···পরীক্ষা করে দেখলাম হাঁ, ভর্ত্তিই আছে···টেবিলের ওপর রিভলভারটা রাখলাম। সোফার পেছন দিক থেকে ছোরার খাপটা তুলে নিয়ে চেয়ারে বসে পড়লাম। বহুক্ষণ ধরে সেই ভাবে বসে রইলাম···শূন্য মন···কিছুই ভাবি নি···কিছুই মনে করতে চেষ্টা করি নি। শুধু মনের পেছনে একটা অবস্থা অনুভূতি জানিয়ে দিচ্ছিল, সামনের ঘরে রীতিমত গোলমাল হচ্ছে। শুনতে পেলাম, দরজার সামনে একটা গাড়ী এসে দাঁড়ালো, তারপর আর একখানা এলো। তারপর শুনলাম, পায়ের শব্দ ···দেখলাম সেই ফেলে-আসা লাগেজটা নিয়ে জর্জ্জ আসছে···কি-ই বা দরকার সেই লাগেজের? সে সামনে এলে জিজ্ঞাসা করলাম, 'শুনেছ, কি হয়ে গিয়েছে? দরোয়ানকে বলো, পুলিশে গিয়ে খবর দিতে!'

"কোন জবাব না দিয়ে সে চলে গেল। সোফা থেকে উঠে সিগারেটের বাক্স আর দেশলাইটা নিলাম··· সিগারেট ধরালাম। একটা সিগারেট শেষ হতে না হতে, কেমন যেন তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম···ঘুমিয়ে গেলাম।

"প্রায় দু'ঘণ্টা ঘুমিয়েছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম, আমার স্ত্রী আর আমি পরম শান্তিতে সংসার করছি। কি একটা ব্যাপার নিয়ে বচসা হলো কিন্তু আমরা মিটমাট করে নিলাম···মিটমাট করে নেবার পক্ষে বিশেষ কোন বাধা বা অসুবিধা হলো না। বাইরে বচসা হলেও অন্তরে যে আমরা পরস্পরের বন্ধু···

"দরজায় এসে কে যেন কড়া নাড়ছিল, তাতেই ঘুম ভেঙ্গে যায়।

"ভাবলাম, নিশ্চয়ই পুলিশ হবে··তাঁকে আমি তাহলে মেরেই ফেলেছি হয়ত। কিংবা তিনি নিজে এসেই দরজায় করাঘাত করছেন···আসলে হয়ত তেমন কিছুই ঘটে নি।

"দরজায় করাঘাত থামলো না। কোন উত্তর না দিয়ে মনে মনে এই উত্তর খুঁজে বার করতে লাগলাম, সত্যিই কি তা ঘটেছে, না, কিছুই ঘটে নি? নিশ্চয়ই ঘটেছে। মনে পড়ে গেল, ছোরাটা বসাবার সময় গায়ের জামার দরুণ যে সামান্য প্রতিরোধ অনুভব করেছিলাম, মনে পড়ে গেল দেহের ভেতর ছোরাটা কি রকম ভাবে ঢুকে গেল। মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেরুদণ্ড দিয়ে যেন একটা হিমানী স্রোত প্রবাহিত হয়ে গেল···সমস্ত দেহের মাংসপেশী সঙ্কুচিত হয়ে এলো।

"হাঁ, যা ঘটবার তা ঘটে গিয়েছে। এ সম্বন্ধে আর কোন ভুলের সম্ভাবনা নাই। এখন আর একটা জিনিস ঘটবার বাকি আছে, নিজের হাতে নিজেকে বধ করা। যখন এই কথা ভাবছি, তখনই মনের আড়ালে এ-কথাও জানি যে, আমি তা পারবো না। তবুও উঠে দাঁড়ালাম, রিভলভারটা হাতে তুলে নিলাম। কেমন যেন অসম্ভব মনে হলো। মনে পড়লো, এর আগে আর কতবার এমনি আত্মহত্যা করবার সঙ্কল্প করেছি···তখন মনে হয়েছে সে এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। সহজ মনে হয়েছে কারণ সেই চেষ্টার দ্বারাই ভেবেছিলাম স্ত্রীকে আতঙ্কিত করে তুলবো। আজ এখন শুধু যে আত্মহত্যা করতে পারি না, তা নয়, সে-চিন্তা পর্য্যন্ত মনে স্থান পাচ্ছে না। জিজ্ঞাসা করি নিজেকেই, কেন আত্মহত্যা করবো? কোন উত্তরই দিতে পারি না। দরজায় তেমনি করাঘাত তখন সমানে চলেছে। হাঁ, উঠতে হবে তা হলে, কে দরজা ঠেলছে আগে সেটা দেখতে ত হবে! ভাববার অনেক সময় পরে পাওয়া যাবে···

"রিভলভারটা নামিয়ে টেবিলে একটা খবরের কাগজ চাপা দিয়ে রেখে দিলাম। দরজার কাছে গিয়ে খিল খুলে দিলাম। দেখি, আমার স্ত্রীর ভগিনী···বিধবা··· ভালমানুষ কিন্তু নীরেট মাথা।

"ভদ্রমহিলা কান্না-গদগদ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে

উঠলেন, 'ভাসা, এ সব কি শুনছি?' সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। স্বভাবতই তাঁর চোখ একটু বেশী পান্‌সে।

"বিরক্ত কণ্ঠে আমি বলে উঠলাম, 'তুমি কি দরকারে এখানে এসোছো?'

"আমি জানতাম, তার প্রতি রূঢ় হওয়া আমার উচিত নয়, আর তার কারণই বা কি থা তে পারে? কিন্তু তখন আমার গলা দিয়ে অন্য আর কোন সুরই বেরুলো না।

"তবুও তিনি বললেন, 'ভাসা, আইভান জাকারিভিচের কাছে শুনলাম, দিদির আয়ু শেষ হয়ে আসছে...'

"আইভান জাকারিভিচ হলো ডাক্তার—আমার স্ত্রীর ডাক্তার এবং উপদেষ্টা।

"জিজ্ঞাসা করে উঠলাম, 'ডাক্তার কি এখানে এসেছে?'

"তারপর আপনার মনেই বলে উঠলাম, আয়ু শেষ হয়ে যাচ্ছে তা আমি কি করবো?

"দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভদ্রমহিলা বললেন, 'ভাসা, একবার তার পাশে যাও...উঃ...কি ভয়ঙ্কর!'

"যাবো? নিজেকেই নিজে জিজ্ঞাসা করি। হঠাৎ ভেতর থেকে যেন উত্তর পাই, হাঁ, যাওয়াই উচিত... এ ক্ষেত্রে সেইটেই হবে একমাত্র করণীয়। স্বামী যদি স্ত্রীকে খুন করে, তাহলে স্বামীরই উচিত মুমূর্ষু স্ত্রীর পাশে গিয়ে দাঁড়ানো। তাই যদি বিধান হয়, তাহলে আমারও যাওয়া কর্তব্য। সেই সঙ্গে মনে জেগে উঠলো, আত্মহত্যা করবার সংকল্পের কথা। আত্মহত্যা যদি করতেই হয়, দেখা করতে দোষ কি!

"নীরবে ভদ্রমহিলাকে অনুসরণ করে চললাম। মনে মনে ভাবতে লাগলাম, এইবার নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে...মুমূর্ষুর মুখ-বিকৃতি, তার অন্তিম আকুতি... কিন্তু কোন কিছুই আমার অন্তরকে যেন আর স্পর্শ করতে পারে না! হঠাৎ নিজের নগ্নপদের দিকে দৃষ্টি পড়ায় ভদ্রমহিলাকে থামতে বললাম, একটু অপেক্ষা করুন! এ-রকম জুতোহীন খালি পায়ে যাওয়ার কোন মানে হয় না! চটি-জুতোটা পরে আসি।"

২৩

"পড়বার ঘর থেকে বেরিয়ে যখন প্রতিদিনের পরিচিত সেই আবেষ্টনীর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে চলেছি, আশ্চর্য্যের ব্যাপার, হঠাৎ যেন মনে আশা জেগে উঠলো, যা-কিছু ঘটে গিয়েছে বলে আশঙ্কা করছি, হয়ত কিছুই ঘটেনি। কিন্তু তার পরেই যখন নাকে এসে লাগলো সেই শয়তানী ডাক্তারী ওষুধের তীব্র গন্ধ... আয়াডোফর্ম আর কার্বলিক এসিডের ঝাঁঝালো গন্ধ...তখন বাস্তবতার রূঢ় সত্যে অভিভূত হয়ে পড়লাম।

"ছেলেদের খেলাঘরের পাশ দিয়ে বারাণ্ডা অতিক্রম করে যাবার সময় লীজাকে চোখে পড়লো। আমার দিকে ভয়-বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে। মনে হলো, আমার পাঁচ ছেলেমেয়েই যেন সেই ঘরে রয়েছে, তারা সবাই আমার দিকে অমনি ভাবে চেয়ে আছে। স্ত্রীর ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই পরিচারিকা দরজা খুলে দিয়ে চলে গেল।

"প্রথম জিনিস আমার চোখে পড়লো, স্ত্রীর ধূসরাভ সেদিনকার পরিচ্ছদ চেয়ারের ওপর পড়ে রয়েছে, রক্তে কালো হয়ে গিয়েছে। তাঁকে আমার বিছানাতেই শুইয়ে দেওয়া হয়েছে...বালিশের ওপর মাথা উঁচু করে হাঁটু তুলে শুয়ে আছেন...সেমিজের বোতাম খোলা। যেখানে ছোরার আঘাত করেছিলাম সেখানে কি একটা চাপিয়ে রাখা হয়েছে। সমস্ত ঘর আয়াডোফর্মের তীব্র গন্ধে ভর্তি। তাঁকে দেখে প্রথম আমার দৃষ্টি পড়লো, তাঁর ফোলা মুখের ওপর...মুখটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছে...চোখ এবং নাকের খানিকটা অংশ নীলাভ কালচে হয়ে গিয়েছে। আমার হাত থেকে নিজেকে ছাড়াবার যখন চেষ্টা করেছিলেন, সেই সময় আমার কনুই-এর আঘাতে ঐ রকম অবস্থা হয়েছে। সৌন্দর্য্যের কোন চিহ্ন আর সে মুখে নেই—দেখলে বীভৎসতায় চোখ ঘুরিয়ে নিতে হয়...দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে পড়লাম।

"ভদ্রমহিলা কেঁদে বলে উঠলেন, 'যাও...ওর পাশে যাও...ওর পাশে যাও...'

"ভাবলাম, হয়ত তিনি অনুতপ্ত...হয়ত তিনি শেষ মুহূর্তে নিজের অপরাধ স্বীকার করবেন। যদি তাই করেন, আমি কি করবো? ক্ষমা করবো? মরে যে যাচ্ছে, তাকে ক্ষমা করাই তো উচিত! স্থির করলাম, অন্তত এ-মুহূর্তে আমাকে বীর হতে হবে!

"ধীরে তাঁর শয্যাপার্শ্বে তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম। অতি কষ্টে তিনি চোখ তুলে আমার দিকে চাইলেন, একটা চোখ তখন রীতিমত আহত হয়ে গিয়েছিল। কোন রকমে জড়িয়ে তিনি বললেন, 'তোমার বাসনা তুমি পূরণ করেছ, আমাকে খুন করে তুমি নিশ্চিন্ত হয়েছ।'

"দেহের যন্ত্রণার উর্দ্ধে দেখলাম তখনও তাঁর মুখে ফুটে উঠছে, আমার প্রতি সেই পুরাতন, প্রাণহীন নির্জলা ঘৃণা।

'ছেলেদের তুমি—পাবে না···আমি···তোমার কাছে···কিছুতেই···তাদের দিয়ে যাবো না!···ঐ··· দিদি···তার কাছেই···ছেলেরা থাকবে।'

"আমার কাছে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে যেটা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ছিল, তাঁর পাপ, তাঁর ব্যভিচার···সে সম্বন্ধে তিনি একটা কথাও উচ্চারণ করা প্রয়োজন বোধ করলেন না।

"দরজার দিকে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে তিনি কেঁদে বলে উঠলেন, 'হাঁ, যা করেছ, তার জন্যে তোমাকে বাহাদুরী দিয়ে যাচ্ছি!' দরজার সামনে তাঁর ভগিনী ছেলে-মেয়েদের নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

'দেখ, ঐ দেখ, তুমি কি করেছ।'

"ছেলেদের দিকে দৃষ্টি পড়তেই ভেতর থেকে কি যেন হয়ে গেল। তারপর তাঁর সেই নীলাভ ক্ষত-বিক্ষত মুখের দিকে চেয়ে, সেই জীবনে প্রথম আমি নিজেকে ভুলে গেলাম, ভুলে গেলাম আমার অধিকারের দাবী, ভুলে গেলাম আমার গর্ব্ব। সেই জীবনে প্রথম যেন তাঁর মধ্যে দেখতে পেলাম প্রতিদিনের সহজ নারীকে এবং সেই দেখার অনুভূতির সঙ্গে যা কিছু নিজের বলে আমি গর্ব্ব করতাম, এমন কি আমার হিংসার জ্বালা পর্য্যন্ত, সমস্ত যেন উল্টে আমাকেই আঘাত করলো। যা করেছি, তার ভয়াবহ চেতনা এমন ভাবে আমাকে উদ্বেল করে তুললো যে, মনে হলো সেই মুহূর্ত্তে তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে বলি, আমাকে ক্ষমা কর! কিন্তু তা করতে পারলাম না। চোখ বুজে চুপ করে রইলেন, কথা বলতে তিনি আর পারছিলেন না। হঠাৎ তাঁর বেদনা-বিকৃত মুখ যেন কেঁপে উঠলো, ভর্ৎসনার একটা ভ্রূকুটি স্পষ্ট হয়ে উঠলো ···দুর্ব্বল হাতে তাঁর কাছ থেকে আমাকে ঠেলে দিয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'কেন, 'কেন এ সব ঘটলো? কেন? কি করেছিলাম আমি?'

"বললাম, 'আমাকে ক্ষমা কর!'

"বালিশ থেকে মাথাটা তোলবার চেষ্টা করে তিনি বলে উঠলেন, 'ক্ষমা! কোন মানে হয় না ক্ষমার। যদি কোন রকমে বাঁচতে পারতাম···' আমার দিকে বদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন···সে-দৃষ্টিতে একটা আতুর ঔজ্জ্বল্য নিমেষের জন্যে ফুটে উঠলো। 'তোমার বাসনা তুমি চরিতার্থ করেছ···আমি···আমি তোমাকে ঘৃণা করি!' সঙ্গে সঙ্গে তিনি কেঁদে উঠলেন···যেন তাঁর মনের সামনে এক মহা আতঙ্ক মূর্ত্তি ধরে এসে দাঁড়ালো।

"মেরে ফেল, এখন আমাকে মেরে ফেল···আমি ভয় করি না! তবে ওদেরও সেই সঙ্গে মেরে ফেল··· তাকেও মেরে ফেল, তাকেও মেরে ফেল! কিন্তু তাকে পাবে কোথায়? সে চলে গিয়েছে! সে চলে গিয়েছে!' তখন থেকে শেষ পর্য্যন্ত সমানে বিকারের প্রলাপ চলতে লাগলো। কাউকে আর তখন চিনতে পারছিলেন না···তার পরের দিন দুপুর বেলা মারা গেলেন।

"তার আগে সকাল আটটার সময় পুলিশের লোক এসে আমাকে ফাঁড়িতে ধরে নিয়ে যায়, সেখান থেকে আমাকে কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়। বিচারের অপেক্ষায় সেখানে এগারো মাস কেটে যায়। এই এগারো মাস কারাগারে বসে নিজের সম্বন্ধে, নিজের অতীত জীবন সম্বন্ধে গভীর ভাবে ভাববার সুযোগ পাই —এবং তারই ফলে জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করতে সমর্থ হই। ফাঁড়িতে আসবার তিন দিন পরে তারা একবার আমাকে নিয়ে এলো বাড়ীতে—"

পদ্নিশেফ আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ভেতর থেকে এমন ভাবে কান্নার জোয়ার ঠেলে উঠলো যে তাকে আটকাবার শক্তি আর তার হলো না। বাধ্য হয়েই সে নীরব হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে একটা বিশেষ চেষ্টা করে সে আবার বলতে সুরু করলো:

"শয্যায় শায়িত তাঁর মৃতদেহের দিকে চেয়ে সমস্ত জিনিস যেন সত্যের আলোকে নতুন করে দেখতে আরম্ভ করলাম।

"আবার সে কেঁদে উঠলো কিন্তু তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বলতে আরম্ভ করলো, তাঁর সেই মৃত্যুহিম মুখের দিকে চেয়ে সেই আমি প্রথম উপলব্ধি করলাম, আমি কি করে ফেলেছি। সেই মুহূর্ত্তে আমি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝলাম যে, আমি—আমিই তাঁকে খুন করেছি—কিছুকাল আগেও যে দেহ সজীব ছিল, যে ছিল প্রাণচঞ্চল উত্তপ্ত, আমিই তাকে হিম মাংস-স্তূপে পরিণত করেছি—জগতে আর কেউ-ই কোন উপায়েই এই অন্যায়ের কোন প্রতিবিধান করতে পারবে না। এই অনুভূতি যে অন্তরে কোন দিন না অনুভব করেছে, সে কিছুতেই বুঝতে পারবে না আমার মনের অবস্থা! হায়! হায়!!"

শিশুর মত সে কেঁদে উঠলো। বহুক্ষণ ধরে সেই কামরায় আমরা দুজনে বিনা বাক্যব্যয়ে বসে

রইলাম। আমার সামনের আসনেই বসে সে কাঁদছিল, সারা দেহ তার কেঁপে কেঁপে উঠছিল। হঠাৎ সে বলে উঠলো, "বিদায়!"

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে, আমার দিকে পিছন ফিরে—বেঞ্চির ওপর শুয়ে পড়লো। দেহের ওপর কম্বলটা টেনে দিয়ে দিল।

তখন সকাল প্রায় আটটা হবে, আমার গন্তব্য ষ্টেশনে ট্রেণ এসে থামলে নামবার জন্যে আমি উঠে পড়লাম। তার কাছে বিদায় নেবার জন্যে, যেখানে যে শুয়েছিল সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। সত্যি সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, না ঘুমোবার ভাণ করেছিল, তা বলতে পারি না, কিন্তু দেখলাম, সে একটুও নড়লো না। হাত দিয়ে তাকে স্পর্শ করলাম। কম্বলটা মুখ থেকে সরিয়ে নিতে দেখলাম সে জেগেই আছে। হাত বাড়িয়ে বিদায় নিবার জন্যে বলে উঠলাম, "গুড্‌—বাই!" নীরবে সে হাত বাড়ালো। একটা ক্ষীণ হাসি তার অগোচরে তার মুখে ফুটে উঠলো কিন্তু এত মর্ম্মান্তিক করুণ সে হাসি যে চোখের জল রোধ করে থাকা কঠিন হলো।

যে কথা বলে সে তার জীবনের কাহিনী সমাপ্ত করেছিল, সেই একটি কথা দিয়েই সে আমার কাছ থেকে শেষ বিদায় নিলো, "বিদায়!"

এরাও মানুষ

রেনে মারাঁ



এই গ্রন্থটির নাম মূল ফরাসী ভাষায় ছিল— 'বাতোয়ালা'। বাংলা ভাষায় সেই নামটি পরিবর্ত্তিত ক'রে নতুন নামকরণ করা হলো— 'এরাও মানুষ'।

—অনুবাদক

অনুবাদকের কথা

বিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সাহিত্যে যে-সব উল্লেখযোগ্য বই লেখা হয়েছে, বিভিন্ন ভাষায় লিখিত হওয়া সত্বেও, আমরা ইংরেজী ভাষার মারফৎ তার অধিকাংশেরই পরিচয় পেয়েছি। বিশেষ করে, উপন্যাস ও ছোট গল্পের ক্ষেত্রে একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে।

কিন্তু য়ুরোপীয় সাহিত্যের আধুনিক ইতিহাসের যে-কোন নিষ্ঠাবান ছাত্র একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন, তার মধ্যে এমন কতকগুলি বই আছে, যেগুলি ইংরেজী অনুবাদের সুযোগে বিশ্ব-বিস্তারের সৌভাগ্য অর্জন করে নি। যে-কান কারণেই হোক, এই বইগুলির তেমন প্রচার হয় নি, কোন কোনটার অনুবাদ পর্যন্ত হয় নি। যেমন উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জগৎখ্যাত স্পেনীয় নাট্যকার বেনাভান্তের গ্রন্থাবলী ইংরেজীতে অনূদিত হয়ে যখন প্রকাশিত হ'ল, তখন দেখা গেল যে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তঁর একখানি নাটিকা সযত্নে সেই গ্রন্থাবলী থেকে বাইরে রাখা হয়েছে। কারণ সেই নাটিকাতে বেনাভান্তে ভারতে ইংরেজ-শাসনের ছদ্ম-কল্যাণের গর্বকে ফাঁস করে দিয়েছিলেন।

এই থেকে বোঝা যায়, কেন তা ইংরেজী-জানা জগতে প্রচার লাভ করে নি। এই অনুবাদ-কার্যের ভার, ইংলণ্ড আর আমেরিকার সাহিত্যিকদের এবং প্রকাশকদের ওপর। এই দুই জাতির রাজনৈতিক ধর্মের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ এবং ধনতান্ত্রিকতা, এবং তার অবিচ্ছেদ অঙ্গস্বরূপ জগতের দুর্বল ও ক্ষুদ্রজাতিদের নিষ্পেষণ ও শোষণ বিশেষভাবে বিজড়িত। শ্বেতাঙ্গ জাতিরা উনবিংশ শতাব্দীতে তাদের নব-লব্ধ বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষতার দরুণ সমগ্র জগতে নিজেদের সভ্যতাকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করে, যেন বিশ্ব-সভ্যতার তারাই হল উদ্ধারকর্তা এবং তার অনিবার্য ফলস্বরূপ তারা জগতের কৃষ্ণকায় অসভ্য জাতিদের উদ্ধার করবার মহৎ ব্রত নিয়ে তাদের রাজ্য দখল করে নেয়। বিজ্ঞানের সংস্পর্শ থেকে অসহায়ভাবে দূরে থাকতে বাধ্য হয়ে এই সব কৃষ্ণাঙ্গ জাতি এই পাশ্চাত্য আক্রমণকে প্রতিরোধ করবার কোন শক্তিই পায় নি, তাই এই প্রবলের নির্দেশকে মাথা পেতে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। তার ফলে, এশিয়া ও আফ্রিকা, এই দুই মহাদেশে সেদিন সভ্যতার আত্মবিস্তারের নামের আড়ালে যে বীভৎস মানবতার লাঞ্ছনা সজ্ঞানে সংঘটিত হয়, তার সম্পূর্ণ ইতিকথা যদি কোনদিন প্রকাশিত হয়, তাহলে সভ্যতা-গর্বী মানুষের গর্ব করবার কিছু থাকবে না।

সৌভাগ্যের বিষয়, সেই শ্বেতাঙ্গ জাতির মধ্যেই এমন এক-আধ জন লোক মাঝে-মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন, যাঁদের বিবেকে তাঁদের স্বজাতির দ্বারা অনুষ্ঠিত এই সব অনাচার প্রবলভাবে আঘাত করেছে এবং তার ফলে তাঁরা সেই অনাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন। সাহিত্যিকদের মধ্যেও এই ভাবে দু'-এক জন প্রতিভাশালী লেখক জন্মগ্রহণ করেছেন, যাঁরা এই প্রবলের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে নিজেদের লেখনীকে চালনা করেছেন। তার জন্যে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের কাছ থেকে তাঁদের কম লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয় নি। স্বভাবতই সাম্রাজ্য-বাদী রাষ্ট্র এই ধরণের প্রতিভাকে বিশেষ সমাদরে গ্রহণ করতে পারে নি এবং তার কলঙ্ক-কাহিনী যাতে জগতে ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্যে তাকে রীতিমত সতর্ক থাকতে হয়েছে। সেই জন্যেই এই জাতীয় বই সাম্রাজ্যবাদী-শাসিত জগতে বিশেষ প্রচারের সুযোগ পায় নি।

'বাতোয়ালা' সেই জাতীয় একখানি ফরাসী উপন্যাস। সাহিত্য হিসাবে এই বইখানি ১৯২১ সালে সেই বৎসরের সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তকরূপে ফরাসী সাহিত্যে সুনামখ্যাত গোঁকুর পুরস্কার পায়। সম্পূর্ণ এক নতুন ভঙ্গীতে রেনে মারাঁ এই উপন্যাস-খানি রচনা করেন। ভাষা ও ভঙ্গীর দিক থেকে ফরাসী গদ্যসাহিত্যে এই বইখানি একটা নতুন সুর জাগিয়ে তোলে, ফরাসী-ভাষার অপূর্ব নমনীয়তার মধ্যে রেনে মারাঁ এক অপরূপ গদ্যভঙ্গীর সৃষ্টি করেন। অনুবাদে সেই ভঙ্গীটি যথাসাধ্য বাংলা ভাষায় আনবার চেষ্টা করেছি।

উনবিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত আফ্রিকাকে য়ুরোপের লোকেরা 'ডার্ক কন্টিনেন্ট' বলে জানতো। এই অজানা মহাদেশে কাঁচা মাল, হীরে আর সোনার সন্ধান পেয়ে য়ুরোপের শক্তিশালী জাতিরা এই মহাদেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নিজেদের মধ্যে এই বিরাট দেশকে ভাগ করে নেয়। ইংরেজ, ফরাসী, ইতালীয়ান, বেলজিয়ান—প্রত্যেক জাতের সভ্য মানুষ আফ্রিকাতে উপনিবেশ স্থাপন করে এবং সেখানকার নিরক্ষর দরিদ্র কৃষ্ণকায় লোকদের অসহায় নিরস্ত্রতার সুযোগ নিয়ে সেই সব উপনিবেশে সভ্যতার নামে যে শোষণ-শাসনের রাজত্ব সুরু করে, তার সংবাদ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ-শাসিত জগতের সংবাদপত্রে অতি সযত্নে এবং সুকৌশলে চাপা দিয়ে রাখা হতো। যাদের ওপর অবাধে এই অত্যাচার চলতো, এই অত্যাচারের বেদনাকে প্রকাশ করবার মত কোন সুযোগ বা যোগ্য সাহিত্যিক তাদের ছিল না। নীরবে এই নির্মম

অত্যাচার, কোন নিষ্ঠুর বিধাতার বিধানরূপে মেনে নেওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না।

সৌভাগ্যবশত মানবপ্রেমিক সাহিত্যিকদের দুঃসাহসিকতার ফলে মহাদেশব্যাপী এই বিরাট অনাচারের সঙ্ঘবদ্ধ ষড়যন্ত্রের কথা ক্রমশ একটু একটু করে জগৎ জানতে পারে। বাতোয়ালা সাহিত্য-জগতে সেই দুঃসাহসিক মানব-প্রেমেরই অন্যতম নিদর্শন। ফরাসী-কংগো অঞ্চলে সুসভ্য ফরাসী জাতি সেখানকার নিগ্রোদের জীবন ও সভ্যতার ওপর যে হৃদয়হীন নিষ্ঠুর অভিযান বিনা বাধায় চালিয়ে এসেছে, বাতোয়ালা তারই বেদনাময় কাহিনী জগতে বিজ্ঞাপিত করে দিয়েছে। ফরাসী থেকে এই গ্রন্থ যখন ইংরেজীতে অনূদিত হয়, তখন প্রকাশক মাত্র দেড় হাজার বই ছাপিয়ে ছিলেন এবং প্রত্যেক বইটিতে তার ক্রমিক সংখ্যা লেখা ছিল। অর্থাৎ একান্ত মুষ্টিমেয় লোকদের জন্য এই বই প্রকাশিত হয়।

রেনে মারাঁ, পাশ্চাত্য খৃষ্টান পাদ্রীর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নয়, এই নিগ্রোদের জীবন তাদেরই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নিখুঁত বাস্তব ভাবে চিত্রিত করেন, সেই জন্যে খৃষ্টান শ্লীলতা বা অশ্লীলতা-বোধে এর কোন কোন অংশ কটু লেগেছিল। কিন্তু সমসাময়িক মানব-জীবনের স্থায়ী প্রমাণরূপে লেখক সেগুলিকে তাঁর রচনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং অনুবাদকও অনুবাদ-ধর্মের রীতি অনুযায়ী যথাযথ ভাবে সেগুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে বাধ্য হয়েছেন।

ঘটনাচক্রে, সাম্রাজ্যবাদী শ্বেতাঙ্গ জাতিদের কাছে আফ্রিকার নিগ্রোদের মতন আমরাও কৃষ্ণকায় জাতি। তাতে আমাদের কোন ক্ষোভ নেই। শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা আফ্রিকার এই কৃষ্ণকায় নিগ্রো জাতিদের যেভাবে জগতে পরিচিত করাবার চেষ্টা করেছে, তা থেকে তাদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা হয়েছে যে, তারা আফ্রিকার বুনো হিংস্র পশুদের মতনই দ্বিপদ জন্তু-বিশেষ। তাদের ধর্ম নেই, ধর্মবোধ নেই, হৃদয় নেই, হৃদয়াবেগ নেই, কোন রসবোধ বা সৌন্দর্য-অনুভূতি নেই, অসভ্য বর্বর ও হিংস্র এক জাতের প্রাণী, যারা শুধু জন্মেছে শ্বেতাঙ্গ-সভ্যতার ভার বইবার জন্যে···প্রাণহীন ক্রীতদাসের জাত। শ্বেতাঙ্গ মনিবেরা তাদের সেই ভাবেই দেখেছে, সেই ভাবেই ব্যবহার করেছে এবং জগতে তাদের সেই ভাবেই পরিচয় দিয়েছে। এই আদিম প্রাণবন্ত জাতির মধ্যে প্রকৃতি, হৃদয়, মন ও মস্তিষ্কের যে বিরাট সম্ভাবনা সঞ্চয় করে রেখেছে, একদিন না একদিন তার স্ফুরণ হবেই, কৃষ্ণচর্ম বলে তার আড়ালে মানবীয় সম্ভাবনার কিছু নেই, এই বিরাট মিথ্যা অচিরকালের মধ্যেই বিনষ্ট হয়ে যাবে। আজ এই মুহূর্তে চির-অজ্ঞাত কালো কাফ্রি আর নিগ্রোদের মধ্যে যে-সব প্রতিভা জন্মগ্রহণ করছেন, বিশেষ করে হৃদয়-ধর্মের যেটি সবচেয়ে সূক্ষ্মতম প্রকাশ, সেই সঙ্গীতের মধ্যে যে-সব প্রতিভা জেগে উঠছে, জগৎ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তাঁরা সগৌরবে শ্বেতাঙ্গ সমকক্ষদের সমান কৃতিত্ব অর্জন করছেন, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের ছাড়িয়েও উঠছেন।

বাতোয়ালা সেই অবজ্ঞাত মানব জাতিরই মানসিক কাহিনী। এই কাহিনী লেখবার জন্যে রেনে মারাঁ পাশ্চাত্য সভ্যতা থেকে বিদায় নিয়ে সুদীর্ঘ কাল এই কৃষ্ণকায় জাতিদের মধ্যে তাদেরই একজন হয়ে বসবাস করেন এবং তাদের দিক থেকে তাদের জীবনকে বুঝতে চেষ্টা করেন। যদিও তাদের আচার-ব্যবহারের সঙ্গে, তাদের ধর্ম-কর্মের সঙ্গে অন্যান্য সভ্য জাতিদের প্রভূত পার্থক্য আছে, তবুও একথা স্বীকার করতে হবে যে সভ্য মানুষদের মতন জীবনকে দেখবার তাদেরও একটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী আছে এবং তাদেরও মধ্যে একটা ন্যায়-অন্যায় বোধ আছে, তাদেরও অন্তর ভালবাসা, ঈর্ষা, স্নেহ-মমতা আর রূপ-লালসায় আমাদেরই মতন সাড়া দেয়। আমাদের সঙ্গে না মিললেও, তাদেরও একটা স্বতন্ত্র নীতি আছে। রেনে মারাঁর বিশেষত্ব হ'ল তাদের সেই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই তাদের জীবনকে তিনি দেখেছেন এবং আমাদের দেখিয়েছেন ; বাংলা সাহিত্যের সৌখীন প্রোলিটারিয়েট লেখকদের মতন নিজেদের মন-গড়া কল্পনার রঙে তাদের রাঙিয়ে তোলেন নি। সেই জন্যে বাতোয়ালার অনেক বর্ণনা, অনেক কথা, হয়ত আমাদের কাছে কটু লাগতে পারে, কিন্তু তা মিথ্যা নয়, এবং সেইখানেই এই উপন্যাসখানির একটা বিশেষ মূল্য আছে। একটা অপরিচিত জাতির মনের নিখুঁত মানচিত্র এই উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই এবং আমরা যেন ভুলে না যাই যে উপন্যাস হলো একান্ত-ভাবে adult মানুষের সাহিত্য।

আশা করি, জগতের এক অবজ্ঞাত জাতির মানসিক চিত্ররূপে এই কাহিনী বাংলার পাঠক-পাঠিকাদের মানব-জীবনের বহুমুখী বিচিত্র রহস্য-ধারার সঙ্গেই পরিচিত করিয়ে দেবে। যুগ-যুগান্তের বিচ্ছিন্নতার বাধা উল্লঙ্ঘন করে অন্ধকার মহাদেশে কৃষ্ণকায় জাতিরা জেগে উঠছে, তাদের কৃষ্ণচর্মের অন্তরালে যে আদিম প্রাণ-শক্তির ধারা অক্ষুণ্ণভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, বিংশ শতাব্দীর সংস্পর্শে তা নবশক্তিতে, নব সম্ভাবনায় জেগে উঠছে। মানব-সভ্যতার অনাগত বিশ্বৈক-সম্ভাবনা তাদেরও দানে পরিপুষ্ট হবে···

অন্ধকার তামসী রাত্রির মধ্যে জলে উঠবে বিশ্ব দেয়ালী···
বাতোয়ালার মতন গ্রন্থ সেই মহা-সম্ভাবনারই অগ্রদূত।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

এরাও মানুষ

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রতিদিন সন্ধ্যায় ঘরের ভেতর যে আগুনের কুণ্ড জ্বালা হয়, সারারাত্রি ধ'রে জ্বলে জ্বলে তা নিবে এসেছে এখন। পড়ে আছে শুধু স্তূপাকার অর্দ্ধদগ্ধ কাঠ-কয়লা, আর ভস্ম, তখনও গরম। ভেতরকার মেটে গোল দেয়াল গরমে ঘেমে উঠেছে। সামনের গর্তের ভেতর দিয়ে একফালি অস্পষ্ট আলো এসে পড়েছে। সেই গর্তই হ'ল ঘরের দরজা। খড়ো চালের ভেতর থেকে অনবরত উঠছে একটা খস্‌-খস্ শব্দ···উইপোকার চলা-ফেরার শব্দ।

বাইরে ডেকে ওঠে মুর্গীগুলো। তাদের কিরি-কিরি আওয়াজের সঙ্গে মিশে যায় ছাগল-ছানাদের ডাক ···ঘুম ভেঙ্গে তারা তাদের মায়েদের খুঁজছে। ক্রমশ ডাকতে শুরু করে দেয় লম্বা-ঠুঁটো পাখীগুলো···। তাদের মিলিত কলরবের পেছনে, পাম্বা আর বাম্বার তীরে ঘন সবুজ বন থেকে আসে বাকাউয়ার কর্কশ চীৎকার···আফ্রিকার বুনো বাঁদর, কুকুরের মতন মুখের চোয়াল।

এই অঞ্চলের প্রধান বাতোয়ালা, তখনও ঘুমের নেশায় আচ্ছন্ন বিছানায় শুয়ে আছে···শেষ ঘুমের ভেতর থেকে স্পষ্ট শুনতে পায় এই সব পরিচিত আওয়াজ। আশে-পাশে পাঁচখানা গাঁয়ের সে 'মুকুন্দজী', মোড়ল।

বিছানায় শুয়েই সে হাই তোলে, এ-পাশ ও-পাশ পাশমোড়া দেয়, হাত-পাগুলো টেনে ঠিক করে নেয়; ভেবে ঠিক করে উঠতে পারে না, বিছানা ছেড়ে উঠে পড়বে, না আবার আর এক পাল্‌টা ঘুমিয়ে নেবে।

ওঠো, জাগো নাকোরা! কিন্তু কেনই বা উঠতে হবে?

সে ভাবতেও চায় না···সোজাই হোক্ আর জটিলই হোক্, ভাবনা-চিন্তার ধার সে ধারে না।

হাঁ, উঠতে তো হবেই কিন্তু ওঠা বললেই তো ওঠা হয় না। তার জন্যে রীতিমত খানিকটা মেহনৎ তো করতে হবে! অনেকখানি চেষ্টা। উঠতে হবে, শুনতে খুব সোজাই মনে হয়। কিন্তু তাকে কাজে পরিণত করা রীতিমত একটা কঠিন ব্যাপার···কেন না, সে জানে, আজ তার কাছে জেগে ওঠা মানেই হলো কাজ করা··· অন্তত শাদা চামড়ার লোকগুলো সেই কথাই তাদের শিখিয়েছে।

কাজ করতে তার যে বিরক্ত লাগতো কোনদিন, তা নয়। পরিশ্রম করবার মতই তার শক্ত দেহ, নিরেট, নিটোল; লম্বা-চওড়া বলিষ্ঠ সব পেশী; তার মতন হাঁটতে, ছুরি চালাতে, কুস্তি করতে খুব কম লোকই পারে।

বাণ্ডাদের সেই বিরাট দেশের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত লোকের মুখে-মুখে তার অদ্ভুত শক্তির আশ্চর্য সব কাহিনী রূপকথার গল্পের মতন ইতিমধ্যেই ঘুরে বেড়ায়। নারীদের হৃদয়-জয়ে কিম্বা শত্রুদের দুর্গ-জয়ে, কিম্বা অরণ্যে বনো জন্তুদের শিকারে তার অসংখ্য কীর্তির কথা ইতিমধ্যেই তার স্বজাতির মনে একটা বিস্ময়ের স্বর্গ-লোক রচনা করেছে। যখন রাত্রিতে বনের মাথার ওপর আইপেন্ (চাঁদ) ভাসতে ভাসতে এসে পৌঁছয়, দূর-দূরান্তের সব গ্রামে, মবিস, ডাকপা, ডাকানো আর লাংবাসীরা তাদের এই সেরা 'মুকুন্দজী' বাতোয়ালার কীর্তির গান গেয়ে ওঠে, গানের সঙ্গে সঙ্গে বাজতে থাকে তাদের হাতের যন্ত্র, বালাফ, আর কুন্দে, সঙ্গে তাল দিয়ে চলে তাদের তবলা লিউঘা।

সুতরাং কাজ করতে তার কোন ভয় ছিল না।

কিন্তু কথা হলো, শাদা লোকগুলোর ভাষায় এই কাজ কথাটার একটা আলাদা মানে ছিল। আশ্চর্য অদ্ভুত মানে। তাদের ভাষায় কাজ হলো অকারণ ক্লান্তি, উদ্দেশ্যহীন একটা অবসাদ···কাজ মানে হলো অশান্তি, যন্ত্রণা, বেদনা, স্বাস্থ্যক্ষয়, একটা কাল্পনিক লক্ষ্যের পেছনে অকারণে ছুটে চলা।

উঃ! ঐ শাদা লোকগুলো। কেন তারা, তারা সকলে তাদের নিজের দেশে যে-যার ঘরে ফিরে যায় না? কেন তারা তাদের নিজের ঘর-গেরস্থালির ব্যাপার নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না? কেন তারা তাদের

নিজেদের জমি-জমার চাষ-বাস নিয়েই থাকে না? তার বদলে কেন তারা অকারণ অপ্রয়োজনীয় কতকগুলো টাকা রোজগারের জন্যে হয়ে হয়ে ঘুরে বেড়ায়?

এতটুকু তো হলো জীবনের মেয়াদ। যারা এই সত্য না বুঝেছে তারাই অমনি ধারা কাজ ক'রে তা অকারণ ক্ষয় ক'রে বেড়ায়। যে মানুষের দৃষ্টি ঘোলাটে নয়, সে জানে কাজ-না-করার মধ্যে কোন গ্লানি নেই। কাজ-না-করা মানে তো অলসতা নয়। বাতোয়ালা স্থির নিশ্চিত ভাবে জানে, কিছু-না-করা মানেই হলো যা' কিছু পেয়েছ স্বাভাবিক ভাবে তোমার চারদিকে, তাকেই সুন্দর ভাবে উপভোগ করা, তাতেই সন্তুষ্ট থাকা। তার এ সিদ্ধান্ত যে ভুল, তা আজও কেউ তাকে প্রমাণ করে দিতে পারে নি। প্রত্যেকটা দিন আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। যেদিন চলে গেল তার কথা ভাববার কোন দরকার নেই, যেদিন রাত প্রভাতে আসছে তার জন্যে দুশ্চিন্তা করবারও কোন প্রয়োজন নেই। ভাবনা-চিন্তাহীন স্বচ্ছ নিরুদ্বেগ প্রতিদিন বেঁচে থাকা, এই তো চরম বেঁচে থাকা!

তাছাড়া, বিছানা ছেড়ে ওঠে কি হবে? দাঁড়ানোর চেয়ে বসে থাকা ঢের ভাল, বসে থাকার চেয়ে শুয়ে থাকা ঢের বেশী আরামের। এ তো অতি সোজা কথা···সবাই জানে।

যে মাদুরটার ওপর সে শুয়েছিল, তা থেকে শুকনো লতার একটা সুবাস ওঠে। চমৎকার মসৃণ··· সদ্য-নিহত কোন ষাঁড়ের চামড়া এত নরম আর মসৃণ হতে পারে না।

সুতরাং চোখ বন্ধ ক'রে না ঝিমিয়ে, সে তো আর একবার ঘুমোতে পারে! বেশ ভাল করে আর একবার পরখ করে দেখতে পারে যে 'বোগ্‌বো'র (মাদুর) ওপর শুয়ে আছে, সত্যি সেটা কতখানি মসৃণ···

তাহ'লে, আগুনটাকে আবার জ্বালিয়ে তুলতে হয়।

গোটাকতক শুক্‌নো গাছের ডাল আর একমুঠো খড়, তাতেই হবে। মুখ ফুলিয়ে সে নিবন্ত আগুনে জোর করে ফুঁ দেয়। তখনও ছাই-এর ভেতরে ভেতরে আগুনের কণা লুকিয়ে ছিল। দেখতে দেখতে কাঠ-কাটার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গোলাকারে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে থাকে। দম-বন্ধ-করা তীব্র ধোঁয়া। নিবে-যাওয়া আগুনের ভেতর থেকে লক্‌-লক্‌ করে জ্বলে ওঠে শিখা···তন্বী হয়ে গিয়েছে আগুন।

আগুনের দিকে পিঠ করে, সেই মিষ্টি আঁচের আমেজে সে আবার ঘুমোতে চেষ্টা করে। বনের মধ্যে ইগুয়ানা যেমন নির্ভাবনায় রোদ পোয়ায়, তেমনি নির্ভাবনায় উপভোগ করা এই মধুর উত্তাপ। তার ইয়াসী···অর্থাৎ তার স্ত্রী···যা করছে, তাই অনুসরণ করা ছাড়া আপাতত আর কি করবার আছে?

অনেক দিন হলো এই ইয়াসীর সঙ্গে সে ঘর করছে। শান্ত, নগ্ন নিরুদ্বেগ সে এক পাশে ঘুমিয়ে আছে। একটা কাঠের ওপর মাথা, দুটো হাত পেটের ওপর, পা দুটো ঈষৎ ফাঁক করা, নিরুদ্বেগে নাক ডাকিয়ে চলেছে। পাশেই একটা উনুন, তারই মতন তারও নিবে গিয়েছে আগুন।

কি চমৎকার সুখেই না সে ঘুমুচ্ছে! ঘুমের মধ্যে কখনো কখনো পেট থেকে হাত তুলে স্তনের ওপর রাখছে···ভেঙ্গে-পড়া, শীর্ণ স্তন, শুকনো তামাক-পাতার মতন। কখনো বা ঘুমের মধ্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলার সঙ্গে গা-টা একটু চমকে নিচ্ছে। ঠোঁট দুটো হঠাৎ নড়ে ওঠে এক-একবার। গা এলিয়ে দেয়। তারপর আবার সব স্থির হয়ে আসে, আবার নাক ডাকতে থাকে।

ঘরের এক ধারে একটা গর্তের ভেতর কতকগুলো বরাবের চুবড়ী জমা হয়ে পড়ে আছে। তার ওপর বসে ঝিমোচ্ছে জুমা, ছাই-রঙা তার কুকুরটা···বিষণ্ন ম্লান মুখ।

উপবাস-শীর্ণ তার ছোট্ট দেহের মধ্যে চোখে পড়ে শুধু তার লম্বা খাড়া ছুঁচালো কান দুটো, যেন তার ঘুমন্ত দেহের মধ্যে সব সময় সেই দুটো কানই জেগে আছে। হয়ত গায়ে মাছি উড়ে এসে বসলো কিম্বা কোন পোকা কামড়ালো, দেহটা ঝাড়া দিয়ে উৎপাতটাকে দূর করতে চেষ্টা করে। চোখ চেয়ে একবার দেখে নেয়, কাছেই তার মনিবাণী ইয়াসীগুইন্দজা শুয়ে আছে, তার মনিবের সবচেয়ে প্রিয় ইয়াসী, মনিবাণী যখন ঘুমুচ্ছে, তখন সে আর উঠবে কেন? সেইখানেই শুয়ে থাকে, নড়ে না একটুও। কখন বা, স্বপ্নের নিষ্ঠুর পরিহাসে বিচলিত হয়ে শূন্যে মুখ তুলে চীৎকার করতে থাকে···ঘরের নীরবতা আহত হয়ে ওঠে।

বাতোয়ালা কনুই-এর ওপর ভর দিয়ে ভঙ্গী পরিবর্তন করে নেয়। সত্যি, চেষ্টা করে ঘুমানো অসম্ভব! তার বিশ্রাম করার বিরুদ্ধে সবাই যেন আজ ষড়যন্ত্র করেছে। কুঁড়ে ঘরের ফাঁক দিয়ে বাইরে থেকে ভোরের কুয়াশা ঢুকছে। সব ঠাণ্ডা

হয়ে আসছে। তাছাড়া, তার ক্ষিদেও পেয়েছে। হায়! দিন এসে গিয়েছে।

তাছাড়া, এখন কি রকম করেই বা ঘুমাবে? বাইরে ঠাণ্ডায়, ভিজে ঘাসের বনে গেছো-ব্যাঙ আর ষাঁড়-ব্যাঙ স-পরিবারে পাল্লা দিয়ে চীৎকার সুরু করেছে। ভেতরে কুয়াশার হিম, তায় মরে-যাওয়া আগুনে তেমন করে আর আঁচ ওঠে না, তাই মশার দল নির্ভাবনায় আবার সশব্দে ঘুরতে থাকে। ছাগল-ছানাগুলো আপনা থেকে যদিও বেরিয়ে গিয়েছে কিন্তু মুরগীগুলো তখনো রয়েছে, তুমুল সোরগোল তুলেছে।

এমন কি হাঁসগুলো, স্বভাবতই যারা শান্তশিষ্ট থাকে, ঘুম থেকে উঠে দলপতিকে ঘিরে তারাও কলরব জুড়ে দিয়েছে। কখনো গলাটা বাড়িয়ে ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, কখনো বা সোজা করে তুলে, বিস্ময়ে চারদিকে কিসের যেন সন্ধান করে বেড়ায়।

তাদের ভঙ্গী দেখলে, স্পষ্ট মনে হয়, যেন তারা এক বিরাট ধাঁধায় পড়ে গিয়েছে। তাদের হংস-জীবনে যেন এক অভূতপূর্ব নতুন সমস্যার সামনে তারা এসে দাঁড়িয়েছে। ল্যাজ নেড়ে এ-ওকে জিজ্ঞাসা করে, ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরে-ফিরে আলোচনা করে··· যেন একটা মীমাংসায় আসবার জন্যে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

কিছুক্ষণ সেই ভাবে ঘুরে-ফিরে আলোচনা করার ফলে যেন তারা সমস্যার সমাধান খুঁজে পায়। তাদের আলোচ্য লক্ষ্যকে যেন সামনে দেখতে পায়, তখন গম্ভীর ভারিক্কি চালে সারি বেঁধে, সেই রবারের ঝুড়ি-গুলোর চারদিকে ঘুরতে থাকে। ঘরের এককোণে গিয়ে আবার সভা করে বসে। মাঝে মাঝে ঘাড় তুলে দরজার দিকে চেয়ে দেখে।

হঠাৎ তাদের মধ্যে একজন সিদ্ধান্ত ঠিক করে ফেলে। গম্ভীর ভাবে গুণে গুণে পা ফেলে ঈষৎ-আলোকিত দরজার দিকে অগ্রসর হয়। লাফাবার জন্যে মাটীতে কয়েকবার ডানার ঝাপট দিয়ে নিজেকে ঠিক করে নেয়···তারপর···ডানা মেলে লাফিয়ে ওঠে···বাইরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

তার দেখাদেখি অন্য সবাই সেই একই পন্থা অনুসরণ করে।

এতক্ষণে জুমার ঘুম যেন ভাঙে। অবশ্য হাঁসেদের এই গোলমালে তার ঘুম ভাঙে নি। এ গোলমাল তার অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।

যখন তার মা বেঁচেছিল, অর্থাৎ তার মনিবরা তার মাকে খেয়ে ফেলার আগের দিনে, তখন থেকেই রোজ সকালে এই রকম গোলমাল সে শুনে আসছে।

মানুষ আর পশু এখানে বাধ্য হয়েই এক ছাদের তলায় একসঙ্গে বাস করে। তাই একসঙ্গে থাকতে থাকতে পরস্পর পরস্পরকে সহ্য করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

তবে, প্রথম প্রথম জুমার জীবনটাকে বড়ই কষ্টকর মনে হতো। কুকুর হিসেবে তার কি কি কর্তব্য, তা তখনও ঠিক সে আয়ত্ত করে উঠতে পারে নি। মনিবের পায়ের দিকে লক্ষ্য রেখে সময় বুঝে ডেকে উঠতে তার মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যেতো।

বাতোয়ালার অনেক নিষ্ঠুরতা আর ইয়াসীগুইন্দজার অনেক ধমকানি তাকে সহ্য করে বড় হতে হয়েছে। তার ওপর ছিল ছাগল-ছানাগুলোর হরেক-রকম নষ্টামি আর হাঁসগুলোর ঔদ্ধত্য, তাকে মাঝে-মধ্যে পাগল করে তুলতো।

তার ফলে, একটুতেই তার মেজাজ বিগড়ে যেতো। কাজ করতে ডাকলেই সে বিরক্ত হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে উঠতো এবং সঙ্গে সঙ্গেই পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করতো। লাথির ভয়ে তার মগজ এমন ধারালো হয়ে উঠেছিল যে, সাদা চামড়ার লোক দেখলেই সে ছুটতে আরম্ভ করে দিতো।

সুতরাং তার ঘুম যদি ভেঙে থাকে, তা গোলমালের জন্যে নয়। খুব বেশী ঘুমিয়েছে বলেও নয়। ঘুম অফুরন্ত। এ বিষয়ে তার মনিবের সঙ্গে সে একমত। ঘুমিয়ে কেউ ক্লান্ত হয় না।

সে ঘুম থেকে উঠলো, কারণ উঠতে তো হবেই।

জেগে-ওঠা তার পক্ষে কিন্তু খুব একটা আনন্দের বিষয়ও নয়। তার জীবনের অভিজ্ঞতায় সে বুঝেছে, বাতোয়ালার কাছে, বাতোয়ালা কেন প্রত্যেক মানুষের কাছেই, একটা কুকুরের জীবনের কি দামই বা আছে?

মারতে মারতে তাকে তারা মেরেই ফেলে, ক্ষিদে পেলে খেয়ে ফেলে, বিরক্ত হলে কান কেটে ছেড়ে দেয়। এই তো কুকুরের জীবন! তার বদলে কুকুর কি বা করতে পারে? কুকুর করেই বা কি? এক রকম নিষ্প্রয়োজন বললেই হয়। অবিশ্যি যখন বনে আগুন লাগে, তখন কুকুরের খানিকটা দরকার হয়। হাতের কাছ থেকে শীকার যখন পালিয়ে যায়, তখন তার পিছু তাড়া করবার জন্যে দরকার হয়। তা ছাড়া কুকুরের আর কি দরকার? নিষ্প্রয়োজন।

বহু দিন হলো জুমা মানুষকে পুরোপুরি চিনে নিয়েছে। তাদের সব রকম-সকম তার জানা হয়ে

গিয়েছে। অনেক দিন হলো সে বুঝতে পেরেছে, ঘরে বসে ঘুমুলে, কেউ তার মুখে খাবার এনে দেবে না।

সুতরাং তাকে জাগতে হয়। সে জানে এই ভোরবেলা বেরিয়ে পড়লে টাটকা ছাগল-নাদি পাওয়া যায়। ভোরবেলাকার এই নাদিতে তবুও খানিকটা দুধ-দুধ গন্ধ থাকে। যে কুকুরের ভাগ্যে সারা দিনের মধ্যে চিবোতে আর কিছু জুটবে না, তার কাছে এই ভোরের ছাগল-নাদিই পরম উপাদেয় খাদ্য।

ছাগলের পরিত্যক্ত এই পদার্থ, তাও সংগ্রহ করতে হলে নিশ্চিন্তে বসে থাকা যায় না। সেই ছাগল-নাদির আবার ভাগীদার আছে, গোবুরে-পোকার দল। এত ঠাণ্ডায় কি তারা বেরিয়েছে? বোধ হয় না। হঠাৎ কিসের আশায় জুমার বিষণ্ণ মুখে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটে ওঠে। হয়ত ভোরবেলায় ঘুরতে ঘুরতে একটা-আধটা মুরগীর ডিমও জুটে যেতে পারে। না, না, এত আশা করা ঠিক নয়···

জুমা উঠে বসে। জিভ দিয়ে পেট আর পায়ের চেটো ভাল করে চুষে, চেটে নেয়। তারপর ক্লান্ত শীর্ণ দেহ নিয়ে কোন রকমে হেলতে দুলতে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

এত দিনের অভিজ্ঞতায় সে শিখেছে কি করে মনের ভাব লুকিয়ে চলতে হয়। তাই দরজার কাছে এমন ভঙ্গী করে দাঁড়ায় যেন সীমাহীন ক্লান্তির অসহ্য জড়তা তাকে পেয়ে বসেছে। যদি সে একটু স্ফূর্তির আমেজ দেখায়, তাহলে এক্ষুণি হয়তো বাতোয়ালা তার পিছু নেবে। তখন কোন কিছু যোগাড়ের আর কোন আশা-ভরসাই থাকবে না। সেটি হলে চলবে না।

বাতোয়ালাও ভাবছিল। একে একে হাঁসগুলো, ছাগল-ছানারা, মুরগীগুলো, সবশেষে জুমাও বেরিয়ে চলে গেল। তাদের অনুসরণ করাই তার উচিত। তা ছাড়া, লিঙ্গচ্ছেদের উৎসব সামনে রয়েছে। এখনো পর্যন্ত কাউকে নেমন্তন্ন করা হয় নি। আর সময় নেই, তাড়াতাড়ি সেটা সেরে ফেলতে হবে।

দু'চোখ রগড়ে, একবার ভাল করে নাকটা ঝেড়ে নিয়ে উঠে বসলো, গা চুলকোতে লাগলো। বগল, উরু, মাথার পশ্চাদ্দেশ, হাত, কোন অঙ্গই বাদ দিল না। চুলকোনো যে রীতিমত একটা ব্যায়াম। চুল-কোনোর ফলেই না শিরায় রক্ত চলাচল আবার দ্রুত হয়। চুলকোতে অবশ্য এক সময় রীতিমত ভালও লাগতো, আজ শুধু অভ্যাস, ঘুম থেকে জেগে ওঠার লক্ষণ।

আরে, চারিদিকে একটু চেয়ে দেখলেই তো বোঝা যায়! কোন্ প্রাণী ঘুম থেকে উঠে গা চুলকোয় না? সব প্রাণীই তা করে। মানুষ হয়ে তা অনুকরণ করতে দোষ কি? এটা তো একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। যে দেখবে ঘুম থেকে উঠে গা চুলকোচ্ছে না, বুঝবে তার ঘুম এখনও ভাল করে ছাড়ে নি।

তবে চুলকোনো ভাল বটে কিন্তু হাই তোলা আরো ভাল। হাই তোলা মানে হলো, মুখ দিয়ে ভেতরের ঘুমকে পুরোপুরি বার করে দেওয়া!

এবং সেটা যে সম্ভব তা প্রকৃতির দিকে চাইলে অনায়াসেই বোঝা যায়। শীতের দিনে কে না দেখেছে, দেহের ভেতর থেকে এক রকম ধোঁয়া বেরোয়? কিন্তু এ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ঘুমটা হলো দেহের ভেতরের একটা গোপন আগুন। এই আগুনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সে একেবারে অভ্রান্ত। তা ছাড়া, ওঝারা হলো সবজান্তা, তাদের কোন ভুলই হতে পারে না। তার বাবার কাছ থেকে এই ওঝাগিরি সে শিখেছে, তার বাবার সব যাদুবিদ্যা সে পেয়েছে। তাইতে তো আজ সে পাঁচখানা গাঁয়ের বাতোয়ালা, সর্দার।

তা ছাড়া, একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে,—ঘুম যদি ভেতরকার আগুন না হয়, তা হলে নিশ্বাসের সঙ্গে ধোঁয়া বেরোয় কি করে? আগুন ছাড়া ধোঁয়া কি কেউ দেখেছে? এ নিয়ে সে যে-কোন লোকের সঙ্গে তর্ক করতে প্রস্তুত···

তা ছাড়া, প্রথা বলে একটা কথা আছে। পুরানো প্রথা হলো অভ্রান্ত সত্য। বহু দিনের বহু অভিজ্ঞতায় তাদের জন্ম হয়েছে।

বাতোয়ালা আধ-শোয়া অবস্থায় ভাবে। সে হলো আশে-পাশের গাঁয়ের, এতোগুলো লোকের বাতোয়ালা, অর্থাৎ তাদের সমস্ত প্রথার সেই হলো রক্ষক। তার নিজের জাতের সম্পদ সে যা পেয়েছে, সারা জীবন ধরে তাকেই সে আগলে ধরে আছে। সেই তার কর্তব্য।

তার চেয়ে গভীর সে কিছু ভাবতে চায় না। তার কোন দরকারই নেই। প্রথাতে যা প্রতিষ্ঠিত, কোন তর্ক তাকে হটাতে পারে না। অসম্ভব।

তা না হয় হলো, কিন্তু লিঙ্গচ্ছেদ-উৎসব কোথায় কখন হবে, তা তো বন্ধু-বান্ধবদের আগে থাকতে জানাতে হবে। আপাতত নিবন্ত আগুনটা ঠিক করে নেওয়া দরকার। তার আগুন তাকেই ঠিক করে নিতে হবে। মানুষ যে-যার একলার জন্যেই। অন্তত সেই তত্ত্বই সে শিখেছে।

আগুন ঠিক করে সে বেরিয়ে পড়লো

অল্পক্ষণ পরেই আবার ফিরে এলো। গ্রীষ্মই হোক আর বর্ষাই হোক, সামান্য একটা কোমর-বন্ধ ছাড়া আর কিছু সে পরতো না। সেই জন্যে শীতের দিনে শীতের কামড় একটু-আধটু সহ্য করতে হতো।

বাইরের কুয়াশা ঘন হয়ে পড়ছে। এত ঘন যে ঠাওর করে উঠতে পারে না, তার বাকি আট জন স্ত্রীর কুঁড়ে ঘর ঠিক কোন্ দিকে।

উহু···হু···হু···হিমে দেহ কাঁপতে থাকে·· দাঁতে দাঁত লেগে যায়।

ঘরে ঢুকে তৈরী আগুনে ফুঁ দেয়। আগুনের আঁচে হিমের জড়তা কেটে যায়। আগুনের ওপর হাতের পাতা মেলে দিয়ে আপনার মনে একটা পুরানো গানের সুর গুন্-গুন্ করে গেয়ে ওঠে। গুন্-গুন্ করতে করতে গানের ভাষায় নতুন শব্দ যোজনা করে। কান পেতে শুনলে বোঝা যাবে, তার মধ্যে শাদা চামড়াওয়ালা মেয়ে-পুরুষদের কথাও আছে।

বাইরে হাল্কা হাওয়া জেগে ওঠে। ভিজে পাতার মধ্যে মৃদু শিহরণ জাগে। ডালগুলো দুলে দুলে এ-ওর ঘাড়ে গিয়ে পড়ে। বাঁশের উঁচু মাথা নুয়ে প'ড়ে দুলতে থাকে। করুণ দীর্ঘশ্বাসের মতন তাদের বুক থেকে একটা আওয়াজ ওঠে।

বাতাস ক্রমশ জোরে বইতে থাকে। ঘন কুয়াশা টুকরো টুকরো হয়ে যায়। অবশেষে একটা দমকা হাওয়া এসে তাদের দূরে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। মেঘের ভেতর থেকে স্পষ্ট স্বচ্ছ সূর্য ফুটে ওঠে!

বাতোয়ালা তার কুঁড়ে ঘরের বাইরে, নতুন-জ্বালা অগ্নিকুণ্ডের সামনে এসে বসে। উদাসীন শূন্য মনে সে তার পুরানো গড়গড়াতে তামাক দিয়ে ধীরে ধীরে টানতে আরম্ভ করে···

বাইরে এসে গিয়েছে দিন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আধ-বোজা চোখে বাতোয়ালা ধূমপান করে চলে। আরামে ছোট ছোট করে টান দেয়, ছোট ছোট ধোঁয়ার কুণ্ডলী ঘুরতে ঘুরতে বাতাসে মিলিয়ে যায়।

অনেকক্ষণ কেটে যায় এইভাবে।

ক্রমশ আকাশে সূর্য প্রখর হ'য়ে উঠতে থাকে। বাড়তে থাকে রোদের তেজ। মন্দ লাগে না। প্রতিদিনের অভ্যাসে সয়ে গিয়েছে রোদের ঝাঁঝ। গায়েই লাগে না।

সামনে তুলোর গাছে মাঝে মাঝে হঠাৎ দমকা হাওয়ায় আলোড়ন জাগে। নরম কচি ডালের কাঁচা সবুজ পাতা শির-শির করে ওঠে।

কোন কোন গাছের ছাল ভেতর থেকে চিড় খেয়ে শুকিয়ে দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছে; আর তার ভেতর থেকে ফেটে পড়ছে প্রাণ-রস, জমাট-বাঁধা রক্ত অশ্রু-বিন্দুর মত।

এক গাছ থেকে আর এক গাছে সেতু রচনা করে, ঠাস-বুনোনি জালের মতন প্রত্যেক গাছকে জড়িয়ে উঠেছে বিচিত্র সব লতা।

তপ্ত মাটীর শুকনো গন্ধের সঙ্গে, বুনো ঘাস আর পচা জলার ঝাঁঝালো দুর্গন্ধ মিশে বাতাসকে ভারী করে তোলে। তার ভেতর থেকে নাকে আসে বুনো সব্জীর রোদে-পোড়া গন্ধ।

চারিদিকের এই ঘন সবুজের ভেতর আত্মগোপন ক'রে আনন্দে ডাকতে থাকে বুনো পাখীর দল। স্বচ্ছ নীল আকাশে ভ্রাম্যমান কৃষ্ণ-বিন্দুর মতন ঘুরে বেড়ায় শব-সন্ধানী শকুনির দল···দূর থেকে মাঝে মাঝে বাতাসে ভেসে আসে তাদের বীভৎস চীৎকার। ক্ষীণ অথচ কর্কশ।

পোম্বা কিম্বা বাম্বার তীর থেকে ভেসে আসে টুকরো টুকরো গানের সুর···কারা যেন গাইছে, "এ হে···ইয়াবা···হো"···

তার অর্থ হলো, নদীর ধারে, যে কোন জায়গায় হোক, সুরু হয়ে গিয়েছে কাজ···গানের সুর জুগিয়ে চলেছে মেহনতের ছন্দ।

রোদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে থেমে আসে সব শব্দ। সে শব্দ-হীনতার একাধিপত্য ভঙ্গ করে শুধু জেগে ওঠে সেই নদী-পারের একঘেয়ে সুর। হঠাৎ গান যখন থেমে যায়, কান পেতে স্পষ্ট শোনা যায়, চারিদিকে তপ্ত রোদের ঝাঁঝে ফেটে পড়ছে গাছের গা···শোনা যায়, সেই সব ক্ষীণতম শব্দ, যা দিয়ে তৈরী হয় মধ্যাহ্নের নীরবতা।

আবার ভেসে আসে সেই সুর···এবার যেন ক্ষীণতর।

এতক্ষণে ইয়াসীগুইন্দজা যথারীতি রান্না করেছে কাসাভা-দানার ভাত···সেই সঙ্গে হয়েছে তরকারি, আলু-সিদ্ধ, আর বুনো শাক।

বাতোয়ালা খেতে বসে, ইয়াসীগুইন্দজা স্বামীর পরিত্যক্ত হুঁকোটি তুলে নেয়···তামাক টানতে টানতে অন্যমনস্ক ভাবে চেয়ে থাকে উনুনের হাঁড়ির দিকে, সেখানে গুটি-পোকার ষ্টু তৈরী হতে থাকে নরম আঁচে।

তার আট জন সপত্নী-সখী তখন যে-যার কুঁড়ে ঘরের বাইরে নগ্নাবস্থায় দরমার বেড়ায় ঠেস দিয়ে প্রসাধনে ব্যস্ত।

এর মধ্যে লজ্জা বা সঙ্কোচের কিছুই নেই। পুরুষ আর নারী, পরস্পরের প্রয়োজনের জন্যেই তৈরী হয়েছে। পুরুষ আর নারীর মধ্যে যেটুকু পার্থক্য, সে-পার্থক্যকে যখন অস্বীকার করা কোন মতেই চলে না, তখন তা নিয়ে অকারণে মাথা-ব্যথা করে লাভ কি? দেহগত লজ্জার কোন মানেই হয় না। সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। শাদা চামড়াওয়ালা মানুষগুলো তাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছে হরেক রকমের ভণ্ডামি। আরে, মানুষ কোন্ জিনিস লুকোয়? যদি কোথাও কোন আঘাতের দাগ থাকে, যদি কোথাও কোন গোলমাল থাকে, তবেই তাকে মানুষ ঢেকে রাখতে চেষ্টা করে। নইলে, পুরুষই হোক, আর নারীই হোক্, যা তার স্বাভাবিক, যা তার প্রকৃতিগত শক্তি, যা তার সৌন্দর্য, তাকে সে লুকোতে যাবে কেন? হাঁ, এমন যদি কোন উদ্ভট জিনিস থাকে, যা দেখে মানুষ হাসতে পারে বা উপহাস করতে পারে, তা না হয় লুকোন চলে!

বাতোয়ালা খেতে আরম্ভ করে···কাসাভা-দানার ভাত শেষ ক'রে গুটি-পোকার ঝোলের বাটিতে হাত দেয়···গুটি-পোকা নিঃশেষ করে শেষকালে মুখে দেয় আলু সেদ্ধ। দু'-তিন গ্রাস খাদ্যের পর এক-একবার 'কেনে'র ভাঁড় তুলে নিয়ে চুমুক দেয়···'কেনে' হলো তাদের দেশের "বিয়ার", ভুট্টার বীচি পচিয়ে তৈরী করা হয়।

পরিতৃপ্ত ভাবে ভোজন শেষ করে বাতোয়ালা ইয়াসী-গুইন্দাকে ইঙ্গিত করে তামাকের হুঁকোটা আবার তার কাছে এগিয়ে দেবার জন্যে। মৌজ করে বসে অনেকক্ষণ ধ'রে গড়গড়াটি নিয়ে টানের পর টান দিতে থাকে। দিনটার আরম্ভ মন্দ গেল না, খুসী হয়েই হুঁকোটা নামিয়ে রেখে দেয়। তারপর পা ছড়িয়ে ডান পায়ের আঙুলগুলো নেড়ে-চেড়ে পরীক্ষা ক'রে দেখে, 'সিগ্‌ড়ে' অর্থাৎ পোকা-মাকড় কিছু আছে কিনা। এই সিগ্‌ড়ের উৎপাতের জন্যে বেচারা নিগ্রোদের সর্বদাই উদ্‌ব্যস্ত হয়ে থাকতে হয়। একদিন যদি অন্যমনস্ক হয়ে পায়ের আঙুলের দিকে নজর না দিয়েছে, তা হলে রাতারাতি আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে সিগ্‌ড়েগুলো হাজার হাজার ডিম পেড়ে বসবে···একটা সিগ্‌ড়ে যে কত ডিম পাড়তে পারে, তার কোন হিসেব-নিকেস নেই।

শাদা চামড়াওয়ালা লোকদেরও সিগ্‌ড়েরা ছেড়ে দেয় না। কিন্তু তাদের কথা হলো আলাদা। তাদের চামড়া এমন যাচ্ছেতাই রকম নরম যে একটা সিগ্‌ড়ে গিয়ে বসলেই তারা জানতে পেরে যায়, ভয়ে ছটফট করতে থাকে। তক্ষুণি বয়কে ডাক পাড়ে। বয় এসে চামড়া থেকে সিগ্‌ড়েটাকে খুঁজে বার করে যতক্ষণ না ফেলে ফেলছে, ততক্ষণ তারা চেঁচাতেই থাকবে।

কিন্তু এ নিয়ে আলোচনা করে কি লাভ? কে না জানে যে, শাদা লোকগুলোর গায়ের চামড়া নিগ্রোদের মতন শক্ত মজবুত নয়?

নিগ্রোদের গায়ের চামড়া মজবুত বলেই শাদা লোকগুলো হাজার রকমে তার সুযোগ নেয়। একটা উদাহরণ দিলেই তা বোঝা যাবে। ট্যাক্‌স্ আদায় করবার ফিকিরে শাদা লোকগুলো নিগ্রোদের দিয়ে পাহাড়-প্রমাণ বোঝা বইয়ে নেয়। একদিন-দু'দিন নয়, ক্রমান্বয়ে চার-পাঁচদিন ধরে সমানে এই সব বোঝা কাঁধে করে তাদের চলতে হয়···এই সব বোঝার ওজন যে কত ভারী, একজন মানুষ বইতে পারে কি না, তা শাদা লোকগুলো একবার ভেবেও দেখে না! রোদ হোক্, বৃষ্টি হোক্, গরমে গায়ের চামড়া জ্বলে পুড়ে যাক, তাদের বোঝা বয়ে চলতেই হবে! শাদা লোকগুলোর আর কি···তারা ভুলেও রোদে আসে না···সব সময়ে তারা তাদের ছাউনীর ছায়ার ভেতরে থেকে শুধু হুকুম দিয়েই খালাস··· সুতরাং, বুঝছো তো, নিগ্রোদের চামড়া কতখানি শক্ত!

হায় শাদা চামড়া! হায় রে শাদা চামড়াওয়ালা!

মশা দেখলেই তারা ক্ষেপে ওঠে। গালাগাল দিতে সুরু করে। মশার ডাক শুনলেই তাদের মেজাজ বিগড়ে যায়। ভাঙা কুঁড়ে ঘরের ফাটলে কিম্বা পুরানো ভাঙা বাড়ীর পাথরের তলায় যে-সব বিছে থাকে, কালো কালো সব "প্রাকঙ্গো", যমের মতন ওরা তাদের ভয় করে। ঘরের আশে-পাশে বন-জঙ্গলে যে-সব মাছি ঘুরে বেড়ায়, তাদের জন্যেও ভয়ে ওদের ঘুম ছুটে যায়। আমাদের আশে-পাশে চারিদিকে যে সব ছোট ছোট প্রাণী, খাচ্ছে দাচ্ছে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যারা মানুষ বলে নিজেদের পরিচয় দেয়, তারা কেন তাদের দেখলে এত ভয় পাবে? কেন তাদের জন্যে রাতদিন এতো দুর্ভাবনা? হায় রে শাদা চামড়া! হায় রে শাদা চামড়াওয়ালার দল!

শাদা লোকগুলোর পা? জঘন্য! পা, না খেলনা? রাতদিনই বাক্‌সের ভেতর পা দুটোকে বন্ধ করে রেখে দেয়···লাল, নীল, হলদে কত রকমের চামড়া দিয়ে

বেঁধে লুকিয়ে রাখে! কেন, পায়ে ঘা হয়েছে নাকি? তাই রাতদিন বেঁধে রাখতে হবে?

আরে শুধু পা-ই বা কেন? ওদের সারা গা বোধ হয় ঘেয়ো···রাত-দিনই ঢেকে রাখে। গা থেকে যেন মড়ার গন্ধ বেরুচ্ছে।

তাও না হয় সহ্য করা যায়, কিন্তু দোহাই ভগবান্, ভগবানের দেওয়া চোখ দুটোও সব সময় ঢেকে রেখেছে, শাদা, হলদে, নীল কত রকমের কাচ দিয়ে! তাতেও কি ক্ষান্ত থাকে? কোথাও কিছু নেই, সারা মাথাটা নানান্ রকমের ছোট ছোট চুবড়ী দিয়ে ঢেকে রাখে! আশ্চর্য!

পায়ের আঙুলের পোকা বাছতে বাছতে বাতোয়ালা আপনার মনে ভেবে চলে···মাঝে মাঝে ঘাড়-মুখ বেঁকিয়ে খানিকটা থুতু ফেলে যেন ভেতরকার কতকটা ঘৃণা সেই ভাবে বেরিয়ে গেল!

সত্যিই, এই শাদা লোকগুলোকে সে অন্তর থেকে ঘৃণা করে। ভয়ও করে। তারা অতিরিক্ত ধূর্ত। তারা জানে না, এমন কিছুই পৃথিবীতে নেই, সেই জন্যেই তাদের এত ভয় করে। ইদানীং এই শাদা লোকগুলোর মধ্যে কেউ কেউ, তাদের দেশ ফ্রান্স থেকে, কাঠের তৈরী একটা আশ্চর্য যন্ত্র নিয়ে এসেছে, তার ভেতর থেকে ঠিক এই শাদা লোকগুলোর মতন কারা সব কথা বলে, গান গায়। বাতোয়ালা ভেবেই ঠিক করে উঠতে পারে না, কি করে তা সম্ভব হয়, আর কেনই বা হয়?

তা ছাড়া, সে নিজের চোখে দেখেছে, ওরা খাবার-টেবিলে বসে, ছুরি···হাঁ, ছুরি পর্যন্ত গিলে খায়!

এ নিয়ে তর্ক করে কোন লাভ নেই! এ অঞ্চলে হেন লোক নেই, যে সেই ভয়ঙ্কর শাদা লোকটার নাম না জানে···মারো-কাম্বা, যে লোকটা আগুন দিয়ে বান্ডাদের ঘর-দোর সব জ্বালিয়ে দিয়েছিল···কে না জানে যে মারো-কাম্বা যে-সে সেনাপতি নয়, সে রীতিমত তলোয়ার গিলে খেতে পারতো?

তাছাড়া ওদের অনেকের কাছেই এমন এক অদ্ভুত যন্ত্র আছে, যা চোখে লাগিয়ে ওরা বারাণ্ডাতে বসেই বহু দূরের জিনিস স্পষ্ট দেখতে পায়···ঘরে বসেই ওরা দেখতে পায় দূরে বহু দূরে চোখের আড়ালে কি সব ঘটছে···আশ্চর্য নয়? ভয় না করে উপায় কি?

হাঁ···আর একটা ব্যাপার···ওদের ভেতর যারা ওঝা···তাদের ওরা বলে "ডক্‌তোরো"···সেই ডক্‌তোরোগুলো কি সাংঘাতিক লোক···যদি ইচ্ছে করে তোমাকে দিয়ে নীলজল প্রস্রাব করিয়ে দিতে পারে! হাঁ···নীল···সত্যিকারের নীলজল!

কিন্তু···তার চেয়েও ভয়ঙ্কর আর এক ব্যাপার আছে।

কিছুদিন আগে, ফ্রান্স থেকে যে নতুন সেনাপতি এসেছে, সবাই দেখেছে, সে হাসতে হাসতে নিজের হাত থেকে এক পুরু চামড়া তুলে পকেটে রেখে দিল! যদিও সেটা ঠিক তার গায়ের চামড়ার মতন দেখতে নয়···কিন্তু, তাতে কি যায়-আসে? সেটা যে আসল চামড়া, তাতে কোন সন্দেহ নেই! আসল ব্যাপার হলো, লোকটা যন্ত্রণায় একটুখানিও মুখ বেঁকালো না··· হাসতে হাসতে এক পুরু চামড়া খুলে ফেললো!

দরকার হলে তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজের দাঁত পর্যন্ত খুলে ফেলে সামনে রেখে দেয়। শুধু কি দাঁত, এক একটা চোখও তারা হাসতে হাসতে খুলে সামনে রেখে দেয়, আবার দরকার হলে লাগিয়ে নেয়। কি সাংঘাতিক লোক ওরা!

না, তাদের কোন ওঝাই আজ পর্যন্ত এ-রকম যাদু দেখাতে পারে নি। এ-রকম যাদু-শক্তি তাদের কোন ওঝারই নেই। ভাবতে ভাবতে ঘৃণার পরিবর্তে এক সভয় শ্রদ্ধা তার মনে জেগে উঠতে থাকে···

সূর্য তখন ঠিক মাঝ-আকাশে এসে দাঁড়িয়েছে। যথারীতি সে-সংবাদ ঘোষণা ক'রে ডেকে উঠে কালো পাখীর দল। সমস্ত প্রকৃতি রোদে ঝিম্ হ'য়ে নীথর পড়ে আছে। যেন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। সব কিছুই ঘুমিয়ে পড়েছে। লম্বা শীষ-ওয়ালা ঘন ঘাসের বন নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে, এতটুকু বাতাসের চিহ্ন তাদের অঙ্গে ধরা পড়ে না। শুধু তিনবার মাত্র, ঠিক এমনি দুপুরের সময় রোজ কোন্ রহস্যলোক থেকে আসে তিন ঝলক দমকা হাওয়া, দুলে উঠে ঘাসের বন, তারপর আবার নিশ্চল নিশ্চুপ! দূরে ধোঁয়ার কুণ্ডলীকে যেমন মনে হয় স্থির অচঞ্চল, তেমনি স্থির অচঞ্চল দাঁড়িয়ে আছে তুলো-গাছগুলো···একটা পাতাও ভুলে যেন নড়ে না।

বাতোয়ালা উঠে পড়ে···আর বসে থাকা চলে না। এবার সুরু করতে হবে দিনের কাজ।

কিছু দূরে মাঠের ধারে একটা ঢিবির মত উঁচু জায়গা ছিল, বাতোয়ালা সেই ঢিবির দিকে এগিয়ে চলে। সেই ঢিবির ওপর তিন জায়গায় থাকের পর থাক তার নিজস্ব তিনটে "লিংঘা" (জয়ঢাক) ছিল। মাটী থেকে দুটো মুগুর তুলে নিয়ে সবচেয়ে বড় লিংঘাটার ওপর দুবার আঘাত করলো ধীরে, মেপে মেপে। সমস্ত নির্জনতা সে-শব্দে মুখর হয়ে উঠলো।

লিংঘার আওয়াজ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। কয়েক

মুহূর্তে আবার সব চুপ-চাপ। আবার মুগুর দুটো তুলে নিয়ে দুবার আঘাত করলো লিংঘায়। গুরুগম্ভীর শব্দে আবার ভরে উঠলো বাতাস। ধীরে ধীরে সে-শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাতোয়ালার হাতের স্পর্শে এবার সবগুলো লিংঘা থেকে, গুড় গুড়, টম্ টম্ শব্দ একসঙ্গে জেগে ওঠে, প্রথমে ধীরে, তারপর দ্রুত, তার-পর আরও দ্রুত, শেষকালে সর্বোচ্চ সুর থেকে আবার ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে মৃদু কোমল হয়ে বাতাসে মিলিয়ে যায়।

বাতোয়ালা দূরের দিকে চেয়ে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কয়েক মুহূর্ত যেতে না যেতে, মেঘ-গর্জনের মতন, খুব কাছ থেকে, তারপর কিছু দূর থেকে, আরো দূর থেকে, বাঁ দিক থেকে, ডান দিক থেকে, চারদিক থেকে প্রত্যুত্তর আসতে সুরু করলো। ঠিক তারই লিংঘার মতন আওয়াজ দূর থেকে তার কাছে বাতাসে গড়িয়ে গড়িয়ে আসতে লাগলো, তার আহ্বানের প্রত্যুত্তরে। তারা শুনতে পেয়েছে, তারা সাড়া দিয়েছে। বাতোয়ালা সেই শব্দের অরণ্যের মধ্যে প্রত্যেক শব্দটাকে আলাদা বেছে নিতে পারে, কোন শব্দটা ক্ষীণ মৃদু, কোন শব্দটা যেন কুণ্ঠিত, কোনটা যেন অনিশ্চিত, কোনটা যেন স্পষ্ট, উল্লসিত··· এক কাগা থেকে আর এক কাগায় তার প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ে, এমনি তীব্র আর প্রবল। এক নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য দূর-দূরান্তর প্রাণ-সজীব হয়ে ওঠে।

বাতোয়ালার আমন্ত্রণ-ধ্বনির প্রত্যুত্তরে দূর-দূরান্তর গ্রাম থেকে শব্দের সাহায্যে তারা বলে পাঠালো, আমরা শুনেছি···আমরা শুনেছি তোমার ডাক··· আমরা সবাই সজাগ হয়ে আছি···বল···কি বলতে চাও? কথা বল!

দু'বার দূর-দিগন্ত থেকে ঠিক একই রকমের শব্দের তরঙ্গ ভেসে এল। তাদের শেষ আওয়াজটুকু মিলিয়ে গেলে বাতোয়ালা আবার বলতে সুরু করলো। আবার বেজে উঠলো তার লিংঘা।

প্রথমে বাতোয়ালা ধীরে-সুস্থে নিজেদের ছোট-খাটো সুখ-দুঃখের কথা জানায়···লিংঘার আওয়াজে থাকে না কোন জোর। প্রতিদিনের সেই একঘেয়ে জীবনের ক্লান্তি আর অবসাদের কথা, নিরানন্দ নির্জন জীবনের অভ্যস্ত শ্রান্তি···কোন আনন্দের সম্ভাবনা নেই···নতুন কোন বিপদের আতঙ্ক নেই···যা আছে, মুখ বুজে শুধু তাকে স্বীকার করে নেওয়া···বাতোয়ালার হাতের স্পর্শে তার লিংঘায় জেগে ওঠে সেই অমোঘ অবিতব্যতার কথা···শ্রান্ত, ক্লান্ত, মন্থর।

ক্রমশ বাতোয়ালার হাতের মুগুর পালা করে তিনটে লিংঘার ওপর সমানে পড়তে থাকে···আওয়াজ ক্রমশ দ্রুততর, উচ্চতর হতে থাকে—যেন ধীরে ধীরে ঝড় জেগে উঠছে···দেখতে দেখতে সমস্ত আকাশ ভরে ওঠে তার শব্দের সঙ্গীতে···হঠাৎ এক জায়গায় এসে থেমে যায় সঙ্গীত···ক্ষণিকের বিরাম···পূর্ণ নিস্তব্ধতা··· আবার সুরু হয়, এবার সুরু থেকেই ঝড়ো শব্দের চড়া আওয়াজ···গুরু-গম্ভীর গর্জন···গর্জন প্রতি মুহূর্তে বেড়ে চলে···

বাতোয়ালার সারা অঙ্গ বেয়ে দর-ধারায় ঘাম ঝরে পড়ে। সে উল্লসিত। তার মনের কথা সে স্পষ্ট করে সকলকে জানিয়েছে! হাতের মুগুর চালানোর সঙ্গে সঙ্গে নাচতে সুরু করে দেয়।

সে আজ তাদের সবাইকে ডাকছে···দূর-দূরান্ত গ্রামে যেখানে তার অনুগতজনেরা আছে, তাদের স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, বন্ধু-বান্ধব, বন্ধুদের আবার যারা বন্ধু আছে তাদের সকলকেই সে আমন্ত্রণ জানায়। অন্য গ্রামে যারা মোড়ল, যাদের সঙ্গে সে করেছে প্রাণ-বিনিময়, যাদের রক্ত সে পান করে নিজের দেহে নিয়েছে, তার রক্ত যারা পান করে তাদের দেহে নিয়েছে—তাদের প্রত্যেককে দেয় ডাক। ন'দিনের ভেতর তাদের সকলকে এসে জড় হতে হবে, গান্‌জা-উৎসব উপলক্ষে বিরাট এক 'ইয়াংবার' আয়োজন সে করবে, সে-নৃত্য-উৎসবে তাদের সকলেরই নিমন্ত্রণ। সে-বিরাট আয়োজনে তাকে সাহায্য করবার জন্যে, সবাইকে সে আজ ডাক দেয়।

অদ্ভুত এই লিংঘার আওয়াজ। যুগের পর যুগের চেষ্টায় তারা গড়ে তুলেছে এই বিস্ময়কর ভাষাকে। তারই সাহায্যে বাতোয়ালা আজ এক নিমেষে ছড়িয়ে দিল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে তার নিমন্ত্রণের সংবাদ। এবং সে-সংবাদের মধ্যে তারা খবর পেয়ে গেল, কি বিরাট উৎসব আর আনন্দেরই আয়োজন সে করছে। খাওয়া-দাওয়া, নাচ-গান, সারা দিন, সারা রাত ধরে চলবে উৎসব। যত রকম নাচ আছে, সব নাচেরই আযোজন সে করবে। হাতী-নাচ, বর্শা-নাচ, যুদ্ধের নাচ, কোন নাচই বাদ যাবে না। সবার ওপরে থাকবে, সকলের চেয়ে সেরা নাচ—ভালবাসার নাচ···কালো কাক্রী তরুণী মেয়েরা যে-নাচে রেখেছে তাদের মুগ্ধ ক'রে।

সারা দিন চলবে খাওয়া আর নাচ, নাচ আর খাওয়া, সারা রাত চলবে পাত্র ভরে পান আর নাচ, নাচ আর পাত্র ভরে পান। ক্যাসাভা-দানার ভাত, আলু,

কুমড়ো, ইয়াম্, নাড়ালো, ভুট্টা…কি মধুরই না ভুট্টা-দানার বিয়ার! জালা ভর্তি থাকবে ভুট্টা দানার বিয়ার! কুমীরের ডিম-সেদ্ধ আর বিয়ার! প্রচুর পরিমাণে থাকবে কুমীরের ডিম, মাছ, মাংস! প্রত্যেককেই আসতে হবে ··হাঁ···হাঁ···সকলের আসা চাই-ই!

নিমন্ত্রণ শেষ হয়ে গেলে, বাতোয়ালা কয়েক মুহূর্ত ঘাড় উঁচু করে দূরের দিকে চেয়ে রইলো···যেন কার উত্তরের অপেক্ষায় আছে। সহসা নীরবতাকে ভঙ্গ করে দূর থেকে আবার ভেসে আসতে সুরু করে সঙ্গীতের মতন বিচিত্র সব আওয়াজ···বাতোয়ালা স্পষ্ট বুঝতে পারে, আলাদা আলাদা করে প্রত্যেক গানের আলাদা লাইন,—

"শুনলাম, তোমার সব কথাই আমরা শুনেছি··· বুঝেছি কি বলতে চাইছো তুমি···তুমি আমাদের সেরা, সকলের সেরা, সকলের সেরা বাতোয়ালা তুমি,···আমরা আসবো···আমরা আসবো সবাই আসবো তোমার আমন্ত্রণে···নিশ্চয়ই, সঙ্গে নিয়ে যাবো আমাদের বন্ধুদেব···ফূর্তি করবো, নাচবো, গাইবো সারা দিন সারা রাত···শাদা লোকদের মত স্পঞ্জের মতন শুষে নেবো তোমার মদের জালা···আমাদেব প্রত্যেকেব গাঁয়ের হয়ে আমরা প্রত্যেকে কথা দিচ্ছি—আমি ওঁরো—আমি ওহোরো—আমি কাঙ্গা—ইয়াবিংগুই—ডেলেপো—তেঙ্গোগালি—ইয়াবাদা—প্রত্যেক মোড়ল, আমবা কথা দিচ্ছি—আমরা যাবো—আমরা যাবো—"

ধীরে ধীরে দিগন্ত-রেখায় ক্রমশ মিলিয়ে যায় তাদের কথাবার্তা—বাতোয়ালা লিংঘার কাছ থেকে নেমে আসে—সোজা পথ ধরে এগিয়ে চলে যেখানে বাম্বা আর পোম্বা এক জায়গায় এসে মিশেছে—সেখানে আগের দিন জলের ভেতর বসিয়ে রেখে গিয়েছিল মাছ ধরবার ঝাঁঝ্রী। দেখতে হবে, কতটা মাছ ধরা পড়লো।

যাবার সময় সে সঙ্গে দুটো বর্শা, একটা ধনুক, একটা থলে আর একটা ছাগলের চামড়া নিয়ে নিল।

মানুষ যেখানেই যাক্, যত কাছেই হোক না কেন, সঙ্গে করে একটা থলে নিয়ে যাওয়া চাই-ই। কত না জিনিস তার ভেতর লুকিয়ে রাখা চলে!

সেই সঙ্গে সে দুটো বিম্বি পাতা নিয়ে নিল। ধনুকের জন্যে তূণে কতকগুলো কাঁটাওয়ালা তীর ভরে নিল। আর নিল গোটাকতক ক্যাসাভা-দানার পিঠে। খাদ্য।

আর কি দরকার! এই নিয়ে সে জগতের যে-কোন বিপদের সামনে নির্ভাবনায় দাঁড়াতে পারে। আত্মরক্ষার জন্য রইল তীর, ধনুক আর বর্শা। ক্ষুধার জন্যে রইল ক্যাসাভা-দানার পিঠে। তার ওপর, যদি তেমন কিছু আবার দরকার পড়ে, সঙ্গে তো বিম্বি পাতা আছে। মাছের খলুই-এর ভেতর একটা বিম্বি পাতা ফেলে দিলে, যে কোন মাছই ঠাণ্ডা হিম হয়ে যাবে।

নিশ্চিন্ত মনে বাতোয়ালা হাঁটতে সুরু করে।

এক-পা করে পথ চলে আর পায়ের তলার মাটী খুঁটিয়ে দেখে নেয়। চিরকালের অভ্যাস। পিতা-পিতামহদের কাছ থেকে পাওয়া নানান্ অভ্যাসের মতনই এটাও হয়ে গিয়েছে স্বভাব। যতই বয়স বাড়তে থাকে, ততই বুঝতে পারে, এই সব অভ্যাসের দাম কতখানি।

শাদা লোকেরা জানে না, পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে এইভাবে মাটিকে খুঁটিয়ে দেখার মূল্য কতখানি। কত সামান্য সামান্য ব্যাপারই তারা জানে না! পায়ে পাথরের কুচি লাগতে পারে। কাদায় পা হড়্কে যেতে পারে, খানায় বা ডোবায় পা মুচ্কে যেতে পারে। একটু নজর রাখলেই যদি তা থেকে বাঁচা যায়, নজর রাখতে ক্ষতি কি! তার জন্যে তো আর আলাদা সময় নষ্ট করতে হয় না। তা ছাড়া, মানুষের যত বুদ্ধি বাড়ে, মানুষ ততই বুঝতে পারে, সময়ের তো আলাদা কোন দামই নেই···সময়ের মধ্যে যেটুকু পাওয়া যায় সেইটুকুই তো সময়ের দাম! তা ছাড়া, সময়ের আবার দাম কি!

বাতোয়ালা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাতোয়ালার ঘরে এসে উপস্থিত হয় বিসিবিংগুই।

ভরা যৌবন···লিক্লিকে ছড়ির মতন দেহ। সবল ···সুন্দর।

বাতোয়ালার ডেরায়, যখনই সে আসুক না কেন, তার জন্যে এক থালা খাবার আর তার শোবার জন্যে একটা বোগ্বো সব সময়ই প্রস্তুত থাকে। বাতোয়ালার সে ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাই এই বিশেষ খাতিরটুকু বাতোয়ালা তার জন্যে আনন্দেই বরাদ্দ করে রেখেছে।

শুধু যে বাতোয়ালাই তাকে এই ভাবে স্নেহ করতো, তা নয়। বাতোয়ালা জানে না, তার অসাক্ষাতে তার ন'জন স্ত্রীর মধ্যে আট জনই বিসিবিংগুইকে তাদের অন্তরের প্রীতির প্রত্যক্ষ নিদর্শন জানাতে দ্বিধা করে নি। একমাত্র এখনো পর্যন্ত এই কার্যে বাদ দিয়েছিল তার প্রধানা স্ত্রী, ইয়াসীগুইন্দজা। তবে, ইদানীং একটু লক্ষ্য করলেই বেশ বোঝা যায় যে, ইয়াসীগুইন্দজা তার মহিমান্বিত স্বামীর আদেশের চেয়ে বিসিবিংগুই-এর আদেশকেই যেন বেশী সমীহ করে চলছে। ইয়াসী-গুইন্দজা শুধু অপেক্ষা করে আছে একটা ভাল রকমের

সুযোগের জন্যে, যে-সুযোগের শুভ লগ্নে সে তার অন্তরের কামনা বিসিবিংগুইকে নিবেদন করতে পারবে।

পুরুষের কামনাকে প্রত্যাখ্যান করা নারীর শোভা পায় না। নারীর কামনা সম্বন্ধে পুরুষেরও সেই একই কর্তব্য। এই হলো স্বভাব-ধর্ম। স্বভাব-ধর্মকে মেনে চলাই হলো সর্বোচ্চ আইন। একজন নারীকে যে একজন পুরুষেরই সম্পত্তি হয়ে থাকতে হবে, এমন কোন কথা নেই। তাই স্বামীকে প্রতারণা করার মধ্যে খুব একটা ভয়ঙ্কর ক্ষতি বলে কিছু নেই।*

অপরের সম্পত্তি সাময়িক ভাবে ভোগ করার দরুণ যদি ক্ষতিপূরণের কথা একান্তই ওঠে তা হলে আসল মালিককে ক্ষতিপূরণ বাবদ গোটাকতক মুরগী ও ছাগল-ছানা বা দরকারী কাপড়-চোপড় দিয়ে পুষিয়ে দিলেই হলো। তার পর সবই ঠিক হ'য়ে যাবে।

অবশ্য, সব ক্ষেত্রে যে এই ভাবে মীমাংসা হ'য়ে যাবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। অন্তত বাতোয়ালার ক্ষেত্রে তা সম্ভব হবে না, তাতে কোন সন্দেহই ছিল না। সেখানে সে দুর্দান্ত ক্ষমাহীন, কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকেই সে সহ্য করবে না, করতে পারে না। যাই বলুক লোকাচার, আর যাই হোক না কেন সনাতন সামাজিক রীতিনীতি, তার সম্পত্তির ওপর যারা হাত দেবে, তাদের ধ্বংস করে ফেলতে তার এতটুকুও কোথাও বাধবে না। রীতিমত চড়া দাম দিয়ে সে ইয়াসীগুইন্দজাকে কিনে এনেছিল—সে জমির ষোল আনা মালিক সে—সেখানে তারই একমাত্র অধিকার বীজ বপন করবার। ইয়াসীগুইন্দজা সে-কথা ভাল করেই জানতো। তাই সে এতদিন পর্যন্ত নিজের স্বভাব-ধর্মকে দমন করেই রেখেছে।

গত দু'-তিন চাঁদ ধরে ইয়াসীগুইন্দজা লক্ষ্য করে দেখেছে, বিসিবিংগুই ইদানীং যাওয়া-আসা খুবই কমিয়ে দিয়েছে। তাই আজকে তার হঠাৎ আবির্ভাব তাকে উতলা করে তোলে।

একদিন ঘোর বর্ষার মধ্যে বিসিবিংগুই জন্মেছিল। তারপর থেকে ষোলটা বর্ষা চলে গিয়েছে। আজ সেই ষোল বর্ষার জল তাকে যৌবনে ভরপুর করে তুলেছে। ঠিক এই বয়সে, মানুষের মত তাজা মানুষ যারা, তারা চব্বিশ ঘণ্টা শীকার করে বেড়ায়…স্ত্রীলোককে। ঠিক যেমন তাদের চোখের সামনে বনে শীকার করে ঘুরে বেড়ায় নেকড়ে বাঘ তরুণী হরিণীর খোঁজে।

দেখতে দেখতে চোখের সামনে বিসিবিংগুই পাতার আড়ালে লুকানো ফলের মতন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তার দেহের প্রত্যেক পেশী সে-সংবাদ সগর্বে ঘোষণা করেছে। তবে, তাকে হরিণীর পেছনে ছুটতে হয় না, হরিণীরাই তার খোঁজে ছুটে বেড়ায়। কালো ইয়াসী, আর বুনো হরিণী, দুই-ই এক। তবে নেকড়ের কাছে ধরা দিতে হরিণীর কোন আনন্দ নেই। কিন্তু ইয়াসীরা আনন্দে ধরা দেয় তার কাছে। শ্রদ্ধা করে তার সম্পূর্ণ বলিষ্ঠতাকে, পরিপূর্ণতাকে। তার জন্যে অনেক ঘরে অনেক দম্পতীর মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে, অনেক ঝগড়া বাদবিতণ্ডা হয়ে গিয়েছে। ক্রমশ ব্যাপার এতদূর পর্যন্ত গড়ায় যে, লোকে তার নামে কমাণ্ডারের কাছে নালিশ করতে বাধ্য হয়। নালিশের পর নালিশ পেয়ে একদিন কমাণ্ডার তাকে ডেকে পাঠিয়ে শাসিয়ে দেয়, ফের যদি তার সম্বন্ধে এই নালিশ আসে, তাহলে তাকে ধরে জেলে আটক করে রাখা হবে।

তার ফলে তরুণী ইয়াসীদের মহলে তার খ্যাতি আরো বেড়েই যায়।

তাই বহুদিন পরে বিসিবিংগুই-এর অকস্মাৎ আবির্ভাবে বাতোয়ালার কুটীরবাসিনীরা আনন্দমুখর হয়ে উঠলো। সকলেই ছুটে এল সাদর অভিবাদন জানাবার জন্যে। প্রত্যেকের মুখেই প্রশ্ন, কোথায় ছিলে? কি করছিলে? এখানে সেই যে শেষ এসেছিলে, তারপর কত নতুন মেয়ের সঙ্গে আলাপ হলো? তাদের নাম কি? শুনলাম, অমুক মেয়ের সঙ্গে…সে কি সত্যি? এই ধরণের শত অন্তরঙ্গ প্রশ্ন চারদিক থেকে তাকে আক্রমণ করল।

কোন রসিকতাতেই হাঁ কি না, কোন সাড়া না দিয়ে সে হাসতে হাসতে বাতোয়ালার পরিত্যক্ত হুঁকোটা তুলে নিল, ঘন করে তামাক পাতা ঠেসে একটা জলন্ত কাঠকয়লা তার ওপর তুলে দিল।

পাতা ধরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মাদুরে হাত-পা ছড়িয়ে বসে মনের সুখে হুঁকোতে টান দিল। ছোট ছোট ধোঁয়ার কুণ্ডলী গোল হয়ে বাতাসে মিশে যেতে লাগলো।

ইয়াসীগুইন্দজা গম্ভীর চালে বলে ওঠে, মেয়ে-মানুষদের নিয়ে এ-রকম খেলা ভাল নয়…তোমার ভালোর জন্যেই বলছি, তাদের সম্বন্ধে একটু সাবধানেই চলো। কোন্‌দিন দেখবো, সারা অঙ্গে ঘা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছো!

* পাঠকদের অবগতির জন্যে স্পষ্ট করে বলতে বাধ্য হচ্ছি, এটা লেখকের মত বা সিদ্ধান্ত নয়। আফ্রিকার আদিম অধিবাসীরা যে-ভাবে এই প্রশ্নকে দেখে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই তাদের কথাই এখানে বলা হয়েছে।

ইয়াসীগুইন্দজার কথায় তার আট জন সপত্নী হি-হি করে হেসে ওঠে।

—"এ-হি···হি···হি···ইঃ···ইয়াবোয়া······ইয়াসী-গুইন্দজার কথা শোন···এ-হি···হি···হি···"

উপযুক্ত ভাবে হয়ত সাবধান করা হলো না, মনে করে ইয়াসীগুইন্দজা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বলতে সুরু করে, "কাসিরি ঘা তো তবু ভালো···তার চেয়েও ভয়ংকর জিনিস আছে বন্ধু! সারা গায়ে চাকা চাকা দাগ হবে···নেকড়ের মত···মাংস খসে খসে পড়বে··· অমন যে দাঁত, তার একটিও থাকবে না···মায় মাথার চুল, হাতের আঙুল পর্যন্ত! মনে নেই, ইয়াকেন্-লেপিনের কথা? এই তো তিন চাঁদ, কি চার চাঁদ আগেও তো সে বেঁচেছিল।"

আবার তারা সকলে অট্টহাস্য করে উঠলো।

তারা হাসছিল, এমন সময় বাতোয়ালা এসে হাজির হয়। হাসির কারণ বাতোয়ালাকে তারা জানিয়ে দেয়।

বাতোয়ালা তাদের হাসিতে যোগদান করে। সবাই মিলে অট্টহাস্য করে ওঠে। আলাপে, রসিকতায় মশগুল হয়ে যায়। হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে··· গড়াগড়ি দেয়···চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

—"এ হে-হে···হিঃ-হিঃ···হিঃ···বাতোয়াল' গো··· ওহো-হো···ওঃ···ওঃ···"

ক্রমশ সূর্য অস্তে বসে।

একটু একটু করে নীড়ে ফিরে-আসা পাখীর কাকলী ক্ষীণ হয়ে আসতে থাকে···দূরে কোথাও শেষ শকুনি আকাশ থেকে নেমে শেষ চীৎকারে অরণ্যের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

গ্রামের মাথার ওপর ধীরে নেমে আসে কুয়াশার অবগুণ্ঠন।

সূর্য ডুবে যায়।

মানুষের সঙ্গে সঙ্গে ছাগল, হাঁস, মুরগীর দল যে-যার আশ্রয়ে ফিরে আসে আবার।

আকাশ জুড়ে এল পুঞ্জ-পুঞ্জ মেঘ। সে-মেঘের আড়ালে হারিয়ে গেল রক্ত সূর্য—যেন একটা পরিপূর্ণ প্রস্ফুটিত আফ্রিকার রক্ত-অরণ্য-পুষ্প। মেঘের আড়াল ভেদ করে তীরের মতন দেখা যায় শুধু তার কিরণের ছটা। তাকে তখন গ্রাস করে নিয়েছে কুমীরের মতন অন্ধকার, মহাশূন্য।

ধীরে ধীরে মহাশূন্যের বুকে একটু একটু করে ফিকে হয়ে আসে রক্ত-আলোকের ছটা। ক্রমশ রক্তহীন বিবর্ণ হয়ে তারা মিশে যায় আকাশের সঙ্গে···হারিয়ে যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে নিঃসীম মহাশূন্যতায়। অন্ধকার আকাশে ঘোষণা করে সূর্যের মৃত্যু। প্রতিদিন আকাশে এই ভাবে মৃত্যু ঘটে প্রতিদিনের সূর্যের। তার অন্তিম মুহূর্তের মৃত্যু-বেদনার ওপর নেমে আসে সুগম্ভীর নীরবতা। সে-নীরবতা দেখেছে শত লক্ষ সূর্যের দৈনন্দিন মৃত্যু। অবর্ণনীয় তার সুবিশাল মৌনতা।

ম্লান বিবর্ণ আকাশে বেদনার প্রদীপ হাতে মৌন-বিষাদে একে একে দেখা দেয় তারকার দল। অন্ধকারের একাধিপত্যে আবার সুরু হয় বিন্দু বিন্দু আলোর অভিযান, চিহ্নিত হয়ে ওঠে নিশ্চিহ্ন মহাশূন্য।

সারা দিনের রৌদ্রদগ্ধ ধরণীর অঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত হতে থাকে উত্তপ্ত বাষ্প।

দিক-বিদিকে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে রাত্রির হিমেল সুবাস! অন্ধকারে জন্ম নেয় শিশির-বিন্দু। বিদায়ী দিনের উত্তাপ আর আগত রাত্রির হিম-স্পর্শ মিলে গিয়ে ঝরে পড়ে শিশিরে শিশিরে। ভিজে ওঠে শুকনো মাটী। বাতাস ভারী হয়ে ওঠে বুনো লতার স্নিগ্ধ মৃদু গন্ধে। অন্ধকার ভরে যায় নামহীন পতঙ্গের অবিচ্ছেদ গুঞ্জনে।

কাছে কোথাও কুটীর-প্রাঙ্গণে কালো কাফ্রী-রমণী গম পিষছে। তার শব্দের সঙ্গে মিশে যায় বাজনার টম্ টম্ আওয়াজ।

ঘরে ঘরে জলে ওঠে উনুনের আগুন। ধোঁয়ার কুণ্ডলী জানিয়ে দেয়, সেখানে আছে মানুষের থাকবার কুঁড়ে ঘর।

ঘরের চারদিক ঘিরে গান সুরু করে দেয় আফ্রিকার বুনো ব্যাঙের দল। এক এক দলের এক এক রকম আওয়াজ। বাতোয়ালার ঘরে দিনের সফর শেষ করে ফিরে এসেছে জুমা, বাতোয়ালার পালিত কুকুর। ব্যাঙেদের একঘেয়ে ডাকের প্রতিবাদে সে মাঝে মাঝে চীৎকার করে ওঠে।

তাছাড়া, আর কোথাও কোন জীবনের চিহ্ন নেই। একটা মৌন বেদনা আর মথিত অসহায়তাকে ঢেকে রাখবার জন্যেই যেন নেমে এসেছে রাত্রির অন্ধকার।

কিছুক্ষণ পরে আকাশে দেখা দেয় আইপুং, ধীরে ধীরে মেঘের পাশ কাটিয়ে চলেছে, যেমন কচুরী-পানার পাশ কাটিয়ে নদীর ওপর দিয়ে চলে নৌকো।

ইতিমধ্যেই ছ'রাত হয়ে গিয়েছে চাঁদের বয়স।

"গানজা" উৎসবের ঠিক তিন দিন আগে হঠাৎ

* চাঁদ

প্রবল এক ঘূর্ণী ঝড়ে সমস্ত গাঁ যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। এর আগে থাকতে অতি-বৃষ্টির দরুণ যে ক্ষতি একটু একটু করে জমা হচ্ছিল, ঝড় এসে তা সম্পূর্ণ করে দিয়ে গেল।

এত বড় যে একটা ঝড় হয়ে যাবে, তার কোন লক্ষণই আগে থাকতে কিছুই দেখা যায় নি। রোজ যেমন সকাল হয়, সূর্য ওঠে, তেমনি সেদিনও গ্রিমারী গাঁয়ে ভোর হয়েছে, সূর্য উঠেছে। প্রথমটা যেমন একটু ধোঁয়াটে থাকে, তারপর বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দিব্যি ফর্সা হয়ে ওঠে, সেদিনও তেমনি রোদে-পোড়া স্বচ্ছ দিনই প্রথম দিকটায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল।

মাঝামাঝি দিনে, প্রতিদিন যেমন নরম হাওয়া ওঠে, তেমনি নরম হাওয়ায় ঘন সবুজ বনের বুকটা দুলে উঠলো···নরম হাওয়া, ঠাণ্ডাও নয়, গরমও নয়। গাছের পাতার আড়ালে "গোলোকোতো" পাখীর দল কূজন করতে থাকে, তাদের সঙ্গে যোগদান করে বৌ কৌ দো বা আর লিহোযা পাখীর দল। দেখতে চেহারায় প্রায় একই রকমের। লিহোযাদের সঙ্গে তফাৎ শুধু পুচ্ছের সবুজ রঙে।

ভুট্টা আর জনার-ক্ষেতের ওপরে, ঘন গাছের জঙ্গলের ওপরে, গাঁয়ের ওপরে আকাশে দেখা যায়, একটি দুটি ক'রে ক্রমশ অসংখ্য শব-ভুক্ শকুনি··· গোল হয়ে উড়তে থাকে। হঠাৎ মাটিতে খাদ্যের সন্ধান পেয়ে তাদের মধ্যে কেউ কেউ তীরের মতন নীচে ছুটে আসে, খাদ্য সংগ্রহ করে নিয়ে আবার আকাশে দলে যোগদান করে।

দিনটা খুব গরমও নয়···বিশেষ ঠাণ্ডাও কিছু নয়।

বাম্বা আর পোম্বোর তীরে বানরের দল যথারীতি গাছ থেকে গাছে ঘুরে বেড়ায়। তাদের দুরন্তপনার আওয়াজের ফাঁকে ফাঁকে আফ্রিকার জঙ্গলের টাগাউয়াদের অদ্ভুত ডাক কানে আসে, ঠিক যেন ছোট ছেলে কাঁদছে।

চারদিকে থেমে আসে মৌমাছিদের গুঞ্জন। একটা মধু-চোর পাখী মৌচাকে মধু চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে, ঝাঁকের পর ঝাঁক মৌমাছি পাখীটাকে তাড়া করে ছোটে। তাদের ক্রুদ্ধ গুঞ্জনে বাতাস ভরে যায়। ক্রমশ দূরে তাদের শব্দ মিলিয়ে গেলেও, বাতাসে পাতার মৃদু-মর্মর ধ্বনিতে মনে হয় যেন এখনও সেই মৌমাছিরাই গুঞ্জন করছে।

গাঁয়ের ভেতর থেকে আসে গম-পেষার শব্দ। বেলা বেড়ে চলে।

হঠাৎ সেদিন মাকোদা বাতোযালার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আসে। সম্পর্কে বাতোযালার ভাই। মাছ ধরে, জেলে। অনেক দিন পরে বাতোযালার সঙ্গে দেখা করতে এলো। দুটো বড় মাছ তার জালে ধরা পড়েছে। তাই ভাইকে নেমন্তন্ন করতে এসেছে। সেখানে বিসিবিংগুইকে দেখতে পেয়ে, তাকেও নেমন্তন্ন করে।

সাধারণত ওদের সমাজে একটা মানুষ, যদি তার সামর্থ থাকে, তাহলে অনেকগুলি মেয়েকেই বিয়ে করতে পারে এবং প্রত্যেক স্ত্রীর ছেলেপুলে নিয়ে এক বৃহৎ সংসার গড়ে ওঠে। মাকোদা আর বাতোযালার মধ্যে কিন্তু আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। একই বাপ আর একই মায়ের সন্তান তারা।

মাকোদার আমন্ত্রণে তারা তিনজনেই বেরিয়ে পড়ে। হাঁসের মতন একজনের পেছনে আর একজন চলে। পথ চলবার এই নিয়ম। রাস্তায় পাশাপাশি কখনো হাঁটতে নেই। অনাদিকাল থেকে এই নিয়ম চলে আসছে। তাদের জাতের মতন পুরানো এই সব নিয়ম।

পেছনে জুমাও অনুসরণ করে চলে, দু'কান খাড়া করে···

বাড়ীতে বাতোযালার স্ত্রী-মহলে কথা ওঠে। ইন্দোভোরা, বাতোযালার অন্যতমা গৃহিণী, মুখ ভার করে বলে, একজাতের মানুষ আছে, নিজের দেমাক্ নিয়েই সারা!

স্বভাবতই ইন্দোভোরা একটু বেশী হিংসুটে, রক্তের তেজ তার কমে নি। তাকে পরিত্যাগ করে বিসিবিংগুই যে ইয়াসীগুইন্দজার পেছনে ঘুরছে, এ ব্যাপারটা সে কিছুতেই হজম করতে পারে না।

তার কথার ইঙ্গিত বুঝে সপত্নীদের মধ্যে একজন জবাব দেয়, সত্যি, দেমাক্ দেখাতেই যেন তাদের সব সুখ!

"তাতে অবিশ্যি, কার কি যায়-আসে? সেদিকে চেয়ে না দেখলেই হলো! কিন্তু কথাটা কি জানিস্, যাদের কোন দেমাক্ নেই, অনায়াসেই লোকে তাদের ঘাড়ে চাপে। কি বলো গো ইয়াসীগুইন্দজা?"

সকলে খিল্-খিল্ করে হেসে ওঠে। ইয়াসী-গুইন্দজাকে তারা কেউই দেখতে পারতো না।

সপত্নীর প্রশ্নে ইয়াসীগুইন্দজা বলে ওঠে, 'তা যা বলেছিস্, সত্যি! কিন্তু কার কথা তুই বলছিস্, আমি তো ভাই বুঝতে পারছি না! সেই 'নাংগাপো' মাগীটার কথা বলছিস্···সেদিন একজন বড় মোড়লের সঙ্গে যার বিয়ে হলো?'

'নাংগাপো' কথাটার মধ্যে একটা গোপন আঘাত ছিল। অতি নীচ জাত তারা এবং ইন্দোভোরা সেই নীচ জাতেরই মেয়ে। ইন্দোভোরা তৎক্ষণাৎ ধরে নেয় যে, তাকেই গালাগাল দিয়ে একথা বলা হলো। রাগে তার ভেতরে এক নিমেষে আগুন জ্বলে ওঠে।

সেই আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়ে ইয়াসীগুইন্দজা বলে, "তা ভাই দেমাক্ হবে না? ও তো আবার শাদা চামড়ারও ঘর করে এসেছে!"

শেষোক্ত কথাটাও যে তাকে আঘাত করবার জন্যেই বলা হলো, সে কথা বুঝতে ইন্দোভোরার দেরি লাগে না। হাত-পা ছুঁড়ে চীৎকার করে উঠলো, "বলি ও বুড়ো মাগী...আমি কি বুঝতে পারছি না, যে তুই আমাকেই অপমান করে এই সব কথা বলছিস্? আমারও জানতে বাকি নেই তোর গুণের কথা। বাজারের মড়া, আস্তাকুঁড়ের জঞ্জাল, ফের যদি ও-সব কথা বলবি তো গলা টিপে মেরে ফেলবো!"

ইয়াসী—বলি, চেঁচাচ্ছো কেন বাপু? আস্তে কথা বলো না...আমি তো আর কালা নই!

ইন্দো—তা হবি কেন? বালাই ষাট...বড় দেমাক হয়েছে, না? এই হামানদিস্তে দিয়ে তোর মুখ থেঁতো করে দেবো! আসুক না বাড়োয়ালা বাড়ী ফিরে, আমি সব বলে দেবো...লুকিয়ে বিসিবিংগুই-এর সঙ্গে মজা করা! আমি সব বলে দেবো...

ইয়াসী—বলি হঠাৎ এত রাগের কি হলো? ওহো-ওঃ...বুঝেছি...বুঝেছি...অনেক বর্ষা একসঙ্গে কাটিয়েছি কিনা, তাই ভুলে গিয়েছিলাম যে তুমিও সেই নাংগাপো জাত থেকে এসেছো, তুমিও শাদা চামড়ার ঘর করে এসেছো!

এর পর আর কথা-কাটাকাটি করবার দরকার হয় না। আহত বাঘিনীর মতন ইন্দোভোরা ইয়াসী-গুইন্দজার দিকে তেড়ে যায়। যদি তার সপত্নীরা মাঝপথে তাকে ধরে না ফেলতো, তাহলে হয়ত ইয়াসী-গুইন্দজাকে সে আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলতো। মনের ঝাল মেটাতে না পেরে যা-খুশী গালাগাল দিয়ে চলে। দরকার হলে সে কমাণ্ডারের কাছে গিয়ে নালিশ করবে। সকলকে ডেকে সে জানিয়ে দেবে, কি করে "ইয়ারো" খেয়ে সে পেটের ছেলে নষ্ট করে ফেলে, পঞ্চায়েৎ ডেকে সে গাঁয়ের বড়ো মোড়লদের কাছে তার বিচার দাবী করবে। বিসি-বিংগুইকে নিয়ে ইয়াসীগুইন্দজা যা খুশী তাই করুক না কেন! বিসিবিংগুই-এর মতন লোককে সে এক কাণাকড়িও মূল্য দেয় না! যে বেটাছেলের গায়ে কাসিবি ঘা ভর্তি, কি দরকার তার সঙ্গে ওঠা-বসার?

ইন্দো—কথায় বলে না, পেট যার ভর্তি থাকে, সেই বলে, আমার আর ক্ষিদে নেই!

স্থির কণ্ঠে ইয়াসীগুইন্দজা জবাব দেয়, "বলি, হিংসে এমনি জিনিস! কই, আমার কাছ থেকে তুই যখন বিসিবিংগুইকে নিয়েছিলি, আমি কি তোর মতন চেঁচিয়েছিলাম?"

ইন্দো—কেন, বিসিবিংগুই কি তোর সম্পত্তি নাকি? লোভ দেখ।

যেমন হঠাৎ ঝড় ওঠে, তেমনি হঠাৎ আবার থেমে যায়।

সপত্নীরা দু'পক্ষকেই থামিয়ে দেয়।

ইয়াসীগুইন্দজা হাসতে হাসতে বলে, "খুব হলো, আর নয়! একদিনের পক্ষে খুব যথেষ্টই হলো। আয়, সবাই মিলে এখন খানিকটা গলায় ঢালা যাক্! শোবার মাদুর, পেটপুরে খাওয়া, খানিকটা বিয়ার, মিষ্টি পিঠে, নাচ-গান, আর হুঁকো-ভর্তি তামাক—এ ছাড়া দুনিয়ায় চাইবার আর কি আছে?"

সবাই মিলে হুল্লোড় করে ইয়াসীগুইন্দজার প্রস্তাবকে গ্রহণ করলো।

কয়েক মুহূর্ত আগে সেখানে যে ঝড় বয়ে চলেছিল, তার কোন চিহ্নই রইলো না।

আবার সেই প্রতিদিনকার অভ্যস্ত জীবনের পরিচিত ধারা।

এমন সময় সহসা বাতাস বন্ধ হয়ে যায়। যেন শ্বাসরোধ হয়ে আসে। কোথা থেকে উড়ে আসে, ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি, মাছি...অফুরন্ত, অগণিত...সব জায়গা ছেয়ে ফেলে।

একটি একটি করে নিস্তব্ধ হয়ে আসে পাখীর দল। একটি একটি করে আকাশ থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় শকুনিরা।

দেখতে দেখতে গাঁয়ের পেছন দিক থেকে প্রকাণ্ড মেঘের দল মাথা তুলে জেগে ওঠে। থাকের পর থাক জমা হতে হতে ক্রমশ তাদের রঙ বদ্লাতে সুরু করে। এলোমেলো ঝড় এসে তাদের আকাশময় টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দেয়। কি এক অদৃশ্য মায়াশক্তি তাদের নদীর দিকে আকর্ষণ করে নিয়ে আসে।

ক্রমশ তাদের গতি স্পষ্ট দ্রুত হয়ে ওঠে; সঙ্গে সঙ্গে রঙ বদলে কয়লার মত কালো হয়ে যায়। বনেতে আগুন লাগলে কালো বুনো ষাঁড়ের দল যেমন দিক্‌বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে আরম্ভ করে, তেমনি

ধারা কি এক অজানা ভয়ের তাড়নায় তারা আকাশময় ছুটে বেড়ায়।

দেখতে দেখতে বিদ্যুৎ এসে তাদের ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে যায়। গুরু-গুরু গর্জনে কেঁপে ওঠে আকাশ।

ঘরের বাইরে যে-সব মানুষ আর হাঁড়িকুঁড়ি পড়েছিল, তাড়াতাড়ি সেগুলোকে ঘরের ভেতর তুলে আনা হয়। কুঁড়ে ঘরের ছাদের ভেতর দিয়ে নীল-নীল ধোঁয়া কিছুটা ওপরে কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠে, কিছুটা ঘরের বাইরে চারিদিকে অচল অনড় ঝুলে থাকে যেন।

থম্‌থমে হয়ে আসে সব। বাম্বা, ডেলা, ডেকা, গ্রাম-প্রান্তবর্তী ছোট ছোট নদীর ওপর নিথর স্থির দাঁড়িয়ে থাকে পুঞ্জ পুঞ্জ ঘন কালো মেঘ। নিথর দাঁড়িয়ে থাকে তারা আফ্রিকার ছোট ছোট বুনো গাঁয়ের মাথার ওপর। মাটির ওপর যা-কিছু সবুজ, সেই কালো মেঘের ছায়ায় ক্রমশ সব হয়ে আসে গাঢ় ঘন। মেঘেতে ছোট হয়ে আসে দিন, অকস্মাৎ ছেদ পড়ে প্রতিদিনের জীবনে। মূর্তিমান ভয়ের মতন, গম্ভীর মুখে আকাশে অপেক্ষা করে থাকে মেঘের দল, আক্রমণের আদেশে যেমন অপেক্ষা করে থাকে সৈনিকরা···

কিছু দূরে ঐ সৌমানা গাঁ আর ইয়াকিজি গাঁয়ের মাঝখানে কে যেন ঝুলিয়ে দিল আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত পাতলা একটা আবছা পর্দা···বৃষ্টি···বৃষ্টি নেমেছে ওখানে।

হঠাৎ দূর অদৃশ্য লোক থেকে এক ঝলক তীব্র গরম হাওয়া ছুটে আসে···কলাগাছের পাতায় পাতায় সংঘর্ষ সুরু হয়ে যায়···চারদিক থেকে আবার ওঠে বিচিত্র সব ব্যাঙের আওয়াজ···বৃষ্টিকে তারা ডাকছে।

দেখতে দেখতে চারদিক থেকে এলোমেলো বাতাস ফুলে-ফেঁপে ছুটতে আরম্ভ করে। গাছ-পালা, লতা-গুল্ম, ভেঙ্গে ছিঁড়ে তছনছ ক'রে ফেলে; গাঁয়ের পথের যত মেটে-ধুলো বাতাসের সঙ্গে মিশে আকাশ আচ্ছন্ন করে ফেলে; এক নিমেষে সমস্ত অন্ধকার করে দিয়ে যেখান থেকে এসেছিল, তারা আবার সেখানে চলে যায়। এরা দুর্বল। এরা শুধু জানিয়ে গেল, আসছে সে, যে মহাপ্রবল, প্রলয়ের রাজা।

আবার কিছুক্ষণের জন্যে সব নিস্তব্ধ হয়ে যায়। নিশ্চল, নিথর নিস্তব্ধতা।

তারপর সহসা বজ্রভেরী বাজিয়ে সুরু হয় বৃষ্টি। বাতাস ভরে যায় ভিজে মাটির মিষ্টি গন্ধে। আকাশ ছিঁড়ে নামে ঝড়ের মাতন। কাছে কোথাও বাজ পড়লো।

প্রত্যেক মুহূর্তের সঙ্গে সঙ্গে তীব্রতর হয়ে ওঠে ঝড়। তীরের মতন অবিরাম অজস্র ধারায় পড়ে বৃষ্টি। দেখতে দেখতে ঝড়ের কশাঘাতে ক্ষেপে ওঠে শান্ত গ্রাম্য নদী। দুই তীর ছাপিয়ে নদীর জল কুল্‌-কুল্‌ রবে ছুটতে আরম্ভ করে গাঁয়ের দিকে। ডুবে যায় শস্যক্ষেত, প্রান্তর। অদৃশ্য হয়ে যায় লতা-গুল্ম। প্রমত্ত ঝড় একটি একটি করে, সমস্ত পাতা ছিঁড়ে উপড়ে ফেলে গাছ থেকে, ভেঙ্গে উড়িয়ে নিয়ে যায় ঘরের চাল,···মাথায় হাত দিয়ে ছাদহীন ঘরে বসে বসে ভেজে গৃহস্থরা, নিবে যায় উনুন, ভেঙ্গে পড়ে মাটির দেয়াল, এক হয়ে যায় নদ-নদী, মাঠ আর ঘাট, ঘর আর উঠান; কুকুর, মুরগী, ছাগল, মানুষ, একই অবস্থায় একই ভাবে ঝড়ের নির্দয় খেলার পুতুল হয়ে বসে থাকে।

সারা দিন, সারা রাত ধ'রে সমানে চল্‌লো সেই ঝড় আর বৃষ্টি। তার পরের দিন দুপুর পর্যন্ত···

তখন একটু-একটু ক'রে ঝড়ের বেগ কমে আসে। কিন্তু বৃষ্টি থামে না। তবে তারও মাত্রা কমে আসে। ঝির-ঝির করে গুঁড়ো-গুঁড়ো বৃষ্টি সমানে তখনও ঝরতে থাকে।

মাঠে আর মাটিতে চারিদিকে ছিল যে-সব উঁচু-নীচু রেখা, অথই জলের মধ্যে ডুবে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় সব। আনন্দে গান গেয়ে ওঠে শুধু ব্যাঙের দল। রীতিমত কোরাস্‌।

সন্ধ্যের দিকে বৃষ্টি থেমে আসে। যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনি হঠাৎ আবার থেমে যায়। কখন যে গোধূলি এলো গেল, তা কেউ জানতে পারে না। একেবারে নেমে আসে রাত্রির অন্ধকার।

বাতোয়ালা গালে হাত দিয়ে ভাবে, সামনের গান্‌জার উৎসব তবে কি এই রকম বৃষ্টির জলে ভেসে যাবে?

দেখতে দেখতে আকাশে ভাঙা চাঁদ পুরো হয়ে এলো। এলো উৎসবের বাত। গান্‌জার উৎসব সুরু হয়ে গেল।

বরাত ভাল, হপ্তাখানেক হল গ্রিমারী* ছেড়ে কম'ণ্ডার বাইরে চলে গিয়েছে। বাড়ী থেকে বেড়াল দূর না হলে, ইঁদুররা নিশ্চিন্তে কি করে খেলতে বেরোয়? বামুন গেল ঘর, তো লাঙ্গল তুলে ধর! তাই তারা সবাই ছুটলো কমাণ্ডারের অফিসের সামনের

---

* বাতোয়ালাদের গাঁয়ের নাম, স্থানীয় ফরাসী শাসন-কর্তার হেডকোয়ার্টার।

মাঠে। সারা গাঁয়ের মধ্যে এমন সুন্দর আর এত বড় খোলা জায়গা আর একটিও নেই। গানজার সময় যে যুদ্ধের নাচ হবে, এমনি বড় জায়গা না পেলে কি করে তা হবে?

কমাণ্ডারের বাংলো থেকে বাম্বার তীর পর্যন্ত এই মাঠ চলে গিয়েছে। কমাণ্ডারের বাংলোর পাশেই তাঁর অফিস, সামরিক তাঁবু আর ফাঁড়ি। রক্ষী হিসাবে আছে মাত্র একজন সৈনিক, বুড়ো বৌলা। বৌলা ম্যাইডিয়ার লোক, তাকে ভয় করবার কিছুই নেই।

পুরো দমে চলে উৎসবের আয়োজন। নাচের সঙ্গীতের জন্যে পর পর বারোটা জায়গায় বারোটা লিংঘা বসানো হয়েছে। পুরানো পোকায় কাটা যন্ত্র নয়··· গানজার জন্যে তৈরী নতুন বাদ্য-যন্ত্র···কাদা আর ময়দা আর রঙ গুলিয়ে প্রত্যেকটিকে চিত্র-বিচিত্র করা হয়েছে।

মাঠের একধারে নানা রকমের সব খাদ্য ঝুড়ির পর ঝুড়ি সাজিয়ে রাখা হলো—কোন ঝুড়িতে ভুট্টার খই, কোনটাতে সব্‌জীর পিঠে, কাঁদি-কাঁদি কলা, বুনো টমাটো, বড় বড় মাটির ডিস-ভর্তি শুঁয়ো পোকা, ডিম, মাছ। আগে থাকতেই চাঁই-চাঁই হরিণ আর হাতীর মাংস রোদে শুকিয়ে আর আগুনে পুড়িয়ে তৈরী করে রাখা হয়েছিল। বুনো ষাঁড়ের আস্তো ঠ্যাং আগুনে সেঁকে ঝুলিয়ে রাখা হলো। সেই সঙ্গে মজুত রইলো ঝুড়ি-ঝুড়ি নানা রকমের বুনো আলু, শাদা চামড়াওয়ালারা এ-সব আলু মুখে তোলে না! তার স্বাদ জানবে কি করে! এক পাশে বড় বড় মাটির কলসীতে মুখ পর্যন্ত ভর্তি করে রাখা হলো তাদের নিজের হাতে চোলাই-করা মদ। আয়োজনকে সম্পূর্ণ করবার জন্যে বাতোয়ালা কয়েক বোতল বিদেশী মদও জোগাড় করে রাখতে ভুললো না। অবশ্য, সে-বোতলগুলো মজুত রইলো শুধু বড় বড় সর্দার আর পঞ্চায়েতের মাথাদের জন্যে। আয়োজন দেখে সবাই বুঝলো, গানজা জমবে ভাল।

মাঠের চারদিক থেকে কাঁচা কাঠের আগুনের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপরে উঠতে থাকে। সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলী লক্ষ্য করে দূর-দুরান্ত গাঁ থেকে তারা আসতে আরম্ভ করে—ছেলে, বুড়ো, যুব, যুবতী, কুলী, মজুর, এমন কি তাদের সঙ্গে-সঙ্গে গাঁয়ের কুকুরগুলোও পিছু-পিছু চলে।

তাদের "কাগা" ছেড়ে, জঙ্গল ছেড়ে, বুনো জলা ছেড়ে, দলে দলে তারা আসতে আরম্ভ করে···তারা আসছেই আসছে···হাতে বর্শা, পিঠে ধনুক···দলের মোড়লদের হাতে একটা করে জলন্ত কাঠ···বনের অন্ধকারে সেই জলন্ত কাঠের মশালে পথ দেখে দেখে তারা এগিয়ে চলে···

মেয়েরা এসেই ভোজের আয়োজনে যোগদান করে। বড় বড় কাঠের জাঁতায় তারা গম আর বুনো ভুট্টা পিষতে সুরু করে দেয়। পেষবার সঙ্গে সঙ্গে তারা সবাই মিলে সুরু করে দেয় গান।

এক এক কলি গান শেষ হয় আর হাসির হর্‌রা ওঠে। হাসতে হয় বলে তারা হাসে। কথা বলতে হবে বলে তারা কথা বলে, তা সে কথার কোন মানে থাক আর নাই থাক। ক্রমশ তাদের হাসি আর কথা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, চোলাই-করা 'কেনে'র কাজ সুরু হয়ে গিয়েছে। যে যখন পারছে, ভাঁড় ভর্তি করে গলায় ঢালছে।

দেখতে দেখতে মাঠ ভরাট হয়ে ওঠে। ম্‌বিসেরা এসেছে, নাংগাপুরা এসেছে, ডাকারা এসেছে, তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে এসেছে তাদের মোড়লরা।

সর্দারেরা মাঠের মাঝখানে একটা জায়গায় গোল হয়ে সকলে একসঙ্গে বসেছে। বাতোয়ালার বুড়ো মা-বাপ সর্দারদের সঙ্গেই বসেছে।

কথাবার্তা হচ্ছে···

বাংগুইতে নাকি কারা জনকয়েক শাদা লোককে মেরে ফেলেছে···

গভর্ণর সেই জন্যে শীগ্‌গিরই বানডোরোতে যাবে···

ফ্রান্সে কোথায় নাকি ম্‌-পুতু বলে জায়গা আছে, সেখানে শাদা জার্মাণদের সঙ্গে তাদের শাদা মনিবদের লড়াই হচ্ছে···

কথার সঙ্গে সঙ্গে হাত থেকে হাতে হুঁকো চলে··· কোন কল্‌কেতে গাঁজা···কোন কল্‌কেতে তামাক···

হুঁকোতে বেশ ভাল করে গোটাকতক টান দিয়ে পাঙ্গাকোরা বলে ওঠে, "শুনছো বাতোয়ালা, তোমাকে একটা কথা বলি শোন! এই আমি বাইরে ক্রেবেজি শহর থেকে ঘুরে আসছি! বাইরে ঘুরে বেড়ালে অনেক নতুন জিনিস শেখা যায়। তোমরা ভাব, শাদা লোকগুলো বুঝি নিজেদেব মধ্যে ঝগড়া করে না···আরে ছোঃ! মোটেই তা নয়। শোন, একটা ব্যাপার বলি,—নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

"···একজন পর্তুগীজের বিরুদ্ধে আমার নিজের নালিশ নিয়ে কমাণ্ডারের সঙ্গে দেখা করি। কমাণ্ডারকে আমরা নাম দিয়েছি কেতোম্বা, জালার মতন এই বড় তার পেট! কমাণ্ডারকে আমার অভিযোগের কথা জানালাম, অবিশ্যি একটু-আধটু এ-দিক ও-দিক করেই

বলতে হলো। মনে মনে ভাবছি, হাজার হোক পর্তুগীজরা হলো শাদা চামড়া, আমার কথা কি কমাণ্ডার শুনবে? আরে, শোন ব্যাপার, কমাণ্ডার কি বললো জানো? আমাকে ডেকে বললো, 'পাঙ্গাকৌবা, তুমি হচ্ছো যাকে বলে অপদার্থের অপদার্থ। তোমার মত মূর্খ আমি আর একটিও দেখিনি! তুমি কি জান না যে, পুত্রিকিস্‌দের আমরা খোড়াই কেয়ার করি? পুত্রিকিস্ আবার মানুষ নাকি। শোন তাহলে বলি। শাদা লোকদের যিনি ভগবান, তিনি যখন মানুষ তৈরী করতে বসলেন, তখন হাতের কাছে যত সব ভাল জিনিস পেলেন তাই দিয়ে তিনি আমাদের তৈরী করলেন। সমস্ত ভাল জিনিস যখন ফুরিয়ে গেল, তখন যে-সব ময়লা আর নোংরা জিনিস পড়েছিল, তাই দিয়ে তখন তোমাদের মতন ডার্টি নিগারদের তৈরী করলেন। এই ভাবে ভাল-মন্দ সব জিনিসই যখন ফুরিয়ে গেল, তখন ভগবানের নজর পড়লো এই পুত্রিকিস্‌দের তৈরী করার ওপর! তখন আর কি দিয়ে তৈরী করবেন? অগত্যা নিগ্রোদের পরিত্যক্ত মল-মূত্র থেকে তিনি পুত্রিকিস্‌দের তৈরী করলেন। বঝলে এখন'?"

পাঙ্গাকৌবার অভিজ্ঞতার গল্পে সবাই অট্টহাস্য করে ওঠে।

বাতোয়ালা জিজ্ঞাসা করলো, "আচ্ছা, রবারের দাম যে এই রকম পড়ে গিয়েছে, তাতে কি মনে কর, আমাদের কোন সুবিধে হবে?"

পাঙ্গাকৌবা বলে, "তার জন্যেই তো আজ আমরা নিশ্চিন্তে এই উৎসবে জমায়েত হতে পেরেছি। শাদা লোকগুলো সব ছুটছে রবার কিনতে। আমাদের কিনতে হলে যেখানে পাঁচ ফ্রাঙ্ক দিতে হয় সেখানে শাদা লোকগুলো তার দশ ভাগেরও কম দাম দেয়।"

ইয়াকিজী বলে ওঠে, "তুমি ঠিক করেছো বাতোয়ালা! বাধ্য হয়েই এখন ব্যবসায়ী বেটারা সব ফ্রেবেজীতে গিয়ে ধন্না দিয়েছে!"

কে একজন বলে ওঠে, "ব্যাটারা কবে মরবে? বুক পর্য্যন্ত কাদায় ডুবে, মুখ হাঁ করে করে মরবে বেটারা?"

কে একজন উত্তর দিয়ে ওঠে, "তার জন্তে ভাবনা কি! দেখছো না, বন্দুকওয়ালা শাদা সেপাইগুলো জাহাজ-ভর্তি হয়ে যাচ্ছে…শাদা জার্মাণদের সঙ্গে আমাদের শাদা মনিবদের বোধ হয় ঝগড়া বেধে গিয়েছে!"

—"হাঁ, হাঁ…যত বেটা বুলেটওয়ালা, দেখছো না চলে যাচ্ছে। ওদের দেশের ম্-পুতু শহরে যুদ্ধ হচ্ছে!"

—"বোধ হয়, আমাদের এখানকার কর্তাদেরও যেতে হবে।"

বাতোয়ালার বৃদ্ধ পিতা সায় দিয়ে ওঠে, "ইয়াবায়ো! আমাদের এই গাঁ আর নদী যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি হবে তোমার কথা।"

একজন বৃদ্ধ সর্দার প্রতিবাদ করে ওঠে,—"এখানকার ফ্রেঞ্চগুলোকে দেখলে মনে হয় যে তারা এদেশ ছেড়ে চলে যাবে? মোটেই না! আরে, সেখানে গেলে বিপদ আছে! কেন সেখানে এরা মরতে যাবে? নিজের চামড়া সবাই বাঁচ'তে চেষ্টা করে।"

তার কথায় সবাই আবার হেসে ওঠে।

—"ঠিক বলেছ বুড়ো সর্দার! তোমার কথা মিথ্যে হয় না। কিন্তু আমার কি ইচ্ছে জানো? জার্মাণরা যেন এই ফ্রেঞ্চদের বেশ করে হারিয়ে দিতে পারে! বেশ উত্তম-মধ্যম দেয়!"

বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "তুমি তো বলছো বটে ইয়াবাদা, কিন্তু জার্মাণই হোক আর ফ্রেঞ্চই হোক, তারা সবাই শাদা! তাহলে, একজনের বদলে আর এক-জনকে চেয়ে কি লাভ? আমরা ফরাসীদের পায়ের তলায় পড়ে আছি। একটা সুবিধে, অনেক দিন এক-সঙ্গে থেকে তাদের ভালটা যেমন জানি, তাদের মন্দটাও তেমনি। নিয়্ যেমন ইঁদুর নিয়ে খেলা করে, তারা আমাদের নিয়ে তেমনি খেলা করবেই!"

ইয়াবাদা জবাব দেয়, "শুধু খেলা করতে তো কিছু যায়-আসে না, নিয়ূর খেলা যে বড় সাংঘাতিক, খেলার পরিণাম হল খেয়ে ফেলা', নিয়্ ইঁদুর নিয়ে খেলতে খেলতে ইঁদুরকে খেয়ে ফেলে।"

বৃদ্ধ হেসে বলে, "সুতরাং আমাদের যখন খেয়েই ফেলবে, মরতেই যখন আমাদের হবে, তখন যে-নিয়ূ আছে, তার বদলে নতুন নিয়্ এলে আমাদের কিছুই লাভ হবে না।"

অন্য আর একজন সমর্থন করে,—"বুনো ষাঁড়ের শিং থেকে ক্ষেপা নেকড়ের মুখে গিয়ে পড়া!"

সকলেই বৃদ্ধকে সমর্থন করে ওঠে।

—"বুড়ো সর্দার ঠিকই বলেছে। মনিব বদল করে কি লাভ? বদলে যে মনিব আসবে, সে হয়ত আরো খ'রাপ হবে।"

সকলেই আলোচনায় যোগদান করে।

—"ওরা আমাদের একটুও ভালবাসে না।"

—"ওরা যেমন আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করে, আমরাও ঠিক সেই রকম করবো!"

—"ওদের খুন করে মেরে ফেলা উচিত!"

—"ঠিক বলেছো।"

—"একদিন, আজ না হোক, দুদিন পরে, আমরা—"

—"হাঁ, আমরা, বান্‌জিরি, ইয়াকোহামা, গৌবু, সাংবা, ডাকৃবা বিভিন্ন সম্প্রদায়, নিজেদের মধ্যে পুরানো ঝগড়া, দলাদলি আর রেষারেষি ছেড়ে দিয়ে সকলে মিলে যখন এক হব···তখন···"

এই ক্রমবর্ধমান উচ্ছ্বাসের স্রোতে বাধা দিয়ে একজন বলে ওঠে, "তখন বাম্বা উলটো দিকে···তার আগে আর আমরা এক হতে পারবো না···"

তাকে সমর্থন করে আর একজন বলে ওঠে, "তখন মাছ-ধরার হাঁড়িতে মাছের বদলে আকাশের চাঁদ ধরা পড়বে।"

সকলে আবার হেসে ওঠে এবং এতক্ষণ ধরে সবাই মিলে এতই হাসতে থাকে যে, দূরের একটা আওয়াজ তাদের কানেই এসে পৌঁছয় না।

বাতোয়ালা তখন 'কেনে'তে টই-টম্বুর। নেশায় দুই চোখ লাল হয়ে উঠেছে। উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে ওঠে, "হয় তোমরা সবাই কুকুরের বাচ্ছা, না হয় তোমরা আমার চেয়ে ঢের বেশী মদ খেয়েছো। আমি জানতে চাই, তোমরা মানুষ কি না? মানুষের বাচ্ছা কি না? তোমাদের ছেলেবেলায় কি দেবতার নামে ওঝারা তোমাদের লিঙ্গচ্ছেদ করে নি? আলবৎ করেছে! তবে? আমার কথা হচ্ছে, আমি যত দিন বেঁচে থাকবো, শাদা চামড়াকে কিছুতেই ভুলবো না।"

নেশার প্রেরণায় বাতোয়ালার মনের বাঁধন খুলে যায়। সে বলতে সুরু করে,—"আমার মনে আছে, একদিন নিউবাংগুই নদীর ধারে, বেসোকেমো আর কেমো-আউদার মাঝখানে বিরাট জায়গায় ম্‌-বিস্‌রা কি সুখে, কি শান্তিতে বাস করতো···তারপর যেই এল শাদা লোকগুলো, অমনি ঘর-বাড়ী ছেড়ে, বাপ-পিতামোহের ভিটে ছেড়ে দলে দলে আমাদের সরে পালিয়ে আসতে হল; সঙ্গে মুরগী, ছাগল, হাঁড়ি-কুঁড়ি, ঠাকুর-দেবতা, ছেলেপুলে, স্ত্রীলোক সব নিয়ে পালিয়ে আসতে হল। হাঁ, আমার স্পষ্ট মনে আছে···যদিও তখন আমি বালক মাত্র।

"আমরা সরে এসে ক্রেবেজ শহরের আশে-পাশে এসে বসলাম। কিন্তু সেখানেও এলো বাধা। অনেক হলো লড়াই। তারি মধ্যে নতুন করে ঘর বেঁধে, মাটি চষে বেঁচে রইলাম কোন রকমে কিন্তু শেষকালে ক্রেবেজও নিয়ে নিল শাদারা।

"আবার সেখান থেকে সরতে হলো। হাঁটতে হাঁটতে গ্রিকোতে এসে পৌঁছলাম। পছন্দ হলো জায়গাটা। গ্রিকোতেই আবার ঘর বাঁধলাম। কম হাঙ্গামা? সেই নতুন করে আবার সব গড়তে হলো।

"ভাবলাম, এবার হয়ত শান্তিতে থাকতে পারবো। হায়, তা কি হয়? সেখানেও তারা ঘাড়ে এসে পড়লো···মার, ধোর, আগুন, গুলী···

"আবার, তল্পি-তল্পা নিয়ে পালাতে হলো···

"গ্রিমারী! অবশেষে গ্রিমারীতে এসে পৌঁছলাম। বাম্বা আর পোম্বার মাঝখানে একটা ভাল জায়গা দেখে আবার ঘর-বাড়ী তুললাম···

"ঘর-বাড়ী তৈরী শেষ হতে-না-হতেই এখানেও ঘাড়ে এসে পড়লো নেকড়ের দল···

"আর কতক্ষণ যোঝা যায়! মন ভেঙ্গে পড়েছে সকলের। একটু একটু করে জাতের অধিকাংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার মতন হয়েছে। তাই আর গ্রিমারী থেকে নড়তে পারলাম না···শাদা চামড়ার শাসন মেনে নিয়ে এখানেই পড়ে রইলাম···যতদূর পারা যায়, তাদের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে চলতে হচ্ছে···নইলে জাতটা যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।"

দূরে যে শব্দ হাসির মধ্যে শোনা যায় নি, ক্রমশ সেটা যেন আরো কাছে আসতে থাকে।

"কিন্তু আমরা যে এই বশ্যতা স্বীকার করে নিলাম, তাতে কি তারা আমাদের ওপর খুশী হলো? তাদের মন পেলাম না তাতেও। আমাদের আচার-অনুষ্ঠান তো সব বন্ধই করে দিয়েছে, বাপ-পিতামোর আচার-অনুষ্ঠান! কিন্তু তাতেও তারা সন্তুষ্ট নয়, তারা চায় তাদের আচার-অনুষ্ঠান আমাদের ঘাড়ে চাপাতে! যখন খুশী যা আদেশ দেবে, তা মানতেই হবে। হুকুম হলো টাকা-পয়সা নিয়ে "পাতারা" খেলতে পারবে না! আমাদের নাচ-গান শুনলে তারা চটে যায়, তাদের সামনে নাচ-গান চলবে না! তবে, হাঁ, যদি পয়সা দিই, তা হলে তারা অনুমতি দিতে পারে! অতএব, পয়সা দাও! অনবরত খাজনা দাও, আর খাজনা দাও! তাদের সিন্দুক ভর্তি আর হয় না।

"যদি এই হতভাগা শাদা জাতের লোকগুলোর মধ্যে কোন মতিস্থির থাকতো, কিম্বা তাদের কথাবার্তার মধ্যে কোন বিচার-বুদ্ধি থাকতো, তা হলে না হয় কোন রকমে তাদের মেনে চলা যেতো। কিন্তু তাদের কথাবার্তা কিম্বা কাজ-কর্মের মধ্যে কোন সঙ্গতিই নেই। এই তো দু'চাঁদ আগেকার ঘটনা, ঐ বুনো জানোয়ার, ওরো, মদ খেয়ে নেশা করে তার ইয়াসীটাকে

কুকুর-ঠেঙানো ঠাঙালো, এমন মার মারলে যে মেয়েটা হাড়-গোড় ভেঙে তাল হয়ে পড়ে রইলো!

"কিন্তু সেটা এমন কি একটা সর্বনেশে কাণ্ড? আমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে বলতে পারে, তার ইয়াসীকে কখনো মারে নি?

"বোকা মেয়েটা সোজা গিয়ে কমাণ্ডারের কাছে নালিশ করে দিলো। তখন হবি তো হ', কমাণ্ডার তার শাদা বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা দিচ্ছিলো। সাধারণত লোকটা ঠাণ্ডা মেজাজেরই লোক কিন্তু সেদিন কি যে হলো, ভীষণ রেগে গেল। একজন দেশী পুলিশকে ডেকে হুকুম দিলো, তক্ষুণি ওঁয়োকে ধরে নিয়ে কারাগারে বেঁধে রাখতে। লোকটা হুকুম তামিল করতে একটু ইতস্তত করে, তাই না দেখে কমাণ্ডার তার হাতের কাছের একটা খালি মদের বোতল তুলে সোজা তার মাথায় বসিয়ে দিলো। ব্যাপার দেখ! মাথা ফেটে চাপ-চাপ রক্ত বেরুলো, লোকটা বেহুঁস হয়ে সেইখানেই পড়ে গেল। আর তাই না দেখে শাদা লোকগুলো হেসে কুটি-কুটি, যেন কি মজাই না হয়ে গেল!

"এই তো ব্যাপার, ওদের কাছ থেকে আমরা সব বিষয়েই এই রকম ব্যবহার পেয়ে আসছি। আমার কথা যে কতখানি সত্যি, তা যদি নিজের চোখে দেখতে চাও ইয়াবাদা, তা হলে কমাণ্ডার যাতে দেখতে পায়, এমনি কোন জায়গায় বসে 'পাতারা' খেলায় তুমি দুটো ফ্রাঙ্ক ফেলে দেখ…তা হলেই দেখতে পাবে…খুব কম শাস্তি যদি হয়, তা হলে হাতে-পায়ে বেড়ী। জুয়ো খেলবে শুধু শাদা চামড়ার লোকেরা…"

—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাতোয়ালার চোখ নেশায় লাল হয়েই ছিল, তার ওপর উত্তেজনায় মনে হয় যেন এখুনি রক্ত ফেটে পড়বে। রাগে কথা জড়িয়ে আসে, তবুও জোর-গলায় সবাইকে ডেকে বলে ওঠে…

"শাদা চামড়ারা অপদার্থ…আমাদের জন্যে এতটুকু দরদ তাদের নেই…তারা মনে করে আমরা সবাই মিথ্যুক…হাঁ, আমরা মিথ্যে কথা বলি কিন্তু আমাদের সেই মিথ্যে কারুর ক্ষতি করে না, কাউকে সর্বস্বান্ত করে না। কালে-ভদ্রে সত্যিকে একটু বাড়িয়ে বলতে হয়…তার জন্যে দু'-চারটে মিথ্যে বলতে হয়, নইলে সত্যির স্বাদ থাকে না, ঝোলে নুন না দিলে কি ঝোলের কোন স্বাদ থাকে?

"কিন্তু শাদা চামড়ারা তো সেজন্যে মিথ্যে বলে না…তারা একটা উদ্দেশ্য নিয়ে মিথ্যে বলে…তাদের সব মিথ্যে হলো ভেবে-চিন্তে তৈরী-করা জিনিস…তাদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে…

"তাই তারা সব ব্যাপারে আমাদের ওপর টেক্কা দিতে পারে।

"ওরা বলে, আমরা নিগার পরস্পর পরস্পরকে ঘেন্না করি, নিজেদের মধ্যে মারামারি করি…আর ওরা? ওদের কমাণ্ডারগুলো আর ওদের বন্দুকওয়ালারা সব সময় গলা জড়াজড়ি করে থাকে নাকি? ওদের মধ্যে ওরা মারামারি করে না? আমরাই বা ওদের মতন করতে পারবো না কেন? গায়ের চামড়ার রঙ আলাদা হলে বুঝি মানুষ আলাদা হয়ে যায়? গায়ের চামড়ার রঙ যাই হোক না কেন, আমরা সবাই মানুষ না?"

দূর থেকে যে অস্পষ্ট আওয়াজটা আসছিল, সেটা যেন আরো কাছে এসে পড়ে…মেঘের গুর্-গুর্ আওয়াজের মতন শোনায়…

বাতোয়ালা হাত-মুখ নেড়ে বলে চলে, "শাদা লোকগুলোর শয়তানীর কথা জীবন থাকতে ভুলবো না…বিশেষ করে তাদের ছলনা…তারা এক রকম কথা বলে, আর এক রকম কাজ করে। তারা কত না কথা আমাদের শুনিয়েছিল? বলেছিল, আমরা একদিন বুঝতে পারবো আমাদের ভালর জন্যেই তারা আমাদের খাটাচ্ছে…গতর দিয়ে খেটে যে-টাকা আমরা রোজগার করছি, সে-টাকা না কি তারা রেখে দিচ্ছে, আমাদের জন্যে ভাল ভাল রাস্তা, বড় বড় সাঁকো তৈরী করবে বলে, আমাদের জন্যে তারা লাইনের-ওপর-দিয়ে-চলা গাড়ী তৈরী করে দেবে, আশ্চর্য গাড়ী, আগুনের আঁচে না কি যন্তরে চলে! কত আশার কথাই না তারা বলেছিল। কোথায় সে-সব রাস্তা, কোথায় সে-সব সাঁকো? আর কোথায় বা সেই যন্তরে চলা আশ্চর্য গাড়ী? মাতা! নি নি! কিছু না, কিছু না! সব ফাঁকি! এই অজুহাতে আমাদের যথাসর্বস্ব তারা চুরি করে নিচ্ছে, আমরা যা রোজগার করি, তার ক'ছিদেম আমরা ঘরে রাখতে পাই? তোমরাই বল না, আমাদের আর কি আছে? দুর্ভাগ্য ছাড়া আমাদের আর কি আছে?

"জলের দরে ওরা আমাদের কাছ থেকে রবার কেনে। আজ তিরিশ চাঁদ হয়ে গেল, সেই তিন ফ্রাঙ্কে এক কিলো রবার তারা কিনে চলেছে—আর প্রত্যেক চাঁদে ট্যাক্স্ বেড়েই চলেছে—এই সেদিন বলা

নেই, কওয়া নেই, কেন তা কেউ জানলো না, বাজার-দর কমে একেবারে নেমে গেল—আর ঠিক সেই তালে আমাদের গভর্ণর পাঁচ ফ্রাঙ্ক থেকে ট্যাক্স্ বাড়িয়ে একেবারে দশ ফ্রাঙ্ক করে দিলো—

"আমরা শুধু হলাম একতাল মাংস, যা নিংড়ে ট্যাক্স্ আদায় করা যায়…আমরা হলুম শুধু পশু, ওদের মোট বইবার জন্যে! তার চেয়েও জঘন্য, আমরা হলাম কুকুর! স্রেফ রাস্তার কুকুর! কুকুর আর ঘোড়াকে ওরা যে আদর করে, যত্ন করে, আমরা তার শত ভাগের এক ভাগও পাই না—আমরা শুধু পশু নই, পশুর পশু—তাই একটু একটু করে ওরা আমাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলছে—"

বাতোয়ালা আর বুড়ো সর্দাররা যেখানে বসেছিল, পেছন থেকে একদল লোক সেই দিকে ঠেলে আসতে সুরু করে দিল। সুরার উত্তাপে তাদের খালি গা দিয়ে তখন দরধারায় ঘাম ঝরে পড়ছে।

বাতোয়ালার বক্তৃতা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে ব্যর্থ-আক্রোশের অভিশাপ-বাণী জেগে উঠলো। কেউ কেউ বাতোয়ালাকে সাবাস্ দিয়ে উঠলো, ঠিক বলেছো, বিলকুল ঠিক! যখন শাদা লোকগুলো এ-দেশেতে পা দেয় নি, তখন তারা কেমন সুখে ছিল। এমন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে হতো না—দরকার মত একটুখানি খাটলেই চলে যেতো, তারপর খাও, দাও, স্ফূর্তি করো, ঘুমোও। মাঝে-মাঝে কখনো কখনো লড়াই কাজিয়া করতে হতো। কিন্তু তাতে লাভ ছাড়া লোকসান ছিল না। আজও মনে পড়ে, তখন কি ধুম পড়ে যেতো নিহত শত্রুর দেহ ছিঁড়ে লিভার খাবার জন্যে, সবাই ছুটতো তার অংশের জন্যে, কেন না, শত্রুর যা-কিছু সাহস তার লিভারের সঙ্গেই থাকে, তাই সেই কাঁচা লিভার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা সাহসও দেহের ভেতর রক্তের সঙ্গে মিশে যেতো…সে ছিল অতীত যুগের কথা, যখন শাদা লোকগুলো এদেশের মাটীতে পা দেয় নি।

আজ তারা শুধু ক্রীতদাস; তারা বুঝে নিয়েছে ঐ হৃদয়হীন শাদা জাতের কাছ থেকে তাদের আশা করবার কিছু নেই। শাদা লোকগুলো তাদের ঘরের মেয়েদের জোর করে দখল করে, ভোগ করে, আর তার ফলে, তাদের নিজেদের মধ্যেই বিভেদের সৃষ্টি হয়। তাদের ভোগ মিটে গেলে শাদা লোকগুলো তাদের কালো মেয়েমানুষগুলোকে পরিত্যাগ করে, তাদের গর্ভে যে-সব ছেলেমেয়ে হয়, তাদের স্বীকার করে না। আর এই সব বেজন্মা ছেলেমেয়ে বড় হয়ে নিজেদের জাত-ভাইদেরই ঘৃণা করতে শেখে, তাদের বাপের শাদা চামড়া ছিল, এই গর্বে তারা নিজেদের স্বজাতের সঙ্গে মেশে না। এই ভাবে এই বেজন্মাগুলো সমাজের ভেতরে থেকে সমাজের পাপই বাড়িয়ে চলে, সবাইকে তারা ঘৃণা করে, হিংসা করে, তাদেরকেও সবাই তেমনি ঘৃণার চোখে দেখে। আলসে, কুঁড়ে, বদমায়েস, এই বেজন্মাগুলো শুধু ব্যভিচারকেই বাড়িয়ে চলে।

বাতোয়ালার দম তখনো ফুরোয় নি।

সে আবার উঠে বলতে আরম্ভ করে, "আর শাদা লোকগুলোর সঙ্গে যে-সব শাদা চামড়াওয়ালা স্ত্রীলোকগুলো থাকে, তাদের কথা না বলাই ভাল। প্রথম-প্রথম আমরা মনে করতাম, তারা বুঝি একটা আলাদা জাতের মানুষ, আশ্চর্য কোন সৃষ্টি! দেবতার মতন তাই দূর থেকে তাদের ভয় করতাম, সম্মান দিতাম। আজ সে ভুল আমাদের ভেঙ্গে গিয়েছে! কালো নিগ্রো মেয়েকে যত সহজে পাওয়া যায়, তার চেয়ে সহজে পাওয়া যায় ঐ শাদা চামড়াওয়ালা স্ত্রীলোকগুলোকে…আমাদের মেয়েদের চেয়ে ঢের বেশী কামুক ওরা। তাদের যে-সব দোষ আছে, আমাদের কালো মেয়েদের তা নেই… কালো মেয়েরা তা জানে না পর্যন্ত! তবু…শাদা চামড়াওয়ালীরা চায়, আমরা সব সময় তাদের সমীহ করে চলি…"

বাতোয়ালার বক্তৃতা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বাবা হাত তুলে ইঙ্গিত করতেই সব গোলমাল থেমে গেল, বুড়োর কথা শোনবার জন্যে সবাই একেবারে চুপ হয়ে গেলো। সেই নিস্তব্ধতার ভেতর থেকে শুধু শোনা যাচ্ছিল, সেই দূর থেকে ভেসে-আসা আওয়াজ।

বুড়ো বলতে সুরু করলো:

"তোরা যা বললি, তা সবিই সত্যি! তবে সেই সঙ্গে এইটে শুধু মনে রাখতে হবে, আমাদের করবার কিছু নেই। কাজেই ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দাও! যখন বনের ভেতর "বামারা" গর্জে ওঠে, তখন তার কাছে কোন হরিণই যায় না, যাওয়া উচিত নয়। আজ আর তোমরা বলশালী নও। তোমাদের চেয়ে ওরা ঢের বলশালী। তাই, চুপ করে সহ্য করে যাও!

"তাছাড়া আজকে আমরা এখানে ওদের গালাগাল দেবার জন্যে জড় হই নি। আমার বয়স হয়েছে, বুড়ো হয়ে গিয়েছি, তাই গালাগালের উত্তেজনায় জিভ আলগা হয়ে গিয়েছিল। তাই, বলছি একটু কম চেঁচিয়ে, গলায় ঢালো বেশী। শাদা লোকগুলো কাঠের বিছানা আর কাঠের লম্বা লম্বা চেয়ার-ছাড়া আর যত

কিছু জিনিস তৈরী করেছে, তার মধ্যে সেরা হলো, তাদের তৈরী মদ!

"অবশ্য, আমার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছে, কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে অমি সামনে কতকগুলো আবসাঁথের বোতল দেখতে পাচ্ছি। বাতোয়ালা, বোতলগুলো খুলবে নাকি?"

বাতোয়ালার বক্তৃতায় যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল, বুড়োর কথায় তা নিবে গেল। আবার উৎসবের আনন্দে সবাই প্রাণ খুলে হেসে উঠলো। বাতোয়ালা বৃদ্ধ পিতার ঝাপ্‌সা দৃষ্টিশক্তির তারিফ করতে করতে আব্‌সাঁথের বোতলগুলো এগিয়ে দিলো।

দূরের শব্দ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মনে হয়, তাদের গাঁয়ের কাছ-বরাবর আওয়াজটা এগিয়ে আসছে। আরো কাছে এগিয়ে আসছে। পোয়াবা আর পাঙ্গাকোরার রাস্তার মোড়ে যেন এসে পড়েছে। ক্রমশ আরো কাছে এগিয়ে আসছে, কমাণ্ডারের আস্তাবল যেখানে আছে, সেখান থেকে যেন শব্দটা আসছে। এইবার যেন বাম্বার পোল পেরিয়ে শব্দটা আরো কাছে এগিয়ে আসছে···এই দিকেই আসছে···

এবারে আর শব্দ নয়।

শব্দ মূর্ত্তি ধরে সামনে এগিয়ে আসে। একদল তরুণ-তরুণী নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে উৎসব-প্রাঙ্গণের দিকে এগিয়ে আসে।

তাদের সর্বাঙ্গ নগ্ন। নগ্ন গা পা থেকে মুখ পর্যন্ত ভস্মের প্রলেপে শাদা করা হয়েছে। এই হলো তাদের রীতি, ধর্মের অনুশাসন।

একদল গাইছে, আর তার তালে তালে আর একদল নাচছে। তারা সচরাচর যে ভাষায় কথা বলে, এই গানের ভাষা কিন্তু তা নয়। একটা বিচিত্র আনুনাসিক শব্দের মালা, কখনও বা গলার ভেতর থেকে নানা রকমের আওয়াজ বেরিয়ে আসে। এই ভাষার নাম হলো শামালী, তাদের ধর্ম-কর্মের ভাষা। নাচতে নাচতে তারা যেন ভাবাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

তাদের দেখতে পেয়ে উৎসব-প্রাঙ্গণের বিরাট জনতা সমস্বরে এক বিপুল আওয়াজে অভিনন্দন করে উঠলো। সে বিপুল ধ্বনি বাম্বা আর পোম্বার চন্দ্রালোকিত তীর বেয়ে দূরে দুরান্তরে ছড়িয়ে পড়লো, সে-ধ্বনিতে হঠাৎ নদীর ধারের বক-পাখীদের ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় তারাও যেন চীৎকার করে প্রত্যভিবাদন জানিয়ে উঠলো।

হঠাৎ জনতার মধ্যে একটা তীব্র আনন্দের উত্তেজনা জেগে উঠলো। যোদ্ধারা তাদের বর্শা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। কুকুরগুলো চীৎকার করে ডেকে উঠলো, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কলরব করে উঠলো, মেয়েরা বিয়ার আর 'কেনে'র মাদকতায় মাটিতে পা ঠুকে উল্লাসে চীৎকার করে উঠলো, "গানজা—গানজা—গানজা—"

সঙ্গে সঙ্গে শিংঘাগুলো থেকে গুরু-গুরু···গুর্‌-গুর্‌ আওয়াজ জেগে উঠলো।

চোখের সামনে ভোজবাজীর মতন যেন সব শাদা হয়ে গেল। ভস্মমাখা কালো মেয়ের আর কালো ছেলের সর্বাঙ্গ আজ শাদা, শাদা চাঁদের আলো···তার মধ্যে কালো শুধু গাছগুলো···মাটি লেপে শাদা করা হয়েছে···চাঁদের আলো এসে সারা গাঁকে চুণকাম করে দিয়েছে···শাদা ফিতের মতন চলে গিয়েছে পথগুলো··· পোম্বা আর বাম্বার জল আজ গলানো চাঁদের আলোর মতন শাদা।

যোদ্ধারা যে-যার বর্শা তুলে নিয়ে বড় বড় ঢালের আড়ালে অপেক্ষা করে থাকে···

এমন সময় দম্‌-দম্‌ করে বাজনা বেজে ওঠে··· যোদ্ধারা লাফিয়ে বাম্বার দিকে এগিয়ে চলে···মাথার ওপরে ঢাল তুলে হাতের বর্শা ঘোরাতে ঘোরাতে উন্মাদ নৃত্যে তারা এগিয়ে চলে। কিছুদূর গিয়ে আবার তারা তেমনি ভাবে নাচতে নাচতে ফিরে আসে। চীৎকার করতে করতে ফিরে আসে।

সুরু হয়ে যায় গানজার নাচ। চারদিক থেকে বেজে ওঠে বাজনা···চারদিক থেকে ওঠে গান···সে সমবেত শব্দে যেন কেঁপে ওঠে চাঁদ।

এলোমেলো উল্লাসের মধ্যে একটা বন্দোবস্ত ঠিক করা হয়। কার পর কি হবে, তার একটা ক্রম নির্দিষ্ট হয়। সমস্ত খেলাধুলার ভার যাদের ওপর, তাদের নাম হলো মুকোন্দজীইয়াংবা। তাদের দেখলেই বোঝা যায়, স্ফূর্তিতে ঝলমল করছে। তাদের পোষাকও আলাদা। মাথার চুলের সঙ্গে পাখীর লম্বা লম্বা রঙীন পালক গোঁজা; কোমরে, হাঁটুতে, হাতের কব্জীতে ঘণ্টা বাঁধা।

তাদের ভেতর থেকে তিন জন বেরিয়ে এসে একটা যুযুৎসু ধরণের নাচ নাচলো। হাতের সঙ্গে পা জড়িয়ে নানা রকমের কসরৎ দেখালো। দর্শকেরা উল্লাসে বাহবা দিয়ে ওঠে।

ক্রমশ প্রত্যেক দলই উত্তেজিত হয়ে উঠতে থাকে···হাততালি আর বাহবার ভেতর থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে মুকোন্দজীইয়াংবাদের ঘণ্টার আওয়াজ। এইবার সুরু হবে শেষ নাচ···আসল নাচ···

জনতার ওপর দিয়ে যেন একটা আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়···সামনে নাচবার জায়গা খালি করে তারা গোল হয়ে পিছিয়ে আসে···সেই অবকাশে একদল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে সেই শূন্য যায়গায় গিয়ে নাচতে সুরু করে দেয়।

তারা ক্লান্ত হয়ে আবার জনতার মধ্যে ফিরে আসে···এমন সময় মেয়েরা আসে এগিয়ে···পরিপূর্ণ নগ্ন দেহে···নাচবার জন্যে···

এইবার মেয়েরা নাচতে সুরু করলো। পরিপূর্ণ নগ্নদেহ···মাথার চুল আজ রেড়ীর তেলে সুচিক্কণ··· নাকের ডগায়, কানে, ঠোঁটে নানা রঙের অংটির মতন গোল গয়না বিদ্ধ হয়ে ঝুলছে···হাতে পায়ে কোমরে পেতলের বালা! পার্শ্ববর্তিনীর কাঁধে হাত দিয়ে লাইন ধরে সারি-সারি তারা এগুতে আরম্ভ করে।

হঠাৎ কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে তারা গোল হয়ে ঘুরে দাঁড়ায়···

পেছনের বাদ্যযন্ত্র বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাদের অঙ্গ দুলে ওঠে। বাদ্যযন্ত্রের তালের সঙ্গে হাত আর পা দিয়ে তাল দিতে দিতে তারা গান ধরে। গোল হয়ে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

সামনের দল নাচতে নাচতে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ভেঙ্গে যায়, তার মাঝখানে একটি মেয়ে এগিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়ায়। দুই চোখ বন্ধ করে সে নাচতে থাকে, উত্তপ্ত নগ্ন দেহে ফুটে ওঠে সুমধুর আমন্ত্রণ··· বিভোর হয়ে সে নাচতে থাকে, যদি পড়ে যায় পেছনে যারা দাঁড়িয়ে আছে, তারা ধরবে।

নাচ থামিয়ে মেয়েটি মেপে মেপে তিন পা এগিয়ে যায়, এক, দুই, তিন···সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে করতালি ওঠে। তিন পা এগিয়ে যাবার পর সে দেহকে এমন ভাবে এলিয়ে দেয়, যেন তাকে গ্রহণ করবার জন্যে সামনে কেউ দাঁড়িয়ে রয়েছে··· হঠাৎ আবার মুখভার করে তিন পা পিছিয়ে আসে, এক, দুই, তিন···যেন তাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

আবার তেমনি মেপে মেপে তিন পা এগিয়ে যায়, আবার প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে আসে। বার বার এই ভাবে প্রত্যাখ্যাত হতে হতে ক্লান্ত অবশ অঙ্গে নিদারুণ লজ্জায় ঢলে পড়ে।

তার সঙ্গিনীরা তৎক্ষণাৎ তাকে ধরে ফেলে! কাকুতি-মিনতি করে আবার তাকে দাঁড় করায়। আর সে এগিয়ে যায় না, সেই অর্দ্ধচন্দ্রের মধ্যে বাঁ দিকের একেবারে শেষ ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে ডান দিকের শেষাংশ থেকে আর একজন সঙ্গিনী ঠিক তেমনি তিন-পা মেপে এগিয়ে আসে। যে অদৃশ্য প্রেমিক তার সঙ্গিনীকে প্রত্যাখ্যান করে ফিরিয়ে দিয়েছে, তাকে ভোলাবার জন্যে আবার সে চেষ্টা করে।

ক্রমশ এই ভাবে আসে পুরুষদের পালা। তখন চারদিকে জমে উঠছে পরিপূর্ণ উন্মাদনা। যেদিকে চাও সেদিকে শুধু ঘর্মাক্ত মাংসপেশী আর তাণ্ডব আর্তনাদ। পায়ের তলায় মাটি যেন সে-উন্মাদ তাণ্ডবে ফেটে যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে কি অট্টহাসি, কি চীৎকার! সেই অগণিত নরনারীর মিলনে, বিয়ার আর কেনের প্রেরণায়, উল্লাসে আর নৃত্যে জেগে ওঠে উন্মাদ আত্মহারা কামনার চঞ্চলতা···

সামনে এগিয়ে আসে দশ জন পুরুষ···প্রায় নগ্ন দেহ।

সেই দশ জনের মধ্যে, সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়ে বিসিবিংগুইয়ের ওপর···সকলের চেয়ে সুগঠিত দেহ, সবচেয়ে সুন্দর! দুটো চোখ জলছে, যেমন জলে ওঠে রাত্তিরের বনের আগুন। প্রত্যেক মাংসপেশী পাথর দিয়ে তৈরী, আপনা থেকে যেন দুলে দুলে উঠছে। সরু কাঁচা বেতের মতন লিকলিকে দেহ নিয়ে সে লাফিয়ে ওঠে, দলের আর সবাইকে সে-ই চালিয়ে নিয়ে চলে।

তারা প্রত্যেকেই লাল চন্দন আর তেল দিয়ে সারা দেহকে করেছে চিত্রিত। শরীরের মধ্যে যেখানে সুবিধা পেয়েছে সেইখানেই ঝুলিয়েছে ঘণ্টা, এমন কি মাথায় গোঁজা পালকের সঙ্গেও ঝুলিয়েছে ঘণ্টা। নড়তে গেলেই টুং-টাং বেজে ওঠে দেহ।

গায়ের ওপর আঁকা রঙীন নক্সা ঘামে গলে যাচ্ছে ···গা থেকে উঠছে আগুনের মতন উত্তাপ। কিন্তু বিন্দুমাত্র ক্লান্তি কেউ বোধ করে না। তাদের দেহ-মন আজ এই ইয়াংবাংতে তারা সঁপে দিয়েছে।

কত ছোট মানুষের এই জীবন। দেখতে দেখতে কখন এসে যায় সেই দিন, যেদিন মৃত্যু এসে অশুচি করে দেয় দেহকে। প্রতিদিন সূর্য যখন ডুবে যায়, চুরি করে নিয়ে যায় সেই অল্প পুঁজি থেকে একটা করে দিন। তাই যতক্ষণ আছে সূর্য, ভোগ করে নাও যা ভোগ করতে পারে এই দেহ-মন।

সর্ব বাঁধন হারা তারা নাচতে শুরু করে দেয়।

মাটির দিকে মাথা নুইয়ে, দু'হাত মাটিতে ঠেকিয়ে, উঁচুতে পা তুলে তারা নানা রকমের কসরৎ দেখায় প্রথমে। তারপর তারা দু'হাত মেলে উঠে দাঁড়ায়, সামনে পিছু, ডাইনে বাঁয়ে দু'হাত দিয়ে বাতাসকে

ঠেলে ঠেলে এগিয়ে চলে, যেন ডানা মেলে বাজপাখীর দল উড়ে চলেছে শীকার লুণ্ঠন করে নিয়ে।

চারদিক থেকে আবার বাজনা বেজে ওঠে, সেই সঙ্গে সুরু হয় গান্‌জার গান···

"গান্‌জা···গান্‌জা···গান্‌জা···
এখুনি আরম্ভ হবে গান্‌জা!
শিশু হবে মানুষ···
এখুনি শুরু হবে গান্‌জা···"

এগিয়ে আসে একদল তরুণ কিশোর। তাদের সামনে এসে দাঁড়ায় ছুরি-হাতে দু'জন বৃদ্ধ ওঝা, সর্বাঙ্গ ভরা মাদুলিতে। মেয়েদের সামনে এগিয়ে আসে একজন বৃদ্ধা। তরুণ কিশোরেরা নাচতে সুরু করে উন্মাদ নৃত্য, এখুনি তাদের অঙ্গে আঘাত করবে সুপবিত্র ছুরি —গানজার ছুরি—তারা হবে মানুষ, পুরো মানুষ···

চারদিক থেকে ওঠে গান্‌জার গান,
"গান্‌জা···গান্‌জা···গান্‌জা···
আজ রাত্তিরে তারা হবে পুরো স্ত্রীলোক,
আজ রাত্তিরে হবে তারা পুরো পুরুষ,
গান্‌জার ছুরির আঘাতকে আনন্দে সহ্য করে
তারা হবে আজকের উৎসবের মালিক।"

বৃদ্ধ ওঝা দু'জন ছুরি হাতে নিয়ে মন্ত্র বলে, "এক চাঁদ, দু' চাঁদ ধরে, বনের গভীর নির্জনতায় তোমরা উপবাস দিয়ে নিজেদের তৈরী করেছ গানজার জন্যে?

"এক চাঁদ, দু' চাঁদ ধরে, লোকের কুৎসিত দৃষ্টির আড়ালে তোমরা তোমাদের দেহকে করে রেখেছো শুভ্র সুপবিত্র, যাতে মৃত্যু তোমাদের জব্দ করতে না পারে।

"এক চাঁদ, দু' চাঁদ ধরে, তোমরা কোন অপবিত্র কথা বলোনি! শুধু আমাদের জাতির পবিত্র ভাষা উচ্চারণ করেছো। লোকের পাপ-দৃষ্টির আড়ালে তোমরা শুধু ফল-মূল খেয়ে জীবন ধারণ করেছো।

"এক চাঁদ, দু' চাঁদ ধরে, তোমরা যেখানে খুশী, যেভাবে খুশী শুয়ে রাত কাটিয়েছো! এক চাঁদ, দু চাঁদ ধরে তোমরা কোন খেলা, কোন হাসি, কোন রঙ্গ-তামাসায় নিজেদের কর নি নষ্ট।

"ভগবান নাজাকোরা তাই তোমাদের ওপর হয়েছেন সন্তুষ্ট। দু' চাঁদ ধরে এই কঠিন পরীক্ষায় তোমরা উত্তীর্ণ হয়েছো। এখন তোমরা সকলের সামনে হাসতে পার, খেলতে পার, নাচতে পার, এখন তোমরা যে-যার বোগ্‌বোতে শুতে পারো।

"এখুনি তোমরা পুরুষ হবে। এখুনি তোমরা স্ত্রীলোক হবে। গান্‌জার ছুরি এখুনি তোমাদের গৌরব এনে দেবে।

"তাই নাচো, গাও, উৎসব করো।"
চারদিক থেকে ওঠে উন্মাদ রব,
গান্‌জা, গান্‌জা, গান্‌জা···

গান্‌জার লগ্ন এগিয়ে আসে। ওঝারা ছুরিতে শাণ দিয়ে ঠিক করে নেয়। আঘাত গ্রহণ করবার জন্যে গান্‌জার উদ্দিষ্ট তরুণ-তরুণীরা প্রস্তুত হয়। বালাফোন, লিংঘা, কৌন্দে, তাদের যত রকমের বাজনা ছিল, সব একসঙ্গে তারস্বরে বেজে ওঠে। যেন যন্ত্রণার চীৎকার সেই শব্দের মধ্যে ডুবে যায়।

সুরু হয়ে যায়, লিঙ্গচ্ছেদের অনুষ্ঠান।

একটা বড় পাথরের ওপর থুথু ফেলে, পুরোহিতেরা শেষবারের মত ছুরি শাণ দিয়ে ঠিক করে নেয়।

পুরোহিতদের সাহায্যকারীরা হাতে ছড়ি নিয়ে এগিয়ে আসে। যাদের লিঙ্গচ্ছেদ হবে তাদের পিঠে নিয়মিত ভাবে প্রহার করে চলে। সেই প্রহারের ফলে তারা ক্রমশ অচৈতন্য হয়ে আসে। যদি কেউ যন্ত্রণায় চীৎকার করে ওঠে অথবা পড়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে, মানুষ হবার অযোগ্য সে! তার বেঁচে থাকবার কোন দরকার নেই। সেইখানেই প্রহারে প্রহারে তার অবশিষ্ট প্রাণটুকু কেড়ে নেওয়া হয়। এই লোকাচার ···অনাদি কাল থেকে চলে আসছে।

যে-তরুণটির ওপর সর্বপ্রথম এই পরীক্ষা চলছিল, সে উন্মাদ চঞ্চলতায় মৃত্যুকে তুচ্ছ করে উল্লম্ফন করতে থাকে, জনতা উল্লাসে বাহবা দিয়ে ওঠে, মানুষ হবার যোগ্য সে।

প্রত্যেক লাফের সঙ্গে তার রক্তাক্ত দেহ থেকে রক্ত ছিটকে গিয়ে পড়ে নিকটবর্তী জনতার গায়ে। তাকে দেখাতে হবে, তার কোন যন্ত্রণাই হচ্ছে না। আনন্দে নাচতে নাচতে তাকে গাইতে হবে—'গান্‌জা··· গান্‌জা···গান্‌জা···জীবনে শুধু একবার···'

বৃদ্ধ ওঝা দু'জন চারিদিকের উন্মাদ-কলরবের মধ্যে সম্পূর্ণ নিস্পৃহভাবে নিজেদের কাজ করে চলে। যন্ত্র-চালিতের মত তাদের হাতের কাঁচা চামড়া কেটে চলে, তারা যেন কিছুই শুনতে পাচ্ছে না, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। মাঠে যখন শস্য পেকে ওঠে, চাষী যেমন কাস্তে দিয়ে তা কেটে চলে, তেমনি ধারা তারাও ছুরি নিয়ে কেটে চলে।

মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ নাচতে নাচতে ম্লান বিবর্ণ, অবশ হয়ে ওঠে। কোথা থেকে একটা অসহনীয় ভয় তাদের সর্বাঙ্গকে যেন হিম করে দিয়ে যায়।

বৃদ্ধা পুরোহিত-নারী এগিয়ে এসে প্রথমে একজন মেয়েকে ডাক দেয়, জোর করে তাকে জড়িয়ে ধ'রে

ছুরি নিয়ে অবলীলা ক্রমে তার কাজ করে চলে। কাটা শেষ হয়ে গেলে দ্বিতীয় জনের ডাক পড়ে। নাচতে নাচতে আর গাইতে গাইতে সে এগিয়ে আসে,

'গানজা···গানজা···গানজা···
জীবনে তো একবার মাত্র এই যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে,
তার পর, সারা জীবন ভ'রে,
তুমি থাকবে আমার পাশে,
ওগো, তরুণ বীর, যে আজ উত্তীর্ণ হলে
এই গানজার পরীক্ষায়।'

ক্রমশ কলরব আরো বাড়তে থাকে।

এর পর যে কলরব আরম্ভ হবে, তার কাছে এখনকার এই আওয়াজ কিছুই নয়। কারণ, এই সব অনুষ্ঠান শেষ হবে গিয়ে, উৎসবের প্রধানতম ব্যাপারে, প্রণয়-নৃত্যে। এই প্রণয়-নৃত্যের রাতের জন্যে সারা বছর তারা অপেক্ষা করে থাকে। বছরে একদিন মাত্র আসে এই প্রণয়-নৃত্যের রাত। এই রাতে তারা অবাধে ছেড়ে দেয় তাদের মনের সমস্ত কামনা, বাসনা আর প্রবৃত্তিকে। এই রাতে অসংযম আর অনিয়ম পায় সামাজিক অনুমোদন। অপরাধহীন অনাচারের মধু রাত।

দেখতে দেখতে প্রত্যেক বাদক যে-যার যন্ত্র নিয়ে অপরের সঙ্গে তুমুল প্রতিযোগিতা সুরু করে দেয়। এতক্ষণ পরে যোগ দেয়, বৃহৎ-আকার সব শিঙ্গা। তাদের তুমুল চীৎকারে বাতাস কেঁপে কেঁপে ওঠে। সে চীৎকারে শিকারী পাখীরা নীড় ছেড়ে উৎসব-ক্ষেত্রের ওপর ঝাঁক বেঁধে ঘুরতে থাকে।

সেই তুমুল যন্ত্র-কোলাহলের মধ্যে, দুটি নারী এগিয়ে আসে, একজন ইয়াসীগুইন্দজা, বাতোয়ালার প্রধানা মহিষী, আর একজন তরুণী, এখনো কোন পুরুষের স্বামিত্বের চিহ্ন তার দেহের ওপর পড়েনি।

দুই জনেই নগ্ন, পরিপূর্ণ নগ্ন দেহ। সারা অঙ্গে শুধু কাচের নানা রকমের গহনা, গলায়, কোমরে, হাতের কব্জীতে, পায়ে। সারা অঙ্গে মেটে লাল রঙের প্রলেপ।

এ ছাড়া ইয়াসীগুইন্দজার অঙ্গে একটা লাল রঙের কাঠের প্রতীক চিহ্ন কোমরে গহনার সঙ্গে ঝুলতে থাকে। আজকের এই নাচের উৎসবে সে যে প্রধানা, তারই চিহ্ন।

ইয়াসীগুইন্দজা নাচতে সুরু করে। প্রথমে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শুধু কোমর আর উরুদেশ নাচাতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে দুলতে থাকে সেই কাঠের প্রতীক।

তারপর ধীর পদক্ষেপে সে অপেক্ষমান তরুণীর দিকে এগিয়ে আসে। তাকে হাত বাড়িয়ে আমন্ত্রণ জানাতে, তরুণীটি কয়েক পা পিছনে সরে যায়। প্রত্যাখ্যান। তরুণী তার ভঙ্গী দিয়ে জানিয়ে দেয়, এমনি ভাবে পুরুষের কামনার আগুনে নিজেকে আহুতি দিতে সে চায় না। নানা অঙ্গভঙ্গী করে সে লাফাতে থাকে। যেন সে ভীত। ইয়াসীগুইন্দজা যেন তার প্রণয়প্রার্থী পুরুষ।

তরুণীর প্রত্যাখ্যানে প্রণয়ী ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। দুরন্ত ভাবে মাটিতে পা ঠুকে ঠুকে সে তার অন্তরের ক্ষোভকে নিবেদন করে। তরুণীটির ভয় যেন একটু একটু করে ভেঙে যায়। দূর থেকে সে নিজেকে সমর্পণ করবার ভঙ্গী করে।

দ্রুত ছুটে যায় প্রণয়ী তার কাছে, তাকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করে। কিন্তু তরুণী কপট লজ্জায় তখনও মুখ ঘুরিয়ে নেয়। আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দূরে সরে দাঁড়ায়। দু' হাত দিয়ে চোখ ঢেকে থাকে। সুরু হয়, শিকার। শিকারী তেড়ে যায়, শিকার ছুটে পালায়। থমকে দাঁড়ায়, দু' পা এগোয়, আবার দু' পা পিছিয়ে যায়। শিকারী ক্রমশ উন্মাদ হয়ে ওঠে। উন্মাদ আক্রমণে শিকারকে জড়িয়ে ধরে, নিজের দেহের সঙ্গে যেন পিষে ফেলে। চোখে-মুখে ফুটে ওঠে কামনার বীভৎস নির্লজ্জতা। শিকার আত্মসমর্পণ করে।

সঙ্গে সঙ্গে তুমুল শব্দে বেজে ওঠে বাজনা। বিদ্যুৎ-আহতের মতন নিমেষের মধ্যে জনতা ক্ষিপ্ত উন্মত্ত হয়ে ওঠে। পুরুষেরা ছুঁড়ে ফেলে দেয় তাদের ক্ষীণ কটিবাস। মেয়েরা ছিঁড়ে ফেলে দেয় সামান্য লজ্জা-বস্ত্র। সমস্ত উৎসব-অঙ্গন একসঙ্গে নেচে ওঠে। নাচতে নাচতে প্রত্যেকে বেছে নেয় তার সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে। সমস্ত উৎসব-ক্ষেত্র টলমল করে ওঠে কামনার সেই উন্মাদ নৃত্যে।

ইয়াসীগুইন্দজা আর তার নৃত্য-সঙ্গিনীকে কেন্দ্র করে, প্রত্যেক পুরুষ তার নৃত্য-সঙ্গিনীকে বেছে নেয়, জোড়ায় জোড়ায় তারা নাচতে সুরু করে।

সুরা আর ঘন-সান্নিধ্যের গন্ধে বাতাস উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। চারদিক থেকে কানে আসে অস্ফুট চীৎকার, আক্রান্তের আর্তনাদ, দেহ-পীড়িতের মধুর প্রতিবাদ···

প্রকাশ্যে, সকলের সামনে, অরণ্যের বন্যপশুর মতন বাধা-বন্ধহারা প্রচণ্ড উল্লাসে তারা মেতে ওঠে, অরণ্য-পশুর মতন সংস্কারবিহীন মুক্ত। কামনার মদিরকে দ্বিগুণিত করে তোলে ফেনিল সুরার পাত্র···

ক্রমশ বাজনা থেমে আসে। যন্ত্রীর দল তাদের বাজনা দিয়ে যে উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে তুলেছিল,

উত্তাল করে তুলেছিল, তাতে তাদেরও ন্যায্য অংশ গ্রহণ করবার জন্যে বাজনাকে ফেলে দিয়ে এগিয়ে আসে। যদিও অন্য সব দলের মতন তেমন নিপুণ ভাবে তারা নাচতে পারে না, তবুও সেই নৃত্যের উত্তাল তরঙ্গে তারা নিজেদের ভাসিয়ে দেয়, কারণ, আফ্রিকার দিনের এই নৃত্য, প্রণয়-নৃত্য, তাদের উৎসব-জীবনের সর্বোত্তম অনুষ্ঠান, আদিম কাল থেকে এই নৃত্য দিয়া এসেছে তাদের জীবনে নিবিড় আনন্দের প্রেরণা··· অস্তিত্বের স্বাদ···

তারা নেচে চলে। অবিশ্রান্ত···অবিরাম। গ্রীষ্ম-দিনের পর যখন প্রথম বর্ষার ধারা মাটিতে এসে পড়ে, সেই সময় জলের সংযোগে তপ্ত মাটি থেকে যে-রকম বাষ্প ওঠে, তেমনি ধারা একটা বাষ্প যেন তাদের অঙ্গ থেকে সমস্ত বাতাসকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

সহসা সেই উন্মাদ নৃত্য-উৎসবের মধ্যে, কারা দু'জন মাটিতে পড়ে গেল···বাতোয়ালা ক্ষিপ্ত শার্দুলের মতন তাদের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে···হাতে ঝক্‌মক্‌ করে ওঠে শাণিত ছুরিকা···

উত্তেজিত ঘোড়ার মতন সফেন হয়ে ওঠে মুখ।

আঘাত করবার জন্যে হাত তোলে।

কিন্তু হাত তোলা আর আঘাত করার মধ্যে যেটুকু অবকাশ, তার ভেতর, যে দু'জন পড়ে গিয়েছিল, তারা উঠে বাতোয়ালার হাতের বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়, ইয়াসী-গুইন্দজা আর বিসিবিংগুই।

তারা উৎসবক্ষেত্র থেকে ছুটে পালায়।

বাতোয়ালা তাদের পেছনে তাড়া করে ছোটে···

এত বড় আস্পর্দ্ধা! কুকুরের বাচ্ছা, ঐ বিসিবিংগুই আর ইয়াসীগুইন্দজা, তার চোখের সামনে এই রকম ভাবে···

পথ-কুক্কুরী ঐ স্ত্রীলোক···জ্যান্ত তার গায়ের চামড়া সে খুলে নেবে!

আর বিসিবিংগুই-এর দেহ এমন বিকৃত করে দেবে যে, মেয়েরা দেখলে হাসবে!

ঐ ইয়াসীগুইন্দজা! রীতিমত মূল্য দিয়ে তাকে সে কিনে নেয় নি? সাত সাতখানা কটিবাস, এক বাক্স নুন, তিনটে পেতলের গলার হার, চারটে হাঁড়ি, দুটা মুরগী, কুড়িটা ছাগলের বাচ্ছা, চল্লিশ ঝুড়ি ভুট্টার দানা আর একটা ক্রীতদাসী···এতখানি মূল্য দিয়ে বাতোয়ালা তাকে কিনেছিল!

যেমন কাজ, তেমনি তার শাস্তি হবে। তাকে যদি আবার গ্রহণ করতে হয়, তাকে পরীক্ষা দিতে হবে···বিষ খেয়ে তাকে পরীক্ষা দিতে হবে··· তাকে বাতোয়ালা বাধ্য করাবে সেই বিষ-পরীক্ষা নিতে!

অকস্মাৎ সেই ব্যাপারে চারিদিক থেকে একটা তুমুল কলরব জেগে উঠলো···কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কার হুকুমে সমস্ত কলরব নিমেষে স্তম্ভিত হয়ে গেল···প্রস্তর-নীরব।

সেই প্রস্তর-নীরবতাকে ভেদ করে রূঢ় কণ্ঠে কে ঘোষণা করে উঠলো, কমাণ্ডার···ঐ কমাণ্ডার আসছে!

চারিদিক থেকে ভীত সন্ত্রস্ত কণ্ঠে আর্তনাদ পড়ে গেল, কমাণ্ডার···ঐ কমাণ্ডার আসছে! যে যেদিকে পারলো আতঙ্কে ছুটে পালাতে লাগলো···কয়েক মুহূর্তের ভেতর শূন্য হয়ে গেল উৎসব-ক্ষেত্র···পড়ে রইলো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত খাবারের স্তূপ···শূন্য বোতল··· পরিত্যক্ত কটিবাস···বাসন-পত্র···আর তার মাঝখানে পলায়নে-অক্ষম এক বৃদ্ধ···সুরার কৃপায় একটা বাদ্য-যন্ত্রের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে···সুগভীর নিদ্রায় অচেতন। কে বলবে এক মুহূর্ত আগে এখানে উঠেছে কামনার উন্মাদ কলরব!

"ইনে···দিয়েই···ইনে···দিয়েই···ইনে দিয়েই! ডাইনে! হল্‌ট্!"

সৈন্যরা মার্চ করে এগিয়ে আসে। মাটিতে বন্দুক ঠোকার আওয়াজ হয়। কমাণ্ডারের সৈন্যরা ফিরে এসেছে।

সার্জেণ্ট সিল্লাতিগুই কোনাতে-র পরুষ-কণ্ঠে আদেশ শোনা যায়, ইক্‌সে!

সৈন্যরা সঙ্গীন পাশে নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ায়।

ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে ফরাসী কমাণ্ডার এগিয়ে আসে!

সার্জেণ্ট কোনাতে আবার হেঁকে ওঠে···ডাইনে··· মুখ ফিরিয়ে সোজা···

সৈন্যরা ঘুরে দাঁড়ায়।

কমাণ্ডার সার্জেণ্টের দিকে চেয়ে কৈফিয়ৎ চায়, চারদিকে এ সব জঞ্জাল কি? এর মানে কি? কিছুক্ষণ আগে দূর থেকে যে গোলমাল কানে আসছিল তারই বা মানে কি?

সার্জেণ্ট জবাব দেয়, পথে আসতেই খবর পেলাম, এখানকার লোকগুলো আমাদের অনুপস্থিতির সুযোগে এই মাঠে এসে মদ খেয়ে হৈ-হল্লা করেছে!

কমাণ্ডার তৎক্ষণাৎ আদেশ দেয়, বেশ কথা···কিন্তু এই অপরাধের জন্যে এই অঞ্চলের প্রত্যেক সর্দারকে এক শো ফ্রাঙ্ক করে জরিমানা দিতে হবে এবং তা দিতে

হবে আজকে রাত্রি শেষ না হতেই। যদি না দেয়, তাহলে সোজা ফাঁড়ি, হাতে-পায়ে বেড়ি আর উত্তম-মধ্যম বেত!

সার্জেণ্ট অভিবাদন জানিয়ে বলে, এখুনি তার ব্যবস্থা করছি, হুজুর!

হঠাৎ সেই পরিত্যক্ত জিনিস-পত্রের মধ্যে কমাণ্ডারের দৃষ্টি সেই নিদ্রিত বৃদ্ধের ওপর গিয়ে পড়ে।

সামনে ঐ ডার্টি নিগার…ও বেটা কে ওখানে শুয়ে?

সার্জেণ্ট কাছে গিয়ে জবাব দেয়, বাতোয়ালার বাবা!

সার্জেণ্ট কোনাতে একদিন এখানকারই অধিবাসীদের একজন ছিল। তাই সবাইকেই চেনে।

কমাণ্ডার গর্জে ওঠে, ওখানে কি করছে হারামজাদা?

সার্জেণ্ট জবাব দেয়, হুজুর, একটু বেশী খেয়ে ফেলেছে…তাই বেসামাল হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে!

কমাণ্ডার সেই দিকে চেয়ে বলে ওঠে, বেটার পাশে…ওগুলো আমাদের ফরাসী মদের বোতল না?

—আজ্ঞে, হুজুর!

এইবার খোঁজ পড়ে ষ্টেশন-প্রহরীর, যার জিম্মায় এই মাঠ ছিল।

কমাণ্ডার জিজ্ঞাসা করে, আর সেই শূয়োরের বাচ্ছা বোলা…সেই খোঁড়া কুকুরটা কোথায়? এই যে, একেবারে হুজুরে হাজির দেখছি! গুড মর্নিং খোঁড়া কোলা ব্যাঙ!

বোলা কাঁপতে কাঁপতে উত্তর দেয়, গুড মর্নিং স্যার!

কমাণ্ডার তেমনি ব্যাঙের সুরে আদেশ দেয়, আমার অবর্তমানে যাতে অতঃপর আপনি ষ্টেশনের চৌকিদারী কাজে আরো একটু তৎপর হতে পারেন, তার জন্যে আপনাকে পনেরো দিন ঠাণ্ডা গারদে বাস করতে হবে এবং এক সপ্তাহের মাইনে কাটা যাবে। বুঝলেন? দাঁড়িয়ে দেখছিস্ কি? দূর হও…দূর হও আমার সামনে থেকে! নিতান্ত ভাগ্য ভাল যে এত কমে এবারের মতন তোমাকে রেহাই দিলাম…

তারপর সার্জেণ্টের দিকে চেয়ে আদেশ দিলো, গ্রিন্নাতিগুই! আজকের মতন সৈন্যদের সকলকে ছুটি দাও! বিশ্রাম! আজ রবিবার…সবাই বিশ্রাম করুক! বুঝলে? যাও, এদের ছুটি দিয়ে দাও!

দেখতে দেখতে সৈন্যরা চলে যায়। কিন্তু সেই ঘুমন্ত বৃদ্ধ তখনও একলা পড়ে থাকে…

তখন ভোর হয়ে আসছে…গ্রীষ্মদিনের রাত্ত-প্রভাতের প্রথম প্রহর…ঘন কুয়াসার মধ্যে ডেকে উঠছে দু'-একটা পাখী…

একদিন ভোজ, সারা বছর উপবাস। রৌদ্র-শুষ্ক বসন্তদিনের পর আসে বর্ষার ভিজে দিন…উল্লাসের সুর-সঙ্গীতের পর আসে কান্নার সুর…হাসির পর আসে অশ্রু।

উৎসব যখন পূরো মাত্রায় চলেছিল, বাতোয়ালার বৃদ্ধ পিতা তখন অতিরিক্ত সুরা পানে উৎসব-প্রাঙ্গণেই ঘুমিয়ে পড়েছিল, সেই ঘুমের ভেতর দিয়ে বৃদ্ধ তখন যাত্রা করে চলেছিল, নিবিড় ঘন-অন্ধকার লতা-গুল্মের ভেতর দিয়ে সেই দূরতম গাঁয়ে যেখান থেকে আজও পর্যন্ত কেউ আর ফিরে আসতে পারে নি। তার চারপাশে তখন চলেছিল উন্মাদ-নৃত্য। কেউ দেখেনি, বৃদ্ধ চিরকালের মতন ঘুমিয়ে পড়েছিল।

মদের পেয়ালায় মৃত্যু! এর চেয়ে সুখের মরণ আর কি হতে পারে! শেষ মুহূর্তের অনুশোচনা, অস্তিমের অসহায় বিলাপ আর বেদনা, সমস্ত ঢাকা পড়ে যায় ফেনিল নেশায়। ঘুম থেকে মৃত্যু, শুধু একটা ছোট্ট ধাপ। কোন চেষ্টা নেই, কোন পরিশ্রম নেই, কোন যাতনা নেই। শুধু অন্ধকার ছায়ায় নিঃশব্দে আর একটু গড়িয়ে যাওয়া। ভাববার কিছু থাকে না। মধুর মরণ! সারা জীবনের ক্লান্তির শেষে বিশ্রাম নাঙ্গাকোরার বিশাল স্বর্গ-রাজ্যের এক প্রান্তে এক ধারে কোথাও বিশ্রাম…চির-বিশ্রাম।

সেখানে কোন মশার উৎপাত নেই, কোন পোকার কামড় নেই, কোন কুয়াশার জ্বালা নেই, কোন হিমের কাঁপুনি নেই। কোন কাজ করবার তাগাদা নেই। কোন খাজনা দিতে হবে না, কোন বোঝা বইতে হবে না। কেউ কম দামে জিনিস ঠকিয়ে নেবে না, খেসারতের দাবীর জন্যে কেউ সৈন্য পাঠাবে না। পরিপূর্ণ শান্তি…অবাধ আরাম! কোন-কিছু পাবার জন্যে মেহনতও করতে হবে না, অপূর্ণ বাসনার জ্বালাও ভুগতে হবে না। না চাইতেই সেখানে সব পাওয়া যায়, অমনি, বিনা মূল্যে…এমন কি স্ত্রীলোক পর্যন্ত।

যেদিন থেকে তাদের দেশে বিদেশী সৈনিকরা এসে বসেছে, সেদিন থেকে ভালমানুষ নিগ্রোদের একমাত্র কামনার বস্তু হয়ে উঠেছে, মরণ, এই দেশ ছেড়ে সেই নাঙ্গাকোরার দেশে যাওয়া। দাসত্বের যন্ত্রণা থেকে একমাত্র মুক্তির উপায়।

সেদিন থেকে তাদের একমাত্র আনন্দ পাবার জায়গা হলো ঘন-অন্ধকার লতাগুল্মের ওপারে সেই

সুদূর সব-পাওয়ার দেশ, যেখানে তারা শুনেছে শাদা লোকদের প্রবেশ নিষেধ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রাচীন প্রথা-অনুযায়ী বাতোয়ালার পিতার প্রাণহীন দেহকে তারা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে রাখলো, আট দিন আর আট রাত্রি ধরে গ্রামের সমস্ত মেয়েরা মৃতদেহকে ঘিরে কাঁদলো, অঝোরে বিলাপ করলো। অশৌচের চিহ্নস্বরূপ মাথায় ছাই মাখলো, সারা মুখ কালি দিয়ে কালো করলো। আট দিন আট রাত ধরে সেই মৃতদেহকে ঘিরে তারা কেঁদে কেঁদে নাচলো, শোকে আছড়ে আছড়ে পড়লো, সারা গা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল।

তাদের পাশে দাঁড়িয়ে পাঁচখানা গাঁয়ের লোক ধীরে সৎকারের শেষ মন্ত্র গেয়ে চললো···

"বাবা, তুমিই আজ সত্যিকারের সুখী।
দুঃখী আমরা, যারা পড়ে রইলাম,
যারা তোমার জন্যে শোক করছি।"

জীবনের একঘেয়ে বিষাদের ছন্দকে ভাঙবার জন্যে যদি পাল-পার্বণের ব্যবস্থা না থাকতো, কে চাইতো বেঁচে থাকতে? নিচ্ছিদ্র দুঃখের মধ্যে এই সব পুরানো রীতি-নীত তাই বাঁচিয়ে রেখেছিল প্রাণের আগুনকে, বৈচিত্র্যকে।

তা না হলে, যে মরে গেল, তার দিকে চেয়ে দেখবার আর কি আছে? তার কাছে চাইবার বা আশা করবার আর কিছুই নাই। মানুষের সঙ্গে তার সব সম্পর্ক গিয়েছে ছিঁড়ে, কি আর আছে তার মূল্য? আজ আর তো সে সমাজের কেউ নয়! একটা শুকনো পাতার মতন, শুকনো এক টুকরো হাড়ের মতন, নিষ্প্রয়োজন, নিরর্থক।

কিন্তু আবহমান কাল থেকে চলে আসছে, এই পৃথিবী ছেড়ে যে-যাত্রী চললো নাগাকোরার দেশের দিকে, তার যাত্রাপথের চারদিকে নাচতে হবে, গাইতে হবে, তার শেষ-যাত্রা যেন মানুষের সুরে শব্দে সজাগ হয়ে থাকে।

এক সপ্তাহ সেই ভাবে মৃতদেহকে নিয়ে শোক করবার পর, তাকে সমাহিত করতে হবে। গাছের গায়ে তার মৃতদেহ থেকে মাংস গলে পড়বে এবার··· চারদিক থেকে ছুটে এসেছে শবলোভী মাছির দল।

তা ছাড়া তখন এসে পড়েছে শিকারের দিন মৃতকে নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। এই হলো শিকারের সময়। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার পর গ্রামের চারদিক থেকে উঠেছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশের দিকে···পোড়া ঘাসের গন্ধে ভারী হয়ে থাকে বাতাস। তার মাঝে ভেসে আসে টম্-টম্ বাজনার আওয়াজ। চারদিকে বন হয়ে উঠেছে সবুজ। বুনো লতার তাজা গন্ধে রক্তে লাগে দোলা।

তাই মৃতদেহকে এখন তাড়াতাড়ি বীজের মতন মাটির ভেতর পুঁতে ফেলতে হবে। শোক যা করবার তা করা হয়ে গিয়েছে, রীতি-নীতি যা পালন করবার তা যথারীতি পালন করা হয়ে গিয়েছে। এখন মাটির তলায় থাকুক মৃতদেহ, তাদের বেরুতে হবে শিকারে।

আজ-কাল অবশ্য এমন নিখুঁত ভাবে পুরানো রীতি-নীতি লোকে মানতে চায় না। বিশেষ করে যারা শাদা লোকগুলোর সংস্পর্শে এসেছে, যারা শাদা লোকগুলোর দাসত্ব করে তারা এই সব পুরানো রীতি-নীতির কথা শুনে ঠাট্টা করে।

অল্প বয়সের ছেলে-ছোকরার দল এমনি ধারা ঠাট্টা তো করবেই। আজ বুড়ো লোকদের তারা মানতে চায় না। বুড়োদের বিদ্যে-বুদ্ধির তারিফ করে না। কোন-কিছু বিচার করে ভেবে দেখতেও চায় না। ছেলে-ছোকরার দল ভাবে যে হাসলেই বুঝি সব যুক্তি উড়ে চলে গেল।

কিন্তু পুরানো রীতি-নীতি এত হাল্কা জিনিস নয়। শত শত বৎসর ধরে শত শত বৃদ্ধের বিচার-বুদ্ধির ফলে, অভিজ্ঞতার ফলে এই সব আচার-নীতি গড়ে উঠেছে। সমস্ত জাতের অভিজ্ঞতা এই সব পুরানো রীতি-নীতির মধ্যে তিল তিল করে জড়ো হয়েছে। হেসে উড়িয়ে দিলেই হলো?

এই যে আট দিন ধরে মৃতদেহকে গাছের সঙ্গে প্রকাশ্যে সকলের দেখবার জন্যে রাখা হয়, শাদা লোকগুলো এই রীতির ওপর ভারী চটা। তারা জানে না, কেন মৃতদেহকে এই ভাবে এতদিন রাখা হয়। দূর-দূরান্ত বনের ভেতর, দূর গাঁয়ের যে-সব লোক আছে, তাদের আসতে তো সময় লাগে! তাদের সকলের তো আসা চাই! টম্-টম্ বাজিয়ে তাদের সকলকে খবর দিতেও তো সময় লাগে!

তা ছাড়া, সেকালের জ্ঞানী লোকেরা দেখেছে, অনেক সময় যাকে মনে হয়েছে মৃত বলে, আসলে সে কিন্তু তখনও মরেনি। হয়ত গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল মাত্র। তারা দেখেছে এমনি বহু লোককে ঘুম থেকে আবার জেগে উঠতে। তাই তারা নিয়ম করে গেল, মরলেই যাতে মানুষকে

মাটির ভেতর পুঁতে না ফেলা হয়। একটা সময় পর্যন্ত দেখতে হবে, সেটা ঘুম, না মৃত্যু! শাদা লোকেরা এ-সব কথা বুঝবে কি করে?

বাতোয়ালা মনে মনে এই সব কথাই ভাবছিল আর মাঝে মাঝে চাপা গলায় বিসিবিংগুইকে জানাচ্ছিলো।

সামনে বৃদ্ধ পিতার অন্তিম সৎকার হচ্ছে। বিসিবিংগুই তার পাশেই বসে আছে। উৎসবের পরের দিনই তাদের দু'জনার ঝগড়া বাইরে থেকে মিটমাট হয়ে যায়। দুজনেই স্বীকার করে নেয় অতিরিক্ত মদ্যপানের দরুণ তারা সাময়িক ভাবে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলো। তাই তাদের পুরানো অন্তরঙ্গতা মনে হয় অব্যাহতই রয়েছে।

কিন্তু বিসিবিংগুই মনে মনে জানে, সেদিনকার ব্যাপারের দরুণ বাতোয়ালা প্রকৃতপক্ষে তাকে মন থেকে ক্ষমা করতে পারে নি। সুযোগ পেলেই সে তার উপযুক্ত প্রতিশোধ নেবে। নীরবে সেই সুযোগের অপেক্ষায় আছে বাতোয়ালা।

—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মেয়েরা গেয়ে চলে,—
"বাবা, তুমিই প্রকৃত সুখী
আমরা যারা শোক করবার জন্যে পড়ে রইলাম,
আমরাই আসলে দুঃখী।"

শাদা লোকরা যখন অপমানিত হয়, তখন তারা সদ্য সদ্য তার প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করে। কিন্তু আফ্রিকার এই কালো লোকদের প্রতিশোধ নেবার রীতিও আলাদা।

তারা জানে, প্রতিহিংসা গরম গরম পরিবেশন করতে নেই। তাই তারা বাইরের হাসি-খুশী আর মিষ্টি ব্যবহারে প্রতিহিংসার জ্বালাকে লুকিয়ে রাখে, ছাই দিয়ে যেমন আগুনকে লুকিয়ে রাখতে হয়··· ছাই-এর তলায় আগুনের কণা নীরবে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে।

তাই যার ওপর প্রতিহিংসা নিতে চাও, তোমার সেই শত্রুকে আদর করে তোমার বাড়ীতে ডেকে নিয়ে এসো, নেমন্তন্ন করো, পেট ভরে খাওয়াও, দরকার হলে টাকা দিয়ে সাহায্য করো। তোমার দেবার মতো যা-কিছু আছে, সব তোমার শত্রুর হাতে তুলে দাও। এমন কি, সে না চাইতেই, তুমি আগে থাকতে তার মনস্কামনা পূর্ণ করো। তার সন্দেহকে একেবারে ঘুম পাড়িয়ে দাও। হলদে আর শাদা রঙ হলো বন্ধুত্বের চিহ্ন, সুগভীর অন্তরঙ্গতার চিহ্ন···বেছে বেছে তোমার সবচেয়ে শাদা বা হলদে মুরগীর ছানা তোমার শত্রুর জন্যে রেখে দাও। কিছুতেই যাতে তোমাকে বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করতে পারে।

এই বঞ্চনার খেলা, যতদিন দরকার, চালিয়ে যেতে হবে। অসহিষ্ণু হলে চলবে না।—বহুদিন পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে থাকতে হবে, যতক্ষণ না উপযুক্ত সুযোগের লগ্ন আসে। ঘৃণা হলো চরম ধৈর্যের ব্যাপার।

তারপর, যখন সব দিক থেকে সুযোগ ঘনিয়ে আসবে, তখন নিঃশব্দে তাকে বিষ দিয়ে মেরে ফেলো, ···এতদিন ভায়ের মতন যাকে কাছে-কাছে রেখেছো, তাকে বিষ দিতে বিশেষ আর হাঙ্গামা করতে হবে না।

তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী···তোমার শত্রু···তার সঙ্গে তোমার আসল সম্বন্ধ হলো, নেকড়ের সম্বন্ধ···নেকড়ে ···বনের সমস্ত পশুদের মধ্যে সবচেয়ে ক্রুর, সবচেয়ে নির্মম, নিষ্ঠুর—

আকাশে যখন চাঁদ থাকে না, অন্ধকারে থম্‌-থম্ করে বন, সেই সময়ে নেকড়ে বেরোয় শিকারে···

অন্ধকারে অতর্কিতে এক নিমিষে শিকারের টুঁটি চেপে ধরে—নখ আর দাঁত দিয়ে টুকরো টুকরো করে তাকে জবাই করে··· রক্ত পান করবার আগেই রক্তের গন্ধে মুখের সমস্ত পেশী সবল হয়ে ওঠে···টাটকা তাজা গরম রক্ত, তখনও তা থেকে উঠছে ধোঁয়া, সে-রক্ত না হলে তার তৃষ্ণা মেটে না। সেই রক্ত পান করেও সে তৃপ্ত হয় না, সেই রক্ত সর্বাঙ্গে মেখে আনন্দে তাতে গড়াগড়ি দেয়, সুরার মত সে তপ্ত রক্ত মাতাল করে তোলে তাকে—বহুক্ষণ পর্যন্ত বাতাসে রক্তের তীব্র গন্ধ মশগুল করে রাখে তাকে···

নিজের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে এই নেকড়েকে। অমনি চাঁদ-ডোবা এক অন্ধকার রাত্রিতে, যে-বুনো পথ দিয়ে তোমার শিকার যাবে, তার ধারে মুখেতে মুখোস পরে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে···অপেক্ষায়···

তারপর···ঐ···ঐ আসছে শিকার! একটা উন্মাদ লাফ—এক নিমিষে মাটিতে ফেলে দুই হাত দিয়ে সজোরে গলা টিপে ধরো···তারপর নেকড়ের মতন, কোমর থেকে সরু ছুরি নিয়ে, কিম্বা নিজের লম্বা ধারালো নখ দিয়ে গলার নলিটা টেনে ছিঁড়ে ফেলো··· তারপর নেকড়ের মতন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলো···

বাতোয়ালা সত্যি সত্যি ঠিক এই রকমই মনে মনে কল্পনা করে চলেছিল…বিসিবিংগুই অনুমান করতে ভুল করে নি। বাইরের অন্তরঙ্গতার আড়ালে নিঃশব্দে বয়ে চলে প্রতিহিংসার ধারা—

"বাবা, তুমিই প্রকৃত সুখী,
আমরা যারা শোকার্ত পড়ে রইলাম,
আমরাই আসলে দুঃখী।"

একটা ছোট ছেলে আপনার মনে একটা বহুরূপী গিরগিটি ধরবার চেষ্টা করছে। ওরা তাকে বলে কলিঙ্গো। কলিঙ্গো যেখানে থাকে, তারই রঙ ধারণ করে, কখনো শাদা, কখনো হল্‌দে, কখনো সবুজ।

কিন্তু বাতোয়ালার কুকুর জুমা, সে কি এই তত্ত্ব জানে? না। এ তত্ত্ব জানবার কোন উপায়ই তার নেই। তাই কান খাড়া করে সে বহুরূপীটির দিকে চেয়ে প্রাণপণে চীৎকার করে।

শববাহীরা ধীরে ধীরে বৃদ্ধের শবদেহকে একটা মাদুরের ওপর তুলে নেয়, যে-মাদুরে বৃদ্ধ শুয়ে থাকতো। তারপর কবরস্থানে নিয়ে যাবার জন্যে কাঁধে তোলে। সঙ্গে সঙ্গে তুমুল শব্দে বাজনা বেজে ওঠে। মেয়েরা কণ্ঠ ছেড়ে বিলাপ করতে আরম্ভ করে,…

"ওগো বৃদ্ধ,
আজ এখন আমরা চলেছি,
তোমাকে নিয়ে যাব তোমার নতুন ঘরে।
এখানকার জীবন ছেড়ে চলে যেতে
এখানকার জীবন ছেড়ে চলে যেতে
হলো বলে দুঃখ করো না।
তুমি যে নতুন দেশে যাচ্ছো,
সেখানে তুমি ঢের সুখে থাকবে।
সেখানে তোমার অন্নের অভাব হবে না,
অভাব হবে না পানীয়ের।
সেখানে প্রয়োজনই হবে না খাদ্যের।
কারণ সে দেশে নেই ক্ষুধা, নেই তৃষ্ণা।"

কয়েক গজ দূরে কবরের মাটি খোঁড়া হয়েছে। শবযাত্রীর দল গাইতে গাইতে সেখানে উপস্থিত হয়। ধীরে মাটির তলায় গর্তের ভিতর শব-দেহকে নামিয়ে দেওয়া হয়। নির্বিঘ্নে ঘুমাবে এবার বৃদ্ধ।

কবরের পাশে, বৃদ্ধের যা-কিছু কাপড়-চোপড়, আসবাব-পত্র ছিল সব এক জায়গায় এনে জড় ক'রে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো। পৃথিবীর সঙ্গে তার সব সম্পর্ক গেল ফুরিয়ে।

একে একে শোকের পালা শেষ হয়ে এলো। বৃদ্ধের মৃতদেহকে কবরে সমাহিত করবার পর, সেইখানেই বৃদ্ধের পার্থিব অবশিষ্ট যা কিছু ছিল, সব আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হলো।

মেয়েরা গাইতে গাইতে যে-যার ঘরে ফিরে গেলো,

"তুমি এখন পৌঁছে গিয়েছো,
ঘন অন্ধকার ঝোপ-জঙ্গল পেরিয়ে
কলিকংবো-দেশে,
যেখানে তোমার অপেক্ষায় আছে
তোমার বংশের পিতা-পিতামহরা,
তাদের সঙ্গে আনন্দে তুমি আজ হয়েছো মিলিত,
আমরাও একদিন সেখানে গিয়ে তোমার
সঙ্গে হবো মিলিত।"

ধীরে নেমে আসে রাত্রি। রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে আসে দুরন্ত হিম।

নদীর ওপারে বনের ভেতর থেকে জেগে ওঠে শার্দূলের চীৎকার…তারা বেরিয়েছে শিকারের সন্ধানে।

রাত্রির অন্ধকার…হিম…আর শার্দূলের নিশীথ গর্জন!

কেটে যায় দিনের পর দিন।

মৃত-ব্যক্তি যে কুঁড়ে ঘরে থাকতো, সে-ঘরের ছাদ ভেঙে ফেলে দেওয়া হয়েছে…ঘরের সামনে যে কাঠের লিঙ্গ-মূর্তি ছিল, সেটা ভেঙে পড়ে গিয়েছে। কোন পরিবারের কর্তা যখন মারা যায়, তখন এই ভাবেই তারা তার থাকবার ঘরের ছাদটা ভেঙে দেয়। যে-পুরুষ পৃথিবী পরিত্যাগ ক'রে কলিকংবোর দেশে যাত্রা করে, সে তো আর সন্তানের জন্ম দিতে পারবে না, তাই তার ঘরের সামনে কাঠের লিঙ্গ-মূর্তিকেও তারা ভেঙে ফেলে দেয়।

ক্রমশ সকলেই ভুলে যায় তার কথা। জ্যান্ত পৃথিবীর নেশায় মেতে ওঠে আবার তারা।

সামনেই শিকারের সময়। বর্শা-হাতে ছোটে তারা বনের দিকে। তাদের বাজনায় বেজে ওঠে শিকারের গান। সারা দিন ধরে শাণ দেয় বর্শায়। টগ-বগ করে নাচতে থাকে শিরায় রক্ত। প্রমত্ত শার্দূলের সঙ্গে হবে তার মত্ত আদর…মৃতের জন্যে বসে বসে শোক করবার সময় আর নেই…চোখের সামনে ভেসে ওঠে রক্তমাখা বুনো-জন্তুর অন্তিম আস্ফালন…পিচকিরির মতন ছিটকে পড়ে রক্তের ধারা…নিশীথ-অরণ্য কেঁপে ওঠে মৃত্যুর তাণ্ডব নৃত্যে। নেচে ওঠে বুনো মানুষের মন…জীবনের আহ্বানে।

মধ্য-আকাশকে পেরিয়ে বহুক্ষণ হলো সূর্য এগিয়ে চলেছে তার কুঁড়ে ঘরের দিকে, দিগন্ত-রেখার ওপারে অদৃশ্য-লোকে আছে তার দিনান্তে-ফিরে-আসার কুঁড়ে

ঘর। আহা, ঐ আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ো, হাজার হাজার বছরের ঐ বুড়ো-সূর্য, অমন সুন্দর লোক আর হয় না। এতটুকু অবিচার নেই তার কাছে। তুমি যত বড়ই হও, কিম্বা তুমি যত ছোটই হও, যত কেন না তুচ্ছ হও, সমান ভাবে সকলকেই সে দিয়ে চলে আলো। এতটুকু পক্ষপাতিত্ব নেই তার কারুর জন্যেই! সে জানে না কে ধনী, কে নির্ধন! সে জানে না···কে নিগ্রো আর কে শাদা চামড়া।

গায়ের রঙ শাদাই হোক্ আর কালোই হোক্, ঘরেতে টাকা-পয়সা থাকুক আর নাই থাকুক, তার তাতে কিছু যায়-আসে না, আকাশের তলায় সবাই তার সন্তান। সব সন্তানকেই সে সমান ভাবে ভালবাসে। উদয়াস্ত সকলের মন জুগিয়ে চলে। কোথায় কোন ছেলের দল বীজ বুনছে, আলো দিয়ে সেই বীজ থেকে তৈরী করে দেয় অঙ্কুর; কোথায় কারা ভোরে হিমে আর কুয়াসায় পাচ্ছে কষ্ট, তাড়াতাড়ি আলোর শর দিয়ে তাড়িয়ে দেয় কুয়াসার জঞ্জাল; আলোর মুখ দিয়ে শুষে নেয় অদরকারী বাড়তি জল··· সারা দুনিয়া থেকে তাড়িয়ে বেড়ায় ছায়া-ভূতের দলকে। ছায়া সে সইতে পারে না।

ছায়া! অন্ধকার! তাদেব শত্রু সে, চিরদিনের শত্রু। দয়াহীন, মায়াহীন, নির্মম সে তাড়িয়ে বেড়ায় যেখানে থাকে ছায়া। সারা দিন ছায়ার পেছনে শিকার করে বেড়ায়। এমন ঘৃণা আর কিছুকে সে করে না।

পীড়িত যে, তার বন্ধু সে। তার আলো তাদের ওষুধ। মা'র স্নেহের মতন আলোর স্পর্শে সে পীড়িতকে দেয় শান্তি। কে না জানে, আলোই স্বাস্থ্য, আলোই পরমায়ু? কে না জানে, ঐ বুড়ো সূর্যের জন্যেই এই জগৎ-ভরা সব প্রাণী জীবন ধারণ করে আছে?

একমাত্র চিরজীবী হলো সূর্য।

মানুষের আয়ত্তের বাইরে, শাসনের বাইরে যা-কিছু, সেখানেও সূর্যের আলো গিয়ে পৌছোয়, সেখানেও চলে তার শাসন।

এ জগতে চিরদিনের কেউ নয়। প্রত্যেক বর্ষায় যেমন নদীর জল বেড়ে ওঠে, তেমনি বেড়ে চলেছে মানুষ। আজকে যারা শিশু, কালকে আবার তারা হবে শিশুর জনক।

মাটিকে আশ্রয় করে থাকে ঘাস। ঘাসকে আশ্রয় করে থাকে বনের প্রাণী। সে ঘাস আর বনের প্রাণী, দুই-ই আবার নষ্ট হয়ে যায় মানুষের হাতে। মানুষকেও নষ্ট করে দেয় মৃত্যু। কিছুই থাকে না চিরদিন বেঁচে। কিছু না।

আজ যেখানে রয়েছে কুঁড়েঘর, উঠছে ধোঁয়া, নড়ছে ফিরছে প্রাণী, কাল সেখানে গজিয়ে উঠবে বন, ঘন জঙ্গল। আবার মানুষ এসে ছেয়ে ফেলবে সেই বন-জঙ্গলকে। অদৃশ্য হয়ে যাবে বন। শুকিয়ে যাবে নদী। বৃথাই মানুষ আশা করে যে তার সন্তান-সন্ততির মধ্যে সে থাকবে বেঁচে। বড় বড় বংশ অদৃশ্য হয়ে যায়, লুপ্ত হয়ে যায়, সূর্যের আলোয় লুপ্ত হয়ে যায় যেমন কুয়াসা।

একমাত্র শুধু ঐ বুড়ো সূর্য, লুলু তার নাম, প্রতিদিন সে-ই থাকে বেঁচে, প্রতিদিন সমান তাজা, অক্ষয় তার যৌবন; আজও আছে, কালও থাকবে, জগতের সব মৃত্যুর ওপর সে শুধু একমাত্র জেগে আছে জীবন্ত প্রহরী। তেমনি সোনার বরণ, তেমনি আলোময়, তেমনি পরোপকারী। একজনকে ছাড়া বিরাট সৃষ্টিতে সে আর কাউকে ভয় করে না। সে হলো 'আইলু', চাঁদ। চাঁদের আসবার সময় হলেই সে তাই গা-ঢাকা দেয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শিকারের মরশুম। আজ কালো মানুষের দল বর্শা-হাতে সবাই বেরিয়েছে জঙ্গলে।

কোসিগাম্বা কাগার একটা সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে বিসিবিংগুই অপেক্ষায় আছে···

অপেক্ষায় ক্লান্ত হয়ে হাই তুলে মাঝে মাঝে স্থান-পরিবর্তন করে নেয়।

পাহাড়ের চূড়া থেকে নীচে চেয়ে দেখে, চোখে পড়ে বাম্বার তীরে গ্রিমারী···হলুদঃঙা ছোট্ট একটা ক্ষেতের মতন পড়ে আছে। সেই ছোট্ট ক্ষেতের একধারে, চোখে পড়ে কতকগুলো ঘর···সেই ঘর থেকে যে-আদেশ বেরোয়, সে আদেশ যতই কেন বিচিত্র হোক্ না, আশে-পাশের সমস্ত কালো লোকদের জীবন তাতে বাঁধা, সে-আদেশ মানতে তারা বাধ্য।

ঘন গাছের সারি ভেদ করে তার দৃষ্টি চ.ল যায় বাম্বার শীর্ণ রেখার ওপর, সেই রেখাকে অনুসরণ করে চলে তার দৃষ্টি। আঁকা-বাঁকা পথ দিয়ে বাম্বা চলেছে গ্রাম ছাড়িয়ে শূন্য মাঠের দিকে।

সেখান থেকে বিসিবিংগুই দেখতে পায়, সৈন্যরা কুচকাওয়াজ করছে। তাদের কুচকাওয়াজের শব্দে ছুটে পালায় সিবিবিসের দল, খরগোসের চেয়ে ছোট,

ইঁদুরের চেয়ে বড়। দল বেঁধে ছুটে পালাতে গিয়ে তারা পাথরে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে যায়, আবার উঠে ছুটতে আরম্ভ করে।

সৈন্যরা মার্চ করে এগিয়ে চলেছে। বাতাসে ভেসে আসে তাদের মার্চের সঙ্গীত। উঁচু থেকে সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তারা এগিয়ে চলেছে, কোসিগাম্বা ছাড়িয়ে…আরো দূরে, বহু দূরে এগিয়ে চলেছে…

বিসিবিংগুই অপেক্ষা করে আছে…হঠাৎ তার নজরে পড়ে, পাহাড়ের তলায় সরু আঁকা-বাঁকা পথের ওপর কে যেন একজন এসে দাঁড়ালো…স্ত্রীলোক…মুখে তামাকের পাইপ, মাথায় একটা চুবড়ী…স্ত্রীলোকটি এগিয়ে আসছে…

বিসিবিংগুই ক্রমশ আরো স্পষ্ট দেখতে পায়… চিনতে পারে…ইয়াসীগুইন্দজা।

আগের দিন ইয়াসীগুইন্দজার সঙ্গে বিসিবিংগুই-এর হঠাৎ এখানে দেখা-সাক্ষাৎ হয়ে যায়। তার ফলে ইয়াসী কথা দেয়, এইখানেই তার সঙ্গে গোপনে দেখা করবে এবং তার কথামত ঠিক নির্দিষ্ট সময়েই সে এসে হাজির হয়েছে।

দূর থেকে তার পোষাক দেখেই বিসিবিংগুই মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। প্রত্যেক মাসে আট দিন। এই সময়টা তাদের মেয়েরা পোষাকের মধ্যে একটা বিশেষ পরিবর্তনের চিহ্ন ধারণ করে। কপাল ঘিরে মাথায় বাঁধা থাকে একটা লাল সুতো; চুল থাকে এলোনো। এই আট দিন তারা চুলে চিরুনী দেয় না। প্রকৃতির নিষেধ বলে এই চিহ্নকে তারা সম্মান করতে জানে। সেই নিষেধের বিজ্ঞাপন ক্ষুব্ধ করে তোলে অপেক্ষমান বিসিবিংগুই-এর কামাতুর মন।

ইয়াসীগুইন্দজা কাছে এসে বসে। নীরবে বিসিবিংগুই তাকে অভ্যর্থনা জানায়।

আপাতত এখন তাদের ভয় করবার কিছুই নেই। গাঁয়ের প্রত্যেক লোক এখন শিকারে ব্যস্ত, উন্মত্ত। সব গাঁ খালি করে পুরুষ-নারী সবাই বেরিয়ে পড়েছে বনে-জঙ্গলে। ঘরে ঘরে শুধু পড়ে আছে যারা বৃদ্ধ, যারা রুগ্ন অশক্ত, যারা অন্ধ, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আর সদ্য প্রসূতা নারীরা…আর আছে গৃহপালিত ছাগল আর মুরগীর দল। কুকুরগুলোও যে-যার মনিবের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছে জঙ্গলে। সমস্ত গ্রাম নিস্তব্ধ।

বিসিবিংগুই পার্শ্বোপবিষ্ট নারীর দিকে তপ্ত আগ্রহে চেয়ে দেখে। মনে হয়, তার সারা দেহের মধ্যে যে-সব দড়ি আছে, যে নীল দড়ির ভেতর দিয়ে রক্তধারা ছুটে চলে, বাইরের এই সূর্যের আলো যেন সেই নীল দড়ির ভেতর ঢুকে পড়েছে, তার তপ্ত আলো সেখানকার রক্তধারাকে উত্তপ্ত করে তুলেছে।

বিসিবিংগুই মুগ্ধ-বিস্ময়ে ইয়াসীর দিকে চেয়ে থাকে। ইয়াসীও নীরবে তার বলিষ্ঠ দেহকে দৃষ্টি দিয়ে লেহন করে। সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ, পুরুষালি সৌন্দর্যে ভরা। দু'দিকে কাঁধ সুন্দর রেখায় উঁচু হয়ে আছে, বক্ষপেশী সুকঠিন মাংসে সমুন্নত, সরু কোমর, পেটের চিহ্ন নেই বলতে গেলে, তামার পাতের মতন পাতলা, দীর্ঘ দুটি পা, পাথরের মতন শক্ত, পরিপুষ্ট। সবাই জানে বনের নেকড়েকে সে দৌড়ে গিয়ে ধরে।

ইয়াসীগুইন্দজা আশে-পাশের অনেক মেয়েদের কথা জানে, যারা বিসিবিংগুই-এর আদরের জন্যে কত কান্নাকাটি করেছে, এমন কি তার কাছ থেকে কত অপমান আর কত নির্যাতন নীরবে সহ্য করেছে।

আপনার মনে ইয়াসী তার দুঃখের কাহিনী তাকে বলে চলে: "বাতোয়ালার বৃদ্ধ পিতার সেই আকস্মিক মৃত্যু নিয়ে গাঁয়ে রীতিমত পঞ্চায়েৎ বসে। ওঝারা এসে ঘোষণা করে, কোন দুষ্ট লোকের মারণ-ক্রিয়ার ফলেই বৃদ্ধ মারা গিয়েছে। সমাজের ভেতর এমন দুরভিসন্ধিওয়ালা কোন্ লোক আছে, তাকে খুঁজে বার করতে হবে। এই লোককে ধরবার জন্যে, তাদের নানা রকমের পরীক্ষা আছে। ইয়াসী বলে, হায়! বুড়ো ওঝা নাকি বলেছে, আমারই চক্রান্তে বাতোয়ালার বাবা মারা পড়েছে। আমিই তার ঘাড়ে চাপবার জন্যে ভূত পাঠিয়েছি। তাই আমাকে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করবার জন্যে নানান রকমের বিষ-পরীক্ষা দিতে হবে।"

কাতর ভাবে বিসিবিংগুই-এর হাত জড়িয়ে ধরে সে বলে, "বিসিবিংগুই, একমাত্র তুমি আমাকে বাঁচাতে পার! তুমি শক্তিমান! ওদের হাত থেকে তুমিই আমাকে বাঁচাতে পার! দোহাই তোমার, বাঁচাও আমাকে! বাঁচাও আমাকে বাতোয়ালার আক্রোশ থেকে…"

"ইতিমধ্যেই ওঝাদের পরীক্ষা সুরু হয়ে গিয়েছে। একটি পরীক্ষায় অবশ্য সে উত্তীর্ণ হয়েছে।"

"সেদিন তার সামনে ওঝারা মন্ত্র পড়ে একটা কালো মুরগীর ছানার গলা কেটে ছেড়ে দেয়। মুরগীর ছানাটা ছটফট করতে করতে, সৌভাগ্য বশত বাঁ দিকে এসে অসাড় হয়ে পড়ে রইলো। যদি ডান দিকে এসে পড়তো, ত' হলেই সাব্যস্ত হয়ে যেতো যে সে দোষী।"

"ওঝারা বললো, তা হলে ইয়াসীগুইন্দজা এ ব্যাপারে দোষী নয়…অন্য কোন লোকের কাজ।"

"কিন্তু গাঁয়ের বুড়োরা অত সহজে ওঝাদের কথায়

সায় দিলো না। তারা অনেক বচসা করার পর ঠিক করলো যে, এ পরীক্ষায় অনেক সময় ঠিক ঠিক ফল পাওয়া যায় না, সুতরাং ইয়াসীগুইন্দজাকে কঠিনতর পরীক্ষা দিতে হবে···তাকে বিষ-পরীক্ষা দিতে হবে···"

কাতর ভাবে সে এই সব কথা বিসিবিংগুইকে জানায়। বলে, "আমি অবশ্য এই বিষ-পরীক্ষা দিতে ভয় পাচ্ছি না। আমি জানি, এই বিষের প্রতিষেধক কি···সেটা আগে খেয়ে নিলে, তাদের দেওয়া বিষ আমার কিছুই করতে পারবে না। কিন্তু তাতেও তো তারা আমাকে রেহাই দেবে না! আমি জানি, তার পর তারা যে পরীক্ষা দিতে বলবে, তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। তারা আমার চোখে "লাচা" ঢেলে দিয়ে দেখবে, আমি দেখতে পাই কিনা। যদি দেখতে পাই, তাহলে আমি নির্দোষ আর যদি দেখতে না পাই, তা হলেই তারা আমাকে দোষী সাব্যস্ত করবে। আমি তো লাচার প্রতিষেধক কি জিনিস আছে, তা জানি না। কাজেই দুটি চোখ আমার একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। কিছুই দেখতে পাবো না। তখন তারা আমাকে দোষী সাব্যস্ত করে প্রহার করতে সুরু করবে, ঢিলিয়ে আমাকে মেরে ফেলবে। আমি জানি এক দল বুড়ো আমার ওপর ভীষণ রেগে আছে, তাদের কথামত আমি তাদের দেহ দিই নি; তারা সেই রাগের প্রতিশোধ এবার নেবে।"

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে সে আবার বলতে আরম্ভ করে, "জানো বিসিবিংগুই, তারা কি ভাবে আমাকে নির্যাতিত করবে? গরম ফুটন্ত জলে আমার হাত জোর করে ডুবিয়ে ধরে রাখবে···জলন্ত, টকটকে লাল লোহার শিক দিয়ে কোমরে গর্ত করে দেবে···উঃ! বিসিবিংগুই, কেউ আমার কাছে আসবে না, কাউকে আসতে দেবে না···ক্ষিদেয় আর তেষ্টায় ছটফট করতে করতে মারা যাবো! তারপর তারা বাতোয়ালার বুড়ো বাপকে যেখানে কবর দিয়েছে, সেখানে তার পাশেই মাটির ভেতর আমাকে পুঁতে রাখবে। তবেই নাকি সেই বুড়োর আত্মা তৃপ্ত হবে।"

সেই ভয়াবহ নির্যাতনের আশঙ্কায় সে কেঁপে ওঠে। বিসিবিংগুই-এর দুই হাত জড়িয়ে বলে, "বিসিবিংগুই, আমি তোমাকেই চাই! তুমি জান, কত দিন থেকে কি ভাবে আমি তোমাকে চাইছি···তোমাকেই শুধু চাই।"

হঠাৎ কি-যেন মনে পড়ে। চমকে ওঠে।

"জানো, তারা আমাকে সন্দেহ করে। তারা বুঝতে পেরেছে। তাই সদা-সর্বদা তারা লুকিয়ে আমার ওপর নজর রাখে। তোমারও ওপর নজর রেখেছে। হয়ত এই মুহূর্তে এই বনের ভেতর লুকিয়ে তারা আমাদের দেখছে! কিন্তু আমাদের দুজনের মাঝখানে তারা যে এই ভাবে বাধার বেড়া তৈরী করছে, তাতে কি তারা আমাদের আটকে রাখতে পারবে? জল জলের সঙ্গে মিশবেই। এই তো এতো গাঁ, তারা কি পেরেছে পাম্বা আর বাম্বার মিলনকে বাধা দিতে? সমস্ত বন, পাহাড়, জঙ্গলের বাধা এড়িয়ে নদীর জল ঠিক এসে মিশবে আর এক নদীর সঙ্গে···তুমি আমাকে কতখানি ভালবাস তা আমি জানি না, কিন্তু আমি বলছি তোমাকে, এই ক'দিন কেটে গেলেই আমি এসে মিলবো তোমার সঙ্গে। বিসিবিংগুই, তুমি আমার, তুমি আমার!"

বন্য নারীর অন্তরে দুরন্ত ঝর্ণার বেগে নেমে আসে কামনার ঢল। বাসনা আর বাঞ্ছিতের মাঝখানে কোন বাধাকেই সে স্বীকার করে না।

সেদিন মেঘে ঢাকা থাকায় দরুণ সূর্যের তেজ তেমন জোরালো ছিল না।

ইয়াসীগুইন্দজা তার প্রাণের সমস্ত গোপন আকুতি বিসিবিংগুই-এর কাছে নিবেদন করে সমর্থনের জন্যে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। কিন্তু সেখানে সমর্থনের চিহ্ন সে দেখতে পায় না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্ষুব্ধ অন্তরে বলে, "তাহলে তুমি সত্যি আমাকে ঘৃণা করো? কিন্তু আমি কি করবো? আমি যে নিরুপায়। স্ত্রীলোকের রক্তের ওপর ঐ আকাশের চাঁদ যে প্রভাব বিস্তার করে, তুমি তো জান না, তা রোধ করবার ক্ষমতা মেয়েদের নেই! তাই আমার সরল প্রাণের উচ্ছ্বাস শুনে হয়ত তুমি মনে মনে হাসছো··· কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি শুধু তোমাকেই ভালবাসি!"

তবু বিসিবিংগুই তার কথায় কোন সাড়া দেয় না। সহজ পথ ছেড়ে দিয়ে তখন নারী তার গোপন অস্ত্র প্রয়োগ করতে সুরু করে। সেখানে সব দেশেই তারা সমান।

ইয়াসীগুইন্দজা বলে, "বুঝেছি, বাতোয়ালার ভয় করছো তুমি!"

বিসিবিংগুই অট্টহাস্য করে ওঠে।

ইয়াসী বলে, "চল আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই···এই মুহূর্তে। তোমার কোন ভাবনা ভাবতে হবে না, আমি তোমার জন্যে নতুন ঘর তৈরী করবো, তোমার ঘর-দোর পরিষ্কার করে রাখবো···তোমার জন্যে মাঠে গিয়ে জমিতে চাষ করবো, তুমি খাবে বলে নিজের হাতে শস্য কেটে ঘরে নিয়ে আসবো। বিসিবিংগুই, অমন করে তুমি হেসো না। তুমি বুঝতে চেষ্টা কর্লে,

চাঁদের আলো যদি একবার আমাদের রক্তে এসে লাগে, আমরা অসহায় কতখানি। আমি কি করে নিজেকে ধরে রাখবো বলো? আমার রক্ত যে ভেতর থেকে আমাকে টেনে আনছে তোমার কাছে।"

বিসিবিংগুই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "হাঁ, যাবো।"

ইয়াসী বলে, "যাবো নয়, এক্ষুনি চলো ··তোমার ভয় কি? তুমি বাংগুই শহরে সেখানকার শাদা ক্যাপটেনের কাছে সোজা চলে যাবে···তোমার বয়স কম···মজবুত তোমার চেহারা ··এমন চেহারা কোন সৈনিকের নেই ·· হায় বিসিবিংগুই, তুমি বিশ্বাস করো, এমন চেহারা কারো নেই! একবার তুমি তুরুগু (সৈন্য) হলে আর তোমাকে কোন কালো আদমী ছুঁতে পারবে না, তোমার বিরুদ্ধে তখন কোন নালিশই টিকবে না, এমন কি বাতোয়ালারও নয়। দোহাই তোমার, আমাকে বাঁচাও। আমি কিছুতেই বিষ মুখে নিতে পারবো না, কিছুতেই পারবো না ফুটন্ত জলে হাত ডুবিয়ে মরতে। আমার যৌবন এখনো রয়েছে ভরা, আমি বাঁচতে চাই। আর বাঁচতেই যদি হয়, তাহলে যাকে আমার মন চায় তার সঙ্গে না থাকলে বাচারই বা কি মানে থাকে?"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আকাশের রঙ কখন ধীরে ধীরে বদলে এসেছে। সূর্যদেবের রক্ত-রাঙা নৌকা তখন দিগন্ত-রেখার পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ডুবে যাচ্ছে। চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে। ঠিক এমনি নিস্তব্ধতা প্রতিদিন মাত্র দুবার করে দেখা দেয়, একবার যখন সূর্য ওঠে, ঠিক তার আগে, আর একবার যখন সূর্য ডুবে যায়, ঠিক তার আগে।

বিসিবিংগুই উঠে দাঁড়ায়। সমস্ত দেহটাকে টেনে ঠিক করে নেয়। ইয়াসীর দিকে চেয়ে বলে, "তুমি যা বললে, তার একটা কথাও আমি অবিশ্বাস করি না। তবে আজ নয়, আমাকে একটু ভেবে দেখতে দাও! নাঙ্গাকোরার শপথ নিয়ে বলছি, আমি তোমার কথা ভুলবো না। যাবো, তোমাকে নিয়ে যাবো। তবে তার সময় এখনো আসে নি। শিকারের পর্ব শেষ হয়ে যাক। বাতোয়ালার সঙ্গে আমার বোঝা-পড়া বাকি আছে। তার মাঝখানে তুমি এসো না। শিকারের পর্ব শেষ হোক···তখন আমি ব্যাংগুই শহরে যাবো···নিশ্চয়ই যাবো ··আমার অনেক দিনের সাধ, আমি তুরুগু হবো···আপাতত তাই চললুম' এখন ইয়াসীগুইন্দজা·।"

ইয়াসীগুইন্দজা প্রার্থনা জানায়, "নির্বিঘ্ন হোক তোমার পথ।"

দাঁড়িয়ে দেখে, বিসিবিংগুই ধীরে ধীরে পাহাড়ের পথের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো। মাথার ঝুড়ি মাথায় তুলে নিয়ে ইয়াসীগুইন্দজা অন্য পথ ধরে নীচে নামতে সুরু করে।

তখন ধীরে ধীরে প্রান্তরভূমিকে ছেয়ে নেমে এসেছে ধুসর সন্ধ্যা···তারায়-ভরা সন্ধ্যা। বাতাসে আলগা দুলছে বন-ফুলের সুরভি। অন্ধকারের ফ্রেমে-আঁটা জলন্ত বনের লাল ছবি। আকাশে উঠেছে কাস্তের মত বাঁকা চাঁদ, এক ফালি আলো। কাছাকাছি গভীর ঘন নীলের অগাধ বিস্তারে দপ-দপ করে জলছে শুধু একটা তারা।

চারিদিকে প্রশান্ত সৌন্দর্য ··স্নিগ্ধ সুকোমল আলো ···দেখলেই মনে হয় এই পরিবেশের মধ্যে অন্যায়ের, অসুন্দরের, অমঙ্গলের যেন কোন স্থান নেই।

কিন্তু তার ভেতর থেকে মাঝে-মাঝে কানে এসে পৌঁছায় ডুগডুগীর আওয়াজ, লিংগার গুম্-গুম্ শব্দ··· মনে হয়, অন্ধকারে যেন আস্ফালন করছে কোন্ দুরন্ত প্রাণী ··মহা প্রশান্তির অন্তরে গুম্‌রে উঠছে চির দুর্বিনীত অশান্ত···

অষ্টম পরিচ্ছেদ

স্থানীয় কালো লোকদের কাছে তুরুগু হওয়ার একটা প্রবল আকর্ষণ থাকে। বিসিবিংগুই সেই আকর্ষণে মত্ত হয়ে উঠেছিল।

তারা বলে তুরুগু, শাদা লোকগুলো বলে মিলিটারী-ম্যান। সৈনিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমি পাবে রাইফেল, টোটা, চামড়ার বাকস্-ভর্তি টোট ··বুকের সঙ্গে থাকবে আঁটা···কোমরে ঝুলবে লম্বা একটা ছুরি···রীতিমত ধারালো ছুরি। পায়েতে উঠবে জুতো···রীতিমত শক্ত চকচকে চামড়ার জুতো ··কাঁধেতে থাকবে তামার তক্‌মা···তার ওপর, রীতিমত মাসে মাসে পাবে মাইনে।

প্রত্যেক রবিবার, ক্যাপটেন সবাইকে ডেকে বলে দেবে ছুটি, তখন সেই পোষাকে রাইফেল উঁচিয়ে গাঁয়ের ভেতর গিয়ে যখন ঢুকবে, চারদিক থেকে মেয়েরা আসবে ছুটে···ঘিরে দাঁড়াবে তোমাকে···সকলের দৃষ্টি থাকবে তোমার ওপর···শুধু তোমারই ওপর।

এ সব সুবিধে তো হাতে-হাতে সামনা-সামনিই পাওয়া যায়, তাছাড়া পেছন দিক থেকে আরো আছে

হাজার মজা। তুরুগু হলে তোমাকে আর ট্যাক্স দিতে হবে না, উল্‌টে তুমিই লোকের কাছ থেকে আদায় করে নিয়ে আসবে ট্যাক্স। তোমার খাতির কত?

যে-সব গাঁয়ের ট্যাক্স বাকি পড়বে, বাকি পড়বেই কোন না কোন গাঁয়ের, তোমারই ওপর হুকুম হবে তাদের জিনিসপত্র লুঠ করে নিয়ে আসবার···সেই সঙ্গে আশে-পাশে দু'-এক ঘর যারা হয়ত ট্যাক্স দিয়েছে, লুঠের হাত থেকে তারাও বাঁচবে না। লুঠের মাল কি সবই সরকারের সিন্দুকে যাবে? মোটেই না।

তুরুগুদের ওপরই ভার পড়বে রবার সংগ্রহ করে নিয়ে আসবার। তারাই জোগাড় করবে রবারের ঝুড়ি বইবার লোক! এই তো হলো তুরুগুদের কাজ। তাদের সঙ্গে গোপন খাতির রাখবার জন্যে বড় বড় সর্দাররা পর্যন্ত উপহার, বক্‌শিস নিয়ে ছুটে আসবে। কারুর সাধ্যি নেই তুরুগুদের চটায়। তা ছাড়া, তুরুগুদের মাথার ওপর যে শাদা সেনা-নায়ক থাকে, সে তাদের ভাষা জানে না। সেটা কম সুবিধে? তুরুগুরা যা বোঝাবে, শাদা ক্যাপটেনরা তাই শুনতে বাধ্য। সেটা কি কম সুবিধের কথা? ধর, তারা এসে ক্যাপটেনকে খবর দিলো, অমুক গাঁয়ের লোকেরা ভয়ানক অবাধ্য হয়েছে···যা হোক একটা গল্প বানিয়ে বলতে কি আর কষ্ট! ক্যাপটেন অক্ষরে অক্ষরে তাদের কথা বিশ্বাস করে, হুকুম দেয় গ্রেফ্‌তার করো! তখন তুরুগুরা রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে এবং গাঁকে-গাঁ গ্রেফ্‌তার করে নিয়ে আসে—ছাগল, মুরগী, মানুষ, ছেলেপুলে, স্ত্রীলোক সবশুদ্ধ গ্রেফ্‌তার করে নিয়ে আসে। এমন কি, যার যার গোলায় যা-কিছু শস্য মজুত থাকে, তাও বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে আসে।

বিচার হয়···অনেক সময় বিচারের ফলে গ্রেফ্‌তারী মাল নীলামে বিক্রী হয়ে যায়···মুরগী, ছাগল আর গমের দানার সঙ্গে নীলামে স্ত্রীলোক আর ছোট ছোট ছেলে-মেয়েও বিক্রী হয়ে যায়···সেই বিক্রয়-লব্ধ অর্থ ট্যাক্স হিসাবে সরকারী তহবিলে জমা পড়ে।

অনেক সময় গ্রেফ্‌তারী মুরগী আর ছাগল, তুরুগুরা নিজেদের মধ্যেই ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়। কেউ কেউ আবার সেই সব মুরগী আর ছাগল খোদ বড়-কর্তাকে উপহার হিসেবে পাঠিয়ে দেয়। বড়কর্তা এই সব প্রীতির নিদর্শন স্মরণ করে রাখেন প্রমোশন দেবার সময়।

সুতরাং তুরুগু হওয়ার প্রলোভন কালো নিগ্রোদের কাছে কম প্রবল নয়। তাই বিসিবিংগুই-ও মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল, সে-ও তুরুগু হবে···

অন্ধকার রাত্রির মধ্যে সেই কথা ভাবতে ভাবতে বিসিবিংগুই একা এগিয়ে চলে···

পিঠে ঝোলান ধনুক, তূণ-ভর্তি বাণ, হাতে লম্বা একটা বর্শা···আলাদা ভাবে তৈরী বিরাট বর্শা···একটার জায়গায় তিনটে ফলক। দুই কোমরে গোঁজা দুটো লম্বা ছোরা···ছুঁড়ে মারবার ছোরা। পিঠে ঝোলানো পেট-মোটা একটা থলে···খাবারে ভর্তি। বাঁ হাতের অপর দিকে চামড়ার তাগায় বাঁধা আর একটা ছোরা।

বিসিবিংগুই এগিয়ে চলে অন্তহীন ঘন অন্ধকারের ভেতর দিয়ে···শঙ্কাহীন শান্ত পদক্ষেপে, ধীরে। কিন্তু বিন্দুমাত্র শব্দ হলে চমকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, চোখ আর কান খাড়া হয়ে ওঠে তার। হাতে জ্বলন্ত একটা মশাল। কতক্ষণ এই ভাবে সে চলেছে? তার কোন আন্দাজ তার নিজেরই ছিল না। সময়কে ঘণ্টায়, মিনিটে, সেকেণ্ডে ভাগ করে দেখবার কায়দা তারা জানে না। সে কায়দা জানে একমাত্র শাদা মনিবেরা। তারাও আবার আন্দাজে তা জানতে পারে না। তার জন্যে তারা একটা ছোট বাক্‌সের মত যন্ত্র ব্যবহার করে, তার ভেতরে ছোট ছোট সূঁচের মত দুটো কি তিনটে করে কাঁটা থাকে, সেই কাঁটাগুলো নম্বর-দেওয়া ঘর ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে, তাই থেকে তারা নাকি বুঝতে পারে কতটা সময় কেটে গেল।

বিসিবিংগুই এগিয়ে চলে···সামনেই পড়ে একটা ছোট্ট গাঁ, কোসিগাম্বা কাগা, তার পাশে ছোট্ট একটা নদী বোবো, কত দিন এই নদীর জলে অনায়াসেই না সে সাঁতার কেটেছে। এসে পড়ে বড় রাস্তায়, সে-রাস্তা চলে গিয়েছে শান্ত্রীদের পাহারা-ঘরের দিকে; আরো একটু এগিয়ে এসে পড়ে পাঁচিল-ঘেরা একটা বিরাট জমিতে, সেখানে শাদারা তাদের মড়াদের কবর দেয়; ক্রমশ দেখা দেয় বাম্বা; বাম্বার ওপরে সাঁকো; সাঁকো পেরিয়ে কমাণ্ডারের ঘাঁটি···তার চারপাশে চাযের জমি, কমাণ্ডারের শাক-সব্জীর বাগান; তার একধারে একটা মস্ত বড় ছাউনি, যেখানে রবারের বেচা-কেনার সময় সর্দাররা আর তাদের লোকজন এসে জড় হয়।

আরো এগিয়ে যায়। পোম্বোর তীর ধরে এগিয়ে চলে। বাতোয়ালার গাঁয়ের পাশ দিয়ে এগিয়ে চলে, নির্জন মাঠের মাঝখানে একটা কুঁড়ে ঘর···সেইখানে গিয়ে থামে। সেই অঞ্চলের জেলে মাকুদে সেইখানে বাস করে, তারই কুঁড়ে ঘর।

মাকুদের কাছে সে জানতে পারে, বাতোয়ালা এখন কোথায় আছে। সেই সন্ধান নিয়ে সে আবার

বেরিয়ে পড়ে। বেরুবার মুখে মাকুদে তাকে সাবধান করে দেয়···কি এক মহা-অনর্থের সম্ভাবনা ইঙ্গিতে জানিয়ে দেয়। সেই ইঙ্গিতের অস্পষ্টতা থেকেই বিসিবিংগুই বুঝতে পারে, তার জীবন কতখানি বিপন্ন। বাতোয়ালা প্রতিহিংসার জন্যে ক্ষিপ্ত হায়েনার মতন ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আর বিলম্ব করা উচিত নয়। বাতোয়ালা কিছু করবার আগেই, তাকে তার কর্তব্য শেষ করে ফেলতে হবে। যত শীঘ্র সম্ভব।

সে নিমন্ত্রণ পেয়েছে, বিশেষ নিমন্ত্রণ বাতোয়ালার কাছ থেকে। একবার ভাবে, সে নিমন্ত্রণ যদি সে গ্রহণ না করে? তারপর ভাবে, যদি অনুপস্থিত থাকে, লোকে অন্য রকম ভাবতে পারে। নিমন্ত্রণ রক্ষা করতেই যদি যায়, তাতে কি যায়-আসে? সেখানে তার এমন কি বিপদ হবে? বাতোয়ালার আপনার লোকজনের মধ্যে বাতোয়ালার সামনা-সামনি হওয়া কি যুক্তিসঙ্গত? এক পা ভুল ফেললেই সব গোলমাল হয়ে যাবে।

হঠাৎ উত্তর দিক থেকে হাওয়া এসে গায়ে লাগে। শুভ লক্ষণ। বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসে মাদলের গুরু-গম্ভীর আওয়াজ···আগুনে-পোড়া কাঠ ফাটছে, তার শব্দ···শিংঘার ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি।

তাকে একটা যা হোক সিদ্ধান্ত করতে হবে। হয় মারতে হবে, নয় মরতে হবে। কিন্তু সে মারবে কি করে? কোথায়? কখন?

এগিয়ে চলে। মন্দ লাগে না! মাদলের আওয়াজ স্পষ্টতর হয়। একদল বাদুড় উড়ে চলে গেলো। প্যাঁচা ডাকছে। জোনাকীরা জ্বলছে। দূরে, সামনেই চোখে পড়ে আগুন। মাথার ওপরে আকাশ তারায় তারায় ভরা। শিশির পড়ছে। টুপ, টাপ, টুপ, টাপ।

চমৎকার! চমৎকার রাত্রি!

তা তো হলো, কিন্তু···কি সিদ্ধান্ত সে ঠিক করলো? আজকের রাত্রিতেই কি সে খুন হয়ে যাবে? না, না, তা হতে পারে না। চারদিকে সাক্ষী রেখে কেউ কাউকে খুন করে না।

সে কথা ঠিক। সে সম্বন্ধে আর কোন ভুল নেই। কিন্তু, তার নিজের দিক থেকে, বাতোয়ালাকে কি করে সে সাবাড় করবে?

হুঁ! একটুখানি বিষ, সেঁকো বিষ। খাবার সময় বাতোয়ালার খাদ্যে যদি মিশিয়ে দিতে পারে! অবশ্য অন্য পন্থাও নিতে পারে, নেকড়ে যে পন্থা নেয়, তার একটা আলাদা আকর্ষণও আছে। কিন্তু তাতে একটা অসুবিধা থেকে যায়, প্রমাণ থেকে যেতে পারে। কিন্তু সেঁকো বিষ···সোজা···কোন প্রমাণ থাকে না।

পাছে অন্ধকারে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগে, কিংবা কোন বড় নুড়িতে হোঁচট লাগে, তাই মাটির দিকে মাথা করে এগিয়ে চলে···

হাতের মশাল নিবে গিয়েছে···অন্ধকারে ফেলে দিয়েছে।

গাঁয়ের চারদিকে বনের শুকনো পাতা আর শুকনো ঝোপে তারা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। গোল হয়ে আগুনের শিখা ওপরের দিকে উঠছে। তার আঁচ এসে পড়ছে সামনের পথের ওপর।

সে শুধু ভাবে, একটি মাত্র চিন্তা, কি করে সে বাতোয়ালাকে বধ করবে! বধ তাকে করতেই হবে। অরণ্যের নিয়ম। নইলে তাকে নিহত হতে হবে।

অপেক্ষা করে থাকবে সুযোগের জন্য? না। সময় দেওয়া চলবে না। ইচ্ছে করে বাতোয়ালাকে ক্ষেপিয়ে দেবে? তাই করতে হবে। কিন্তু···কি করেই বা সেটা করা যায়? ভাবনার কথা।

কিন্তু মারতেই হবে। নইলে মরতে হবে। মরার চেয়ে মারা ঢের ভাল। এই অল্প বয়সে পরিপূর্ণ যৌবনের মধ্যে কে মরতে চায়? জীবনে আজও রয়েছে পরিপূর্ণ মধুর স্বাদ এবং নারীরা স্বেচ্ছায় সে-মাধুরীকে করে তোলে মোহনীয়। না, না, সে কিছুতেই মরবে না।

চারদিকে একবার চেয়ে দেখে। চারদিকে আগুন। গাঁ যেন মশালের মতন জ্বলছে।

সে সঙ্কল্প স্থির করে ফেলে, বাতোয়ালাকে সে হত্যা করবেই।

ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে! শিকারের সময়! শিকারের সময় দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। এ-রকম দুর্ঘটনা তো শিকারের সময় প্রায়ই হয়···তার জন্যে কে আর মাথা ঘামায়?

চমৎকার ব্যবস্থা! শিকারকে লক্ষ্য করে বাণ ছুঁড়ছি···বিষ-মাখা বাণ···লেগে গেলো একজন মানুষের গায়! ভবিতব্যতা। সব মানুষই যে তীর ছোঁড়ায় অভ্রান্ত হবে, এমন কোন কথা নেই! সকলের তাক সমান হতে পারে না! সবচেয়ে যে ভাল তীরন্দাজ, তারও তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায়! যায় না? তবে?

আর ঐ দাবানল!

প্রত্যেক বছরই কত হতভাগা এই বুনো আগুনে পুড়ে মরে! আগুনের তো কোন বিচারশক্তি নেই! তার খাদ্যাখাদ্য বিচারও নেই! মানুষ কি গাছ, কাকে

পোড়াচ্ছে সে কথা ভেবে দেখবার তার কোন প্রয়োজন নেই। বনের ভেতর হয়ত কেউ নেশায় ঘুমিয়ে পড়েছে···গভীর ঘুম···চারদিক থেকে আগুন এসে তাকে বেষ্টন করেছে···ব্যস্! আগুন কাউকেই রেহাই দেয় না। কিছুকেই নয়···একমাত্র শুধু জলকে···

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ালো কি? হয় একটা বুনো-আগুন, না হয়, শিকারের সময়।

কিসের যেন শব্দ হলো? সে থমকে দাঁড়ায়। সন্ধ্যার পর অন্ধকারে পথের প্রত্যেকটা বাঁক মারাত্মক··· প্রত্যেক বাঁকের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে মৃত্যু! সাবধান হতে দোষ কি? যার বুদ্ধি থাকে, সেই সাবধান হয়।

ইস্, একটা পিঁপড়ের ঢিপি! তার ডান দিকে সারি সারি আরো অনেক ঢিপি। তাহলে ডান দিকেই যেতে হবে। লক্ষণ!

কয়েক পা এগুতেই দেখে, কাঁধ বরাবর একটা গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়েছে, বাঁ দিকে···পায়ের কাছে একটা কাঠ, হাঁ, সেটাও বাঁ দিকে···একটা ঝোপ··· সেটাও বাঁ দিকে···তাহলে এবার বাঁ দিকেই যেতে হবে। অরণ্যের এই সব ইঙ্গিত জানা চাই। অরণ্য কথা বলে। সারা দিন ধরে বৃদ্ধা পিতামহীর মতন অরণ্য কত কথা বলে! শাদা লোকরা তার কিছুই জানে না। তারা মনে করে, অরণ্য বুঝি মৃত। কি ভুলই না তাদের!

মাথার ওপরে একটা পাখী ডেকে গেল···আকাশে আগুনের শিখা ডান দিকে হেলছে, না বাঁ দিকে হেলছে? গাছের শুকনো পাতা তোমার ডান দিকে পড়লো, না বাঁ দিকে পড়লো···গাছের দু'টো ডাল একটার ঘাড়ে আর একটা এসে পড়েছে···পথ চলতে একটা গাছের ডাল মাথায় এসে লাগলো···শুকনো পাতা উড়ে এসে পড়লো···এ-সবের প্রত্যেকের একটা করে আলাদা মানে আছে···যারা জানে, তারা বুঝতে পারে বনের এই মূক ভাষা। অরণ্য-ভরা কথা···জীবন্ত কথা! মা'র মতন স্নেহে তাই নির্বাক্ ভাষায় রাত্রি-দিন অরণ্য আমাদের সতর্ক করে দিচ্ছে···

বিসিবিংগুই পথ চলে আর ভাবে, কি করে, কখন, কোথায়, বাতোয়ালার সঙ্গে সে শেষ-মীমাংসা করবে।

ক্রমশ সে বাতোয়ালার আস্তানার কাছ-বরাবর এসে উপস্থিত হয়। কানে আসে কুকুরের ক্রুদ্ধ চীৎকার। চোখে পড়ে মশালের আলো। স্পষ্ট হয়ে ওঠে দুটো কণ্ঠ, সুরায় জড়িত। বাতোয়ালা আর তার বৃদ্ধা মা। কুকুরটা আর কেউ নয়, জুমা, বাতোয়ালার কুকুর।

বিসিবিংগুই-এর তন্দ্রা ভেঙে যায়। বুঝতে পারে, সে এসে পড়েছে।

কিন্তু মনের মধ্যে তখনও চলেছে সেই ভাবনা। দুটো প্রশ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, শিকারের সময় দুর্ঘটনা, না, বুনো আগুন? বাতোয়ালাকে হত্যা করবার জন্যে কোন্‌টির আশ্রয় সে নেবে?

কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে যায়, আঘাত করার চেয়ে, সেই মুহূর্তে, তার কাছে ঢের বেশী প্রয়োজনীয় আত্ম-রক্ষার ব্যবস্থার কথা ভাবা। চারদিক থেকে নানা রকমের লক্ষণ তাকে সতর্ক করে দিয়েছিল কিন্তু সে কোন লক্ষণকেই মানে নি, ভাবনার ঘোরে সে শত্রুর ডেরাব মধ্যেই এসে পড়েছে। হয়ত তার জন্যে তৈরী ফাঁদে সে নিজেই এসে পা দিয়েছে। সুতরাং এখন আত্মরক্ষার ব্যবস্থার কথাই ভাবা তার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ।

অচিরকালের মধ্যেই বিসিবিংগুই বুঝতে পারে, ঝোঁকের মাথায় কি নির্বুদ্ধিতার কাজই সে করে ফেলেছে! এ-রমক ভাবে বাতোয়ালার ডেরায় তার আসা উচিত হয় নি।

তার সামনে বাতোয়ালা, সুরায় উন্মত্ত হয়ে আছে। যে কোন আঘাতের জন্যে তৈরী। হয়ত তাকে বধ করবাব জন্যে যে ফাঁদ বাতোযালা পেতে রেখেছে, তার মধ্যে সে নিজেই এসে পড়েছে। এ-সব কথা আগে থাকতেই তার ভেবে দেখা উচিত ছিল। এখন ভাববার সময় নেই।

যদি সেইখানেই বাতোয়ালা তাকে হত্যা করে? সাক্ষী থেকে যাবে? কি করে? সাক্ষীর মধ্যে তো দুটি প্রাণী বাতোয়ালার বড়ো মা, আর তার কুকুর। কিন্তু সাক্ষী হিসাবে দুজনেই নিরর্থক। কোন মূল্য নেই তাদের অস্তিত্বের। কোন মা তার নিজের ছেলেকে ধরিয়ে দেয় না, যদি ছেলে তার বেজন্মা না হয়। আর জুমা? আজও পর্যন্ত কেউ কখনো শোনে নি যে, কুকুর কথা বলেছে। অতএব, তাদের দু'জনের থাকা আর না-থাকায় কিছুই যায়-আসে না।

অতএব বিসিবিংগুই, আজ রাত্রি তোমার জীবনের শেষ রাত্রি। স্পষ্ট করে দু'চোখ চেয়ে আশে-পাশের পৃথিবীকে ভাল করে দেখে নাও!

মাটির ওপরই বসে পড়লো। পাশে মাটিতেই বর্শাটি পুঁতে রাখলো, কোমর থেকে ছোরাটা আলগা করে নিলো।

অতিথি সৎকারে বাতোয়ালার ত্রুটী হয় না। বিসিবিংগুইকে খেতে দেয়। সঙ্গে দেয় ভুট্টা-দানার

বিয়ার। বিসিবিংগুই গ্রহণ করে না। খাদ্যও নয়, বিয়ারও নয়। প্রত্যাখ্যানে বাতোয়ালা অসন্তুষ্ট হয়… মুখ ভার করে থাকে। বিসিবিংগুই ইচ্ছে করেই তা লক্ষ্য করে না। যথাসম্ভব নিজেকে স্বাভাবিক দেখাবার চেষ্টা করে।

খাদ্য গ্রহণ না করবার অজুহাত দেখিয়ে সে বলে, আসবার সময় মাকুদের ওখান থেকে খেয়ে আসছি। এক-পেট ভরে খাইয়ে দিলো, আলু সেদ্ধ, পোড়া মাছ আর কেনে। জাগা-ভর্তি করে খেয়েছি। বিশ্বাস না হয়, টিপে দেখো। এক দানা খাবার যাবার আর জায়গা নেই। ফেটে পড়ছে।

পরিচিত লোক দেখে জুমা বিসিবিংগুই-এর কাছে আসে, জিভ দিয়ে পা চাটে। বিসিবিংগুই আদর করে তার গায়ে হাত বুলোয়। আনন্দে ধুলোয় গড়াগড়ি দিতে দিতে হর্ষধ্বনি করে ওঠে। ছুটে এসে খেলার ছলে বিসিবিংগুই-এর আঙুল কামড়ে ধরে, আবার ছুটে গিয়ে ধুলোয় গড়াগড়ি দেয়। ভেতরকার খবর সে কিছুই জানে না। বাইরে যেটুকু চোখে দেখে, সেইটুকুই তার সব।

কিন্তু, হাজার হোক, আর দশটা কুকুরের মত জুমা একটা কুকুর ছাড়া আর কিছু তো নয়! অর্থাৎ তাকে নিয়ে মেতে থাকবার কিছু নেই। কিছুক্ষণ পরেই বিরক্ত হয়ে ওঠে বিসিবিংগুই, কুকুরের খেলায় মন দেবার মতন অবস্থা তার নয়। লাথি মেরে জুমাকে তাড়িয়ে দেয়। দূরে দাঁড়িয়ে জুমা ভাবে, হঠাৎ এ আবার কি হলো?

ইতিমধ্যে বাতোয়ালা গ্লাসের পর গ্লাস পান করে নেশায় টইটম্বুর হয়ে উঠেছে। আপনার খেয়ালে নাচতে আরম্ভ করে দেয়। কয়েক পা নাচে আবার পান করে। আবার কয়েক পা নাচে। পূর্ণিমা রাতের প্রণয়-নাচের ছন্দ।

বাতোয়ালার ধারণা, সে নাচছে, ঠিক মতনই নাচছে। কিন্তু আসলে শুধু দাঁড়িয়ে টলতে থাকে, এ-দিকে ও-দিকে বিবশের মত শুধু অঙ্গ দোলায়। সমস্ত দেহ যেন সীসের মতন ভারি; জমাট হয়ে গিয়েছে মস্তিষ্ক; পা দুটো যেন দেহের ভার বইতে পারে না; চোখ ফেটে যেন রক্ত পড়বে এখুনি। হঠাৎ নাচতে নাচতে একটা কাঠে ঠোক্কর লেগে পড়ে যায়। সটান মাটিতে শুয়ে পড়ে।

জুমা দূরে থেকে মনিবের নাচ দেখছিল। হঠাৎ মনিবকে ধরাশায়ী হয়ে যেতে দেখে ছুটে তার কাছে চলে আসে। মনিবের অবশ দেহকে বেষ্টন করে ঘুরতে থাকে আর চীৎকার করে। তার ধারণা, তার মনিব তার সঙ্গে খেলা করছে। তার চীৎকারে হয়ত এখুনি আবার উঠে দাঁড়াবে।

সত্যিই বাতোয়ালা উঠে দাঁড়ায়। জড়িত কণ্ঠে বলে, "বহু…বহুকাল আগে একবার ঠিক এই রকম অবস্থায় পড়েছিল ইলিঙ্গো…"

আপনার খেয়ালে অট্টহাস্য করে ওঠে। আবার বলতে আরম্ভ করে, "ইলিঙ্গোকে চিনতে পারলে না, না? আচ্ছা দাঁড়াও, তার সম্বন্ধে সব কথা আমি বলছি। তুমি জান না তো? তবে শোন।

"যে সময়ের কথা বলছি, তখন, পৃথিবীতে আজকের মতন এত-সব ঘর-ঘাড়ী, দেশ-দেশান্তর কিছুই ছিল না…অনেক দিন আগে…শুধু ছিল মানুষ, অনেক দিন আগেকার মানুষ। কিন্তু একটা ছিল অসুবিধা, ভীষণ অসুবিধা। তখন ছিল ভয়ানক ঠাণ্ডা। সেই ঠাণ্ডার জন্যেই মানুষের মনে বড় অশান্তি ছিল। সে রকম ঠাণ্ডা না থাকলে, মানুষের আর কোন অসুবিধাই ছিল না। ঠাণ্ডায় হাত-পা অবশ হয়ে যেতো। প্রাণভয়ে মানুষ ঘুমোতে পর্যন্ত পারতো না। এই নিয়ে মানুষ রাত-দিন ওজর-আপত্তি করতে সুরু করে দিলো। সেই ওজর শুনতে শুনতে, আকাশে ছিল আইপু-চাঁদ, মানুষকে আশ্বাস দিলো, এই অশান্তির হাত থেকে সে মানুষকে বাঁচাবে। আইপু তার জন্যে ইলিঙ্গোকে ডেকে পাঠালো, এই ইলিঙ্গোরই আর একটা নাম হচ্ছে সেলাফু। ইলিঙ্গোর ওপর ভার দিলো, পৃথিবীতে গিয়ে মানুষকে আগুন ব্যবহার করতে শেখাতে। সেই কাজের ভার নিয়ে ইলিঙ্গো এলো পৃথিবীতে…দীর্ঘ তার কাহিনী…"

বাতোয়ালা বলতে সুরু করে সেই পুরাণ-কাহিনী—

বাতোয়ালা বলতে আরম্ভ করে সেই পুরাণ-কাহিনী, কি করে ইলিঙ্গো পৃথিবীতে নিয়ে এলো আগুন, মানুষকে শেখালো আগুনের ব্যবহার।

"আইপু মনস্থ করলো, পৃথিবীর মানুষের সেই হিম-যন্ত্রণা দূর করবার জন্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইলিঙ্গোকে সেখানে পাঠাবেন। তার জন্যে তিনি একটা লম্বা দড়ি ইলিঙ্গোর কোমরে বেঁধে পৃথিবীতে নামিয়ে দিলেন। দড়ির সঙ্গে একটা লিংঘা বেঁধে দিলেন; কাজ শেষ হয়ে গেলে যখন ইলিঙ্গো ফিরে আসতে চাইবে, তখন সেই লিংঘায় আওয়াজ করলেই আইপু জানতে পারবে। তখন আবার দড়ি ধরে তাকে ওপরে টেনে নেবে।

"ইলিঙ্গো পৃথিবীতে এসে মানুষকে শেখালো কি

করে আগুন ব্যবহার করতে হয়। মানুষ ক্রমশ জানতে পারলো যে, আগুনের আঁচে শুধু যে হিমই দূর হয় তা নয়, আগুনের আঁচে তাদের হাত-পা সুস্থ সবল হয়, আগুনের আঁচে তারা রান্না তৈরী করতে পারে, ঘরের অন্ধকার দূর করতে পারে।

"এই ভাবে ইলিঙ্গোর কাছ থেকে আগুনের ব্যবহার শিখতে শিখতে, পৃথিবীর মানুষ ইলিঙ্গোর প্রেমে পড়ে গেলো। তারা বুঝলো, তার এতন বন্ধু তাদের আর কেউ নেই। যা-কিছু তারা বুঝতে পারে না, যা-কিছু তাদের কাছে রহস্যময় জটিল বোধ হয়, ইলিঙ্গোকে জিজ্ঞাসা করে। ইলিঙ্গো তার জবাব দেয়।

"একটা জিনিস পৃথিবীর মানুষকে সব চেয়ে ভাবিয়ে তুলেছিল। তারা প্রায়ই দেখতো, তাদের আশে-পাশে যে সব জন্তু ঘুরতো-ফিরতো, হঠাৎ একদিন তারা অবশ হয়ে শুয়ে পড়তো, আর উঠতো না। ক্রমশ তাদের সামনে থেকে তারা একেবারে অদৃশ্য হয়ে যেতো। কোথায় যায় এই সব জন্তু অদৃশ্য হয়ে? কেন যায়? এ প্রশ্নের কোন উত্তরই তারা খুঁজে পায় না। তার জন্যে একটা অনিশ্চিত ভয় তাদের দেহের ভেতর তাদের স্নায়ুর সঙ্গে তাদের পাক-যন্ত্রের সঙ্গে যেন জড়িয়ে যায়। সেই যে জন্তুটা ঘুরছিল ফিরছিল ডাকছিল, সে কেন হঠাৎ এই রকম চুপ হয়ে গেলো? তখন তাদের যতই ডাকো, তারা আর সাড়া দেয় না। তখন তাদের যতই আদর করো, তারা আর নড়ে না, চড়ে না। যতই কেন তাদের খোসামোদ করো, তারা আর কোন উচ্চবাচ্য করে না। পড়ে থাকে অনড় অচল, শব্দহীন, স্থির। মাছিরা এসে তাদের নাকের ফাঁকের ভেতর দিয়ে ঢুকে পড়ে। কোন প্রতিবাদ করে না। তারপর দেখতে দেখতে একদিন গলে পচে যায়। পোকা-মাকড় আর মাছি কিলকিল করে সেই পচা দেহের ওপর। কেন এমন হয়? কোন উত্তর না পেয়ে একটা আতঙ্ক তাদের পেয়ে বসে। তারা সকলে মিলে ইলিঙ্গোকে চেপে ধরে, এ রহস্যের সমাধান তাকে করে দিতেই হবে। সে অনেক বিষয় জানে। নিশ্চয় এ বিষয়ও তার জানা আছে। উত্তর দিয়ে মানুষের এই আতঙ্ক তাকে দূর করতেই হবে। কিন্তু ভীত-সন্ত্রস্ত এই মানুষদের এই প্রশ্নের কি উত্তর দেবে তা ইলিঙ্গো ঠিক করে উঠতে পারে না। বলে, আমার রাণী আইপুকে জিজ্ঞাসা করে এসে তোমাদের বলবো।

"এই স্থির করে ইলিঙ্গো আবার আইপুর কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়। বলে, 'একটা ব্যাপার নিয়ে বড়ই মুশকিলে পড়েছি। পৃথিবীর মানুষরা একটা সমস্যা নিয়ে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছে। তারা মৃত্যুকে ভয় করে। তারা জানতে চায়, পশু-পাখীরা যেমন মৃত্যুর অধীন, মানুষও কি তেমনি মৃত্যুর অধীন?'

"আইপু বলে, 'তুমি ফিরে গিয়ে পৃথিবীর মানুষদের জানাও, এতে ভীত হবার কিছু নেই। আমি আমার দেহ থেকেই তাদের তৈরী করেছি। আমিও মৃত্যুর অধীন। তবে আমি আবার জন্মগ্রহণ করি। প্রত্যেক মৃত্যুর আট রাত্রি পর আমি আবার জন্মগ্রহণ করি। তাই মৃত্যুতে আমি অদৃশ্য হয়ে যাই বটে; তবে আবার নবজন্ম নিয়ে ফিরে আসি। মানুষদের জানিয়ে দিও আমার এই কথা। তারা যেন ভোলে না এই কথা। যাতে তারা আমার এই কথায় বিশ্বাস অর্জন করতে পারে, তার জন্যে আজ থেকে তোমাকে মানুষদের মধ্যে গিয়েই বাস করতে হবে।'

"সেই কথা বলে আইপু আবার সেই লিংঘা-গুচ্ছ দড়ি ঝুলিয়ে দিয়ে ইলিঙ্গোকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেয়।

"দু'হাত দিয়ে দড়িটা বেশ শক্ত করে ইলিঙ্গো ধরে থাকে। নামবার সময় নানান্ রকমের চিন্তায় তার মন এমন ভরে থাকে যে, এক সময় তার ধারণা হয় যে সে মাটিতে পৌঁছে গিয়েছে। সেই জন্যে অন্যমনস্ক ভাবে দড়ি ছেড়ে দেয়। তৎক্ষণাৎ সে শূন্য থেকে সজোরে এসে মাটিতে পড়লো এবং সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলো। সেই দিন থেকে পৃথিবীতে অন্য সব জীব-জন্তুর মতন মানুষও মরতে লাগলো। সেই দিন থেকে যে মানুষ জন্মায়, সে মানুষই আবার মরে যায়। মৃত্যুর হাত থেকে কারুরই রেহাই নেই।"

বিসিবিংগুই একমনে বাতোয়ালার কথা শোনে। এই গল্প কেন আজ বাতোয়ালা তাকে শোনালো? সে কি এই গল্পের ভেতর দিয়ে আসন্ন মৃত্যুর কথাই ইঙ্গিত করছে? মনে তার ঘোরতর সন্দেহ জেগে ওঠে। হয়ত কয়েক মুহূর্ত পরেই তার জীবন শেষ হয়ে যাবে। হয়ত বাতোয়ালা তার সব আয়োজনই করে রেখেছে।

কিন্তু বিসিবিংগুই-এর মনে আর এক পুরাণ-কাহিনী জেগে ওঠে। আর এক জাতের পুরাণ-কাহিনী। বাতোয়ালাকে প্রতিবাদ করে সে বলে, "তুমি বললে, আইপুর আদেশেই ইলিঙ্গো এসেছিল পৃথিবীর মানুষকে আগুনের ব্যবহার শেখাতে? কিন্তু নিয়োনুবাঙ্গুই নদীর ধারে যে-সব জাতের লোক বাস করে তারা অন্য কথা বলে। তারা বলে, এই তোমার কুকুর, তোমার জুমার পূর্বপুরুষরাই নাকি পৃথিবীতে প্রথম আগুন নিয়ে এসেছিল।

"শোন তাহলে, আমি বলছি সে-কাহিনী। "বহু... বহুদিন আগেকার কথা। পৃথিবীতে প্রথম যে কুকুর জন্মেছিল, সে একদিন খেলা করছিল, পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁড়ছিল। খেলার ছলে, এই ভাবে সে রীতিমত একটা গর্ত খুঁড়ে ফেলেছিল। হঠাৎ কিছুক্ষণ পরে খুঁড়তে খুঁড়তে সে যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠলো। একটা পা তার জখম হয়ে গেল। সেই পাটা উঁচু করে সে যন্ত্রণায় ডাকাতে লাগলো। সেই অবস্থায় তার মনিবের সামনে গিয়ে সে চীৎকার করতে লাগলো এবং মনিবকে টেনে সেই গর্তের কাছে নিয়ে এলো। গর্তের কাছে এসে মনিব দেখে, গর্তের ভেতরে কি যেন জ্বলছে! হাত দিয়ে দেখতে গিয়ে, তার হাতটাও পুড়ে গেলো। সেই মানুষ সর্বপ্রথম আগুনের সন্ধান পেলো।"

বিসিবিংগুই বলে, "ওদের দেশে নদীতে যে-সব বুড়ো মাঝি চলা-ফেরা করে, তাদের কাছে এই গল্প সে শুনেছে।"

বাতোয়ালা সে-কাহিনীকে স্বীকার করতে পারলো না। বলে, "তুমি নিয়োন্‌বাঙ্গুই নদীর ধারে যে জাতের লোকদের কথা বলছো, তাদের আমি বেশ ভাল করেই চিনি...তারা হলো মিথ্যাবাদী। তাদের পুরাণ হলো মিথ্যার ঝুড়ি। অবিশ্বাস্য।"

সুরু হয়ে যায়, দু'জনার তুমুল তর্ক।

বাতোয়ালা আর বিসিবিংগুই, দু'জনেই অন্তরের আসল কথা চাপা দিয়ে, জাতির পুরাণের গল্প নিয়ে বচসা করতে সুরু করে দেয়। বাতোয়ালা দেখতে চায়, যেহেতু সে সর্দার, সেহেতু জাতির পুরাণ ব্যাখ্যা করবার অধিকার তারই বেশী এবং তার পিতার কাছ থেকে বংশ-পরম্পরায় সে এই-সব জ্ঞান অর্জন করেছে। এই সব জ্ঞান বাইরে থেকে পাবার কোন উপায় নেই। প্রত্যেক বংশের কর্তার কাছে এই জ্ঞান থাকে। তার মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী তার জমি-জমার সঙ্গে সঙ্গে এই-সব জ্ঞানেরও উত্তরাধিকার পেয়ে থাকে। সেই জন্যে তাদের মধ্যে বংশ-মর্যাদার এতখানি মূল্য।

বিসিবিংগুই জানে, সে আজ এসে পড়েছে বাতোয়ালার ফাঁদের মধ্যে। তাকে হত্যা করে প্রতিশোধ নেবার যে বাসনা বাতোয়ালার মনে জেগেছে, বাইরে তার কোন লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে না উঠলেও, বিসিবিংগুই জানে, সে-প্রতিশোধের বহ্নি বাতোয়ালার অন্তরে তেমনি জ্বলছে। তাদের মনে একবার যে জিঘাংসা জাগে, রক্ত না দেখার আগে তা আর প্রশমিত হয় না। বাতোয়ালার কাহিনী সে অন্যমনস্ক ভাবে শুনে চলে কিন্তু তার মনের ভেতর একটি কথাই শুধু বড় হয়ে থাকে, আজ রাত্রির শেষে প্রভাত-সূর্যকে কে দেখবে? সে, না বাতোয়ালা?

বিসিবিংগুই-এর কাহিনীর প্রতিবাদ করে বাতোয়ালা বলে, "তুমি যে ইয়াকোমাদের কথা বলছো, তারা একটা নিরেট মূর্খ জাত...তারা এই-সব পুরাণ-কাহিনীর কিছুই জানে না। আমার কাছ থেকে তার সত্য বিবরণ শুনতে পাবে। আমি এইমাত্র যে ইলিঙ্গোর কাহিনী বললাম, জেনে রেখো সেই কাহিনীই হলো সত্য। পৃথিবীতে আজ মানুষ যে আগুন ব্যবহার করছে, তা একমাত্র ইলিঙ্গোর জন্যেই সম্ভব হয়েছে। তা ছাড়া, এ-কথা বোধ হয় তুমি জান না যে, এই যে আমাদের সব গ্রাম, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত সে-সবই সেই ইলিঙ্গোর কীর্তি।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বাতোয়ালা বলে ওঠে, "বিসিবিংগুই, যতটুকু তোমার জানা দরকার, তার বেশী জানতে চেষ্টা করো না। আর এ-কথা মনে রেখো, তুমি যতটুকু জান, আমি তার চেয়ে ঢের বেশী জানি... সেই সঙ্গে একথাও তোমাকে জানানো দরকার, যতটুকু জানলে তোমার কোন ক্ষতি হবে না, তুমি তার চেয়ে অনেক বেশী জেনে ফেলেছ...সেটা ভাল নয়।"

বিসিবিংগুই চমকে ওঠে। এ কথাগুলোর মধ্যে সে যেন স্পষ্ট একটা আঘাতের সম্ভাবনার সুর শুনতে পায়। চারদিকে চেয়ে দেখে, সে একা। এ অবস্থায় বাতোয়ালাকে প্রতিবাদ করা তার পক্ষে উচিত হবে না। তাদের জাতের পুরাণ-কাহিনী বাতোয়ালা একাই কি সব জানে? বাতোয়ালার ভুল ধারণা। দম্ভ! বাতোয়ালার চেয়ে ঢের বেশী কাহিনী সে জানে। কিন্তু এখন সে-কথা উত্থাপন করা ঠিক হবে না। হয়ত এই পথ ধরেই বাতোয়ালা তার সঙ্গে ঝগড়া বাধাতে চায়। আজ, এই নির্জন নিশুতি রাতে, সে একলা...কিছুতেই আজ সে বাতোয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করবে না...কাল, শিকারের সময়...

হঠাৎ জুমা চীৎকার করে উঠলো...যেন অন্ধকারে কি দেখতে পেয়েছে! ছুটে খানিকটা দূর এগিয়ে যায়, আবার চীৎকার করতে করতে ফিরে আসে। বিসিবিংগুই চেয়ে দেখে, অন্ধকারের ভেতর থেকে একদল লোক আসছে। পথিক...হয়ত পথ ভুলে গিয়েছে...তাদেরই স্বজাত...

হঠাৎ অন্ধকারের গহ্বর থেকে সেই লোকগুলোকে আসতে দেখে, বিসিবিংগুই হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। এমন করে মানুষের সঙ্গ সে আর কোন দিন কামনা করে নি।

তাড়াতাড়ি উঠে লোকগুলোকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসে। নতুন করে একটা আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে তার চারপাশে গোল হয়ে তারা বসে।

আগুনের আঁচে বিসিবিংগুই লক্ষ্য করে, বাতোয়ালার চোখ দুটো যেন বাঘের চোখের মতন জ্বলছে। জ্বলুক …আজ আর তার ভয় নেই! আজকের রাত সে বেঁচে থাকবে…তারপর কাল দেখা যাবে; পৃথিবীতে কে বেঁচে থাকে, বাতোয়ালা না সে!

বাতোয়ালা আবার গল্প বলতে আরম্ভ করে। আকাশের গায়ে তখন অসংখ্য তারা ফুটে উঠেছে। সেই দিকে চেয়ে বাতোয়ালা বলে, "এই যে আমার মাথার ওপরে রূপোর টাকার মতন অসংখ্য 'আম্‌বি রেপি' জ্বলছে…মনে হচ্ছে যেন অসংখ্য চোখ পিট্‌-পিট্‌ করছে, ওগুলো আসলে কি, তা জানো? ওগুলো আসলে হচ্ছে, আকাশের গায়ে অসংখ্য ছেঁদা, সেই সব ছেঁদা দিয়ে বৃষ্টির দিনে পৃথিবীতে বৃষ্টি পড়ে!"

প্রতিবাদ করতে গিয়ে বিসিবিংগুই আবার থেমে যায়। বাতোয়ালা নিজের জ্ঞান জাহির করবার জন্যে বলতে আরম্ভ করে, "আমাদের পূর্ব-পুরুষরা জানতেন কি করে বৃষ্টিকে ডেকে আনতে পারা যায়। বিশেষ করে চাষ-বাসের মাসে, যে বছরে বৃষ্টি হতো না সে বছরে তাঁরা মন্তর পড়ে আকাশ থেকে বৃষ্টি টেনে আনতেন। মাঠের ওপর একটা মাটির সরায় মুঠো-মুঠো নুন রেখে তারা আম্‌বি রেপিদের মন্তর পড়ে নেমন্তন্ন করতো। সেই মন্তর-পড়া নুনের লোভে দেখতে দেখতে আকাশ থেকে বৃষ্টি ঝরে পড়তো। আজকাল আমরা সে-সব মন্ত্র ভুলে গিয়েছি। এই সব নোংরা শাদা লোকগুলোর সংস্পর্শে এসে আমরা আমাদের পুরানো সব বিদ্যা ভুলে যাচ্ছি। এই বিসিবিংগুই-এর মতন যারা আজকাল-কার ছোকরা, তারা নিজেদের জাতের ধর্ম-কর্ম ভুলে শাদা লোকদের অনুকরণ করতে ছুটছে…সমস্ত জাতটাকে মেরে ফেলছে…"

বিসিবিংগুই হঠাৎ যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। মাটিতে শোয়ান বর্শাটার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে, তার চারদিকে লোক। এত লোককে সাক্ষী রেখে, কোন কিছু করা ঠিক নয়। সে নিজেকে আবার সংযত করে নেয়। রাতটা শেষ হোক্!

নবম পরিচ্ছেদ

বনের ভেতর দুধারে ঘন-ঝোপ, তার মধ্যে দিয়ে সরু পথ। ঠাণ্ডা, শিশির-ভেজা। চারদিক থেকে উঠছে একটা ভিজে মিষ্টি গন্ধ…বুনো লতার গন্ধ… পায়ের চাপে নরম কচি ঘাসের গন্ধ। পাতায় পাতায় শিহরণ জাগিয়ে দ্রুত বয়ে চলেছে বাতাস। বাইরে প্রান্তরে বিন্দু-বিন্দু গলে পড়ছে কুয়াশা…টুপ-টাপ। উদয়-সূর্যের দিকে চেয়ে জেগে উঠছে ছোট ছোট গ্রামগুলি, জেগে উঠছে তাদের ঘিরে ঘুমিয়েছিল যে-সব ছোট ছোট পাহাড়। প্রভাত এসেছে।

একটু একটু করে দেখা দেয় ধোঁয়া…আসে-যায় টুকরো টুকরো শব্দ…কে কাকে ডাকছে, বাতাসে আসে তার ছেঁড়া-ছেঁড়া আওয়াজ…সে আওয়াজ বহন করে আনে জেগে-ওঠার সংবাদ…প্রভাত!

বনেতে জেগে উঠেছে হরেক রকমের পশু… ঝোপের আড়ালে আড়ালে ঘুরছে খাদ্যের অন্বেষণে… ভক্ষিত হবার ভয়ে আবার কেউ কেউ ঢুকেছে যে-যার গর্তে…সেখানে অপেক্ষা করে থাকবে রাত্রির অন্ধকারের জন্যে। মানুষের রাত্রি এলে, আসবে তাদের জেগে-ওঠার লগ্ন…তখন তারা আবার বেরুবে খাদ্যের অন্বেষণে। খাদ্য আর খাদক…অরণ্যে আছে শুধু এই একটি সম্পর্ক।

এমন দিনে কালো নিগ্রোর দল যে-যার অস্ত্র হাতে বেরিয়ে পড়ে অরণ্যে শিকারের খোঁজে। অরণ্যের মধ্যে তারা হয়ে যায় অরণ্যের সামিল। তারা জানে, শিকার খোঁজাই হলো শিকারের আনন্দ। যারা বীর, তাদের একমাত্র খেলা। বনের পশু আর গাঁয়ের মানুষের লড়াই…যার শক্তি বেশী সে থাকবে বেঁচে।

বিপদ? প্রচুর আছে বিপদ। বিপদ আছে বলেই শিকারের এত দাম। যুদ্ধ করবার আগে তাই শিখতে হয় শিকার করতে; যুদ্ধের জন্য তৈরী হতে হলে, আগে হতে হবে শিকারী। এই অরণ্যে দুরন্ত বুনো পশুর সঙ্গে সামনা-সামনি লড়াই-এ মানুষ শেখে আত্মরক্ষার হাজার রকম কায়দা, শেখে ধৈর্য, পায় সাহস, আঘাত দেবার আর আঘাত নেবার অভ্যাস।

বনের পথে ভিজে ঘাস মাড়িয়ে চলেছে বিসিবিংগুই আর বাতোয়ালা। শিকারে। তাদের মনের মধ্যে চলেছে তখন আর এক শিকারের তাগাদা। কে আজ কাকে করবে শিকার!

প্রতিহিংসা আগুন, যে-আগুন নেবে না কোন জলে। তাকে নেবাতে হলে, দরকার রক্তের। নইলে

সে-আগুন তোমাকেই দেবে জালিয়ে ছাই করে। মনের ভেতর সেই জলন্ত আগুনের শিখা নিয়ে তারা আজ চলেছে শিকারে।

এক জন চলেছে এগিয়ে, আর এক জন চলেছে তার পেছনে। তার পেছনে চলেছে জুমা।

মাঝে-মাঝে চলতে চলতে তাদের সঙ্গে দেখা হয় অন্য সব শিকারী-দলের। বাতোয়ালাকে দেখে সর্দার বলে তারা অভিবাদন জানায়। অপেক্ষা করে থাকবার সময় নেই। সামনে ঝোপে কোথায় ওঠে একটা ঘস্-ঘস্ শব্দ···কান খাড়া করে তারা সেই দিকে ছোটে। সবাই এগিয়ে চলেছে বনের বুকের দিকে, বন্য-পশুদের আড্ডার দিকে। সেখানে সকলে একত্র হয়ে ব্যবস্থা ঠিক করে নেয়। এক এক দলের ওপর এক এক রকম কাজের ভার পড়ে। কেউ রাখে লক্ষ্য, কেউ মাটিতে খুঁজে বার করে বুনো জন্তুদের পায়ের দাগ, কারুর ওপর ভার পড়ে আগুন জ্বালাবার। খুব অল্প লোকই আসল শিকারে নিযুক্ত হয়···উদ্যত বর্শা-হাতে বুনো বাঘকে তাড়া করে ছোটে।

দিন বেড়ে ওঠে। নানা দিক্ থেকে, নানা পথ বেয়ে তারা এসে জড় হয় নদীর ধারে। নদীর ওপারে আসল জঙ্গল। সেই জঙ্গলে সুরু হবে শিকারের খেলা।

তার আগে, তারা নদীর ধারে সকলে একত্র হয়ে বসে। শিকারের দিন হলো উৎসবের দিন। প্রত্যেকের সঙ্গে কিছু-না-কিছু খাদ্য থাকে। শিকারে ছোটবার আগে, তারা দেহকে সবল করে নেয়। সকলে মিলে গোল হয়ে খেতে বসে। খাবার সময় হয় মজাদার সব গল্প। শিকারের গল্প। পূর্ব-অভিজ্ঞতার গল্প। বুনো-জন্তুদের রীতি-নীতি, অভ্যাসের নানান্ রকম গল্প···

"লোকের ভুল ধারণা যে বামারা-রা সিংহ, দল বেঁধে শিকারের খোঁজে বেরোয়···"

"অবিশ্যি, সিংহ আর সিংহিনী স্বামি-স্ত্রীতে এক সঙ্গেই অনেক সময় শিকারের সন্ধানে বেরোয়। তবে সিংহিনী যখন বাচ্ছা প্রসব করে তখন আর সে শিকারে বেরোতে পারে না···নিজের ঘরে তখন সে বাচ্ছাদের নিয়ে স্তন্যদান করে, স্বামীর ওপর ভার পড়ে সংসারের জন্যে মাংস শিকার করে নিয়ে আসবার।"

"তবে সিংহিনীও ছেলেপুলে নিয়ে খুব বেশী দিন আটক পড়ে থাকে না। যেই দেখলো বাচ্ছারা মজবুত হয়ে উঠেছে, তখনি স্বামি-স্ত্রী বাচ্ছাদের ডেকে নিয়ে সোজা বনের পথ দেখিয়ে দেয়। বাচ্ছারা তখন বাপ-মার কথা ভুলে বনের মধ্যে নিজেদের পথ নিজেরাই করে নিতে বেরিয়ে পড়ে। স্বামি-স্ত্রীতে পাশাপাশি একসঙ্গে আবার তারা তখন শিকার করতে বেরোয়।"

"কারুর কারুর ধারণা যে, শিকারের সময় সিংহ গর্জন করে। ভুল! সম্পূর্ণ ভুল ধারণা! আরে, একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে, তুমি যখন বর্শা-হাতে হরিণের পেছনে ছোট, তখন কি তত শব্দ করো? যত চুপি-চুপি যেতে পার তত ভাল। তবে সিংহ কেন গর্জন করবে? সে কি এমন মূর্খ যে, আগে থাকতে গর্জন করে, সমস্ত পশুদের আগে থাকতে সতর্ক করে দেবে? তা কি কখনো কেউ করে? তবে, হাঁ, সিংহ গর্জন করে, কখন? যখন তার আনন্দ হয়। যখন নিহত পশুর বুক চিরে সমস্ত থাবা রক্তরাঙা করে তোলে, তখন আনন্দে সিংহ গর্জন করে ওঠে!"

শিকার আরম্ভ হবার আগে নদীর ধারে সকলে একত্র জটলা করে বসে। খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে চলে গাল-গল্প। শিকারের গল্প।

ক্রমশ মাথার ওপরে সূর্য ঠিক মাঝ-আকাশে এসে পৌঁছায়। এমন সময় বনের চারদিক থেকে ওঠে গুর্-গুর্ গুম্-গুম্ আওয়াজ। বাজনদাররা সুরু করে তাদের কাজ। বাজনার শব্দে বনের পশুদের বিভ্রান্ত করে তোলা হলো তাদের কাজ।

কিছুক্ষণ পরেই নদীর ওপারে বনের ধার থেকে ওঠে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। সারা বনকে বেড়ে তারা শুকনো ঝোপে লাগিয়ে দেয় আগুন।

এমন সময় দূর থেকে ভেসে আসে বাতাসে অসংখ্য কণ্ঠে আওয়াজ, ইয়াহো!

ইয়াহো! শিকার আরম্ভের সংকেত।

সেই শব্দ, সেই বাজনা, আর সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলী জানিয়ে দেয়, শিকারের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত।

ইয়াহো! নদী পেরিয়ে বর্শা-হাতে ছুটে চলে আসল শিকারীর দল। রোদে ঝিক্‌মিক্ করে ওঠে কোমরের ছোরা।

ইয়াহো! তৈরী হয়েছে বন···হয়েছে সময়··· এইবার শিকারের পেছনে যে-পারে সে ছুটবে···সমস্ত অরণ্য এখন মুক্ত শিকারীদের জন্যে···যার হাতের বর্শায় আছে জোর···শিকার তার।

দেখতে দেখতে সমস্ত বনকে ঘিরে কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠে ধোঁয়া···ধোঁয়ার রঙ একটু একটু করে হয়ে আসে ফিকে···তারপর লক্-লক্ করে হাজার জিহ্বায় জলে ওঠে দাবানল···সমস্ত বনকে ঘিরে জলে ওঠে অগ্নি-বলয়···যে অগ্নির আতঙ্কে পশুরা বিবর ছেড়ে ছুটতে আরম্ভ করে···দগ্ধ হয়ে যায় সাপেরা···ঝোপের অন্ধকার

থেকে বেরিয়ে পড়ে শাবকদের নিয়ে সিংহিনী···পুড়ে ছাই হয়ে যায় লতা-গুল্ম, তৃণ-কণ্টক।

এই আগুন না হলে হয় না শিকারের উৎসব। শিকারকে উপলক্ষ্য করে অরণ্যকে দগ্ধ করার মধ্যে শুধু যে পশুদের আতঙ্কিত করাই উদ্দেশ্য, তা নয়; এর সঙ্গে সংযুক্ত আদিম অরণ্যবাসীদের জীবন-যাত্রা-চক্র। এই ভাবে অরণ্যকে দগ্ধ করে আগুন মাটিকে করে উর্বর, দগ্ধ লতা-গুল্মের ভস্মে মাটি পায় তার প্রয়োজনীয় আহার্য। শিকারের উৎসবের পরেই আসে জমি-চষার উৎসব। দগ্ধ মাটির ওপর চলে হলকর্ষণ। জন্মায় শস্য। এই ভাবে শিকারের এই বার্ষিক উৎসবের সঙ্গে গাঁথা তাদের জীবন-যাত্রা-চক্র।

তাই আগুন হলো এই অরণ্যচারী মানুষদের বন্ধু। তাদের শিকারের সহায়, সঙ্গী। তাদের অন্নদাতা। অন্ধকার নিষ্প্রদীপ ঘন তামসী রাত্রে তাদের ভয়ত্রাতা। শীতের কুহেলি-আচ্ছন্ন রাত্রে তাদের নগ্ন নিরাবরণ দেহের উত্তাপ-রক্ষক।

দশম পরিচ্ছেদ

দেখতে দেখতে অগ্নি-তাড়িত অরণ্যের চারদিক থেকে জেগে ওঠে আতঙ্কিত আর্তনাদ। বাতাস আর আগুনের শব্দের সঙ্গে মিশে যায় শিকারীর উন্মত্ত উল্লাসিত চীৎকার···তাকে ছাপিয়ে ওঠে মৃত্যু-ভীত পশুর অন্তিম আর্তনাদ। অরণ্যের প্রত্যেক তৃণ যেন শব্দ হয়ে ফেটে পড়ে। প্রলয়ের শব্দ।

আগুন ছুটে চলে···বাতাস তাকে ক্ষেপিয়ে তোলে···বর্শা-হাতে শিকারের পেছনে ছুটে চলে শিকারী···চারদিকে সুরু হয় দিক্‌ভ্রান্ত ভীত পশুদের উল্লম্ফন···চারদিকে ছুটোছুটি···অরণ্যের পশুর সঙ্গে মানুষের আদিম হত্যা-পিপাসার সংগ্রাম···দয়াহীন, মায়াহীন, ক্ষমাহীন মৃত্যুর খেলা। শিকার এবং শিকারী, কেউ জানে না কে কাকে করবে শেষ। একটু অসতর্ক যদি হয়েছে শিকারী অমনি ক্রুদ্ধ সিংহের থাবায় ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে তার উদর···শিকারীর হাতের লক্ষ্যের মধ্যে এলে মুক্তি নেই শিকারের। এক তিল সময় নেই ভাববার, দাঁড়াবার, অন্যমনস্ক হবার। হয় মারতে হবে, নয় মরতে হবে।

সহসা এক প্রান্ত থেকে উঠে বিকট উল্লাস, ইয়া হো···ইয়া···

বর্শার ফলকে লুটিয়ে পড়েছে প্রথম শিকার··· মাটিতে, পড়েছে প্রথম ঝলক রক্ত, ঝোপে রক্ত, পা ভিজে যায় আহত পশুর রক্তে। দীর্ণ পশুর বুক থেকে ফিন্‌কী দিয়ে গায়ে লাগে সোনা গরম রক্ত। ইয়া হো···ইয়া···রক্ত-মাখা মাটিতে শুরু হয় রক্তের নাচ··· শিকার হলো রক্তের নাচের উৎসব। তীব্র সুরার মতন শিরায়-উপশিরায় রক্ত জাগিয়ে তোলে উন্মাদ নেশা···হত্যা হয়ে যায় খেলা, মৃত্যু হয়ে যায় নাচের ছন্দ।

রক্ত আর শব্দের নেশায় হঠাৎ বিসিবিংগুই-এর মধ্যে জাগে, বহু যুগ আগেকার ভুলে-যাওয়া ঘটনার মত, বাতোয়ালার কথা। ইয়াসীগুইন্দজা···সে আর ইয়াসীগুইন্দজা···আর বাতোয়ালা!

হ্যাঁ, বাতোয়ালা! কাল রাত্রিতে সে বেরিয়েছিল শিকারে···বাতোয়ালাকে হত্যা করবার জন্যে। সে জানে, কাল সারা রাত বাতোয়ালাও মনে মনে তাকেই শিকার করে বেড়িয়েছে। কে থাকবে? সে আর ইয়াসীগুইন্দজা? না, বাতোয়ালা আর ইয়াসীগুইন্দজা?

এমন সময় ঠিক তার মাথার ওপর দিয়ে এক লক্ষ মৌমাছির মতন শব্দ করতে করতে ছুটে চলে গেল এক ফালি একটা আলো···ঝক্‌ঝকে একটা বর্শা!

কে ছুঁড়লো এই বর্শা?

নিমেষের মধ্যে বিসিবিংগুই-এর মনে ঝিলিক দিয়ে উঠলো সেই গুপ্তঘাতকের চেহারা···

পেছনে ফিরে চেয়ে দেখতেই চোখে পড়লো, তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাতোয়ালা।

নিমেষের মধ্যে বিসিবিংগুই হাতে তুলে নিলো বর্শা···কিন্তু ছুঁড়তে যতটুকু সময় লাগে, তার মধ্যে দেখলো একটা হলদে আগুন লাফিয়ে পড়লো বাতোয়ালার ওপর······বাঘ!

বাতোয়ালা তাকে এড়াবার জন্যে তৎক্ষণাৎ মাটিতে সটান হয়ে শুয়ে পড়লো···

হলদে আগুনটা লাফাতে লাফাতে ঘন সবুজ ঝোপে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিন্তু বাতোয়ালা আর উঠলো না। বিসিবিংগুই এগিয়ে গিয়ে দেখে, সেই একটা লাফের মধ্যে বাঘ বাতোয়ালার পেট চিরে দিয়ে চলে গিয়েছে···

বিসিবিংগুই কোন কথা না বলে উলটো পথ ধরে চলে গেল···

একাদশ পরিচ্ছেদ

বাতোয়ালাকে তারা তুলে নিয়ে এসেছে তার ঘরে। তার ঘরের সামনে একটা মস্ত বড় বাদাম

গাছ···সেই গাছের তলায় শুয়ে আছে বাতোয়ালা। শুয়ে আছে আজ সাত দিন। যন্ত্রণায় সেইখানে গড়াগড়ি দেয়, যন্ত্রণায় সেইখানেই অবশ হয়ে পড়ে থাকে। বাঘে যার পেটে নখের স্বাক্ষর দিয়ে গিয়েছে, সে বাঁচে না। বাতোয়ালাও বাঁচবে না। সুতরাং তাকে ঘিরে বসে থেকে সারা বছরের শিকারের কে করবে ক্ষতি? বাতোয়ালার কাছে গাছতলায় চব্বিশ ঘণ্টা আছে একজন মাত্র সঙ্গী···তার সেই হ্যাংলা কুকুর জুমা।

বাতোয়ালা তখনো চেয়ে আছে তার ঘরের দরজার দিকে···সেই ঘরের ভেতর আছে ইয়াসীগুইন্দজা···ভয়ে ইয়াসীগুইন্দজা তার কাছে আসে নি···

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

গভীর রাত্রি···যন্ত্রণায় বাতোয়ালার চোখ বুজে গিয়েছে···সে স্পষ্ট দেখছে, সে চলেছে সেই সবুজ-ঝোপে-ঢাকা পথ দিয়ে না-চাইতে-সব-পাওয়ার দেশে।

এমন সময় কিসের যেন শব্দ হলো···তার শিকারী মন নিমেষে তাকে জাগিয়ে দিলো···শুকনো পাতার ওপর খস্-খস্ শব্দ···ওঠো, জাগো বাতোয়ালা, শিকার এসেছে! বাতোয়ালা চোখ খুলে দেখে, চাঁদের আলোয় ইয়াসীগুইন্দজা বিসিবিংগুই-এর সঙ্গে চলেছে···

বাতোয়ালা গর্জন করে ওঠে··কিন্তু শুধু একটা ঘড়্-ঘড়্ আওয়াজ হয়···হাত ছুঁড়ে কি যেন খোঁজে··· তারপর, বর্শার অভাবে নিজের মুমূর্ষু দেহকে বর্শার মতন করে নিজেই নিক্ষেপ করে।

এতদিন ধরে যে বন্য শক্তিকে সে নিরুদ্ধ নিশ্বাসে সঞ্চয় করে রেখেছিল, দেহ-নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে তা নিঃশেষিত হয়ে গেল।

অন্তিম মুহূর্তের অন্ধকারে শুধু কানে আসে শুক্‌নো পাতার ওপর দিয়ে দুটি মানুষের চলে-যাওয়ার শব্দ···

ঘুমাও বাতোয়ালা!

কথা কও

ভেরকর্‌স



অনুবাদকের কথা

এই গ্রন্থমালার নাম দেওয়া হয়েছে বিশ্ব-সাহিত্য গ্রন্থমালা। প্রত্যেক মাসে বিশ্ব-সাহিত্য থেকে স্বল্পায়তন এক-একখানি শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-গ্রন্থ অনূদিত ক'রে প্রকাশ করা হবে। এই পুস্তকখানি সেই পর্যায়ের প্রথম গ্রন্থ। দ্বিতীয় গ্রন্থ বিখ্যাত ফরাসী লেখক রেনে মারাঁ-র জগৎখ্যাত উপাখ্যান 'বাতোয়ালা', তৃতীয় গ্রন্থ টুর্গেনিভের অমর-সৃষ্টি 'স্বপ্ন-কাহিনী', এবং চতুর্থ গ্রন্থ বিখ্যাত ফরাসী জননেতা শহীদ গ্র্যাব্রিয়েল পেরী-র অমর লেখা 'রাত-প্রভাতের গান'···

আমাদের এই অনুবাদ-গ্রন্থমালার পেছনে একটা বিশেষ লক্ষ্য আছে, যাতে এই গ্রন্থ-চয়ন ব্যাপারটা এলোমেলো না হয়। সেই জন্যে আমাদের এই পর্যায়ে প্রত্যেক মাসে যে-সব বই আমরা প্রকাশিত করবো, সেগুলি এলোমেলো ভাবে নির্বাচিত হবে না। একটা সুস্পষ্ট আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা এই পর্যায়ের গ্রন্থগুলি নির্বাচিত করেছি এবং আমাদের বিশ্বাস, বৎসরের শেষে আমাদের নির্বাচিত পুস্তকের তালিকা রসিক পাঠকবর্গকে রীতিমত তৃপ্ত করতে পারবে।

আজ বিশ্বের বিপুল-চিন্তাধারা সমস্ত প্রাদেশিক বন্ধন ভেঙ্গে দেশগত সমস্ত স্বাতন্ত্র্যের দুরত্ব উল্লঙ্ঘন ক'রে এক সার্বজনীন নৈকট্যে বিশ্বের সকলের দ্বারপ্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। রাষ্ট্রনৈতিক জগতে বিশ্ব-সংসারের আদর্শ মূর্তি কবে যে রূপ পরিগ্রহণ করবে, তা কেউ বলতে পারে না, কিন্তু চিন্তার জগতে আজ সমগ্র বিশ্ব এক পরিবারভুক্ত হয়ে গিয়েছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং এইটেই হলো বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। এই দানের সুযোগ যে-ভাষা যত ব্যাপক ভাবে নিতে পারবে, সেই ভাষার সাহিত্য ততই সমৃদ্ধ ও প্রভাবশালী হবে। ভাবের আদান-প্রদানের এই বিরাট বিশ্ব-মেলায় যদি কোন জাতি আজ সরে দাঁড়িয়ে থাকে, তা হলে সেটা হবে তার চরম দুর্ভাগ্যের কথা।

আজ ইংলণ্ডের কবি যে স্বপ্ন দেখেছেন, দূরে ব্রেজিলে বসে দার্শনিক চিন্তার যে জাল বুনছেন, নরওয়ের মধ্যরাত্রির সূর্যের স্তিমিত আলোকে সাহিত্যিক যে কাহিনী রচনা করেছেন, তার প্রত্যেকটির সঙ্গে অচ্ছেদ্য যোগ রয়েছে গঙ্গাতীরবাসী আমার মনের, আমি আজ সকলের চিন্তার সরীক, বিশ্বের ভাব ও ভাবনার সমান অংশীদার। গল্পের নায়কের নাম পাভ্‌লভ্‌ হোক্, কি পিটার হোক্, নায়িকার নাম নাটাশা হোক্ অথবা হেলেন হোক্, ঘটনার স্থল নরওয়ের দূর মেরু-গ্রাম হোক্ অথবা মিসিসিপির অরণ্য হোক্, তার মধ্যে যে-মন বিকশিত হয়ে উঠেছে, সে আমারই মন; তাদের চোখে আনন্দে বা বিষাদে যে অশ্রু-বাষ্প ঘনিয়ে উঠেছে, সে আনন্দ ও বিষাদ আমার অপরিচিত নয়। সব দেশে আমার ঘর আছে, সব দেশে আমার আত্মীয় আছে, বাংলার কবির এই বিশ্ব-অনুভূতি আজ চিন্তার রাজ্যে সত্য হয়ে ফুটে উঠেছে। এই বিশ্ব-মনের সঙ্গে আমার মনকে যোগযুক্ত করা, এই হলো আজকের জাগ্রত যৌবনের সব চেয়ে বড় মানসিক সাধনা। চিন্তার জগতে এই স্বরাজ্য, আজকের প্রত্যেক শিক্ষিত নাগরিকের প্রধান গৌরব অধিকার।

এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই আমরা এই গ্রন্থমালা প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছি এবং আমাদের গ্রন্থ নির্বাচনের পেছনে আছে এই আদর্শ।

বিশ্ব-সাহিত্যে যেখানে নতুন চিন্তা-শক্তির উন্মেষ হচ্ছে, যেখানে দুঃসাহসী মানুষ ক্ষুদ্র স্বার্থের পাঁচিল ভেঙ্গে বৃহত্তর অনুভূতির কণ্টক-প্রান্তর দিয়ে চলেছে, যেখানে মানুষের স্বাধীন মন শৃঙ্খল-ভাঙ্গার শক্তির উদ্বোধন করছে, যেখানে নতুন জগতের নতুন বীরেরা শক্তির দণ্ডের বিরুদ্ধে, আত্মস্ফীত লোভের অমানুষিক লালসার বিরুদ্ধে, মৃত চিন্তার কঙ্কালের নিশীথ বিভীষিকার বিরুদ্ধে রুধিরাক্ত কণ্টকপথে অগ্রসর হয়ে চলেছে; যেখানে অনাগত সুন্দর মেদিনীর আবির্ভাব আকাঙ্ক্ষায় তপস্বী মানুষ মহা-সুন্দরের মন্ত্র ধ্যান করছে, —সেখান থেকে আমরা আহরণ ক'রে নিয়ে আসবো, আমাদের ভাষার মধ্যে দিয়ে, সেই নতুন শক্তিকে, সেই নতুন প্রাণকে, সেই নতুন মন্ত্রকে। সেই আদর্শ দিয়েই আমরা এই গ্রন্থমালার পুস্তক নির্বাচন করেছি।

এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এই বিশ্ব-সাহিত্য গ্রন্থমালা প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছি, আশা করি, সহৃদয় পাঠকবর্গ তাঁদের সহানুভূতির দ্বারা এই উদ্যোগকে সার্থক ক'রে তুলবেন।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

মুখবন্ধ

১৯৪৭···বসন্তকাল।

তিনটি বৎসর চলিয়া গিয়াছে, পুরা তিনটি বৎসর··· মাত্র কয়েক সপ্তাহ বাদ।

এই তিন বৎসর ফ্রান্সের জীবনের একটি মাত্র প্রতীক ছিল···নীরবতা।

পথে-প্রান্তরে নীরবতা, জনতার মধ্যে নীরবতা··· নীরবতা ফ্রান্সের ঘরে ঘরে।

নীরব ফ্রান্স···কেন না সশস্ত্র জার্মাণ প্রহরী মধ্যদিনে প্রকাশ্য রাজপথ বাহিয়া টহল দিয়া ফিরিতেছে :

নীরব, কেন না পাশের ঘরেই জার্মাণ অফিসার বিজয়ীর অধিকারে বাস করিতেছে :

নীরব, কেন না জার্মাণীর গেষ্টাপো বিভাগের গুপ্তচর হোটেলে মাথার বালিশের তলায় মাইক্রফোন রাখিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে :

নীরব, কেন না ক্ষুধিত শিশুরা ক্ষুধার তাড়নায় উৎক্ষিপ্ত হইয়াও ক্ষুধিত হইয়াছে তাহা জানাইতে পারে না :

নীরব, কেন না প্রতিসন্ধ্যায় আশ্রয়দাতার নিষ্প্রাণ মৃতদেহ পরবর্তী প্রভাতকে জাতীয় শোকদিবসে পরিণত করিয়া চলিয়াছে।

সর্বোপরি বিরাজ করিতেছে, ফ্রান্সের নিহতচিন্তার নীরবতা···ফ্রান্সের সাহিত্যিকদের শৃঙ্খলিত নীরবতা··· নিজেদের অন্তরের কথা জগৎ-সমক্ষে প্রকাশ করিবার অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়া তাহারা চলমান বিশ্বের মুখর জনতার এক পাশে দাঁড়াইয়া আছে, মূক, নীরব।

য়ুরোপের স্বাধীন চিন্তাশক্তিকে অবরুদ্ধ করিয়া জার্মাণী যে বিরাট প্রাচীর গাঁথিয়া তুলিয়াছে, সেই প্রাচীরের অবরুদ্ধ জীবন যে কি, তাহা যে ভোগ না করিয়াছে সে বুঝিতে পারিবে না। শুধু আজ জগৎ এইটুকুই জানুক, সেই নিশ্ছিদ্র অবরোধ প্রাচীরের গায়ে সামান্যতম ফাটল ধরাইবার জন্য মানুষ অবলীলাক্রমে জীবন বিসর্জন দিতেছে···

যখন আমি ফ্রান্সে ছিলাম, তখন যদি শুনিতে পাইতাম যে জার্মাণ অধিকারের কালে ফ্রান্সে এমন কতকগুলি বই লিখিত হইয়াছে, যেগুলি ফ্রান্সে মুদ্রিত হইতে না পারিয়া অন্যত্র মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতাম অমূল্য উপহারস্বরূপ কিছু পাইয়াছি, কারাগারের সেই কপাটের গায়ে ভাঙ্গন ধরিয়াছে।

কিন্তু তখন ফ্রান্সের মাটিতে দাঁড়াইয়া এমন ভয়ে আমরা অভিভূত হইয়া গিয়াছিলাম যে, ফ্রান্সের মন যে বাঁচিয়া আছে, তাহা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারিতাম না। বহু শতাব্দীর ইতিহাসে মর্মান্তিক বেদনায় এই প্রথম অনুভব করিলাম, জগৎ-ব্যাপারে পরস্পর আদান-প্রদানের মহামেলায় এই প্রথম ফ্রান্স কোন স্থান পাইল না।

আমাদের সাহিত্যের কণ্ঠ আজ বন্ধ, কিন্তু বাঁচিয়া সে আছে। জার্মাণী তাহাকে বন্দী করিয়াছে কিন্তু ক্রীতদাস করিতে পারে নাই।

মাত্র দশ-বারো জন লেখক এবং শ'খানেক ভাড়াটে মসীজীবী, যাহাদের আজও পর্যন্ত কেহ জানে না, চেনে না, তাহারাই কলুষ-পঙ্কের কালিতে শত্রুর নির্দেশে সাহিত্য রচনা করিয়া শত্রুসেবা করিতেছে। যদি কেহ কষ্ট করিয়া স্মরণ করিয়া দেখেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, ফ্রান্সে অন্তত একশো জন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ছিলেন এবং এমন পাঁচশো লেখক ছিলেন, যাঁহারা জনসমাজে ছিলেন রীতিমত পরিচিত। সুতরাং যে কয়েক জন আত্মবিক্রয় করিয়াছে, সংখ্যার অনুপাতে তাহারা তুচ্ছ। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে শতকরা যে দশ ভাগ কাপুরুষতা আছে, আত্মবিক্রীত লেখকগুলি সেই কাপুরুষতারই যোগফল এবং প্রত্যেক মনুষ্য-সমাজে ন্যূনতম এই কাপুরুষতা সংগোপনে থাকিতে বাধ্য।

তিন বৎসর কাল ধরিয়া এই আত্মবিক্রীত লেখক-গোষ্ঠী তাহাদের আয়ত্তে বর্তমান প্রচার-শিল্পের সম্ভাব্য সমস্ত সুযোগ ভোগ করিয়াছে ; তাহারা প্রচুর কলরব সৃষ্টি করিয়া তাহাদের সংখ্যার দৈন্যকে ঢাকিতে চেষ্টা করিয়াছে।

ফ্রান্সের জনসাধারণ সমবেত ভাবে এমন করিয়া তাহাদের নিকট হইতে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, এই দলের প্রধান নেতা লা রচেল পর্যন্ত লিখিতে বাধ্য হইয়াছে, ফ্রান্সের সমগ্র প্রতিভা, ফ্রান্সের সুবিপুল কবি-মন আমাদের বিরুদ্ধে।

ইহার অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। সমগ্র

জাতির পুঞ্জীভূত ঘৃণার চাপে ইহারা একদা স্বভাবতই নিঃশেষে মরিয়া যাইবে এবং যখন মরিয়া যাইবে, তখন তাহা লইয়া আনন্দ-প্রকাশেরও কোন প্রয়োজন হইবে না।

এই তিন বৎসর কাল, অবশ্য ফ্রান্সের একদল শ্রেষ্ঠ লেখক ফ্রান্স হইতে আত্মনির্বাসিত হইয়া ফ্রান্সের চিন্তা-ধারার অক্ষুণ্ণতাকে বজায় রাখিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের লেখার একটি অক্ষরও ফ্রান্স দেখিতে পায় নাই। কিন্তু তবুও এক বিচিত্র উপায়ে তাঁহাদের নাম ও কীর্তি জনতার অন্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে···তাঁহাদেরই নাম তাহারা বার বার উচ্চারণ করে, যদিও করিতে হয় অস্ফুট কণ্ঠে কানে কানে।

ইহা ছাড়া, আর যাঁহারা আছেন, তাঁহারা যে কি ভাবে এই নিদারুণ দুর্দৈবকে সহ্য করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিতে পর্যন্ত অন্তর শিহরিয়া উঠিতেছে। সে-মহত্ত্বের কথা হয়ত আজও প্রকাশ করিয়া বলা চলে না,—কেন না, সেই মহত্ত্ব-প্রকাশের সুযোগে শত্রুরা তাঁহাদের চিনিয়া লইতে পারিবে।

তাই কাহারও নাম উল্লেখ করিব না; জানি, আমার সেই প্রশংসিত নামের ফলে, শত্রুর কারাগারে আর একজন বন্দীর সংখ্যা বাড়িবে, হয়ত বা আর একটি অকাল মৃত্যু ঘটিবে। তবে আমি জানি, সে-নামের তালিকা রীতিমত দীর্ঘ।

এই দলের মধ্যে এক শ্রেণীর সাহিত্যিক ছিলেন, যাঁহারা শপথ করিয়া ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, যত দিন ফ্রান্স শত্রুর কবলে থাকিবে, তত দিন তাঁহারা একটিও অক্ষর লিখিবেন না। বর্তমান গল্পের প্রৌঢ় ব্যক্তির মত তাঁহারা শত্রুর বেয়নেটের সামনেও প্রস্তর-নীরব হইয়া ছিলেন। কোন ভাবে কোন কিছুর সহিতই তাঁহারা আপোষ-মীমাংসা করেন নাই; তাঁহাদের অধিকাংশেরই একমাত্র জীবিকার উপায় ছিল লেখনী। সুতরাং সেই লেখনী একেবারে অচল হইয়া যাওয়ার ফলে নিদারুণ দারিদ্র্যও তাঁহাদের গ্রাস করিয়া ফেলে। হয়ত তাঁহাদের জীবনের সর্ব-শেষ আনন্দ, একমাত্র আনন্দ, তাঁহাদের শেষ সৃষ্টিকে মুদ্রিত দেখিয়া যাওয়া, হয়ত তাহাও তাঁহাদের ভাগ্যে জুটিবে না।

অন্ধকার ছায়ালোকে বসিয়া তাঁহারা লিখিয়া চলিয়াছেন···লিখিয়া চলিয়াছেন নিজেদের অন্তরের বেদনাকে প্রকাশ করিবার জন্য···লিখিয়া চলিয়াছেন ভবিষ্যৎ ফ্রান্সের জন্য। অন্তরের অন্তরতম স্থলে যে-সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছেন, উহাকেই অনুসরণ করিয়া লিখিয়া চলিয়াছেন। এবং একদিন এই নীরব ছায়ালোক হইতে যখন তাঁহাদের বাণী আলোকে জাগিয়া উঠিবে, তখন পৃথিবী রুদ্ধকণ্ঠ সত্যের পরিচয় অবশ্যই পাইবে।

ইহা ছাড়া এক শ্রেণীর সাহিত্যিক আছেন, যাঁহারা এই স্তিমিতকণ্ঠ নীরবতার মধ্যে থাকিয়াই শত্রুর উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাদের অন্তরের প্রতিবাদের বাণী লিখিয়া চলিয়াছেন, এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে, এই স্বাধীনতা অপহরণের বিরুদ্ধে, নির্দোষ জনতার হত্যার বিরুদ্ধে, কাপুরুষতা আর দেশদ্রোহিতার বিরুদ্ধে তাঁহারা সমানে লেখনী চালনা করিয়া চলিয়াছেন। দিনের পর দিন তাঁহারা বেদনার পাথরে ঘসিয়া ঘসিয়া বাণীকে দুধারি তলোয়ারের মতন তীক্ষ্ণ করিয়াছেন; শোক-গাথার ছন্দের আড়ালে সংগোপনে জাতিকে সশস্ত্র প্রতিরোধে প্রেরণা জোগাইয়াছেন; বাণীর মধুভাণ্ডের ভিতর বিষ-ছুরিকা লুকাইয়া পরিবেশন করিয়াছেন; যে-কথা বলিতে গিয়া বলিতে পারেন নাই, তাহাকে এমন কৌশলে উহ্য রাখিয়া গিয়াছেন যে, সেই অনুচ্চারিত-বাণীই উচ্চারিত বাণীর ফাঁকে ফাঁকে স্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে।

একান্ত সন্তর্পণে এবং সুকৌশলে এই কার্য্য সম্পাদন করিতে হইয়াছে। এবং প্রয়োজনের অনুরূপ কৌশলও তাঁহারা উদ্ভাবন করিয়াছেন। যে-সাহিত্য আজ এক সহস্র বৎসর ধরিয়া ইতিহাসের পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পথে সব সময়ে সমানে তাল রাখিয়া চলিয়াছে, আজ তাহার সুমহান্ ঐতিহ্যের ধারা তাঁহারা এই ভাবে সগৌরবে বজায় রাখিয়াছেন।

জার্মাণরা কড়া সেন্সারের জাল চারিদিকে বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই জালের ভিতর তাঁহাদের প্রতিভা ছিদ্রপথ অন্বেষণ করিয়া লইয়াছে। এক অপরূপ সমালোচনার ছদ্মবেশে তাহারা জার্মাণদের বিরুদ্ধে তাঁহাদের প্রতিবাদকে তুলিয়া ধরিয়াছেন; তরুণ লেখকেরা লিরিক কবিতার অনুরাগ-প্রবণতাকে আশ্রয় করিয়া অন্তরের বিদ্রোহী সুরকে রূপ দিয়াছেন।

এই যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সে কবিতার যে নব-জন্ম হয়, তাহার মূল উৎস উপরি-উক্ত সূত্রের মধ্যে নিহিত। শিল্পীর হাতে ফরাসী ভাষা যে-যাদুর সৃষ্টি করিতে পারে, ভাষায় তরল সংযোগের মধ্য দিয়া ভাষার ঊর্ধ্বে তখন যে অর্থ বিকশিত হইয়া উঠে, ফরাসী ভাষা যাহার মাতৃভাষা নয়, সে তাহা কখনই ধরিতে পারে না। ফরাসী ভাষার এই অপরূপ

ঐশ্বর্য বিদেশীর আয়ত্তের বাহিরে। তাই জার্মান তাহার সমস্ত অস্ত্র লইয়া এই ভাষার ঐশ্বর্যকে বন্দী করিতে পারে নাই। ফরাসী কবিতার সুনিপুণ আবেদনকে ব্যর্থ করিতে পারে, জার্মাণীর অস্ত্রশালায় এমন কোনও অস্ত্র নির্মিত হয় নাই।

এই সাহিত্যিক গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বশেষ আর একদল ছিল, যাঁহাদের কীর্তি সকলের চেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য, তাঁহারা সংগোপনে মাটির তলায় থাকিয়া দিনের পর দিন এই সংগ্রামে ইন্ধন জোগাইয়াছেন। স্বদেশের মাটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া ফ্রান্সের যে-সব বীর-সন্তান গেরিলা-যুদ্ধ চালাইয়া গিয়াছেন, কারখানায় কারখানায় যে-সব শ্রমিক নীরব সাবোতাজের দ্বারা পদে পদে শত্রুকে ব্যাহত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, যে-সব নেতা সর্বশেষ প্রতিরোধের জন্য জনতাকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের উদ্দেশে প্রস্তুত করিতেছিলেন, স্বাধীনতা-সংগ্রামের সেই সব বীর সৈনিকদের সঙ্গে সমানে পা ফেলিয়া চলিয়াছিলেন, ফ্রান্সের এই সাহিত্যিক দল, সাংবাদিক, কবি আর দার্শনিকের দল।

আমি দেখিয়াছি, উপদ্রুত বন্য শিকারের মতন এই লেখকেরা অবিরত আক্রমণের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য ছুটিয়া বেড়াইয়াছেন, এক সংগোপন আড্ডা হইতে রাতারাতি আর এক সংগোপন আড্ডায় নিজেদের লুকাইয়া বেড়াইতে হইয়াছে; কখনও পাণ্ডুলিপি ভাঙ্গা জানালার শার্টলের ভেতরে, কখনও বা স্ত্রীলোকের গহনার বাক্সের ভিতর, কখনও বা গির্জার অভ্যন্তরে ফাঁপা মূর্তির ভিতর লুকাইয়া বেড়াইতে হইয়াছে; কত পাণ্ডুলিপি হয়ত গ্রামে অরণ্যে গাছের তলায় চিরকালের মতন মাটির সহিত মাটি হইয়া মিশিয়া যাইবে, কেহ আর তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না। অন্ধকার মাটির তলায় সুড়ঙ্গে, অন্ধকার গর্ভগৃহে দেখিয়াছি, সংবাদপত্র ছাপা হইতেছে…এই সব সংবাদপত্রের মধ্যে এমন কতকগুলি ছিল, যেগুলি পুরোপুরি সাহিত্য বিষয়ক।

মাটির তলার এই ছাপাখানা হইতে যে-সব সাহিত্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, বর্তমান গ্রন্থখানির তুলনা হয় না। ফরাসী সাহিত্যের যে গৌরবের কথা আমি বলিতে চাহিতেছি, তাহার এত-বড় প্রমাণ আর দুইটি নাই।

যে পাঠক এই কাহিনী পড়িতে আরম্ভ করিবেন, তাঁহার নিকট আমার নিবেদন, তিনি যেন ইহার ইতিহাস এবং সে-ইতিহাসের মর্ম কি, তাহা অগ্রে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেন। এই গ্রন্থখানি যে মূল ফরাসী ভাষায় নীরবতার কাহিনী পর্যায়ের প্রথম গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়, ইহা কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়। ফ্রান্সের এক গুপ্ত প্রকাশক এই বইখানি *Le Silence de la Mar* নামে প্রকাশিত করেন।

এই বড় ছোট-গল্পের লেখক 'ভেরকর্‌স্' ছদ্মনামের আড়ালে নিজের আসল পরিচয় সংগোপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। হয়ত তিনি কোন সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক। সুবিখ্যাত হন বা না হন, এ-কথা সুনিশ্চিত, যিনি এই কাহিনীর লেখক তিনি অসাধারণ প্রতিভাশালী সাহিত্যিক।

এই গ্রন্থ পড়িবার আগে পাঠককে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই কাহিনী লিখিবার জন্য গ্রন্থকারকে মূল্যস্বরূপ নিজের জীবনের সুখ-সম্ভোগ বিসর্জন দিয়া ভূগর্ভের অন্ধকার কারাগারকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইতে হইয়াছিল; যে ভদ্রলোক এই গ্রন্থ ছাপিবার জন্য প্রেস এবং কাগজ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, যখন কাগজ জার্মাণ-অনুগৃহীত দালাল প্রকাশকেরাও পাইতেছিল না, তাঁহারেও তাহার মূল্যস্বরূপ নিজের জীবনের সুখ-সাধকে বিসর্জন দিতে হয়; যে-সব কম্পোজিটার এই পাণ্ডুলিপি মুদ্রিত করিবার জন্য অন্ধকারে টাইপ সাজাইয়াছেন, যে-সব নারী দফ্‌তরীর কাজ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেককেই মাটির তলায় অন্ধকার গর্তে আবদ্ধ জীবন যাপন করিতে হয়, তাঁহাদের মাথার উপর দিয়া জার্মাণ প্রহরীর ভারী জুতার শব্দ অষ্টপ্রহর তাঁহাদের সচকিত করিয়া রাখিয়াছিল।

এই বিচিত্র আবেষ্টনীর মধ্যে, পরম বিস্ময় ও আনন্দের কথা, এই যে গ্রন্থ মুদ্রিত হইল, তাহা জগতের সবকালের অনুপম সাহিত্য-সৃষ্টির অন্যতম।

শত প্রহরি-বেষ্টিত কারাগারের ছিদ্রপথ দিয়া, কুড়ি রকমের বিভিন্ন পুলিশের জাগ্রত হিংসা এড়াইয়া, সীমান্তে সীমান্তে অতন্দ্র সশস্ত্র প্রহরীদের বেড়া ডিঙ্গাইয়া, জার্মাণ অত্যাচারের এই জীবন্ত প্রমাণ আজ জগৎ-সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থ প্রমাণ করিয়া দিয়াছে, ফ্রান্স মরে নাই …ফ্রান্সের মানসিক ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার আজও শূন্য হয় নাই…যে-জাতির মধ্যে এখনও মানুষ অন্তরের ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য অকাতরে রক্তদান করিতে পারে, সে-জাতির যেন কেউ নিন্দা না করেন…

ফ্রান্স কোন দিন নিজেকে শত্রুর হাতে সমর্পণ করে নাই…যাহা সে হারাইযাছিল বলিয়া আশঙ্কা হইয়াছিল, তাহাকে সে পুনরায় অধিকার করিয়া লইতে চলিয়াছে…ফ্রান্স তাহার সুবিশাল মহত্ত্বে আবার জাগিয়া উঠিতেছে।

মনে পড়ে, কয়েক দিন আগেই ফ্রান্সের লোকেরা নিজের হাতে বসন্তের নবোদ্গত শস্যের উপর দিয়া লোহার পেষণ-দণ্ড চালাইয়াছিল…

যাঁহারা মাটির কাজ জানেন না, তাঁহারা হয়ত' মনে করিতে পারেন যে, এই ভাবে নূতন শস্য বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় ফ্রান্সের ভবিষ্যতের অন্নভাণ্ডার শূন্য হইয়া গেল…

কিন্তু গ্রামের চাষীরা জানে, এই ভাবে নিষ্পেষণের ফলে নবাঙ্কুরের মূল আরো গভীর ভাবে মাটির বুক আঁকড়াইয়া ধরে, আবার নূতন শস্য যখন দেখা দেয়, মাটির গভীরতম বুক হইতে তাহারা তখন বিপুলতর তেজ সংগ্রহ করিয়াই জন্মায়…

ফ্রান্সের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে জার্মাণীর লৌহ-দেহ ট্যাঙ্কের নিষ্পেষণ…

নূতন শস্য নবীনতর তেজ লইয়া মাটির বাধা ভেদ করিয়া শীঘ্রই আসিবে…

কথা কও

প্রথম পরিচ্ছেদ

তার আসবার আগে রীতিমত ঘটা ক'রে একটা সামরিক আয়োজনের মহড়া হযে গেল। প্রথমে দু'জন পদাতিক সৈনিক এলো, দু'জনেই দেখতে মন্দ নয়। এক জন খুব পাতলা গড়নের, আর এক জনের দেহ রীতিমত চৌকষ, হাত দুটো শাবল-চালানো হাতের মতন মজবুত। বাড়ীব ভেতব না ঢুকে বাইরে থেকেই আমার বাড়ীটা তারা চোখ বুলিযে দেখে গেল। তার কিছুক্ষণ পরে এক জন এন্‌-সি-ও অফিসর এলেন, পাতলা সৈনিকটি তাঁকে নিযে বাড়ীব ভেতর ঢুকে পড়লো। তাদেব ধারণা, তাবা ফবাসী ভাষাতেই আমার সঙ্গে আলাপ করেছিলো, কিন্তু আমি তার এক-বর্ণও বুঝতে পারিনি। যাই হোক্‌, বাড়ীর ভেতর খালি ঘরগুলো দেখিযে দিলাম এবং তারা সন্তুষ্ট হলো বলেই বিশ্বাস হলো।

পবের দিন সকাল বেলা এক বৃহৎ আকার ছাই-রঙা সামবিক টুরিং মোটর গাড়ী সোজা আমাব বাগানের ভেতর এসে ঢুকে পড়লো। গাড়ীর চালক আর এক-মাথা-চুল পাতলা ধরণের হাসি-হাসি মুখ এক জন সৈনিক দুটো প্যাকিং কেস্‌ আব ছাই-রঙা কাপড়ে-মোড়া একটা মস্ত-বড় পুঁটলী গাড়ীর ভেতর থেকে বাব করলো। মালগুলো কাঁধে তুলে নিয়ে ওপবের যেটা সব চেযে বড ঘব, সেই ঘরে রাখলো। মোটর গাড়ীটা দেখলাম ফিরে গেল কিন্তু ঘণ্টা কতক পরেই ঘোড়ার খুরের আওয়াজ কানে এলো। দেখি, সামনেই তিন জন অশ্বারোহী। এক জন ঘোড়া থেকে নেমে আমার সেই পুরানো পাথরওয়ালা বাড়ীটা ঘুরে-ফিরে দেখে এলো, তারপর তারা তিন জনেই ঘোড়া-সমেত বার-বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়লো। এই বার-বাড়ীতেই আমার নিজস্ব কারখানা-ঘর ছিল। দুটো পাথরের মাঝখানে একটা হুক দিয়ে ছুতোবেব কাজ করবার জন্যে একটা বেঞ্চী তৈরী করেছিলাম; পরে দেখতে পাই, তারা হুকটা খুলে নিয়ে দেয়ালে গর্ত ক'রে ঢুকিয়ে ঘোড়া বাঁধার কাজে লাগিয়েছিল।

দু'দিন আব বিশেষ কিছু ঘটল না। আমি জন প্রাণীব মুখ দেখতে পেতাম না। ভোব না হতেই অশ্বারোহীরা ঘোড়া নিয়ে বেরিযে পড়তো; তারপর সন্ধ্যাবেলা কখন ফিরে এসে শুয়ে পড়তো···একরাশ খড় দিয়ে ঘবের মধ্যেই বিছানা করে নিয়েছিল।

তারপর তৃতীয দিনের সকাল বেলা, সেই বড় টুরিং গাড়ীটা ফিরে এলো। একটা মস্ত-বড় ফিল্ড্‌ ট্রাঙ্ক, যা বড বড় অফিসররা ব্যবহার করে, সোজা কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে ড্রাইভার ওপরের ঘরে রেখে এলো। তারপর নিজের কিট্‌ ব্যাগটি নিয়ে তার পাশের ঘরে রাখলো। সিঁড়ি দিযে নীচে নেমে এসে চমৎকাব ফবাসী ভাষায় আমাব ভাগ্নীব কাছে খানকতক বিছানাব চাদর চেয়ে নিলো।

আমাদেব বন্ধ ঘরের দরজায় করাঘাতের আওয়াজ হ'তে আমাব ভাগ্নী দরজা খুলে দেখতে গেলো। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায সে যেমন আমাব জন্যে কফি তৈরী ক'রে নিয়ে আসে, সেদিনও সবে সে কফি নিয়ে এসে রেখেছে, আমি ঘরের ভেতর দিকের এক কোণে, অপেক্ষাকৃত অন্ধকারেব মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে বসে আছি। ঘরের এই দরজাটা খুললেই সোজা সামনে বাগান দেখা যায়। বাগানেব চারদিকে লাল টালির একটা ছোট্ট রাস্তা তৈরী করেছিলাম, বর্ষার দিনে বিশেষ কাজে লাগতো। মনে হলো, সেই টালির রাস্তায় মানুষের পায়ের আর লোহাওযালা জুতার আওয়াজ হচ্ছে। ভাগ্নী আমাব দিকে চেয়ে তার কফির কাপটা নামিযে রাখলো। আমার কাপটা হাতেই ছিল।

তখন রাত্রি হ'য়ে এসেছে, তবে শীত তেমন নেই। সে-বছর সারা নভেম্বর মাসটাতেই তেমন যেন শীত পড়েনি। অন্ধকারে আমি যেখানে বসেছিলাম, সেখান থেকে ঘাড় তুলে দেখতে পেলাম, খোলা দরজার সামনে এক বিরাট দেহ, মাথায় ফ্ল্যাট টুপি, চাদরের মতন ক'রে কাঁধের ওপর একটা ম্যাকিন্‌টস্‌ ঝুলছে।

আমার ভাগ্নী দরজা খুলে দিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে

ছিল। দরজাটা টেনে দেয়ালের সঙ্গে লাগিয়ে দেয়ালের গায়ে ঠেসান দিয়ে সে সামনে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। আমার দিক থেকে আমি একটু একটু ক'রে চুমুক দিয়ে কফি খেয়েই চলেছিলাম।

উন্মুক্ত দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জার্মাণ অফিসরটি বলে উঠলো, যদি কিছু মনে না করেন!

তারপর ঈষৎ ঘাড় নীচু ক'রে অভিবাদন জানিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েই রইলো, মনে হলো যেন ঘরের সেই নীরবতার গভীরতাকে মনে মনে মেপে দেখছে। তারপর সোজা ঘরের ভেতর এগিয়ে এলো।

কাঁধ থেকে ম্যাকিন্‌টস্‌টা নাগিয়ে হাতের ওপর রেখে সামরিক ভঙ্গীতে স্যালিউট্ করলো, তারপর মাথা থেকে টুপিটা খুলে আমার ভাগ্নীর দিকে ফিরে চাইলো; শান্ত ভাবে মৃদু হেসে ঈষৎ মাথা নত ক'রে অভিবাদন জানালো। নিজেই বলে উঠলো, আমার নাম ওয়ার্ণার ফন্ এব্রেনাক্।

হঠাৎ এক ঝলকে আমার মনের মধ্যে জেগে উঠলো, নামটা তো পুরোদস্তুর জার্মাণ নয়, হয়ত কোন প্রোটেষ্টাণ্ট জার্মাণীতে এসে বসবাস করেছিল, তারই বংশধর।

সমস্ত ঘর নীরব।

সে আবার বলে উঠলো, সত্যি, আমি একান্ত দুঃখিত।

শেষ কথাটা সে ইচ্ছা করেই যেন একটু টেনে বললো···তার কথার রেশ ঘরের জমাট নীরবতার মধ্যে ডুবে গেল।

ইতিমধ্যে ভাগ্নী দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছিল কিন্তু দেয়ালে হেলান দিয়ে সে তেমনি তার সামনে শূন্য-দৃষ্টিতে চেয়েছিল। আমিও চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াইনি। ধীরে শূন্য কফির পাত্রটি সামনে হার্মো-নিয়মের ওপরে রেখে দিলাম, তারপর দুটো হাত একত্র ক'রে···অপেক্ষা ক'রে রইলাম···নীরবে।

জার্মাণ অফিসরটিই আবার কথা বললো, অবশ্য থাকবার ব্যবস্থা একটা করতেই হতো—তবে এখানে হয়তো না এসেও পারতাম···কিন্তু আমি আপনাদের আশ্বাস দিতে পারি, যাতে আপনারা উত্যক্ত না হন সে দিকে আমার আরদালী বিশেষ দৃষ্টি রাখবে।

ঘরে ঠিক মাঝখানটায় সে দাঁড়িয়ে ছিল···বিরাট একটা প্রাণী···হাত তুললে মনে হয় কড়িকাঠে গিয়ে ঠেকবে। মাথাটা সামনের দিকে একটু ঝুঁকে ছিল, যেন ঘাড় থেকে ওপরের দিকে না উঠে সোজা বুকের ওপর টাঙানো ছিলো। স্কন্ধদেশ সুগোল নয়, তবে বাইরে থেকে ধরা পড়ে না। অপরিসর কাঁধ আর কোমর সহজেই নজরে পড়ে, তবে মুখের-গড়ন রীতিমত সুন্দর। খাঁটি পুরুষ মানুষের মুখ··দুই গণ্ডে দুটি বৃহৎ গর্ত। আমি যেখানে বসেছিলাম সেখান থেকে তার চোখ নজরে পড়ছিল না···কপালের ছায়ায় যেন ঢাকা পড়েছিল। তবে মনে হলো, চোখের রং হাল্কাই হবে। মাথায় মোটামুটি বেশ ভাল চুলই ছিল, সোজা পেছন ক'রে আঁচড়ানো···ওপরের মোমবাতির আলোয় সিল্কের মতন ঝিকমিক করছিল।

ঘরের অবিচ্ছেদ নীরবতা ক্রমশ গাঢ় থেকে গাঢ়তর হ'য়ে উঠতে লাগলো···শীত-প্রভাতের কুয়াশার মতন। নিশ্চল···ঘন। আমার ভাগ্নী যেমন দাঁড়িয়ে ছিল, ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। তার সেই প্রস্তর-স্থিরতা, আর আমার নীরবতা মাঝখানের বাতাসকে যেন অচল ক'রে দিলো। মর্মাহত হয়ে অফিসরটিও চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো···ক্রমশ একটা ক্ষীণ হাসির রেখা তার ঠোঁটের কোণে দেখা দিলো। সে-হাসির মধ্যে ব্যঙ্গের রেশ পর্যন্ত ছিল না। হাত দিয়ে অস্পষ্ট কি-একটা ইঙ্গিত ক'রে উঠলো, তার মানে আমি বুঝতে পারলাম না। ঘাড় ফিরিয়ে সোজা আমার ভাগ্নীর দিকে চেয়ে রইলো; সে তখনও তেমনি পাথরের মতন দাড়িয়ে ছিল। সেই অবকাশে আমি তার মুখের রেখা ভাল ক'রে লক্ষ্য করবার সুযোগ পেলাম। অর্ধ-উন্মুক্ত দুই ঠোঁটের মাঝখান দিয়ে একটা সোনালী দাঁতের আভা দেখা যাচ্ছিল। অবশেষে অফিসরটি চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে ঘরের ভেতর আগুনের দিকে ফিরে চেয়ে বলে উঠলো, যাঁরা নিজের দেশকে ভালবাসেন, সত্যি আমি তাঁদের অন্তর থেকে গভীর শ্রদ্ধা করি।

তারপর হঠাৎ মাথাটা ঝাঁকানি দিয়ে তুলে জানালার ওপরের দিকে দৃষ্টি রেখে বলে উঠলো, আমি এতক্ষণ আমার নিজের ঘরে চলে যেতাম কিন্তু কোন্ দিকে সিঁড়ি তা আমি এখনো জানি না।

তৎক্ষণাৎ আমার ভাগ্নী, ঘরের যে দরজাটা খুললে পেছন দিক্‌কার সিঁড়িটা সামনে পড়ে, সেই দরজা খুলে অফিসরের দিকে একবারও ফিরে না চেয়ে, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো, যেন সে একা। অফিসরটি নীরবে অনুসরণ ক'রে সিঁড় দিয়ে উঠতে লাগলো··· তখন আমি দেখতে পেলাম, লোকটির একটা পা ভাঙা। পায়ের শব্দে বুঝতে পারলাম, তারা সিঁড়ির ওপরে গিয়ে উঠেছে। জার্মাণ অফিসরটির একটা পায়ের আওয়াজ যেমন ভারী, আর একটা পায়ের আওয়াজ তেমনি পাতলা। একটা দরজা খুললো, আবার বন্ধ হয়ে গেল।

ভাগ্নী নেমে এলো। কাপটা তুলে নিয়ে সে নীরবে কফি খেতে লাগলো। আমি আমার পাইপটা ধরালাম। কয়েক মিনিট কেউই মুখ দিয়ে কোন কথা উচ্চারণ করলাম না। অবশেষে আমিই বল্লাম, ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ, লোকটা দেখছি অন্তত ভদ্র।

ভাগ্নী নীরবে শুধু ঘাড় দুটো নাচালো একবার। কোলের ওপর আমার পশমি জ্যাকেটটা তুলে নিয়ে নীরবে সে বিপ্‌কাজের বাকিটুকু শেষ করতে মনঃসংযোগ করলো।

পরের দিন সকাল বেলা যখন আমরা রান্নাঘরে বসে প্রাতরাশ গ্রহণ করছি, মনে হলো যেন অফিসরটি নীচে নেমে আসছে। রান্নাঘরে আসতে হলে ওপর থেকে আর একটা যে সিঁড়ি আছে তার খবর অফিসরটি জেনেছে কি না বলতে পারি না, হয়ত বা হঠাৎ সেই সিঁড়ি দিয়ে রান্নাঘরের সামনে এসে পড়েছিল···হয়ত বা আমাদের কথাবার্তা শুনতে পেয়েও থাকবে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলে উঠলো, কাল রাত্তিরে বেশ ভাল ঘুম হয়েছিল···আশা করি আপনাদেরও কোন ব্যাঘাত হয় নি।

তারপর হেসে ঘরের ভেতরে চারদিকে একবার চেয়ে দেখলো। সারা শীতটা হয়ত সেই ঘরের ভেতর কাটিয়ে দিতে হবে, সেই জন্য কতরগুলো দরকারি আসবাবপত্র, খানকতক বাসন আর পুরানো থালা সেই ঘরের ভেতর এনে রেখেছিলাম। লোকটা চোখ বুলিয়ে সেগুলা দেখলো। দেখলাম তার চোখের রং, কাল রাতে যা মনে করেছিলাম তা নয়, সোনালী আর লালে মেশানো রঙীন দৃষ্টি। কিছুক্ষণ চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে যখন কোন সাড়াই পেলো না, তখন ঘরটা পার হয়ে সামনের দরজা খুলে বাগানের দিকে এগিয়ে চললো। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সে আবার ফিরে দাঁড়ালো, আমার সেই পুরানো বাড়ীর লম্বা নীচু ঘরগুলো নিরীক্ষণ ক'রে দেখতে লাগলো। পুরানো লালচে টালির ওপর লতার ঘন আবরণ উঠেছে। ঠোঁটের ক্ষীণ হাসিটা ক্রমশ যেন একটু আরো বিস্তৃত হলো, আপনার মনেই আমাদের লক্ষ্য ক'রে বলে উঠলো, আপনাদের বুড়ো মেয়র আমাকে বলেছিলেন, ঐ স্যাতুতে* থাকতে! সঙ্গে সঙ্গে পেছন দিকে হাত তুলে গাছের ফাঁক দিয়ে অদূরে পাহাড়ের ওপর যে বৃহদাকার স্যাতুটা দেখা যাচ্ছিল, তার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখালো।

—আমার লোকেরা অবশ্য ভুল ক'রে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে; তাদের এই ভুলের জন্যে কিন্তু তাদের আমি ধন্যবাদই জানাচ্ছি। আপনার এই বাড়ী ঐ স্যাতুর চেয়ে ঢের বেশী সুন্দর।

তারপর সামরিক ভঙ্গীতে অভিবাদন জানিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঠিক আগের দিন যে সময়ে এসেছিল, আজও সন্ধ্যায় ঠিক সেই সময়ে ফিরে এলো। তখন আমরা ঘরে বসে কফি খাচ্ছিলাম। দরজায় গত দিনের মতন করাঘাত করলো, কিন্তু আজকে দরজা খুলে দেওয়ার অপেক্ষা না করেই নিজে দরজা খুলে ঘরে ঢুকে পড়লো এবং ঘরে ঢুকেই বলে উঠলো, হয়ত আপনাদের বিরক্ত করলাম, কিন্তু আপনারা যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে আমি রান্নাঘর দিয়েই যাতায়াত করতে পারি, আপনাদের এ-দিকটা আপনারা তালা দিয়ে বন্ধ ক'রে রাখতে পারেন।

ঘরের ভেতর দিয়ে যাবার সময় একটু দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতরটা একবার ভাল ক'রে দেখে নিলো। তারপর ঈষৎ মাথা নত ক'রে অভিবাদন জানালো, প্রার্থনা করি, আপনাদের রাত্রি শুভ হোক।

সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমরা অবশ্য দরজাতে তালা লাগাইনি। কেন যে লাগাইনি, তার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য আমাদের মনে ছিল না। আমার ভাগ্নী আর আমি, দু'জনে পরামর্শ ক'রে ঠিক ক'রে নিয়েছিলাম যে আমাদের জীবন-যাত্রার কোন পরিবর্তনই আমরা করবো না, বিন্দুমাত্র না; আমরা এমন একটা ভাব দেখালাম যেন সেই জার্মাণ অফিসরটির কোন অস্তিত্বই আমাদের কাছে নেই, বড় জোর মনে ক'রে নিয়েছিলাম যে, কোন অশরীরী প্রেতমূর্তি হয়ত আমাদের সঙ্গে বাস করছে, এই পর্যন্ত। হয়ত এই ব্যবস্থার পেছনে এই মনোভাবও সংগোপনে ছিল, নিজে যে-বেদনা সহ্য করতে পারি না, সে-বেদনা কাউকে দিতেও চাই না, হোক সে শত্রু।

বহুদিন ধরে, প্রায় এক মাসেরও ওপর, এই একই ব্যাপার প্রতিদিন সন্ধ্যায় ঘটতে লাগলো। অফিসরটি এসে প্রথমে করাঘাত করে, তারপর ঘরে ঢুকে, ঘরের ভেতর দিকে চলে যায়। আবহাওয়া সম্বন্ধে কিংবা সেদিনকার টেম্পারেচার অথবা ঐ জাতীয় কোন অপ্রাসঙ্গিক তুচ্ছ ব্যাপার সম্বন্ধে দু'-একটা কথা বলে। এই সব উক্তির মধ্যে একটা ব্যাপার কিন্তু প্রত্যেক দিনই সমান ভাবে থাকতো, কোন উত্তরের প্রয়োজন

* এক ধরণের বড় বাড়ীকে 'স্যাতু' বলে—অনুবাদক

বক্তা দাবী করতো না! প্রতিদিনই ছোট্ট দরজাটার সামনে কয়েক মুহূর্তের জন্যে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে নিতো…একটা ক্ষীণ হাসির ম্লান আভায় বোঝা যেত যেন এই ভাবে নিরীক্ষণ ক'রে দেখতে তার ভাল লাগছে—প্রতিদিন সেই একই ভাবে চেয়ে দেখা, একই ক্ষীণ হাসির রেখা। ঘর থেকে চলে যাবার আগে আমার ভাগ্নীর নত মুখের স্থির গম্ভীর নির্বাক্ রেখার দিকে একবার সে চোখ তুলে চাইতো এবং যে ভাবে তার মুখের ওপর থেকে অবশেষে সে চোখ ঘুরিয়ে নিতো তা থেকে বুঝতে পারতাম, ফরাসী তরুণীর সেই মুখের নীরব রেখার মধ্যে কোথায় যেন তার অন্তরের একটা সম্মতি ছিল। তারপর একটু মাথা নত ক'রে অভিবাদন জানিয়ে চলে যেতো, প্রার্থনা করি, আপনাদের রাত্রি শুভ হোক্!

প্রতিদিন সন্ধ্যায় এই একই ব্যাপার ঘটতো একই ভাবে।

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলা সব যেন নিমেষে বদলে গেল। বাইরে বৃষ্টির সঙ্গে গুঁড়ো-গুঁড়ো বরফ পড়ছিল…নিদারুণ ঠাণ্ডা…হাড়ে গিয়ে বিঁধছিল। ঘরের ভিতর আগুনখানায় মোটা মোটা কাঠ দিয়ে আগুনের আঁচ বাড়িয়ে তুলছিলাম, এই রকম শীতের রাত্রির জন্যেই এই সব মোটা কাঠ মজুত ক'রে রেখেছিলাম। নিজের অজ্ঞাতে মনে মনে ভাবছিলাম, জার্মাণ অফিসরটি এই সময় শীতে বাইরে কি করছে, হয়ত যখন আসবে তখন সর্বাঙ্গে পাউডারের মতন গুঁড়ো-গুঁড়ো বরফ জমে থাকবে। কিন্তু যে-সময় রোজ আসে, সে-সময় সে এলো না। এলো অনেক পরে। এতক্ষণ ধরে যে মনে মনে তার কথাই ভেবেছি, সে-কথা মনে করতেই নিজের ওপর বিরক্ত হ'য়ে উঠলাম। ভাগ্নী নীরবে বুনে চলেছিল…যেন তার সমস্ত মন সেই বোনার উপরেই।

অবশেষে পায়ের শব্দ কানে এলো…কিন্তু বাইরে থেকে নয়, বাড়ীর ভেতর থেকে। পায়ের অসমান শব্দে বুঝতে পারলাম, জার্মাণ অফিসারটি আজ অন্য দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে এবং এখন তার ঘর থেকে অন্য কোথাও যাচ্ছে। হয়ত ভিজে ইউনিফর্ম নিয়ে আমাদের সামনে এসে সে দাঁড়াতে চায়নি, তাতে তার সামরিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। হয়ত এই আশঙ্কাই তার কাছে বড় হয়েছিল। তাই সে বেশ-পরিবর্তন ক'রে আসছিল।

সেই পায়ের শব্দ, একটা ভারী আর একটা হাল্কা, সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসছে। তারপর সেই করাঘাত। দরজা খুলে তেমনি এসে দাঁড়ালো। পরনে আজ ছাইরঙা ফ্লানালের ট্রাউজার আর ইস্পাত-নীল টুইডের কোট। কোটের তলায় একটা গোলাপী রঙের পশমী পুলওভার, সুগঠিত দেহের পেশীর সঙ্গে যেন এঁটে রয়েছে।

—মাফ করবেন, বড্ড ঠাণ্ডা লেগেছে। ফেরবার সময় একেবারে ভিজে নেয়ে গিয়েছিলাম। আমার ঘরটা বড্ড ঠাণ্ডা, তাই কিছুক্ষণের জন্যে আপনাদের ঘরে আগুন পোয়াতে আসতে হলো।—এই ব'লে সে আগুনখানার কাছে কায়ক্লেশে নিজেকে দুমড়ে নিয়ে বসে পড়লো…দু'হাত বার ক'রে আগুনের আঁচের সামনে ঘোরাতে-ফেরাতে লাগলো।

তেমনি পা দুমড়ে হাঁটুর ওপর হাত রেখে, আগুনের দিকে পিঠ ক'রে ঘুরে বসলো। আগুনের আঁচে তৃপ্ত হয়ে বলে উঠলো, আঃ, চমৎকার!

তারপর আপনার মনেই বলে চললো, এ তো তেমন কিছু শীত নয়…ফ্রান্সে তেমন শীত আর কই পড়ে! আমার যেখানে দেশ, সেখানে কি ভীষণ ঠাণ্ডা…অত্যন্ত বেশী। গাছ বলতে শুধু ফার্ গাছ আর নিরেট-ঘন বন…তার ওপর লেসের মত কে যেন বরফ বুনে রেখেছে। তাই তুলনার কথা মনে হলে মনে হয়, আমাদের দেশটা যেন একটা বিরাট ষাঁড়ের মতন…অত্যন্ত পুরু তার গায়ের চামড়া…তার যতখানি শক্তি আছে, সবটুকুই তার দরকার শুধু নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে। এখানে তোমাদের দেশে…ফ্রান্সে—তার দরকার হয় না…এখানে মানুষের মন পায় প্রচুর অবকাশ…তাই ফ্রান্স হলো সুকুমার কবিতার দেশ।

তার কণ্ঠস্বরের মধ্যে কোন ব্যঙ্গের আমেজ ছিল না। বর্ণহীন…ঝংকারহীন। শুধু বিদঘুটে কড়া ব্যঞ্জনবর্ণের জায়গায় একটু যা জোর পড়তো, তা ছাড়া মোটামুটি শুনতে কতকটা যেন একঘেয়ে ঘুমপাড়ানী সুরের মতন।

উঠে দাঁড়িয়ে আগুনখানার মাথার ওপর হাতটা রাখলো। এত লম্বা যে সোজা দাঁড়াতে গিয়ে তাকে বাধ্য হ'য়ে একটুখানি কুঁজো হতে হলো। অনেকক্ষণ ধরে নিশ্চল চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইলো। যন্ত্রের মতন একভাবে ভাগ্নী বুনে চলেছিলো, একবারও মাথা তুলে দেখেনি। ইজি-চেয়ারের ওপর অনায়াসে অর্ধশায়িত অবস্থায় আমি নীরবে ধূমপান ক'রে চলেছিলাম। সেই অতল নীরবতার গুরুভারকে সরাতে পারে, এমন কিছুই আমার কল্পনায় ছিল না! ভেবেছিলাম, লোকটি যথারীতি শুভরাত্রি জানিয়ে এখনি চলে যাবে। কিন্তু

সেই মথিত একটানা ঘুমপাড়ানী সুর আবার জেগে উঠলো। তাতে যে ঘরের নীরবতা ভেঙ্গে গেলো, তা বলা চলে না, বরঞ্চ মনে হলো, তার আওয়াজটা সেই নীরবতার ভেতর থেকেই যেন বেরিয়ে আসছে।

যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখান থেকে না নড়ে সে বলে উঠলো, ফ্রান্সকে আমি চিরকাল ভালবেসে আসছি···চিরকাল। গত মহাযুদ্ধের সময় আমি শিশু ছিলাম···তখন মনে কি হতো তাতে কিছু যায়-আসে না। কিন্তু তারপর থেকে আমি বরাবরই ফ্রান্সকে ভালবেসেছি···অবশ্য দূর থেকে···মনে হয়েছে, সে যেন আমার রূপকথার রাজকুমারী···

হঠাৎ সে থেমে গেল। তারপর গম্ভীর ভাবে বললো, অবশ্য তার মূল কারণ হলো, আমার বাবা।

ঘুরে দাঁড়িয়ে জামার বুক-পকেটে হাত রেখে চিমনীর গায়ের ওপর হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। সামনেই অবশ্য একটা ইজিচেয়ার খালি পড়ে ছিল, কিন্তু তার ওপর বসবার কোন চেষ্টাই সে করলো না। শেষ দিন পর্যন্ত সে একবারও একটু ক্ষণের জন্যও বসেনি···আমরা কোন দিন নিছক লৌকিকতার খাতিরেও তাকে সামান্য কিছু দিতে চেষ্টা করিনি, সেও কোন দিন তা গ্রহণ করবার জন্যে বিন্দুমাত্র আকুলতা দেখায়নি।

শেষ কথাটার পুনরুক্তি ক'রে বলে উঠলো, হাঁ, আমার বাবাই হলো তার মূল কারণ। তিনি উদগ্র স্বদেশভক্ত ছিলেন। জার্মাণীর পরাজয়ে তাঁর বুকে নিদারুণ আঘাত লাগে। কিন্তু তবুও তিনি ফ্রান্সকে ভালবাসতেন। ব্রিঁয়াকে তিনি পছন্দ করতেন, ভাইমার রিপাবলিক আর ব্রিঁয়ার ওপর তাঁর আস্থা ছিল···অগাধ ছিল তাঁর উৎসাহ। বলতেন, ব্রিঁয়া একদিন স্বামি-স্ত্রীর মতন আমাদের এই দুটো জাতকে মিলিয়ে দেবে! তিনি ভেবেছিলেন, য়ুরোপের কালরাত্রি শেষ হয়ে এসেছে···তার আকাশে এইবার উঠবে প্রভাতের নতুন সূর্য···

কথা বলবার সময় সে আমার ভাগ্নীর দিকে এক-দৃষ্টিতে চেয়েছিল। অবশ্য পুরুষ যে-দৃষ্টি দিয়ে নারীর দিকে চায় সে-দৃষ্টি নয়···মানুষ পাথরের মূর্তিকে যে-দৃষ্টি দিয়ে দেখে, তার চোখে ছিল সেই দৃষ্টি। আর আমার ভাগ্নী, যদিও সামনে জীবন্ত সে বসেছিল, কিন্তু তার মধ্যে জীবনের কোন লক্ষণই ছিল না···পাথরের মূর্তি।

—কিন্তু ব্রিঁয়া হেরে গেল। বাবা বুঝলেন, ফ্রান্সকে এখনো নাকে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে চলেছে ফ্রান্সের ওপর-থাকের বুর্জোয়া দল, আমাদের উনড়েকের মতন লোক, আর আপনাদের হৃদয়হীন হেনরী বোরদো আর আপনাদের বুড়ো মার্শাল···। আমাকে একদিন বাবা বলেছিলেন, কোন দিন ফ্রান্সে যাবে না, যদি কোন দিন যাও তো মাথায় লোহার শিরস্ত্রাণ পরে আর পায়ের ফিলড-বুট দিয়ে যাবে। সে-সময় তিনি মৃত্যু-শয্যায় মুমূর্ষু ছিলেন, তাই তাঁর কাছে আমাকে সে-শপথ গ্রহণ করতে হয়। তাই এই যুদ্ধ বাধবার আগে পর্যন্ত আমি ফ্রান্স ছাড়া সমস্ত য়ুরোপকেই জানতাম।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকার পর হেসে বলে উঠলো, আমি এক জন সঙ্গীত-শিল্পী!

আগুনখানা থেকে একটা কাঠ ঠিকরে পড়ে গেল··· সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা আগুনের কণা বাইরে ছড়িয়ে পড়লো। জার্মাণ অফিসরটি লোহার চিমটে দিয়ে আগুনের ফুলকীগুলোকে তুলে ফেলে দিল। তারপর বলতে সুরু করলো, আমি অবশ্য নিজে গান গাই না, আমি গান রচনা করি। সেই হলো আমার আসল জীবন, আমার সমগ্র জীবন···তাই যোদ্ধার পোষাকে নিজেকে যখন দেখি তখন নিজেরই হাসি পায়। তবে, যুদ্ধ বেধেছে বলে আমার কোন ক্ষোভ নেই। আমার বিশ্বাস, এর ভেতর থেকেই একটা মহৎ কিছু সৃষ্টি হবে।

নিজেকে সোজা ক'রে নিয়ে পকেট থেকে হাত বার ক'রে ওপর দিকে অর্ধ-উত্তোলিত ক'রে ধরলো।

—ক্ষমা করবেন···হয়ত এমন কিছু বলে ফেলেছি যাতে আপনারা ক্ষুণ্ণ হতে পারেন। তবে জানবেন, যে-কথা আমি সত্যি বলে অন্তরে মানি, সেই কথাই প্রকাশ করে বলেছি এবং সত্যিকারের শুভকামনা নিয়েই বলেছি। কারণ বিশ্বাস করুন, ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি···ফ্রান্সের কল্যাণ-বোধ থেকেই যা-কিছু বলেছি। আমার বিশ্বাস, এই যুদ্ধের ভেতর থেকে ফ্রান্সের কল্যাণ, জার্মাণীর কল্যাণ আসবে। আমার বাবা যে-বিশ্বাস নিয়ে এই পৃথিবী থেকে চলে গিয়েছেন, সে-বিশ্বাস আমি আজও হারাইনি, য়ুরোপের আকাশে একদিন জেগে উঠবেই প্রভাতের সূর্য।

কয়েক পা এগিয়ে এসে ঈষৎ মাথা নত ক'রে সে অভিবাদন জানালো। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিদায়ের কালে যে-কথা সে বলতো আজও তাই বললো, প্রার্থনা করি, আপনাদের রাত্রি শুভ হোক্!

তারপর ঘর থেকে চলে গেল।

নীরবে পাইপের তামাক শেষ ক'রে বলে উঠলাম, হয়ত এই ভাবে একটা জবাবও না দিয়ে লোকটার প্রতি খুব রূঢ় ব্যবহারই করা হচ্ছে।

ভাগ্নী নীরবে শুধু একবার ঘাড় তুলে চাইলো।

চোখের ভ্রূ বিস্তার ক'রে বড় ক'রে চাইতে দেখলাম, তার চোখে আক্রোশের আগুন যেন জ্বলছে। সে অগ্নি-দৃষ্টিতে আমি নিজে লজ্জিত হয়ে পড়লাম।

সেই দিন থেকে তার আসার ধারা বদলে গেল। সেদিন থেকে তাকে ক্বচিৎ আর সামরিক পোষাকে দেখতে পেতাম। বাইরে থেকে এসে আগে বেশ পরিবর্তন করতো, তারপর দরজায় এসে টোকা দিত। তার এই বেশ-পরিবর্তনের মানে কি? সে যে আমাদের শত্রুপক্ষের লোক, সে-কথাটা সে আমাদের সামনে বড় ক'রে ধরতে চায় না? যোদ্ধা ছাড়াও সে যে মানুষ সেই দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। হয়ত এ দুটো কারণই একসঙ্গে হতে পারে। দরজায় টোকা মারার পরই সে ঘরে ঢুকে পড়তো, উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থেকে কোন লাভ নেই, কেন না, কোন উত্তরই যে আসবে না, সে-কথা সে বুঝে নিয়েছিল। অবশ্য সে একান্ত সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই জিনিসটাকে নিয়েছিল। ঘরের ভেতর আসবার জন্যে একটা অজুহাতও সে তৈরী ক'রে নিয়েছিল, আগুনের আঁচ পোয়াবার দরকার···সে অজুহাতের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে ঘরের ভেতর কারুর কিছু বলবারও ছিল না।

অবশ্য প্রতিদিনই সন্ধ্যায় যে সে আসতো তা নয়; তবে যে দিন সে আসতো, এমন কোন দিন হয়নি, যে দিন সে আমাদের সঙ্গে দু'-একটা কথা না বলে বিদায় নিয়েছে। ঘরের ভেতর ঢুকে সোজা আগুনখানার উপর সে ঝুঁকে দাঁড়াতো। হাতে কিম্বা পায়ে বা গায়ের অন্য কোন অংশে আগুন পোয়াতে পোয়াতে সে আপনার মনে সেই একঘেয়ে সুরে কথা বলতে সুরু ক'রে দিত—একাই বলে চলতো, তার নিজের দেশ, ফ্রান্স, সঙ্গীত, যে বিষয়গুলো তার মনকে সব সময় আচ্ছন্ন ক'রে ছিল সেই সব বিষয় নিয়েই কথা বলে যেতো। আমাদের সাড়া পাবার আশায় একবারের জন্যেও সে কোন চেষ্টা করতো না কিম্বা তার কথায় আমরা ঘাড় নাড়লাম কি না, সেটুকুর জন্যেও কোন আগ্রহ দেখাতো না। কোন দিনই সে বেশীক্ষণ ধরে কথা বলতো না—অন্তত প্রথম দিন যতটুকু কথা বলেছিল, তার বেশী আর কোন দিনই বলেনি। দু'-একটা কথা বলেই সে চুপ করে যেতো, তারপর হয়ত আবার দু'-একটা কথা বলতো··· প্রার্থনার মাঝখানে ক্ষণিক নীরবতা যেমন প্রার্থনাকে জোড়া দেয় তেমনি ধারা তার কথার মাঝখানে এই নীরবতার টুকরোগুলো তার বক্তব্যকে জোড়া দিতো। কখনও হয়ত আগুন-খানার সামনে স্থির নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে থাকতো, কখনো কখনো বা কথা বলতে বলতে ঘরের ভেতরকার কোন একটা জিনিসের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতো—কিম্বা দেয়ালের গায়ে কোন ছবির দিকে চেয়ে থাকতো। তারপর হঠাৎ কথা বলা বন্ধ হয়ে যেতো; মাথাটা ঈষৎ নত ক'রে শুভরাত্রি জানিয়ে ঘর থেকে চলে যেতো।

প্রথম প্রথম যখন আসতো, তখন আমার দিকে চেয়ে একদিন সে বলেছিল, আমার ঘরে যে-আগুন জ্বলে আর এই ঘরে যে-আগুন জ্বলছে, তার মধ্যে তফাৎ কি কিছু আছে? সেই কাঠ, সেই আগুনের আঁচ, সেই একই আগুন-খানা। কিন্তু তফাৎ বোধ হয় আলোটা। আলো যে জিনিসের ওপর পড়ে, ঘরের ভেতর লোকজনের ওপর হোক, কিম্বা ঘরের আসবাব-পত্র, ঘরের দেয়াল বা শেল্‌ফের বইয়ের ওপরই হোক তাতেই তার তফাৎ বোঝা যায়···

কিছুক্ষণ মনে মনে কি চিন্তা ক'রে সে হঠাৎ বলে উঠলো, এ-ঘরটা আমার এত ভাল লাগে কেন? ঘরটা যে দেখতে খুব সুন্দর, তা নয়···এই দেখুন, মাফ করবেন কি বলে ফেললাম! বলেই সে হেসে উঠলো!

—মানে, আমি যে কথা বলতে চাইছি, আপনাদের এই ঘর, এটি তো কোন মিউজিয়ামের ঘর নয়···মানে, এই ধরুন, আপনাদের আসবাব-পত্রগুলো—এগুলো এমন কিছু নয় যা দেখলেই লোকে বলে উঠবে বাঃ, কি সুন্দর! অথচ এই ঘর, এর একটা আলাদা সত্তা আছে···একটা আত্মা আছে···যেমন থাকে প্রত্যেক ঘরের, বাইরের চেহারা ছাড়া আর একটা সত্তা,··· আত্মা···

বলতে বলতে বই-এর শেল্‌ফের সামনে এসে সে দাঁড়িয়েছিল। শেল্‌ফের বই-এর মলাটের ওপর অতি সন্তর্পণে আঙুল বোলাতে বোলাতে এক একজন গ্রন্থকারের নাম উচ্চারণ ক'রে চলে,

···ব্যালজাক, ব্যারে, বদলেয়ার, বোমার্সেই, বোয়লু, বুর্ফো···সাতুব্রিয়াঁ, কর্ণেই, ডেকার্তে, ফেঁলোঁ, ফ্লবেয়ার···লা ফোনতেইন্, ফ্রাঁস, গ্যতেয়র, হুগো··· অপরূপ নামাবলী···প্রত্যেকটি নামই অমর···আর এ তো শুধু 'এইচ' পর্যন্ত এসেছি···এখনো বহু অক্ষর বাকি··· মলেয়ার···র‍্যাবালে, রেসিন্, পাস্কেল, ষ্টেনধাল, ভল্‌তেয়ার, মনটেইন্ আরো কত যে রয়েছে···

বই-এর শেল্‌ফের সামনে দিয়ে ধীর পদক্ষেপে যেতে যেতে মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে···হয়ত নতুন কোন নাম দেখে সে উচ্ছ্বাস জাগে।

আপনার মনে বলে, কিন্তু ইংরাজদের কথা বলতে গেলে একটা নামই সঙ্গে সঙ্গে জেগে ওঠে, শেক্স্পীয়ার। ইতালীয়ানদের তেমনি দান্তে, স্পেনের, সারভেনৃতিস্! আর আমাদের গ্যোয়টে! সেই একটি নামের পর আবার যদি কোন নাম উচ্চারণ ক'রতে হয়, তাহলে একটু থেমে ভেবে-চিন্তেই করতে হবে। কিন্তু ফ্রান্সের কথা যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে? তা হ'লে শুধু কি একটা নামই ঠোঁটের ডগায় আসে? কার নাম আসবে? মলেয়ার? রেসিন? হুগো? ভলতেয়ার? র‍্যাবেলা? যেন সবাই একসঙ্গে থিয়েটারে ঢোকবার দরজায় হুড়োহুড়ি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, কা'কে আগে ঢুকতে দেবেন আপনি?

বই-এর শেল্ফের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আকুল আগ্রহে বলে ওঠে, কিন্তু সঙ্গীতের ব্যাপার যেখানে, সেখানে কিন্তু আমার দেশ! তখন আমাদের পালা, কোন্ নাম ছেড়ে কোন্ নাম করবো? বাক্, হাণ্ডেল, বিটোফেন, হ্বাগ্নার, মোজার্ট···কার নাম আগে উচ্চারণ করবেন?

কয়েক মুহূর্ত থেমে ঘাড় নেড়ে ধীরে স্থিরকণ্ঠে বলে, তবু আমরা···ফরাসী আর জার্মাণরা, পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করবার জন্যে যুদ্ধে যেতে উঠেছি!

কথা বলতে বলতে ইতিমধ্যে সে আবার আগুন-খানার কাছে ফিরে এসেছে···ভাগ্নীর অবনত মুখ-রেখার দিকে স্মিতহাস্যে চেয়ে থাকে।

—কিন্তু এই হলো শেষবার! আর আমরা এই ভাবে এই দু'র্জাত যুদ্ধে পরস্পরকে খুন করতে ছুটবো না। আমরা দেবো ফ্রান্সের আর জার্মাণীর বিবাহ!

তার চোখের ভ্রূ বিস্তৃত হয়ে উঠলো, দুই গালের দুই গর্ত যেন হঠাৎ বুঁজে দুটো রেখায় পরিণত হলো··· ঠোঁটের ভেতর থেকে সাদা দাঁতগুলো ঝক্ঝক্ ক'রে উঠলো।

নিজের কথায় নিজেই ঘাড় নেড়ে যেন সম্মতি জানিয়ে সে আনন্দিত কণ্ঠে বলে উঠলো, হাঁ, হাঁ, আমি যা বলছি, তাই সত্য হবে! যখন ফ্রান্সের ভেতর বিজয়ী বেশে আমরা প্রবেশ করলাম, তখন সেখানকার লোকেরা দেখলাম আমাদের ভাল ভাবেই গ্রহণ করলো। বড় আনন্দ হলো। কিন্তু কয়েক দিন যেতে-না-যেতেই বুঝলাম, সে দিন যা দেখেছিলাম, তা ভুল। লোকে ভয়ে কাপুরুষতায় আমাদের সেই ভাবে গ্রহণ করেছিল।

বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর সুগম্ভীর হয়ে উঠলো।

—সেই সব কাপুরুষদের দেখে মন ঘৃণায় ভরে উঠলো···ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ ভেবে আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম। ভাবলাম, সত্যিই কি ফ্রান্স আজ এই রকম কাপুরুষ হয়ে গিয়েছে? না, না, তা হতে পারে না। তারপর থেকে আমি আরো ঘনিষ্ঠ ভাবে ফ্রান্সকে দেখবার সুযোগ পেয়েছি, দেখেছি তার দুর্দান্ত অন্তরের কঠোরতাকে···দেখে তৃপ্ত হয়েছি!—

হঠাৎ সে আমার দিকে চোখ তুলে চেয়ে দেখলো। আমি দৃষ্টি সরিয়ে নিলাম। আমার মুখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে সে ঘরের আসবাব-পত্রের দিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চাইতে চাইতে অবশেষে আমার ভাগ্নীর সুকঠোর উদাসীন প্রস্তর-স্থির মুখের ওপর আবার দৃষ্টিনিবদ্ধ করলো।

স্থিরকণ্ঠে বলে উঠলো, এই বাড়ীতে এসে সর্বপ্রথম আমি এমন একজন প্রৌঢ় ব্যক্তির দেখা পেলাম, যিনি নিজের মর্যাদা বজায় রাখতে জানেন, এমন একজন তরুণীর দেখা পেলাম, যিনি জানেন কি ক'রে নীরব থাকতে হয়। এই নীরবতাকে আমাদের জয় করতে হবে। সমগ্র ফ্রান্সের এই নীরবতাকে জয় করতে হবে। এই জয়ের মধ্যে আনন্দ আছে।

নীরবে সে ভাগ্নীর সেই প্রস্তর-স্থির অবিচল-উদাসীন সুকোমল মুখ-রেখার দিকে চেয়ে থাকে। চেয়ে থাকতে থাকতে তার নিজের মুখের চেহারা স্থির গম্ভীর হয়ে ওঠে কিন্তু সে গাম্ভীর্যের মধ্যে খুঁজে দেখলে তখনও পর্যন্ত একটা ক্ষীণ হাসির ভগ্নাবশেষ দেখা যেতো। দেখলাম, আজ তার এই স্থির দৃষ্টি যেন তরুণীর পাষাণ-স্থির অন্তরে ঈষৎ আলোড়ন নিয়ে এসেছে, দেখলাম, সে যেন ঈষৎ রক্তিম হয়ে উঠলো, দুই চোখের ভ্রূর মাঝখানে যেন একটা কুঞ্চন-রেখা দেখা দিলো। হঠাৎ হাতের সূঁচ অতিরিক্ত দ্রুত চলতে আরম্ভ করলো, ফলে এক-আধ বার সূঁচ থেকে সুতো খুলেও গেল।

তেমনি ধীর একমাত্রিক সুরে জার্মাণ অফিসরটি বলে চললো, হাঁ, সেই পথই ভাল···ঢের ভাল। সে পথে চললে, একদিন যে মিলন হবে, তাতে আর বিচ্ছেদের ভয় থাকবে না···দু'জনার মহত্ত্বে এই যে মিল, তাতে দুজনাই লাভবান হবে···। ছেলেদের জন্যে একটা চমৎকার সুন্দর গল্প আছে···আমি সে গল্প পড়েছি···আপনারাও পড়েছেন···সকলেই পড়েছে। জানি না, সব দেশেই সেই গল্প এক নামে পরিচিত কিনা। আমাদের ভাষায় সেই গল্পের নাম আমরা দিয়েছি···ডাস্ ট্যায়ার উন্ড্ ডি স্কুন্···রূপসী নারী আর পশুর কাহিনী···পশুর কাছে রূপসী বন্দী, শৃঙ্খলিতা···পশুর খেয়াল-খুসীর ওপর নির্ভর ক'রে

তাকে বেঁচে থাকতে হয়। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত সে তার ক্ষমাহীন হিংস্রতায় রূপকুমারীকে আচ্ছন্ন অভিভূত করে থাকে…। রূপকুমারীর অন্তরের আত্মগরিমা আর গর্বে আঘাত লাগে…হৃদয়কে সে পাষাণ করে ফেলে। ..কিন্তু পশুকে সে যতখানি নীচ মনে করেছিল, একদিন দেখে সত্যি তত নীচ সে নয়। তার বাইরেটা মার্জিত নয়, সে বিশাল, সে বীভৎস, রূপকুমারীর অনবদ্য রূপের পাশে তাকে আরো কুৎসিত দেখায়। কিন্তু তবুও ..তারও হৃদয় আছে…সে-হৃদয় চায় তার নিজের বীভৎসতাকে ছাড়িয়ে উঠতে…যদি রূপকুমারী তাকে ভালবাসে, তাকে চায়। কিন্তু দিনের পর দিন চলে যায়…রূপকুমারীর পাষাণ মন পাষাণ হয়েই থাকে।… অবশেষে…বহু বহু দিন পরে ..একটু একটু করে রূপ-কুমারীর নজরে পড়ে তার বীভৎস কারারক্ষীর চোখের দৃষ্টির পেছনে নাচে যে আলো -যে-আলোর লেখা থাকে তার বন্য হৃদয়ের মিনতিভরা ভালবাসা। তার বুনো হাতের বোঝার ভার ক্রমশ একটু একটু করে কমে আসতে থাকে, তেমন করে আর বাজে না তার পায়ের বন্ধন-শৃঙ্খল। ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে নারীর মনে ঘৃণা…সেই বুনো পশুর অবিচল নিষ্ঠা আর ধৈর্য টলিয়ে দেয় পাষাণকে…রূপকুমারী আনন্দে তার হাত বাড়িয়ে দেয় বুনো পশুকে। সহসা সেই মুহূর্তে সব যায় বদলে …যে যাদুমন্ত্রে বাধা পড়ে সে পশু হয়েছিল, ভেঙ্গে যায় সে-যাদুর প্রভাব…তার জায়গায় জেগে ওঠে রাজার কুমার, সুস্নিগ্ধ মূর্তি অনিন্দ্যসুন্দর সুশোভন…চুম্বনে চুম্বনে রূপকুমারী সার্থক ক'রে তোলে নিজেকে। তাদের মিলনে পুরোহিত হয়ে আসে আনন্দের দেবতা নিজে। সেই মিলনের ফলে আসে সুন্দর শিশুর দল, বাপ আর মায়ের যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তাই অঙ্গে বহন ক'রে তারাই হয় নতুন পৃথিবীর সেরা মানুষ ..এ গল্প নিশ্চয়ই আপনারা জানেন! আপনাদেরও নিশ্চয়ই ভাল লাগে …আমার দিক থেকে বরাবরই আমার ভাল লাগে… বার বার পড়েছি…বহুবার পড়েছি। পড়তে পড়তে উচ্ছ্বাসে আমার কণ্ঠ কান্নায় ভরে আসতো…সেই বুনো পশুকে আমি ভালবেসে ফেলেছি…তার মর্ম-যাতনা আমি যে জানি। আজও, এই এখন, তার কথা বলতে আমার মন উদ্বেল হয়ে উঠলো…

হঠাৎ সে নীরব হয়ে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস বুক থেকে টেনে নিয়ে ঈষৎ মাথা নত ক'রে অভিবাদন জানালো,

—প্রার্থনা করি, আপনাদের রাত্রি শুভ হোক্!

তার পর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একদিন সন্ধ্যাবেলা ওপরে আমার ঘরে তামাক খুঁজতে গিয়ে শুনি, কে-যেন হার্মোনিয়াম বাজাচ্ছে। ঠিক এই যুদ্ধের আগে আমার ভাগ্নী সেই সময়কার প্রচলিত একটা সঙ্গীত বাজনায় তোলবার জন্যে কসরৎ করছিল। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা বন্ধ হ'য়ে যায়। বাজনার সামনে গানের স্বরলিপির বইখানার পাতা যেমন খোলা ছিল, তেমনি খোলাই পড়ে থাকে। কোন দিন আর ভাগ্নী সেই পাতা উল্টে দেখেনি। তাই সেদিন সেই গানেরই গৎ কানে আসতে, প্রথম মনে হয়েছিল, সে বুঝি আবার সেই অসমাপ্ত শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করবার চেষ্টায় বসেছে। আনন্দে ও বিস্ময়ে ভাবলাম, হঠাৎ তার এই ভাবান্তর ঘটলো কি করে? অন্তরের কোন্ সুনিবিড় প্রয়োজনে হঠাৎ আবার সে বাদ্য-যন্ত্রের কাছে নিজেকে নিয়ে যেতে পারলো? কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়লো, সে তো নয়, সে তো নীচের ঘরে তার আপন কেদারা থেকে তার সোনার কাজ ফেলে এক দণ্ডের জন্যেও অন্য আর কোন কাজে হাত দেয় নি। ঘরে ফিরে এসে তার দিকে চাইতে, সে নীরব দৃষ্টি দিয়ে আমাকে কি বললো, তার পাঠোদ্ধার করতে পারলাম না। ওপরের ঘরে গিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম, জার্মাণ অফিসারটি বাজাচ্ছে… যন্ত্রের সামনে তার আনত দেহের রেখা চোখে পড়লো …আঙ্গুলগুলো হার্মোনিয়ামের চাবির ওপর দিয়ে এমন ভাবে যাতায়াত করছে যেন সেই স্পর্শের বেগে তারা সব জীবন্ত হয়ে উঠছে।

সেই সঙ্গীতের ভূমিকা-অংশটুকু বাজিয়ে সে উঠে পড়লো। এবং উঠে আমাদের ঘরে যথারীতি আগুন-খানার সামনে এসে দাঁড়ালো।

কানে কানে কথা বলার মতন আস্তে, সেই উদাসীন বর্ণহীন কণ্ঠে সে বলে উঠলো, সঙ্গীতটার ঐ আরম্ভটুকু, ওর চেয়ে সুন্দর আর কিছু হতে পারে না। সুন্দর বললে হয়ত ওকে বোঝান যায় না! মানুষের অস্তিত্বের বাইরে…আমাদের এই রক্তমাংসের দেহের উর্ধ্বে… হয়ত সেখানে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারি…বুঝতে পারা নয়, শুধু অনুভব করতে পারি…না, না, অনুভব নয়…একটা আলোক-ইঙ্গিত…যে-ইঙ্গিতে ফুটে ওঠে প্রকৃতির অন্তরে লুকোন আছে যে অজ্ঞেয় চেতনা…প্রকৃতি থেকে একে একে সব খুলে নিলে শেষকালে পড়ে থাকে যে চেতনাটুকু…অন্তরের আলো…হাঁ ..হাঁ…এ সঙ্গীত হলো সেই অতিমানব-চেতনা…

-যেন তার স্বপ্নের নীরবতায় সে আপনার মনে একটার পর একটা চিন্তার বীজ বপন ক'রে

চলেছে··· নিজের অন্তরকে নিজেই অনুসরণ ক'রে চলেছে।

—বাক্···তিনিও সেখানে পুরোদস্তুর জার্মাণ··· মানে, জার্মাণ-সঙ্গীত-প্রতিভার সেই হলো বৈশিষ্ট্য, সুরের মধ্যে অতি-মানবকে খুঁজে বার করা···অতি-মানব মানে আমি বলতে চাইছি, এই প্রতিদিনের মানুষের নাগালের বাইরে আর এক স্তরের কোন মানুষ···

কয়েক মুহূর্তের জন্যে সে নীরব হয়ে যায়:

—এই ধরণের সঙ্গীত আমি ভালবাসি, সর্বান্তঃকরণে ভালবাসি, আমাকে অভিভূত ক'রে ফেলে ···মনে হয়, আমার মধ্যে যেন সেই মুহূর্তে স্বয়ং ভগবান জেগে উঠেছেন···কিন্তু···তবুও···তাকে যেন একান্ত আপনার বলে গ্রহণ করতে পারি না:

···আমার দিক থেকে, আমি যদি কোন দিন সঙ্গীত রচনা করি, তাহলে এমন সঙ্গীত রচনা করবো যা প্রতিদিনের মানুষ তার আপনার ধন বলে সহজে গ্রহণ করতে পারে:

আলাদা পথ, কিন্তু এ পথ দিয়েও মানুষ চরম সত্যের কাছে পৌঁছতে পারে। সেই হলো আমার পথ···অন্য আর কোন পথে আমি চলতে চাই না··· কেমন যেন পারিও না। আজ আমি তা বুঝেছি··· সম্পূর্ণ ভাবে বুঝেছি। কখন থেকে বুঝেছি? এখানে এসে বাস করবার পর থেকে···।

আমাদের দিকে পেছন ফিরে আগুনখানার ঢাকনার ওপরে হাত দুটো রাখে। হাতের আঙুলগুলো দিয়ে জোরে তাকে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করে। হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে জ্বলন্ত আগুনের দিকে চেয়ে থাকে, যেন গরাদের ফাঁকের ভেতর দিয়ে দেখছে। কণ্ঠস্বর আরো কোমল হয়ে আসে···যেন নিজেকেই নিজে ঘুম পাড়াচ্ছে···

আজ একান্ত ভাবে আমার প্রয়োজন ফ্রান্সকে। কিন্তু আমি জানি, এ আমার চাওয়ার অতিরিক্ত চাওয়া ···আমি চাইছি ফ্রান্স আমাকে সাদরে আহ্বান ক'রে নিক্। অজানা পথিক হয়েই আসি, কিংবা আসি বিদেশী পর্যটকরূপে কিংবা যদি আসি বিজয়ী হয়েই, তাতে কি যায়-আসে! সে ক্ষেত্রে ফ্রান্স তো আমাকে কিছুই দিলো না, তার কাছ থেকে জোর ক'রে নিতে পারি এমন তো কিছুই নেই। তার যা-কিছু দেবার শ্রেষ্ঠ ধন, তার যা-কিছু ঐশ্বর্য, সে তো জয় ক'রে নেওয়া যায় না; তা নিতে হলে, তার বুক থেকে তার মাতৃস্তন থেকে পান ক'রে নিতে হবে। সেই শুধু পাবে, জননীর অন্তরের স্বাভাবিক আগ্রহে, তার অমৃত-উদ্বেল মাতৃস্তন শিশুর তৃষ্ণার্ত মুখে অবারিত তুলে ধরতে।···আমি জানি, তা গ্রহণ করা অনেকখানি নির্ভর করে আমাদের ওপর··· কিন্তু···তার দিক থেকেও কম নির্ভর করে না। তাকে বুঝতে হবে যে আমরা তৃষ্ণার্ত, সে-তৃষ্ণা দূর করতে তাকে রাজী হতে হবে, তার অবারিত বুকে আনন্দে আমাদের টেনে নিতে তাকেও এগিয়ে আসতে হবে···

সে তেমনি পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে সেই পাথরের ঢাকনাকে আঙুল দিয়ে নিষ্পেষণ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। গলার স্বরটা একটু চড়িয়ে আবার বলে, আমার দিক থেকে আমি বলতে পারি, আমাকে দীর্ঘ দিন এখানে থাকতে হবে। এই রকম কোন বাড়ীতে··· এই গাঁয়েরই অন্য আর সব ছেলের মতন এই গাঁয়েতেই···আমাকে থাকতে হবে···আমি থাকবোই···

অতঃপর সে নীরব হয়ে যায়। তারপর ঘুরে সোজা আমাদের দিকে ফিরে দাঁড়ায়। স্থিরবদ্ধ দৃষ্টিতে আমার ভাগ্নীর দিকে চেয়ে থাকে, ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসি ফুটে ওঠে।

সে বলে, যা-কিছু বাধা, যা-কিছু বিপত্তি, তাকে জয় করতে হবে। অন্তর দিয়ে যদি কামনা করা যায়, আমি জানি, এই মানুষের অন্তরই পারে সব বাধার উর্ধ্বে উঠতে।

তারপর ঈষৎ মাথা নত ক'রে অভিবাদন জানায়:

প্রার্থনা করি, আপনাদের রাত্রি শুভ হোক্।

তারপর ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সেই শীতার্ত শত রাত্রির মধ্যে সে যে কত কথা বলেছিল, আজ আর তা সব স্মরণে নেই, তবে বক্তব্যের মধ্যে বিশেষ কিছু বৈচিত্র্য ছিল না। ফ্রান্সকে সে নতুন ক'রে আবিষ্কার করেছে, সেই এক বিষয় সম্বন্ধে দীর্ঘ মনোচ্ছ্বাস। যেদিন সে ফ্রান্স থেকে দূরে ছিল, ফ্রান্সকে চিনতো না, সেদিন থেকেই তাকে কি ভাবে ভালবাসতো, তারপর এখানে যখন বাস করতে এলো, প্রতিদিন কি ভাবে তার সেই ভালবাসা বেড়ে চলেছিল ···শুধু সেই একই কথার দৈনন্দিন পুনরাবৃত্তি। এবং বিশ্বাস করুন, এর জন্যে অন্তর থেকে তাকে আমি শ্রদ্ধাই করতাম। হাঁ, শ্রদ্ধা করতাম, কারণ, কোন কিছুতেই সে নিরুৎসাহ হতো না, কোন দিন এমন কি সামান্যতম গলার জোর দেখিয়ে আমাদের সেই পর্বত-প্রমাণ উদাসীন নীরবতার অসহ্য বোঝাকে নাড়া দেবার চেষ্টা পর্যন্ত করতো না···বরঞ্চ, যখন তার

আসার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘরটা, অদৃশ্য ভারী গ্যাসের মত, যে গ্যাস নিশ্বাসে গ্রহণ করতে মানুষ পারে না, সেই গ্যাসের মত নীরবতায় ভরে যেতো, ঘরের প্রত্যেকটি কোণ যখন সেই নীরবতায় টইটম্বুর হয়ে উঠতো, আমাদের তিন জনের মধ্যে একমাত্র সে-ই একান্ত স্বচ্ছন্দ ভাবে সেই নীরবতার পাষাণ-ভারকে গ্রহণ করতে পারতো। যেদিন সে প্রথম এসেছিল, সেদিন ঠিক যেমন স্মিত হাস্যের সঙ্গে সুগভীর দৃষ্টি দিয়ে আমার ভাগ্নীর দিকে চেয়েছিল, প্রতিদিন সেই একই স্মিত সুগম্ভীর দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকতো··আমার মনে হতো, সেই তরুণী তার চার দিকে নিজের হাতে নীরবতার যে কারাগার রচনা করেছিল, সেই কারাগারের মধ্যে তার নিজেরই অন্তর ক্রমশ উদ্বেল হয়ে উঠছিল। আমি কতকগুলো লক্ষণ থেকে তা বুঝতে পারতাম, দেখতাম তার আঙুলগুলো সহসা কি রকম চঞ্চল হয়ে উঠতো। ক্রমশ যখন দেখলাম, ওয়ার্ণার ফন্ এব্রেনাক তার ঘুমপাড়ানি একঘেয়ে আওয়াজের ক্রমান্বয় আক্রমণে সেই অচল নীরবতার প্রাচীরকে স্বচ্ছন্দে উল্লঙ্ঘন করে গেলো, তখন সেই বদ্ধ আবহাওয়ায় স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস নেওয়া যেন আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠলো।

অধিকাংশ সময় সে নিজের সম্বন্ধেই বলতো··

—আমার যেখানে বাড়ী, চারদিকে তার ঘন বন; সেইখানেই আমি জন্মেছি: সেই বন পেরিয়ে ছেলে-বেলায় আমাকে গাঁয়ের পাঠশালায় পড়তে যেতে হতো···সেইখানেই আমার সমস্ত শৈশব কেটে যায়··· পরীক্ষা দেওয়ার সময় সেই প্রথম গাঁ ছেড়ে মিউনিকে আসি···তারপর সঙ্গীত শিক্ষার জন্য সাল্‌সবুর্গে যাই। তারপর থেকে সেইখানেই বাস করছি। বড় বড় শহর আমার মোটেই ভাল লাগে না। লণ্ডন, ভিয়েনা, রোম, প্যারিস, সবই আমি দেখেছি··জার্মাণীর বড় বড় শহরগুলো সবই দেখেছি··কিন্তু সেখানে থাকতে আমার আদৌ ভাল লাগে না। একমাত্র ভাল লেগেছিল প্রাগ শহর, মনে হয় আর কোন শহর প্রাগের মতন অন্তর-সচেতন নয়। অবশ্য নুরেমবুর্গের কথা আলাদা। সেই একটি মাত্র শহর, যার নাম করলে প্রত্যেক জার্মাণের বুকটা দুলে ওঠে, কারণ তার পথে, তার গলি-গলিতে আছে অতীত দিনের এমন সব মহাপুরুষের স্মৃতি যারা আমাদের অন্তরের আত্মীয়···নুরেমবুর্গের প্রত্যেক পাথরের টুকরোটা স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁদের, যাঁরা একদিন অতীত জার্মাণীর গৌরবের জন্ম দিয়েছিলেন। আমার মনে হয়, প্রত্যেক ফরাসী ঠিক এই একই ভাবে দেখে তাদের সাঁত্রের গির্জা-শহরকে। আমি জানি, প্রত্যেক ফরাসী সেই সব গির্জার দ্বারে দাঁড়িয়ে অনুভব করে তাদের পিতা-পিতামহের বিদেহী অস্তিত্বকে, তাদের অতীত দিনের অন্তরের অবিনাশী সৌন্দর্য···তাদের বিশ্বাসের সুমহান্ আদর্শ, তাদের জীবন-যাত্রার সুন্দরতম বিকাশ তাদের অন্তরকে আজও ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যায়। ভাগ্য-তাড়িত হয়েই আমি সাঁত্রেতে গিয়েছিলাম। সত্যি দূর থেকে তার নীল-নীলা রূপ, তার পরিপক্ক শস্যের স্বচ্ছ স্বর্ণাভ রঙের ওপর যখন চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, অন্তর বিমোহিত না হ'য়ে থাকতে পারে না। প্রাচীন কালে যারা এই শহরে আসতো, পায়ে হেঁটে, ঘোড়ায় চড়ে, গাড়ীতে ক'রে, তাদের মনের আনন্দ-উচ্ছ্বাসের পরিমাণ আমি আমার অন্তর দিয়ে পরিমাপ করবার চেষ্টা করি। মনে মনে তাদের আনন্দের অংশ আমি গ্রহণ ক'রে উপভোগ করি, তাদের ভালবাসি। দুরন্ত সাধ হয় মনে, আমি যদি এদের সহোদর হতাম।

বলতে বলতে তার মুখের রেখা কঠিন হয়ে উঠে।

—অবশ্য একটা পেল্লায় সাঁজোয়া গাড়ীর ভেতর বসে যে সাঁত্রেতে এসেছিল, তার সম্বন্ধে এ-সব কথা বিশ্বাস করতে মন চাইবে না। কিন্তু তবুও সেইটেই সত্যি। একজন জার্মাণের বুকে যে এ-সব চিন্তা কি গভীর আলোড়ন জাগিয়ে তুলছে, তা কে বিশ্বাস করবে?

নিজের মনেই সে হেসে উঠলো, ক্ষীণ হাসি কিন্তু ক্রমশ সমস্ত মুখটা একটু একটু করে সে-হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে আবার বলে চললো:

—আমার দেশের যে বাড়ী, সেই বাড়ীর এক রকম পাশেই একটি মেয়ে বাস করে। দেখতে রীতিমত সুন্দর···বড় মধুর। অন্তত আমার বাবা খুবই খুসী হতেন যদি আমি সেই মেয়েটিকে বিয়ে করতাম। যখন বাবা মারা গেলেন, তখন আমাদের দুজনের বিয়ের কথা এক রকম প্রায় পাকাই হয়ে গিয়েছিল, তার আত্মীয়-স্বজনেরা নিশ্চিন্ত মনে আমার সঙ্গে একলা তাকে বেড়াবার জন্যে ছেড়ে দিতো।

শেলাই করতে করতে হঠাৎ ভাগ্নীর সূঁচ থেকে সুতোটা খুলে যায়। যতক্ষণ না আবার সূঁচে সুতো পরাতে পারলো ততক্ষণ পর্যন্ত এব্রানেক কথা না বলে চুপ ক'রে থাকে। অবশ্য একান্ত ভাবে মনঃসংযোগ ক'রে সে সুতো পরাতে চেষ্টা করে, কিন্তু সূঁচের মুখটা এত সরু যে অনায়াসেই তা হ'য়ে উঠলো

ে।। কয়েক বার ব্যর্থ চেষ্টার পর আবার সুঁচ চলতে লাগলো।

সে-ও বলে চললো, একদিন আমরা দুজনে বনের মধ্যে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমাদের চারদিকে খরগোস আর কাঠবেড়ালী নির্ভাবনায় ছুটে বেড়াচ্ছিল। নানা রকমের সব ফুল, নর্সিসাস্, বনো হায়াসিন্থ, আমারিলিস্, চারিদিকে ফুটেছিল। আনন্দে মেয়েটি মাঝে মাঝে চিৎকার ক'রে উঠছিল বলছিল, ওয়ার্ণার, সত্যি আমি সুখী, একান্ত ভাবে সুখী, আমার চারদিকে ভগবানের এই-সব দান, কি অপূর্ব সুন্দর···কি যে ভাল লাগে আমার। আমারও ভাল লাগছিল। লতাকুঞ্জের মাঝখানে শৈবাল-আচ্ছাদনের ওপর দুজনে শুয়ে পড়লাম। দুজনের মধ্যে কেউই মুখ থেকে কোন কথা বার করিনি। মাথার ওপর নির্নিমেষ দৃষ্টিতে দেখছিলাম, ফারগাছের উঁচু ডালগুলো কি রকম বাতাসে হেলছে-দুলছে, ডাল থেকে ডালে পাখীরা কি ভাবে উড়ে-উড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ মেয়েটি কেঁদে উঠলো, ইস্, আমাকে কামড়ে দিয়েছে, আমার চিবুকের ওপর, হতভাগা পাজী। সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম হাত বাড়িয়ে পতঙ্গটাকে ধরবার চেষ্টা করছে। এবং ধরলোও।

ওয়ার্ণার, দেখ, দেখ, একটাকে ধরেছি···আচ্ছা ক'রে শাস্তি দিচ্ছি···এই···একটা · আর একটা সব পা ক'টা···ছিঁড়ে ফেললাম···।···এবং সত্যি, সে তাই করলো···

অকস্মাৎ তার চরিত্রের সেই সংগোপন দিকটি আমার চোখ খুলে দিলো। সৌভাগ্য বশতঃ তার পাণি-প্রার্থীর অভাব ছিল না। এবং তার জন্যে আমার এতটুকুও খেদ জাগে নি। সেই দিন থেকে কি জানি কেন, জার্মাণ মেয়েদের কথা মনে হলেই যেন মন ভয়ে সরে আসে···

তারপর নিজের প্রসারিত করপুটের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে বললো,

—আমাদের রাজনৈতিকরাও ঠিক ঐ এক জাতেরই লোক। সেই জন্যে আমার বন্ধুদের সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও তাদের রাজনৈতিক দলে আমি যোগদান করতে পারি নি। না···সত্যিই পারি নি···পারবোও না··· বরঞ্চ সারা জীবন বাড়ীতে ঘরের কোণে বসে থাকবো। অবশ্য সঙ্গীত নিয়ে নাম করতে হলে, এ-পন্থা অবলম্বন করলে চলে না, তা আমি জানি। কিন্তু নিজের স্বচ্ছ বিবেকের কাছে পর্বত-প্রমাণ জাগতিক উন্নতিও কিছু নয়। আমি জানি আমার বন্ধুদের এবং স্বয়ং আমার কুহ্‌.রায়ের মনে অনেক বড় বড় সব ভাব আছে, সুন্দর সুন্দর সব অনুভূতি, কিন্তু একথাও আমি জানি, সুযোগ পেলেই তাঁরা সেই মেয়েটির মতন সামান্য একটা পতঙ্গের একটি একটি ক'রে পা ছিঁড়ে ফেলতে দ্বিধা করবেন না। জার্মাণরা যখন একলা থাকে, তখন তাদের মনে সেই প্রবৃত্তিই প্রবল হয়ে থাকে আর একলা থাকা···। যখন কোন রাজনৈতিক দল শক্তি আয়ত্ত করে, সিংহাসন দখল করে, তখন সেই দলের লোকদের মতন একলা জীব দুনিয়ায় আর কেউ নেই।··· সৌভাগ্যের বিষয়, এখন এই মুহূর্তে তারা একলা নেই··· তারা ফ্রান্সের মধ্যে এসে পড়েছে। ফ্রান্স তাদের এই একলা থাকার ব্যাধি সারিয়ে দেবে এবং বিশ্বাস করুন আমি সত্যি কথাই বলছি, সে-কথা তারা জেনেই এসেছে। তারা জানে, বিজয়ী হয়ে তারা ফ্রান্সের কাছ থেকে শিখে যাবে কি ক'রে সত্যিকারের মহৎ হতে হয়, কি ক'রে অন্তরকে শুদ্ধ রাখতে হয়।

দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে, আপনার মনে কি-যেন কথা বলবার চেষ্টা করলো কিন্তু প্রত্যেক বারই কথাগুলো যেন ভেতর থেকে নিজেই গিলে নিলো। তারপর আপনার মনে বলে উঠলো, কিন্তু তার জন্যে দরকার, ভালবাসা··· ফ্রান্সের কাছ থেকে ভালবাসা···

দরজাটা ঈষৎ খুলে বাইরের দিকে এক পা বাড়িয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে সেই নীরব-রতা তরুণীর প্রস্তর-শুভ্র স্কন্ধমূলের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ·কুঞ্চিত কালো কেশগুচ্ছ সেখানে অলস ভাবে দুলছে···সেই অবনত-মুখ নীরবতার প্রতিমূর্তির দিকে চেয়ে শান্ত আত্মস্থ কণ্ঠে বলে, সে ভালবাসা, আমি জানি, প্রত্যাখ্যাত হবে না।

তারপর ঘাড় সোজা ক'রে সামনের দিকে চেয়ে দরজা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে নিত্য-নৈমিত্তিক বিদায়-বাণী উচ্চারণ করে,

—প্রার্থনা করি, আপনাদের রাত্রি শুভ হোক্!

এই ভাবে অবশেষে এলো বসন্তের দীর্ঘ দিন। বিদায়-সূর্যের বিলম্বিত রক্ত-আলোর শেষ ঝিকিমিকির সঙ্গে সে ওপর থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামতো। পরনে, সেই ছাই-রঙা ফ্লানেলের ট্রাউজার, গায়ে আর একটা হাল্কা রঙের পশমী জ্যাকেট, মনে হয়, বাড়ীতে তৈরী করা। একদিন একটা বই হাতে ক'রে নেমে এলো, বই-এর ভেতর একটা আঙুল গোঁজা। মুখে অর্ধ-স্ফুট হাসি, সে-হাসির অর্থ হলো, আমার মনে যে আনন্দ এসেছে, তার অংশ এক্ষুণি তোমাকে দেব।

যথারীতি ঘরের ভেতর এসে আপনার মনে বলে উঠলো,

—আপনাদের জন্যেই এই বইটা নিয়ে এসেছি··· আঙুল দিয়ে এই পাতাটা চিহ্নিত ক'রে রেখেছি। শেকস্‌পীয়ারের ম্যাকবেথ। আশ্চর্য! এ কি লেখা!

বইটা খুলে বলতে আরম্ভ করলো,—

—শেষের দিকে···ম্যাকবেথের আয়ু তখন নিঃশেষ হয়ে আসছে···প্রতি মুহূর্তে অনুভব করছে জীবনের পাত্র বিন্দু-বিন্দু ক'রে শূন্য হ'য়ে আসছে···সেই সঙ্গে শেষ হয়ে আসছে তাঁর অনুচরদের আনুগত্য···তারা বুঝতে পেরেছে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার পেছনে কি গভীর কালো অন্ধকার অধিকার বিস্তার ক'রে ছিল। স্কটল্যাণ্ডের যে-সব মহৎ-হৃদয় বীরপুরুষ স্বদেশের সম্মান রক্ষা করবার জন্যে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিলেন, তাঁরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা ক'রে আছেন ম্যাকবেথের আসন্ন বিদায়ের জন্যে··· তাঁদের মধ্যে একজন ম্যাকবেথের এই আসন্ন পতনের নাটকীয় লক্ষণগুলি বর্ণনা করেছেন···

বইটার উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ ক'রে সে ধীরে পড়তে আরম্ভ করে···কণ্ঠস্বর সকরুণ গুরুভাব-মন্থর···

"আজ এখন সে অনুভব করছে, তার গোপন সব হত্যাকাণ্ডের রক্ত যেন তার হাতের ওপর জল-জল করছে···

বিশ্বাস-ভঙ্গের দরুণ সমস্ত অনাচার আজ তারই বিরুদ্ধে মাথা তুলে উঠেছে··

যারা তাঁর শাসনে উঠতো-বসতো, তারা শুধু শাসনেই উঠতো বসতো,

প্রেম ছিল না তাদের মধ্যে ;

আজ তাই সে দেখছে তার রাজার উপাধি আলগা হ'য়ে শুধু ঝুলে আছে, বেমানান,

যেমন বেমানান ঝুলতে থাকে, বিরাট-দেহ দানবের পোষাক বামন-দেহ চোরের গায়···"

বই থেকে মাথাটা তুলে সে হেসে উঠলো। স্তম্ভিত হ'য়ে আমি ভাবি যে-অত্যাচারীর কথা আমার মনে জেগে উঠছে, সেই এক অত্যাচারীর কথাই কি সে-ও ভাবছে?

কিন্তু, না···

সে বলে উঠলো,

—ঠিক এই রকম দুর্ভাবনাই কি আপনাদের সেনাপতিকে আজ রাত্রিতে বিনিদ্র ক'রে রাখে নি? তবুও···সে লোকটাকে মনে মনে যতখানি ঘৃণাই করি না কেন, জানি আপনারাও ঠিক সেই রকম ঘৃণা করেন, তবুও লোকটার জন্যে অনুকম্পাই জাগে। যারা তার শাসনে উঠতো-বসতো, তারা শুধু শাসনেই উঠতো-বসতো···তার মধ্যে ছিল না কোন প্রেম।···

—যে জন-নেতা, আপনার মনে সে বলে, চলে, জনতার ভালবাসা অর্জন করতে পারে না, সে শুধু অসহায় হতভাগ্য একটা কাঠের পুতুল মাত্র। শুধু একটা···মানে তা ছাড়া আর সে কি আশা করতে পারে? উন্মাদ ভাগ্যান্বেষী ছাড়া এ কাজ আর কে করতে পারে? হয়ত এই ছিল ভবিতব্যতা। এমন একজন লোকের দরকার ছিল যে ফ্রান্সের মর্যাদাকে অর্থ-মূল্যে বিকিয়ে দিতে পারবে···তার নিজের কাছে তার মর্যাদা না হারিয়ে ফ্রান্স কখনই স্বেচ্ছায় এই ভাবে আমাদের কাছে ধরা দিতে পারতো না। জীবনের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, বহু-বাঞ্ছিত পরিণয়ের মূলে অনেক সময় এমনি থাকে অতি জঘন্য ঘটকের সংযোগ। অবশ্য তার জন্যে এই জাতীয় ঘটকের মর্যাদা কিছু বাড়ে না, তারা সমানই ঘৃণ্য থেকে যায়, কিন্তু ঘটক ঘৃণ্য ব'লে পরিণয়ের ফল কিছু অশুভ হয় না।

সশব্দে বইটা বন্ধ ক'রে কোটের পকেটে রেখে দেয়, তারপর অভ্যাস মত হাত দিয়ে পকেটটা কয়েক বার চাপড়ে দেখে, বইটা ঠিক আছে কি না। একটা আনন্দের আভাস সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে, বলে, আমার গৃহস্বামীদের আমার জানানো উচিত যে, কয়েক সপ্তাহের জন্যে আমি বাইরে চলে যাবো। প্যারিসে যাবো। সে-কথা ভাবতেই মন আনন্দে নেচে উঠছে। এই কয়েক সপ্তাহ আমি ছুটি পেয়েছি···আমার পাওনা ছুটি জীবনে এই প্রথম···প্যারিসে গিয়ে বাস করবো। আমার কাছে এইটেই হবে আমার জীবনের চরম আনন্দের দিন। এবং যত দিন পর্যন্ত আমার জীবনে আর একটা আকাঙ্ক্ষিত সৌভাগ্যের দিন না আসে, তত দিন পর্যন্ত প্যারিস-বাসের দিনগুলিই আমার জীবনের চরম দিন হয়ে থাকবে। ভবিষ্যতের সেই আকাঙ্ক্ষিত দিনের জন্যে আমি পরম আশায় অপেক্ষা ক'রে আছি, অপেক্ষা ক'রে থাকবো, যদি বৎসরের পর বৎসরও অপেক্ষা ক'রে থাকতে হয়, তাতেও আমি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হবো না। আমার হৃদয় জানে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা ক'রে থাকতে।···

···প্যারিসে আশা করছি আমার পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে, কারণ এই দু'জাতির পরিণয়ের জন্যে প্যারিসে আপনাদের রাজনৈতিকদের সঙ্গে যে আলোচনার বৈঠকের আয়োজন হয়েছে, তাতে যোগদান করবার জন্যে তারাও আসছে। এই পরিণয়ের একজন সাক্ষিরূপে আমিও সেখানে থাকবো···তাই

যাবার মুখে এ-কথা আপনাদের জানিয়ে যাচ্ছি, ফ্রান্সের এই শুভ-লগ্নের জন্যে আমি আজ আনন্দিত, আমি জানি, তার অঙ্গের সব ক্ষত অচিরকালের মধ্যেই নিরাময় হ'য়ে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে, কিন্তু তার চেয়ে বেশী আনন্দিত আমি, জার্মাণীর জন্যে, আমার নিজের জন্যে। জার্মাণী আজ ফ্রান্সকে তার মহত্ত্ব, তার মর্যাদা, তার স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিয়ে যে মহৎ কাজ করবে, তা থেকে সব চেয়ে বেশী উপকৃত হবে জার্মাণী নিজেই।

আমি প্রার্থনা করি, আপনাদের রাত্রি শুভ হোক্।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যেদিন সে আবার ফিরে এলো, আমরা চোখ তুলে তাকে চেয়েও দেখিনি।

আমরা জানতাম সে এসেছে, বাড়ীতে রয়েছে। চোখের বাইরে অদৃশ্য থাকলেও এমন কতকগুলো চিহ্নের ইঙ্গিত থাকে, যা দিয়ে বোঝা যায় যে বাড়ীতে অতিথি আছে। অনেক দিন ধ'রে, এমন কি এক সপ্তাহেরও বেশী হবে···আমরা চাক্ষুষ তাকে দেখি নি।

সত্যি কথা স্বীকার করবো? তার অনুপস্থিতির দরুণ আমার মনে যে শান্তি ছিল, তা আদৌ সত্যি নয়। তার কথা প্রায়ই মনে মনে ভাবতাম, সে-ভাবনার পেছনে কতখানি দুশ্চিন্তা বা অনুশোচনা ছিল, সে-কথা অবশ্য বলতে পারি না। আমরা দু'জনে কেউই তার কথা একবারের জন্যেও নিজেদের মধ্যে উত্থাপন করি নি। সে ফিরে আসবার পর, যখন বাইরে সিঁড়ি থেকে তার দু'-পায়ের অসমান আওয়াজের প্রতিধ্বনি সন্ধ্যাবেলায় কানে এসে পৌঁছত, স্পষ্ট লক্ষ্য করতাম, আমার ভাগ্নী যেন হঠাৎ সেলায়ের কাজে ইচ্ছে ক'রে একেবারে তন্ময় হ'য়ে যেতো, তার মুখের চেহারা পাথরের মত কঠিন হ'য়ে উঠতো, সেই নিশ্চল কাঠিন্যের মধ্যে উদাসীনতা আর আশা যেন নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মিশিয়ে যেতো। বুঝতাম, আমারি মতন সে-ও মনে মনে তার চিন্তা থেকে নিজেকে অব্যাহতি দিতে পারে নি।

একদিন মোটরের টায়ার সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাকে স্থানীয় জার্মাণ কমাণ্ডারের অফিসে যেতে হলো। সেখানে একটা ফর্মে যথানির্দিষ্ট ভাবে প্রয়োজনীয় কথাগুলো যখন লিখছিলাম, তখন দেখি অফিসের ভেতর থেকে ওয়ার্ণার বেরিয়ে আসছে। প্রথমে সে আমাকে দেখতে পায় নি। দেয়ালের গায়ে টাঙানো একটা মস্ত-বড় আয়নার সামনে একটা ছোট টেবিলে একজন সার্জেণ্ট বসে কাজ করছিল। ওয়ার্ণার এসে তার সঙ্গে কি কথা বললো। তার সেই একই একঘেয়ে মন্থর সুর কানে এসে পৌঁছতেই, কেন জানি না, যদিও আমার আর কোন দরকার ছিল না, তবুও আমি সেখানে অপেক্ষা ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম···মনে মনে প্রত্যাশা করছি এখুনি হয়ত কোন অশ্রুতপূর্ব চরম কথা তার মুখ থেকে শুনতে পাবো। আয়নায় তার দীর্ঘ মুখ চোখে পড়ছিল, মুখের চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল যেন বিবর্ণ, ক্লান্ত···চোখ তুলে চেয়ে দেখতেই আমার চোখের সঙ্গে চোখাচোখী হ'য়ে গেল। দু'-সেকেণ্ড মতন সময় পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলাম, তারপর হঠাৎ ঘুরে একেবারে আমার সামনে মুখোমুখী এসে দাঁড়ালো। ঠোঁট দুটো ঈষৎ ফাঁক হ'য়ে গেল, ধীরে হাতটা একটু তুল্‌লো, তারপর সঙ্গে সঙ্গেই নামিয়ে নিলো। নিজের অজ্ঞাতে একবার যেন সে ঘাড় নেড়ে অন্তরের কি অসহায় দ্বন্দ্বের কথা প্রকাশ করতে চাইলো, তারপর যেন সে ঘাড় নেড়ে নিজেকে 'না' বলে উঠলো। কিন্তু সর্বক্ষণ আমার দিকে সমানে চেয়েছিল। তারপর ধীরে মাটির দিকে দৃষ্টি অবনত ক'রে একবার যেন খুব ছোট ক'রে ঘাড়টা নত করলো, তারপর পেছন ফিরে অফিস-ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিল।

বাড়ীতে ফিরে এসে আমার ভাগ্নীকে এই ব্যাপার সম্বন্ধে কোন কথাই আমি জানালাম না। কিন্তু স্ত্রীলোকদের একটা অসাধারণ ক্ষমতা আছে, বেড়াল যেমন গন্ধে বুঝতে পারে তার শীকারের অস্তিত্ব, তেমনি স্ত্রীলোকেরা কোন্ এক অদ্ভুত উপায়ে মানুষের মনের ভেতরের কথার সন্ধান পায়। সেদিন সন্ধ্যাবেলা সেলাই করতে করতে ক্ষণে ক্ষণে চোখ তুলে সে আমার মুখের দিকে এমন ভাবে চেয়ে দেখছিল যেন মনে হলো, সেখানে আমার অনুচ্চারিত সংবাদের সে পাঠোদ্ধার করছে··· আমি রীতিমত জোরে পাইপে টান দিতে দিতে যথা-সম্ভব উদাসীন মুখে থাকবার চেষ্টা করলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম, যেন একান্ত ক্লান্ত হ'য়ে সে হাত এলিয়ে দিলো, সেলায়ের জিনিসপত্র ভাঁজ ক'রে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

—আজ একটু সকাল সকাল শুতে যাচ্ছি, আশা করি কিছু মনে করবে না! এই বলে দুটো আঙুল কপালের ওপর আস্তে আস্তে সঞ্চালন করতে লাগলো, মাথা ধরলে লোকে যা করে। বিদায়-চুম্বন দিয়ে সে ঘর থেকে চলে গেলো, তার দুই ধূসর চোখের দিকে চেয়ে মনে হলো যেন তাতে ম্লান ভর্ৎসনা লেখা রয়েছে···কি একটা ভারাতুর বেদনা থম্-থম্ করছে। ঘর থেকে

চ'লে গেলে পর, হঠাৎ একটা বেয়াড়া রাগ পেয়ে বসলো ; নিজের ওপর রাগ হলো, নিজের সেই বেয়াড়া একগুঁয়ে নীরবতার জন্যে ; একটা যে ভাগ্নী, সে-ও তেমনি বেয়াড়া। এই যে অর্থহীন ব্যাপার চলেছে, এর মানে কি ? চেষ্টা ক'রেও কোন মানে নিজে খুঁজে বার করতে পারলাম না। জানি এ সব অর্থহীন, কিন্তু এ-ও জানি, এর মূল অন্তরের কোন্ সুগভীর স্তরে গিয়ে ঠেকেছে।

এই ব্যাপারের তিন দিন পরে, সন্ধ্যাবেলায় যথারীতি আমার ঘরে বসে যখন কফির পাত্র সবে শেষ করেছি, এমন সময় কানে এলো সেই সুপরিচিত অসমান পায়ের আওয়াজ…স্পষ্ট মনে হলো আওয়াজটা সোজা আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। হঠাৎ কেন জানি না, মনে পড়ে গেল, ছ'মাস আগে শীতের সন্ধ্যেতে যেদিন প্রথম এই আওয়াজ শুনেছিলাম। ভাবলাম, আজও ঠিক তেমনি বৃষ্টি পড়ছে !

সত্যি, সারা সকালটা মুষল ধারায় বৃষ্টি হ'য়ে গিয়েছে—এখনও পর্যন্ত সমান ভাবে চলেছে সেই দুরন্ত বর্ষণ, বাইরে সব জলে ডুবে গিয়েছে, এমন কি ঘরের ভেতরটা পর্যন্ত ভিজে-ভিজে হিম হয়ে উঠেছে। একটা ছাপানো সিল্কের চাদরে কাঁধ পর্যন্ত মুড়ি দিয়ে ভাগ্নীকে বসে থাকতে হয়েছে…আমি জ্বলন্ত পাইপটা হাতের মুঠোর মধ্যে রেখে হাতটা গরম ক'রে নিচ্ছিলাম ! অথচ সেটা হলো জুলাই মাস !

ওপর থেকে আওয়াজটা ক্রমশ সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসছে ! আওয়াজ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, লোকটা খুব আস্তে-আস্তে আসছে, প্রত্যেক পা-ফেলার সঙ্গে যেন পায়ের গতি আরও কমে আসছে, তবে তার মধ্যে কোন কুণ্ঠার ইঙ্গিত নেই ; মনে হচ্ছিল, প্রত্যেকটা পা আগিয়ে ফেলবার জন্যে তাকে রীতিমত মনের সঙ্গে কসরৎ করতে হচ্ছে। ঘাড় তুলে ভাগ্নী আমার মুখের দিকে চাইলো। নিশাচর পেচকের তিমিরবিদারী স্থির দৃষ্টি নিয়ে সে তেমনি ভাবেই আমার দিকে চেয়ে রইলো। পায়ের আওয়াজটা শেষ সিঁড়ি পার হ'য়ে যখন হঠাৎ স্তব্ধ হ'য়ে গেল, তখন দেখি তার মুখের সেই কঠিন পাথুরে ভাব আলগা হ'য়ে এলো, দুই চোখের পাতা যেন ভারী বোধ হতে লাগলো, ঘাড় নীচু ক'রে ক্লান্তদেহ অলস ভাবে ইজি-চেয়ারে এলিয়ে দিলো।

আমার মনে হয়, তার পায়ের আওয়াজ থেমে যাওয়ার দরুণ যে নীরবতা তা মাত্র কয়েক সেকেণ্ড স্থায়ী ছিল, কিন্তু সেই কয়েক সেকেণ্ডই যেন মনে হচ্ছিল দীর্ঘকাল ব'লে। মানস-চক্ষে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম, লোকটা যেন দরজার ও-পাশে এসে দাঁড়ালো, করাঘাত করবার জন্যে তার হাতের আঙুলটা একবার তুললো, তারপর ঠিক করাঘাত করবার মুহূর্তে কি মনে ক'রে আঙুলটা নামিয়ে নিলো, করাঘাত করা মানেই তো ঘরে এসে প্রবেশ করা…

অবশেষে করাঘাত তাকে করতেই হলো। কিন্তু আজকের এই করাঘাত আমার কানে হঠাৎ অন্য সুরের ব'লে মনে হলো। ঘরে প্রবেশ করবার অনুমতির জন্যে যে কুণ্ঠিত মৃদু করাঘাত, এ তা নয় ; কিংবা নিজের অন্তরের চাঞ্চল্যকে ঢাকবার চেষ্টায় দ্রুত ধীর করাঘাত, এ তা-ও নয়। স্থির, ধীর সুনিশ্চিত ছন্দে তিনবার আঙুলের টোকায় শব্দ এলো, সে শব্দের ছন্দ ও মাত্রা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, যে এসে প্রবেশ করতে চাইছে, সে প্রবেশ করবো বলেই স্থির ক'রে এসেছে। সচরাচর এর আগে করাঘাতের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে দেখতাম দরজা খুলে যেতো, কিন্তু আজ দেখলাম দরজা তেমনি বন্ধই রইলো…একটা অসহ্য উত্তেজনায় অন্তর উদ্বেল হ'য়ে উঠলো…পরস্পর-বিরোধী ভাবের সংঘাতে আর নানারকম দ্বিধা আর প্রশ্নের কোলাহলে ভেতরটা যেন ছিন্ন-ভিন্ন হ'য়ে যেতে লাগলো…প্রত্যেকটি মুহূর্ত, মনে হ'তে লাগলো যেন, ঝর্ণার মত্ত-ধারার মতন দ্রুত হ'তে দ্রুততর ছুটে চলেছে। কি করবো ? সেই করাঘাতের কোন উত্তর দেওয়া কি আমাদের কর্তব্য নয় ? আজ হঠাৎ তার দিক্ থেকেই বা এই পরিবর্তন এলো কেন ? এতদিন পর্যন্ত তো আমরা সমানে আমাদের দুরন্ত নীরবতাকে রক্ষা ক'রে এসেছি, এবং কোন দিনের জন্যে তো সে তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপন করে নি ? যেন তার সম্মতি নিয়েই আমরা আমাদের এই নীরবতার ব্রতকে পালন ক'রে চলেছি…তবে আজ সন্ধ্যায় কেন সে আশা করে যে ত… ভঙ্গ ক'রে আমরা তার সাড়া দেবো ? এই সন্ধ্যা—আজকের এই সন্ধ্যায় কে বলে দেবে আমাদের মর্যাদা বজায় রেখে আমরা আর কি করতে পারি ?

ভাগ্নীর দিকে চেয়ে দেখলাম, যদি তার চোখের চাউনী থেকে কোন ইঙ্গিত পাই, কোন নির্দেশ বা তা… কোন আভাস…কিন্তু দেখলাম ঘাড় নীচু ক'রে তেমনি আনত-মুখে সে বসে আছে। দরজার হাতলের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ…সেই তিমির-ভেদী পেচকের অমানুষি… স্থির দৃষ্টি ! সমস্ত মুখ যেন তার রক্তহীন ম্লান হ'… এসেছে…অসীম যন্ত্রণায় ওপরের ঠোঁট দাঁত দিয়ে চে… ধ'রে আছে। আমার নিজের অন্তরের মধ্যে সং…

আর দ্বিধার যে আলোড়ন চলেছিল, হঠাৎ উপলব্ধি করলাম, সেই তরুণীর অন্তরে হয়ত তার চেয়ে শত গুণ তীব্র একটা নাটকের নিঃশব্দ অভিনয় ঘটে চলেছে··· আমি যেন শক্তিহীন, অবশ হ'য়ে পড়লাম। ঠিক সেই সময় আবার আঘাতের শব্দ এলো···তিনটে নয়, মাত্র দুটো টোকা···দ্রুত কিন্তু মৃদু!

একান্ত ক্ষীণ ও মৃদুস্বরে আমার দিকে চেয়ে মনে হলো যেন ভাগ্নী বলে উঠলো বাড়ী ছেড়ে সে চলে যাচ্ছে···আমি আর নিজেকে ধ'রে রাখতে না পেরে স্পষ্ট উচ্চ কণ্ঠে সাড়া দিয়ে উঠলাম, ভেতরে আসুন, মঁসিয়ে!

কেন আমি মঁসিয়ে কথাটা যোগ করলাম? তাকে যে শত্রু-পক্ষের অফিসর হিসাবে না দেখে, মানুষ হিসাবেই দেখছি, তাই জানাবার জন্যে? কিংবা, শুধু তাকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে যে, কে করাঘাত করছে, তা আমরা জানি···

জানি না, কেন বলেছিলাম, জানলেও তাতে বিশেষ কিছু যায়-আসে না। তবে এ-কথা ঠিক যে, তার করাঘাতের উত্তরে সেদিন আমরা সেই প্রথম সাড়া দিয়েছিলাম এবং সে-ও সাড়া পেয়ে তবে এসে প্রবেশ করেছিল।

মনে করেছিলাম, তাকে সাধারণ পোষাকেই দেখতে পাবো, কিন্তু দেখলাম, সামরিক পোষাকে সে ঘরে ঢুকলো। তার আজকের পোষাক দেখে মনে হ'লো, তার মধ্যে সামরিক সজ্জার বিন্দুমাত্র ত্রুটী কোথাও নেই···বরঞ্চ এমন একটা অতিরিক্ততা আছে, যা দিয়ে সে ইচ্ছা ক'রেই যেন সেই সামরিক পোষাকের দিকে আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করতে চায়। দরজাটা ঠেলে দেয়ালের সঙ্গে সমান ক'রে দিয়ে সোজা সেখানে সে এমন ঋজু আর কঠিন হ'য়ে দাঁড়ালো যে, তাকে দেখে মনে হ'লো সে যেন আলাদা আর একজন লোক ·· তার সেই স্থির কঠিন মূর্তির দিকে চেয়ে সেই আমার প্রথম লক্ষ্য পড়লো, লোকটার চেহারার সঙ্গে বিখ্যাত ফরাসী অভিনেতা লুই-জোভের আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে। কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে সে তেমনি কঠিন, স্থির, ঋজু ভাবে মাথা সোজা ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো, হাত দুটো যেন অলস ভাবে তার কাঁধ থেকে পাশে ঝুলে পড়েছে, পা দুটো ঈষৎ ফাঁক করা, মুখের-চেহারা প্রস্তর-কঠিন, হিম, যেন সেখানে অনুরাগের কোন চিহ্ন কোন কালে ছিল না, ভাবহীন, শূন্য···

আমি আমার ইজি-চেয়ারের ভেতর যে-ভাবে বসেছিলাম, সেখান থেকে তার বাঁ হাতটা ঠিক আমার মুখের সমান স্তরে পড়েছিল, সেই হাতটার দিকেই আমার নজর পড়লো। দেখলাম, হাতের আঙুলগুলো দেহের ভেতরের কোন্ অসীম যন্ত্রণাকে যেন রূপ দিতে চেষ্টা করছে। তার হাতের সেই অবস্থা থেকে তার বাইরের প্রস্তর-কাঠিন্য ভেদ ক'রে তার অন্তরের সকরুণ চেহারা আমার দৃষ্টির সামনে এমন ভাবে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো যে আমি আর সেখানে থেকে চোখ ফেরাতেই পারলাম না···যেন শৃঙ্খল দিয়ে কে আমার দৃষ্টিকে তার হাতের সঙ্গে বেঁধে দিলো···

সেই দিন আমি জানতে পারলাম, যদি কেউ লক্ষ্য ক'রে দেখতে জানে, তাহ'লে দেখতে পাবে, মানুষের মুখ যে-ভাবে মানুষের অন্তরের কথা প্রকাশ করে, তেমনি ধারা মানুষের মনের কথা প্রকাশ করবার ক্ষমতা আছে মানুষের হাতের। হয়ত তার চেয়ে বেশী ক্ষমতা আছে হাতের। তার দেহ আর মুখ যেখানে তার আয়ত্তে স্থির নিশ্চল হ'য়ে ছিল, দেখলাম, তার সেই হাতের আঙুলগুলো যেন সেখানে আপনা থেকে দোমড়াচ্ছে, মুষ্টিবদ্ধ হ'চ্ছে, আবার সোজা হ'চ্ছে, আবার তৎক্ষণাৎ যেন কোন-কিছুকে ধরবার জন্যে মুষ্টিবদ্ধ হ'চ্ছে···এই ভাবে এক অপূর্ব নীরব ভাষাতে তারা অন্তরের সমস্ত চাঞ্চল্যকে মূর্তি দিতে চাইছে··· মনের কোন আধিপত্য যেন তাদের ওপর নেই।

কিছুক্ষণ পরে যুবকের পাথরের চোখে যেন জীবনের স্পন্দন ফিরে এলো। এক লহমার জন্যে সে-দৃষ্টি ভাগ্নীর ওপর থেকে আমার ওপর এসে পড়লো। মনে হলো যেন, দূর আকাশ থেকে বাজ পাখী তার শিকারকে দৃষ্টি দিয়ে চিহ্নিত করলো। স্থির আঁখি-পল্লবের মধ্যে দুটো চোখ জলছিল···চোখের পাতার দিকে চেয়ে স্পষ্ট বোঝা যায় রাত্রির অনিদ্রার ইতিহাস সেখানে লেখা রয়েছে। আমার ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে আবার আমার ভাগ্নীর মুখের ওপর রাখলো, এবং সেখানেই তা আবদ্ধ রয়ে গেল।

অবশেষে দেখলাম, তার হাতও স্থির হ'য়ে এলো। সমস্ত আঙুল দুমড়ে মুঠো ক'রে রইলো। আস্তে দু'টো ঠোঁট একটু ফাঁক করলো, খালি বোতল থেকে ছিপি খুলতে গেলে যেমন একটা ছোট্ট অস্পষ্ট শব্দ হয়, তেমনি ছোট্ট একটা শব্দ বেরিয়ে এলো। তারপর একান্ত শূন্যকণ্ঠে এক্রেনাক বলে উঠলো, একটা বিশেষ দরকারি ব্যাপার···আপনাদের জানানো আমার কর্তব্য!

ভাগ্নী তার দিকে ঘুরে বসলো কিন্তু মাথা নত ক'রে ···পশমের বল থেকে আপনার মনে আঙুলে পশম জড়াতে লাগলো, বলটা কার্পেটের ওপর গড়িয়ে পড়ে

গেল···জানি, এ কাজ করতে কোন ভাবনা-চিন্তার দরকার হয় না···অনায়াসে যন্ত্রচালিতের মত করা যায়। তাছাড়া, নিজেকে লুকোবার পক্ষে এটা কম সাহায্য করে না।

কথা বলবার জন্যে যে ভাবে এব্রেনাককে চেষ্টা করতে হচ্ছিল, তাতে মনে হলো যেন তার প্রাণ ছিঁড়ে যাচ্ছে,···

—এই ছ'মাস ধরে আমি যা-কিছু বলেছি···ছ'মাস ধরে এই ঘরের দেওয়ালগুলো যা-কিছু শুনেছে···

হঠাৎ থেমে গিয়ে, হাঁপানী রোগীর মত জোরে ফুসফুস্ ভর্তি ক'রে শ্বাস নেবার চেষ্টা করে, তারপর আবার বলতে আরম্ভ করে,

—যা-কিছু বলেছি···আমার অনুরোধ···

আবার সে থেমে শ্বাস নেয়,—

—ভুলে যাবেন···সমস্তই ভুলে যাবেন।

দেখলাম, ধীরে তরুণীর হাত দুটো তার কোলের ওপর অবশ হ'য়ে পড়ে গেল···এবং সেইখানেই স্থির হ'য়ে পড়ে রইলো···নদীর বালুর চড়ায় নৌকো আটক পড়ে যেমন স্থির হ'য়ে পড়ে থাকে। তারপর, দেখলাম, ধীরে, অতি ধীরে, সে তার আনত মাথা তুলে সেই জার্মাণ অফিসরের দিকে—এই প্রথম···তার ম্লান দৃষ্টির প্রদীপ তুলে পরিপূর্ণ ভাবে চেয়ে দেখলো।

অস্ফুট কণ্ঠে, একেবারে যে ভাবে লোকে কানে কানে কথা বলে, সেই ভাবে অতি-মৃদু জার্মাণ অফিসরটি বলে উঠলো, ওয়েল্চ্‌স্ এইন্ লিকৃথ্‌ট্—ওগো দীপ নেবাও, নিবিয়ে দাও ঐ প্রদীপের আলো।

এবং সত্যি সত্যি সেই দৃষ্টি-প্রদীপের আলো যেন সহ্য করতে না পেরে হাত তুলে নিজের চোখে আড়াল দেয়। এই ভাবে দু' সেকেণ্ড চলে গেল···তারপর চোখ থেকে হাত নামিয়ে রাখলো কিন্তু সোজা আর চাইতে পারলো না। এবার তার পালা, সে মাটির দিকে আনত মুখে চেয়ে রইলো···

কয়েক মুহূর্ত পরে তার ঠোঁট দু'টো অস্ফুট শব্দ ক'রে আবার যেন নড়ে উঠলো···সুদূর উদাসীন কণ্ঠে সে বললো,

—আমি তাদের দেখে এলাম···আমার বিজয়ী বন্ধুদের···

তারপর কয়েক সেকেণ্ড পরে, আরো নীচু গলায় বললো,

—তাদের সঙ্গে কথা বলেও দেখলাম···

আবার কয়েক সেকেণ্ড নীরব থেকে তিক্ত সুরে বলে উঠলো,

—কিন্তু তারা আমার কথা শুনে হেসে উঠলো।

তারপর ঘাড় তুলে আমার দিকে চেয়ে গম্ভীর ভাবে আপনার মনে তিনবার ঘাড় নেড়ে উঠলো। চোখ বন্ধ ক'রে বলতে লাগলো,

—তারা আমাকে বললো, তুমি কি বুঝছো না, আজ তাদের মুঠোর মধ্যে পেয়েছি···হাঁ, তারা ঠিক তাই-ই বললো···মুঠোর মধ্যে পেয়েছি···তারা আমাকে ভর্ৎসনা করে উঠলো, আজ জার্মাণীতে কে এমন বোকা আছে যে ফ্রান্সকে এই সুযোগে একেবারে পিষে না ফেলতে চাইবে—এমন ভাবে পিষে ফেলতে হবে যাতে আর কোন দিন সে জার্মাণীর দিকে মুখ তুলে ফিরে চাইতে না পারে। আমার মুখের দিকে চেয়ে তারা সবাই অট্টহাস্য ক'রে উঠলো, হাসতে হাসতে আমার পিঠ চাপড়ে মুরুব্বির মত আমাকে ব্যঙ্গ ক'রে বলে উঠলো, আমরা তো কেউ গানের চাষ করি না।

শেষ কথাগুলো সে যে-সুরে বললো, তাতে তার সহযাত্রীদের সম্বন্ধে তার অন্তরের সংগোপন ঘৃণা তীব্র-ভাবে ফুটে উঠলো অথবা তারা তার সঙ্গে যে-ব্যঙ্গের সুরে কথা বলেছিল, তারই প্রতিধ্বনি তার কণ্ঠে বেজে উঠলো।

—তবুও শেষ একবার চেষ্টা করলাম, প্রাণের দুরন্ত আবেগে যা মনে এলো, তাই তাদের সামনে উপস্থিত করলাম। তারা উত্তরে শুধু হেসে উঠলো, হোঃ! হোঃ!···বিজ্ঞের মত তারা আমাকে উপদেশ দিলো, রাজনীতি কবির স্বপ্ন-দেখা নয়। তুমি ভেবেছ, কিসের জন্যে আমরা এই যুদ্ধে মরতে এসেছি? ঐ বুড়ো ফরাসী মার্শালের সঙ্গে প্রেম করবার জন্যে? সঙ্গে সঙ্গে তারা আবার হেসে উঠলো। "আমরা কেউ পাগলও হয়ে যায় নি, বুদ্ধিশুদ্ধিও হারাই নি। এত দিন পরে আমরা ফ্রান্সকে ধ্বংস করবার সুযোগ পেয়েছি এবং ফ্রান্সকে ধ্বংস আমরা করবোই, শুধু যে তার রাজ্যই ধ্বংস করবো তা নয়, তার অন্তরাত্মাকে পর্যন্ত ধ্বংস ক'রে ফেলবো। হাঁ···বিশেষ ক'রে তার সেই উদ্ধত অন্তরকে ধ্বংস করতেই হবে। সে-ই হলো সব চেয়ে বড় বিঘ্ন, সব চেয়ে বড় শত্রু। বুঝেছ বন্ধু, সে-ই হলো এখন আমাদের আসল কাজ, সে সম্বন্ধে যেন এক তিলও ভুল ধারণা না থাকে। আমাদের হাসি দিয়ে, আমাদের খুশী দিয়ে ফ্রান্সকে দরকার হলে পিঠ চাপড়ে ভেতর থেকে দেউলিয়া ক'রে ফেলবো···ফ্রান্সকে আমরা য়ুরোপের রাস্তার মাদী কুকুর ক'রে ছেড়ে দেবো···।"

নীরব হয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে। মনে হয় যেন তার

দম ফুরিয়ে এসেছে…শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এত জোরে দাঁতে দাঁত দিয়ে চেপে ধরলো যে দুই গালের হাড় উঁচু হয়ে উঠলো, কপালের ওপর একটা শিরা মোটা হয়ে ফুটে উঠলো, যেন একটা কেঁচো মস্তিষ্কের দিকে এগিয়ে চলেছে। দু'দিকের রগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, দপ-দপ করছে। হঠাৎ মনে হলো যেন তার মুখের চামড়ার তলা দিয়ে একটা তীব্র কাঁপনের তরঙ্গ বয়ে গেল, ঝড় যেমন হ্রদের বুকের ভেতরটা কাঁপিয়ে দিয়ে যায়। ফরাসী তরুণীর বিস্ময়-বিস্ফারিত দুই আয়ত চোখের দিকে চেয়ে সে ধীর, স্থির, বেদনা-ভারাতুর কণ্ঠে বলে উঠলো, কোন আশা নেই! আর কোন আশা নেই!

সেই অমোঘ নিষ্ঠুর সত্যের অসহ্য নির্লজ্জ প্রকাশে তার সমস্ত দেহ-মন যেন ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। একান্ত কুণ্ঠিত ভাবে, উদাসীন ম্লান কণ্ঠে বলে ওঠে, আশা নেই! আশা নেই!

সহসা তার কণ্ঠস্বর বদলে গেল। স্পষ্ট দীপ্ত কণ্ঠে, বজ্র-নিনাদের মতন, সমর-ঘোষণার মতন, সে চীৎকার ক'রে বলে উঠলো, আশা নেই! আশা নেই!

তারপর…নীরবতা…পরিপূর্ণ স্থির নীরবতা। মনে হলো তার মধ্যে যেন তার হাসি শুনতে পেলাম। সমস্ত কপালটা হঠাৎ দেখি রেখায় রেখায় ভরে উঠেছে। ঠোঁট দুটো, ব্যাধিগ্রস্ত রোগীর ঠোঁটের মতন ম্লান বিবর্ণ হ'য়ে গিয়েছে।

—তারা সমস্ত দোষ আমার ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়। আমার ওপর রাগ ক'রে তারা বললো, "এই তুমি…তোমাকে দিয়েই আমরা বুঝেছি…আসল বিপদ কোথায়! এরি মধ্যে তুমি তার জন্যে প্রেমে উন্মাদ হ'য়ে গিয়েছ! এই হলো আসল বিপদ! আসল ব্যাধি! এই ব্যাধির অভিশাপ থেকে সমস্ত য়ুরোপকে বাঁচাতে হবে। এ বিষ য়ুরোপের গা থেকে ঝেড়ে বার ক'রে ফেলে দিতে হবে!" তারা সব কথা আমাকে বুঝিয়ে বলেছে, তারা কি করবে, কি করছে, কোন কিছুই জানাতে আমাকে বাকী রাখে নি। আপনাদের দেশের সাহিত্যিকদের ওরা পিঠ চাপড়ে বাহবা দিচ্ছে, সেই সঙ্গে বেলজিয়ামে, হল্যাণ্ডে, যে-সব দেশে জার্মাণ সৈন্য গিয়ে হাজির হয়েছে, সেখানে তারা ভাল করে বেড়ার পর বেড়া বসাচ্ছে। সেই বেড়া ডিঙিয়ে একখানা ফরাসী বইও কোথাও ঢুকতে পারবে না…পারে, স্কুল-পাঠ্য বিজ্ঞানের বই…যন্ত্রপাতির বই…সিমেন্ট তৈরী করবার বই…তা ছাড়া আর কোন ফরাসী বই…সাহিত্য শিক্ষা বা কৃষ্টির কোন বই-এর অস্তিত্বের কোন সম্ভাবনা নেই।

ঘরের মধ্যে হঠাৎ পথ হারিয়ে ঢুকে পড়ে নীড়-মুখী রাত্রির পাখী যেমন অসহায় ভাবে ঘরের দেয়ালের চার কোণে ছুটোছুটি ক'রে নিজের পাখার ঝাপটে নিজেই আহত হয়ে পড়ে, তেমনি ভাবে তার দৃষ্টি ঘরের চার-দিকে অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়ায়। আশ্রয়-নীড়ের অন্বেষণে হতাশ হয়ে অবশেষে বই-এর আলমারীর অন্ধকার এক কোণে এসে যেন সে তার আশ্রয় খুঁজে পায়। আলমারীর সেই থাকে ছিল রেসিন্, রোঁসার্ড, রুশো। সেইখানেই তার দৃষ্টি কিছুক্ষণ স্থির আবদ্ধ হয়ে থাকে, তার পর কণ্ঠ দিয়ে মথিত গর্জনের মত ধ্বনিত হয়ে ওঠে, কেউ নয়, কেউ নয়, এদের কাউকেই বেঁচে থাকতে দেবে না!

তার সেই আশঙ্কার পূর্ণ তাৎপর্য আমরা হয়ত বুঝতে পারি নি মনে ক'রে সে আমাদের বুঝিয়ে বলে শুধু যে আপনাদের আধুনিক সাহিত্যিকেরাই নিষিদ্ধ, তা নয়।…ফরাসী সাহিত্যের, ঐ আপনার আলমারীতে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা সবাই…সবাই নিষিদ্ধ…একজনকেও ওরা বেঁচে থাকতে দেবে না!

সেই রাত্রির আধ-আলো-আধ-অন্ধকারে তার দৃষ্টি অসহায় মমতায় সেই বাঁধানো বইগুলির ওপর দিয়ে যেন স্পর্শ করে যায়। চীৎকার করে ওঠে, সারি সারি ঐ প্রদীপের আলো, ওরা সব নিবিয়ে দেবে! এমন ভাবে নিবিয়ে দেবে যে আর তাদের আলোয় য়ুরোপ উদ্ভাসিত হবে না!

তার সেই আর্ত কণ্ঠের সুগভীর আকুতি আমার অন্তরে এসে যেন আছড়ে পড়লো, আমার অজ্ঞাতে প্রতিধ্বনির মতন শুধু একটা কথা, আর্তনাদের মতন বেরিয়ে এলো,

—সব শেষ!

তারপর আবার সেই নীরবতা। কিন্তু আজ এই নীরবতার আড়ালে অন্তরে এ কি অস্পষ্ট অব্যক্ত যন্ত্রণা! এর আগে এই ঘরে বহু দিন এমনি নীরবতার মধ্যে কেটেছে; সমুদ্রের শান্ত মূর্তির আড়ালে অদৃশ্য অতল গভীরে যেমন সামুদ্রিক জীবেরা আত্মরক্ষার জন্যে সর্বদা পরস্পর সংঘর্ষে মত্ত থাকে, বাইরে সমুদ্রের ওপর তার কোন চিহ্ন দেখা যায় না, তেমনি সেদিন সেই নীরবতার সমুদ্রের অতল অদৃশ্য-লোকে চলতো পরস্পর-বিরোধী সব চিন্তার দ্বন্দ্ব কিন্তু আজ এই নীরবতার মধ্যে এ কি আত্ম-নির্যাতনের অসহ্য যন্ত্রণা!

অবশেষে, সে-ই নীরবতা ভঙ্গ করে ব্যথিত শান্ত

কণ্ঠে আবার বলে উঠলো, আমার একজন বন্ধু ছিল,··· সহোদর ভায়ের মতন···একসঙ্গে দু'জনে স্কুলে পড়েছি ···ষ্টুটগার্টে একসঙ্গে এক ঘরে কাটিয়েছি···মুরেমবুর্গে একসঙ্গে তিন মাস বাস করি···একজনকে বাদ দিয়ে আর একজন কোন কাজই করি নি···কবিতা লিখলে আগে সে আমাকে তা পড়ে শোনাত···আমি সঙ্গীত রচনা করলে আগে তাকে শোনাতাম···সে ছিল রোমাণ্টিক, ভাবপ্রবণ···কিন্তু একদিন সে আমাকে ছেড়ে চলে গেল···মিউনিকে গিয়ে সেখানে তার কবিতার নতুন শ্রোতা জুটলো···মাঝে মাঝে আমাকে চিঠি লিখে তার কাছে যাবার জন্যে ডাকতো···সেদিন প্যারিসে যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তার মধ্যে সে-ও ছিল···দেখলাম, তাকে তারা সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ গড়ে তুলেছে···সম্পূর্ণ আলাদা···

যেন কোন অন্যায় আবেদনকে প্রত্যাখ্যান করতে হচ্ছে, এমনি ভাবে আপনার মনে সে ধীরে ঘাড় নাড়তে থাকে।

—প্যারিসে যারা আমাকে ঠাট্টা করেছিল, তাদের মধ্যে সে-ই সব চেয়ে বেশী আমার ওপর বিরূপ হয়েছিল। সে যে শুধু ব্যঙ্গই করেছিল তা নয়, আমার ওপর রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়েছিল। এক একবার আমার দিকে কটমট করে চেয়ে চীৎকার করে বলে উঠেছে, বিষ! বিষ! এই বিষ থেকে তোমাকে বাঁচাতে হবে। মাঝে মাঝে আঙুল দিয়ে আমার পেটে খোঁচা মেরে রসিকতাও করেছে। বিজ্ঞের মতন হাসতে হাসতে বলেছে, জানিস, ওরা ভয় পেয়ে গিয়েছে, স্রেফ ভয়ে শুকিয়ে গিয়েছে···পকেট আর পেটের ভাবনা ওদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ভাবনা···তা ছাড়া ওদের আর কোন চিন্তা নেই। এ ছাড়া অন্য যে দু'-একজন আছে তাদের আমরা পিঠ চাপড়ে ঘুম পাড়িয়ে দেবো···হা···হা··· হা···এই বলে আমার দিকে চেয়ে এমন হাসতে সুরু করলো যে হাসতে হাসতে সারা মুখ লাল হয়ে উঠলো। বললো, এক টুকরো রুটী দিয়ে আমরা তাদের দেহ-মন কিনে নেবো!

নিশ্বাস নেবার জন্যে ওয়ার্ণার একবার থামলো।

—তবুও আমি তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমরা কি করছো, তা একবার ভাল করে ভেবে দেখেছ? সত্যিই তোমরা ভেবে দেখেছ, যা করবে বলছ তার প্রকৃত তাৎপর্য কি? উত্তরে তারা বলেছিল, তুমি কি ভেবেছ তাতেই আমরা ভয় পেয়ে যাব? আমরা যা করছি, সুস্থ মস্তিষ্কে বিচার করেই করছি। তখন আমি বললাম, তাহ'লে তোমরা বলতে চাও, তোমরা সারা দেশটাকে কবরের মধ্যে রেখে দেবে, চিরকালের জন্যে?

—তারা উত্তর দিয়েছিল, জানো, এ হলো আমাদের জীবন-মরণের ব্যাপার। জয় করতে হলে যা একমাত্র দরকার তা হচ্ছে শক্তি, কিন্তু শক্তি দিয়ে যা জয় করা যায়, শক্তি দিয়ে তাকে ভোগ করা যায় না। আমাদের শক্তি যদি এমনি বজায় রাখতে হয়, তা হলে শুধু আমাদের সৈন্য দিয়েই তা বজায় রাখতে পারবো না···

তখন আমি বলে উঠলাম, তা বলে নিজের আত্মাকে ধ্বংস ক'রে এই শক্তিকে বজায় রাখতে হবে? এই কি তার মূল্য?

—তারা উত্তর দিয়েছিল, আত্মা কখনো মরে না··· এমনি ধারা বহু বিপদের মধ্যে দিয়েই সে বেচে এসেছে···নিজের চিতাভস্ম থেকে সে আবার জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং তার জন্যে ভাবনা করবার দরকার নেই···আমাদের সামনে হাজার বছরের ওপর দৃষ্টি রেখে এখন আমাদের গড়ে তুলতে হবে, এবং তার জন্যেই আমাদের আগে ধ্বংস করতে হবে।

আমি তার মুখের দিকে স্থির গভীর ভাবে চেয়ে দেখলাম। তার চোখের দৃষ্টির ভেতর দিয়ে তার মনের তলা পর্যন্ত দেখলাম। দেখলাম, সে যা বলেছে, তার মধ্যে তার কোন আত্ম-প্রবঞ্চনা নেই। সেইটেই হলো তার সম্বন্ধে সব চেয়ে ভীষণ দুঃখের কথা।

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে এমন ভাবে সামনে চেয়ে রইলো যে, তার সেই চোখের দৃষ্টি দেখে আমার স্পষ্ট মনে হলো যেন সে সামনেই কোন ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করছে। তার শেষ কথাগুলো হয়ত আমরা বিশ্বাস করে নিতে পারি নি, সে জন্যে সে বলে উঠলো, তারা যা বলেছে তারা তা করবেই···নিয়ম ক'রে ঘড়ি ধরে অক্লান্ত ভাবে তা করবে···আমি জানি, এমন কিছু নেই যা শয়তানদের থামিয়ে রাখতে পারে।

যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখান থেকে এক পাও আর সে নড়ে নি। খোলা দরজার সামনে কাঠের পুতুলের মতন অচল দাঁড়িয়ে ছিল, দুদিকে দেয়ালে ভর দিয়ে হাত দুটোকে যেন আটকে রেখেছিল, তা না করলে হয়তো হাত দুটো আপনা থেকেই আপনার ভারে পড়ে যেতো। তার মুখের রঙ বিবর্ণ হয়ে এসেছিল, মোমবাতির মতন নয়, দেয়ালের রঙ উঠে গেলে যেমন বিবর্ণ হয়ে যায়, তেমনি।

দেখলাম, ধীরে ধীরে দীর্ঘ দেহটাকে যেন একটু নত করলো। তার পর হাত তুলে আমার ভাগ্নীর দিকে প্রসারিত করলো, করতল মাটির দিকে, আঙুলগুলো

একটু করে বেঁকে গিয়েছে। তার পর মুঠো ক'রে কয়েক বার উপর-নীচু ঘোরালো ; মুখের মধ্যে দেখতে দেখতে একটা প্রবল আবেগের রঙ ফুটে উঠলো। ঠোঁট দুটো ঈষৎ ফাঁক হয়ে গেলো, জানি না আবার কি নতুন আবেগ সে আমাদের কাছে উপস্থিত করবে! আমার মনে হলো, সত্যি আমার স্পষ্ট মনে হলো, সে যেন আমাদের বিদ্রোহে প্রণোদিত করতে চাইছে। কিন্তু একটা কথাও সে উচ্চারণ করলো না। আবার তার ঈষৎ-ভিন্ন ঠোঁট দুটো বন্ধ হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ দুটোও বন্ধ হয়ে এল। আবার সোজা দাঁড়িয়ে উঠলো। আস্তে আস্তে দুটো হাত মুখ-বরাবর তুলে দুর্জ্ঞেয় কি-সব মুদ্রার মতন কয়েক বার সঞ্চালন করলো, জাভার ধর্ম-নৃত্যে যেমন তাঁদের করতে দেখেছিলাম। তার পর বলে উঠলো,

—ওরা আমাকে বললো, সেইটেই হলো আমাদের ন্যায্য অধিকার, আমাদের কর্তব্য! আমাদের কর্তব্য! যারা এত সহজে তাদের কর্তব্যের পথ বেছে নিতে পারে, সত্যিই তারা সুখী!

তার পর অবশ ভাবে হাত দুটোকে ফেলে দিলো।

—পথের চৌমাথায় এসে, সোজা তোমাকে বলে দিলো, ঐ শক্তির দম্ভের শাসনের পথ, ঐ পথ দিয়েই তোমাকে যেতে হবে! কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ও-পথ তো আলোকোজ্জ্বল পর্বত-শৃঙ্গে গিয়ে পৌঁছবে না, দেখছি ও-পথ গিয়ে মিশেছে নীচে কণ্টক-উপত্যকায় গভীর অরণ্যানীর বিভীষিকাময় অন্ধকারে! ...হায় ভগবান!...দেখিয়ে দাও...তুমি দেখিয়ে দাও কোথায় আমার পথ...কি আমার কর্তব্য!

বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর আবেগে সু-উচ্চ হয়ে উঠলো...এক রকম চীৎকার করেই বলে উঠলো, এমনি ধারা চলেছে এই অনাদি সংগ্রাম...জাগতিক শক্তির বিরুদ্ধে আত্মিক শক্তির মহাসংগ্রাম।

জানালার ওপর কাঠের তৈরী একটা দেবদূতের মূর্তি ছিল। স্থির সকরুণ বদ্ধ দৃষ্টিতে সে সেই মূর্তির দিকে চেয়ে রইলো, স্মিত-মুখ দেবদূত, সর্বাঙ্গে তার ঝলমল করছে স্বর্গীয় শান্তির পরমা-দ্যুতি।

সেই মূর্তির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তার ভাবান্তর ঘটে থাকে, কঠিন দেহের রেখা আবার কোমল নমনীয় হয়ে ওঠে, মাটির দিকে একবার মাথা নীচু ক'রে চেয়ে আবার মুখ তুলে চায়।

স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে, আমার ন্যায্য অধিকারের দাবীতে আমি সামান্য সৈনিকরূপে পুনর্নিযুক্ত হবার জন্যে আবেদন করি...এবং তারা সে-আবেদন অবশেষে স্বীকার করেছে...আমার ওপর হুকুম হয়েছে কাল রওয়ানা হবার জন্যে।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে সে যেন আপনার মনে বলে উঠলো, আবার সেই নরকে!

দেখলাম একটা ক্ষীণ হাসির ছায়া যেন ঠোঁটের ওপর দিয়ে ভেসে গেল।

পূর্বাঞ্চলের দিকে দু'হাত তুলে সে দাঁড়ালো, যে পূর্বাঞ্চলের বিরাট বিস্তীর্ণ মাঠে মৃত মানবের শব-দেহে পুষ্ট হয়ে নবীনতর তেজে জেগে উঠবে ভবিষ্যতের শস্য।

ভাগ্নীর মুখের চেহারা দেখে সচকিত হয়ে উঠলাম, আকাশের চাঁদের মতন ম্লান পাণ্ডুর। পাতলা ঠোঁট দুটো ঈষৎ ভিন্ন হয়ে রয়েছে, স্ফটিকের পাত্রের স্বচ্ছ ধারের মতন; সারা মুখে গ্রীক-ট্রাজিক অভিনয়ের মুখোসের মতন একটা অর্থপূর্ণ বিষণ্ণ ভ্রূকুটি। কপালের যে রেখার ওপর থেকে মাথার চুল সুরু হয়েছে, দেখলাম সেখানে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমা হয়েছে...তারা যেন ভেতর থেকে ফেটে বেরুচ্ছে।

জানি না, ওয়ার্ণার ফন্ এব্রেনাক তা লক্ষ্য করেছিল কি না। তীরেতে লৌহ-বলয়ের সঙ্গে নৌকো যে ভাবে আবদ্ধ থাকে, তেমনি ধারা তার চোখের তারা সেই তরুণীর চোখের তারার সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এক হাত দিয়ে এব্রেনাক দরজার হাতলটা ধরেছিল, আর এক হাত দিয়ে দরজাটা আঁকড়ে ধরেছিল। এক মুহূর্তের জন্যেও তরুণীর চোখ থেকে তার দৃষ্টি এক চুল পরিমাণ না সরিয়ে, সে ধীরে ধীরে দরজাটা একটু একটু করে বন্ধ করে দেবার চেষ্টা করছিল। তার পর সম্পূর্ণ শূন্য কণ্ঠে একান্ত নিস্পৃহ ভাবে সে বলে উঠলো, প্রার্থনা করি, আপনাদের রাত্রি শুভ হোক!

ভাবলাম, এইবার দরজাটা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়ে সে চলে যাবে, কিন্তু কই, তা তো করলো না! তখনও তেমনি সেই তরুণীর দিকে স্থির ভাবে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। মনে হলো যেন কানে কানে অতি অস্পষ্ট ভাবে বললো, বিদায়!

কিন্তু তখনও তেমনি স্থির দাঁড়িয়ে রইলো, নিশ্চল, গতিহীন। এবং সেই নিশ্চল স্থির মুখের মধ্যে সব চেয়ে স্থির গতিহীন স্পন্দনহীন দেখাচ্ছিল তার দুই চোখ... তরুণীর দুই ম্লান আয়ত চোখের সঙ্গে এমন ভাবে যেন বাঁধা পড়ে গিয়েছে যে কোন স্পন্দনই তার পক্ষে বুঝি আর সম্ভব নয়। বহুক্ষণ এই ভাবে তারা পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলো...বহুক্ষণ...কতক্ষণ কে বলতে পারে? অবশেষে তরুণীর ঠোঁট দুটো ঈষৎ নড়ে উঠলো...ওয়ার্ণারের চোখে যেন সহসা আলো

জলে উঠলো···শুনলাম, কে যেন ক্ষীণ নারীকণ্ঠে বলে উঠলো, বিদায়।

যদি কেউ শোনবার জন্যে উৎকর্ণ না হয়ে থাকতো, তাহলে সেই কণ্ঠস্বর কিছুতেই সে শুনতে পেতো না। আমি উৎকর্ণ হয়ে ছিলাম বলেই, শুনতে পেয়েছিলাম। এব্রেনাকও শুনতে পেয়েছিল; তার সর্ব শরীরের কাঠিন্য নিমেষে দূরীভূত হয়ে গেল, কে যেন সহসা স্নিগ্ধ মাধুরীতে তাকে স্নান করিয়ে দিলো।

সে হেসে উঠলো···তাই তার শেষ স্মৃতি যা আমার মনে আছে, তাতে তার হাসি-মুখই ফুটে আছে···তার পর দরজাটা ধীরে বন্ধ হয়ে গেল, বাইরে বাড়ীর বিরাট শূন্যতার মধ্যে তার পায়ের শব্দ ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে এলো।

পরের দিন সকাল বেলা, যখন অভ্যাস মত দুধের পাত্র নিয়ে খেতে বসলাম, তখন সে চলে গিয়েছে। প্রতিদিন যেমন প্রাতরাশ তৈরী করে, আজও তেমনি আমার ভাগ্নী প্রাতরাশ তৈরী করলো। নীরবে আমার সামনে আহারের পাত্রগুলি সাজিয়ে দিল, নীরবে দুজনে পান করতে সুরু করলাম।

বাইরে কুয়াসার মধ্যে ম্লান প্রভাতী সূর্য সমুদিত হ'য়েছে। মনে হ'লো আজিকার দিন যেন অতিরিক্ত হিমেল।

চক্র ও চক্রান্ত



সূচনা

অন্যায়ের কতখানি আত্মঘাতী শক্তি যে মানুষের আছে, তা মানুষও হয়ত জানে না।

১৯১৪, যেদিন জগতের প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হলো, সেদিন থেকে ১৯৪৫ পর্য্যন্ত, যেদিন জগতের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কাগজে-কলমে শেষ হলো, এই ত্রিশটা বছর, জগতের ইতিহাসে এ-রকম অবিচ্ছেদ্য চাঞ্চল্যকর দিন আর দেখা যায় না। এই ত্রিশটা বছরের মধ্যে কত রাজ্য ওলোট-পালট হয়ে গেল; কত রাজা সিংহাসন থেকে ধুলোতে এসে বসলো, কত বিপ্লব, কত বিদ্রোহ, কত ষড়যন্ত্র যে এলো-গেলো তার আর ইয়ত্তা নেই। জগতের বাইরে থেকে দাঁড়িয়ে কেউ যদি এই ক'টা বছরের সমস্ত পৃথিবীটাকে একসঙ্গে দেখতে পেতো, আরব্য-উপন্যাসের কল্পিত ম্যাজিকের কাহিনী মনে হয় সে-দৃশ্যের কাছে অতি তুচ্ছ মনে হতো।

এই ত্রিশটা বছরে যা ঘটে গিয়েছে, তার বিবরণ প্রতিদিনই জগতের মুদ্রাযন্ত্র থেকে একটু একটু করে এখন প্রকাশিত হচ্ছে। এত দিন খবরের কাগজে এই ত্রিশটা বছরের যে সংবাদ আমরা পড়ে এসেছি, আজ ক্রমশ দেখছি, আসল ঘটনার কতটুকুই না তখন খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। খবরের কাগজে যা দেখেছি, সে শুধু তার বাইরের খোসাটা···একটা অতি নগণ্য অংশ। প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টের গোপন দফ্‌তর থেকে, প্রত্যেক বিপ্লবীর আত্মকাহিনী থেকে, বহু গুপ্তচর আর রাষ্ট্রদূতের অপ্রকাশিত কাগজপত্র থেকে, দুনিয়ার বই-এর বাজারে আজ প্রতিদিনই যে-সব বই প্রকাশিত হচ্ছে, তা পড়ে মনে হয় যে, এই বিরাট অন্ধকার গর্ত্তের ভেতরে এখনও যে কি রহস্য লুকানো আছে, তা কে বলতে পারে! রয়টারের একটা সামান্য সংবাদ, খবরের কাগজে মাত্র দুটি নিরীহ লাইনের মধ্যেই যা সীমাবদ্ধ, তার পিছনে যদি অনুসন্ধান করা যায়, তাহলে হয়ত দেখা যাবে, গ্রীণল্যাণ্ড থেকে মাডাগাস্কার পর্য্যন্ত একটা বিরাট প্লট সেই দুটি নিরীহ লাইনের পিছনে রয়েছে। খবরের কাগজে সেই দুটি লাইনে যা পড়লাম, তা হয়ত সম্পূর্ণ মিথ্যা, বা অসম্পূর্ণ। তার পেছনে থাকের পর থাক, অন্য আর এক সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার ঢাকা পড়ে আছে। কোন ঘটনা পরে উদ্‌ঘাটিত হয়, তখন আমরা তার আসল মানে খুঁজে পাই, কোন ঘটনা হয়ত আর উদ্‌ঘাটিতই হয় না। সরকারী গোপন দফ্‌তরের সাত হাত মাটির তলায় তার সমাধি হয়ে যায়!

তাই আজ গত ত্রিশটা বছরের সে-সব রোমাঞ্চকর কাহিনী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হচ্ছে, কতটুকু অংশই বা তার প্রকাশিত হয়েছে, মনে হয় তার মধ্যে ঢুকলে যেন আর বেরুবার পথ পাওয়া যাবে না। গত বছরে যে ঘটনার বিবরণ পড়ে মনে হয়েছে জার্ম্মাণীই দায়ী, আজ আবার সেই সম্বন্ধে নতুন বই বেরুলো, মনে হলো, জার্ম্মাণী নিরপরাধ, রাশিয়াই দায়ী। কাল যে লোককে দেখেছি দেশহিতৈষী ব্যবসায়িরূপে, আজ দেখলাম আসলে সে শত্রুপক্ষের চর···ব্যবসা তার বাইরের আবরণ, দশটা লোকের অকালমৃত্যুর সঙ্গে সে বিজড়িত। পদ্মার তীরের মত দু'বেলা ঘটনার স্রোত জীবনের অভিজ্ঞানের তীর ভাঙতে ভাঙতে চলেছে। সেই ক্রূর অভিযান যে উপলব্ধি করেছে, যে দেখতে শিখেছে ঘটনার আড়ালে চলমান জীবনের সেই নির্ম্মম বহুরূপী ছদ্মবেশ, যে প্রবেশ করেছে লিখিত ইতিহাসের দ্বারদেশ পেরিয়ে তার গোপন অন্দর-মহলে, এক মহা-আতঙ্ক আর সন্দেহ তার মনকে আচ্ছন্ন না করেই পারে না। সংবাদপত্রের কোন ঘটনাকেই আর তার বাহ্য-মূল্যে গ্রহণ করা তখন সম্ভব হয় না।

এই বহুরূপী ত্রিশটি বছরের গোটাকতক দিনের অন্তরঙ্গ কাহিনী এখানে পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি। রাশিয়ায় বোল্‌শেভিক-বিপ্লব আর সোভিয়েট-পত্তনের মাঝামাঝি কয়েকটা বছরের ঘটনা। খবরের কাগজের ভাষায় এই ঘটনার বিবৃতি সামান্য দু'কথায় বলা যায়—দলের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ার দরুণ ট্রটস্কী রাশিয়া থেকে নির্ব্বাসিত হন এবং নির্ব্বাসনে থেকে তিনি সোভিয়েট রাশিয়ার তদানীন্তন শাসকদের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন।

এই নিরীহ উক্তিকে কেন্দ্র করে আজ যে-সব ঘটনা উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে, তা পড়তে পড়তে মনে হয়, বর্ত্তমান আমেরিকার যে-কোন শ্রেষ্ঠ থ্রিলার তার কাছে পানুসে। মানুষের কল্পনা, যেখানে ছুটেছে উর্দ্ধরেখায় স্বর্গের দিকে, সেখানে হয়ত আসল মানুষ অনেক নীচে পড়ে আছে কিন্তু মানুষের কল্পনা যেখানে ছুটেছে নিম্নগতিতে পাপের অন্ধকারে, সেখানে আসল মানুষ মনে হয় তার কল্পনাকেও ছাড়িয়ে বহু বহুদূরে চলে গিয়েছে। কল্পনাও সেখানে তার নাগাল পায় না। অন্যায়ের কতখানি আত্মঘাতী শক্তি যে মানুষের আছে, তা মানুষও হয়ত জানে না।

চক্র ও চক্রান্ত

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিপ্লবের ভেতর বিপ্লব

চলুন পাঠক, আজ নির্ভাবনায় সেখানে প্রবেশ করা যাক, নির্ভাবনায় কেন না, সেদিনকার জ্যান্ত ঘটনা আজ মরা ইতিহাস, সেদিনকার বিপ্লবীর হাতের বিভলভার আজ ঘটনার মিউজিয়ামে প্রদর্শনী মাত্র।

হিটলার যে-মুহূর্ত্তে জার্ম্মাণীর ভেতরে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিতে পারলেন, যখন তিনি বুঝলেন, তাঁর ইচ্ছাই জার্ম্মাণ জাতির ইচ্ছা, সেই মুহূর্ত্ত থেকেই তাঁর দৃষ্টি গিয়ে পড়লো, জার্ম্মাণীর বাইরে বিরাট বিশ্বের ওপর। সীজার যা পারে নি, সেকেন্দর শাহ যা পারে নি, নেপোলিয়ান যা পারে নি, সেই অসাধ্য সাধন করবার ঐতিহাসিক দায়িত্ব তিনি নিজের ঘাড়ে নিলেন। সমগ্র বিশ্বে তিনি জার্ম্মাণ-আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করবেন, জগতের মধ্যে তিনি থাকবেন তাদের একমাত্র ফুহ্‌রার। সীজার-সেকেন্দর-নেপোলিয়ানের ভূত জেঁকে এসে বসলো সেই সামান্য সৈনিক যে আজ জার্ম্মাণীর একমাত্র ইষ্টদেবতা হয়েছে, সেই হিটলারের ঘাড়ে। তার জন্যে হিটলার অঙ্ক কষে প্ল্যান তৈরী করতে লাগলেন।

এই জাতীয় দিগ্বিজয়ের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে, জার্ম্মাণ-দার্শনিক-বুদ্ধি অনুযায়ী, একটা তত্ত্ব খাড়া করা প্রয়োজন। ঈশপের সেই নেকড়ে বাঘের অমর গল্পের নীতিকথা অনুযায়ী ছলের অসদ্ভাব কখনও ঘটে না। এক্ষেত্রেও ঘটলো না। নব্য নাৎসী দার্শনিকেরা জার্ম্মাণ জাতির আর্য্যত্ব আবিষ্কার করে ফেললো এবং সেই আর্য্যত্বের গুরু দায়িত্বে অনুপ্রাণিত নব্য জার্ম্মাণী প্রথম জেগে উঠে দেখলো, জগতের অনার্য্যদের ক্ষেপিয়ে তোলবার জন্যে সোভিয়েট রাশিয়া বোলশেভিকবাদের যে মারাত্মক প্রেতযজ্ঞের আয়োজন করেছে, তা পণ্ড না করতে পারলে জার্ম্মাণ-আর্য্যামির প্রতিষ্ঠার কোন সুযোগ নেই। সুতরাং সর্ব্বশক্তি প্রয়োগে সেই অর্বাচীন অনার্য্যশক্তিকে আগে ধ্বংস করা কর্ত্তব্য।

তাই রাশিয়ার দিকে চেয়ে হিটলার দেখলেন, যদিও সেখানে বোলশেভিকরা জারতন্ত্র ধ্বংস করে শাসন-ভার গ্রহণ করেছে, কিন্তু এখনও তারা সংহত হতে পারে নি। যদিও বার বার বহু সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের বহু ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে, তবুও এখনো সোভিয়েট রাশিয়া এমন সংহতি লাভ করে নি, যা থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারে যে, তাদের এই উদ্যোগ স্থায়ী হবে। এখনও সেই বিরাট দেশের মধ্যে নানা দল, নানা মত, নানা স্বার্থ, আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টাস্বরূপ সেই বিজয়ী বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের আয়োজন করছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শল্যের ব্যূহের মধ্যে একা ঢুকে পড়ে, তরুণ অভিমন্যু যেমন দশ দিক থেকে দশ রথীর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন, তেমনি ধারা তরুণ সোভিয়েট রাষ্ট্রকে সেদিন ঘরে-পরে দশ দিক থেকে দশ জনে ঘিরে ধরে। সেদিন জগতে খুব অল্পসংখ্যক লোকই বিশ্বাস করতে পেরেছিলেন যে, সেই বিরাট প্রতি-আক্রমণ এড়িয়ে সোভিয়েট রাশিয়া স্থায়ী শাসন-যন্ত্র গড়ে তুলতে পারবে। বিশেষ করে, সংগ্রামের মধ্যস্থলে যখন লেনিন পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হলেন এবং সেনাপতিত্বের ভার গিয়ে পড়লো একদা ব্যাঙ্ক-লুণ্ঠনকারী গুণ্ডা-শ্রেণীর একজন অনুচরের ওপর, অর্থাৎ ষ্টালিনের ওপর, তখন সেই অল্পসংখ্যক লোকের বিশ্বাসেও ভাঙ্গন ধরলো। কারণ, বাইরের জগৎ বোলশেভিক দলের শক্তিরূপে তখন মাত্র দুটি নামকে জান্‌তো, একটি হলো লেনিন আর একটি হলো ট্রটস্কী। দলের অন্য সব নেতা এই দুই বিরাট জ্যোতিষ্কের আলোর আড়ালে তখন জগতের জনসাধারণের চোখে পড়তো না। ষ্টালিনকে লেনিনের ছায়া-অনুসরণকারী যে-কোন-অপকর্ম্মে-অগ্রণী বিরল-বাক্ রক্তলোভী এক-জন গুণ্ডারূপে সেদিন সাম্রাজ্যবাদী প্রেস জগতে জাহির করতো। তার বেশী কোন সম্ভাবনা যে সেই স্বল্পকথার মানুষটির মধ্যে আছে বাইরের জগৎ তার কোন সংবাদই রাখতো না।

কিন্তু মানুষকে বাদ দিয়ে দেখলেও, সে-সময়

সোভিয়েট রাশিয়া যে আদর্শের ওপর ভিত্তি করে তাদের নতুন রাষ্ট্র গড়ে তুলছিল, সেই আদর্শ তখন দাবানলের মত য়ুরোপের অন্য সব দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রত্যেক জাতির মধ্যে অপমানিত লাঞ্ছিত সর্বহারার দল সেই আদর্শের মধ্যে তাদের বুভুক্ষিত অন্তরের ক্ষুধার সামগ্রীর সন্ধান পেয়েছিল, তাই রাষ্ট্রের সমস্ত বাধা সত্ত্বেও, তাদের মনে ধীরে ধীরে কম্যুনিজিমের আসন প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছিল। সোভিয়েট রাশিয়া যদি কৃতকার্য্য হয়, তাহলে অন্য সব রাষ্ট্রের জনসাধারণকে আর কোন উপায়ে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। সুতরাং সোভিয়েট রাশিয়াকেই সমূলে উৎপাটিত করতে হবে, এই ছিল অন্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের সংকল্প।

সেই সংকল্পে অনুপ্রাণিত হয়েই হিটলার, দশ বৎসর পরে যে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করবেন, দশ বৎসর আগে থাকতে য়ুরোপের প্রত্যেক রাষ্ট্রের ভেতরে তার সহায়ক গোপন ষড়যন্ত্রকারী দল গড়ে তুলতে লাগলেন। যেদিন তিনি বাইরে থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন, সেদিন এই ষড়যন্ত্রকারী দল ভেতর থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে তাঁকে সাহায্য করবে। যদিও তখন পঞ্চম বাহিনী কথাটির সৃষ্টি হয় নি, কিন্তু কার্য্যত হিটলার জার্ম্মাণীর বাইরে য়ুরোপের প্রত্যেক রাষ্ট্রে এই গোপন পঞ্চম বাহিনী দল গড়ে তোলবার এক বিরাট প্ল্যান তৈরী করলেন। তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর হেসের ওপর ভার পড়লো, দেশে দেশে ষড়যন্ত্রকারী এই গোপন-বাহিনী গড়ে তোলবার। এই চক্রের প্রধান কাজ হলো, প্রত্যেক রাষ্ট্রের যে-সব উচ্চপদকে key post বলে, সেগুলোতে ধীরে ধীরে নিজেদের দলের লোককে বসানো। কবে সেই সব পদ খালি হবে, তার জায়গায় স্বাভাবিক নিয়মে নতুন লোক নিযুক্ত হবে, তার জন্যে বসে থাকতে হলে, প্রচুর সময়ের প্রয়োজন। অত সময় হাতে নেই। সুতরাং সেই সব পদে যদি বিরোধী দলের লোক থাকে, শর্ট-কাট পদ্ধতি অনুযায়ী, তাদের হত্যার দ্বারা সবিঘ্নে ফেলতে হবে। এবং এমন ভাবে এই সব হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করতে হবে, যাতে কারুর মনে তিলমাত্র সন্দেহ না আসতে পারে যে, কোন বিরুদ্ধ দল গোপনে "কাজ" করছে। অন্তত উদ্যোগ-পর্ব্ব পর্য্যন্ত এই সংগোপনতাকে যে-কোন উপায়ে বজায় রাখতে হবে।

এই সিদ্ধান্তের ফলে, য়ুরোপের প্রত্যেক রাজধানীতে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, খবরের কাগজের সংবাদের আড়ালে, এক ভয়াবহ হত্যার আর ষড়যন্ত্রের চক্র পৃথিবীর আবর্ত্তনের বেগে ঘুরতে সুরু করলো। গোয়েন্দা আর গুপ্তচর, বিপ্লবী আর প্রতি-বিপ্লবীতে ভরে গেল য়ুরোপের প্রত্যেক রাজধানী।

আপাতত আমাদের কাহিনী সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। চলুন পাঠক, নির্ভাবনায় আজ সেখানে প্রবেশ করা যাক্…নির্ভাবনায়, কেন না সেদিনকার জ্যান্ত ঘটনা আজ মরা ইতিহাস, সেদিনকার বিপ্লবীদের হাতের রিভলভার আজ ঘটনার মিউজিয়ামে প্রদর্শনী মাত্র।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ষ্টালিন না ট্রট্স্কী

ট্রট্স্কী ষ্টালিনকে বলতেন জর্জিয়ার নোংরা আরসুলা, তার জবাবে ষ্টালিন তাঁকে বলতেন য়িহুদী শয়তান।

লেনিন যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন গ্রীক রূপকথার এ্যাট্‌ল্যাস্ দৈত্যের মত রুশ-বিপ্লবের সমস্ত দায়িত্ব তাঁর নিজের ঘাড়ে নিয়ে বয়ে বেড়িয়েছেন। তা থেকে অবশ্য এ-কথা বলতে চাইছি না যে, রুশ-বিপ্লব তাঁর একার সৃষ্টি, কিন্তু এ-কথা ঐতিহাসিক সত্য যে লেনিন যত দিন জীবিত ছিলেন, নবীন সোভিয়েট রাষ্ট্রের সমস্ত বিভাগই তাঁর বিরাট প্রতিভায় তিনি পরিব্যাপ্ত করেছিলেন। তাঁর বিচার ও বুদ্ধি অনুযায়ী সেই পরীক্ষামূলক নতুন রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নিয়ম-কানুন, সন্ধি-সর্ত্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষ্পন্ন হতো, এবং কম্যুনিষ্টরা সন্দেহাতীত ভাবে জানতো যে, এই একটি লোকের মার্কস্ নীতি-জ্ঞানের ওপর এবং সততার ওপর তারা নির্ভর করে থাকতে পারে এবং তাই ছিলও। রাশিয়ার বাইরে তখন লেনিন ছাড়া আর একটি লোককে জগৎ জানতো, তিনি হলেন ট্রট্স্কী।

গত যুগের য়ুরোপের রাজনৈতিক জগতে যতগুলি রোমান্টিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই, ট্রট্স্কী তাঁদের চেয়ে সব চেয়ে বেশী রঙদার ছিলেন। রাজনৈতিকের চেয়ে তাঁর মধ্যে সাহিত্যিকের এবং অভিনেতার উপাদানই ছিল বেশী। বিরাট জনতাকে শুধু কথার উত্তাপে কি করে জাগিয়ে তুলতে হয় সে-বিদ্যা ট্রট্স্কীর সহজাত ছিল। তাই রেড-আর্ম্মির গোড়ার দিকে, যুদ্ধ-অভিজ্ঞতাহীন সামান্য চাষী এবং শ্রমিকদের রেড-আর্ম্মিতে তিনি টেনে আনতে পেরেছিলেন। তাঁর নিখুঁত বেশভূষা, বাটালি দিয়ে-খোদা প্রতিভাদীপ্ত মুখ, অসাধারণ বাগ্মিতা

ক্ষমতা, পাকা অভিনেতার মত নাটকীয় ভঙ্গী এবং সর্বোপরি আত্ম-প্রচার-কলাবিদ্যার চূড়ান্ত প্রয়োগ, সেই সময় য়ুরোপীয় জনসাধারণের কাছে রূপকথার নায়কের রহস্যে তাঁকে ঘিরে রাখে। তাই অনেকের ধারণা ছিল যে, লেনিনের তিরোধানের পর, সোভিয়েট রাশিয়ার প্রথম-পুরুষের মুকুট তাঁর মাথাতেই এসে পড়বে। কিন্তু তার বদলে কোথা থেকে জর্জ্জিয়ার সেই মুচীর ছেলে, এতদিন যে শুধু মাটির তলায় অন্ধকার সুড়ঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে, ট্রটস্কীর মুখের সামনে থেকে তাঁর গ্রাস কেড়ে নিয়ে কম্যুনিষ্ট পার্টিতে লেনিনের স্থান অধিকার করে বসলো। জগৎ শুনলো, ট্রটস্কী নয়, ষ্টালিনই লেনিনের উত্তরাধিকারী।

কম্যুনিষ্ট পার্টির অন্তরঙ্গ ইতিহাসের সঙ্গে যারা জড়িত, শুধু তারাই তখন জানতো, এই দুটি বিপ্লবীর মধ্যে কি অসাধারণ প্রেমই না ছিল! ট্রটস্কীর মতন ষ্টালিনের কোন দিনই বাসনা ছিল না যে, আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর নাম জগতের বড় বড় খবরের কাগজের হেড্‌লাইনে মুদ্রিত হোক্! ট্রটস্কী আর লেনিন যখন রাশিয়া থেকে নির্ব্বাসিত হয়ে য়ুরোপের রাজধানীতে রাজধানীতে আন্তর্জ্জাতিক বিপ্লবীদের সঙ্গে ওঠা-বসা করছেন, ষ্টালিন তখন জারের রাশিয়ায় মাটির তলায় সুড়ঙ্গ-পথে নীরবে এবং অতি গোপনে দলের কাজ করে চলেছেন। দলের প্রত্যেকটি সামান্যতম কর্ম্মীর সঙ্গে ষ্টালিন পরিচিত···ট্রটস্কী তাদের নামও পর্য্যন্ত শোনেন নি। তাই হঠাৎ যখন লেনিনের প্রভাব সরে গেল, ট্রটস্কী দেখলেন, দলের ভেতরে তাঁর কোন প্রভাবই নেই, সেখানে জর্জ্জিয়ার সেই গুণ্ডারই একচ্ছত্র প্রভাব। তিনি যখন বাইরে বক্তৃতা করে বেড়িয়েছেন, এই স্বল্পবাক্ লোকটি তখন দলের আভ্যন্তরিক সমস্ত ঘাঁটি দখল করে বসে ছিল। ট্রটস্কী কোনও দিন নিজের প্রতিভার তেজে সন্দেহ পর্য্যন্ত করেন নি যে, ষ্টালিনের মাথায় মস্তিষ্ক বলে কোন পদার্থ আছে কিন্তু লেনিনের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বুঝলেন, তাঁর এই রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীটিকে তিনি যতখানি ঘৃণা করেছেন, ঠিক ততখানি যদি বুঝতে চেষ্টা করতেন, তাহলে হয়ত আজ কম্যুনিষ্ট দল থেকে তাঁকে স্থানচ্যুত হতে হতো না।

ট্রটস্কী সর্ব্বদাই চরম ঘৃণা ও অবজ্ঞায় ষ্টালিনকে দেখে এসেছেন। প্রকাশ্যে ষ্টালিনকে আঘাত করবার জন্যে তাঁকে জর্জ্জিয়ার আরসুলা বলে উল্লেখ করতেন। ষ্টালিনও তার প্রত্যুত্তর দিতে এতটুকু দ্বিধা করতেন না। ট্রটস্কী না বলে তিনি বলতেন ইহুদী শয়তান। আজ কম্যুনিষ্ট দলের পুরোনো ইতিহাস ঘাঁটলে, এই দু'জনের ঝগড়ার বহু নজীর বেরুবে এবং সেই সব বিবাদের অতি তীব্র কাহিনী পড়তে পড়তে মনে হয়, লেনিনের কতখানি কৃতিত্ব ছিল যে এই দুই পরস্পর-বিরোধী শক্তিকে তিনি একসূত্রে বেঁধে চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন। এই দুই বিরুদ্ধ শক্তিকে তিনি স্বতন্ত্র ভাবে রুশ-বিপ্লবের কাজে খাটিয়ে নিয়েছিলেন কিন্তু রাষ্ট্র-গঠনের সময় যখনই এঁরা দুজন একই ক্ষেত্রে কার্য্য-গতিকে এসে পড়েছেন, তখনই তুমুল দ্বন্দ্ব বেধে গিয়েছে। ইতিহাসের প্রত্যেক ছাত্রের কাছে এই-সব দ্বন্দ্ব অতি পরিচিত। প্রত্যেক দ্বন্দ্বে ট্রটস্কী নিষ্ফল আক্রোশে সেই জর্জ্জিয়ানের কাছ থেকে হটে আসতে বাধ্য হয়েছেন। অবশেষে কুড়ি বছরের এই ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব লেনিনের মৃত্যুর পর ষ্টালিনের একাধিপত্যে চরম বিরোধিতায় ফেটে পড়লো।

ট্রটস্কীকে কম্যুনিষ্ট দলের চৌহদ্দী থেকে সরাবার জন্যে ষ্টালিন লেনিনের একটা চিঠি বার করলেন, সেই চিঠিতে লেনিন লিখছেন, দলের নেতাদের মধ্যে কমরেড ট্রটস্কী নিশ্চয়ই সকলের চেয়ে প্রতিভাবান কিন্তু তিনি সেই অনুপাতে আত্মকেন্দ্রিক, দাম্ভিক। তা ছাড়া, তিনি আসলে বোলশেভিক নন্।

শেষ কথাটাই হলো মারাত্মক। ট্রটস্কী রেগে জবাব দিলেন, এ চিঠি হলো ষ্টালিনের জালিয়াতী, আবিষ্কার।

কিন্তু ষ্টালিন পুরোনো কাগজ চিঠিপত্র ঘেঁটে এক-দুই-তিন করে প্রায় দশটি লেনিনের উক্তি বার করে দিলেন, যাকে আর আবিষ্কার বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। একটিতে লেনিন স্পষ্ট লিখেছেন, ট্রটস্কী হলো রুশ-বিপ্লবের "জুডাস্"।

সুরু হলো বিপ্লবের ভেতরে আর এক তুমুল বিপ্লব। এই ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব বুঝতে হলে, ট্রটস্কীর অভ্যুদয় এবং কম্যুনিষ্ট পার্টিতে তাঁর স্থান কোথায় ছিল, সেটার খবর নেওয়া একটু দরকার।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রোমাণ্টিক বিপ্লবী বনাম বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদী

রিভলভার নয়, ডাস্ ক্যাপিটলের একখানা পাতা······

লেনিন ষ্টালিনের মত ট্রটস্কীও ছদ্মনাম। বস্তুত অধিকাংশ সোভিয়েট নেতাদের যে-নামে আমরা জানি, তা তাঁদের ছদ্মনাম। জারের গুপ্তচরদের হাত এড়াবার

জন্যে এঁদের প্রত্যেককেই বহু ছদ্মনাম ব্যবহার করতে হয়। তার মধ্যে তাঁদের বাপ-মায়ের-দেওয়া নাম আজ প্রায় নিঃশেষে হারিয়ে গিয়েছে।

ট্রটস্কীর বাবা ছেলের নাম রেখেছিলেন লেভ্ ডেভিডোভিচ ব্রনষ্টিন। দক্ষিণ-রাশিয়ার খারশনের কাছে ইয়ানোভ্কা বলে একটা ছোট্ট গ্রাম, সেই গ্রামের এক সমৃদ্ধ ইহুদী-পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর আত্মচরিত-কাহিনীতে নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে ট্রটস্কী লিখছেন, আমার চোখের সামনে তখন কবি আর সাহিত্যিকের জীবন স্বর্গলোকের মতন মনে হতো; মনে হতো, জগতের নির্ব্বাচিত মহাপুরুষদের সেই হলো মহত্তম বৃত্তি।

কলেজে পড়বার সময়ই একটা নাটক লিখতে সুরু করেন। সেই সময় ওডেসা শহরে সাহিত্যিকদের ছোট-খাটো বহু আড্ডা গড়ে ওঠে। তারই এক সৌখীন আড্ডায় ট্রটস্কী জুটে পড়েন। সেই সময় থেকেই তাঁর বেশভূষার মধ্যে বেশ একটা পারিপাট্য ও স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। এই সব আড্ডায় সাধারণত সেই যুগের বোহিমিয়ান সব যুবকরা সমবেত হতো। অতীতের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে নতুন বামপন্থী সাহিত্য-রীতির প্রবর্ত্তন তখন সুরু হয়ে গিয়েছে। কোন যে বিশিষ্ট মতবাদ তাদের ছিল তা নয়, তবে যৌবনের প্রথম উন্মাদনায় বামাচারী হওয়াই ছিল প্রতিভার পরিচয়। কোন কিছুকে স্বীকার করা নয়, সব-কিছুকে অস্বীকার করাই ছিল এই বোহিমিয়ানদের আদর্শ। তার প্রেরণায় তারা সমাজ, ধর্ম্ম, জার-তন্ত্র, যা-কিছু তখন প্রচলিত তার বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করলো! ফলে মারাত্মক বিপ্লবী বলে জারের গুপ্তচরদের সুনজরে এঁদের মধ্যে অনেকেই পড়লেন। ট্রটস্কীও ধরা পড়লেন এবং সেই সময় রাশিয়া থেকে সাইবেরিয়ার চিরতুহিনের দেশে যে পথ চলে গিয়েছে, সেই পথে প্রতিদিন দলে দলে রুশ যুবকেরা চলেছে নির্ব্বাসনের দণ্ড নতশিরে বহন করে। সেই বিরাট তীর্থে-যাত্রায় ট্রটস্কীও যাত্রী হলেন।

কয়েক মাস সাইবেরিয়ার নির্ব্বাসনে কাটানোর পর, ট্রটস্কী সেখান থেকে পালিয়ে ছদ্মবেশে য়ুরোপের বিভিন্ন রাজধানীতে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। সেই সময় লণ্ডন এবং জেনেভা এই ধরণের স্বদেশ থেকে নির্ব্বাসিত নানা জাতির বিপ্লবীতে ভর্তি। দেশের বাইরে থেকে নিজের নিজের দেশের ভিতরে বিপ্লবের অনুকূল অবস্থা তৈরী করবার জন্যে আয়োজন করাই ছিল তাদের কাজ। ট্রটস্কী সেই সব প্রবাসী রুশ-বিপ্লবীদের নিয়ে নিজে একটা ছোটখাটো দল তৈরী করে ফেললেন।

সেই সময় লেনিনও স্বদেশ থেকে নির্ব্বাসিত হয়ে লণ্ডন শহরে তাঁর কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপন করেছেন। সাম্রাজ্যবাদী জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার বৃটিশ মিউজিয়ামে বসে লেনিন তখন সাম্রাজ্যবাদ-ধ্বংসের বীজ-মন্ত্র সংগ্রহ করছেন। এই লণ্ডন শহর থেকেই তাঁর বিখ্যাত সংবাদ-পত্র Iskraর সম্পাদনা করছেন। ট্রটস্কী লণ্ডনে এসে Iskraর সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করলেন। সেই বছরেই রাশিয়ার সোশ্যাল ডেমোক্রাট দলের মধ্যে মতদ্বৈধতার দরুণ দুটো ভাগ হয়ে গেল। যে দলে অধিকাংশ সভ্য রয়ে গেলেন, তার নাম হলো বোলশেভিক (রুশ ভাষায় Bolshiviki কথার মানে হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ) আর তাঁদের প্রতিবাদকারী স্বল্প-সংখ্যকের নাম হলো মেনশেভিক। যে কথাটি উচ্চারিত হলে, সাম্রাজ্যবাদী য়ুরোপ সেদিন পর্য্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে উঠতো, যেন সেই কথাটির মধ্যেই নরকের সমস্ত বিভীষিকার শক্তি পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, জন্মের দিক থেকে তার মধ্যে বিভীষিকার ব পর্য্যন্ত ছিল না। অতি নিরীহ শব্দ, সংখ্যাগরিষ্ঠের দল। এই বোলশেভিক দলের নেতা হলেন লেনিন আর ট্রটস্কী হলেন তার অপোজিসন্ পার্টির নেতা অর্থাৎ মেনশেভিক দলের নেতা। প্রকৃতপক্ষে সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক্ পার্টির মধ্যে সেদিন সেই দুটি স্পষ্ট ভাগ হয়ে যাওয়ার পর থেকে, খাঁটি মার্কস্-নীতি অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক কম্যুনিজমের জন্ম হলো। এবং সেই দিন থেকে সাম্যবাদের নামে রাশিয়ায়, টেরারিজিম্ থেকে আরম্ভ করে নানা নামে নানা জাতীয় যে-সব ধোঁয়াটে সাম্যবাদের দল ছিল, সেগুলোকে লেনিন কঠোর হস্তে আলাদা করে দিলেন। এত দিন যে-ভাবের গোঁজামিলের ওপর নানা দল উপদলের সৃষ্টি হয়ে চলেছিল, লেনিনের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা তাকে সমালোচনা করে, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের ভিত্তি রচনা করলেন। জগতের সামনে বৈজ্ঞানিক মার্কস্বাদকে তুলে ধরলেন এবং এমন ভাবে তাকে তুলে ধরলেন যে, তার মধ্যে এতটুকু ভাবের গোঁজামিল বা উচ্ছ্বাসের আবছা আত্ম-প্রবঞ্চনার স্থান রইলো না। তার ফলে তাঁর বহু সহযাত্রী, মতবাদের দিক থেকে তাঁর বিরোধী হয়ে উঠলো। মার্কস-নীতির ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ নিয়ে তাঁর সঙ্গে তাদের বচসা ও দ্বন্দ্ব প্রায়ই হতে লাগলো। ট্রটস্কী এই বিরোধী দলের সহযোগিতাকে লেনিনের বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়ে, লেনিনের হাত থেকে অনাগত

বিপ্লবের প্রথম নায়কের গৌরবকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ট্রটস্কীর সাহিত্যিক প্রতিভা, অপূর্ব্ব বাগ্মিতা, মানুষকে প্রথম সাক্ষাতে মুগ্ধ করবার শক্তি, দেখতে দেখতে প্রবাসী বিপ্লবীদের চিত্তে রীতিমত প্রভাব বিস্তার করলো। য়ুরোপের যে সমস্ত শহরে প্রবাসী রুশদের আড্ডা ছিল, ব্রুসেল্‌স্‌, প্যারী, জেনেভা, লীইজ্‌, বার্লিন, সর্ব্বত্র ঘুরে ঘুরে ট্রটস্কী, লেনিনের অঙ্ক-কষা বৈজ্ঞানিক রীতির বিরুদ্ধে প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন। লেনিনের সুচিন্তিত নিয়মানুবর্ত্তিতা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, নাটকীয়তাহীন কঠোর আদর্শবাদ ট্রটস্কীর রোমাণ্টিক ধাতে অসহ্য বোধ হতে লাগলো। ট্রটস্কী যেখানে ঝড়ের মত ছুটে গিয়ে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়তে চান, লেনিন সেখানে ধীর স্থির হয়ে বসে চোখে মাইক্রস্‌কোপ লাগিয়ে দেখেন, কোথায় মৃত্যু সূক্ষ্মতম ছদ্মবেশে লুকিয়ে রয়েছে। ট্রটস্কী বক্তৃতা দিয়ে যেখানে জনতাকে ক্ষেপিয়ে তাদের হাতে রিভলভার তুলে দিতে চান, লেনিন সেখানে দিনের পর দিন লাইব্রেরীতে বসে, অঙ্ক কষে, জনতার হাতে তুলে দেন তাদের আত্মপরিচয়ের হিসাব···রিভলভার নয়, ডাস্‌ ক্যাপিটলের একখানা পাতা। ভেতর থেকে যেদিন তাদের শক্তি উদ্‌বুদ্ধ হবে, সেদিন তারা নিজেরাই খুঁজে নেবে রিভলভার। তত দিন স্থির ধীর ভাবে, ঈগল পাখীর দৃষ্টি নিয়ে, অপেক্ষা করে থাকতে হবে। ভুল মুহূর্ত্তে আত্মপ্রকাশ করার দরুণ বহু বিপ্লব অঙ্কুরেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ভুলের পুনরাবৃত্তি করা সুস্থ মস্তিষ্কের পরিচয় নয়। উপমা দিয়ে যে মতবিরোধের কথা জানালাম, প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে এই বিভিন্ন মানসিকতার দরুণই সেই দুই বৈপ্লবিক প্রতিভার মধ্যে সেদিন প্রায়ই দলের ছোট-বড় নানা কাজকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ জেগে উঠতো।

১৯০৫-এ জাপানের হাতে জারের রাশিয়ার পরাজয়ে, রাশিয়ার মধ্যে হঠাৎ গণবিপ্লব মাথা তুলে উঠলো। ট্রটস্কী কালবিলম্ব না করে রাশিয়ায় প্রবেশ করলেন এবং সেণ্ট পিটার্সবার্গে শ্রমিকরা যে সোভিয়েট গঠন করেছিল, তার সভাপতি হয়ে গণ-বিপ্লবকে ব্যাপক করবার আয়োজন করলেন। কিন্তু ভুল-সময়ে এবং অপূর্ণ আয়োজনের মধ্যে এই গণবিপ্লব হওয়ার দরুণ, অতি অল্প সময়ের মধ্যে জারের মন্ত্রীরা সৈন্যদের সাহায্যে তাকে সংযত করে ফেললেন। প্রথম রুশ-গণ-বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে গেল। পুলিশ আর গুপ্তচরের অত্যাচার শতগুণ বেড়ে গেল। ট্রটস্কী বাধ্য হয়েই আবার রাশিয়া থেকে বেরিয়ে পড়লেন। ভিয়েনায় এসে তিনি স্বতন্ত্র ভাবে একটা কর্ম্মকেন্দ্র গড়ে তুললেন। সেখান থেকে তিনি য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের সাম্যবাদী দলের সঙ্গে যোগ স্থাপন করতে লাগলেন এবং বিভিন্ন দেশের বিপ্লবপন্থী ইন্‌টেলেকচুয়ালদের সঙ্গে মেলামেশা করে রাশিয়ার বাইরে নিজের প্রতিষ্ঠাকে অনেকখানি কায়েমী করে তুললেন। বস্তুত, সেই সময় আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে ট্রটস্কীর নাম ভ্রাম্যমান বিপ্লবের অগ্নিশিখার মত জ্বলে উঠলো। লেনিন তখন নীরবে কঠোরতম পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে বিপ্লব আয়োজনের ভিত্তির একটির পর একটি ইট গেঁথে চলেছেন···বৈজ্ঞানিক যেমন তার ল্যাবরে-টারীতে সংবাদ-পত্রের প্রচারের বাইরে একটার পর একটা পরীক্ষা নিঃশব্দে করে চলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

লেনিন ও ট্রটস্কী

যখন বহু দিনের কোন পরাধীন দেশ স্বাধীন হয়, কিম্বা পূর্ব্ব-বন্ধনকে ছিন্ন করে কোন জাতিকে স্বাধিকার অর্জ্জন করতে হয়, তখন সেই মুক্তি-আন্দোলনের নেতাকে সব চেয়ে বেশী সংগ্রাম করতে হয়। স্বদেশবাসীর সঙ্গেই রুশবিপ্লবের ইতিহাসে তা দেখেছি, ভারতের মুক্তি-সংগ্রামেও তা দেখছি।

মহাযুদ্ধের শেষ-বরাবর ১৯১৭ সালের মার্চ্চ মাসে রাশিয়ার সিংহাসন থেকে যখন র‍্যামোনফ-বংশের শেষ উত্তরাধিকারী বাধ্য হয়ে নেমে দাঁড়ালেন, তখন ট্রটস্কী রাশিয়া থেকে বহু বহু দূরে আমেরিকার নিউইয়র্ক সিটিতে তাঁর অন্যতম বন্ধু এবং লেনিনের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী নিকোলাই বুখারিনের সঙ্গে "নোভি মির" অর্থাৎ "নূতন জগৎ" সম্পাদন করছিলেন।

আমেরিকার কাগজে জারের পতন-সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রটস্কী তৎক্ষণাৎ তল্পিতল্পা গুটিয়ে রাশিয়ার অভিমুখে রওয়ানা হলেন। পথে ক্যানেডার গবর্ণমেণ্ট তাঁকে হ্যালিফ্যাক্স্‌ শহরে আটকালো। সংবাদ চলে গেল কন্যা-ডোমিনিয়নের কাছ থেকে জননী ইংলণ্ডের কাছে। রাশিয়া থেকেও নবগঠিত প্রভিন্স্যানাল গবর্ণমেণ্ট ট্রটস্কীর মুক্তির জন্যে ইংলণ্ডের কাছে আবেদন পাঠালো। ইংলণ্ড বিবেচনা করে দেখলো, ট্রটস্কীকে আটকে রেখে লাভ নেই বরঞ্চ নিরাপদে রাশিয়াতে দ্রুত পৌঁছে দিতে পারলেই তার সুবিধা হয়। কারণ, লেনিনের ক্ষমতার বিরুদ্ধে যদি কাউকে দাঁড় করানো সম্ভব হয়, তাহলে সে-ব্যক্তি হলো ট্রটস্কী এবং এই নব-গঠিত সাম্যবাদী রাষ্ট্রকে অঙ্কুরে বিনাশ করতে হলে, লেনিনের বিরুদ্ধে সেই রাষ্ট্রের

ভিতরেই আর একটা শক্তিশালী দলকে খাড়া করা দরকার। একমাত্র ট্রটস্কীই সেই বিপক্ষ দলের নায়ক হতে পারেন। এই হিসাব করেই ইংলণ্ড ট্রটস্কীর পথে আর কোন বাধা দিল না।

যে মাসে ট্রটস্কী পেট্রোগার্ড শহরে এসে উপস্থিত হলেন এবং লেনিনের বিরুদ্ধবাদী জন কয়েককে নিয়ে রাষ্ট্রের মধ্যে একটা অপোজিশন্ পার্টি গড়ে তোলবার আয়োজন করলেন কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই বুঝতে পারলেন, বোলশেভিক পার্টির বাইরে থেকে এই অপোজিশন তৈরী করা সম্ভব হবে না। এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, ট্রটস্কী তখনও পর্য্যন্ত বোলশেভিক দলের (যা পরে কমুনিষ্ট পার্টিতে নামান্তরিত হয়) সভ্য ছিলেন না। তখন সদ্য-জাগ্রত জয়ী জনগণের কাছে বোলশেভিক লেবেলেরই একমাত্র দাম। যা-কিছু করতে হবে, তা এই লেবেল এঁটে করতে হবে।

তাই আগষ্ট মাসে, চোদ্দ বৎসরের ক্রমাগত বিরোধিতাকে ভুলে গিয়ে ট্রটস্কী বোলশেভিক দলে সভ্যরূপে যোগদান করবার অনুমতি চেয়ে যথারীতি আবেদন করলেন।

আদর্শ নেতার ন্যায় লেনিন তখন শত্রু-বেষ্টিত সদ্যজাত সেই শিশুরাষ্ট্রকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে যেখানে যেটুকু সাহায্য পাওয়া যায়, তাই গ্রহণ করবার নীতি অবলম্বন করেছেন। তিনি জানতেন, প্রকৃত সাম্যবাদী রাষ্ট্রের পত্তন এখনও বহু দূরে। সৈন্য নেই, রসদ নেই, অস্ত্র নেই, অভিজ্ঞতা নেই; তার পরিবর্ত্তে আছে, সমগ্র সাম্রাজ্যবাদী জগতের গোপন ও প্রকাশ্য বিরুদ্ধতা এবং দেশের মধ্যেই রয়েছে সংগোপনে বহু শক্তিশালী দল এবং ব্যক্তির বিরোধিতা যারা নিজেদের স্বার্থ ও সম্পত্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবার আশঙ্কায় একটা প্রাণান্ত শেষ-সংগ্রামের আয়োজনে বদ্ধপরিকর হবে বা হচ্ছে। এই শত দিক থেকে শত আক্রমণকে ব্যর্থ করে সোভিয়েট রাশিয়াকে আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করতে হবে। সুতরাং এখানে এখন ব্যক্তিগত ঝগড়া, সূক্ষ্ম মতগত বৈষম্য সম্পূর্ণ ভাবে ভুলে যেতে হবে, যেখানে যতটুকু শক্তি আছে, তাকে আকর্ষণ করে এনে কাজে লাগাতে হবে। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে লেনিন পুরোনো সোশ্যাল ডেমোক্রাট, মেনশেভিক, র‍্যাডিকাল এবং ভিন্নপন্থী অন্যান্য সাম্যবাদী দলকে এই বিরাট দায়িত্ব বহনের কাজে আহ্বান করলেন এবং নিজের বিরাট ব্যক্তিত্বে এবং পরিচালন-ক্ষমতায় কোন দলের বা কোন বিশেষ মতের সূক্ষ্ম ভেদাভেদ বা ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বকে মাথা তোলবার অবকাশই দিলেন না।

সেই মহাদুর্যোগে লেনিন রাজনৈতিক সেনাপতিদের যে মহা-উদাহরণ রেখে গিয়েছেন, প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষীর তা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অনুশীলন করা উচিত। অমন ঝড়ো হাওয়ায়, অমন তরঙ্গসঙ্কুল মহাসাগরে আর কোন নাবিককে অমন অক্ষত অবস্থায় নৌকোকে কূলে ভিড়াতে দেখা যায় নি। কিন্তু সে স্বতন্ত্র কাহিনী।

বিপ্লবের আয়োজনের যুগে লেনিনকে বার বার ট্রটস্কীর বিরোধিতাকে নস্যাৎ করবার জন্যে বহু পরিশ্রম করতে হয়েছে, বহু বার ট্রটস্কীর বহু রূঢ় অপমান সহ্য করতে হয়েছে কিন্তু আজকে যখন সেই প্রতিদ্বন্দ্বী বোলশেভিক দলের সভ্য হবার জন্যে আবেদন করলো, লেনিন তা প্রত্যাখ্যান করলেন না। লেনিন দেখলেন, ট্রটস্কীকে দলে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক প্রতিভাশালী বামপন্থীকে দলে পাওয়া যেতে পারে। কারণ, ট্রটস্কী মানে ট্রটস্কীর দল, তা ছাড়া আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে ট্রটস্কীর প্রতিষ্ঠাকে সেই নবীন রাষ্ট্রের বিশেষ প্রয়োজন; দেশের ভেতরেও তাঁর বাগ্মিতা, লোক আকর্ষণ করবার শক্তি, ভাষার যাদুকরী প্রয়োগ-বিন্যাস আজ বিশেষ প্রয়োজন আছে। বোলশেভিক দলের মধ্যে ট্রটস্কীর মত বহু-ভাষা-জ্ঞান আর কারুর ছিল না। আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিতে তার প্রয়োজন কম নয়। লেনিন ট্রটস্কীকে বোলশেভিক দলের সভ্য করে নিয়ে সেই নবীন রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-সচিবের সব চেয়ে প্রয়োজনীয় পদে অধিষ্ঠিত করলেন। কিছুদিন পরে সেই সঙ্গে সমর-বিভাগের ভারও তাঁর ওপর দিলেন। কার্য্যত ট্রটস্কীই তখন হলেন সেই নবীন রাষ্ট্রের সর্ব্ব-প্রধান নায়ক। ষ্টালিনের ওপর পড়লো, জাতীয়তা সমস্যা সমাধানের ভার, তখন সেই যুদ্ধ-বিগ্রহের মুখে এই দফতরের বিশেষ কোন মর্য্যাদা ছিল না বললেই হয়। যদিও পরবর্ত্তী কালে দেখা গেল, লেনিন সোভিয়েট রাশিয়ার সব চেয়ে কঠিন সমস্যার সমাধান করবার ভার সেই মেঠো কর্ম্মীর ওপরই দিয়েছিলেন! ষ্টালিনও এই সমস্যা নিয়ে যে পুঁথিগত বিদ্যা এবং রাজনীতি-জ্ঞানের পরিচয় দিলেন, তাতে জগৎ সেই প্রথম বিস্মিত হয়ে দেখলো, এই স্বল্পবাক্ কর্ম্মীটির মস্তিষ্কের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর শত্রুপক্ষেরা যে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল, তা সর্ব্বৈব ভুল।

রাশিয়া বিরাট দেশ। তার দেহ য়ুরোপ এবং এশিয়াকে জুড়ে পড়ে আছে এবং তার মধ্যে এমন বহু বিভিন্ন জাতি বসবাস করে, যাদের ভাষা, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত ভিন্নভাবাভাষী সেই সব বিভিন্ন জাতির রাজনৈতিক একীকরণ করার সমস্যা-সমাধানে সেদিন ষ্টালিন যে পুস্তক রচনা করেছিলেন, আজ রাজনীতি-ক্ষেত্রে তা জাতীয়তা-সমস্যা সম্পর্কে সর্ব্ববাদিসম্মত ক্লাসিক্স্।

বোলশেভিক দলে যোগদান করে ট্রটস্কী লেনিনের অপোজিসন পার্টির নায়কের স্থান নিলেন। তাঁর সঙ্গে যোগদান করলেন বুখারিন, গ্রেগরী, জেনোভিভ, এবং তাঁর শ্যালক লিও ক্যামেনেভ্। শেষোক্ত তিন জনের আবার নিজেদের বিশেষ প্রভাবে প্রভাবান্বিত এক একটি ছোট উপদল ছিল। প্রায়ই ট্রটস্কীর সঙ্গে এই তিন জনের কর্ম্ম-ব্যবস্থার দৈনন্দিন প্রয়োগ-রীতি নিয়ে ঝগড়াও হতো—কিন্তু যেখানে দলের অধিনায়কত্ব নিয়ে লেনিনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হতো, সেখানে এই চার জনই এক হয়ে দাঁড়াতেন। রুশ-বিপ্লবের ইতিহাসে এই সব উপদলীয় ঝগড়ার কথা পড়তে পড়তে বিভ্রান্ত পাঠকের মনে হতে পাবে, এক দলের মধ্যে এত মতের বিরোধ কি করে হয়? কেনই বা হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে মনে রাখতে হবে, দলের আদর্শের দিক্ থেকে তখনও পর্য্যন্ত তাঁদের মধ্যে কোন বিশেষ বিরোধ ছিল না। তাঁরা সকলেই ছিলেন মার্কস্‌পন্থী। শাস্ত্রের ব্যাখ্যা নিয়েই যেমন পণ্ডিতদের মধ্যে বিরোধ হয়, মার্কসের নীতির প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা নিয়ে তেমনি তাঁদের মধ্যে তখন বিরোধ হতো। যখন কার্য্যত সেই মার্কস্-বাদকে রূপ দেবার প্রয়োজন হলো, তখন তাঁদের সামনে কোন ঐতিহাসিক নজীর ছিল না, সম্পূর্ণ নতুন ভাবে তাঁদের একটা নতুন মানবীয় পরীক্ষা করতে হচ্ছিল এবং যাঁদের ওপর এই ভার পড়ে, অল্পবিস্তর তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাশালী এবং প্রত্যেকেরই ছিল একটা স্পষ্ট ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য। সেই জন্যেই দেখি, এত মতের দ্বন্দ্ব। একমাত্র লেনিনের ব্যক্তিত্বই এই বিভিন্ন দ্বন্দ্বের বহুমুখী ধারাকে আত্মঘাতী বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে রক্ষা করে দেশের বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে নিয়োজিত করতে পেরেছিল। সোভিয়েট রাশিয়ার আত্মপ্রতিষ্ঠার পক্ষে লেনিনের আবির্ভাব তাই সব চেয়ে বড় উপাদান। গণতন্ত্রের নীতি হিসাবে বহু মানবের সম্মতি তার মূল ধর্ম্ম হলেও, ব্যক্তিত্ব আজও, অর্জ্জুনের রথের নিষ্ক্রিয় সারথির মত মানুষের জয়-পরাজয়ের প্রধানতম নিয়ামক।

ট্রটস্কীর নিজের দলে তাঁর প্রধানতম সহচরদের মধ্যে ছিলেন উরী পিয়াটাকফ, রীতিমত এক বিত্তশালী বংশের সন্তান, য়ুরোপ-প্রবাসের সময় ট্রটস্কীর প্রভাবে বৈপ্লবিক সাম্যবাদ গ্রহণ করেন; দ্বিতীয় জন হলেন, কার্লর‍্যাডেক, বামপন্থী সাংবাদিক হিসাবে প্রথম খ্যাতি অর্জ্জন করেন; তৃতীয়, নিকোলাই ক্রেসটিনস্কী, বোলশেভিক দলের সভ্যরূপে ডুমাতে যোগদান করেন এবং শাসন-যন্ত্রের প্রধান অধিনায়কের স্থান অধিকার করবার দুরাকাঙ্ক্ষা হলো তাঁর চরিত্রের প্রধানতম উপাদান; চতুর্থ, গ্রেগরী সোকোল্‌নিকফ, ট্রটস্কী তাঁকে তাঁর মন্ত্রিত্বের আমলে পররাষ্ট্র বিভাগের একটা প্রধান পদে নিযুক্ত করেন; পঞ্চম জন হলেন, রোকোভাস্কী, জন্মের দিক থেকে তিনি বুলগেরিয়ান্, ডাক্তারী লেখা-পড়া শেখেন ফ্রান্সে এবং উক্রেন-এর গণ-অভ্যুত্থানে প্রধান অংশ গ্রহণ করেন।

এ ছাড়া, সমর-বিভাগের কর্ত্তা হয়ে, ট্রটস্কী নেপোলিয়ানের অনুকরণে, তাঁর সব সময়ের দেহরক্ষি-রূপে একটা স্বতন্ত্র দল গড়ে তোলেন। এই দলে ট্রটস্কী বেছে-বেছে বিপ্লবী দল থেকে যায়-প্রাণ-যাক্-প্রাণ গোছের দুর্দ্ধর্ষ লোকদের নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি জানতেন, সেই রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতিযোগিতায়, বহু সংগোপন আঘাতের সম্মুখে তাঁকে দাঁড়াতে হবে। সুতরাং পূর্ব্বাহ্নেই তার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ।

এ ছাড়া, ট্রটস্কী জারের আমলের কোন কোন বিচক্ষণ সেনাপতির সঙ্গেও যোগাযোগ রাখলেন এবং দলের সতর্কবাণী উপেক্ষা করে তাঁদের কাউকে কাউকে নতুন সমর-বিভাগে নিযুক্তও করলেন। ভূতপূর্ব্ব সেনাপতি টুকাচেভস্কী ট্রটস্কীর অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে পরিগণিত ছিলেন।

বোলশেভিক দলে যোগদান করলেও ট্রটস্কী নিজের স্বাতন্ত্র্য ষোল আনা বজায় রেখেই চলতেন। রাষ্ট্রের পরিচালন-ব্যাপারে প্রায়ই লেনিনের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ও সংঘর্ষ চলতো। প্রতিপদে এই সংগ্রামশীল লোকটির প্রত্যক্ষ বিরোধিতাকে জয় করে লেনিনকে অগ্রসর হতে হয়। লেনিনের কর্তৃত্বকে ছাড়িয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার দুঃসাহস একমাত্র টটস্কীরই ছিল। সমগ্র জগৎ সেদিন দেখেছে, সেই নতুন রাষ্ট্রের ভাগ্য-নির্ণয়ে এই দুই শক্তিশালী প্রতিভার দ্বন্দ্ব। তবে লেনিনের দূরদৃষ্টি এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কাছে ট্রটস্কীকে বারে বারে হার স্বীকার করতে হয়েছে।

যখন বহু দিনের পরবশতার পর কোন দেশ স্বাধীন হয়, কিম্বা পূর্ব্ব-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কোন জাতি স্বাধিকার অর্জ্জন করে, তখন সেই মুক্তি-সংগ্রামের নেতাকে সব চেয়ে বেশী সংগ্রাম করতে হয় তার স্বজনের

সঙ্গেই। রুশ-বিপ্লবের ইতিহাসে তা দেখেছি, ভারতের আর বর্মার মুক্তি-সংগ্রামেও তা দেখছি। এই বিরাট আত্মঘাতী অপব্যয়ে আজ ভারতবর্ষ অর্জ্জিত মুক্তিকেও ভোগ করতে পারছে না। সোভিয়েট রাশিয়াও পারতো না, যদি লেনিন আর ষ্টালি'নর মত কঠিন লোক সেই অপব্যয়ের মুলে নির্ম্মম হাতে ছিপি এঁটে না দিতেন। ডাক্তারীতে নির্ম্মমতার যেমন একটা বৈজ্ঞানিক উপযোগিতা আছে, বোধ হয় রাজনীতিতেও নির্ম্মমতার অনুরূপ একটা প্রযোগ-ক্ষেত্র আছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এক-বিপ্লব বনাম বহু-বিপ্লব

লেনিন বললেন, Electrification······ট্রটস্কীর দল ব্যঙ্গ করে উত্তর দিল, Electrofiction.

কি করে দিনের পর দিন, য়ুরোপের বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের এবং রাশিয়ার ভেতরকার জার-তন্ত্রের ভূতপূর্ব্ব শক্তিধরদের বার বার আক্রমণকে ব্যর্থ করে শিশু সোভিয়েট রাশিয়া আঁতুড়েই পঞ্চত্ব প্রাপ্তির অভিশাপ এড়িয়ে উনিশ শো কুড়িতে পায়ে হেঁটে চলতে শিখলো, তার দীর্ঘ কাহিনী বর্ত্তমান আলোচনার বিষয় নয়। বর্ত্তমান প্রসঙ্গের খাতিরে এখন আমাদের ধরে নিতে হবে, সোভিয়েট রাশিয়া বাইরের বহু আক্রমণকে ব্যর্থ করে উনিশ শো কুড়িতে একটা চলনসই স্থায়িত্ব অর্জ্জন করেছে। এখন তার সামনে সব চেয়ে বড় সমস্যা, ততঃ কিম্? যে বেদকে অনুসরণ করে তাঁরা চলছিলেন, সেই বেদের মূল কথা হলো, জগৎ থেকে ক্যাপিট্যালিজম্ এবং তার বাহন যে-সব শোষণকারী শাসন-তন্ত্র আছে তার উচ্ছেদ করা, জগতের সর্ব্বহারাদের মহাসম্মেলন গড়ে তোলা। তাই তাঁদের শ্লোগান ছিল, কোন বিশেষ দেশের নয়, জগতের যারা শ্রমিক, তারা হোক সম্মিলিত। মার্কস্ ক্যাপিটালিজমকে জগৎব্যাপী বর্ত্তমান সভ্যতার মহাব্যাধিরূপে দেখেছিলেন এবং জগৎ থেকে তার বীজকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁর বেদে জাতীয়তার কোন স্থান নেই। একই দুঃখে, একই শোষণে, একই নিপীড়ন-যন্ত্রে জগৎ নিপীড়িত। তাই একসঙ্গে জগৎকে এর প্রতিকার ব্যবস্থা করতে হবে। এক বিশ্বব্যাপী শ্রমিক তন্ত্র হলো মার্কস্বাদের আদর্শ। সেই আদর্শে পৌছতে হলে তাই প্রত্যেক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে মানবীয় চেষ্টায় বিপ্লব-সৃষ্টি করতে হবে এবং দ্রুত বিপ্লবের দ্বারা শাসন যন্ত্র অধিকার করে নিতে হবে।

তাই খণ্ড ভাবে রাশিয়ায় যখন একটি বিপ্লব সফল হয়ে উঠলো, একটি দেশে যখন মানবীয় চেষ্টায় বিপ্লব সৃষ্টির দ্বারা শ্রমিকেরা ধনতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করতে পারলো, তখন স্বভাবতই প্রশ্ন উঠলো, অন্য সব দেশে, যেখানে আজও ক্যাপিটালিজম সমান প্রতাপে চলেছে, যেখানে আজও শ্রমিকেরা নিত্য বঞ্চিত হয়ে আছে, সেখানে কি হবে? যে-কোনও দিনই তো সাম্রাজ্যবাদী ধনবাদ সম্মিলিত ভাবে এই অর্জ্জিত জয়-খণ্ডটুকুকে গ্রাস করে ফেলতে পারে? একটি বিপ্লব সার্থক হলেও, বহু-বিপ্লব এখনও বাকি আছে এবং যত দিন না ক্রমান্বয়ে বিপ্লব দ্বারা বিশ্ব-ধারা পরিবর্ত্তিত করা যাচ্ছে, তত দিন এই একদেশীয় খণ্ড সার্থকতার কি মূল্য?

এই প্রশ্ন তুললেন বামপন্থী বোলশেভিকরা, ট্রটস্কী হলেন তাঁদের নেতা। তাঁর সমস্ত সাহিত্যিক-প্রতিভা, সমস্ত বৈপ্লবিক অনুভূতি সংহত করে তিনি জগতের সামনে মহাবিপ্লবীর রূপে মার্কসের সেই অবিচ্ছেদ বহু-বিপ্লবের ধ্বজাকে তুলে ধরলেন। তীব্র ভাষায় লেনিনকে আক্রমণ করলেন, বললেন, লেনিন হলো নির্ব্বাপিত-অগ্নি আগ্নেয়গিরি; নব-লব্ধ জয়ের খণ্ড-কৃতিত্বে তৃপ্ত হয়ে আশ্রয় নিতে চলেছেন ডিক্টেটরের অনায়াস জীবনে। লেনিনের নায়কত্বের বিরুদ্ধে তরুণদের সজাগ করে তোলবার জন্যে সারা দেশের মধ্যে আবার পরিভ্রমণ করে বক্তৃতা দিতে লাগলেন, লেনিন আজ নিঃশেষিত-শক্তি···বিপ্লবের সমস্ত অর্জ্জিত সম্পদকে তিনি আবার সেই পুরাতন শক্তিতন্ত্রের সঙ্গে আপোষে নষ্ট করে ফেলতে চলেছেন···

লেনিনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের কারণ হলো, লেনিন তখন অন্য দেশে বিপ্লব-সৃষ্টির কাজে তরুণ সোভিয়েট রাষ্ট্রকে শক্তিক্ষয় করতে না দিয়ে, রাশিয়ায় যে শিশু সোভিয়েট রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে, তাকেই আগে সত্যকারের শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে চাইলেন। লেনিন বললেন, আমাদের পরীক্ষা যে সফল হয়েছে, তা আজ আমরা কিছুতেই বলতে পারি না। শাসন-তন্ত্রের দিক থেকে আমরা শ্রমিক-তন্ত্রকে স্বীকার করে নিয়েছি বটে কিন্তু এই রাষ্ট্রের ভেতরে দুঃখ, দৈন্য, অভাব আগেকার চেয়ে বর্ত্তমানে বেশী···এমন এক ভয়াবহ আর্থিক দুর্গতির মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া আজ আছে, তার যদি প্রতীকার না করা হয়, তাহলে এই একটি বিপ্লবের সমস্ত কৃতিত্ব অতি অল্পদিনের মধ্যেই নষ্ট

হয়ে যাবে, তখন জগৎব্যাপী বিপ্লব সংঘটন করার কথা আবার সেই পূর্ব্বেকার মত স্বপ্নের বস্তু হয়ে থাকবে। অতএব আজ সোভিয়েট রাশিয়ার আভ্যন্তরিক উন্নতির দিকেই সমস্ত সংগঠন-শক্তি নিয়োগ করতে হবে। তার জন্যে প্রয়োজন হলে, যুদ্ধের সময় কম্যুনিজিমের যে-সব নিয়ম আক্ষরিক ভাবে মানা হয়েছিল, আজ স্থান-কাল-পাত্রভেদে তার কিছু অদল-বদলও করতে হবে, এমন কি বর্ত্তমান অবস্থা-অনুযায়ী ছোটখাট ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যক্তিগত অধিকারও নাগরিকদের দিতে হবে।

মার্ক্সবাদের আদর্শের দিক থেকে লেনিনের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার এত-বড় সুযোগ টটস্কী অবহেলা করতে পারলেন না। লেনিন অনুত্তেজিত হয়ে, লজিকের সূত্রের মতন, ট্রটস্কীর সমস্ত বিপ্লবাত্মক বক্তৃতা বিশ্লেষণ করে দেখালেন, ভাষার আলঙ্কারিক প্রয়োগ বাদ দিয়ে, ট্রটস্কীর এই ক্রমাম্বয় বিপ্লব-বাদের পেছনে রয়েছে "bohemian anarchism" একটা অবৈজ্ঞানিক ধ্বংসের উন্মাদনা। বাস্তবতাকে বোঝবার বা দেখবার শক্তির অভাব। টটস্কীর এই বহু-বিপ্লববাদ মেনে নিলেও, সোভিয়েট রাশিয়ার আজ সে-শক্তি হয় নি, যাতে সেই বিরাট দায়িত্ব সে নিতে পারে এবং নিয়ে সফল করতে পারে। তার জন্যেই আজ সোভিয়েট রাশিয়াকে নিজের মধ্যে নিজের শক্তির সন্ধান করতে হবে।

এই মতের দ্বন্দ্বের মধ্যে এলো উনিশ শো কুড়ির বাৎসরিক পার্টি কংগ্রেস। রাশিয়ার প্রত্যেক সোভিয়েট থেকে প্রতিনিধিরা মস্কো শহরে এসে সমবেত হলো। ডিসেম্বর মাস। নিদারুণ শীতে পথ-ঘাট সমস্ত বরফে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সারা দেশ দুর্ভিক্ষে রিক্তপত্র শীতের গাছের মত শুকিয়ে আছে। দেশে কোথাও এতটুকু কয়লা নেই। যা আছে, গুণে খরচ করতে হচ্ছে। কাঠ পর্য্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। মস্কোর হল্ অফ্ কলমস্-এ শীতে কাঁপতে কাঁপতে প্রতিনিধিরা এসেছে। হলের ভেতর উত্তাপের কোন বন্দোবস্ত নেই। সেই শীতার্ত্ত ডিসেম্বরে জাতির ভাগ্য-বিধানের জন্যে সমেবেত হয়েছে বোলশেভিক নেতারা। ট্রটস্কী এসেছেন তাঁর দল নিয়ে, জাতির প্রতিনিধিদের কাছে লেনিনের নেতৃত্বের ভ্রান্তি ও অপ্রয়োজনীয়তাকে প্রমাণিত করবার জন্যে। নতুন নেতৃত্বের দাবী উত্থাপন করতে।

লেনিনও এসেছেন। আসতে পারবেন কি না সন্দেহ ছিল। কারণ কয়েক মাস আগে, যখন তিনি প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন সেই সময় ফানিয়া ক্যাপলিন তাঁর বুক লক্ষ্য করে বুলেটের পর বুলেট ছোঁড়ে। দুটো বুলেট তাঁর বুকে লাগে। সোভিয়েট রাশিয়ায় তাঁর জীবন-নাশ করবার এটা হলো দ্বিতীয় চেষ্টা। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করে দেখলেন, বুলেটের মুখে আবার বিষ মাখানো ছিল। লেনিন যে সে-যাত্রা বেঁচে উঠবেন, সে-আশা কারুরই ছিল না। তবু দুর্জ্জয় আত্মশক্তির জোরে লেনিন মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরে এলেন। তবে বিষের প্রভাবে সমস্ত দেখ তখন আর্ত্ত··· দুর্বল, অতি শীর্ণ। সেই শীর্ণ দেহ নিয়ে তিনি এসেছেন এবং তাঁর পকেটে আছে কম্যুনিজম্-এর একটা সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায়···ট্রটস্কীর প্রত্যুত্তর নয়···সোভিয়েট রাশিয়ার বেঁচে থাকবার একটা ব্যবস্থা···অনিশ্চিত সৌভাগ্যকে সন্দেহাতীত বিজয়-শক্তিতে পরিণত করবার একটা বৈজ্ঞানিক ফরমূলা···নিউ একোনমিক পলিসী··· সংক্ষেপে আজ ইতিহাসে যা NEP নেপ্ নামে পরিচিত।

প্রকাশ্য সভায় লেনিন স্পষ্ট ভাষাতেই ব্যক্ত করলেন, এই যে নতুন ব্যবস্থা তিনি প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দিচ্ছেন, এটা কম্যুনিজমের আদর্শের দিক থেকে one step backward বটে···এ কথা ঢাকতে যাওয়ার কোন কারণ নেই। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস, আজ এই এক-পা পিছিয়ে গেলে, তবে কিছু কাল পরেই তাঁরা আবার নিতে পারবেন, two steps forword।

লেনিন নিউ একোনমিক পলিসির কথা ঘোষণা করলেন।

ট্রটস্কী ভলটেয়ারের ভাষায় ব্যঙ্গ করে উঠলেন, "The cuckoo has cuckooed the end of the Soviet goverment—এবার কোকিলের মুখে ডাক উঠেছে···বিদায়-বসন্তের, সোভিয়েট রাষ্ট্রের সমাধি-মন্ত্র।"

কিন্তু সেই ব্যঙ্গকে উপেক্ষা করে লেনিন তাঁর বহু চিন্তা আর বহু চেষ্টার ফলস্বরূপ অর্থহীন, সম্পদহীন, বৈজ্ঞানিক সহায়শূন্য, মধ্যযুগের গতানুগতিকতায় পঙ্গু রাশিয়াকে নতুন বৈজ্ঞানিক শক্তিতে ঢেলে সাজবার জন্যে একটা সম্পূর্ণ নতুন প্ল্যান উপস্থাপিত করলেন। কথা নয়, কল্পনা নয়, সূক্ষ্ম মতের চুল-চেরা বিরোধ নয়, কাজ···কাজ···সংগঠন···বিজ্ঞানের সাহায্যে সত্যি-কারের শক্তি অর্জ্জন করা!

এতক্ষণ কেউ লক্ষ্য করেনি, বক্তৃতামঞ্চের ওপর আধ-অন্ধকারে রাশিয়ার একটা প্রকাণ্ড মানচিত্র টাঙানো ছিল। লেনিনের কাছ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র, হঠাৎ সেই ম্যাপের ওপর ইলেক্‌ট্রিকের আলো জ্বলে

উঠলো। লেনিনের বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে একটা বৈদ্যুতিক আলোর বিন্দু সেই মানচিত্রের ওপর এক শহর থেকে আর এক শহর, এক প্রান্তর থেকে আর এক প্রান্তরে নেচে-নেচে এগিয়ে চলতে লাগলো। লেনিন সেই বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে প্রতিনিধিদের সামনে তাঁর ম্যাপের প্রত্যেকটি অঙ্গ বুঝিয়ে দিতে লাগলেন; কোন্‌খানে কোন্‌খানে বিদ্যুৎ-তৈরীর কেন্দ্র তৈরী হবে, কোথায় নদীর গতি থেকে বিরাট বিদ্যুৎ-ভাণ্ডার গড়ে উঠবে, কি ভাবে বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে সেই বিরাট ভূমি, যা আজ শুধু শূন্য পড়ে আছে, তাকে বিপুল আয়তন শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করতে হবে। একমাত্র বিদ্যুৎ-শক্তিই পারে অল্প সময়ের মধ্যে অঘটন ঘটাতে...দেশের ঘুমন্ত সম্পদকে জাগিয়ে...সোভিয়েট রাশিয়াকে জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্প-কেন্দ্রে পরিণত করতে। নতুবা এই নব-লব্ধ ক্ষণিক জয় কয়েক মাইল অগ্রসর হতে না হতেই পাগাড়ী নদীর মতন বালুচরে হারিয়ে যাবে। লেনিন সেই নতুন সংগঠন-প্ল্যানের নাম দিলেন, Electrification...

ট্রটস্কীর সমস্ত উচ্ছ্বাসময় রক্ত উষ্ণকারী বক্তৃতা ঘষা-পয়সার মতো অস্পষ্ট হয়ে গেল...প্রতিনিধিদের অন্তর থেকে আনন্দিত সম্মতির একটা বিরাট গুঞ্জন জেগে উঠলো। ট্রটস্কীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দলের লোকেরা বুঝলো, জীবিত থাকতে লেনিনকে নেতৃত্ব থেকে সরানো অসম্ভব। ব্যর্থ-আক্রোশে র‍্যাডেক শুধু ব্যঙ্গ করে বলে উঠলেন, Electrification নয় Electrofiction!

কিন্তু দেখতে দেখতে লেনিনের সেই fiction-ই সত্য হয়ে উঠলো। সারা দেশের মধ্যে নতুন সৃষ্টির, নতুন কর্ম্মের অভূতপূর্ব্ব এক জোয়ার এসে গেল। বিপ্লব দেশের মধ্যে যে নতুন শক্তিকে জাগিয়ে দিয়েছিল, লেনিন তাকে সহসা ভাঙার কাজ থেকে টেনে এনে গড়ার কাজে নিযুক্ত করে দিলেন। সারা দেশ কাজের নেশায় মেতে উঠলো...পরিশ্রম করা, দেশের জন্যে নিজের প্রতিটি দিনের অকুণ্ঠ সেবা দান করা, পারিশ্রমিকের দিকে না চেয়ে আজ শুধু পরিশ্রম করে যাওয়া, একটা নতুন ধর্মের মত প্রত্যেক বোলশেভিকের মনে একটা নতুন শক্তি এনে দিল। সেই নতুন আবহাওয়ায় ট্রটস্কী সারা দেশ পরিভ্রমণ করে তাঁর ক্রমাম্বয় বিপ্লববাদের কথা প্রচার করতে গিয়ে বুঝলেন, দলের কর্তৃত্ব দখল করতে না পারলে তাঁর রাজনৈতিক অস্তিত্বের আর কোন মূল্য থাকে না। লেনিনের বিরুদ্ধে তিনি প্রকাশ্য আন্দোলন সুরু করে দিলেন।

ডিসেম্বরের সোভিয়েট কংগ্রেসের কয়েক সপ্তাহ পরেই পরের বৎসর মার্চ্চ মাসেই আবার কংগ্রেসের একটা জরুরী অধিবেশন আহ্বান করা হলো। ট্রটস্কীর এই বিরোধিতাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া রাজনৈতিক সুবুদ্ধির পরিচয় নয়। লেনিন মার্চ্চের কংগ্রেসে প্রস্তাব আনলেন, সোভিয়েট রাশিয়ার বিপ্লব-সাধনার কল্যাণে বোলশেভিক দলের মধ্যে বিরুদ্ধবাদী কোন মতের অস্তিত্বকে আর বরদাস্ত করা চলবে না। অতঃপর দলের প্রত্যেক নেতাকে পার্টির অধিকাংশ লোকের যা মত তা মেনে চলতে হবে, তার ব্যতিক্রম হলে, সেই নেতাকে দল থেকে বহিষ্কৃত করে দেওয়া হবে এবং তখন সেই নেতা বা নেতাদের রাষ্ট্রের শত্রু হিসাবে দেখা হবে।

ট্রটস্কী এই প্রস্তাবকে পুরাতন শক্তি-তন্ত্রের অতি ঘৃণ্য পুনরাবির্ভাব বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু আজ ঐতিহাসিকেরা বলেন, ট্রটস্কীও যদি সেদিন দলের কর্তৃত্ব পেতেন, তাহলে বিরোধিতাকে নষ্ট করতে এই পন্থা তিনিও গ্রহণ করতেন।

দশম সোভিয়েট কংগ্রেসে এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর ট্রটস্কী বুঝলেন, প্রকাশ্য বিরোধিতার পথ তাঁকে ত্যাগ করে গোপন ষড়যন্ত্রের সুড়ঙ্গপথে নামতে হবে। দশম কংগ্রেসের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের কতকগুলি উচ্চপদের অধিকারীকে স্থানচ্যুত করা হলো। সমর-বিভাগে ট্রটস্কীর প্রধান সামরিক সেক্রেটারী ছিলেন নিকোলাই মুরালভ্। তাঁকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় বসানো হলো ভোরোশিলভ কে এবং পরের বৎসর পার্টির নির্ব্বাচনে জোসেফ ষ্টালিনকে করা হলো পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী। ষ্টালিনের নির্ব্বাচনে ট্রটস্কী স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, গোপন ষড়যন্ত্রের পথ ছাড়া তাঁর মতবাদকে জাহির করবার আর কোন পথ নেই। যদিও তখনও পর্য্যন্ত তিনি সমর-সচিব, তবুও তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, তাঁকে লক্ষ্য করেই পার্টি তাঁর চার দিকে দেয়াল তুলছে। সুতরাং আবার মাটির তলায় ঢোকা ছাড়া গতি নেই।

একান্ত সংগোপনে ট্রটস্কী এক বিরাট ষড়যন্ত্র-চক্রের আয়োজনে সর্ব্ব-মনপ্রাণ নিয়োগ করলেন। এ-রকম বিভীষিকাময় ষড়যন্ত্র কোন দলের ইতিহাসে আর দেখা যায় না।

——

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আমি ভুল করি নি—ট্রট্স্কী

কিন্তু সে এক-তরফা বিচার ইতিহাস মেনে নেয় নি।

প্রকাশ্য বিরোধিতা আর গোপন ষড়যন্ত্র, তাদের ভাষা সম্পূর্ণ আলাদা। গোপন ষড়যন্ত্রের ভাষা হলো সাঙ্কেতিক। কথাবার্ত্তা চলাচল, চিটি-পত্র লেখা, সংবাদ-দেওয়া-নেওয়া, সবই চলে বিশেষ করে তৈরী করা "কোডে", সেই কোড্ বা সাইফারের অর্থ একমাত্র সেই দলের লোকেরই জানা থাকে। তাই নতুন ষড়যন্ত্র করতে হলে, নতুন কোড্ তৈরী করতে হয়, নতুন অভিধান গড়তে হয়, সে-অভিধানে হয়ত আম মানে বোমা, খাওয়া মানে মেরে ফেলা, বক মানে পুলিশ। এই কোড্ তৈরী করা এবং তার পাঠোদ্ধার করা, রীতিমত একটা নতুন বিজ্ঞান হয়ে উঠেছে।

ট্রটস্কী যথারীতি এই সব প্রাথমিক আয়োজন ক'রে জীবনের শেষ সংগ্রামে নামলেন। মাটির তলায়, বনের ভেতর গোপনে বসলো প্রেস। প্রেস না হলে ব্যাপক আন্দোলন অসম্ভব। সারা দেশের মধ্যে, সৈন্য বিভাগে, পুলিশ বিভাগে, প্রতিটি প্রয়োজনীয় দফ্তরে, নিজেদের দলের লোক ঢুকিয়ে ছোট-ছোট "সেল" গড়ে তুলতে লাগলেন। এই সব "সেল"-এর লোকেরা দলের গুপ্তচরের কাজ করে। যত উচ্চপদের লোককে এই "সেলে" টানা যায়, ষড়যন্ত্র ততই শক্তিশালী হয়।

ট্রটস্কীর নিজের ছেলে, লিওন সিড্ভ, মাত্র ষোল বছর বয়স, সে-ও পুরোমাত্রায় এই ষড়যন্ত্রে পিতার সাহায্যকারীরূপে যোগদান করলো। তার সম্বন্ধে পরে ট্রটস্কী নিজেই লিখেছিলেন, সতেরো বছর বয়সেই লিওন এই সব গোপন ষড়যন্ত্রের কাজে রীতিমত পারদর্শী হয়ে ওঠে। গোপন ইস্তাহার বিলি করা, নিষিদ্ধ সভা গোপনে বসানো, সংবাদ-চলাচলের কাজ, সমস্তই সে অভিজ্ঞ বিপ্লবীর মত করতে শিখেছে।

তখন কিশোর ও তরুণদের সাম্যবাদে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে সোভিয়েট রাশিয়া সারা দেশে কোম্সোমল্ অর্থাৎ তরুণ-সঙ্ঘ গড়ে তুলছে। দলে দলে তরুণেরা তাতে যোগদান করছে। সোভিয়েট রাশিয়ার আত্মবিস্তারের ইতিহাসে এই কোম্সোমলের দান কম নয়। লিওন সিডভ্ এই কোম্সোমলের ভেতরে থেকে সংগোপনে একটা লেনিন-বিরোধী ট্রটস্কাইট দল গড়ে তুলতে লাগলো। অভিজ্ঞ বিপ্লবীর মত ট্রটস্কী রীতিমত বড় করে সারা দেশের মধ্যে জাল ফেললেন।

কিন্তু এত-বড় ষড়যন্ত্র শুধু দেশের ভেতরের সাহায্যের ওপর নির্ভর করে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। আন্তর্জ্জাতিকতাই হলো ট্রটস্কীর লক্ষ্য, সুতরাং গোড়া থেকেই তার ভিত্তিপত্তন করবার জন্যে তিনি ধীরে ধীরে রাশিয়ার বাইরে হাত বাড়াতে সুরু করলেন।

ট্রটস্কীর যোগাযোগের ফলেই নিকোলাই ক্রেস্টিন্স্কী সোভিয়েট রাষ্ট্রদূতরূপে বার্লিনে ছিলেন। ক্রেস্টিন্স্কী বোলশেভিক দলের সভ্য হলেও গোপনে ছিলেন ট্রটস্কীর চেলা। ট্রটস্কীর ইঙ্গিতে ক্রেস্টিন্স্কী রিখ্-বাহিনীর সেনাপতি হান্স্ ফন্ সীকৃট-এর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করলেন। সীকৃট্ তাঁর গুপ্তচর বিভাগ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে জানতে পারলেন যে, ক্রেস্টিন্স্কী ট্রটস্কীর গোপন দলেরই লোক। সুতরাং ত্ব'জনের অন্তরের পরিচয় হতে বেশী দেরী হলো না। সীকৃট তাঁকে আশ্বাস দিলেন যে, ট্রটস্কী যদি লেনিনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেন, জার্ম্মাণ-বাহিনীর দিক থেকে তিনি সাহায্য পাবেন।

ক্রেস্টিন্স্কী মস্কোতে ফিরে গিয়ে নিজের মুখে ট্রটস্কীকে সব জানালেন। ট্রটস্কী সন্তুষ্ট হলেন কিন্তু তখন তাঁর সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন টাকার। বিপুল টাকা ছাড়া সেই বিরাট আয়োজন গড়ে তোলা সম্ভব নয়। ক্রেস্টিন্স্কীর মারফৎ ট্রটস্কী সীকৃটের কাছে প্রস্তাব করে পাঠালেন, এই ষড়যন্ত্র গড়ে তোলবার জন্যে সীকৃট নিয়মিত অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করতে পারেন কি না।

মস্কোর সুবিখ্যাত মামলায় ক্রেস্টিন্স্কী পরে এই ব্যাপার সম্পর্কে নিজের মুখেই বলেন, আমি ফিরে গিয়ে সীকৃটের কাছে ট্রটস্কীর প্রস্তাব উত্থাপন করলাম এবং আড়াই লক্ষ সুবর্ণ মার্ক চাইলাম। সীকৃট তাঁর সহকারী এবং চীফ অফ ষ্টাফের সঙ্গে পরামর্শ করে আমাকে জানালেন, তিনি আমার প্রস্তাবে মোটামুটি রাজী আছেন, তবে একটা সর্ত্ত আছে। এই টাকার বদলে ট্রটস্কীকে আমার মারফতে সোভিয়েট রাশিয়ার সামরিক বিভাগের প্রয়োজনীয় কতকগুলি গুপ্ত সংবাদ দিতে হবে। তা ছাড়া, কতকগুলি লোককে তাঁরা জার্ম্মাণ গুপ্তচর হিসাবে সোভিয়েট রাশিয়াতে পাঠাতে চান, তারা যাতে যথোপযুক্ত প্রবেশপত্র এবং সুবিধা-সুযোগ পেতে পারে, তার জন্যে সাহায্য করতে হবে।

বাদানুবাদের ফলে এই গোপন চুক্তি উভয় পক্ষই স্বীকার করে নেয়। কিন্তু যার বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্রের আয়োজন, সারা জীবনের মানবাতীত পরিশ্রমের ফলে, সেই লেনিন, তখন পক্ষাঘাত রোগে হঠাৎ পঙ্গু হয়ে পড়লেন। হয়ত ফিন্নানা ক্যাপলিনের সেই বিষমাখা

বুলেট তার জন্যে দায়ী। বিজ্ঞানের সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে লেনিন অর্দ্ধসমাপ্ত কাজ ফেলে রেখে চিরবিশ্রাম নিতে বাধ্য হলেন। কেউ ভাবেনি যে এত শীঘ্র মৃত্যু তাঁকে টেনে নেবে। ট্রটস্কী তখন অসুস্থ শরীর সারাবার জন্যে ককেশাস্ অঞ্চলে কিছুদিনের মত বিশ্রাম করতে গিয়েছিলেন।

লেনিনের মৃত্যুসংবাদে সমগ্র সোভিয়েট রাশিয়া মুহ্যমান হয়ে গেল। মস্কোতে তাঁর সমাধি-দিনে যে-ভাবে একটা সমগ্র দেশ শোক প্রকাশ করেছিল, য়ুরোপের কোন শাসকের ভাগ্যে তা ঘটেনি।

ট্রটস্কী কিন্তু সেদিন আসেন নি। তিনি তখন সুখুম নামে এক সমুদ্র-তীরবর্ত্তী স্বাস্থ্যনিবাসে সমুদ্রবায়ু উপভোগ করছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর আত্মচরিতে নিজেই লিখেছেন, "As I breathed in sea air in at Sukhum, I assimilated with my whole being the assurance of my historical rightness......

"সেই সমুদ্রবায়ু সারা দেহে গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে, আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে সেদিন এই আশ্বাসই উপলব্ধি করেছিলাম যে জাতির ইতিহাসে আমার ইতিকর্ত্তব্য ভুল হয়নি।"

কিন্তু সেই এক-তরফা বিচার ইতিহাসে স্বীকার করে নি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জগতের বৃহত্তম ষড়যন্ত্র

কোন দিন যাদের এক ঘরে বসবাস সম্ভাবনা ছিল না, এক নিঃসংশয় ধ্বংসের তাড়নায় তারা এক বিছানায় পাশাপাশি শয়ন করতে বাধ্য হলো।

ট্রটস্কী কিন্তু সুখুমে অতখানি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ছিলেন না। লেনিনের পর কম্যুনিষ্ট পার্টির কর্তৃত্ব এবং সেই জন্য সোভিয়েট রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব তাঁর ওপরই বর্তাবে, এই ধরণের একটা গোপন বিশ্বাস তখনও তাঁর মনে ছিল। লেনিনের সমাধির পর তিনি প্রকাশ্য ভাবে এই নেতৃত্ব দখলের জন্য মস্কোতে এলেন।

লেনিনের মৃত্যুর পর, মে মাসে (১৯২৪) পার্টি কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসলো। এই অধিবেশনে ট্রটস্কী খোলাখুলি ভাবে ঘোষণা করলেন, পার্টির উচিত তাঁকেই লেনিনের উত্তরাধিকারিরূপে গ্রহণ করা। ষ্টালিনও তাঁর দাবী উপস্থিত করলেন। ট্রটস্কী বললেন, তাহলে ভোট নেওয়া হোক্। ট্রটস্কীর সহচরেরা কিন্তু তাঁকে সাবধান করবার বহু চেষ্টা করলেন, যাতে ট্রটস্কী ভোটের ব্যাপারে না যান। কিন্তু তখনও ট্রটস্কী বোলশেভিক দলকে চিনতে পারেন নি। তিনি ভোটের সিদ্ধান্তকেই মেনে নিতে রাজী হলেন।

সেই পার্টি কংগ্রেসে ৭৪৮ জন ডেলিগেট ভোট দেবার জন্যে সমবেত হয়েছিলেন এবং ট্রটস্কী তাঁর জীবনের চরমতম বিস্ময়ে দেখলেন, সেই ৭৪৮ জন ভোটারই একবাক্যে ষ্টালিনকে ভোট দিল। এমন কি তাঁর গোপন চক্রান্তের যে তিন জন প্রধান ব্যক্তি, বুখারিন, জিনোভিভ, এবং ক্যামেনভ—তাঁরাও জনমতকে উপেক্ষা করতে শেষ মুহূর্ত্তে পারলেন না।

ট্রটস্কী ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁদের তিন জনকে বিশ্বাসঘাতক বলে তিরস্কার করলেন। এই ব্যাপার নিয়ে যে সাময়িক মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়, তাতে ট্রটস্কীর গোপন দলের লোকেরা মনে করলো, বুঝি সেই চার জনের মধ্যে প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব সুরু হয়ে যায়। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই পুরোনো ক্ষত সেরে গেল। ট্রটস্কী আর জেনোভিভ দু'জনে মিলে আবার নতুন করে ষ্টালিনের বিরুদ্ধে এক নতুন অপোজিশন্ পার্টি গড়ে তুলতে ব্যস্ত হলেন।

লেনিনের সময় এই অপোজিশন্ যতখানি আত্ম-সংযত ভাবে চলেছিল, এখন আর তার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। এক রকম প্রকাশ্য ভাবেই ট্রটস্কী নতুন নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দেশের মধ্যে তুমুল প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন। এবং এই প্রচারের সুযোগে মাটির তলায় যেখানে যত বিরোধী দল ছিল, যত ব্যর্থ-আশা ভূতপূর্ব্বের দল ছিল, তারা শেষ সুযোগ বুঝে কেন্দ্রীভূত হতে লাগলো। কোন দিন যাদের এক ঘরে বসবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, আজ তারা একই নিঃসংশয় ধ্বংসের তাড়নায় এক বিছানায় পাশাপাশি শয়ন করতে বাধ্য হলো। ধনী জমিদার—যাদের সর্বস্ব বোলশেভিকরা কেড়ে নিয়েছে, বড় বড় জমিওয়ালা চাষী—যাদের জমি আজ ষ্টেটে চলে গিয়েছে, জারের আমলে যে-সব সেনাপতি জারের অনুগ্রহে প্রভুত্ব করে বেড়িয়েছে অথচ আজ যাদের চোরের মতন আত্মগোপন করে বেড়াতে হচ্ছিল, বিদেশী রাষ্ট্রের সহায়-পুষ্ট যে-সব জেনারেল নতুন জার হবার আশায় বার বার বোলশেভিকদের আক্রমণ করেছে আর মার খেয়ে বিতাড়িত হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা তখনও আশায় বুক বেঁধেছিল তারা সবাই মিলে একটা বিরাট সংগোপন বিরুদ্ধ দল গড়ে তুললো। এই বিভিন্ন স্বার্থের

বিভিন্ন দুরাকাঙ্ক্ষীদের নিয়ে ট্রট্স্কী ইতিহাসের বৃহত্তম ষড়যন্ত্রের আয়োজনে সর্ব্বশক্তি নিযুক্ত করলেন। য়ুরোপের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে এ্যাডভেঞ্চারী গুপ্তচরদেরও টনক নড়ে উঠলো। এত বড় গোলযোগের সুযোগ আর ঘটবে না। তাদের প্রত্যেকের সংলগ্ন-স্বার্থের জন্যে তারাও সক্রিয় হয়ে উঠলো। এই শেষোক্ত দলের মধ্যে, যার নাম বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুপ্তচর-রূপে গোপন রাজনীতির ইতিহাসে লেখা থাকবে, উইন্‌ষ্টন চার্চ্চিলের বন্ধু, বৃটিশ সমর বিভাগের সর্ব্বপ্রধান গুপ্তচর সেই ক্যাপটেন সিড্‌নী জর্জ্জ রেলী এই অবকাশে স্থির করলেন, তাঁর বহুদিন-সঞ্চিত বোলশেভিক-বিদ্বেষ চরিতার্থ করবার এই মাহেন্দ্রক্ষণ। উইন্‌ষ্টন চার্চ্চিলও সুযোগ বুঝে এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে তাঁর প্রতিভা নিয়ে উপস্থিত হলেন, অবশ্য দূর থেকে। রেলী চার্চ্চিলের আশীর্ব্বাদ সহ বোরিস সাভিন্‌কফ্‌কে সঙ্গে নিয়ে মস্কো অভিমুখে যাত্রা করলেন। রেলীর বাসনা ছিল, বোলশেভিকদের সরিয়ে তিনি সাভিন্‌কফ্‌কে আবার নতুন জাররূপে রাশিয়ার সিংহাসনে বসাবেন।

যদি এই সময়কার বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের একটা জ্যামিতিক মানচিত্র আঁকা যায়, তাহলে দেখা যাবে য়ুরোপের প্রায় প্রত্যেক রাজধানী থেকে অসংখ্য লাইন মাটির তলা দিয়ে মস্কোর মাটির তলায় গিয়ে মিশেছে।

কিন্তু তার পূর্ব্বে সিড্‌নী রেলী এবং তাঁর সহচর বোরিস্ সেভিন্‌কফের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সর্বশ্রেষ্ঠ বৃটিশ গুপ্তচর সিড্‌নী রেলী

রেলীর মত বোলশেভিকদের প্রতি বিদ্বেষ বোধ হয় আর কোন রাজনৈতিকের ছিল না এবং এমন রোমাণ্টিক জীবনও বোধ হয় আর কোন গুপ্তচরের ভাগ্যে ঘটে নি।

গত প্রথম মহাযুদ্ধে যত এ্যাড্‌ভেঞ্চার-প্রয়াসী লোক একসঙ্গে বিভিন্ন দেশে দেখা দেয়, জগতের ইতিহাসে আর কোন যুগে তা দেখা যায় না। এই বিরাট দুঃসাহসিক দলের মধ্যে আরব্য লরেন্স আর রেলীর জোড়া প্রতিভা বৃটিশ-ইতিহাসে মেলে না। রেলীর মত বোলশেভিকদের প্রতি বিশুদ্ধ ঘৃণা বোধ হয় রাজনৈতিক জগতে আর কারুর ছিল না এবং এমন রোমান্টিক জীবনও বোধ হয় এ-যুগের আর কোন গুপ্তচর যাপন করতে পারে নি। গুপ্তচরদের জীবনের মধ্যেই একটা অভিশাপ ওতপ্রোত আছে। তাদের সমস্ত কাজ সংগোপনে সাধিত হয়। এমন কি তাদের নিজের কোন বিশেষ নামও থাকে না, কীর্ত্তি বা অকীর্ত্তি সবই গোপন দফ্‌তরের মধ্যেই জন্মায় এবং মরে, এমন কি ধরা পড়লে যাদের জন্যে ধরা পড়লো, তারাও তাকে স্বীকার করবে না। তাদের কোন দেশ নেই, তাদের কোন কাজের প্রকাশ্য কোন লিখিত নজীর নেই। তাই তাদের ব্যক্তিগত বীরত্ব বা ব্যক্তিগত জীবন, তা কীর্ত্তিকর বা অকীর্ত্তিকরই হোক্, কোন দিনই প্রচারের সুযোগ পায় না। হয়ত বহু ঐতিহাসিক ঘটনার তারাই মূল নায়ক, তবুও সে-সব ঘটনার ইতিহাসে তাদের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত থাকে না। তাদের কাজের আড়ালেই তারা মরে যায়। ক্বচিৎ কখনো ঘটনার সমাধির পর; তাদের কারুর কারুর কীর্ত্তির কথা জগৎ জানতে পারে। তাই বোলশেভিক অভ্যুত্থানের বিপ্লব আর অনু-বিপ্লবের ইতিহাসে রেলীর নাম কোথাও পাওয়া যায় না। মাইকেল সেয়ার্স এবং এ্যালবার্ট কাহ্‌ন্, আমেরিকার দুই স্বনামখ্যাত সাংবাদিকের জন্যেই রেলীর কীর্ত্তির কথা আমরা জানতে পেরেছি।

রেলীর জন্ম হয় কিন্তু রাশিয়ায়। তাই বোধ হয় রাশিয়া এত তীব্র ভাবে তাঁকে আকর্ষণ করে। তাঁর বাবা ছিলেন আইরিশ নাবিক, মা ছিলেন রুশ নারী। তাঁর বাল্যজীবন অতিবাহিত হয় রুশ বালকদের সঙ্গে, ওডেসার বন্দরে। তারপর বহু দিন পরে তাঁর দেখা আমরা পাই সেণ্ট পিটার্সবার্গ শহরে, জারের আমলে রাশিয়ার বৃহত্তম অস্ত্র-ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের একজন প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা তখন রেলী। তখনই তিনি যথেষ্ট অর্থ এবং অস্ত্র-ব্যবসায়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন। সেই সময় থেকেই তিনি সংগোপন রাজনৈতিক জগতে চলা-ফেরা করছেন, কারণ, জগতের অস্ত্র-ব্যবসায়ীদের প্রকাশ্য ব্যবসার আড়ালে একটা বিরাট গোপন লেন-দেনের কারবার আছে। এই রুশ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবার সময়ই জার্ম্মাণীর বড় বড় অস্ত্র-ব্যবসায়ীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। যখন প্রথম মহাযুদ্ধ বিঘোষিত হলো, তখন জার্ম্মাণ গুপ্তচর বিভাগ বিস্মিত হয়ে জানতে পারলো যে, তাদের অস্ত্র-শস্ত্র নির্ম্মাণের এবং সাবমেরিন স্কীমের অতি প্রয়োজনীয় সব গোপন সংবাদ কি করে বৃটিশ সমর-বিভাগে গিয়ে পৌছচ্ছে। এই সংবাদের গোপন বাহক ছিলেন সিডনী রেলী এবং সেদিন থেকেই তিনি বৃটিশ সমর বিভাগে গুপ্তচরের কাজে নিযুক্ত হয়েছেন।

রেলীর অর্থ, সামাজিক প্রতিপত্তি, ব্যক্তিগত

দুরাকাঙ্ক্ষা এবং দুঃসাহসের সঙ্গে ছিল অপূর্ব্ব ভাষাজ্ঞান। জগতের বহু-প্রচলিত ভাষা রেলী মাতৃভাষার মত বলতে পারতেন। আন্তর্জ্জাতিক গুপ্তচরের যতগুলি গুণ থাকা প্রয়োজন, রেলীর পূর্ণমাত্রায় তা ছিল।

যুদ্ধের প্রারম্ভে রেলী রুশ এশিয়াটিক ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি হয়ে জাপানে এক গোপন উদ্দেশ্যে প্রেরিত হন। সেখান থেকে তিনি আমেরিকায় যান সেখানকার বড় বড় ব্যাঙ্কার এবং অস্ত্র-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগ স্থাপন করবার জন্যে।

ইতিমধ্যেই রাজনীতির গুপ্তলোকে আন্তর্জ্জাতিক চরদের মধ্যে রেলীর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তখন তাঁর কোড্‌নাম ছিল আই ইস্‌তি 'I Isti—এই নামেই বৃটিশ সমর-বিভাগে তিনি তখন চলা-ফেরা করতেন।

বছর দুই আমেরিকায় কাজ করবার পর, বৃটিশ সমর-বিভাগ তাঁকে য়ুরোপে কাজের জন্যে ডেকে পাঠালেন এবং ছদ্মবেশে সুইজারল্যাণ্ড দিয়ে তিনি জার্ম্মাণীতে প্রবেশ করলেন। জার্ম্মাণ নৌ-সেনার একজন অফিসার সেজে রেলী জার্ম্মাণ নৌ-বিভাগে যাতায়াতের পথ করে নিলেন এবং প্রথম মহাযুদ্ধের সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর গুপ্তচরের কাজ, জার্ম্মাণ নৌবিভাগের গুপ্তসংবাদ প্রেরণের কোড্ উদ্ধার করে বৃটিশ সমর-বিভাগের হাতে পৌঁছে দিলেন। তার ফলে জার্ম্মাণীকে যে কি বিপন্ন হতে হয়, তার ইতিহাস আমরা সবাই জানি। কি করে যে এই চরম দুঃসাহসিক কাজ রেলী সম্পন্ন করেছিলেন, আজ তা জানবার কোন উপায়ই নেই। জানতে পারলে হয়ত একটা থ্রিলারের উপাদান জুটতো।

এই কীর্ত্তির পর, ইংলণ্ড রেলীকে আর এক বৃহৎ দায়িত্ব দিয়ে রাশিয়াতে পাঠালো। রেলী হলেন রাশিয়ায় বৃটিশ গুপ্তচর বিভাগের কর্ত্তা। রাশিয়া তাঁর জন্মভূমি, সেখানকার বহু সম্ভ্রান্ত রাশিয়ানের সঙ্গে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে সম্পর্কিত, সেই জন্য এ কাজে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি বিবেচিত হয়েছিলেন। কিন্তু এই নিয়োগের সঙ্গে রেলীর নিজের একটা দুরাকাঙ্ক্ষা মিশেছিল। রেলী সর্ব মন-প্রাণ দিয়ে বোলশেভিকদের ঘৃণা করতেন এবং সোভিয়েট-রাষ্ট্রের উচ্ছেদ ছিল তাঁর জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষা।

তাঁর নিজেরই এক উক্তি থেকে জানা যায়, তিনি লিখছেন, জার্ম্মাণরা আমাদেরই মতন মানুষ। তাদের কাছে হেরে গেলে কোন ক্ষোভ নেই। কিন্তু এখানে এই মস্কো শহরে একটু একটু করে বেড়ে উঠছে, মানব-জাতির চরম শত্রু বোলশেভিকরা। যদি সভ্য জগৎ এখনও পর্য্যন্ত সজাগ হয়ে এই রাক্ষসকে ধ্বংস করতে না পারে, তাহলে অচিরকালে এই রাক্ষসই সমস্ত মানব-সভ্যতাকে গ্রাস করে ফেলবে।

মস্কো থেকে বৃটিশ সমর-বিভাগে রেলী যে-সব নোট পাঠাতেন, তাতে বার বার করে এই কথাই বোঝাতে চেষ্টা করতেন, যেমন করে হোক্ জার্ম্মাণীর সঙ্গে সন্ধি করে ফেলে, জার্ম্মাণী আর ইংলণ্ড মিলে সোভিয়েট রাশিয়াকে ধ্বংস করার আয়োজন করুক। "মানুষের একমাত্র শত্রু হলো এই বোলশেভিকরা, সমগ্র সভ্য মানুষের সম্মিলিত হয়ে সভ্যতার এই নিশীথ আতঙ্ককে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা উচিত।" এই ছিল রেলীর বিশ্বাস ও মত।

বলা বাহুল্য, এ-হেন লোক রাশিয়ায় এসে চুপ করে বসে থাকতে পারে না। সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরোধী সংগোপন দলদের খুঁজে বার করতে যতটুকু দেরী। এবং রেলীর পক্ষে তা খুঁজে বার করতে বিশেষ দেরীও হলো না। রেলী তাঁর সমস্ত শক্তি আর প্রতিভা নিয়ে সোভিয়েট নিধন-যজ্ঞে আত্মসমর্পণ করলেন।

অল্প কালের মধ্যেই রেলী রুশবিপ্লবীদের মধ্যে তাঁর যোগ্য সহধর্ম্মীর সন্ধান পেয়ে গেলেন। সেই সময় বোলশেভিক দলের বিরুদ্ধে সব চেয়ে শক্তিশালী দল কাজ করছিল, সোশ্যাল রেভলিউশ্যানারী পার্টি। এই পার্টির অনেকেই তখন বোলশেভিক দলে যোগদান করলেও, এই দল তখনও রীতিমত সক্রিয় ছিল। কারণ, রাশিয়ার মধ্যে এই দলই জাতীয় আন্দোলনের যুগে জারের বিরুদ্ধে সব চেয়ে বেশী কাজ করেছিল। এই দলই দিনের পর দিন জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং জারের উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে নিয়ম করে টেরারিজিম্ চালিয়ে এসেছে। তাই রোমাণ্টিক যৌবনের কাছে এই দলের একটা বিশেষ আবেদন ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, লেনিনই প্রথম এই দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘোষণা করেন যে একটা শাসন-তন্ত্র পরিবর্ত্তনের কাজে ব্যক্তিগত টেরারিজিম্ ভুল পন্থা। কিন্তু সোশ্যাল রেভলিউশ্যানারীরা লেনিনের সে-উপদেশ গ্রহণ করে না। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে তারা তখনও টেরারিজিম্‌কেই প্রধান অস্ত্ররূপে প্রয়োগ করতো। সেদিন জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে ছিল তাদের আক্রমণ, আজ বোলশেভিকদের বিরুদ্ধে সেই এক আক্রমণ-নীতিই তারা প্রয়োগ করলো।

এই সোশ্যাল রেভলিউশ্যানারী দলের অধিনায়ক ছিলেন বোরিস্ সেভিনকফ্। জারের সিংহাসন-ত্যাগের

পর কেরেনেস্কী যখন সিংহাসন দখলের জন্যে সমর-আয়োজন করেন, সেভিন্‌কফ তখন তাঁর সমর-সচিব ছিলেন। কেরেনেস্কীর পতনের পর সেভিন্‌কফ নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার জন্যে সোশ্যাল রেভলিউশ্যানারী দলে যোগদান করেন এবং তাঁর অধিনায়কত্বে এই দল তদানীন্তন সোভিয়েট পরিচালকদের ধ্বংস করার জন্যে এক বিরাট গোপন আয়োজন করেছিল। তখন মস্কোতে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ছিলেন Noulens. সেভিন্‌কফ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে নিয়মিত অর্থ ও অস্ত্র-সাহায্য পাচ্ছিলেন। সোশ্যাল রেভলিউশ্যানারী দলের মধ্যে প্রকৃত হত্যাকার্য্য অনুষ্ঠান করবার জন্যে আলাদা একটা টেরারিষ্ট উপদল ছিল। সেভিন্‌কফ মস্কো শহরে সেই টেরারিষ্ট দলের প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত করলেন কিন্তু তার নাম দিলেন The Leagure for the regeneration for Russia—রাশিয়ার নব জন্ম-সঙ্ঘ, টেরারিজিম্-এর নাম-গন্ধ পর্য্যন্ত নেই। এই লীগের কর্ম্মসূচীতে ছিল, ১নং লেনিনের হত্যা, ২য় অন্যান্য বোলশেভিক নেতাদের হত্যা।

রেলী বিপুল উদ্যমে এই লীগের সঙ্গে যোগসংস্থাপন করলেন এবং তাঁরি চেষ্টায় বৃটিশ সিক্রেট সার্ভিস বিভাগও অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সেভিন্‌কফকে নিয়মিত সাহায্য করতে লাগলো।

কিন্তু এই সংযোগের মধ্যে রেলী নিজের একটা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখলেন। সোভিয়েট রাষ্ট্র উচ্ছেদের ব্যাপারে রেলীর সঙ্গে এই সব বিপ্লবীদেব স্বার্থের যোগ থাকলেও, রেলী মনে মনে বোলশেভিকদের মতই এই সোশ্যাল রিভলিউশ্যানারীদেরও ঘৃণা এবং অবিশ্বাস করতেন। কারণ রেলীর উদ্দেশ্য ছিল, রাশিয়াতে আবার আগেকার মতন রাজতন্ত্রের প্রবর্ত্তন করা। সেখানে রিভলিউশ্যানারীদের সঙ্গে তাঁর আদর্শের কোন মিলই ছিল না। তা ছাড়া রেলী তাঁর গুপ্তচরের কাজ থেকেই জানতেন যে, এই দলের অনেকে আবার গোপনে ট্রট্‌স্কীর দলের লোক, ট্রট্‌স্কীর ক্রমান্বয় বিপ্লববাদের আদর্শ হলো তাদের আদর্শ। সুতরাং এই দলকে কিছুতেই বিশ্বাস করা চলে না। তবে কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করার নীতি অনুযায়ী এই দলের সাহায্যে সোভিয়েট রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করতে হবে, তারপর রাশিয়া থেকে মার্কস্ আর বিপ্লববাদ আর যত-কিছু সমগোত্রীয় অনাচার আছে শেকড়-শুদ্ধ তাদের উপড়ে ফেলতে হবে। একমাত্র সেভিন্‌কফকেই রেলী বিশ্বাসযোগ্য মনে করতেন এবং তাঁর লক্ষ্য ছিল ধীরে ধীরে সেভিন্‌কফকে তাঁর মতে নিয়ে আসা।

সুতরাং রেলীকে অতি সন্তর্পণে এগুতে হচ্ছিল। সোভিয়েট বিরোধীদের সাহায্য করার সঙ্গে সঙ্গে রেলী নিজের একটা স্বতন্ত্র দল গড়ে তুলেছিলেন, যার অস্তিত্ব এই সব বিপ্লবীরা জানতোই না।

নিজের এই স্বতন্ত্র দল গড়ে তোলার মধ্যে রেলীর কূটনীতির অদ্ভুত পরিচয় পাওয়া যায়। এক ষড়যন্ত্রের মধ্যে বহু ষড়যন্ত্র তাঁকে পরিচালিত করতে হয় এবং প্রত্যেক উপদলের কাছ থেকেই তাঁর নিজের অভিসন্ধিকে লুকিয়ে রাখতে হয়। সেই সময় রাশিয়া গুপ্তচর ও গোপন বিপ্লবীতে পরিপূর্ণ। কে কখন কাকে পথে বসিয়ে দেয় কিছুই ঠিক নেই। পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা থেকে রেলী দেখেছেন, দলের একজন ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দল ধরা পড়ে গিয়েছে। তাই এই চতুর গুপ্তচর এই ষড়যন্ত্র পরিচালনায় এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। তার নাম দিলেন "Fives System"—"পাঁচের প্যাঁচ"। রেলীর ডায়েরী থেকে এই পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি যা লিখেছিলেন, তা উদ্ধৃত করছি, "রাশিয়ায় আমাকে যে চক্রান্ত গড়ে তুলতে হলো, তার প্রধান লক্ষ্য হলো, এই চক্রের লোকেরা হাতের কাছে যা আছে, তার বেশী কিছু জানতে পারবে না তার ব্যবস্থা করা। এবং এই প্রতিষ্ঠানের কোন অংশ ইচ্ছা করলে অপর অংশকে ধরিয়ে দিতে পারবে না। সেই জন্যে আমাকে পাঁচের প্যাঁচ আবিষ্কার করতে হলো। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী আমার দলের কোন লোক অন্ত চার জনের বেশী কাউকে জানবে না। নৈবেদ্যের থাকের মতন সমস্ত দলকে সাজাতে হলো, আর এই থাকের সব ওপরে রইলাম আমি। আমিই একমাত্র দলের সকলকে জানি কিন্তু ইচ্ছা করেই চিনি না অর্থাৎ সকলের নাম এবং ঠিকানা ধরে জানি কিন্তু ব্যক্তিগত পরিচয়ে চিনি না। পরে এই বন্দোবস্ত আমি দেখেছি, খুব কাজে লেগেছে···এই ভাবে গঠন করার ফলে, যদি দলের মধ্যে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে দলের একটা সামান্য অংশই ধরা পড়বে। অন্য অংশের কোন সন্ধানই সে দিতে পারবে না।"

এই প্ল্যান অনুযায়ী রেলী যে কত বিভিন্ন দলের সঙ্গে সংযোগ রেখেছিলেন ভাবলে বিস্মিত হয়ে যেতে হয়। সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরোধী শক্তি যেখানে দেখতে পেয়েছেন সেখানেই রেলী তাঁর সাহায্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন এবং তাদের কাছ থেকেও সাহায্য আদায় করে নিয়েছেন। জারের আমলের বড় বড় অফিসাররা

তখনও পর্য্যন্ত যাঁরা জীবিত ছিলেন, তাঁরা গোপনে Union of Czarist officer বলে একটা দল করেছিলেন। রেলী সেখানেও যোগদান করলেন। জারের আমলের পুলিশ ও গুপ্তচর বিভাগ, সেভিন্‌কফদের টেরারিষ্ট দল, সোশ্যাল রিভলিউশ্যানারীর দল, ভূতপূর্ব্ব জেনারেল উডিনিচ, পেট্রগ্রাডের বিখ্যাত কাফেওয়ালা ব্যালকফ, বিখ্যাত নর্ত্তকী দাগামারা, প্রত্যেকেই রেলীর এই বিরাট চক্রান্তের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। নর্ত্তকী দাগামারার গোপন প্রকোষ্ঠে ছিল রেলীর মস্কোর প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র। জারের পুলিশ-বিভাগে ওরলভস্কী একদিন বিশেষ প্রতিপত্তিশালী লোক ছিলেন। সোভিয়েট আমলে ওরলভস্কী বহু কসরৎ করে পেট্রগাডের চেকা-পুলিশ-বিভাগে নিজের স্থান করে নেন এবং সেই সুযোগে সোভিয়েটবিরোধী দলের একজন প্রধান সহায়করূপে তিনি ছিলেন। রেলী ওরলভস্কীর সঙ্গেও যোগস্থাপন করেন এবং তাঁরই সাহায্যে নকল চেকা পাসপোর্ট নিয়ে সিডনী রেলেনস্কী নামে সোভিয়েট রাশিয়ার সর্ব্বত্র অবাধে ঘুরে বেড়াতেন।

ক্রেমলিনের ভিতর এবং রেড-আর্মি জেনারেল ষ্টাফেও রেলীর লোক ছিল এবং তাদের মারফৎ রেলী ভেতরকার সব সংবাদ সংগ্রহ করতেন। রেলী তাই গর্ব্ব করে বলেছিলেন, শীলমোহর-আঁটা রেড-আর্মি-বিভাগের গোপন হুকুমনামা, মস্কোতে খোলার আগে লণ্ডনে পড়া হয়ে যেতো।

এই বিরাট আয়োজনকে চালু রাখবার জন্যে অসম্ভব অর্থের প্রয়োজন হওয়া স্বাভাবিক। রেলী বৃটিশ সিক্রেট সার্ভিস থেকে সেই বেহিসেবী বিরাট টাকা পেতেন। মস্কোতে নর্ত্তকী দাগামারার গোপন প্রকোষ্ঠে রেলীর অধিকাংশ টাকা গচ্ছিত থাকতো, দু'-এক হাজার নয়, বহু লক্ষ রুবেল।

এই বিরাট অর্থ কি ভাবে সংগৃহীত হতো, সে-সম্পর্কে মস্কোতে বৃটিশ রাষ্ট্রদূত ব্রুস লকহার্ট তাঁর বই British Agent-এ লিখেছেন, সেই সময় রাশিয়াতে বহু ধনী ব্যক্তি তাদের আজীবনের সঞ্চিত অর্থ সোভিয়েট রাষ্ট্রের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখবার জন্যে রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। কি করে সেই অর্থ তারা সোভিয়েট রাষ্ট্রের কাছ থেকে বাঁচাতে পারে, এই ছিল তাদের বিরাট সমস্যা। বৃটিশ এম্ব্যাসী থেকে আমরা সেই সব ধনীর সঙ্গে যোগস্থাপন করে প্রস্তাব করলাম, তারা যদি তাদের টাকাকড়ি আমাদের দেয়, তার বদলে আমরা তাদের একটা হুণ্ডী লিখে দিতে পারি। সেই হুণ্ডী লণ্ডনের একটি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত করলে, তারা কমিশন বাদে তাদের টাকা পেয়ে যাবে। এই ব্যবস্থায় তারা আনন্দিত হয়েই তাদের সঞ্চিত অর্থ বৃটিশ এম্ব্যাসীতে এনে জমা করলো। আমরাও পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সেই বৃটিশ ফার্ম্মের নামে হুণ্ডী লিখে দিতাম। এই ভাবে বৃটিশ এম্ব্যাসীতে বিরাট অর্থ জমা হয়ে উঠলো। সেই সব রুবেল বৃটিশ এম্ব্যাসী থেকে যুক্তরাষ্ট্রের এম্ব্যাসীতে চালান যেতো। সেখান থেকে রেলী তাঁর প্রয়োজন মত অর্থ নিতেন।

সোভিয়েট গুপ্তচরেরা তখন একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের এম্ব্যাসীর ওপর তত কড়া নজর রাখতো না, তার কারণ, উড্রু উইলসন তখন সোভিয়েট রাষ্ট্রের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এবং রাশিয়ার বাইরে এই একটি লোককেই তখন বোলশেভিকরা শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের চোখে দেখতো। তাই রেলী তাঁর অধিকাংশ কাজ যুক্তরাষ্ট্রের এম্ব্যাসীর মারফতই করতে চেষ্টা করতেন।

নবম পরিচ্ছেদ

রেলীর দলের প্রথম আক্রমণ

বাধ্য হয়ে রেলীকে নিজের পকেটের কাগজ নিজেকে গিলে ফেলতে হলো।

১৯১৮ সালের মাঝামাঝি রেলীর গোপন চক্র কাজ করতে সুরু করলো। সেই বছর জুন মাসে, সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রেস-বিভাগের কমিশনার (সচিব) ভলোডারস্কী যখন পেট্রোগার্ডে এক কারখানা থেকে বক্তৃতা দিয়ে ফিরছিলেন, হঠাৎ সেই সময় ভিড়ের ভেতর থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে কে গুলী ছুঁড়লো। ভলোডারস্কী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মারা গেলেন। তার দু' সপ্তাহ পরেই মস্কো সহরে সোভিয়েট-বন্ধু জার্ম্মাণ রাষ্ট্রদূত মারবাক্ নিহত হলেন।

ঠিক সেই দিন মস্কোর বিখ্যাত অপেরা-হাউসে নিখিল রাশিয়া সোভিয়েট কংগ্রেসের অধিবেশন বসেছিল। প্রত্যেক প্রধান বোলশেভিক প্রতিনিধি ও নায়ক সেই কংগ্রেসে এসেছেন। বিদেশী দর্শক ও প্রেস-রিপোর্টারদের গ্যালারীতে যথাযোগ্য সম্মানিত আসনে বসে আছেন বিভিন্ন বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতেরা। তাঁদের মধ্যে যুক্তসাম্রাজ্যের প্রতিনিধি ব্রুস লকহার্টও আছেন।

সেই সময় কেউ যদি লকহার্টকে লক্ষ্য করতো তাহলে দেখতে পেতো, প্রতিনিধিদের বক্তৃতা শোনার

দিকে তাঁর কান ছিল না। তিনি যেন উৎসুক আগ্রহে কার আগমন প্রতীক্ষা করছেন। এমন সময় ছদ্মবেশে সেখানে রেলেনেস্কী (রেলী) প্রবেশ করলেন, রক্তহীন ম্লান শুষ্ক মুখ। পরস্পর চোখে-চোখে কি যেন ইঙ্গিত হয়ে গেল। রেলেনেস্কী লকহার্টের পাশে গিয়ে বসলেন।

রেলী এই দিনটিকে তাদের প্রতি-আক্রমণের দিন স্থির করেছিল। এবং তাদের প্ল্যান লক্ষ্য ছিল অপেরা-হাউস। কারণ, প্রায় সমস্ত বোলশেভিক নেতাই সেদিন অপেরা-হাউসে সমবেত। মারবাককে আক্রমণ করার শব্দের ইঙ্গিত পেলেই বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রকারী দল তাদের নির্দিষ্ট এলাকা দখল করতে অগ্রসর হবে। প্রধান দল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অপেরা-হাউস আক্রমণ করবে এবং সমস্ত নিষ্ক্রমণ-পথ রোধ করে বোলশেভিক নেতাদের এক জায়গায় সকলকেই কারারুদ্ধ করে ফেলা হবে। এই ছিল রেলীর পরিকল্পনা।

এই অভ্যুত্থানের প্রথম সিগন্যাল মারবাককে হত্যা করা—তা যথারীতি অনুষ্ঠিত হলো কিন্তু রেলী বিস্ময়ে দেখলো যে প্ল্যান অনুযায়ী অন্য সব দলের অভ্যুত্থানের আর কোন চিহ্ন নেই। নিশ্চয়ই কোথায় কোন ভুল হয়ে গিয়েছে। রেলী অপেরা-হাউসে এসে দেখে, অপেরা-হাউস রেড-আর্মির সৈন্যদলে সুরক্ষিত। ভিতরে কংগ্রেসের অধিবেশন নির্বিঘ্নেই চলছে। লকহার্টকে খবর দিতে এসে রেলী বুঝলো তার প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। চেকা-গুপ্তচরেরা পূর্বাহ্ণেই এই অভ্যুত্থানের কথা জানতে পেরে সকাল থেকে ধর-পাকড় সুরু করে দিয়েছে এবং সমস্ত ঘাঁটি সুরক্ষিত করে ফেলেছে। পাছে রেলী সন্দেহক্রমে ধরা পড়ে সেই জন্যে সে তার পকেট খুঁজে দেখলো কোন দরকারী কাগজ-পত্র আছে কি না। খানকতক দরকারী কাগজ সত্য সত্যই তখনও তার পকেটে ছিল। তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে ফেলে তাল পাকিয়ে গিলে খেয়ে ফেললো।

তখন অধিবেশনে সভার অধিনায়ক ঘোষণা করছেন, এইমাত্র আমরা খবর পেলাম যে, গোপন বিরোধী দলের লোকেরা আজ একটা প্রতি-আক্রমণের আয়োজন করেছিল কিন্তু চেকার সতর্কতার ফলে সেই অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। বিদ্রোহীদের অনেকেই ধরা পড়েছে এবং অনেকে নিহত হয়েছে। রাস্তায় এখনও রেড-আর্মি টহল দিচ্ছে...

রেলী বুঝলো যে তার প্রথম উদ্যম ব্যর্থ হয়ে গেল।

দশম পরিচ্ছেদ

ব্যর্থ দ্বিতীয় অভিযান

রেলীর কথার উত্তরে রেড-আর্মির অফিসরটি বললে, ব্যাপার আর কি? রেলী বলে একজন পাজী গুপ্তচরকে আমরা খুঁজছি।

রেলীর প্রথম উদ্যম ব্যর্থ হয়ে গেল বটে কিন্তু সোভিয়েট গোয়েন্দারা এই অভ্যুত্থানের পেছনে রেলীর অধিনায়কত্বের সন্ধান তখনও পায় নি। কয়েক দিন অপেক্ষা করে থাকার পর, রেলী আবার দ্বিতীয় উদ্যোগের আয়োজনে উঠে-পড়ে লাগলো।

সেই সময় মিত্রশক্তিরাও, তরুণ বোলশেভিক রাষ্ট্রকে ধ্বংস করবার জন্যে যারা সাহায্য খুঁজছিল, তাদের সহায়তার উদ্দেশ্যে, আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করেই রাশিয়াতে রীতিমত সামরিক আয়োজন নিয়ে উপস্থিত হয়। তখন যুরোপের অধিকাংশ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র, বিশেষ করে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স, সেই নব-জাত আতঙ্ককে অঙ্কুরে বিনাশ করবার জন্যে বদ্ধপরিকর। তাই এক গোপন চক্রান্ত অনুযায়ী, ১৯১৮ সালের ২রা আগষ্ট, বৃটিশ সমরবাহিনী রাশিয়ার আর্চ-এ্যাঞ্জেল বন্দরে এসে নামলো। বাইরে থেকে আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যে তারা ঘোষণা করলো যে, যুদ্ধের মাল-পত্র সমুদ্র-পথে সেইখান দিয়ে যাতে জার্মাণদের হাতে না পড়ে, সেই জন্যেই তারা রাশিয়াতে সৈন্য নিয়ে নামতে বাধ্য হয়েছে। তার দু'দিন পরেই বৃটিশ সৈন্য ককেশাস্ অঞ্চলে বাকুর তৈল-প্রদেশ দখল করে নিল। সঙ্গে সঙ্গে ভ্লাডিভষ্টকে বৃটিশ ও ফরাসীর মিলিত বাহিনী পদার্পণ করলো। দেখাদেখি, আমেরিকা আর জাপান গভর্ণমেণ্টেরও বিরাট সমর-বাহিনী রাশিয়ার পূর্ব-সীমান্তে এসে বসলো। এই ভাবে বিনা যুদ্ধ-ঘোষণায় দীর্ঘ লাইন ধরে মিত্রশক্তির সৈন্যরা রাশিয়ার ভিতরে এগিয়ে চলতে লাগলো। রাশিয়ার ভেতরে বোলশেভিক দলের শত্রু ভূতপূর্ব জারের সেনাপতিরাও সেই সুযোগে আবার মাথা-চাড়া দিয়ে উঠলো।

মস্কোতে মিত্রশক্তির প্রতিনিধি যাঁরা ছিলেন, তাঁরা অনেকে ভীত হয়ে মস্কো ত্যাগ করে চলে যেতে লাগলেন। বৃটিশ-প্রতিনিধি ক্রস লকহার্ট গোপনে রেলীকে ডাকিয়ে আনিয়ে পরামর্শ করেন, এ অবস্থায় তাঁর আর মস্কোতে থাকা সুবুদ্ধির পরিচয় হবে কি না।

রেলী কিন্তু মস্কো ছেড়ে যেতে রাজী হলো না এবং ক্রসকেও যেতে বারণ করলো। এই গণ্ডগোলের

সুযোগে সে তখন তার দ্বিতীয় উদ্যোগ প্রায় সম্পূর্ণ করে এনেছে।

আগষ্ট মাসের শেষের দিকে, বেলী আমেরিকান্ কনসালের গোপন কক্ষে এক সভা আহ্বান করলো। তখনও পর্যন্ত বোলশেভিকরা আমেরিকাকে সন্দেহের চোখে দেখে নি। এই বিশ্বাসের মূলে ছিল উইল্‌সনের উদার রাজনীতি এবং শেষ মার্কিণ-রাষ্ট্রদূত রেমণ্ডসের বোলশেভিক-প্রীতি। তারি সুযোগ নিয়ে রেলী আমেরিকান্ কনসাল্ গৃহকেই তার ষড়যন্ত্রের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র করে।

এই গোপন সভায় বেলী এবং লকহার্ট ছাড়া বৃটিশ, ফরাসী এবং আমেরিকান রাষ্ট্রের প্রতিনিধিস্বরূপ একজন করে উচ্চ রাজকর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। এই সভাতে রেলী তার দ্বিতীয় উদ্যোগের প্ল্যান উপস্থিত করলো এবং সেই ষড়যন্ত্র যার সাহায্যে সম্ভব হয়েছে, তাকেও সহকর্মীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো। সেই ব্যক্তিটি হলো একজন বোলশেভিক উচ্চ রাজকর্মচারী, নাম কর্ণেল বাজিন। সেই সময় ক্রেমলিনের বিরাট প্রাসাদ-নগরে ছিল সোভিয়েট নেতাদের প্রধান কর্ম-কেন্দ্র। এই ক্রেমলিনের রক্ষী হিসাবে লেট্‌-জাতীয় এক গার্ডবাহিনী নিযুক্ত ছিল। কর্ণেল বাজিন ছিল এই লেট্‌-রক্ষী বাহিনীর নেতা, সোভিয়েট দপ্তরের প্রধানতম রক্ষী। এ-হেন ব্যক্তিকে এই ষড়যন্ত্রে টেনে আনতে পেরে, রেলী মনে মনে রীতিমত উৎফুল্ল হয়েই ছিল এবং তার এই দ্বিতীয় উদ্যোগের সাফল্য সম্বন্ধে তার আর কোন সন্দেহই ছিল না।

বাজিনের সঙ্গে বেলীর যে চুক্তি হয়, তার সর্ত হলো, বাজিনের কাজের জন্যে রেলী তাকে নগদ কুড়ি লক্ষ রুবেল দেবে। দশ লক্ষ সে অগ্রিম দিয়ে দিয়েছে। বাকি দশ লক্ষ কাজ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে যখন সে বৃটিশ-সহায়ে আর্চ-এ্যাঞ্জেলে পালিয়ে যাবে, সেই সময় সেখানে তাকে দিতে হবে।

এই গোপন সভায় রেলী ষড়যন্ত্রের প্ল্যানের যে বিবরণ উপস্থিত করে এবং যা কার্যে রূপান্তরিত হবে বলে নির্দিষ্ট হয়, তা হলো, সামনেই ২৮শে আগষ্ট মস্কোর গ্রাণ্ড থিয়েটর-হলে বোলশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটির একটি জরুরী অধিবেশন বসবে। এই অধিবেশনের গোপন সংবাদ কর্ণেল বাজিনই রেলীকে দেয়। এই অধিবেশনে বোলশেভিক দলের প্রায় প্রত্যেক শীর্ষস্থানীয় নেতা উপস্থিত থাকবেন। যথারীতি এই অধিবেশনের সময় গভর্ণমেণ্টের লেট্‌ রক্ষী দলই কর্ণেল বাজিনের অধীনে থিয়েটার-হলের দ্বাররক্ষী হিসাবে উপস্থিত থাকবে। ঘটনার দিন কর্ণেল বাজিন বেছে বেছে তার দলের চিহ্নিত লোকদেরই হলের চারদিকে নিযুক্ত রাখবে। কর্ণেলের কাছ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া মাত্রই তারা সমস্ত নিষ্ক্রমণ-দ্বার বন্ধ করে দিয়ে সঙ্গীন নিয়ে প্রস্তুত থাকবে। সেই সময় রেলী তার লোকজন নিয়ে হলের ভেতর সমস্ত নেতাদের একসঙ্গে বন্দী করে ফেলবে। শৃঙ্খলিত অবস্থায় লেনিন এবং তাঁর প্রধান সহকর্মীদের মস্কোর রাস্তা দিয়ে প্যারেড করে নিয়ে যাওয়া হবে। যাতে জনসাধারণ বুঝতে পাবে যে তাদের আতঙ্কের মূল কারণ আজ সন্দেহাতীত ভাবে পঙ্গু হয়ে গেল। তারপর তাদের গুলী করে মেরে ফেলা হবে। ঘটনার আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই, মস্কো শহরে প্রায় ষাট হাজার পুরানো আমলের অফিসার—যারা সংগোপনে বোল-শেভিকদের বিরুদ্ধে অন্তরের ঘৃণা পোষণ করে আসছে তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে এবং বাইরে থেকে জেনারেল য়ুডিনিচ এক দিক থেকে আর সেভিন-কফ আর এক দিক থেকে মস্কো আক্রমণ করবে। রেলীর এই প্ল্যান বৃটিশ এবং ফরাসী সিক্রেট সার্ভিস্ বিভাগ পূর্ণমাত্রায় অনুমোদন করে।

বেলী প্রতিদিন গোপনে কর্ণেল বাজিনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে প্ল্যানের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলে, যাতে কোথাও ভুল-ত্রুটি না থাকে। হঠাৎ বাজিনের কাছে রেলী খবর পেলো যে, অধিবেশনের তারিখ বদলে গিয়েছে, ২৮শে আগষ্টের বদলে ৬ই সেপ্টেম্বর। রেলী তাতে সন্তুষ্টই হলো, আবো খানিকটা সময় পাওয়া গেল।

২রা সেপ্টেম্বর নাগাদ বেলী একদিন ছদ্মবেশে পেট্রোগার্ড শহরে যাবার জন্যে ট্রেণে উঠলো। উদ্দেশ্য, সেই শহরের আয়োজন-ব্যবস্থা শেষবারের মত পর্যবেক্ষণ করে আসা। পেট্রোগার্ড শহরে রেলী বৃটিশ এম্‌ব্যাসীতে বৃটিশ নৌ-বিভাগের প্রতিনিধি ক্যাপটেন ক্রমির কাছে গিয়ে উঠলো এবং মস্কোর প্ল্যান সম্বন্ধে তাঁকে যথাযথ সব রিপোর্ট দাখিল করে জানালো যে, মস্কো তাদের হাতের মুঠোর মধ্যেই আছে। ক্রমি তাতে স্বভাবতই উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

পরের দিন রেলী পেট্রোগার্ডে তাদের ষড়যন্ত্র-দলের নেতা গ্রামাটিকফকে ফোন করলো। গ্রামাটিকফ এক সময় চেকা-বাহিনীর একজন বিশিষ্ট অফিসর ছিল কিন্তু বর্তমানে বোলশেভিক দলের বিরাগভাজন হয়ে পড়ায় পদচ্যুত হয়েছে।

ফোন তুলে প্রথমে সাঙ্কেতিক বিনিময়ের দ্বারা পরস্পর যখন পরস্পরকে চিনলো, তখনই গ্রামাটিকফের গলার আওয়াজে রেলীর মনে খটকা লাগে। গ্রামাটিকফ তাদের সাঙ্কেতিক ভাষায় প্রথমেই বলে উঠলো, এই মাত্র হাসপাতাল থেকে লোক খবর নিয়ে এসেছে। ডাক্তাররা ফোড়া না পাকতেই অপারেশন করে বসেছে। রুগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। শীগ্‌গির চলে এসো।

ফোন রেখে দিয়ে রেলী উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটলো গ্রামাটিকফের সঙ্গে দেখা করতে। ঘরে ঢুকেই দেখে, গ্রামাটিকফ তাড়াতাড়ি ড্রয়ার থেকে কাগজ-পত্র বার করে আগুনে পোড়াচ্ছে।

রেলীর মুখ ম্লান হয়ে এলো। গ্রামাটিকফ জানালো, দলের একজনের বোকামিতে সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। আজ সকালেই উরিটস্কী খুন হয়েছে। চেকার গোয়েন্দারা সেই-জন্যে শহর চষে ফেলছে। হয়ত এখনই এখানে এসে পড়তে পারে। আর মুহূর্ত এখানে থাকা চলবে না।

গ্রামাটিকফ তাড়াতাড়ি সমস্ত কাগজ-পত্র নষ্ট করে সরে পড়লো। রেলী ফোনে ক্রমিকে সংবাদ দিতে গিয়ে শুনলো, ইতিমধ্যে ক্রমি সব শুনেছে। রেলীর আর সেখানে আসা নিরাপদ নয়। ফোনে ঠিক হয় সন্ধ্যাবেলা গির্জাতে দেখা হবে।

গির্জা হলো ব্যালকফের সরাইখানা। সন্ধ্যাবেলা যথানির্দিষ্ট সময়ে ব্যালকফের সরাইখানাতে রেলী উপস্থিত হলো কিন্তু ক্রমির দেখা নেই। কি করবে ঠিক করতে না পেরে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, দেখে, রাস্তায় লোক-জন পাগলের মত ছুটে পালাচ্ছে। তুমুল শব্দ করে রেড-আর্মির মেসিন-গান-গাড়ী ছুটে চলেছে। রেলীও ছুটতে আরম্ভ করলো। বৃটিশ এম্‌ব্যাসীর কাছে এসে দেখে, তার দরজায় কতকগুলি দেহ মৃত অবস্থায় পড়ে। তাদের পোষাক দেখে রেলী বুঝলো, তারা রেড-আর্মির লোক।

সমস্ত এম্‌ব্যাসীকে ঘিরে সশস্ত্র রেড-আর্মির সৈন্য পাহারা দিচ্ছে।

এমন সময় পেছন দিক্ থেকে কে-যেন তার পিঠে হাত দিল।

হঠাৎ রেলী চমকে ওঠে।

—কি হে বন্ধু, কি দেখ্‌ছো?

রেলী ভীত হয়ে চেয়ে দেখে একজন রেড-আর্মি-অফিসর তাকেই সম্বোধন করছে। রেলীর সঙ্গে এই অফিসরটির মৌখিক পরিচয় ছিল। অবশ্য, রেলীর ছদ্মরূপের সঙ্গেই সে পরিচিত ছিল।

রেলী বিস্মিত হয়ে ন্যাকা সেজে জিজ্ঞাসা করে, কি ব্যাপার কমরেড?

অফিসরটি জানায়, ব্যাপার আর কি। আমাদের কি সুস্থ থাকতে দেবে সাঙাতরা? এক বেটা পাজী বৃটিশ গুপ্তচর, সিডনী রেলী আবার একটা ষড়যন্ত্র গড়ে তুলেছিল······তবে সব ধরা পড়ে গিয়েছে······এখন তাকে ধরবার জন্যই চেকার গোয়েন্দারা বেরিয়েছে।

রেলী আর কালবিলম্ব না করে সরে পড়ে এবং সাঙ্কি ডোরনস্কী বলে তাদের দলের একজন টেরারিষ্টের বাড়ীতে সে-রাত্রিতে গা-ঢাকা দিয়ে রইলো।

একাদশ পরিচ্ছেদ

লাল ঝাণ্ডার কাছে হার মানবো না

এ-কথা জেনে রেখো বন্ধু, দু'মাস পরে লণ্ডনে স্যাভয় হোটেলে তোমার সঙ্গে দেখা করবো।

ডোরনস্কীর কাছ থেকে রেলী সমস্ত ব্যাপার শুনলো। উরিটস্কীর হত্যার পর চেকার লোকেরা বৃটিশ এম্‌ব্যাসীর ওপর চড়াও হয়। তখন এম্‌ব্যাসীর সদর দরজা বন্ধ করে দিয়ে ক্রমি ছাদের ওপর বিপজ্জনক কাগজ-পত্র সব পুড়িয়ে ফেলতে সুরু করেছে। ধাক্কার পর ধাক্কা দিয়ে যখন ভেতর থেকে দরজা খুললো না, চেকার সৈন্যরা তখন জোর করে দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে পড়লো। ক্রমি তখন ব্রাউনিঙ রিভলভার হাতে সিঁড়ি আটকে দাঁড়ায়। চেকার দল তাতে ভ্রূক্ষেপ না করে অগ্রসর হতে থাকে। ক্রমি ক্রমান্বয় গুলী ছুঁড়তে আরম্ভ করে। তার ফলে কয়েক জন চেকার লোক সেইখানেই মরে পড়ে যায়। তার প্রত্যুত্তরে চেকার লোকেরা গুলী চালাতে থাকে। একটা গুলী ক্রমির মাথা ভেদ করে চলে যায় এবং সেইখানেই সে মরে পড়ে যায়।

সকাল বেলা ডোরনস্কী সেই তারিখের একখানা প্রাভ্‌ডা কিনে রেলীর হাতে দিতে সে দেখলো, সরকারী বিবরণে তার সমস্ত ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশিত হয়েছে এবং সকলের চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে, গত কাল লেনিনের ওপরও আক্রমণ হয়ে গিয়েছে। লেনিন যখন মিচেলসন্ কারখানা থেকে সভা করে বেরুচ্ছিলেন সেই সময় ফ্যানিয়া ক্যাপলিন নামে একজন মহিলা লেনিনকে লক্ষ্য করে গুলী চালায়। একটি গুলী ফুস্‌ফুস্ ভেদ করে চলে গিয়েছে আর একটি গলার ভেতর প্রধান শিরাকে ছিন্ন করে দিয়েছে। দুটি গুলীর

মুখেই বিষ মাখানো ছিল। যদিও লেনিন তখনও মরেনি, তবে বাঁচবার আশা খুবই কম। সংবাদে প্রকাশ, এই সমস্ত ষড়যন্ত্রের মূলে আছে সিডনী রেলী। তার প্রমাণস্বরূপ বহু দলিল চেকার হস্তগত হয়েছে। রেলীকে ধরবার জন্যে চারদিকে চেকার লোক ঘুরছে এবং এই অনুসন্ধানের ফলে বহু ষড়যন্ত্রকারীও ধরা পড়েছে……ইত্যাদি।

ফ্যানিয়া ক্যাপলিন যে বন্দুক ব্যবহার করে, সে-বন্দুক সে পেত্রিন্‌কফের কাছ থেকেই নিয়েছিল।

ব্রুস লকহার্টের সঙ্গে আমেরিকান্ কনসালে যে গোপন বৈঠক রেলী আহ্বান করেছিল, যেখানে কর্ণেল বার্জিনকে সে উপস্থাপিত করে, সেই বৈঠকে ফরাসীদের তরফ থেকে বিখ্যাত ফরাসী সাংবাদিক রেণে মার্সান্দ উপস্থিত ছিলেন। মার্সান্দ ধরা পড়ে এবং সমস্ত কথা প্রকাশ করে দিতে বাধ্য হয়। বিবৃতির ফলেই কর্ণেল বার্জিন ধরা পড়ে। ব্রুস লকহার্ট কর্ণেল বার্জিনের পালানোর সুবিধার জন্যে আর্চ এ্যাঞ্জেলে বৃটিশ সেনাপতির কাছে যে চিঠি দিয়েছিল, সে চিঠিও চেকার হাতে এসে যায়। লকহার্টের সঙ্গে সঙ্গে তার বহু সহকর্মীও ধরা পড়ে।

কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের আসল নায়ক রেলীর কোন সন্ধান চেক পায়নি। মস্কো এবং পেট্রোগার্ডে রেলীর ছবি এবং বিবরণী দিয়ে দেয়ালে দেয়ালে পোষ্টার দেওয়া হলো। তাতে জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া হলো যে, ম্যাসিনো, কনষ্টানটাইন্, রেলিন্‌স্কী এই তিনটি ছদ্মনামে সে রাশিয়ায় ঘুরছে। যে-কেউ তাকে যেখানে দেখতে পাবে, তাকে খুন করতে পারে।

কিন্তু সেই দুরন্ত দুঃসাহসী গুপ্তচর চারিদিকের সেই মৃত্যু-জালের মধ্যে তখনও ঘুরে বেড়াতে লাগলো। পেট্রোগার্ড থেকে রেলী মস্কোতে এলো। মস্কোতে তার প্রধান কেন্দ্র ছিল নর্তকী দাগামারার বাড়ী। কিন্তু মস্কো পৌঁছে জানতে পারলো যে দাগামারা আত্মগোপন করেছে।

ফ্যানিয়া ক্যাপলিনের বন্ধু ভেরা ট্রোভনার বাড়ীতে দাগামারা লুকিয়ে বাস করছিল। রেলী অনুসন্ধান করে সেইখানে উপস্থিত হলো। দাগামারার কাছে শুনলো, চেকার লোকেরা তার বাড়ী তছনছ করে অনুসন্ধান করে গিয়েছে। তার কাছে রেলীর যে দু' মিলিয়ন রুবেল গচ্ছিত ছিল, দাগামারা আগেই তা সরিয়ে ফেলে। সেগুলো সব হাজার রুবেলের নোটের আকারে ছিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার, তারা দাগামারাকে গ্রেফতার করেনি। হয়ত তাদের উদ্দেশ্য ছিল যে, দাগামারাকে গ্রেফ্‌তার না করে বাইরে রাখলে রেলীকে ধরবার সুবিধা হবে। কিন্তু দাগামারা তাদের চোখে ধূলো দিয়ে আত্মগোপন করাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করে।

সেই দু' মিলিয়ন রুবেলের জোরে রেলী সাহস করে মস্কোতে তখনও পর্য্যন্ত রয়ে গেল। কখনও গ্রীক বণিকের ছদ্মবেশে, কখনও জারের ভূতপূর্ব্ব সেনানায়ক সেজে, নানাবিধ ছদ্ম রূপে রেলী চেকার দৃষ্টি এড়িয়ে ভেঙ্গে যাওয়া ষড়যন্ত্রের অবশিষ্টটুকুকে নিয়ে আবার দাঁড়াবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলো। বোলশেভিক-বিদ্বেষে তার মৃত্যুভয় পর্য্যন্ত চলে গিয়েছিল। তাছাড়া এক প্রকৃতির লোক থাকে, যারা বিপদের মধ্যেই থাকতে ভালবাসে। উত্তেজনা মদের মত তাদের নার্ভে নেশা ধরিয়ে দেয়। বদ্ধ মাতালের মত তারা নেশা না করে থাকতে পারে না। রেলী ছিল সেই জাতের লোক।

সেই সময় মস্কোতে বৃটিশ সিক্রেট সার্ভিসের এক-জন ওস্তাদ লোক চেকার নজর এড়িয়ে তখনও বাস করছিল। সে ব্যক্তিটি হলো রেলীরই অন্যতম সহকর্মী ক্যাপটেন জর্জ্জ হিল্। ঘুরতে ঘুরতে রেলী হিলের সাক্ষাৎ পেয়ে গেল। হিল্ কিন্তু তখন আত্মগোপন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল এবং তার আর কোন আশা-ভরসা তখন অবশিষ্ট ছিল না।

রেলী হিল্‌কে উৎসাহিত করে তুলতে চেষ্টা করে। বলে, তার দলের যে-সব লোক এখনও ধরা পড়ে নি, তাদের আবার সে একত্র করবার চেষ্টা করছে। এই লাল-ঝাণ্ডার কাছে হার স্বীকার করতে সে নারাজ। হিল্ কিন্তু ভেঙ্গে পড়ে।

একদিন হিল্ তাকে জানালো, বৃটিশ আর সোভিয়েট গভর্ণমেন্টের মধ্যে বন্দী-বিনিময় হবে। এই সুযোগ সে গ্রহণ করতে চায়। সেই জন্যে সে ঠিক করেছে, স্বেচ্ছায় সে ধরা দেবে এবং অচিরে বন্দী-বিনিময়ের ফলে সে মুক্ত হয়ে যাবে।

রেলী তাকে আর আটকে রাখতে চেষ্টা করলো না। কিন্তু সে নিজে তার পথ পরিত্যাগ করে পলায়ন করবে না। বিদায়ের মুখে সগর্ব্বে সে হিল্‌কে বলে, মুক্ত হয়ে তুমি লণ্ডনে স্যাভয় হোটেলে আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে। আমি দু'মাসের মধ্যেই এদের চোখে ধূলো দিয়ে লণ্ডনে স্যাভয় হোটেলে তোমার সঙ্গে দেখা করবো।

রেলীর কথা মিথ্যা হয় নি। সপ্তাহ কয়েক রাশিয়ায় থেকে যখন সে বুঝলো, এখন আর কিছুতেই

নতুন দল গড়ে তোলা সম্ভব নয়, তখন ছদ্মবেশে সে রাশিয়া থেকে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করলো। বহু বার ধরা পড়তে পড়তে সে বেঁচে গিয়েছে। অবশেষে একদিন একটা নকল জার্মাণ পাসপোর্ট জোগাড় করে রাশিয়া থেকে নরওয়ের বার্গেন শহরে এসে পৌছায়। বার্গেন থেকে ইংলণ্ডে এসে স্যাভয় হোটেলে ক্যাপটেন জর্জ হিল্‌কে সত্যি সত্যি একদিন অপরাহ্নে বিস্মিত করে দিয়ে বলে উঠলো, গুড্‌ আফ্‌টার নুন্‌ হিল্‌।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বার বার তিন বার

"সব কাজের মত খুন করাও একটা কাজ···করতে করতে অভ্যাস হয়ে যায়।"

সিডনী রেলীর রোমাঞ্চকর জীবনকেই অনুসরণ করে আমরা যথাকালে রাশিয়া এবং ট্রটস্কীর জীবনে ফিরে যাব। সোভিয়েট রাশিয়ার তদানীন্তন শাসকদের বিরুদ্ধে দলচ্যুত চিরবিপ্লবী ট্রটস্কীর বিদ্রোহ-আয়োজনের কাহিনী তাই আপাতত এখানে মুলতবী রইলো।

১৯১৮ সালের ব্যর্থ ষড়যন্ত্রের পর রেলী ইংলণ্ডে ফিরে আসে। তখন উইনষ্টন চার্চিল ইংলণ্ডের সমর-বিভাগের সেক্রেটারী। রেলীর অসাধারণ শক্তি সম্বন্ধে তাঁর কোন সন্দেহই ছিল না এবং রেলীকে চার্চিল অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন।

সেই বছরের শেষের দিকে জেনারেল ডেনিকিন্‌ মিত্রশক্তিদের সাহায্যে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে এক বিরাট অভিযান গড়ে তোলেন। ডেনিকিন্‌কে সাহায্য করবার জন্যে, চার্চিল রেলীকে আবার রাশিয়াতে পাঠান। ডেনিকিন্‌ সোভিয়েট-বিরোধী য়ুরোপের অন্য সব রাষ্ট্রের সহায়তা করবার কাজে রেলীকেই নিযুক্ত করেন এবং রেলী প্রায় তিন বৎসর কাল ধরে য়ুরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমর বিভাগে এই উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়ায়। বোলশেভিকবাদ ধ্বংস করাই রেলীর জীবনের একমাত্র ব্রত হয়ে ওঠে এবং য়ুরোপে যেখানে যেটুকু সহায়-সুযোগ পাওয়া সম্ভব তার সন্ধানে এই বৃটিশ গুপ্তচর আহার নিদ্রা ত্যাগ করে।

এই উদ্দেশ্য-সাধনে ব্যাপৃত রেলীকে ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে আমরা আবার দেখতে পাই বার্লিন শহরে। তদানীন্তন জার্মাণীর সন্ত্রাস দলের নায়কদের প্রধান আড্ডা ছিল হোটেল এডলন। এই হোটেলের সুবিস্তীর্ণ হল-ঘরের এক কোণে, তিনটি প্রাণী খাবারের টেবিলে বসে গল্প করছিল। দু'জন পুরুষ, তৃতীয় প্রাণী মহিলা, অপরূপ সুন্দরী, অপূর্ব সুসজ্জিতা। পুরুষ দু'জনের পরিচয় হলো, একজন জার্মাণীর নৌ-বিভাগের বড় অফিসর, তরুণ, আর একজন হলো বৃটিশ গুপ্তচর-বিভাগের অফিসার। মহিলাটির নাম পেপিটা বোবাডিল্লা। কয়েক বৎসর আগে লণ্ডনে গায়িকা হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন এবং স্বনামখ্যাত নাট্যকার হেডন চেম্বার্স-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। সম্প্রতি তাঁর বিধবা স্ত্রীরূপে মিসেস্‌ চেম্বার্স নামে পরিচিত। কথাবার্তা প্রসঙ্গে রাজনৈতিক গুপ্তচরদের কথা উঠলো। ইংরেজ ভদ্রলোকটি বলে উঠলো, বর্তমান য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ গুপ্তচর হিসাবে ইংলণ্ডে একজন আছেন···তাঁকে মিঃ সি বলেই আমরা জানি··· সোভিয়েট রাশিয়াতে তিনি যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়ে এসেছেন শুনলে বিস্মিত হয়ে যেতে হয়।

এই সূত্রে মিঃ সির নানা বিচিত্র কাহিনী ভদ্রলোকটি বলতে সুরু করলো। সেই সব কাহিনী শুনতে শুনতে স্বভাবতই মিসেস্‌ চেম্বার্সের কৌতূহল অত্যন্ত বেড়ে উঠলো।

তিনি জিজ্ঞাসা করে উঠলেন, কে এই মিঃ সি?

ইংরেজ ভদ্রলোকটি উত্তরে জানায়, জিজ্ঞাসা করুন বরঞ্চ তিনি কে নন্‌? তাঁর যে কত নাম এবং একসঙ্গে যে কত বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন, তার পরিচয় দেওয়া এক কথায় সম্ভব নয়। তবে এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, তিনি হলেন বর্তমান য়ুরোপের "মিস্ট্রী ম্যান্‌।" মৃত বা জীবিত তাঁর দেহের সন্ধান পেলে বোলশেভিক গভর্ণমেণ্ট বোধ হয় একটা রাজ্য দান করে দিতে পারে।

মিসেস্‌ চেম্বার্স সেই অদ্ভুত ব্যক্তিটি সম্বন্ধে একান্ত কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। জিজ্ঞাসা করেন, কোন রকমে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করা যায় না?

তাঁর বিস্ময়কে বিস্মিত করে ইংরেজ ভদ্রলোকটি বলে ওঠে, আজ সকালেই তাঁকে দেখেছি।

মিসেস্‌ চেম্বার্স চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান।

ভদ্রলোকটি জানায়, তিনি আপাতত ছদ্মবেশে এই হোটেলেই বাস করছেন···

সেই দিন সন্ধ্যা বেলাতেই মিসেস্‌ চেম্বার্সের সঙ্গে মিঃ সি-র সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হলো। মিসেস্‌ চেম্বার্স প্রথম দর্শনেই আত্মনিবেদন করলেন।

তার কয়েক মাস পরে লণ্ডনে মিঃ সি অর্থাৎ সিডনী

রেলীর সঙ্গে মিসেস্ চেম্বার্সের শুভ পরিণয় সংঘটিত হয়ে গেল।

কালক্রমে, মিসেস্ রেলীর বিস্মিত দৃষ্টির সামনে, খবরের কাগজের য়ুরোপের অন্তরালে আর এক নতুন য়ুরোপ একান্ত বাস্তব মূর্তিতে ফুটে উঠলো। তাঁর স্বামীর কর্ম-জীবনের সঙ্গে তিনি নিজেকে অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িয়ে ফেলেন এবং তার ফলে য়ুরোপের অন্তরাল-জীবন যে ভাবে তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়, সে-সম্বন্ধে তিনি নিজেই লিখছেন :

"ক্রমশ বেশী আমাকে য়ুরোপের প্রকাশ্য রাজনীতির আড়ালে যে বিরাট গোপন ধারা ক্ষুরধার বেগে প্রবাহিত হয়ে চলেছিল, তার সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেয়। দেখলাম, য়ুরোপের প্রত্যেক রাজধানীর নিস্তরঙ্গ জীবনের তলায়, আগ্নেয়গিরির জ্বলন্ত লাভার মতন ষড়যন্ত্র আর অন্তর্বিপ্লবের গলিত অগ্নিধারা টগ্ বগ্ করে ফুটছে... প্রত্যেক দেশের নির্বাসিত বিপ্লবীরা নিজের দেশে অন্তর্বিপ্লব সংঘটন করাবার আয়োজনে ব্যস্ত। সেই সব ষড়যন্ত্রের মূলে দেখি, কোন না কোন ভূমিকাতে রেলী সাক্ষাৎভাবে বিজড়িত।"

একদিন রেলী লণ্ডনে তার গোপন কক্ষে বসে কাজ করছে, এমন সময় তার দ্বাররক্ষী এসে জানালো যে, মিঃ ওয়ার্ণার নামে একজন লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে এবং সে বলছে যে সে সেভিন্‌কফের কাছ থেকে আসছে।

রেলী জানতো যে সেভিন্‌কফ এখন রাশিয়া পরিত্যাগ করে প্যারিসে গোপনে বাস করছে। মিঃ ওয়ার্ণারকে তৎক্ষণাৎ তার কাছে নিয়ে আসতে আদেশ করলো।

পরিচয়ে বুঝলো, মিঃ ওয়ার্ণার হলো আসলে একজন রুশ-বিপ্লবী, নাম ড্রেভকফ। ড্রেভকফ রাশিয়াতে তার গোপন দলেরই একজন কর্মী ছিল। তারই মত বোলশেভিকবিদ্বেষী। সেভিনকফের দূত হিসাবে সে দেখা করতে এসেছে এবং সেই সঙ্গে সেভিনকফের একখানি চিঠিও নিয়ে এসেছে। সেই চিঠিতে সেভিনকফ রাশিয়ার বর্তমান অবস্থা জানিয়ে রেলীকে আমন্ত্রণ করছে আবার রাশিয়াতে আসতে। বোলশেভিকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সার্থক করে তোলবার একটা মস্ত-বড় সুযোগ এসেছে। লেনিনের মৃত্যুর পর ষ্টালিন এবং ট্রটস্কীর মধ্যে যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সুরু হয়েছে, এই দ্বন্দ্বের যদি কেউ সুযোগ নিতে পারে তো সে রেলী।

সেভিনকফের ওপর রেলীর অগাধ বিশ্বাস ছিল। ১৯০৫ সালে রাশিয়াতে যে প্রথম গণবিপ্লব হয়, সেভিন্‌কফ তাতে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সভ্যরূপে যোগদান করে। সেই বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে যাবার পর থেকে সেভিন্‌কফ বিপ্লবী দলের একজন ওস্তাদ খুনে হয়ে ওঠে। বোলশেভিক উত্থানের যুগের বহু হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তার নাম জড়িত। এবং তার এই অসম সাহসিকতার দরুণই ধীরে ধীরে সে পার্টির প্রথম লাইনে এসে দাঁড়ায়।

ক্রমশ তার মধ্যে একটা নিদারুণ উচ্চাকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। সে নিজেকে রাশিয়ার ভবিষ্যৎ ভাগ্য-বিধাতারূপে কল্পনা করতে আরম্ভ করে। যখন বোলশেভিকরা শাসন-যন্ত্র অধিকার করে এবং সে-ব্যবস্থায় তার কোন স্থান হয় না, তখন সে তাদের বিরুদ্ধ দলে যোগদান করে। এবং রাশিয়ার ভেতরে বোলশেভিকদের বিরুদ্ধে যত প্রতি-আক্রমণ হয়েছে, তার প্রায় প্রত্যেকটিতে সেভিন্‌কফ প্রধান অংশ গ্রহণ করে। বার বার ব্যর্থ হয়ে যাওয়াতে সে বহু কষ্টে চেকার হাত এড়িয়ে ফ্রান্সে চলে আসে এবং সুযোগের আশায় রাশিয়ার দিকে চেয়ে অপেক্ষা করে থাকে।

সোভিয়েট শাসনযন্ত্রের পত্তনের সময় থেকেই ইংলণ্ডের দৃষ্টি সেভিন্‌কফের ওপর ছিল। বোলশেভিকদের উচ্ছেদ করবার প্ল্যানে ইংলণ্ড ঠিক করে যে, তাদের তরফ থেকে একজন রাশিয়ানকে দাঁড় করানো দরকার। ইংলণ্ড সেই কাজের জন্যে প্রথমে সেভিনকফকেই মনোনীত করে এবং তার সঙ্গে যোগস্থাপন করবার জন্যে বিখ্যাত ইংরাজ-ঔপন্যাসিক সমারসেট্ মমকে রাশিয়াতে পাঠানো হয়। পেশাদার খুনে হিসাবে সেভিন্‌কফের নাম তখন য়ুরোপের গোপন রাজনীতি মহলে রীতিমত সুপরিচিত হয়ে গিয়েছিল। তাই মম্ একদিন নিজের কৌতূহল প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য নিভৃতে তাকে জিজ্ঞাসা করেন, শিক্ষিত মানুষ এক-আধ বার উত্তেজিত হয়ে হয়ত খুন করতে পারে। কিন্তু বার বার এই ভাবে খুন করা...?

সহজ ভাবেই সেভিন্‌কফ উত্তর দিয়েছিল, বিশ্বাস করুন, এমন কিছুই অসম্ভব কাণ্ড নয়। সব কাজের মতনই খুন করাও একটা কাজ। করতে করতে অভ্যাস হয়ে যায় তখন আর বিশেষ কিছুই মনে হয় না।

রেলি সেভিন্‌কফের সঙ্গে ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জের সাক্ষাতের একটা আয়োজন করলো। তখন রাশিয়াতে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। এমন ভয়াবহ যে মানুষের স্মৃতিতে অনুরূপ ঘটনার চিহ্ন পাওয়া যায় না। সেই নিদারুণ দুর্যোগের সুবিধা

গ্রহণ করে। বোলশেভিক-বিদ্বেষী দলেরা শেষ বারের মত সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে সেই তরুণ রাষ্ট্রকে আক্রমণ করবার আয়োজনে যেন ব্যস্ত। রেলীও সে-সুযোগ গ্রহণ করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলো। লণ্ডনে প্রথমে রেলী সেভিন্‌কফকে নিয়ে চার্চিলের সঙ্গে দেখা করে। চার্চিল সেভিন্‌কফের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে বুঝলেন, এই লোকের দ্বারাই তাঁদের অভিসন্ধি সার্থক হতে পারে। সুতরাং তিনিই উদ্যোগী হয়ে লয়েড জর্জ্জের সঙ্গে সাক্ষাতের আয়োজন করলেন। চার্চিল তাঁর বিখ্যাত বই Great Contemporariesতে এই ঘটনা সম্পর্কে লিখছেন: "সেদিন রবিবার। প্রধান মন্ত্রীর সরকারী বাস ভবনে সেদিন তিনি সকালবেলা তাঁর স্বদেশ থেকে আগত এক দল গায়কের সঙ্গীত শোনবার আয়োজন করেছেন···সেই সময় সেভিন্‌কফকে নিয়ে রুশ-অভিযান সম্পর্কে আলোচনা করবার জন্যে উপস্থিত হলাম।"

বলা বাহুল্য, লয়েড জর্জ্জ সেভিন্‌কফের উৎসাহে ইন্ধনই দিলেন। জগতের অধিকাংশ রাজনৈতিকের মতন যখন তাঁরও স্থিরবিশ্বাস ছিল, দু'-এক মাসের মধ্যেই তাসের ঘরের মতন এই নব-গঠিত সোভিয়েট-রাষ্ট্র ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

—

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

চেকার জালে সেভিন্‌কফ

চার্চিল, মুসোলিনী, সকলেই ঠিক করেছিলেন, বোলশেভিকদের সরিয়ে তাঁরা সেভিন্‌কফকেই রাশিয়ার ডিক্‌টেটর করবেন।

ইতিমধ্যে লেনিনের মৃত্যু-সংবাদ লণ্ডনে এসে পৌঁছেছিল। রাশিয়া থেকেও রেলীর অনুচরেরা কালবিলম্ব না করে রেলীকে চলে আসবার জন্যে বার বার আহ্বান জানাচ্ছিল। রেলীও কালবিলম্ব না করে, তার জীবনের শেষ উদ্যোগে ঝাঁপিয়ে পড়লো। রাশিয়াতে প্রবেশ করবার আগে, য়ুরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সামরিক বিভাগে ঘুরে ঘুরে রেলী সেভিন্‌কফের সাহায্যের ব্যবস্থা ঠিক করে নিল। সেই সঙ্গে বিভিন্ন সামরিক বিভাগের জেনারেল ষ্টাফের বিশেষজ্ঞদের একত্র করে প্রতি-আক্রমণের একটা প্ল্যান তৈরী করলো। এই কাজে রেলী সব চেয়ে বেশী সাহায্য পেলেন বৃটিশ ধনকুবের স্যার হেনরী উইলহেলম্‌ আগাষ্ট ডেটারডিঙ-এর কাছ থেকে। ডেটারডিঙ্‌ নিজের স্বার্থেই তাঁর বিপুল ঐশ্বর্য্য এবং প্রতিপত্তি নিয়ে রেলীর পাশে এসে দাঁড়ালেন।

ডেটারডিঙ্‌ জন্মের দিক থেকে ছিলেন হল্যাণ্ডের অধিবাসী, কিন্তু তিনি ইংলণ্ডের নাগরিকরূপেই পরিগণিত হন। সেই সময় য়ুরোপে তৈল-ব্যবসায়ীদের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি ছিলেন। বিরাট রয়েল ডাচ শেল কোম্পানীর তিনিই ছিলেন প্রধান মালিক। ডেটারডিঙ্‌ বহু কৌশল করে রাশিয়ার বড় বড় তেলের খনির অধিকাংশ শেয়ার কিনে নিয়েছিলেন এবং তারি-জোরে নিজেকে সেই সব খনির মালিক বলে ঘোষণা করেন কিন্তু বোলশেভিক-শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে স্যার ডেটারডিঙের সেই মালিকানী স্বত্ব স্বভাবতই বোলশেভিক রাষ্ট্র অস্বীকার করলো। কারণ, রাশিয়ার ভেতরে তখন সমস্ত খনিই রাষ্ট্রের সম্পত্তি হয়ে গিয়েছে। সেই থেকে স্যার ডেটারডিং বোলশেভিকদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। সুতরাং রেলীর উদ্যোগে তিনি তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য্য আর প্রতিপত্তি নিয়ে সাহায্য করতে দ্বিধাবোধ করলেন না।

রেলীর প্ল্যান হলো, সেভিন্‌কফ তার টেরারিষ্টদের নিয়ে মস্কো আর পেট্রোগার্ডে একটা বিপ্লবের সূচনা করা। বিপ্লব আত্মপ্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে সামরিক আক্রমণ সুরু হবে। সেই সময় লণ্ডন এবং প্যারিস থেকে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টকে অস্বীকার করে একটা ঘোষণা জাহির করা হবে। সেই ঘোষণায় সেভিনকফকেই রাশিয়ার সামরিক ডিক্‌টেটররূপে স্বীকার করা হবে। যুগোশ্লাভিয়া আর রুমানিয়া থেকে হোয়াইট আর্মির দল রাশিয়ায় প্রবেশ করবে। অপর দিক থেকে পোল্যাণ্ড কিয়েভের দিকে অগ্রসর হবে। আর ফিনল্যাণ্ড থেকে সৈন্যরা লেনিনগ্রাড অবরোধ করবে। সেই সুযোগে ককেশাস্‌ অঞ্চলে জর্জিয়ান মেন্‌শেভিক-নেতা নই জর্দ্দানিয়া ককেশাস্‌ অঞ্চলকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করে রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেবে।

রেলীর এই প্ল্যান ফরাসী, পোলিস, ফিনিস, রুমানিয়ান জেনারেল ষ্টাফ অনুমোদন করলো। ককেশাস্‌ অঞ্চল, যেখানে আছে রাশিয়ার সব তেলের খনি, রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন এবং স্বতন্ত্র হওয়ার সম্ভাবনাকে বৃটিশ পররাষ্ট্র বিভাগ আনন্দেই গ্রহণ করলো। মুসোলিনীও এই ষড়যন্ত্রে যোগদান করলেন। সেভিনকফকে রোমে ডেকে আনিয়ে তার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কি ভাবে তিনি সাহায্য করতে পারেন জানিয়ে

দিলেন। সেভিনকফের লোকদের রাশিয়া থেকে ইতালীতে এবং ইতালী থেকে রাশিয়াতে যাতায়াতের সুবিধার জন্যে তিনি ইতালীয়ান পাসপোর্টের বন্দোবস্ত করে দিলেন এবং তাদের সকল রকমে সাহায্য করবার জন্যে ফাসিস্তি গুপ্তচর বাহিনী এবং গোপন-পুলিশ ওভরা (OVRA)কে আদেশ দিয়ে দিলেন।

এই ভাবে এক বিরাট ষড়যন্ত্রের আয়োজন সম্পূর্ণ করে রেলী ১৯২৪ সালের ১০ই আগষ্ট, ইতালীয়ান পাসপোর্টের সাহায্যে ইতালীর মধ্য দিয়ে সেভিনকফকে আগে রাশিয়াতে পাঠিয়ে দিল। সেভিনকফের সঙ্গে কয়েক জন বিশ্বস্ত অনুচর রক্ষী হিসাবে রইলো। যাতে সেভিনকফের অস্তিত্ব বা গতিবিধি সম্বন্ধে কেউ কিছু জানতে না পারে, তার নিখুঁত বন্দোবস্ত করা হলো। ঠিক হয় যে, ইতালীর সীমান্ত পেরিয়ে সোভিয়েট রাশিয়াতে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দলের হোয়াইট রাশিয়ান-বিপ্লবীরা সেভিনকফের ভার নেবে। এই সব হোয়াইট রাশিয়ান-বিপ্লবীরা বোলশেভিক সেজে সীমান্ত-নগরের বড় বড় সরকারী পদগুলো আগে থাকতেই দখল করেছিল। রাশিয়ার ভেতরে নিরাপদে পৌঁছেই সেভিনকফ বিশেষ দূত দিয়ে রেলীর কাছে সংবাদ পাঠাবে, এই হলো ব্যবস্থা।

সেভিনকফের দূতের আশায় রেলী প্যারিসে অপেক্ষা করে রইলো। এক সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ চলে গেল, অথচ সেভিনকফের কাছ থেকে কোন সংবাদই আসে না।

২৮শে আগষ্ট। সেই দিন ককেশাস্ অঞ্চলে বিদ্রোহ ঘোষণার কথা ছিল এবং প্ল্যান অনুযায়ী সেই দিন ভোর বেলা নই জর্দানিয়া তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে জর্জিয়ার সিয়াটুরী নগর আক্রমণ করলো। সঙ্গে সঙ্গে ককেশাসের বিভিন্ন শহরে সূর্য্য ওঠার সঙ্গে নিরীহ গৃহস্থরা বন্দুক আর কামানের শব্দে সচকিত হয়ে উঠলো। অপ্রস্তুত সোভিয়েট রক্ষীরা বাধা দেবার আগেই নিহত হলো। একটার পর একটা গ্রাম জর্দানিয়ার সৈন্যদল দ্রুত দখল করে চললো। তাদের লক্ষ্য, তেলের খনির অঞ্চল।

পরের দিন খবরের কাগজে রেলী বিস্মিত হয়ে দেখে, মর্ম্মন্তুদ দুঃসংবাদ, সেভিনকফ ধরা পড়েছে। সোভিয়েট সংবাদপত্র ইজভেষ্টিয়ার এক সংবাদে প্রকাশ যে, সোভিয়েট-বিরোধী টেরারিষ্ট সেভিনকফ, রুশ-সীমান্ত অতিক্রম করে রাশিয়ায় প্রবেশ করবার মুখে ধরা পড়েছে।

সেভিনকফ সীমান্ত অতিক্রম করে রাশিয়ার মাটিতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা-অনুযায়ী এক দল রক্ষী সৈন্য তাকে অভিনন্দন করে। সেভিনকফ তাদের নিজের দলের লোক বলেই ধরে নেয়। তারাও সেই ভাবে সেভিনকফের কাছে আত্মপরিচয় দেয়। তখন সেভিনকফের বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয়নি যে সে চেকার চক্রান্তে পড়ে গিয়েছে। সেই রক্ষী সৈন্যদের কাছে সে খবর পেলো যে, মিনস্ক শহরে তার থাকবার গোপন ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই কথায় বিশ্বাস করে সেভিনকফ তাদের সঙ্গে মিনস্ক শহরে এক বাড়ীতে গিয়ে ওঠে। সেখানে রাত্রিবেলা সেভিনকফ সহসা বুঝতে পারলো যে, চেকার জালে সে ধরা পড়ে গিয়েছে। যারা তাকে এখানে এগিয়ে নিয়ে এসেছে, তারা বোলশেভিক দলেরই লোক, চেকার গোয়েন্দা সৈনিক। পালাবার আর কোন উপায় না দেখে, সেভিনকফ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো এবং বন্দী অবস্থায় তাকে রাজধানীতে নিয়ে আসা হলো।

অন্য দিকে ককেশাসে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল,—সেই বিদ্রোহ দু'দিনের মধ্যেই চেকার কৌশলে বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়ে। চেকার নিযুক্ত এক দল পাহাড়ী ককেশাস সৈন্য নই জর্দানিয়ার পক্ষ অবলম্বন করে এবং পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে একটা গোপন শর্ট-কাট রাস্তায় দ্রুত অগ্রসর হবার আশ্বাস দিয়ে তাকে পাহাড়ের ভেতর কৌশলে টেনে নিয়ে যায় এবং সেখানে বিস্মিত জর্দানিয়া দেখলো যে, শত্রুর সৈন্যদের দ্বারাই সে বেষ্টিত হয়ে পড়েছে। অন্য সব শহরে অচিরকালের মধ্যেই রাজধানী থেকে সৈন্য এসে পড়ায়, সপ্তাহ খানেকের খণ্ডযুদ্ধেই বিদ্রোহীরা পরাজিত হয়ে গেল।

এই দুঃসংবাদেও রেলী ততখানি ভেঙ্গে পড়েনি কিন্তু কয়েক দিন পরেই যখন খবরের কাগজে সে জানতে পারলো যে, বোলশেভিকরা সেভিনকফের বিচারে সেভিনকফের কাছ থেকে তাদের প্ল্যানের সমস্ত সংবাদই জানতে পেরেছে, তখন সে একেবারে ভেঙ্গে পড়লো।

সেভিনকফকে বন্দী করে নিয়ে গিয়ে বোলশেভিকরা তার সঙ্গে রীতিমত সদয় ব্যবহার করে এবং এমন কৌশলে তারা তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে যে সেভিনকফ অকপট চিত্তে ষড়যন্ত্রের সমস্ত কথা প্রকাশ্য আদালতে ফাঁস করে দিতে বাধ্য হয়। একান্ত আন্তরিক ভাবে সে আদালতে ঘোষণা করে যে, সে ভুল করেছিল এবং আজ সে অকপট চিত্তে সে-কথা ঘোষণা করছে। রাশিয়ার উন্নতির ব্যাপারে বোলশেভিকদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তার যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল, তারই প্রেরণায় সে এই বিদ্রোহের পথ গ্রহণ করেছিল। তার অনুতাপের

যাথার্থ্য সম্পর্কে প্রমাণ-স্বরূপ, সে ষড়যন্ত্রের সমস্ত ছোট-খাট ব্যাপার পর্য্যন্ত আদালতে প্রকাশ করে দেয়। বিচারে তার ফাঁসীর হুকুম হয় কিন্তু তার অকপট আত্ম-প্রকাশের দরুণ মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্ত্তে দশ বৎসর কারা-বাসের ব্যবস্থাই বহাল করা হয়।

রেলী প্রথমে এই সংবাদ বিশ্বাস করতে চায়নি এবং সেই মর্ম্মে সে চাচিলকে একখানি চিঠিও লেখে কিন্তু খবরের কাগজে যখন সেভিনকফের বিচারের সমস্ত সংবাদই প্রকাশিত হলো তখন আর অবিশ্বাস করবার কিছুই রইলো না।

রেলী হতাশ হয়ে ইংলণ্ডে ফিরে এলো।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বিদ্বেষ-সংগ্রামের শেষ পরিণাম

এত সাধ্য, এত সাধনা, দুই মহাদেশব্যাপী এত আলোড়ন, তার মোট ফল, লণ্ডন টাইমস্-এর এক কোণে মাত্র দু'টি লাইন।

বার বার এই ভাবে ব্যাহত হয়ে, রেলীর অন্তরে বিদ্বেষ-জ্বালা ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। যে আগুনে তার শত্রুদের পুড়ে মরা উচিত, সেই আগুন তাকেই পুড়িয়ে মারতে সুরু করলো। নিষ্ফল বিদ্বেষের চেয়ে জ্বালাময় বহ্নি আর কিছুই নেই।

এমন সময়ে য়ুরোপের গোপন রাজনীতি মহলে একটা সংবাদ জানাজানি হয়ে গেল যে, নবীন সোভিয়েট রাষ্ট্র শিল্প-উন্নতির জন্যে আমেরিকার কাছে এক বৃহৎ ঋণের প্রস্তাব করেছে। এবং সে-ঋণ যদি আমেরিকার কাছ থেকে সে পায়, তাহলে তার অকালমৃত্যুর যে আশা এত দিন ধরে য়ুরোপের সাম্রাজ্যবাদী ধনিকেরা পোষণ করে আসছিল, তা নিশ্চয়ই হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। এই ঋণ পাবার আশাতেই বোলশেভিকরা বরাবর আমেরিকানদের খাতির করে এসেছে এবং যুক্তরাষ্ট্রে এই সম্পর্কে প্রচারকার্য্য চালাবার জন্যে তারা একটা বিরাট আয়োজন সংগোপনে গড়ে তোলে। এই প্রচার-কার্য্যের ফলে সোভিয়েটের আবেদন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই প্রায় গ্রাহ্যের সামিল হয়ে উঠেছিল।

এই সংবাদে রেলী এবং তার পৃষ্ঠপোষক বৃটিশ রাজনৈতিকরা শঙ্কিত হয়ে উঠলো এবং তারা স্থির করলো, রেলীকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়ে এই সোভিয়েট-ঋণের বিরুদ্ধে সেখানকার জনমতকে গড়ে তুলতে হবে। রেলীও নিজের ব্যর্থ আক্রোশের একটা নিষ্ক্রমণ-পথ পেয়ে আবার উৎসাহিত হয়ে উঠলো। হাতে না মারতে পারলেও, এই ভাবে ভাতে সোভিয়েট রাশিয়াকে মারতে হবে। কিছুতেই যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে এ ঋণ সোভিয়েট রাশিয়া পেতে পারবে না, এই সঙ্কল্প নিয়ে নবীন উৎসাহে রেলী যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে উপস্থিত হলো।

সেখানে ব্রডওয়েতে রেলী আবার বিরাট ভাবে তার কাজ সুরু করে দিল। সেখানে বসেই সে য়ুরোপ আর আমেরিকার প্রত্যেক বড় শহরে আন্তর্জাতিক এ্যাণ্টি-বোলশেভিক লীগের শাখা-প্রশাখা প্রতিষ্ঠিত করে চললো। আমেরিকায় যারা গোপনে বোলশেভিকদের হয়ে কাজ করছে, তাদেরও একটা লম্বা লিষ্ট তৈরী হলো। রেলীর গোয়েন্দাতে যুক্তরাষ্ট্র ভরে গেল।

এই সময় আমেরিকার স্বনামখ্যাত ধনকুবের হেনরী ফোর্ডও তাঁর বিরাট ঐশ্বর্য এবং প্রতিপত্তি নিয়ে বোলশেভিক-বিরোধী প্রচারে নেমেছেন। তাঁর সুবিধা, জগতের প্রায় প্রত্যেক বড় শহরেই তাঁর ব্যবসায়-কেন্দ্র আছে। এই সব কেন্দ্রের মারফত ফোর্ড জগৎ-ব্যাপী এক বিরাট প্রচার-চক্র গড়ে তুলছিলেন। রেলী তাঁর সঙ্গে যোগদান করলো।

প্রতিদিন ডাকে য়ুরোপের বিভিন্ন শহর থেকে গোপন কোডে তার কাছে দলের লোকদের কাছ থেকে বিবরণ আসে। সেই সব কোড উদ্ধার করবার জন্যে রেলীর গোপন কেন্দ্রে রীতিমত একটা বড় অফিস বসলো। সেই সব বিবরণী থেকে রেলী সোভিয়েট রাশিয়ার ভেতরকার সমস্ত ব্যাপার একনিষ্ঠ ছাত্রের মত গবেষণা করে চলে। ক্রমশ সোভিয়েট রাশিয়ার ভেতর থেকে আশাপ্রদ সংবাদ আবার আসতে সুরু করলো। ষ্টালিন এবং ট্রটস্কীর বিরোধিতার ফলে সোভিয়েট রাশিয়ার ভেতর ক্রমশ আবার অন্তু-বিপ্লবের অবস্থা তৈরী হয়ে উঠছে এবং রাশিয়ার ভেতর থেকে কাজ করবার জন্য পুনরায় রেলীর কাছে ঘন-ঘন আবেদন আসতে লাগলো। বোলশেভিক-বিরোধী বিপ্লবীরা আবার শক্তি-সঞ্চয় করে উঠছে।

রেলীও ক্রমশ বুঝলো যে, যুক্তরাষ্ট্র থেকে সে বড় জোর একটা নিষ্ক্রিয় বিরোধিতার আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারে, তার বেশী কিছু করা সম্ভব নয়। বোলশেভিকদের পতন ঘটাতে হলে, রাশিয়ার ভেতরে গিয়েই কাজ করতে হবে।

এমন সময় একদিন তার ডাকের মধ্যে একটা বিচিত্র চিঠি এলো। পাঠোদ্ধার করে রেলী দেখলো, তার এক পুরানো বিশ্বস্ত বন্ধু কমাণ্ডার ই (E) এই চিঠি লিখছেন। চিঠির ওপর পোষ্ট অফিসের ছাপ রয়েছে,

Estoniaর Reval শহর। সেখান থেকে কমাণ্ডার K লিখছেন :

প্রিয় সিডনি,

এই চিঠি পাওয়া মাত্র তুমি প্যারিসে চলে আসবার চেষ্টা করবে। সেখানে দু'জন লোক তোমার সঙ্গে দেখা করবে, তারা স্বামি-স্ত্রী। একজনের নাম Krashnostanov, তাদের কাছ থেকেই তুমি জানতে পারবে যে, কালিফোর্ণিয়া থেকে একটা জরুরী সংবাদ আছে। তারা সেই সঙ্গে তোমাকে একটা কাগজ দেবে, তাতে ওমর খইয়ামের কবিতা দু'লাইন লেখা আছে, যে কবিতার কথা তুমি হয়তো ভোল নি। যদি সেই ব্যাপারে তোমার বলবার কিছু থাকে, তাদের কাছে বলতে পার। নইলে তাদের শুধু বলে দেবে Thank you very much, Good-day.

সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা এই পত্র থেকে রেলী বুঝতে পারলো, Krashnostanov কে। Shultz নামে একজন বিখ্যাত বিপ্লবীর ছিল এই সাঙ্কেতিক নাম। কালিফোর্ণিয়া হলো সোভিয়েট রাশিয়া এবং ওমর খৈয়ামের দু'লাইন কবিতা হলো, দলের গোপন সংবাদ।

রেলী আর কালবিলম্ব না করে সস্ত্রীক প্যারিসে চলে আসে এবং সেখানে Shultzএর অপেক্ষায় বসে থাকে। Shultzএর সঙ্গে দেখা হওয়াতে রেলী রাশিয়া থেকে বোলশেভিক-বিরুদ্ধ দলের সমস্ত সংবাদ একটা চিঠিতে পেলো। তাতে বিশদ ভাবে সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করে রেলীকে রাশিয়াতে আহ্বান করা হয়েছে—ষ্টালিনের বিরুদ্ধে ট্রট্স্কী একটা শক্তিশালী দল গড়ে তুলছেন এবং সেই সুযোগে রেলী আবার তার প্রতিভাকে কাজে লাগাতে পারে। সাময়িক দুর্য্যোগ কাটিয়ে বোলশেভিক-বিরোধী দলেরা আবার শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

সেই চিঠি পাওয়ার পর চুম্বকের মত রাশিয়া আবার রেলীকে আকর্ষণ করতে থাকে। এবং অনতিকালের মধ্যেই রাশিয়াতে প্রবেশ করবার জন্যে যাত্রা করলো। স্থির হলো যে, রাশিয়ার সীমান্তে এই গোপন আন্দোলনের একজন প্রধান নেতার সঙ্গে রেলীর প্রথম দেখা-সাক্ষাৎ হবে। এই সাক্ষাতে ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থার একটা খসড়া নির্দ্দিষ্ট হবে। এই উদ্দেশ্যে রেলী ফ্রান্স থেকে নরওয়ের হেলসিঙ্কিতে উপস্থিত হলো। সেখানে ফিনিস্ সামরিক বিভাগের জেনারেল ষ্টাফের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাদের সঙ্গে রেলীর বন্দোবস্ত হলো যে, তারাই রেলীকে সীমান্ত পার করিয়ে রাশিয়ায় পৌঁছে দেবার ভার নেবে।

এই ব্যবস্থা অনুযায়ী কয়েক দিন পরে রেলী তিন জন রক্ষীর সঙ্গে ছদ্মবেশে রুশ-সীমান্তে এসে পৌঁছল। রাত্রির অন্ধকারে তখন স্পষ্ট প্রতিধ্বনি উঠছে, রেড-আর্ম্মি-রক্ষীদের ভারী পায়ের শব্দের। মাঝখানে একটা ছোট পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনী। অন্ধকারে নীরবে তারা সাঁতরে ওপারে গিয়ে উঠলো।

ওধারে প্যারিসে মিসেস্ রেলী দিনের পর দিন অপেক্ষা করে আছেন, স্বামীর সংবাদের জন্যে। হেলসিঙ্কি ত্যাগ করার দিন রেলী স্ত্রীকে একখানি চিঠি লেখে, সেই চিঠিতে সে জানায়, এবার জীবনের শেষ অভিযানে চললাম। আমার বিশ্বাস, কৃতকার্য্য হবোই। পৌঁছে তোমাকে সংবাদ জানাবো।

কিন্তু দিনের পর দিন কোন সংবাদই আসে না। মিসেস্ রেলী উৎকণ্ঠিত হয়ে রোজ সংবাদ-পত্র দেখেন, রাশিয়ার সংবাদ······সোভিয়েট রাশিয়ার অভ্যন্তরে বিদ্রোহের সংবাদ। প্রতিদিন আশা করেন সকাল বেলার খবরের কাগজ খুলেই দেখতে পাবেন, বড় বড় অক্ষরে সোভিয়েট-রাষ্ট্রের পতনের সংবাদ······রেলীর বিদ্রোহ-অভিযানের সফলতার সংবাদ।

হঠাৎ ৩০শে সেপ্টেম্বর সকাল বেলা, মিসেস্ রেলীর এক বান্ধবী রুশ ইজ্‌ভেষ্টিয়া সংবাদ-পত্র থেকে একটা অংশ কেটে এনে তাঁর সামনে ধরলো, পড়তে পড়তে মিসেস্ রেলীর চোখের সামনে সমস্ত ধোঁয়াটে হয়ে এলো···

"গত ২৮শে সেপ্টেম্বর রাত্রি বেলা ফিনিস্ সীমান্তের কাছে চার জন বিদ্রোহী যখন গোপনে সীমান্ত পার হবার চেষ্টা করছিল, সেই সময় রেড-আর্মির প্রহরীদের দ্বারা তারা নিহত হয়।"

তার কয়েক দিন পরে, লণ্ডন টাইমস্-এর এক কোণে ছোট ছোট অক্ষরে মাত্র দুটি লাইন প্রকাশিত হলো :

"২৮শে সেপ্টেম্বর রাশিয়ার সীমান্তে আল্লেকুল নামক গ্রামে রেড-আর্মি সীমান্ত-রক্ষীদের দ্বারা সিডনী জর্জ্জ রেলী নিহত হইয়াছে।"

অতি সাধারণ প্রাণহীন বিজ্ঞপ্তি মাত্র।

এত ক্রিয়া-কাণ্ড, বিপ্লব-ষড়যন্ত্র···এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশ পর্য্যন্ত এত প্রাণান্ত পরিশ্রম··· তার নেট ফল, লণ্ডন টাইমস্-এর এক কোণে ছোট্ট অক্ষরে মাত্র দুটি লাইন···তারপর, অতল বিস্মৃতি···

রেলী ফিনিস্ সীমান্ত থেকে নিরাপদে রুশিয়াতে প্রবেশ করেছিল। যে-কোন কারণে হোক সেই সীমান্ত দিয়ে ফিনল্যাণ্ডে সে আবার ফিরে আসবার চেষ্টা

করে। ফিরে আসবার পথে হঠাৎ রেড-আর্মি রক্ষীদের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং একটা বুলেট সোজা তার মাথা ভেদ ক'রে চলে যায়।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কম্যুনিষ্ট পার্টি থেকে বিতাড়িত ট্রট্স্কী

ষ্টালিন দেখলেন, ইংলণ্ডে চেম্বারলেইন থেকে রাশিয়াতে ট্রট্স্কী পর্য্যন্ত কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে একটা বিরাট দল মাথা তুলে উঠছে।

১৯২৪ সালের মে মাসে বোলশেভিক পার্টি-কংগ্রেসে, পূর্ব্বেই কথিত হয়েছে, ভোটে সর্ব্ববাদি-সম্মতিক্রমে ট্রটস্কীকে পরাজিত করে ষ্টালিন পার্টির অধিনায়ক নির্বাচিত হন। তারপর থেকে ট্রটস্কী, ষ্টালিন এবং ষ্টালিন-পরিচালিত সোভিয়েট শাসন-তন্ত্রের রীতি-নীতি সম্বন্ধে তাঁর মনের ভাব গোপন করে চলবার কোন প্রয়োজনীয়তাই উপলব্ধি করলেন না। প্রচলিত শাসন যন্ত্রের বিরুদ্ধে একটা অপোজিশন পার্টি প্রকাশ্য ভাবেই গড়ে তুলতে লাগলেন। বক্তৃতা, পুস্তিকা ইত্যাদির সাহায্যে তিনি জাতির তরুণদের কাছে ষ্টালিনের শাসন-ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা সুরু করলেন ...গণতন্ত্রের নামে একজনের আধিপত্য...সাম্যবাদের নামে এক পার্টির ডিকটেটরশিপ্।

১৯২৪ সালে রকোভস্কী ইংলণ্ডে সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতরূপে নিযুক্ত হন। সেই সময় বোল-শেভিক দলের মধ্যে যাদের গোপন ভরসায় ট্রটস্কী প্রচলিত শাসন-যন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর দল গড়ে তুলছিলেন, রকোভস্কী তাঁদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। ট্রটস্কীর স্কীম অনুযায়ীই রকোভস্কী ইংলণ্ডে প্রেরিত হন।

ইংলণ্ডে পৌছবার কয়েক দিন পরেই রকোভস্কীর অফিসে বৃটিশ গুপ্তচর বিভাগের দু'জন অফিসার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসে। একজনের নাম ক্যাপটেন আর্মষ্ট্রং আর একজনের নাম ক্যাপটেন লকহার্ট। তাদের কাছ থেকেই রকোভস্কী জানতে পারেন যে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডে সোভিয়েট রাশিয়ার কোন রাষ্ট্রদূত প্রথমে রাখতে চায়নি। রাষ্ট্রদূত হিসাবে রকোভস্কীর নাম বৃটিশ-দপ্তরে যখন প্রথম পাঠানো হয়েছিল, তখন ম্যাক্স্ ইষ্টম্যানের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে বৃটিশ পররাষ্ট্র বিভাগ আগে জানে যে, রকোভস্কী ট্রটস্কীর দলের লোক এবং তাঁর একজন বিশেষ অনুগত বন্ধু। (ম্যাক্স্ ইষ্টম্যান আমেরিকা থেকে ট্রটস্কীর বিশেষ বন্ধুরূপে রাশিয়াতে যান এবং ট্রটস্কী তাঁকেই তাঁর সব বই-এর একমাত্র অনুবাদক মনোনীত করেন। আমেরিকাতে ম্যাক্স্ ইষ্টমানই ট্রটস্কীর দলের হয়ে প্রচার-কার্য্য করেন।) সেই জন্যই বৃটিশ পররাষ্ট্র বিভাগ রকোভস্কীকে ইংলণ্ডে সোভিয়েটের রাষ্ট্রদূত হিসাবে গ্রহণ করে।

এই সূত্রে রকোভস্কীর সঙ্গে বৃটিশ গুপ্তচর বিভাগের ক্রমশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় গড়ে ওঠে। রকোভস্কী মস্কোতে ফিরে গিয়ে গোপনে ট্রটস্কীকে বৃটিশ গুপ্তচর বিভাগের ভেতরের কথা জানালেন যে, বৃটিশ গুপ্তচর বিভাগ অপোজিশন দল হিসাবে ট্রটস্কীর দলের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে উৎসুক।

এই ভাবে ট্রটস্কী যখন বৃটিশ গুপ্তচর বিভাগের আশ্বাস পেলেন, তখন তিনি জার্মাণীর মনোভাব জান-বার জন্যে স্বয়ং জার্মাণীতে যাবার একটা পথ খুঁজতে লাগলেন। এই সময়ের কথা উল্লেখ করে ট্রটস্কী তাঁর আত্ম-জীবনীতে লিখছেন: "হঠাৎ সেই সময় প্রতিদিন আমার নাড়ীতে জ্বর দেখা দিতে লাগলো। মস্কোর ডাক্তাররা সেই জ্বর কেন হচ্ছে, তার কোন কারণই বার করতে পারলেন না।" সেই জ্বর সারাবার জন্যে ট্রটস্কী কিছুদিন চেঞ্জে যাবার ঠিক করলেন এবং ঠিক করলেন, দিন কতক জার্মাণীতেই ঘুরে আসবেন। যখন কম্যুনিষ্ট পার্টি তাঁর এই সিদ্ধান্তের কথা অবগত হলো, স্বভাবতই তাঁরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন এবং জার্মাণীতে যেতে ট্রটস্কীকে প্রকারান্তরে নিষেধ করলেন। এই সম্পর্কে ট্রটস্কী তাঁর আত্মচরিতে লিখছেন: "আমার এই বিদেশ যাওয়ার প্রস্তাব পলিটবুরোতে উত্থাপিত হলো। এবং তাঁরা আলোচনা করে জানালেন যে, বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির দরুণ আমার এই বিদেশ-যাত্রা আশঙ্কাজনকই বলে তাঁরা মনে করেন, তবে যাওয়ার দায়িত্ব তাঁরা আমার ওপরই ছেড়ে দিলেন।"

ট্রটস্কী যাওয়াই স্থির করলেন। জার্মাণীতে ট্রটস্কী কোন হাসপাতালে না গিয়ে একটা প্রাইভেট ক্লিনিকে উঠলেন। কারণ, তিনি চিকিৎসার জন্যেই জার্মাণীতে গিয়েছিলেন। সেই ক্লিনিকে ক্রেস্‌নিস্কী এসে ট্রটস্কীর সঙ্গে দেখা করলো। রকোভস্কীর মত ক্রেস্‌নিস্কী ট্রটস্কীর গোপন দলের একজন পাণ্ডা ছিলেন। তাঁর মধ্যস্থতায় জার্মাণ সামরিক বিভাগের সঙ্গে ট্রটস্কী সংযোগ-স্থাপনের চেষ্টা করেন। যখন তাঁরা দু'জনে কথা বলছেন, এমন সময় একজন জার্মাণ পুলিশ

বিভাগের উচ্চ-রাজকর্মচারী সেখানে এসে ট্রটস্কীকে জানালেন যে, তাঁরা খবর পেয়েছেন ট্রটস্কীকে খুন করবার জন্যে একটা প্লট চলছে, সুতরাং তাঁকে রক্ষা করবার একটা স্বতন্ত্র ব্যবস্থা তাঁদের করতে হবে।

এই ধরণের প্লট নাকি গুপ্তচর বিভাগকে মাঝে-মাঝে আবিষ্কার করতে হয়।

সে যাই হোক, সেই জার্মাণ অফিসার, বহু ঘণ্টা ধরে তাঁদের দু'জনের সঙ্গে নিভৃতে "রক্ষা-ব্যবস্থা" সম্বন্ধে আলোচনা করে চলে গেলেন।

পরে জানা গিয়েছিল যে, ট্রটস্কীর এই জার্মাণ ক্লিনিকে চিকিৎসা করাতে যাওয়ার সময়, জার্মাণ গুপ্তচর বিভাগের সঙ্গে ট্রটস্কীর একটা নতুন চুক্তি হয়। তখন অবশ্য এ চুক্তির কথা বাইরে কেউ জানতো না। পরে ক্রেস্‌নিস্কী যখন ধরা পড়ে তখন বিচারে সে তার নিজের জবানবন্দীতে স্বীকার করে যে, "সেই সময় আমরা নিয়মিত ভাবে জার্মাণী থেকে অর্থ-সাহায্য পাচ্ছিলাম। সেই টাকা থেকে রাশিয়াতে এবং রাশিয়ার বাইরে দলের প্রচারকার্য্য চলতো। এই ভাবে কিছু কাল যাওয়ার পর, জার্মাণীর তরফ থেকে Seeckt একটা নতুন দাবী নিয়ে এলো, প্রথম, গুপ্তসংবাদ আদানের ব্যাপার আরো নিয়মিত করতে হবে, এবং সামনে যে যুদ্ধ আসছে, তাতে যদি ট্রটস্কীর দল রাশিয়ার শাসন-ভার দখল করতে পারে, তাহলে জার্মাণীর অংশে যাতে তার ন্যায্য প্রাপ্য ঠিক মত বর্ত্তায়, তার জন্যে নতুন চুক্তি করতে হবে। ট্রটস্কীর সঙ্গে পরামর্শ করে আমি সম্মতি জানাই এবং আমাদের প্রাপ্যের দিক থেকে টাকার অঙ্কও বাড়তে থাকে। ১৯২৩ থেকে ১৯৩০ পর্য্যন্ত প্রত্যেক বৎসরে আমরা আড়াই লক্ষ মার্ক সোনায় পেতাম।"

জার্মাণী থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে এসে ট্রটস্কী পূরো উদ্যমে প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রচার-কার্য্য সুরু করে দিলেন। ট্রটস্কীর আত্মজীবনীতে তিনি লিখছেন: "উনিশ শো ছাব্বিশ সাল নাগাদ এই দলগত সংঘর্ষ চরম অবস্থায় এসে উঠলো। সেই বছর থেকে আমার দলের লোকেরা প্রকাশ্য ভাবেই সভা আহ্বান করে বিদ্রোহের জন্য জনমতকে গড়ে তুলতে লাগলো।"

কিন্তু সাধারণ শ্রমিক আর কর্ম্মীরা এই সব সভাকে খুব সাদরে গ্রহণ করলো না। মার-ধোর করে তারা এই সব সভা ভেঙে দিতে সুরু করলো।

সেই সময় অর্থাৎ ১৯২৭ সালে সোভিয়েট রাশিয়ার ওপর আবার যুদ্ধের ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। সেই আসন্ন বিপদের সম্ভাবনায় সমস্ত শাসন-যন্ত্র উদব্যস্ত হয়ে উঠেছে। ট্রটস্কী তখন প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, "ফ্রান্সে ক্লেমেঁস্যু যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন, আমরাও তাই গ্রহণ করবো। যখন জার্ম্মাণরা প্যারিস থেকে আর মাত্র ৮০ মাইল দূরে সেই সময় ক্লেমেঁস্যু ফ্রান্সের প্রচলিত শাসন-তন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে উঠেছিলেন।"

মনে রাখতে হবে, ট্রটস্কী তখনও বোলশেভিক দলের সভ্য।

ষ্টালিন ট্রটস্কীর সেই ঘোষণার বিরুদ্ধে পার্টিকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, ইংলণ্ডে চেম্বারলেন থেকে আরম্ভ করে ট্রটস্কী পর্য্যন্ত সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটা মিলিত ষড়যন্ত্র গড়ে উঠছে। এবং এই ষড়যন্ত্রকে এখানেই উচ্ছেদ করে ফেলতে হবে।

কম্যুনিষ্ট পার্টির সামনে ট্রটস্কী এবং ট্রটস্কীর দলের এই প্রকাশ্য বিরোধিতা একটা মস্ত-বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিল। ষ্টালিন সেই সম্পর্কে পার্টির তরফ থেকে একটা "রেফারেণ্ডাম্" আহ্বান করলেন। কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রত্যেক সভ্যকে এই ব্যাপারে ভোট দিতে আহ্বান করা হলো। ভোটের ফলে, ৭ লক্ষ ৪০ হাজার সভ্য ট্রটস্কীর দলের বিরোধিতাকে অস্বীকার করে ষ্টালিনের শাসন-ব্যবস্থাকেই সমর্থন করলো; মাত্র ৪ হাজার ভোটদাতা ট্রটস্কীর বিরোধিতাকে সমর্থন করলো।

এই নিদারুণ পরাজয়ে ট্রটস্কী বুঝলেন, তাঁর রাজনৈতিক অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে, পার্টির বর্ত্তমান পরিচালকদের সঙ্গে তাঁকে সংগ্রাম করেই জয়ী হতে হবে, একদা যেমন জার-তন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। এবং যদি অবিলম্বে তিনি শক্তি-সংগ্রহ না করতে পারেন, তা হলে এই নিষ্ঠুর রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে তাঁকে সুনিশ্চিত নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে। এই সময়ের ঘটনা সম্পর্কে তাঁর আত্মচরিতে লিখছেন: "এই ভোটের ব্যাপারের পর মস্কো এবং লেনিনগ্রাড শহরে সংগোপনে সভা বসতে সুরু করলো; অবশ্য এই সব সভা অপোজিশন পার্টির দ্বারাই সংঘটিত হতো। তরুণ ছাত্র-ছাত্রী আর শ্রমিকরাই এই সভায় যোগদান করতো। প্রত্যেক সভাতে প্রায় একশো জন করে লোক হতো। কোন কোন সভাতে তার দ্বিগুণও লোক হতো। দলের বিশিষ্ট নেতারা ঘুরে ঘুরে এই সব সভায় বক্তৃতা দিতেন। আমাকে কোন কোন দিন একটার পর একটা চার-পাঁচটা সভায় বক্তৃতা দিতে হতো। এই ভাবে সংগোপনে ছোট ছোট সভা কিছুদিন চালাবার পর, এ রকম প্রকাশ্য ভাবেই হাই

টেকনিক্যাল স্কুলের বড় হল-ঘরে এক বিরাট সভা আহ্বান করা হলো। গভর্ণমেণ্ট এই সভার অধিবেশন যাতে না বসতে পারে, তার জন্যে চেষ্টার ত্রুটী করে নি কিন্তু অপোজিশন পার্টির সভ্যদের কৌশলে এই সভার অধিবেশন পূর্ণভাবেই পরিচালিত হয়। আমি আর ক্যামনেভ, প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা দিই।"

ষ্টালিনের অনুষ্ঠিত শাসন-নীতি এবং তদানীন্তন সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের অনুসৃত মার্কস্‌বাদের বিরুদ্ধে ট্রটস্কী দেশের নব-জাগ্রত তরুণদের সজাগ করবার জন্যে সংগোপনতা ত্যাগ করে প্রকাশ্য সংগ্রাম-পরিচালনাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করলেন। এবং সেই উদ্দেশ্যে সংগোপনে তিনি একটা বিরাট আয়োজন সম্পূর্ণ করে একটা নির্দ্দিষ্ট তারিখে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করবেন স্থির করলেন। ১৯২৭, ৭ই নভেম্বর বোলশেভিক বিপ্লবের দশম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। সেই দিনই ট্রটস্কী স্থির করলেন যে, তাঁর দলের লোকেরাও প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে শোভাযাত্রা করে বেরুবে। সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশের মধ্যে প্রয়োজনীয় ঘাঁটি থেকে তাঁর দলের সশস্ত্র লোকেরা প্রকাশ্যে বিপ্লব ঘোষণা করে বেরিয়ে পড়বে।

৭ই নভেম্বর ভোর বেলা, বোলশেভিক শ্রমিকরা শোভাযাত্রা করে যথারীতি যখন বেরুলো, তখন পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা অনুযায়ী ট্রটস্কীর দলের লোকেরা তাদের মধ্যে প্রচার-কার্য্যের জন্যে ছাপান কাগজ বিলি করতে সুরু করে দিল, কোন কোন জায়গায় বাড়ীর ওপর থেকে পুস্তিকা-বর্ষণ সুরু হয়ে গেল। রাস্তার মোড়ে ট্রটস্কীর বিদ্রোহ-পতাকা নিয়ে অপোজিশন পার্টির ছোট ছোট দল প্রচলিত শাসন-তন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্লোগান চীৎকার করতে করতে শোভাযাত্রী শ্রমিকদের তাদের দলে যোগদান করবার জন্যে আহ্বান করতে লাগলো।

কিন্তু ট্রটস্কী যা আশা করেছিলেন, প্রকৃত ক্ষেত্রে তার উল্টো ঘটে গেল। শ্রমিকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্রুদ্ধ হয়ে অপোজিশন দলের শোভাযাত্রাকারীদের ঘাড়ের ওপর পড়ে আক্রমণ করে তাদের পতাকা কেড়ে নিল। বিধ্বস্ত, আহত হ'য়ে তারা রণে ভঙ্গ দিল।

কালবিলম্ব না করে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টও সেই দিন অপোজিশন দলের বহু নায়ককে গ্রেফতার করে ফেললো। কোন মতেই আর এই বিরুদ্ধ দলকে বাড়তে দেওয়া চলবে না। ক্যামেনভ, মুরোলভ, পিয়াটকভ, ট্রটস্কীর দলের বড় বড় পাণ্ডারা কারারুদ্ধ হলেন। চেকার লোকেরা সারা দেশ তোলপাড় করে বিপক্ষ দলের গোপন প্রেস দখল করে নিল। অনুসন্ধানের ফলে কোন কোন জায়গায় গোপন অস্ত্র-ভাণ্ডারের সন্ধানও পাওয়া গেল। লেনিনগ্রাড শহরে অনুরূপ-বিপ্লব উত্থানের আয়োজনের জন্যে জেনোভিভ আর র‍্যাডেক প্রেরিত হয়েছিল। সেখানে তাঁরাও কারারুদ্ধ হলেন। বোলশেভিকদের তরফ থেকে জোফেকে জাপানে রাষ্ট্রদূতরূপে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু জোফে নিঃশব্দে ট্রটস্কীর দলে যোগদান করেন এবং জাপান থেকে ছুটি নিয়ে রাশিয়াতে তখন তিনি ফিরে এসেছিলেন। এই ধর-পাকড়ের সময় তিনি আত্মহত্যা করে চেকার হাত এড়ালেন। হোয়াইট রাশিয়ার বহু সেনা নায়কও এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত থাকায় বন্দী হলেন।

বোলশেভিক পার্টি এত দিন পরে ট্রটস্কীর বিরুদ্ধে দল-গত শাসন প্রয়োগ করলেন; ট্রটস্কী কম্যুনিষ্ট পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হলেন এবং তাঁকে রাজধানী থেকে দূরে সুদূর সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত করে পাঠানো হলো।

—

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

দেশ থেকে বিতাড়িত ট্রটস্কী

বিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী ক্রমশ এগিয়ে চললো তার সেণ্ট হেলেনার দিকে……

য়ুরোপীয় রাশিয়া থেকে দূরে, এশিয়ার চীনের উত্তর-সীমান্ত-লগ্ন সাইবেরিয়ার আল্‌মা-আটা শহরে ট্রটস্কীকে নির্ব্বাসিত করা হলো। একদিন যে ব্যক্তি জার-তন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অন্যতম অধিনায়ক ছিলেন, আজ, রাজনীতির নির্ম্মম চক্র-আবর্ত্তনে, তাঁকেই সহযাত্রীদের হাত থেকে নির্ব্বাসন-দণ্ড নিতে হলো। অবশ্য ট্রটস্কীর ব্যক্তিত্ব এবং সোভিয়েট রাষ্ট্র গঠনে তাঁর দান স্মরণ করেই, ষ্টালিনের দল যথাসম্ভব এই নির্ব্বাসন-দণ্ডকে সহনীয় করবারই চেষ্টা করে। অবশ্য তখনও পর্য্যন্ত সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ট্রটস্কীর বিরোধিতার ঠিক কতখানি গভীরতা ছিল, তা সন্দেহ করতে পারেন নি।

আলমা-আটারে তাঁর বাসের জন্যে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট তাই একটা স্বতন্ত্র বাড়ীর ব্যবস্থা করেন। ট্রটস্কী, তাঁর স্ত্রী নাটালিয়া এবং পুত্র সিডভকে সঙ্গে নিয়ে আলমা-আটায় আসেন। এবং দেহরক্ষী হিসাবে তাঁর নির্ব্বাসিত কয়েক জন লোককে তাঁর সঙ্গে রাখবার অধিকারও গভর্ণমেণ্ট দেয়। এ ছাড়া, দেখা-শোনা করা বা চিঠি-পত্র লেখা সম্পর্কেও প্রথমে বিশেষ কোন কড়া

নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয় না। তাঁর নিজের লাইব্রেরী এবং ব্যক্তিগত কাগজপত্র তাঁর সঙ্গে রাখবার অনুমতিও তিনি পেয়েছিলেন।

কিন্তু এই সুযোগের অবকাশে ট্রটস্কী আবার নতুন করে তাঁর ঘর সাজাতে আরম্ভ করলেন। তাঁর দলের মধ্যে ক্রেস্টেনস্কী ছিলেন একজন ধুরন্ধর মাথাওয়ালা লোক, রাজনৈতিক দাবা-খেলায় একজন ওস্তাদ খেলোয়াড়। তিনি ভাগ্যক্রমে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এড়িয়ে তখনও বাইরে ছিলেন। চেকার জালের বাইরে থেকে তখনও পর্য্যন্ত অপোজিশন দলের দ্বারা স্বাধীন ভাবে ঘোরাফেরা করছিল, ক্রেস্টেনস্কী তাদের নিয়ে নতুন করে পরামর্শ করতে বসলেন। তিনি বুঝলেন যে, ট্রটস্কী যে প্রকাশ্য বিরোধিতার পন্থা গ্রহণ করেছিলেন, তা ভুল। তাই এক নতুন আয়োজনের প্রস্তাব করে তিনি ট্রটস্কীকে গোপনে চিঠি লিখলেন। এই চিঠিতে ক্রেস্ টনস্কী ট্রটস্কীকে বোঝালেন যে, "এই ভাবে প্রকাশ্য বিরোধিতা করবার সময় এখনো আসে নি! এখন তাদের উচিত, কম্যুনিষ্ট দলেব ভেতর থেকে, ধীরে ধীরে দলের বিশ্বাস উৎপাদন করা এবং প্রয়োজনীয় দফতর এবং উচ্চপদগুলি আবাব দখল করতে চেষ্টা করা। এই ভাবে দলের ভেতর থেকেই জনসাধারণের ওপর তাদের দলগত এবং ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তাব কবতে হবে। এবং তার জন্যে এখন এমন একটা নীতি গ্রহণ করতে হবে, যাতে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট বুঝতে পারে যে, আমরা আমাদের ভুল বুঝতে পেরেছি এবং সত্য সত্যই তার জন্যে অনুতপ্ত। প্রযোজন হলে, কূটনীতির খাতিরে, এখন ট্রটস্কীকেই আমাদের নিন্দা কবতে হবে। দলের ভিতর পুনঃপ্রবেশ করা ছাড়া, আমাদের মত-প্রতিষ্ঠার আর কোন পথ নেই।"

ট্রটস্কী ক্রেস্টেনস্কীর এই কূটনীতির পূর্ণ সমর্থন করলেন এবং গোপনে দলের প্রত্যেক কর্ম্মীর কাছে আদেশ চলে গেল যেমন করেই হোক্, পুনরায় আবার কম্যুনিষ্ট পার্টিতে প্রবেশ করার চেষ্টা কর এবং ধীরে ধীরে পার্টির সঙ্গে মিশে প্রয়োজনীয় দফতরগুলি হাতাবার আয়োজন কর। তার জন্যে যে কোন শঠতা অবলম্বন করা যেতে পারে।

ট্রটস্কীর মতন, তাঁর দলের অন্য সব নেতা, র‍্যাডেক, ক্যামেনভ এবং জেনোভিভও নির্ব্বাসিত হয়েছিলেন। কয়েক মাস নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করার পর, হঠাৎ তাঁদের রাজনৈতিক মত পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল এবং রুশ-জনসাধারণ আনন্দিত চিত্তেই প্রতিদিন প্রেস মারফৎ শুনতে লাগলো, এই সব নির্ব্বাসিত নেতাদের অনুতাপ-উক্তি। তাঁরা তাঁদের অতীত ভুলের জন্যে সত্যই মর্ম্মাহত, এবং আজ সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে কম্যুনিষ্ট পার্টির অক্ষুণ্ণতা এবং একাধিপত্য বজায় রাখা যে কত-বড় প্রয়োজনীয় জিনিস, তা তাঁরা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছেন। এবং সেই সঙ্গে তাঁরা আন্তরিক ভাবে আবেদন জানাতে সুরু করলেন, যাতে পুনবায় পার্টির সভ্যরূপে তাঁদের গ্রহণ করা হয়।

যখন এই ভাবে পার্টিতে পুনঃপ্রবেশ করবার চেষ্টা চলছে সেই সময় আল্মা-আটাতে ট্রটস্কীর বাড়ীকে কেন্দ্র করে একটা গোপন-চক্র আবার গড়ে উঠতে আরম্ভ করলো। কম্যুনিষ্ট পার্টি ট্রটস্কী এবং ট্রটস্কীর দলের লোকদের বে-আইনী দলের সভ্য বলে যখন ঘোষণা করে, তখন ট্রটস্কীর বন্ধু বুখারিন তাঁর দল থেকে সরে দাড়িয়ে নতুন একটা দল গঠন করবার আয়োজন কবেন। ট্রটস্কীর নির্ব্বাসনেব পর বুখারিন কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে বিরোধী দলের লোকদের একত্র কবে একটা নতুন অপোজিশনের সৃষ্টি করেন। ট্রটস্কীর দল লেফ্‌ট অপোজিশন নামে পরিচিত, বুখারিনেব দল রাইট অপোজিশন নামে আত্মপরিচয় দিল। বুখারিনের মতে ট্রটস্কী সব দিক বিবেচনা না করে, অবিবেচকের মত তাড়াতাড়ি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং দেশের মধ্যে অন্য যে-সব বিরোধী দল আছে তাদের সকলকে একত্র করে একটা সঙ্ঘবদ্ধ বিরোধিতা দিতে পারে নি বলেই, তাঁকে এই ভাবে পরাজিত হতে হয়। তাই বুখারিন ট্রটস্কীর ভুল সংশোধন করে অতি সতর্কতার সঙ্গে প্রচলিত শাসন-তন্ত্রের বিরুদ্ধে একটা বিরাট দল গড়ে তুলতে লাগলেন।

সেই সময় ষ্টালিন তাঁর পঞ্চবার্ষিকী প্ল্যান দেশের সামনে উপস্থিত করেছেন। এই প্ল্যান-অনুযায়ী রাষ্ট্রের প্রত্যেক লোককে অতঃপর আরো বেশী পরিশ্রমী হতে হবে, আরো বেশী আত্ম ত্যাগের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। একেই তো বড় বড় জমিওয়ালা চাষীরা এবং জমিদাররা সোভিয়েট রাষ্ট্রের ওপর মনে মনে বিরূপ হয়েই ছিল, তার ওপর পঞ্চ-বার্ষিকী প্ল্যানে যে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা হলো, তাতে করে তাদের ভবিষ্যতের সমস্ত আশাই সমাহিত হয়ে গেল। এই সুযোগে বুখারিন এক নতুন অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম নিয়ে গোপনে এই সব সংক্ষুব্ধ লোকদের দলে টানতে চেষ্টা করলেন। বুখারিনের এই অর্থনৈতিক প্রোগ্রামে তারা তাদের ধনসম্পত্তি আংশিক ফিরে

পাবার এবং আগেকার মত ব্যবসা-বাণিজ্য করবার অধিকারের একটা সম্ভাবনা দেখতে পেলো। তাই তারা কোমর বেঁধে বুখারিনের সাহায্যে দলবদ্ধ হতে লাগলো।

ট্রটস্কী নির্ব্বাসন থেকে বুখারিনের সমস্ত সংবাদই পেতেন। যদিও তিনি বুঝলেন যে, অপোজিশনের অধিনায়কত্ব তাঁর হাত থেকে বুখারিনের হাতে চলে যাচ্ছে, কিন্তু আপদ-ধর্ম্ম হিসাবে তিনি তাঁর দলের অবশিষ্ট লোকদের বুখারিনের সঙ্গে যোগ দিতেই গোপন ইস্তাহার জারী করলেন। পঞ্চবার্ষিকী প্ল্যানের কঠোর অসম্ভাব্যতার দোহাই দিয়ে বুখারিন পার্টির ভেতরে থেকেই সংগোপনে একটা বিরাট বিরোধী দল ক্রমশ গড়ে তুলতে লাগলেন।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের গুপ্তচররা আলমা-আটাতে চব্বিশ ঘণ্টা ট্রটস্কীর বাড়ীর ওপর নজর রাখতো। তাদের নজর এড়িয়ে ট্রটস্কীকে মস্কোর সঙ্গে যোগ রাখতে হতো। এই কাজে তাঁর প্রধান সহায় ছিল, তাঁর পুত্র সেডভ। মস্কো থেকে যে-সব গোপন দূত আসতো তাদের সঙ্গে দেখা-শোনা করবার জন্যে সেডভকে নানা রকম ফিকির বার করতে হতো। অনেক সময় তুষার-বৃষ্টির মধ্যে, যখন জনপ্রাণী রাস্তায় বেরুতে চাইতো না, সেই সময় সেডভ সেই তুষার মাথায় করে নগরের প্রান্তে বনের ভেতর নির্দ্দিষ্ট ঝোপে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতো···কখনও হয়ত বনের ভেতর চিহ্নিত গাছের তলায় মাটি খুঁড়ে তারা চিঠি-পত্র রেখে যেতো, সন্ধান করে মাটির তলা থেকে সেই সব চিঠি আনতে হতো। শহর থেকে একটু দূরে কিরগিজদের মেলা বসতো; প্রায়ই সেই মেলার ভিড়ের সুযোগে তাদের দেখা-শোনা হতো। হয়ত কোন গেঁয়ো চাষী মেলায় গরু বেচতে এসেছে···তারই থলির ভেতর থেকে দর-কষাকষির সময় চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান হয়ে যেতো। পুত্রের এই সব চতুর দৌত্যকার্য্যে ট্রটস্কী মুগ্ধ হয়ে তাঁর আত্মচরিতে আদর করে পুত্রকে সম্বোধন করে গিয়েছেন, আমার সব চেয়ে কৃতী পররাষ্ট্র-সচিব। এই সংগোপন ষড়যন্ত্র-কার্য্যের কৃতিত্ব সম্পর্কে ট্রটস্কী তাঁর আত্মচরিতে সগর্ব্বে লিখেছেন যে, ১৯২৮ সালের এপ্রিল থেকে অক্টোবরের মধ্যে এই ভাবে আমি রাশিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে এক হাজার সংগোপন চিঠি এবং সাত শো টেলিগ্রাম পাই এবং আমার দিক্ থেকে আমি বিনা বাধায় প্রায় আট শো চিঠি আর পাঁচ শো টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি।

কিন্তু আর বেশী দিন এই ভাবে চেকার চোখে ধুলো দিয়ে ষড়যন্ত্র চালানো সম্ভব হলো না।

বুখারিনের গতিবিধি লক্ষ্য করে, অচিরকালের মধ্যে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট বুখারিন এবং তাঁর অনুচরদের কম্যুনিষ্ট পার্টি থেকে নির্ব্বাসিত করে দিল এবং আলমা-আটাতে ট্রটস্কীর কাছে সোভিয়েট রাষ্ট্র থেকে দূত উপস্থিত হলো তাঁকে সাবধান করে দেবার জন্যে। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট এমন সব দলিল-পত্র হাতে পেয়েছে, যাতে ট্রটস্কীকে রাষ্ট্রের শত্রুরূপে তাঁরা আইনের কঠোরতম শাস্তি দিতে পারেন।

কিন্তু ট্রটস্কী, চিরবিপ্লবী ট্রটস্কী সে-সতর্ক-বাণী গ্রাহ্য করলেন না। ফলে ওগপুর বিচারে, তাঁকে সোভিয়েট রাষ্ট্রের সীমানা থেকে চির-নির্ব্বাসনের দণ্ড দেওয়া হলো।

সেই দণ্ড মাথায় নিয়ে ট্রটস্কী রাশিয়া ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু সোভিয়েট-রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক ষড়যন্ত্রের সব চেয়ে রোমাঞ্চকর অধ্যায়ের সূচনা হলো সেই সঙ্গে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বেড নেপোলিয়ান বলে ট্রটস্কীর দিকে ফিরে চাইল য়ুরোপ।

জর্জ্জিয়ার চর্ম্মকারের সন্তানকে জঘন্য আরশুলা জ্ঞানে ঘৃণা করলেও, সম্ভ্রান্ত ইহুদী-পিতার সন্তান ট্রটস্কী দেখলেন, তাঁর সমস্ত সাহিত্যিক-প্রতিভা, বাগ্মিতা এবং শিক্ষাশালীনতা সত্ত্বেও, সেই আরসুলার প্রতাপে তাঁকে সোভিয়েট রাশিয়া থেকে নির্বাসিত হতেই হলো। যে সোভিয়েট রাশিয়ার গঠনে, লেনিনের মত না হলেও, লেনিনের পরেই তাঁর স্থান, সেই সোভিয়েট রাশিয়া থেকে সপরিবারে তাঁকে পালিয়ে আসতে হলো। সেই শিশু-রাষ্ট্রকে গড়ে তুলবে ষ্টালিন, তাঁর নিজের মতন করে···তাঁর নিজের মতন করে তিনি ব্যাখ্যা করবেন মার্কসবাদকে, লেনিনকে। ট্রটস্কীর সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। লেনিনের পর তাঁরই একমাত্র অধিকার মার্কসবাদকে জগতের লোকের সামনে ব্যাখ্যা করবার···যে বিপ্লব রাশিয়ায় সফল হয়েছে, তাকে সফল করে তুলতে হবে জগতের অন্য সব সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে ···অবিচ্ছেদ বিপ্লবের অনির্বাণ বহ্নি জাগিয়ে রাখতে হবে বিংশ শতাব্দীর বুকে···

ষ্টালিনের কিন্তু অন্য মত। এক দেশে যে বিপ্লব সবেমাত্র সার্থক হয়েছে, যাতে তার নব-জাগ্রত শক্তি আঁতুড়-ঘরেই না মরে যায়, তার জন্যে আগে তাকে সেই এক দেশের মধ্যেই চরম শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে···

ব্যাখ্যার পার্থক্যের আড়ালে বড় হয়ে উঠলো আসলে ব্যক্তিত্বের পার্থক্যের লড়াই। ট্রট্স্কীর স্থির ধারণা হলো, ষ্টালিন জীবিত থাকতে মার্কস্‌বাদ সম্পূর্ণ সার্থক হবার কোন উপায় নেই, ষ্টালিন নীরবে উপলব্ধি করলেন, ট্রট্স্কী জীবিত থাকতে এই শিশু-রাষ্ট্রের অগ্রগতির পথ কখনই নিরাপদ হবে না। ট্রট্স্কী তাই চাইলেন, ষ্টালিনের মৃত্যু, হত্যা ছাড়া তাকে নিরস্ত করবার আর উপায় নেই। ষ্টালিন চাইলেন, ট্রট্স্কীকে হত্যা না করা হলেও তাকে এমন অবস্থায় এনে ফেলা, যেখান থেকে নখদন্তহীন স্থবির সিংহের মত সে একটি শশকের প্রাণেও ভয় জাগাতে পারবে না। ট্রট্স্কী আয়োজন করতে লাগলেন, ষ্টালিনের হত্যার। ষ্টালিন সম-সাময়িক ইতিহাসের পাতা থেকে কেটে, মুছে, ছিঁড়ে, রবার দিয়ে ঘসে ট্রট্স্কীর নাম তুলে দিতে লাগলেন।

মার্কসবাদের ইতিহাসের কথা বাদ দিয়ে, এই ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের পরিণাম আজ আমরা জানি। ট্রট্স্কী ষ্টালিনকে হত্যা করতে গিয়ে নিজেই নিহত হয়েছেন। ষ্টালিন তাঁর নিহত প্রতিদ্বন্দ্বীকে দ্বিতীয় বার নিহত করেছেন, সোভিয়েট রাশিয়ার সমসাময়িক ইতিহাস থেকে ট্রট্স্কীর নাম সরকারী ভাবে তুলে দিয়ে। আজ সোভিয়েট রাষ্ট্রের শিশুরা স্কুল-পাঠ্য জাতির ইতিহাসে কোথাও খুঁজে পায় না ট্রট্স্কীর নাম, যেখানে তারা ভুলেও একটা স্মরণের ফুল রেখে একটা নমস্কার অন্তত করতে পারে। প্রথম অপমৃত্যুর চেয়ে ঢের বেশী মারাত্মক এই দ্বিতীয় অপমৃত্যু।

সোভিয়েট রাশিয়া থেকে নির্বাসিত হয়ে ট্রট্স্কী সপরিবারে তুরস্কের রাজধানী কনস্টাণ্টিনোপল্‌স্‌-এ এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু রাশিয়ায় থাকবার সময় বর্ত্তমান জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবের অন্যতম নায়করূপে তাঁর যে খ্যাতি ছিল, সেই খ্যাতি নিয়েই তিনি বাহির জগতে এসে দাঁড়ালেন। তখনও পর্য্যন্ত আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিগত আকর্ষণ বিন্দুমাত্র কমেনি। যখন এই সংবাদ জগতে রাষ্ট্র হয়ে পড়লো যে, ট্রট্স্কী নির্বাসিত হয়ে তুরস্কে বসবাস করতে এসেছেন, তখন য়ুরোপ আর আমেরিকার সংবাদপত্র-মহলে সাড়া পড়ে গেল। জগতের প্রায় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্রের বিশেষ প্রতিনিধিরা ছুটলো তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে; সোভিয়েট-বিরোধী য়ুরোপীয় রাষ্ট্রের গুপ্তচরেরাও সজাগ হয়ে উঠলো, এই নির্বাসিত লোকটির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবার জন্যে। ট্রট্স্কীও নিজের সেই আকর্ষী-শক্তি সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় সজাগ হয়ে, দ্বিতীয় নেপোলিয়ানের মত, নিজের চারিদিকে একটা রাজকীয় শক্তি ও সম্ভাবনার আবহাওয়া গড়ে তুললেন। তিনি যে নির্বাসিত, হৃতশক্তি বা দলহীন, তা বোঝবার বিন্দুমাত্র অবকাশ কাউকে দিলেন না। সেরা অভিনেতার মত, তিনি য়ুরোপ আর আমেরিকাকে এই কথাই বোঝাতে চাইলেন, ষ্টালিনকে রাশিয়া থেকে বিতাড়িত করবার শক্তি একমাত্র তাঁরই আছে এবং এই সাময়িক পরাজয়কে মুছে ফেলে দিয়ে অচিরকালের মধ্যেই তিনি সোভিয়েট রাশিয়ার ভেতরে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করবেন, যাতে করে ষ্টালিন এবং তাঁর অনুচরেরা চিরকালের মত ইতিহাস থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সোভিয়েট রাশিয়াকে উচ্ছেদ করবার বাসনায় তখন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রেরা যে-কোন লোককে বন্ধু বলে স্বীকার করে নিতে উদ্‌গ্রীব। রাশিয়ার তুহিন-প্রান্তর থেকে তাদের চোখের সামনে বোলশেভিজিমের যে ভয়াবহ দানব-মূর্তি জেগে উঠছে, তাকে যদি এখন না উচ্ছেদ করে ফেলা হয়, তা হলে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রেরা আর নিশ্চিন্তে অগ্রসর হতে পারবে না। তাই তারা সকলে এই নির্বাসিত রুশ-বিপ্লব-নায়ককে কাজে লাগাবার জন্যে তাঁর প্রার্থিত মূল্যেই তাঁকে স্বীকার করে নিল। পরাজিত, নির্বাসিত হয়েও তাই ট্রট্স্কী পূর্ণতেজে নিজেকে জাহির করলেন। য়ুরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র-দফ্‌তরে—"রেড্‌ নেপোলিয়ান্‌" আখ্যায় তাঁর নতুন নামকরণ হয়ে গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

স্বাভাবিক ভাবে কখন যে মৃত্যু আসবে, তার জন্যে বিপ্লবীরা বসে থাকতে পারে না, তাই তারা হত্যা দিয়ে তাকে আগিয়ে আনে।

তাঁর আগমনের পূর্ব্বেই তাঁর দলের লোকেরা তুরস্কের প্রিন্‌কিপো অঞ্চলে তাদের নায়কের নতুন বাস-ভবনের বন্দোবস্ত করে রেখেছিল। সেখানে ট্রট্স্কী তাঁর হেড-কোয়ার্টার্স গড়ে তুললেন এবং তাঁর চারদিকে একটা রহস্যঘন বিপ্লবের আবহাওয়া বেশ ঘটা করে তৈরী করলেন। প্রতিদিনের জীবন-যাত্রার ভঙ্গীর দিক থেকেও ষ্টালিন এবং ট্রট্স্কী ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্ম্মী। ট্রট্স্কীর সমস্ত কাজ-কর্ম্ম, দৈনন্দিনতার মধ্যে ছিল একটা নাটকীয় ভঙ্গী—একটা ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ; ষ্টালিন সেখানে একেবারে নীরব—কোন নাটকীয়তার কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত তাঁর আশে-পাশে থাকে না।

প্রিনকিপোতে তাঁর বাড়ীকে ঘিরে এমন একটা রহস্যঘন বৈপ্লবিক আবহাওয়া সৃষ্টি করা হলো যে, সেই সময়ের মত য়ুরোপের সমস্ত সংবাদ-পত্রের দৃষ্টি সেই বাড়ীটার ওপর গিয়ে পড়লো। বাড়ীর চারিদিক ঘিরে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে তাঁর দলের লোকেরা সশস্ত্র ভাবে পাহারা দিতে লাগলো। বাড়ীর আধ-মাইল ঘিরে বিশেষ ভাবে শিক্ষিত শিকারী কুকুরের দল নিযুক্ত করে রাখা হলো। বাড়ীর ভিতর যাওয়া-আসা নিয়ন্ত্রণ করবার জন্যে রীতিমত কঠোর ব্যবস্থা করা হলো; নতুন সাঙ্কেতিক, গোপন ছাড়পত্র, দলের লোকদের জন্যে গোপন চিহ্ন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সব নতুন করে গড়ে তোলা হলো। বাড়ীর ভিতরে ট্রটস্কীর লাইব্রেরী-ঘরের সামনে, যে ঘরে বসে তিনি বাইরের লোকদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন, সেখানে সদা-সর্বদা অস্ত্র-হাতে তাঁর দেহরক্ষীরা পাহারা দিত।

দেখতে দেখতে প্রিনকিপোর সেই বাড়ী সোভিয়েট-বিদ্বেষী য়ুরোপের তরুণ বিপ্লবীদের তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠলো। ট্রটস্কীর রোমান্টিক ব্যক্তিত্ব বিশ্ব-বিপ্লবের অধিনায়করূপে এক শ্রেণীর তরুণদের চুম্বকের মত আকর্ষণ করে নিয়ে এলো। য়ুরোপের সেই সদ্য-জাগ্রত আগ্রহকে ট্রটস্কী তাঁর নিজের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাজে লাগাতে তৎপর হয়ে উঠলেন। প্রিনকিপোর সেই বাড়ী য়ুরোপের গোপন রাজনীতির সব চেয়ে আকর্ষণীয় স্থান হয়ে উঠলো। ট্রটস্কী হয়ে উঠলেন, জগতের ১নং বিপ্লবী।

তাঁর শত্রুপক্ষের লোকেরা বলে, এই সময় ট্রটস্কী—লোকের ওপর তাঁর প্রভাবকে আরও গভীর ও রোমান্টিক করবার জন্যে নিজের নাটকীয় প্রতিভাকে চরম ভাবে কাজে লাগান। কোন বিশেষ প্রতিপত্তিশালী রাষ্ট্র-প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করতে হলে, তিনি আগে থাকতে তাঁর ঘরে নিজের অংশটি ভাল করে রিহার্স্যাল দিয়ে নিতেন। এমন কি, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, নিজের ভঙ্গীগুলো যাতে নিখুঁত হয়, তার জন্যে আগে থাকতে তার কসরৎ করে নিতেন। এই উক্তির কোন প্রামাণিক বিবরণ আমি পাই নি, তবে তাঁর প্রোপাগাণ্ডার যে একটা নিজস্ব ধরণ ছিল এবং তার মধ্যে নাটকীয়তার অংশ যে অনেকখানিই ছিল, তা সম-সাময়িক ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই জানেন। তবে এ কথা ঠিক যে, সে-সময় বাইরের যে-সব বিশিষ্ট সাংবাদিককে তিনি সাক্ষাৎকারের সুযোগ দিতেন, তাঁদের সঙ্গে আগে থাকতেই কতকগুলি সর্ত্ত করে নিতেন। তার মধ্যে একটি প্রধান সর্ত্ত হলো, তাঁদের কাগজে এই সাক্ষাৎকারের যে বিবরণী প্রকাশ করবেন, প্রকাশের আগে তার পাণ্ডুলিপি তাঁকে দেখিয়ে নিতে হবে এবং তাতে তিনি তাঁর ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন করতে পারবেন।

এই প্রিনকিপোতে অবস্থান কালেই ট্রটস্কীর সঙ্গে জগতের কয়েক জন বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং সাংবাদিকের সাক্ষাৎ হয়। সেই সব সাক্ষাৎকারের মধ্যে দুটি কি তিনটি বিবরণ সম-সাময়িক ইতিহাস এবং সাহিত্যে স্থায়ী ভাবে থেকে গিয়েছে। সেই সব বিবরণ পাঠে বোঝা যায় যে, ট্রটস্কী প্রশ্নকর্ত্তাদের প্রশ্নের উত্তরে যে ভাষা প্রয়োগ করতেন, তা তার মধ্যে একটা সুমার্জ্জিত নাটকীয়তার লক্ষণ স্পষ্ট ভাবেই থাকতো এবং তার মধ্যে তাঁর অসাধারণ সাহিত্যিক-প্রতিভারও নিদর্শন স্পষ্ট ভাবেই পাওয়া যেতো। এই সব উক্তির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, বিশ্বের সংবাদপত্রে ষ্টালিনের বিরোধী একটা জনমতকে গড়ে তোলা। ষ্টালিন এবং ষ্টালিন-শাসিত সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে তিনি যে ষড়যন্ত্র গড়ে তুলছেন, তার একটা নৈতিক স্বীকৃতি গড়ে তোলা।

এই সাক্ষাৎকারের মধ্যে জগৎখ্যাত জার্ম্মাণ সাহিত্যিক ও জীবনী-লেখক এমিল লুড্‌হবুইগ এবং স্বনামখ্যাত আমেরিকান সাংবাদিক জন গুন্থারের বিবরণী আজ সাহিত্যে স্থানলাভ করেছে।

লুড্‌হবুইগের মারফৎ ট্রটস্কী য়ুরোপ আর আমেরিকাকে শোনালেন যে, ষ্টালিন যে পঞ্চম বার্ষিক প্ল্যানের কথা জাহির করেছেন, সেটা সূচনাতেই ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে···এবং তার ফলে অচিরেই রাশিয়াতে অর্থ নৈতিক মহাদুর্গতি দেখা দেবে···বেকারের সংখ্যায় দেশ ভরে যাবে···এত কষ্টে অর্জ্জিত বিপ্লবের ধনকে ষ্টালিন একেবারে নষ্ট করে ফেলছে···এবং সোভিয়েট রাশিয়ার ভেতরে ভেতরে তার বিরুদ্ধে একটা বিরাট দল ক্রমশ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠছে···

য়ুরোপ এই কথাই বিশ্বাস করতে চাইছিল।

হঠাৎ এই সময় চতুর জীবনী-লেখক একটা বেয়াড়া প্রশ্ন করে ফেললেন, রাশিয়ার ভেতরে এখন আপনার প্রভাব কি রকম?

হঠাৎ উত্তর দিতে গিয়ে ট্রটস্কী নিজেকে সামলে নিলেন। কণ্ঠস্বর বদলে শান্ত ভাবে বললেন, বাইরে থেকে তা অনুমান করা সম্ভব নয়···কারণ···তাঁর দলের লোকেরা এখন সব ছড়িয়ে পড়েছে···এখন গোপনে তাদের কাজ করতে হচ্ছে······

লুড্‌হবুইগ পুনরায় প্রশ্ন করেন, কবে আপনি আশা

করছেন প্রকাশ্যে ষ্টালিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করতে পারবেন ?

—বাইরে থেকে যখন একটা সুযোগ দেখা দেবে। আর একটা যুদ্ধ···কিংবা বাইরে থেকে অন্য কোন রাষ্ট্র যদি রাশিয়াকে আক্রমণ করে···তখন···

জন গুন্থার এই সুযোগের স্পষ্টতর উল্লেখ করলেন, সে-সুযোগ একমাত্র আসতে পারে, ষ্টালিনের মৃত্যুর সঙ্গে।

স্বাভাবিক ভাবে কখন যে মৃত্যু আসবে, তার জন্যে বিপ্লবীরা অপেক্ষা করে থাকতে পারে না; অথবা স্বাভাবিক নিয়মে কখন সে-যুদ্ধ বাধবে, তার জন্যেও অপেক্ষা করে থাকা যায় না।

সুতরাং, সেই যুদ্ধকে অথবা সেই ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যুকে নিজের চেষ্টাতে আগিয়ে আনতে হবে। বিবর্ত্তন আর বিপ্লবে এইখানেই পার্থক্য।

ট্রটস্কী বিবর্ত্তনে বিশ্বাস করতেন না, তাই তিনি সর্ব-শক্তি দিয়ে চেষ্টা করতে লাগলেন, সেই সুযোগকে স্বচেষ্টায় নিকটবর্ত্তী করে আনতে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

আজকের জগতে সবাই প্রগতিশীল এবং সবাই সনাম revolutionary.

বর্ত্তমান জগতের রাজনৈতিক অভ্যুত্থান এবং তার অনুগামী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রচার-কার্য্য বিশ্লেষণ করে একজন আমেরিকান লেখক বর্ত্তমান রাজনৈতিক প্রোপাগাণ্ডার একটা মূল সূত্র আবিষ্কার করেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের ধাক্কায় জগতের লোকের মনস্তত্ত্বে একটা মস্ত-বড় পরিবর্ত্তন এসে যায়। সব দেশেই লোক অল্প-বিস্তর বিপ্লব-ধর্ম্মী হয়ে ওঠে। যে-পুরাতন ব্যবস্থার ফলে জগতের এই দৈন্য আর দুঃখ, তার মধ্যে তারা আর ফিরে যেতে চায় না। লোকের মনে একটা স্পষ্ট ধারণা হয়ে যায় যে, সেই সব পুরোন ব্যবস্থার দরুণই তাদের এই দুঃখ-কষ্ট। সুতরাং, সেই পুরাতনের বিরুদ্ধে বিপ্লব করতে হবে। বিপ্লব কথাটার মানে নিঃশব্দে কখন যে বদলে গেল, তা কারুরই নজরে পড়লো না। যে-কেউ, যে-কোনও মতবাদ প্রচার করুক না কেন, তার ভাষার মধ্যে বিপ্লব থাকা চাই, নতুবা জনমতকে আকর্ষণ করা যাবে না। তাই বর্ত্তমান জগতের রাজনৈতিক ইতিহাসে আমরা দেখি, ইতালিতে ফ্যাসিসিজমের বিজয়কে মুসোলিনী বলছেন, ইতালির বিপ্লবের জয়; রাশিয়ায় ফ্যাসিসিজমের শত্রু ষ্টালিনও বলছেন, রাশিয়ায় বিপ্লবের জয়; জার্মাণীতে নাৎসী দলের নেতা হিটলারও নাৎসী দলের জয়-লাভকে বললেন, জার্মাণ-বিপ্লবের জয়। বিপ্লবের প্রকৃত সংজ্ঞা কি, তা আজ আর বিচার করে দেখবার সময় নেই। প্রতিপক্ষকে হেয় করতে হলে, বলতে হবে সে re-actionary, revolutionary নয়। এই হলো আজকালকার প্রোপাগাণ্ডার টেকনিক। ইংলণ্ডের লর্ড রদারমেয়ার এবং আমেরিকার সংবাদ-পত্র সম্রাট উইলিয়াম র‍্যানডলফ হার্ষ্ট লেনিনকে তারস্বরে গালাগাল দিলেন, bloody revolutionary বলে। তাঁরাই আবার নির্বাসিত ট্রটস্কীকে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেন, রাশিয়ায় ষ্টালিন is betraying the Revolution!

আজকে সকলেই revolutionary, সকলেই প্রগতিশীল।

ইংলণ্ড আর আমেরিকার কাগজেরা তারস্বরে ষ্টালিনকে গালাগাল দিল, revolutionary বলে। রাশিয়া থেকে নির্বাসিত হয়ে ট্রটস্কী ঘোষণা করলেন ষ্টালিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, তার কারণ ষ্টালিন Counter Revolutionary!

সেই বিপ্লবের নাম নিয়েই ট্রটস্কী ষ্টালিনের বিরুদ্ধে য়ুরোপের জনমতকে গড়ে তুলতে সর্ব-মন-প্রাণ নিযুক্ত করলেন। য়ুরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে, প্রকাশ্য ভাবে তিনি সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে, সংবাদ-পত্রের মধ্যে দিয়ে তদানীন্তন সোভিয়েটরাশিয়ার পরিচালকবর্গের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচারকার্য্য সুরু করলেন এবং সেই সময়ই তিনি তাঁর বিখ্যাত আত্মচরিত "My life" লেখেন। এই আত্মচরিতখানি হলো তাঁর অনুষ্ঠিত প্রচার-কার্য্যের প্রধান ভিত্তি এবং এই বইখানির সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্য-বাদী রাষ্ট্রের নায়কেরা ষ্টালিন এবং ষ্টালিন-শাসিত সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে নতুন করে তাঁদের প্রোপাগাণ্ডা সুরু করে দিলেন।

বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক মানুষ আত্ম-প্রবঞ্চনায় যে কি রকম ভাবে সিদ্ধ হয়ে উঠেছে, তা ভাবলে বিস্মিত হয়ে যেতে হয়। ট্রটস্কীর এই আত্মজীবনী পড়ে হিটলারের জীবনী-লেখক কোন্‌রাড্ হিডেন লিখছেন, নাৎসী-নায়ক উল্লাসে বলে উঠেছিলেন, "Brilliant!" সোভিয়েট-বিরোধী য়ুরোপের বিভিন্ন গুপ্তচর-বিভাগে এই বইখানিকে নতুন শিক্ষার্থীদের পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। চীনের সংগ্রামে

জাপানীরা যে-সব চীন কম্যুনিষ্টদের বন্দী করে, কারাগারে তাদের পড়াবার জন্যে একখানি করে এই বই দেওয়ার ব্যবস্থা তারা করে, যাতে এই বই পড়ার ফলে, সোভিয়েট-রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাদের বিশ্বাস ভেঙ্গে যায়। এই একখানি বই, একটি বিরাট সেনা-বাহিনীর মত, সোভিয়েট রাশিয়ার অস্তিত্বকে প্রতিবাদ করে দাঁড়ালো।

এই সঙ্গে রাশিয়ার ভেতরে প্রচারের জন্য মাটির তলায় গোপন প্রেস থেকে একটি দুটি করে সোভিয়েট-বিরোধী সংবাদ-পত্রও প্রকাশিত হতে লাগলো।

বিংশ পরিচ্ছেদ

গালিয়া থেকে আমরা শুভ সমাচার এনেছি···

প্রিন্‌কিপোর হেড কোয়াটার্স থেকে ট্রটস্কী সেই বিরাট ষড়যন্ত্রের প্রত্যেকটি অঙ্গ পরিচালনা করতে লাগলেন। এবং এই কাজে তাঁর সব চেয়ে বেশী সহায় হলো, তাঁর পুত্র সিডভ্।

ষ্টালিনের বিরুদ্ধে ট্রটস্কীর এই সুগভীর বিদ্বেষকে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের ষোল-আনা তাদের কাজে লাগাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়লো। সেই জন্যে এই একটি লোককে কেন্দ্র করে য়ুরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের গুপ্তচর বিভাগ স্ব স্ব স্বার্থের আনুকূল্যে যে বিরাট ষড়যন্ত্রের জাল বুনে তুলতে লাগলো, তার ধারাবাহিক ইতিহাস যদি কোন দিন প্রকাশিত হয়, তাহলে দেখা যাবে যে সে-রকম একটা জট-পাকানো চক্রান্ত জগতের ইতিহাসে আর ঘটে নি। ষড়যন্ত্রের মধ্যে ষড়যন্ত্র, চক্রের মধ্যে চক্র য়ুরোপের প্রকাশ্য রাজনৈতিক জীবনের আড়ালে গুপ্তচরেরা এমনি এক রহস্যঘন পরিস্থিতির সৃষ্টি করলো যে, কে গুপ্তচর আর কে সাধু, তা চিনে ওঠা মুস্কিল হয়ে উঠলো। গত একশো বছরের য়ুরোপের জীবনে গুপ্তচরদের এত বেশী কর্মতৎপর হতে আর কখনো দেখা যায় নি। এই যুগটাকে য়ুরোপের রাজনীতিতে গুপ্তচরদের যুগ বলা যেতে পারে। এবং সেদিন য়ুরোপের রাজনীতি গুপ্তচর আর ষড়যন্ত্রকারী রাজনৈতিকদের হাতে যে রূপ পরিগ্রহণ করে, তাতে প্রাচ্য জগৎ ভীত ও শঙ্কিত হয়ে ওঠে এবং রাজনীতির এই প্রাণহীন সংগোপন প্রবঞ্চনার ভয়াবহ পরিণতির বিরুদ্ধেই ভারতবর্ষে মহাত্মাজী দিবালোকের মত স্বচ্ছ, প্রাণধর্মে বলিষ্ঠ, নতুন এক রাজনীতির প্রবর্ত্তন করেন।

সে-কথা এখানে অবান্তর। এখন আমাদের মূল কাহিনীতে ফিরে আসা যাক্।

য়ুরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের গুপ্তচর-বিভাগ ট্রটস্কীর সঙ্গে যোগসাধন করবার জন্যে তৎপর হয়ে উঠলো। ট্রটস্কীও তাদের মধ্যে থেকে তাঁর স্বার্থ বুঝে বন্ধু খুঁজে বার করতে সচেষ্ট হলেন।

জার্মাণীতে তখন হিটলারের শক্তি পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছে। সামান্য একজন সৈনিক থেকে হিটলার যুদ্ধে-সর্ব্বস্বান্ত লাঞ্ছিত জার্মাণীকে আবার এক নতুন আশ্বাসে সঞ্জীবিত করে তুলেছেন। এবং তাঁর গোপন মনে তখন থেকেই য়ুরোপব্যাপী এক জার্মাণ-রাষ্ট্রের স্বপ্ন তিনি লালন-পালন করে চলেছেন।

জার্মাণীতে তখনও পর্য্যন্ত সোভিয়েটের পররাষ্ট্র-বিভাগের দূত ক্রেস্‌টেনস্কী ট্রটস্কীর গোপন প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে চলেছেন। তখনও পর্য্যন্ত ষ্টালিনের সন্দেহ তাঁর ওপর পড়েনি। ক্রেস্‌টেনস্কীর মারফতই ট্রটস্কী জার্মাণ সমর-বিভাগ থেকে গোপন চুক্তি অনুযায়ী অর্থ সংগ্রহ করে চলেছেন এবং তার পরিবর্ত্তে ক্রেস্‌টেনস্কী জার্মাণ গুপ্তচর-বিভাগকে প্রয়োজনীয় গুপ্ত সংবাদ বিক্রয় করেছেন। রীতিমত ব্যবসা···ওজন করে দেওয়া-নেওয়া।

পরে যখন ক্রেস্‌টেনস্কী ধরা পড়েন এবং অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে তাঁরও বিচার চলে, তখন তিনি প্রকাশ্য বিচারালয়ে স্বীকার করেন, ১৯২২ থেকে আরম্ভ করে ১৯৩০ পর্য্যন্ত, জার্মাণ সমর-বিভাগ থেকে তাঁরা ২০ লক্ষ স্বুবর্ণ মার্ক পেয়েছিলেন।

এই সময় ট্রটস্কী তাঁর পুত্র সিডভ্‌কে বার্লিনে পাঠান, বার্লিন থেকে সোভিয়েটের ভিতরে তাঁদের দলকে চাঙ্গা করে তোলবার জন্যে। ছাত্রের ছদ্মবেশে সিডভ্ বার্লিনের এক প্রান্তে একটা আলাদা বাসা ভাড়া নিলেন। কোন জার্মাণ বৈজ্ঞানিক-পরিষদে কাজ শেখবার জন্যে তিনি এসেছেন, সেই মর্ম্মেই পাসপোর্ট জোগাড় করেছিলেন।

সরকারী ভাবে তখনও পর্য্যন্ত জার্মাণী ডেমোক্রাসী-রূপেই পরিচিত। এবং সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে তার বাণিজ্য-চুক্তি অনুযায়ী দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য-গত আদান-প্রদান পুরামাত্রায় চলেছে। রাশিয়ায় ষ্টালিন তখন পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী নতুন নতুন শিল্প ও কল-কারখানার আয়োজনে ব্যস্ত। সেই শিল্প-প্রসারের কাজে জার্মাণ কারখানা থেকে ভারে ভারে যন্ত্রপাতি রাশিয়াতে যাচ্ছে। এবং রাশিয়াতে নতুন খনি সংক্রান্ত এবং বৈদ্যুতিক শিল্প সংক্রান্ত

যে সব কাজ সুরু হয়েছিল, তা পরিচালনা করবার জন্যে জার্মাণী থেকে বিশেষজ্ঞদের আনিয়ে সেই সব প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বমূলক পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তাই সেই সময় রাশিয়া থেকে যেমন দলে দলে ব্যবসায়ী যন্ত্রপাতি কেনবার জন্যে জার্মাণীতে আসছিল, জার্মাণী থেকেও তেমনি বিশেষজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক এবং কারিকরের দল রাশিয়াতে যাচ্ছিল। রাশিয়ার সেই সব নতুন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের বহু দায়িত্বমূলক উচ্চপদ তখন জার্মাণ বিশেষজ্ঞদের হাতেই ছিল। ট্রটস্কীর লক্ষ্য হলো, এই সব জার্মাণ-বিশেষজ্ঞদের হাত করে, রাশিয়ার সেই সব নতুন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কাজে বিঘ্ন ঘটিয়ে ষ্টালিনের পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনাকে ভূমিসাৎ করা। সেই উদ্দেশ্যেই যোগাযোগ স্থাপন করবার জন্যে তিনি সিডভ্‌কে বার্লিনে পাঠান।

পুত্রের স্মৃতিরক্ষার জন্যে ট্রটস্কী নিজেই তাঁর পুত্রের একটি ছোট জীবন-কাহিনী রচনা করেন। সেই জীবনীতে তিনি নিজে এই ব্যাপার সম্পর্কে লিখেছেন, বার্লিনে সিডভ্‌ অতন্দ্রভাবে সারা দিন খুঁজে বেড়াতো, কোথায় কি ভাবে রাশিয়ার সঙ্গে নতুন যোগসূত্র স্থাপন করা যায়। তার জন্যে সে টুরিষ্টদের মেসে মেসে, রেল-ষ্টেশনে, ছাত্রাবাসে, যেখানে রুশ-ছাত্ররা পড়াশুনা করবার জন্যে আসতো, বিদেশী রাষ্ট্রের দফতরে দফতরে ছদ্মবেশে সর্ব্বদাই ঘুরে বেড়াতো। জার্মাণ এবং রুশ গুপ্তচরদের হাত এড়াবার জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকে রাস্তায় রাস্তায় লুকিয়ে বেড়াতে হতো। এই সময় রাশিয়া থেকে এক দল সরকারী লোক জার্মাণীর সঙ্গে বাণিজ্য-চুক্তির ব্যাপারে বার্লিনে আসে। সেই দলের মধ্যে একজন বিশিষ্ট অফিসার ছিলেন স্মার্ণভ।

ট্রটস্কী যখন রাশিয়ায় ছিলেন তখন স্মার্ণভ ছিল তাঁর দলের একজন প্রধান কর্ম্মী। সন্দেহক্রমে স্মার্ণভ কারারুদ্ধ হয়। কারাবাসকালে স্মার্ণভ এক ফন্দী করে নিজের মুক্তি অর্জ্জন করে। নিজের দোষ স্বীকার করে প্রকাশ্য ভাবে ট্রটস্কীকে পরিত্যাগ করবার সঙ্কল্প জানায় এবং এই ভাবে পুনরায় পার্টিতে প্রবেশ লাভ করে। ট্রটস্কীর দলের অনেক প্রধান কর্ম্মী এই ফন্দী অবলম্বন করে। পার্টিতে পুনঃ প্রবেশ করে তারা দলের বিশ্বাস অর্জ্জন করে কিন্তু ভেতরে-ভেতরে তারা ট্রটস্কীর দলেরই লোক থেকে যায়। ট্রটস্কীর পরামর্শ অনুযায়ীই তারা এই ফন্দী অবলম্বন করে এবং তার ফলে সোভিয়েট রাষ্ট্রের বহু দায়িত্বপূর্ণ পদে তখনও পর্য্যন্ত এই ভাবে ট্রটস্কীর বহু অনুচর কাজ করছিল। তাদের ওপরই ছিল ট্রটস্কীর প্রধান ভরসা। স্মার্ণভ নিজের যোগ্যতায় অচিরকালের মধ্যেই রাশিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্য-কমিশনে বিশেষ সভ্যরূপে মনোনীত হয় এবং সেই সময় এক বাণিজ্য-চুক্তির ব্যাপারে তাকে বার্লিনে আসতে হয়।

সিডভ্‌ যথাকালে এই সংবাদ পায় এবং গোপনে স্মার্ণভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে শহর থেকে দূরে এক রিয়াব হলে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে। স্মার্ণভের সঙ্গে দেখা করে সিডভ্‌ ট্রটস্কীর পরিকল্পনার কথা তাকে জানায়। ট্রটস্কীর সঙ্গে যোগসূত্র মাঝখানে ছিন্ন হয়ে যাওয়ার দরুণ স্মার্ণভ ট্রটস্কীর তদানীন্তন পরিকল্পনার কথা কিছুই জানতো না। সিডভের কাছে জানতে পারলো যে, ট্রটস্কী পুনরায় আঘাত করবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন এবং একটা পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি অগ্রসর হয়ে চলেছেন। সেই পরিকল্পনাকে তিনটি প্রধান অংশে ভাগ করা যায়; প্রথম হলো, রাশিয়ার ভেতরে সোভিয়েট-বিরোধী যে-সব বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আছে, যেমন মেনসেভিক দল, জেনোভিভের দল, বুখারিনের দল, সোশ্যাল রেভলিউস্যানারীর দল এবং ট্রটস্কীর দল, তাদের সকলকে একত্র করতে হবে, সূক্ষ্ম রাজনৈতিক মতবাদের চুলচেরা ঝগড়া পরিত্যাগ করে ষ্টালিনের বিরুদ্ধে তাদের সকলের শক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে। দ্বিতীয় হলো, এত দিন শুধু প্রচারকার্য্যের মধ্যে দিয়ে যে-আন্দোলন চলেছিল, এখন থেকে তাকে সামরিক মূর্তি দিতে হবে। অর্থাৎ টেরারিজমের সাহায্যে প্রতিপক্ষ দলের প্রধান ব্যক্তিদের হত্যা করতে হবে। তৃতীয় হলো, পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী যে-সব নতুন কল-কারখানা হয়েছে, যন্ত্রপাতি ভেঙ্গে অথবা সরিয়ে ফেলে তাদের কাজকে অচল করতে হবে; তার জন্যে এই সব প্রতিষ্ঠানের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে যে-সব অফিসার আছে, তাদের দলে আনতে হবে। তিন দিক থেকে এই ভাবে আক্রমণ করে শাসন-যন্ত্রকে বিকল করে দিতে হবে।

সিডভ্‌ ট্রটস্কীর নির্দ্দেশ অনুযায়ী স্মার্ণভকে জানালো যে, আপাতত স্মার্ণভের কাজ হবে, রাশিয়ায় ফিরে গিয়ে দলের প্রধান কর্ম্মীদের এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সজাগ করে তোলা এবং রাশিয়া থেকে দলের কাজের সংবাদ নিয়মিত ভাবে বিশ্বস্ত দূত মারফৎ বার্লিনে পাঠানো। সিডভ্‌ বার্লিনে সেই সংবাদ গ্রহণ করবার জন্যে অপেক্ষা করবে এবং বার্লিন থেকে ট্রটস্কীকে এই সংবাদ জানানো হবে। এই সব গোপন দূতদের অভিজ্ঞানের জন্যে সিডভ্‌ নতুন এক সাঙ্কেতিক বাণী তৈরী করলো, তারা বলবে গালিয়া থেকে আমরা শুভ সমাচার এনেছি।

সেই বিয়ার হলের সাক্ষাৎ শেষ হবার আগে সিডভ্‌ স্মার্ণভকে আর একটা কাজের ভার দিলেন। সেই সময় বার্লিনে রাশিয়া থেকে যে ট্রেডমিশন এসেছে, তার অধিনায়কের কাছে এই সংবাদটুকু পৌঁছে দিতে হবে যে, সিডভ্‌ বার্লিনেই আছে এবং তাঁর সঙ্গে একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপারে পরামর্শ করতে চায়।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

শব্দের অর্থ নিয়ে সূক্ষ্ম নৈতিক বাদ-বিচার করা বিপ্লবীর শোভা পায় না।

এই ট্রেডমিশনের অধিনায়ক হয়ে যিনি এসেছিলেন, পিতার কাছ থেকে সিডভ জানতে পারে যে, সেই ব্যক্তি ট্রটস্কীর একজন বিশেষ ভক্ত এব' একদিন তাঁরই অনুচর ছিলেন। নাম যুরি পিয়াটাকভ্‌।

স্মার্ণভ পিয়াটাকভের অফিসে গিয়ে গোপনে সিডভের বার্ত্তা পৌঁছে দিল। পিয়াটাকভ দেখা করতে রাজী হলো, "আম-জু" নামে একটা কাফেতে এই গোপন সাক্ষাৎকার হবে স্থিরীকৃত হলো।

সেই কাফেতে সিডভ পিয়াটাকভকে জানালো যে, তার পিতার নির্দ্দেশ মত, পিতার প্রতিনিধি হিসাবেই তাঁর সঙ্গে সে দেখা করতে এসেছে। উদ্দেশ্য, তাঁকে জানানো যে, ষ্টালিনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য ট্রটস্কী পুনরায় আয়োজন করেছেন। এবং সিডভ সোজাসুজি পিয়াটাকভকে জিজ্ঞাসা করলো, ট্রটস্কী জানতে চান, আপনি এই সংগ্রামে তাঁর পক্ষে কোন অংশ গ্রহণ করতে চান কি না?

হঠাৎ এই প্রস্তাবে পিয়াটাকভ প্রথমে হাঁ বা না কিছুই বলতে পারেন নি। তাঁকে কিছু দিন ভাববার সময় দিয়ে সিডভ দ্বিতীয় বার তাঁর সঙ্গে দেখা করলো এবং জানালো যে পরিকল্পনা অনুযায়ী ট্রটস্কী অগ্রসর হচ্ছেন তাতে তাঁদের সহযোগিতা তিনি একান্ত ভাবেই কামনা করেন। এবং তাঁর স্থির বিশ্বাস যে, অচিরকালের মধ্যেই তিনি কৃতকার্য্য হবেন। তাঁর ওপর ট্রটস্কীর কতখানি আশা আছে, সে-কথা কৌশলে উত্থাপন করে সেই নবীন ষড়যন্ত্রকারী আসল দরকারের কথা উত্থাপন করলো, আপনি বুঝতেই তো পারছেন, এ-জাতীয় ষড়যন্ত্রে টাকার কতখানি প্রয়োজন। বাবা আশা করেন সেই দিক দিয়ে, আপনি যথেষ্ট তাঁকে সাহায্য করতে পারেন।

পিয়াটাকভ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে, আমার দ্বারা এত টাকা সাহায্য করা কি ভাবে সম্ভব হতে পারে?

সিডভ্‌ ট্রটস্কীর পরামর্শ অনুযায়ী তার পন্থা পিয়াটাকভের সামনে উপস্থিত করে, সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের বাণিজ্য-প্রতিনিধি হিসাবে তাঁকে বড় বড় অর্ডারগুলি তাদের নির্দিষ্ট জার্মাণ ফার্মকে দিতে হবে। এই রকম দুটি জার্মাণ ফার্মের সঙ্গে তাদের বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছে, একজনের নাম বোরোসিগ আর একজনের নাম ডেমাগ। দুটিই খুব বড় প্রতিষ্ঠান। অর্ডার দেবার সময় পিয়াটাকভকে দাম বেশী করেই ধরতে হবে। বোরোসিগ আর ডেমাগের কাছ থেকে ট্রটস্কী কমিশন বাবদ সেই বাড়তি টাকাটা আদায় করে নেবেন এবং তারা দিতেও রাজী হয়েছে। এই ভাবে পিয়াটাকভ. যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করতে পারেন। পিয়াটাকভ-সম্মত হলেন।

পিয়াটাকভের সঙ্গে বন্দোবস্ত পাকাপাকি করে সিডভ আর দু'জন সোভিয়েট অফিসরকে এই গোপন-চক্রের অন্তর্ভুক্ত করবার জন্যে সচেষ্ট হলো। একজন হলেন, এ্যালেক্সী শেষ্টভ, পিয়াটাকভের অধীনে যে ট্রেডমিশন এসেছিল, শেষ্টভ তার মধ্যে এঞ্জিনীয়ার ছিলেন। আর একজন হলেন, বেসোনভ, তিনিও সোভিয়েট বাণিজ্য সংক্রান্ত আর এক মিশনে তখন বার্লিনে এসেছিলেন।

বার্লিনে সোভিয়েট রাশিয়ার যে বাণিজ্য-দফ্‌তর ছিল, বেসোনভ তাব একজন প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা। এই দফতরের মারফৎ য়ুরোপের আরও দশটি রাষ্ট্রের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার বাণিজ্য-সম্বন্ধ বজায় ছিল। সুতরাং সংবাদ আদান-প্রদানেব কাজে বেসোনভই সব চেয়ে বেশী সাহায্য করতে পারেন। স্থির হয় যে, রাশিয়া থেকে সমস্ত সংবাদ বেসোনভের মারফৎ সিডভ্‌ বা ট্রটস্কীর কাছে পৌঁছবে।

ছাত্রাবস্থাতেই শেষ্টভ ট্রটস্কীর দলে যোগদান করেন এবং সেই দিন থেকেই তাঁর ওপর ট্রটস্কীর ব্যক্তিগত প্রভাব রীতিমত ভাবেই প্রতিফলিত হয়। ট্রটস্কীর পূর্ব-ভক্তদের মধ্যে তিনি একজন প্রধান ছিলেন। তারপর নানা কারণে তাঁর সঙ্গে মাঝখানে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

সিডভ্‌ যখন তাঁর সঙ্গে বার্লিনে দেখা করে, তখন শেষ্টভ সোভিয়েট রাশিয়ার একটা অতি প্রয়োজনীয় পদে অধিষ্ঠিত। নতুন পরিকল্পনায় সাইবেরিয়াকে উন্নত করবার জন্যে যে ট্রাষ্ট গঠিত হয়, শেষ্টভ সেই ট্রাষ্টের একজন বিশিষ্ট সভ্য।

সিডভ্ শেষ্টভের কাছে প্রস্তাব করলো যে, তাঁকে একজন জার্ম্মাণ ব্যবসায়ীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। সেই জার্ম্মাণটির নাম হলো ডেহ্‌ল্‌ম্যান্। মস্ত-বড এক জার্ম্মাণ ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্ম্মের কর্ত্তা। এই ফার্ম্মের বহু জার্ম্মাণ বিশেষজ্ঞ সাইবেরিয়ার খনিতে তখন কাজ করছে।

সিডভ জানালো, রাশিয়ায় ফিরে যাবার আগে, ডেহ্‌ল্‌ম্যানের সঙ্গে তাঁর কথাবার্ত্তা সব ঠিক করে যেতে হবে। সাইবেরিয়ায় সোভিয়েট অর্থনৈতিক বিপত্তি ঘটাবার কাজে ডেহ্‌ল্‌ম্যান তাঁদের সব চেয়ে বড় সহায়। ডেহ্‌ল্‌ম্যানের সাহায্যের মূল্যস্বরূপ শেষ্টভকে সাই-বেরিয়ার খনি-সংক্রান্ত গোপন সংবাদ তাকে সরবরাহ করতে হবে।

সিডভের প্রস্তাবে শেষ্টভ প্রথমে সচকিত হয়েই ওঠে। বলে, তোমার প্রস্তাব স্বীকার করার অর্থ হচ্ছে স্পাই হওয়া।

পাকা ষড়যন্ত্রকারীর মত সিডভ্ বলে, স্পাই! টেরারিষ্টদের অভিধানে ওর অর্থ আল্‌দা। সামান্য একটা "শব্দ" নিয়ে এত বাদ-বিচার করা বিপ্লবীদের শোভা পায় না। যদি টেরারিজিম্‌কে গ্রহণ করতে আপনার আপত্তি না থাকে, তাহলে প্রতিপক্ষের অর্থ-নৈতিক জীবনের ভিত্তির মূলে আঘাত করতে, যে-কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হোক্ না কেন, তার নৈতিক মূল্য যাচাই করবার কোন দরকার নেই। এর মধ্যে সূক্ষ্ম নৈতিক বাদ-বিচারের স্থান নেই।

শেষ্টভের মনের মধ্যে তখনও যে দ্বন্দ্ব চলছিল, তা বোঝা যায়, তার কয়েক দিন পরে যখন স্মার্ণভের সঙ্গে শেষ্টভের দেখা হয়। স্মার্ণভকে সব কথা জানিয়ে শেষ্টভ তার পরামর্শ চায়। বলে, সিডভের প্রস্তাব মত আমাকে ডেহ্‌ল্‌ম্যানের সঙ্গে যোগ দিতে হবে···ডেহ্‌ল্‌-ম্যান স্পাইগিরি আর স্যাবোটাজ করছে···আমাকে তাই করতে হবে···

সিডভের মত স্মার্ণভও বলে ওঠে, ও-কথা দুটোর মধ্যে কি আছে? আসল কথা হলো, সংগ্রাম এবং সংগ্রামে জয় লাভ করা। সময় চলে যাচ্ছে, ষ্টালিনের হাত থেকে যদি আধিপত্য কেড়ে নিতে হয় তো এই সময়···এখন কথা নয়, কাজ করতে হবে···তার জন্যে যদি জার্ম্মাণদের সাহায্য নিতে হয়, দোষ কি তাতে?

এই সাক্ষাৎকারের পর দেখি, শেষ্টভ জার্ম্মাণ সামরিক গুপ্তচর-বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছে। সেখানে তার গোপন নাম হয়েছে আলোয়সা।

মস্কোতে ফিরে যাবার সময় শেষ্টভ গোপনে ট্রটস্কীর একটি চিঠি সঙ্গে করে নিয়ে যায়, পিয়াটাকভ্‌কে দেবার জন্যে। পিয়াটাকভ্ তার আগেই মস্কোতে ফিরে গিয়েছিলেন। শেষ্টভ জুতোর সুখতলার নীচে চিঠিটা লুকিয়ে নিয়ে যায়। সেই চিঠিতে ট্রটস্কী পিয়াটাকভ্‌কে ষ্টালিনবিরোধী বিভিন্ন দলকে কি ভাবে একত্র করতে হবে এবং তারা কি ভাবে কাজে অগ্রসর হবে, তার নির্দ্দেশ দিয়ে দিয়েছিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

য়ুরোপ নাৎসী-বিভীষিকার অভ্যুদয়।

এই ভাবে প্রিনকিপোর হেড কোয়ার্টার্স থেকে ট্রটস্কী ষ্টালিনের শাসন উচ্ছেদ করবার জন্যে সারা য়ুরোপব্যাপী এক বিরাট ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে চললেন।

পূর্ব্বেই বলেছি, এই চক্রান্তের তিনটি বিভিন্ন অঙ্গ—

প্রথম অঙ্গ হলো, ষ্টালিন-বিরোধী বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন দলকে একত্র করা।

দ্বিতীয় হলো, গুপ্তহত্যার দ্বারা সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধান ব্যক্তিদের সরিয়ে ফেলা।

তৃতীয় হলো, স্যাবোটাজের দ্বারা পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনাকে ভূমিসাৎ করা।

এবং এই তিনটি ব্যবস্থার দ্বারা রাশিয়ার মধ্যে যে অসহায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে, তার মধ্যে শাসন-যন্ত্রকে অধিকার করে নেওয়া।

১৯৩২-৩৩ থেকে কয়েক বৎসর কাল য়ুরোপের প্রধান সংবাদপত্রগুলোর প্রতিদিনের সংখ্যার যদি পাতা উল্টে যাওয়া যায়, তাহলে তাদের প্রত্যেক পাতা থেকে এক-জাতীয় সংবাদ ছোট-বড়-মাঝারি হরফে অনবরত চোখে পড়বে, সে হলো গুপ্ত-হত্যা আর হঠাৎ আক্রমণের সংবাদ। একটা মারাত্মক ব্যাধির মড়কের মত গুপ্তহত্যার বীজ য়ুরোপের প্রত্যেক রাজধানীতে যেন অকস্মাৎ ছড়িয়ে পড়লো। মাটির তলায় অন্ধকারে যে কালনাগিনীরা এত কাল লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে বিষ সঞ্চয় করছিল, তারা যেন সহসা অন্ধকার আবরণ ত্যাগ করে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়লো। য়ুরোপের রাজনীতি এই হিংসা আর হত্যার বিষে জর্জ্জরিত হয়ে বিষকন্যার মত মানব-সভ্যতাকে আলিঙ্গন-বদ্ধ করলো। তার স্পর্শ যে সমুদ্র পেরিয়ে আমাদের দেশের হাওয়াকে কলুষিত করে নি, তা নয়, তবে আমাদের পরম

সৌভাগ্য যে সেই সময় এই সুপ্রাচীন সভ্যতার অবিনশ্বরতার অন্তর থেকেই যেন এক নীলকণ্ঠ মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করলেন, যিনি জগতের উপহাসকে মাথায় নিয়ে তারস্বরে ঘোষণা করলেন, এই বিষ-তন্ত্রের বিরুদ্ধে অমৃত-তত্ত্ব, উদ্দেশ্য আর উপায়ের অন্তর্নিহিত মঙ্গল বার্ত্তাকে নতুন করে জগতের সামনে তুলে ধরলেন। ভারতবর্ষকে উপদেশ দিলেন, পথভ্রান্ত য়ুরোপকে উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিতে, উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য যে-কোন উপায়ই উপায় নয়। মহাকালের রাজত্বে আজকের জয়লাভটাই সব চেয়ে বড় কথা নয়। মনুষ্যত্বকে খর্ব করে মানবকে উদ্ধার করবার এই উন্মত্ত অভিযান, এ অভিযান থেকে ভারতবর্ষকে সরে দাঁড়াতে হবে। আজ থেকে কয়েক যুগ পরে যখন সভ্যতার ইতিহাস-লেখক, এশিয়া আমেরিকা য়ুরোপ আর আফ্রিকা এই চারিটি মহাদেশের সমস্ত ঘটনাকে একসঙ্গে চোখের সামনে দেখতে পাবেন, তখন তাঁর প্রসারিত দৃষ্টির সামনে বিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদে মহাত্মাজীর কল্যাণ-অস্তিত্ব, শুধু ভারতবর্ষের দিক থেকে নয়, বিশ্ব-সভ্যতার সেই আত্মিক অপমৃত্যুর যুগে সব চেয়ে আবশ্যকীয় ব্যাপার বলে প্রতিভাত হবে।

কিন্তু এখানে, সে-কথা হয়ত আজ অপ্রাসঙ্গিক বোধ হবে। তাই সে-কথা থাক।

য়ুরোপের সেই ভয়াবহ অনিশ্চয়তার মধ্যে কখন যে কি পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, সেদিন কেউ তা বলতে পারতো না। সবই যেন এক ভয়াবহ অনির্দ্দিষ্টতার চক্রান্তে চলেছে। আজ রাষ্ট্রের যে গঠন আছে, কালই তা পরিবর্ত্তিত হয়ে যেতে পারে; আজ যে জন-নায়ক, কাল সে নির্বাসিত অথব নিহত; যে নির্বাসনে আছে, সে হঠাৎ আক্রমণের ফলে হয়ত পুনরায় শাসন-যন্ত্র অধিকার করে নিতে পারে: হত্যা, ষড়যন্ত্র, গোপন-চক্রান্ত, হঠাৎ আক্রমণ···সমস্ত য়ুরোপ যেন ফুটন্ত কড়ার মত টগবগ করে তখন ফুটছে।

এই নতুন আবহাওয়ার ঝঞ্ঝা-কেন্দ্র হলো বার্লিন। হিটলার তাঁর রাজনৈতিক অভ্যুদয়ের একটা নৈতিক পটভূমি রচনা করবার জন্যে জার্ম্মাণ-দার্শনিক প্রতিভাকে কাজে লাগলেন। সাম্যবাদের অন্তর্নিহিত মানব-কল্যাণের যে মন্ত্র আছে, সাম্যবাদীদের যতই নিন্দা করা যাক না কেন, তাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। তাই তার পরিবর্ত্ত হিসাবে একটা নতুন কিছু দার্শনিক তত্ত্ব খাড়া করা চাই। হিটলারের অনুপ্রেরণায় এক শ্রেণীর জার্ম্মাণ কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, প্রচারক সারা য়ুরোপের মধ্যে নতুন আর্য্যামির এক তত্ত্ব প্রচার করতে লেগে গেল। কিন্তু সেই সব ভাবগত ধাপ্পাবাজীর আড়ালে য়ুরোপের বাস্তব জীবন এক ভয়াবহ অনিশ্চয়তার ষড়যন্ত্রে চঞ্চল হয়ে উঠলো। প্রত্যেক দেশে হিটলার তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশ-বৈরী একটা সংগোপন কেন্দ্র গড়ে তুলতে লাগলেন, যারা বাইরে থেকে তিনি যখন আক্রমণ করবেন, ভেতর থেকে তাঁকে সাহায্য করবে। বর্ত্তমান রাজনৈতিক জগতের কুৎসিততম প্রাণী, নতুন পরিভাষায় যাদের পঞ্চম বাহিনী বলা হয়, এই ভাবেই সেদিন তাদের উদ্ভব হয়। য়ুরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন নামে তারা সেদিন শক্তি সঞ্চয় করছিল।

ফ্রান্সে তাদের নাম ছিল, Caogoulards এবং Croix de Feau;

ইংলণ্ডে তাদের নাম ছিল, Union of Facsists;

বেলজিয়ামে তাদের নাম ছিল, Rexists;

পোলাণ্ডে তাদের নাম ছিল, POW;

চেকোশ্লোভাকিয়ায় তাদের নাম ছিল, Henlinists এবং Illinka Guards;

নরওয়েতে তাদের নাম ছিল, Quislingites;

রুমানিয়াতে তাদের নাম ছিল, Iron guards,

বুলগেরিয়াতে তাদের নাম ছিল, IMOR;

ফিনল্যাণ্ডে তাদের নাম ছিল, Lappo;

লুথিয়ানিয়াতে তাদের নাম ছিল, Iron Wolf;

লাটভিয়াতে তাদের নাম ছিল, Fiery Cross,

বিভিন্ন নাম এবং বিভিন্ন দেহ হলেও, তাদের প্রত্যেকের হৃদ্‌স্পন্দন নাৎসী জার্মাণীর সঙ্গে বিজড়িত ছিল। এবং তাদের প্রত্যক্ষ প্রোগ্রাম যাই হোক, তাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য ও কামনা ছিল, সোভিয়েট রাশিয়ার উচ্ছেদ।

আজ এ-কথা ভাবলে সত্যি বিস্মিত হয়ে যেতে হয়, এতগুলি শক্তিশালী রাষ্ট্রের এবং দলের বিরোধিতাকে নস্যাৎ করে সোভিয়েট রাশিয়া একক ভাবে আজও পর্য্যন্ত পূর্ণশক্তিতে বিরাজ করছে, তার আদর্শের মধ্যে সত্যিকারের প্রাণবস্তু না থাকলে, তা কখনই সম্ভব হতো না। এবং এই সব ক্ষণস্থায়ী দলের সেই ব্যাপক অস্তিত্ব থেকে অনুমান করা যায় যে, য়ুরোপীয় রাজনীতি তখন গোপন ষড়যন্ত্রের কাছে কি ভাবে আত্মবিক্রয় করেছিল।

যে-সময়ের কাহিনী লিখতে বসেছি, সে-সময় এই নাৎসী শক্তি-উন্মাদনা এবং তার বিরুদ্ধে বোলশেভিক-দের যে-কোন উপায়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা য়ুরোপে হত্যা

আর ষড়যন্ত্রের একটা মড়ক এনে দেয়। হিটলারের শক্তি-অর্জ্জনের মুখে, ১৯৩৩-এর অক্টোবর থেকে পরের বছর অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত, এই এক বছরের মধ্যে য়ুরোপে নাৎসী টেরারিজিমের ফলে যে-সব হত্যাকাণ্ড এবং রাজনৈতিক ব্যভিচার ঘটে, কোন আমেরিকান লেখক তার একটা তালিকা তৈরী করেছেন। সেই তালিকাতে শুধু বড় বড় ঘটনাগুলিরই উল্লেখ করা হয়েছে, অপেক্ষাকৃত ছোট-খাট ঘটনাগুলিকে বাদ দেওয়াই হয়েছে। পাঠকদের কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্যে এখানে সে-তালিকাটি উদ্ধৃত করে দিলাম—

অক্টোবর ১৯৩৩—পোলাণ্ডের Lvov সহরে পোলাণ্ডস্থ সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত এ্যালেক্স ম্যায়লভের হত্যা।

ডিসেম্বর ১৯৩৩—রুমানিয়াতে স্থানীয় নাৎসী দল Iron guard কর্ত্তৃক রুমানিয়ার প্রধান মন্ত্রী আইয়ন ডুকার হত্যা।

ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪—ফ্রান্সে প্যারিস শহরে ফরাসী নাৎসী দল Croix de Feau-এর সশস্ত্র অভ্যুত্থান।

মার্চ্চ ১৯৩৪—এস্তোনিয়াতে নাৎসী-ষড়যন্ত্রের ফলে "Liberty Fighters" দল কর্ত্তৃক হঠাৎ রাজ্য-অধিকারের উদ্দেশ্যে সশস্ত্র আক্রমণ।

মে ১৯৩৪—বুলগেরিয়াতে অনুরূপ ঘটনা।

মে ১৯৩৪—লাটভিয়াতে অনুরূপ ঘটনা।

জুন ১৯৩৪—নাৎসী গোপন দল POW কর্ত্তৃক পোলাণ্ডের গৃহ-সচিব জেনারেল Pierackii-র হত্যা।

জুন ১৯৩৪—পোলাণ্ডে POW কর্ত্তৃক Ivan Babiy-র হত্যা।

জুন ১৯৩৪—লুথিয়ানিয়ায় নাৎসী-ষড়যন্ত্রে Iron Wolf সম্প্রদায়ের হঠাৎ আক্রমণ।

জুন ১৯৩৪—মিউনিক এবং বার্লিনে হিটলার নিজের দলের মধ্যে বিরুদ্ধ প্রভাব আশঙ্কা করে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জার্ম্মাণ সামরিক বিভাগের বহু প্রধান ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। রাতারাতি তাঁদের বুলেট-বিদ্ধ দেহ অদৃশ্য হয়ে যায়।

জুলাই ১৯৩৪—অষ্ট্রিয়ায় হঠাৎ নাৎসী আক্রমণ এবং চ্যান্সেলর Dollfuss-এর হত্যা।

অক্টোবর ১৯৩৪—যুগোশ্লোভিয়ার নাৎসী-বিপ্লবী দল Ustachi-র অভ্যুত্থান এবং যুগোশ্লাভিয়ার রাজা আলেক-জাণ্ডারের হত্যা।

অক্টোবর ১৯৩৪—যুগোশ্লোভিয়ায় নাৎসী-বিপ্লবী দল Ustachi-র দল কর্ত্তৃক ফরাসী পররাষ্ট্র-সচিব Barthou-এর হত্যা।

এই তালিকা থেকে সেই সময়কার য়ুরোপের রাজনৈতিক অবস্থা বুঝতে এক মিনিটেরও বেশী সময় লাগে না। নির্লজ্জ শক্তির বিলাসে রাজ্য বিস্তারের এক প্রচণ্ড লোভে, হিটলার তখন য়ুরোপের চারিদিকে বিষবৃক্ষ রোপণ করে চলেছেন। প্রত্যেক রাজধানীতে তাঁর গুপ্তচরের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানুষের অন্তর্নিহিত গোপন শক্তি-লালসার সুযোগ নিয়ে এই একটি লোক, প্রত্যেক দেশে এক নতুন ধরণের দেশ-দ্রোহীর দল সৃষ্টি করে চলেছে। আজ যে লোক রাত্রিতে শয্যা গ্রহণ করলো, সে যে কাল সকালে উঠে সূর্য্যকে দেখতে পাবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। প্রত্যেক বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতার পেছনে ছায়ার মত মৃত্যু তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে। একমাত্র বুলেটের যুক্তিই চরম যুক্তি।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

হিটলার চাইলেন, ষ্টালিনকে সরাবার কাজে ট্রটস্কীর বিদ্বেষকে কাজে লাগাতে, ট্রটস্কী সেই সুযোগে জার্ম্মাণ সাহায্যে নিজের অবস্থাকে কায়েমী করে নিতে অগ্রসর হলেন।

এই ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের আবহাওয়ায় ট্রটস্কী তাঁর বিপ্লব-প্রতিভা স্ফুরণের যেন চরম সুযোগ দেখতে পেলেন। এই তরঙ্গকে আশ্রয় করেই তাঁকে উঠতে হবে। এক দিকে হিটলার, আর এক দিকে ট্রটস্কী; অন্য আর এক দিকে ষ্টালিন; য়ুরোপের সব প্রত্যক্ষ ঘটনার আড়ালে চলতে লাগলো এই তিনটি অসাধারণ ব্যক্তিত্বের গোপন সংঘর্ষ। সেই সময়কার সংবাদপত্রের প্রকাশিত সাধারণ ঘটনার আড়ালে, আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই তিনটি লোক লোকচক্ষুর অন্তরালে যে ভাবে দাবার চাল দিয়ে চলেছে, সেই ভাবেই "বড়ে"রা নড়ে-চড়ে বসেছে।

ট্রটস্কীকে নিয়ে সেই সময় য়ুরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র বিশেষ ভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ে। সোভিয়েট রাশিয়া থেকে নির্বাসিত এই ভয়ঙ্কর বিপ্লবীটিকে কোন রাষ্ট্রই ভরসা করে আশ্রয় দিতে পারে না। মূর্ত্তিমান ষড়যন্ত্র এবং বিপ্লবের অনির্বাণ শিখার মত এই দুর্জ্ঞেয় লোকটি যে-কোন সময় রাষ্ট্রের বিপর্য্যয়ের কারণ হয়ে উঠতে পারে এবং তার সোভিয়েট-বিরোধী কার্য্যকলাপের জন্যে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে সেই সব রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সম্পর্কও বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে।

অথচ তাঁর নিজের এমন একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব এবং আভিজাত্য-বোধ ছিল যে, কারুর সঙ্গে তাঁর আপোষ করাও সম্ভব হয়নি। হিটলারের মত ট্রটস্কীও চেয়ে-ছিলেন, সর্ব অবস্থায় সর্ব ক্ষেত্রে প্রথম পুরুষের স্থান অধিকার করে থাকতে। সেই পরাজিত, নির্বাসিত অবস্থার মধ্যেও ট্রটস্কী নেপোলিয়ানের মত নিজের শক্তির বৈশিষ্ট্যে নিজেকে অপরাজেয় সেনাপতির মতন জাহির করতেন।

প্রিনৃকিপোতে তিনি যে-বাড়ীতে থাকতেন, তার চারিদিকে এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিলেন, যেন সেখানে কোন নির্বাসিত লোক বাস করে না, সেখানে বাস করেন জগতের একজন প্রধানতম সেনানায়ক। ক্রমশ তুরস্ক গভর্ণমেণ্ট শঙ্কিত হয়েই তাঁকে তুরস্ক থেকে সরে যেতে আদেশ করলো। যে-দেশেই প্রবেশ করেন, সেখানেই বেশী দিন বাস করবার অনুমতি পান না। এক দেশ থেকে আর এক দেশে ভেসে বেড়ান। এই ভাসমান অবস্থার মধ্যে সেই বিরাট ষড়যন্ত্র পরিচালনা করা সম্ভব নয়। কোন এক স্থানে নিজের স্থায়ী হেড কোয়ার্টার্স গড়ে তুলতে হবে। বহু চেষ্টার ফলে ফ্রান্সের সেই সময়ের রাষ্ট্র-নায়কদের কাছে তিনি সহানুভূতি পেলেন। সেই সময় হিটলারের প্রভাবের ফলে ফ্রান্সের মধ্যে সোভিয়েট-বিরোধী একটা শক্তিশালী দল খাড়া হয়ে উঠছিল। এই দলের নেতা-স্বরূপ দালাদিয়ে তখন ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট। দালাদিয়ে ট্রটস্কীকে আশ্রয় দিলেন। দক্ষিণ-ফ্রান্সে পিরাণী পাহাড়ের পাদদেশে স্যাঁৎপ্যালে নামক এক গণ্ডগ্রামে ট্রটস্কী নতুন করে তাঁর হেড কোয়ার্টার্স গড়ে তুললেন।

য়ুরোপ এবং আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রে হিটলার তখন যে-সব গোপন কেন্দ্র গড়ে তুলছিলেন এবং যে সব কেন্দ্রের মধ্যস্থতায় তাঁর চরেরা হত্যার বিভীষিকা ছড়িয়ে চলেছিল, সেই বিরাট আয়োজনের ভার ছিল তাঁর দু'জন বিশ্বস্ত অনুচরের ওপর। একজন হলেন, আলফ্রেড রোজেনবার্গ; দ্বিতীয় জন হলেন, রুডল্ফ হেস্। এই দুইটি লোকের ওপর ভার ছিল নাৎসী জার্ম্মাণীর পররাষ্ট্র বিভাগ। রোজেনবার্গ ছিলেন NSDAP*-এর সর্বময় কর্ত্তা…জগৎ জুড়ে হাজার হাজার যে-সব নাৎসী গুপ্তচর আর স্পাই হিটলারের অভিসন্ধি অনুযায়ী তাঁর ভবিষ্যৎ আত্ম-বিস্তারের পথ তৈরী করে চলেছিল, রোজেনবার্গ ছিলেন তাদের কর্ত্তা। তাঁরই ইঙ্গিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মাটির তলার অন্ধকার জগতে এই সব কালনাগেরা ঘোরা-ফেরা করতো। হেসের ওপর ভর ছিল, হিটলারের প্রতিনিধি-স্বরূপ, পররাষ্ট্র বিভাগের সঙ্গে সমস্ত গোপন চুক্তি পরিচালনা করা।

হিটলার জার্ম্মাণীর সর্বময় ডিক্টেটর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই (১৯৩৩) রোজেনবার্গের দৃষ্টি ট্রটস্কীর উপর গিয়ে পড়লো। ষ্টালিনের চিরশত্রু এই লোকটিকে কি ভাবে তাঁদের কাজে লাগানো যেতে পারে এবং প্রকৃতপক্ষে কতখানিই বা তার শক্তি-সামর্থ তা যাচাই করে দেখা দরকার। ট্রটস্কীও এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। যদিও জার্ম্মাণ সামরিক বিভাগের কাছ থেকে তিনি গোপন চুক্তি অনুযায়ী অর্থসাহায্য পেয়ে আসছিলেন কিন্তু তাঁর আসল উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে এই যোগাযোগ খুব বেশী মূল্যবান ছিল না। আসলে জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁর কোন রাজনৈতিক চুক্তি বা সম্পর্ক তখনও পর্য্যন্ত ছিল না; তাঁর আসল প্রয়োজন ছিল, সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিপ্লব পরিচালনার কাজে জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের সাহায্য। একটা শক্তিশালী রাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়া এই বিপ্লবকে জয়ী করে তোলা অসম্ভব। এবং জার্ম্মাণী এই সাহায্য তাকে করতে পারে একমাত্র এই চুক্তিতে, বিপ্লব কৃতকার্য্য হলে রাশিয়ার অংশ-বিশেষ জার্ম্মাণীকে দিয়ে দিতে হবে।

রোজেনবার্গ ট্রটস্কীর সঙ্গে বোঝাপড়া ঠিক করবার জন্যে ক্রেস্টেনস্কীকে নিযুক্ত করলেন। ক্রেস্টেনস্কী তখন সোভিয়েট পররাষ্ট্র দফতরের সহযোগী কমিশর। সাক্ষাৎভাবে ক্রেস্টেনস্কী নিজে এ সম্পর্কে কিছু করতে পারেন না বলে বার্লিনে বোসনভ্‌কেই তাঁদের দলের মধ্যস্বরূপে রাখা হল। বোসনভের মারফৎ ট্রটস্কীর সঙ্গে তাঁদের কথাবার্ত্তা চলতো। চারদিকে সোভিয়েট গুপ্তচরেরা তাঁদের প্রত্যেককে অনুসরণ করে ঘুরছে। সেই জন্যে অতি সন্তর্পণে এবং অতি সতর্কতার সঙ্গে এই সব কাজ করতে হয়। প্রত্যেক বছরে ক্রেস্টেনস্কী কয়েক সপ্তাহের ছুটি নিতেন, সেই সময় কোন

* নাৎসী পার্টির পররাষ্ট্র দফতরের সংক্ষিপ্ত নাম।

স্বাস্থ্যাবাসে গিয়ে দিন কতক বিশ্রাম করতেন। রোজেনবার্গের প্রস্তাব আসার পর ক্রেস্টেনস্কী সেই বাৎসরিক ছুটি নিয়ে স্বাস্থ্যাবাসে যাবার পথে বার্লিনে এলেন। এবং গোপনে বোসনভের সঙ্গে দেখা করে জানালেন, যেমন করেই হোক খুব তাড়াতাড়ি ট্রটস্কীর সঙ্গে তাঁর দেখা করিয়ে দিতে হবে।

বোসনভ্ নিজেদের চর মারফৎ ট্রটস্কীর সঙ্গে ক্রেস্টেনস্কীর গোপন সাক্ষাৎকারের আয়োজন স্থির করলেন। ফ্রান্স আর ইতালীর সীমান্তের কাছে, মেরানো শহরে হোটেল ব্যাভেরিয়াতে এই সাক্ষাৎকারের স্থান নির্দিষ্ট হলো। ট্রটস্কী, পুত্র সিডভ্‌কে সঙ্গে নিয়ে ছদ্মবেশে এক জাল পাসপোর্টের সাহায্যে ইতালীর সীমান্ত পেরিয়ে হোটেল ব্যাভেরিয়াতে উপস্থিত হলেন।

এই সাক্ষাৎকারে জার্মাণ গভর্ণমেণ্টের সাহায্য সম্পর্কে আয়োজন ছাড়াও, ট্রটস্কী রাশিয়ার ভেতরে তাঁর দলের প্রধান কর্মীরা কি ভাবে এখন অগ্রসর হবে, তার একটা পরিষ্কার নির্দেশ দিয়ে দিলেন। শুধু জার্মাণ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে নয়, জাপানী গভর্ণমেণ্টের সঙ্গেও এই সম্পর্কে একটা গোপন কথাবার্তা চালাতে হবে। ট্রটস্কী বুঝেছিলেন, সামনেই হিটলার এক বিরাট যুদ্ধের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছে এবং সে-যুদ্ধে জাপান একটা প্রধান অংশ নেবে। এশিয়াটিক রাশিয়ার নিকটতম প্রতিবেশীরূপে জাপান তাঁদের সব চেয়ে বেশী সাহায্য করতে পারে। সুতরাং জাপানের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার জন্যে ট্রটস্কী শোকোলনিকভের সাহায্য নিতে ক্রেস্টেনস্কীকে নির্দেশ দিলেন। শোকোলনিকভ্ তখন সোভিয়েট পররাষ্ট্র দফতরের প্রাচ্য-বিভাগের একজন প্রধান অফিসর। তাঁর সঙ্গে জাপানী রাষ্ট্রদূতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

দ্বিতীয় কাজ রাশিয়াতে ফিরে গিয়ে ক্রেস্টেনস্কীকে করতে হবে, জেনারেল চুকাবেভস্কী তখন সোভিয়েট সামরিক বিভাগের একজন প্রধান ব্যক্তি, রেড-আর্মির চীফ অফ্ ষ্টাফের প্রধান সহকারী। ট্রটস্কীর অনুমান এবং পরিকল্পনানুযায়ী, জার্মাণী যখন রাশিয়া আক্রমণ করবে, তখন তাঁদের দলের পক্ষ থেকে শাসন-যন্ত্র অধিকার করবার জন্যে একটা দলকে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং তারই জন্যে রেড্-আর্মির ভেতরে এখন থেকেই একটা গোপন কেন্দ্র তাঁদের গড়ে তুলতে হবে। ট্রটস্কী জানতেন, এই কাজে তাঁকে সব চেয়ে বেশী সাহায্য করতে পারে চুকাবেভস্কী, কারণ এই লোকটির অন্তরে ছিল দুর্বার ব্যক্তিগত লোভ, শক্তির দুরাকাঙ্ক্ষা। ট্রটস্কী জানতেন, চুকাবেভস্কীর দিবা-স্বপ্নের সঙ্গে জড়িয়েছিল নিজেকে রাশিয়ার সর্বময় পরিচালকরূপে দেখবার কল্পনা। তাই চুকাবেভস্কীর সেই গোপন দুরাকাঙ্ক্ষার সুযোগ নিয়ে তাঁকে তাঁর গোপন দলে আকর্ষণ করে আনতে পেরেছিলেন। যাতে তাঁর দলের প্রধান কর্মীরা গোপনে সর্বতোভাবে চুকাবেভস্কীকে সহায়তা করে, তার জন্যে ট্রটস্কী বিশেষ করে ক্রেস্টেনস্কীকে নির্দেশ দিলেন, কিন্তু চুকাবেভস্কীর গোপন কেন্দ্রে যে সব প্রয়োজনীয় ঘাঁটি থাকবে, তাতে যেন ট্রটস্কীর চিহ্নিত লোকেরাই অধিষ্ঠিত থাকে ; কারণ, বিপ্লব ঘোষণার পর চুকাবেভস্কী যখন শাসনযন্ত্র দখল করে নেবেন, তখন যেন তিনি ট্রটস্কীর সহযোগিতা ব্যতিরেকে একপদও অগ্রসর হতে না পারেন। ষড়যন্ত্রকারীদের বিপদই হলো, তারা সম্পূর্ণভাবে কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না।

পরিশেষে, তাঁর পরিকল্পনার সব চেয়ে প্রয়োজনীয় অঙ্গ সম্পর্কে ক্রেসটেনস্কীকে ফিরে গিয়েই তৎপর হতে আদেশ করলেন—হত্যা এবং স্যাবোটাজ, কালবিলম্ব না করেই সুরু করতে হবে। দুটি জিনিসের ওপর লক্ষ্য রেখে এই কাজ নিষ্পন্ন করতে হবে, একটি হলো, যুদ্ধের সময় হত্যা এবং স্যাবোটাজের দ্বারা রেড-আর্মির সংহত শক্তিকে ভেঙ্গে ফেলতে হবে এবং অপরটি হলো, যাতে বিদেশী রাষ্ট্রের কাছে ট্রটস্কী নিঃসংশয়ে দেখাতে পারেন, রাশিয়ার আভ্যন্তরিক রাজনৈতিক সংগঠনে তাঁর কতখানি ব্যক্তিগত প্রভাব, এবং রাশিয়ার ভেতরে তাঁর দলের লোকের প্রতাপ কতখানি ব্যাপক ও গভীর। তার ফলে তাদের কাছ থেকে সুবিধাজনক সর্ত আদায় করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে।

বেলুনে যেমন পুরামাত্রায় গ্যাস ভরে আকাশে ছেড়ে দেওয়া হয়, তেমনি ধারা ক্রেসটেনস্কীকে খুঁটিনাটি সমস্ত নির্দেশ দিয়ে ঠেসে ট্রটস্কী রাশিয়ার ভাগ্যাকাশে ছেড়ে দিলেন। ফ্রান্স আর ইতালীর সীমান্তবর্তী সেই নগণ্য শহর থেকে ক্রেসটেনস্কী ধূমকেতুর মত রাশিয়ার দিকে অগ্রসর হলো……

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

সুরু হলো মানব-ইতিহাসে জঘন্যতম মনুষ্য-শিকারের খেলা।

রাশিয়াতে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রেসটেনস্কী দলের এক সংগোপন অধিবেশন আহ্বান করলেন এবং সেই অধিবেশনে ট্রটস্কীর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর সমস্ত

পরিকল্পনা ষড়যন্ত্রকারীদের সামনে উপস্থিত করলেন। স্তিমিত সাগরের তলদেশ উচাটন করে জেগে উঠলো তরঙ্গ। প্রতিদিনের অভ্যস্ত নিস্তরঙ্গ জীবনের আড়ালে শহরে শহরে, হোটেলে, ছাত্রাবাসে বিভিন্ন পররাষ্ট্র-বিভাগের দফতরে—সামরিক অফিসরদের মেসে ষড়যন্ত্রের গোপন চাকা দ্রুত চলতে আরম্ভ করলো। সহস্র-আঁখি সোভিয়েট গুপ্তচর-বিভাগ O. G. P. Uও সঙ্গে সঙ্গে সজাগ হয়ে উঠলো।

ক্রেসটেনস্কীর মারফৎ শোকোলনিকভ্ যখন শুনলো, ট্রটস্কী রাশিয়ার ভেতর থেকেই পররাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করবার জন্যে তাকে নির্দ্দেশ দিয়েছেন, সে বিস্মিত ও ভীত হয়ে উঠলো। র‍্যাডেককে বললো, ট্রটস্কী বহুদিন রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন বলে এখনকার অবস্থার কথা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনেননি। O. G. P. Uর চরদের সামনে, পররাষ্ট্র-বিভাগে কাজ করে, বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কোন গোপন কথাবার্ত্তা চালানো একেবারে অসম্ভব ব্যাপার! ট্রটস্কীকে স্পষ্ট ভাবে সে-কথা জানিয়ে দেওয়া দরকার।

র‍্যাডেক শোকোলনিকভ কে আশ্বাস দিয়ে জানান যে, অবিলম্বে তিনি ট্রটস্কীকে এই বিষয় সম্পর্কে পরিকল্পনা বদলাতে লিখবেন।

সেই সময় ভালাডিমির রম্ নামে একজন তরুণ রুশ রুশ-সংবাদ-সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান টাসের ফ্রান্সস্থ প্রতিনিধির কাজ করছিল। ট্রটস্কীর প্রভাবে রম্ ষড়যন্ত্রকারীদের দলে যোগদান করে। এবং তার মারফৎ রাশিয়া থেকে র‍্যাডেক ট্রটস্কীর সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রেখে চলেছিলেন। তাই রমের মারফৎ র‍্যাডেক ট্রটস্কীকে চিঠি লিখে জানালেন, জাপানের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বাইরে থেকে তাঁকেই চালাতে হবে।

সেই সময় জাপানে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি হয়ে কাজ করছিলেন য়ুরেনভ্। ট্রটস্কী য়ুরেনভ্‌কে তাঁর দলে আকর্ষণ করে নেন। য়ুরেনভের কাজের সুবিধার জন্যে ট্রটস্কীর দল রাশিয়া থেকে রাকোভস্কীকে পাঠায়। সেই সময় এক সোভিয়েট ডেলিগেশনের সভ্য হয়ে সে জাপানে আসে। যাবার সময় রাশিয়া থেকে য়ুরেনভের কাছে সরকারী ভাবে পিরাটাকভ্ একখানি চিঠি পাঠান। সাধারণ সরকারী চিঠি। দফতরের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তারূপে পিরাটাকভ্ সেই চিঠিতে য়ুরেনভকে ব্যবসা-সংক্রান্ত কতকগুলি সাধারণ নির্দ্দেশ পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেই চিঠির পেছন দিকে অদৃশ্য কালীতে আর একটি গোপন চিঠি লেখা ছিল। রাকোভস্কীকে দলের গোপন কাজে ব্যবহার করবার নির্দ্দেশ ছিল এই চিঠিতে।

রাকোভস্কীর মধ্যস্থতায় য়ুরেনভ জাপানী সামরিক গুপ্তচর-বিভাগের সঙ্গে যোগ স্থাপনা করলেন। এই ভাবে মস্কো থেকে আরম্ভ করে টোকিও পর্য্যন্ত ক্রমশ একটা বিরাট ষড়যন্ত্রের চক্র গড়ে উঠলো।

যখন এই ভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ট্রটস্কী তাঁর বিরাট ষড়যন্ত্রের কাঠামো গড়ে তুলছিলেন, রাশিয়ার ভেতর তখন ট্রটস্কীর দ্বিতীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী টেরারিজিম এবং স্যাবোটাজ পূরামাত্রায় সুরু হয়ে যায়। ভেবে-চিন্তে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক মানব-হত্যার এ-রকম ব্যাপক আয়োজন ইতিহাসে আর কখনো দেখা যায় নি। গোপন রাজনীতির অবশ্যম্ভাবী পরিণামস্বরূপ এই হত্যা-তন্ত্র সেদিন সোভিয়েট রাশিয়ায় তার চরম মূর্ত্তিতে বিকশিত হয়ে উঠলো। সভ্য মানুষের সংসারে সকলের চোখের সামনে সুরু হলো মনুষ্য-শীকারের মারাত্মক খেলা।

তখন সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট সাইবেরিয়া অঞ্চলে তাঁদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে শিল্প-উন্নয়ন কাজে বড় বড় কারখানা খুলেছেন। মাটির তলা থেকে অনুসন্ধান করে বড় বড় খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। এবং বিপুল ভাবে সেই সব খনিতে তখন কাজ চলেছে। Kuznetsk অঞ্চলের কয়লার খনিতে তখন পুরোদমে কাজ চলেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনায় এই কয়লার খনিটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। সম্প্রতি কিছুদিন থেকে, খনির পরিচালকেরা লক্ষ্য করছিলেন, কোন্ এক অদৃশ্য হাতের ইঙ্গিতে কারখানার কাজ যেন হঠাৎ চলতে চলতে ভেঙ্গে পড়ছে; কোন কোন যন্ত্রের অঙ্গ থেকে রহস্যজনক ভাবে একটা প্রত্যঙ্গই হারিয়ে যাচ্ছে; কোথায় গেল, কি ভাবে গেল, কেউ তার সন্ধানই পায় না। সন্দিগ্ধ হয়ে কর্ত্তৃপক্ষরা, বিশেষ নজর রাখবার জন্যে আলাদা লোক নিযুক্ত করেন।

একদিন সেই কারখানার একজন বিশেষজ্ঞ, Boyarshinov প্রধান পরিচালকের অফিসে এসে স্পষ্ট ভাষায় জানালেন যে, কারখানার মধ্যে নিশ্চয়ই শত্রুপক্ষের লোকেরা নিয়মিত ভাবে স্যাবোটাজ সুরু করেছে। তা না হলে এই রকম নিয়ম করে যন্ত্রগুলো বিকল হয়ে যেতে পারে না।

প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা এই সংবাদের জন্যে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, এই নিয়ে যেন আর কারুর সঙ্গে সে

আলোচনা না করে। যথাযোগ্য স্থানে এর প্রতিকার ব্যবস্থার জন্যে তিনি অবিলম্বে জানাচ্ছেন।

জানালেনও। এই সব কল-কারখানা পরিদর্শন করবার ভার তখন শেষ্টভের ওপর। শেষ্টভই এই বিভাগের সর্বময় কর্তা। কিন্তু তিনি যে তখন গোপনে ট্রটস্কীর হয়ে কাজ করছেন, সে-কথা সোভিয়েট রাষ্ট্রের কেউ-ই তখন সন্দেহ করে নি।

এই ব্যাপারের কয়েক দিন পরে হঠাৎ একদিন দেখা গেল যে, কারখানার এলাকার বাইরে এক নর্দমায় Boyarshinov-এর মৃতদেহ পড়ে আছে। সন্ধ্যার পর কাজ সেরে সে যখন বাড়ী ফিরছিল, তখন হঠাৎ সেই জনবিরল পথে উল্‌টা দিক থেকে একটা ট্রাক সজোরে এসে তাকে আঘাত করে এবং সেই অবস্থাতেই তাকে ফেলে রেখে ট্রাক-পরিচালক অদৃশ্য হয়ে যায়। পরে জানা যায়, শেষ্টভের আদেশে Cherepukhin এই ভাবে তাকে হত্যা করে। চেরিপুখিন ছিল একজন পেশাদার খুনে। বোয়ারশিনভ্‌কে খুন করবার জন্যে পনেরো হাজার রুবল সে পায়। তখন শেষ্টভের হাতে এক লক্ষ চৌষট্টি হাজার রুবলের একটা গোপন ফাণ্ড ছিল। ট্রটস্কীর দলের সশস্ত্র বিপ্লবীরা কিছুদিন আগেই আন্‌জারখা ষ্টেট ব্যাঙ্ক লুঠ করে এই টাকা পায়। এই টাকা থেকেই শেষ্টভ পেশাদার খুনেদের পুষতেন।

তার দু'মাস পরেই সোভিয়েট রাষ্ট্রের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী অথবা চেয়ারম্যান, মোলোটোভ স্বয়ং এই সব খনি এবং কারখানা পরিদর্শনে এলেন। Kuznetsk খনি অঞ্চল থেকে পরিদর্শন সেরে যখন তিনি মোটরে সদলবলে ফিরছেন তখন হঠাৎ একটা ঢালু রাস্তার মোড়ে মোটরটার যন্ত্র বিগড়ে গেল এবং তার ফলে মোটরটা সোজা রাস্তা থেকে ছিটকে সজোরে একটা খাদের একেবারে সীমানায় গিয়ে পড়লো, সেখান থেকে আর কয়েক গজ নীচে সুগভীর খাদ, সেখানে পড়লে মোটর এবং মোটর-আরোহীদের চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকতো না। মোলোটভের সৌভাগ্য, ঠিক সেই খাদের মুখে গিয়ে মোটরটা থেমে গেল, তাঁরা স্থানচ্যুত হয়ে পড়লেন বটে, সামান্য আঘাতও যে লাগলো না, তা নয়। কিন্তু প্রাণে বেঁচে গেলেন।

সেই গাড়ীর চালক ছিল ভ্যালেন্টভক আরনল্ড। লোকটার ট্যাকসীর ব্যবসা ছিল। গাড়ী উল্‌টে মোলোটভকে খুন করবার জন্যেই শেষ্টভ তাকে নিযুক্ত করেন। এই কাজে হয়ত তাকেও মরতে হতো কিন্তু তবুও এই দায়িত্ব সে নিয়েছিল। পরিকল্পনা অনুযায়ী মোটরটিকে সে খাদের কাছে নিয়েও এসেছিল কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে নিজের জীবন-নাশের আশঙ্কায় সে শেষ লাফটা আর দিতে পারে নি। তাই সুনিশ্চিত মৃত্যুর দ্বার থেকে সেদিন য়ুরোপীয় রাজনীতিতে আবার ফিরে আসতে পেরেছিলেন, মোলোটভ।

সারা রাশিয়ার মধ্যে ট্রটস্কীর দলের লোকেরা ষ্টালিন-বিরোধী দলকে একত্র করে এই ভাবে টেররিজিম-এর এক ভয়াবহ জাল বিস্তার করলো।

একটা সুপরিকল্পিত পন্থা অনুসরণ করে যাতে এই হত্যাকার্য্য দ্রুত এগিয়ে চলে, তার ব্যবস্থা ঠিক করবার জন্য সমস্ত বিরোধী দলের প্রধান কর্ম্মীদের নিয়ে এক গোপন বৈঠক বসলো। তাতে একটা তালিকা তৈরী হলো, পর পর কাকে কাকে হত্যা করতে হবে। সেই তালিকার গোড়ার দিকেই ছিল ষ্টালিন, ভরোশিলভ, মোলোটভ, ম্যাকসিম গর্কী প্রভৃতির নাম।

এই সময় ওয়ারশ' থেকে একজন মহিলা রাশিয়াতে এলেন। মহিলাটি Dreitzer-এর ভগিনী। ট্রটস্কী যখন রাশিয়াতে ছিলেন Dreitzer ছিলেন তাঁর প্রধান দেহরক্ষী। এখন তিনি ট্রটস্কীর প্রতিনিধিরূপে ষ্টালিন-বিরোধী দলের একজন প্রধান কর্ম্মী। ভগিনীর মারফৎ তিনি একখানি জার্ম্মাণ ছায়াচিত্রের মাসিক-পত্রিকা পেলেন। সেই পত্রিকাখানির বিশেষ এক পাতার মার্জ্জিনে অদৃশ্য কালীতে একখানি চিঠি লেখা ছিল। সংক্ষিপ্ত চিঠি, তাতে শুধু দলের কর্ম্মীদের নির্দ্দেশ দিয়ে ট্রটস্কী তিনটি প্রধান লক্ষ্যের দিকে নজর রাখতে Dreitzerকে আদেশ করে পাঠিয়েছেন :

প্রথম হলো, ষ্টালিন এবং ভরোশিলভকে অবিলম্বে সরিয়ে ফেলা ;

দ্বিতীয়, রেড-আর্মির ভেতরে ছোট-ছোট কেন্দ্র গড়ে তোলা ;

তৃতীয়, যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যাতে করে শাসন-যন্ত্র দখল করতে পারা যায়, তার জন্যে পূর্বাহ্নেই শাসন-যন্ত্রের ছিদ্র-পথগুলিকে অনুসন্ধান করে রাখা।

চিঠির তলায় স্বাক্ষর ছিল, Starik অর্থাৎ old man…জনৈক বৃদ্ধ…

সেই ছিল তখন দলের মধ্যে ট্রটস্কীর ছদ্মনাম। সেই বৃদ্ধের নির্দ্দেশ অনুযায়ী ষড়যন্ত্রকারীরা ক্রেমলিনের ভেতরে ষ্টালিনের দেহরক্ষী দলের সতর্কতা ভেদ করে অগ্রসর হবার চেষ্টা করতে লাগলো।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

ফরাসী-বিপ্লবের ইতিহাসে আমরা দেখেছি, যে লোক গিলোটিনের প্রবর্তন করলো, তাকেও গিলোটিনে মাথা দিতে হলো। রুশ-বিপ্লবেও সেই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি হলো।

ভরোশিলভ, তখন সামরিক বিভাগের কর্ত্তা, দেশ-রক্ষা বিভাগের কমিশার। ট্রটস্কীর দলের বিপ্লবীরা দিনের পর দিন তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করে আবিষ্কার করলো যে একটা নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়ে অধিকাংশ সময় ভরোশিলভের মোটর যাতায়াত করে। সেই পথের প্রত্যেক মোড়ে একজন করে বিপ্লবীকে মোতায়েন করা হলো। কিন্তু দেখা গেল, ভরোশিলভের মোটর এত দ্রুত যায় যে, সেই অবস্থায় তাঁকে দূর থেকে গুলী করে খুন করা অসম্ভব ব্যাপার। কাজেই সে-পন্থা তাদের ত্যাগ করতে হলো।

ষ্টালিনকে খুন করবার জন্যে তিন-চার বার ইতি-মধ্যেই উদ্যোগ হয়ে যায়। কিন্তু প্রত্যেক বারই বিপ্লবীরা অকৃতকার্য্য হয়। এখানে বিপ্লবী মানে ষ্টালিনের বিরুদ্ধ-পক্ষ ট্রটস্কীর দলকেই বুঝতে হবে। একবার মস্কোতে কম্যুনিষ্ট পার্টির এক বিশেষ অধিবেশনে তাঁকে হত্যা করবার আয়োজন হয়। নির্দ্দিষ্ট হত্যাকারী বহু চেষ্টার ফলে সেই গোপন অধিবেশনে প্রবেশলাভ করে। কিন্তু যেখান থেকে লক্ষ্য করলে গুলী ঠিক গায়ে গিয়ে লাগতে পারে, কিছুতেই ষ্টালিনের তত কাছে গিয়ে সে পৌঁছতে পারলো না। হতাশ হয়েই লোকটিকে সে-যাত্রা ফিরে আসতে হয়। আর একবার বাল্‌টিক সাগরের তীরের কাছাকাছি যখন তাঁর মোটর বোট যাচ্ছিল, সেই সময় কিছু দূর থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে তীব্র বেগ-সম্পন্ন রিভলভার ব্যবহার করা হয় কিন্তু গুলী তাঁর পাশ দিয়ে চলে যায়। গায়ে লাগে না। এই আয়োজনের ভার ছিল বাকায়েভের ওপর। পুলিশের হাত এড়িয়ে বাকায়েভ কামেনেভের কাছে এসে নিজের ব্যর্থতার কথা জানিয়ে বলে, কোন দুঃখ নেই, এর পরের বারে নিশ্চয়ই সাবাড় করবো।

এই সব ব্যর্থতার সংবাদ যখন ট্রটস্কীর কাছে পৌঁছতে লাগলো, তিনি অধীর হয়ে উঠলেন। পরবর্ত্তী কালে তাঁর যে-সব কাগজ-পত্র O G P U-র হস্তগত হয়, তাতে দেখা যায় যে, এই সময় ট্রটস্কী রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়ে দলের বিশিষ্ট নেতাদের শাসন করে চিঠি লিখে পাঠাচ্ছেন, সব সময় তারা শুধু রাজনৈতিক আলোচনা নিয়েই ব্যস্ত, কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। অবশেষে তিনি বাইরে থেকে পাকা জার্ম্মাণ টেরারিষ্টদের জাল পাসপোর্টের সাহায্যে রাশিয়াতে পাঠাতে আরম্ভ করলেন, যারা গিয়ে "কাজের কাজ" দ্রুত সমাধা করতে তাদের সহায়তা করবে। পরে জানা যায়, এই ভাবে ট্রটস্কী একজনের পরে একজন, ছ'জন পাকা জার্ম্মাণ টেরারিষ্টকে রাশিয়াতে পাঠান।

ষ্টালিনকে সরিয়ে না ফেলতে পারলে সোভিয়েট শাসনযন্ত্র অধিকার করবার কোন উপায় নেই, তাই ট্রটস্কী তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন এই লোকটিকে হত্যা করবার জন্যে। ইতিহাসে এত-বড় ব্যক্তিগত ঘৃণার উদাহরণ আর নেই। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে যে-কোন উপায়ই অবলম্বন করা যেতে পারে এই ছিল তাঁদের রাজনৈতিক আদর্শ। মাত্র প্রাচীন রোমের ইতিহাসে আমরা আর একবার দেখেছিলাম, রাজনীতিকে ঘৃণা আর হত্যায় এই রকম ভাবে আকণ্ঠ ডুবে যেতে, যেদিন মানুষকে হত্যা করবার জন্যে প্রাসাদের গোপন কক্ষে বিষ নিয়ে পরীক্ষার পর পরীক্ষা হতো। সেদিন সোভিয়েট রাশিয়ার রাজনৈতিক জীবনের অন্তরালে মানুষের হিংস্র প্রবৃত্তির যে জঘন্য প্রতিযোগিতা সুরু হয়, পাঁচ হাজার বছরের সভ্যতার পক্ষে তা খুব শ্লাঘার বিষয় নয়। রাজনীতি যদি মনুষ্য-শিকারে পরিণত হয়, সে-রাজনীতি মানুষকে এমন কিছুই দিতে পারে না, যার জন্যে মানুষ গর্বিত হতে পারে। অন্তত আমরা ভারতবর্ষে সে-কথা অকুণ্ঠ ভাবেই বলবো।

প্রথম যে লোকটিকে জার্ম্মাণী থেকে ট্রটস্কী রাশিয়াতে পাঠালেন সে যখন ব্যর্থ হলো, তখন ট্রটস্কী বেছে-বেছে আরো দুজন পাকা শিকারীকে পাঠালেন। দুজনেই জার্ম্মাণ। একজনের নাম Konon Berman-yurin, আর একজনের নাম Fitz David ; তাদের পাঠাবার আগে ট্রটস্কী কোপেন্‌হাগেন শহরে ব্যক্তিগত-ভাবে তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন। তাদের মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তিটি নিজেই পরে স্বীকার করে গিয়েছে, "রাশিয়াতে যাবার আগে ট্রটস্কীর সঙ্গে আমার দু'বার দেখা হয়। প্রথম সাক্ষাতে ট্রটস্কী বার বার নানা প্রশ্ন করে, আমার কার্য্যশক্তির পরিচয় নিতে চেষ্টা করেন। আমি যে-কাজের জন্যে যাচ্ছি, সে-কাজের উপযুক্ত কিনা, তা তিনি যাচাই করে নিচ্ছিলেন। তারপর আমাকে অনুপ্রাণিত করবার জন্যে তিনি বলেন, আসল প্রশ্ন হলো, ষ্টালিনকে নিয়ে। ষ্টালিনকে যে কোন উপায়ে হ'ক, পৃথিবী থেকে সরাতে হবে। তার আগে, অন্য কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থাই বিশেষ কার্য্যকরী হবে না। এবং তার জন্যে এমন

লোক দরকার, যে যে-কোন কাজ করতে ভয় পাবে না, এমন কি নিজে যদি মরতে হয়, তাতেও পিছ-পাও হবে না। সমগ্র মানব-ইতিহাসের প্রয়োজনের জন্যে সে-লোককে আত্মোৎসর্গ করতে হবে···

"এই ভাবে তিনি আমাকে উৎসাহিত করতে চেষ্টা করেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু এই জাতীয় ব্যক্তিগত টেরারিজম্, মার্কসবাদ তো সমর্থন করে না?

"তার উত্তরে ট্রটস্কী বলেন, আজ সোভিয়েট রাশিয়াতে এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হ'য়েছে, যা মার্কস্ কল্পনা করতে পারেন নি! সুতরাং মার্কসবাদের দোহাই দিয়ে একাজ থেকে বিরত হওয়া চলে না।

"এই প্রসঙ্গেই তিনি উল্লেখ করেন, শুধু ষ্টালিনই নয়, ভোরোশিলভ এবং কাগানোভিচ, তাদেরও সরিয়ে ফেলতে হবে···

"কথা বলবার সময় তিনি উত্তেজিত ভাবে ঘরময় পায়চারি করে বেড়াতে লাগলেন। ষ্টালিনের নাম উচ্চারণ করতে পর্য্যন্ত অসীম ঘৃণায় তাঁর কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়ে উঠছিল।"

দ্বিতীয় লোকটিকে পাঠাবার সময় ট্রটস্কী বলেছিলেন, টেরারিষ্ট যাকে হতে হবে, তার হাত কিছুতেই কাঁপবে না।

"Whoever is a revolutionary, his hand will not tremble."

ফরাসী-বিপ্লবের ইতিহাসে আমরা দেখেছি, যে-লোক গিলোটিনের প্রবর্ত্তন করলো, তাকেও গিলোটিনে মাথা দিতে হলো। বিপ্লবীর যে অকম্পিত হাতকে সেদিন ট্রটস্কী শত্রুনিধনে উত্তেজিত করছিলেন, সেই অকম্পিত হাতের আঘাতেই তাঁকে এই পৃথিবী থেকে সরে যেতে হয়েছিল। এই ভাবে চক্রাকারে চলে রক্ত-জিঘাংসা।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

সন্দেহ গাঢ়তর হলেও তখনো পর্য্যন্ত ষ্টালিন এই ষড়যন্ত্রের গভীরতা অনুমান করতে পারেন নি।

রাশিয়ার বাইরে ট্রটস্কী এবং রাশিয়ার ভেতরে জেনোভিভ, এই দুইজনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলো এক বিরাট ষড়যন্ত্র দল। বাচনিক প্রচার কাজ পরিত্যাগ করে এই দল পূর্ণ উদ্যমে তাদের অভীষ্টসিদ্ধির উদ্দেশ্যে "কাজে" নামলো···কাজ মানে হলো, যে-কোন উপায়ে বিপক্ষের প্রধান ব্যক্তিদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলা। সুরু হলো, পৃথিবীর ইতিহাসে জঘন্যতম মনুষ্য-শিকারের পালা।

যাতে এলোমেলো ভাবে এ 'কাজ' অনুষ্ঠিত না হয়, তার জন্যে দলের বিশিষ্ট নেতাদের নিয়ে একটা সংগোপন কেন্দ্র গড়ে তোলা হলো। ট্রটস্কী দূত মারফৎ এই কেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ যোগ বজায় রাখলেন। কখন কোন্ লোককে সরাতে হবে, তার নির্দ্দেশ এই কেন্দ্র থেকেই বিভিন্ন কর্ম্মীদের সরবরাহ করা হতো। এই কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে স্থির হলো, প্রথম আঘাত করতে হবে, সারজী কিরভ্‌কে। কিরভ্ তখন লেনিনগ্রাড পার্টির সেক্রেটারী এবং ষ্টালিনের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ।

১৯৩৫-এর নভেম্বর মাসে জেনোভিভ্, তাঁর প্রতিনিধিস্বরূপ বাকায়েভ্‌কে লেনিনগ্রাড পাঠালেন, সেখানকার ব্যবস্থা তদারক করে আসবার জন্যে এবং কিরভের হত্যার জন্যে যা-কিছু প্রয়োজন, পাকাপাকি ভাবে তার ব্যবস্থা ঠিক করে আসতে।

লেনিনগ্রাডে এসে বাকায়েভ্ দলের বাছা-বাছা সাত জন ওস্তাদকে নিয়ে কাজে অগ্রসর হলেন। তাদের মধ্যে একজন যখন শুনলো যে বাকায়েভ্ তাদের ব্যবস্থা তদারক করতে এসেছে, তখন ক্ষুণ্ণ হয়েই বলে উঠলো, জেনোভিভ্ তাহলে আমাদের শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করেন না? বাকায়েভ্ তাকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে যে, তাদের কাজে সহায়তা করবার জন্যেই সে এসেছে। তাদের শক্তির ওপর জেনোভিভের আস্থা আছে বলেই, এত-বড় শক্ত কাজের ভার তাদের ওপর দেওয়া হয়েছে।

তাদের কাছ থেকেই বাকায়েভ্ জানতে পারলো যে, তারা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই। বাড়ী থেকে তার অফিসে আসবার জন্যে যে-পথ কিরভ প্রতিদিন ব্যবহার করে, সেই পথের মোড়ে মোড়ে লোক বসে গিয়েছে, তার চলাচল লক্ষ্য করবার জন্যে। যে লোকটির ওপর আসল "কাজের" ভার দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গেও বাকায়েভের পরিচয় হলো। পাতলা, রোগা, বছর ত্রিশ বয়স, নাম লিওনিদ্ নিকোলেয়েভ্। কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত সে কম্যুনিষ্ট যুবকদের প্রধান প্রতিষ্ঠান কম্‌শোমলের একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিল। তার ওপর হিসাব রাখার এবং তহবিলের ভার ছিল। কিন্তু হিসাবের গোলমাল ধরা পড়ায় তাকে সেই প্রতিষ্ঠান থেকে বিতাড়িত করা হয়। সেই ব্যক্তিগত আক্রোশে সে সোভিয়েট-বিরোধী এই চক্রান্তে যোগদান করে।

তার সঙ্গে কথা বলে বাকায়েভ্ বুঝতে পারলো

যে, তার ওপর যে-কাজের ভার দেওয়া হয়েছে, সে তার অনুপযুক্ত নয়। কোন্ জায়গা থেকে গুলী ছুঁড়লে ঠিক কাজ হবে এবং সে-ও আত্মগোপন করতে পারবে, এই ক'দিন ঘোরাঘুরি করে সে তা ঠিক করে ফেলেছে। ইতিমধ্যে সে কিরভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে দু'-তিন বার চেষ্টাও করেছে, কিন্তু সফল হতে পারেনি।

বাকায়েভ, দলের প্রত্যেককে জেনোভিভের নির্দ্দেশ-মত সতর্ক করে দেয়,—আমাদের প্রত্যেককে মনে রাখতে হবে, এখন যতদূর সম্ভব সংগোপনে আমাদের কাজ সারতে হবে। বাইরের লোকে যাতে কোনক্রমেই সন্দেহ করতে না পারে, সেই রকম ভাবে আমাদের চলাফেরা করতে হবে। যদি দৈবক্রমে কেউ ধরা পড়ে, তাহলে যতই কেন না সে নির্য্যাতিত হোক্, দলের কথা সে কিছুতেই প্রকাশ করবে না। প্রকাশ্য ভাবে আমাদের সব সময়ই জোরের সঙ্গে ঘোষণা করতে হবে যে, মার্কস্‌পন্থী হিসাবে এই সব ব্যক্তিগত টেরারিজিম্‌কে আমরা ঘৃণা করি।

বাকায়েভের মুখ থেকে লেনিনগ্রাডের আয়োজনের সুব্যবস্থার কথা শুনে জেনোভিভের স্থির বিশ্বাস হয় যে, দু'-এক দিনের মধ্যেই কিরভের মাথা মাটিতে লুটোবে এবং তার ফলে সোভিয়েট শাসন-যন্ত্রের মধ্যে যে বিপর্য্যয় সুরু হবে, তার মধ্যে তাঁরা অনায়াসে খানিকটা এগিয়ে যেতে পারবেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর সহকর্ম্মী কামানেভের সঙ্গে যখন আলোচনা হচ্ছিল তখন কামানেভ্ একটি কথা বলেছিলেন, অতি দামী কথা, Heads are peculiar, in that they do not grow again। বড় মজার জিনিস, এই মাথা··· একবার পড়ে গেলে আর গজায় না।

তার কয়েক দিন পরেই। ১লা ডিসেম্বর ঘড়িতে তখন চারটে বেজে সাতাশ মিনিট, কিরভ স্মলনী ইন্‌ষ্টিটিউটে তাঁর অফিস-ঘর থেকে বেরিয়ে বারাণ্ডায় এসে দাঁড়ালেন। দীর্ঘ বারাণ্ডা। তার শেষের দিকে একটা ঘরে তিনি একটা রিপোর্ট দাখিল করে বাড়ী ফিরবেন। বারাণ্ডায় তখন জনপ্রাণী নেই। হঠাৎ একটা থামের আড়াল থেকে একজন লোক দ্রুত বেরিয়ে এসে একেবারে তাঁর মাথার পেছনে রিভলভার রেখে ছুঁড়লো। সমস্ত বারাণ্ডা সেই শব্দে কেঁপে উঠলো। ঠিক সাড়ে চারটার সময় কিরভের মৃতদেহ বারাণ্ডার মার্বেলের ওপর পড়ে গেল।

নিকোলেয়েভ্ পালাবার চেষ্টা করতেই চারদিক থেকে লোক ছুটে এলো। নিরুপায় দেখে, হাতের রিভলভার দিয়ে সে নিজেকে হত্যা করবার চেষ্টা করলো। কিন্তু তার আগেই কয়েক জন লোক তার হাত ধরে ফেললো।

বিচারে নিকোলেয়েভ্ দলের শপথ অনুযায়ী সমস্ত অপরাধের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে নিলো। সোভিয়েট রাশিয়ার বর্ত্তমান পরিচালকদের বিরুদ্ধে তার ব্যক্তিগত প্রতিবাদ জানাবার জন্যেই সে এই কাজ করেছে। তার সঙ্গে কোন দলের কোন যোগ নেই।

নিকোলেয়েভের ফাঁসী হয়ে গেল।

সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট কিন্তু নিকোলেয়েভের স্বীকারউক্তিকে ষোল আনা সত্য বলে গ্রহণ করলো না। নিশ্চয়ই এর পেছনে একটা শক্তিশালী দল কাজ করছে···কিরভের হত্যা সেই দলের অস্তিত্বের প্রথম স্পষ্ট প্রকাশ। এই ব্যাপারে তদারক করবার জন্যে একটা বিশেষ কমিশন নিযুক্ত হলো। কমিশনের অনুসন্ধানের ফলে জেনোভিভ্, কামেনেভ্, বাকায়েভ্, ইত্যাদি বিরোধী দলের কয়েক জন নেতাকে গ্রেফতারও করা হলো। জেনোভিভ্ আগে থাকতেই তৈরী করে রেখেছিলেন, ধরা পড়লে তাঁরা কি ভাবে জবানবন্দী দেবেন। এই হত্যা-নীতিকে জেনোভিভ্ তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করলেন। যদিও তাঁরা বর্ত্তমান শাসন-ব্যবস্থার বিরোধী মত পোষণ করেন এবং সেইজন্যেই তিনি তাঁর অনুচরদের নিয়ে একটা বিরোধী দলও গঠন করেছেন, কিন্তু এই ভাবে ব্যক্তিগত হত্যার দ্বারা তাঁরা যে শাসনযন্ত্র অধিকার করতে পারেন না, সেটুকু জ্ঞান তাঁরা লেনিনের কাছ থেকে পেয়েছেন। যদি তাঁদের প্রচারকার্য্যের ফলে পরোক্ষ ভাবে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে থাকে, তার জন্যে তিনি অনুতপ্ত। তিনি সর্ব্বদাই বিশ্বাস করেন যে, নিয়মতান্ত্রিক পথে একদিন বর্ত্তমান শাসকেরা তাঁর দলের সঙ্গে আপোষ করতে বাধ্য হবেই। কামানেভ, বাকায়েভও ঠিক এই সুরে নিজেদের জবানবন্দী দিল। তাঁদের অভিনয় এমন নিখুঁত হয় যে, বিচারে হত্যার ষড়যন্ত্রের অপরাধ থেকে তাঁরা সে-যাত্রা মুক্তিলাভ করেন। সাক্ষাৎ ভাবে এই হত্যার সঙ্গে তাঁদের কোন যোগসূত্র আবিষ্কার করতে না পেরে, তাঁদের কথার ওপর আংশিক বিশ্বাস করতে বাধ্য হন বিচারকরা। কিন্তু তাঁরা যে বর্ত্তমান শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য করেছেন, এবং তাঁদের সেই কাজ যে স্পষ্টই রাষ্ট্র-দ্রোহী, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবং সেই অপরাধে জেনোভিভের দশ বৎসর, এবং তাঁর অন্যান্য সহকর্ম্মীদের প্রত্যেকের পাঁচ বৎসর করে সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হলো। সন্দেহ আরো গাঢ় হলেও,

ষ্টালিন তখনো পর্য্যন্ত সেই বিরাট ষড়যন্ত্রের আসল ব্যাপকতার সন্ধান পান নি।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

ফল পড়ে যায় কিন্তু বোঁটা ঠিক থাকে। এই বোঁটা জাতীয় রাজনৈতিকরাই সব চেয়ে মারাত্মক।

কিরভের হত্যাকাণ্ডের পরে O G P U-র গুপ্তচর বিভাগ বিশেষ ভাবে সজাগ হয়ে উঠলো। সেই বছরের যে মাসেই O G P U-র প্রধান কর্ম্মকর্তা মেন্‌ঝিনস্কী হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেলেন। অনেক দিন থেকেই তিনি হৃদ্‌রোগে ভুগছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর এই দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয় হেনরী ইয়াগোডা। ইয়াগোডা বহুদিন থেকেই গোপনে বর্ত্তমান শাসকদের বিরোধী দলে যোগদান করেছিল। এবং ট্রটস্কীর মতবাদের সঙ্গে তার মতের যথেষ্ট মিল ছিল। ক্রমশ সে নিজেকে ট্রটস্কীর গোপন-দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত করে ফেলে। ট্রটস্কীর বা বুখারিনের মতকে বিশ্বাস করতো বলে নয়, ইয়াগোডার বিশ্বাস ছিল ষ্টালিন এবং তাঁর অনুচরেরা বেশী দিন শাসনযন্ত্র অধিকার করে থাকতে পারবেন না, তাঁদের পরাজিত হয়ে সরে দাঁড়াতেই হবে। এক শ্রেণীর লোক থাকে, যারা নিজেদের সর্ব্বদাই বিজেতার দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখতে চায়। ইয়াগোডা ছিল সেই শ্রেণীরই একজন। বর্ত্তমানে তাই সে ষ্টালিনের শাসন-ব্যবস্থায় একটা সব চেয়ে বড় দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকেও ভেতরে ভেতরে সে আগামী বিজেতা দলের সঙ্গেও যোগ-সাজস রেখে চলেছিল। রাষ্ট্র-পরিবর্ত্তনের সময় এই জাতীয় চতুর এবং বিশেষ কর্ম্মদক্ষ অফিসর প্রত্যেক দেশেই দুই-একটি দেখা যায়। কর্ম্মদক্ষতার সুযোগে যারা সর্ব্বদাই বিজেতার দলের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক বজায় রাখতে চায়...এক দলের হাত থেকে শাসনভার চলে গেলেও, দেখা যায়, অপর দল এসে তাকে সেই জায়গা থেকে আর নড়ায় না। এই জাতীয় চতুর এবং দক্ষ কর্ম্মীরাই সব চেয়ে মারাত্মক। ফল পড়ে যায় কিন্তু বোঁটা ঠিক থাকে।

পরবর্ত্তী কালে ইয়াগোডা নিজের যে জবানবন্দী রেখে গিয়েছিল, তা থেকেই তার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা জানতে পেরেছি। সুতরাং একান্ত প্রামাণিক। এই সময়কার কথা-প্রসঙ্গে ইয়াগোডা লিখছে: "দেশের ভেতরে এই দুই দলের সংঘর্ষ আমি একান্ত সজাগ থেকে অনুধাবন করতাম। আমি আমার জীবনের মূলনীতি-স্বরূপ স্থির করে নিয়েছিলাম যে, যে দল জয়লাভ করবে, আমি থাকবো সেই দলে। তার জন্যে আমাকে একান্ত সতর্ক হয়ে চলতে হতো। যখন ট্রটস্কীর দলের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু হয়ে গেল, তখন কোন্ দল যে জিতবে তা আগে বোঝা অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠলো। ট্রটস্কীর দল যে আবার শাসন-যন্ত্র অধিকার করতে পারে না, এমন ধারণা আমার মনে ছিল না! O G P U-র সহকারী চেয়ারম্যানরূপে যখন আমারই ওপর ভার পড়লো ট্রটস্কীর দলকে সায়েস্তা করবার জন্যে, তখন আমাকে একান্ত বিচক্ষণ-তার সঙ্গে অগ্রসর হতে হলো। রাষ্ট্রের একজন প্রধান অফিসররূপে রাষ্ট্রের বিধান আমাকে মেনে চলতেই হতো কিন্তু সেখানে আমি খুব সতর্কতার সঙ্গে এমন সব ব্যবস্থা করতাম যাতে ট্রটস্কীর দলের লোকেরা আমার ওপর একেবারে বিরূপ হতে না পারে। আদালতের বিচার অনুযায়ী তাদের নির্বাসনে পাঠাতাম বটে কিন্তু নির্বাসনে থাকবার সময় যাতে তারা সব চেয়ে বেশী সুবিধা পায়, সংগোপনে সে-ব্যবস্থাও করতাম।"

ইয়াগোডা যে ষ্টালিন-বিরোধী দলের লোক, গোড়ার দিকে সে-কথা বিরোধী দলের প্রধানতম নেতারূপে মাত্র তিন জন জানতেন—বুখারিন, রায়কভ এবং টমস্কী। যখন ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ট্রটস্কী, জেনোভিভ এবং বুখারিনের দল মিলে একটা মিলিত বিরোধী-কেন্দ্র গড়ে উঠলো, তখন ইয়াগোডার এই সংগোপন যোগাযোগের খবর জানতে পারলো আর দুজন লোক,—পিয়াটাকভ এবং ক্রেস্টেনস্কী।

রাশিয়ার ভেতরে এই বিরোধী দলের নেতাদের কেন্দ্র যে বহুদিন পর্য্যন্ত আত্মগোপন করে থাকতে পেরেছিল, তারও একমাত্র কারণ হলো ইয়াগোডা। যে-লোকের ওপর ভার তাদের ধরিয়ে দেবার, তাদের গোপন কার্য্যকে রাষ্ট্রের জ্ঞানগোচর করাবার, সেই লোকই যদি তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে, তাহলে রাষ্ট্রের পক্ষে তাদের গ্রেপ্তার করা দুরূহ ব্যাপার হয়ে ওঠে। সেই জন্যেই ট্রটস্কীর দল গোড়ার দিকে এমন ভাবে ষড়যন্ত্রের জাল রাশিয়ার ভেতরে নির্বিবাদে ছড়াতে পেরেছিল। এবং পরিশেষে তারা যে জয়ী হতে পারেন নি, এইটেই সব চেয়ে বিস্ময়কর বলে মনে হয় এবং সেইখানেই বোঝা যায়, রাশিয়ার স্বল্পবাক্ পরিচালকটির মস্তিষ্ক কতখানি শক্তি ধরে।

ইয়াগোডা যে শুধু এই বিরোধী দলের কেন্দ্রটিকে আগলে রেখেছিল তা নয়, O G P U-র মধ্যেও এই

দলের বিশিষ্ট কর্ম্মীদের একটি-দুটি করে নিযুক্ত করে রেখেছিল। এবং তারই সহযোগিতার দরুণ য়ুরোপের অন্য রাষ্ট্রের গুপ্তচরেরা, গোপনে O G P U-র মধ্যে তাদের স্থান করে নিতে পেরেছিল। যদি এই ষড়যন্ত্রের কোন জ্যামিতিক রেখা-চিত্র আঁকা সম্ভব হয়, তাহলে দেখা যাবে এক বৃত্তের মধ্যে শত বৃত্ত, এক চক্রের মধ্যে শত চক্র, রীতিমত একটা গোলক-ধাঁধা।

কিরভের হত্যাকাণ্ডের কয়েক দিন আগে O G P U-র একজন গুপ্তচর নিকোলিয়েভকে সন্দেহক্রমে গ্রেফতার করে এবং অনুসন্ধানের ফলে তার পকেটে একটা মানচিত্র পাওয়া যায়, যে রাস্তা দিয়ে কিরভ যাতায়াত করে, সেই রাস্তারই মানচিত্র। সংবাদ পেয়েই ইয়াগোডা নিজে নিকোলিয়েভের ব্যাপারটা তদারক করবার অছিলায় তার সঙ্গে দেখা করে এবং তৎক্ষণাৎ তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সমস্ত ব্যাপারটা ফাইলের তলায় চাপা পড়ে যায়। তার কয়েক দিন পরেই কিরভের হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৩৩ সালে হঠাৎ সন্দেহক্রমে স্মার্ণভকে O G P U-র এক অফিসর গ্রেপ্তার করে। ইয়াগোডা জানতো, স্মার্ণভ ট্রটস্কী-জেনোভিভ্ গোপন-কেন্দ্রের একজন বিশিষ্ট নেতা। কিন্তু ইয়াগোডা জানবার আগেই তার বিভাগীয় লোকেরা স্মার্ণভকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিয়ে আসে এবং পুলিশের খাতায় তার নাম লেখা হয়ে যায়। তখন তাড়াতাড়ি ইয়াগোডা বন্দীকে পরীক্ষা করে দেখবার অছিলায় গোপনে তার সঙ্গে কারাগারে দেখা করে এবং আদালতে স্মার্ণভ কি জবানবন্দী দেবে পূর্ব্বাহ্নেই তাকে শিখিয়ে দিয়ে আসে। এই ভাবে স্মার্ণভ সে-যাত্রা ধরা পড়েও রক্ষা পেয়ে যায়।

এই ভাবে ইয়াগোডা ক্রমশ নিজেকে বিরোধী দলের সঙ্গে এমন ভাবে জড়িয়ে ফেলতে থাকে যে, কার্য্যত সে-ই হয়ে উঠলো বিরোধী দলের মূল নায়ক। এক দিকে O G P U-র সর্বময় কর্ত্তারূপে সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে তার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতা, অন্য দিকে আবার চক্রান্তকারীদের রক্ষক হিসাবে তারই হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়লো বিপক্ষ দলের সমস্ত ভবিষ্যৎ। এই বিপুল শক্তি নেশার মত ইয়াগোডার সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। যে-কথা পূর্ব্বে কোনদিন সে কল্পনাও করেনি, ক্রমশ সেই কথা, সেই সম্ভাবনা, সেই চিন্তা তার কাছে একান্ত বাস্তব হয়ে উঠলো···সে-ই তো পারে এই বিরাট রাষ্ট্রকে পরিচালনা করতে। রাশিয়ার বাইরে হিটলারের দিকে চেয়ে, তার মনের মধ্যে জেগে উঠলো এক দুরন্ত দুরাকাঙ্ক্ষা, সে-ও তো হতে পারে রাশিয়ার হিটলার। একদিন হিটলার ছিল সৈন্য-বিভাগের একজন সামান্য সার্জ্জেণ্ট, সে-ও তো তার জীবন আরম্ভ করে একজন সার্জ্জেণ্ট-রূপেই। ইয়াগোডার সমস্ত অভিসন্ধির সহায় ছিল তার অধীন এক কর্ম্মচারী,—পাভেল বুলানভ। হিটলারের আত্মজীবনী পড়ে উল্লসিত হয়ে একদিন বুলানভকে ইয়াগোডা বলেছিল, অদ্ভুত বই···এ থেকে শেখবার যথেষ্ট কিছু আছে।

সেই দুরাকাঙ্ক্ষী জার্ম্মাণ সৈনিকের জীবনের কৃতিত্ব ক্রমশ তার মনে এমন এক সম্ভাবনার আশা জাগিয়ে তুললো যে সংগোপনে সে গভীর ভাবে চিন্তা করতে সুরু করে দিল, ষ্টালিনকে সরিয়ে যে নূতন শাসন-তন্ত্র রাশিয়ায় সে গড়ে তুলবে, কি হবে সেই শাসন-তন্ত্রের চেহারা। এবং বুলানভের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, সেদিন সে ঠিক করেছিল, রাজ্য-শাসন ব্যাপারে হিটলারের প্রদর্শিত পথই তার পক্ষে শ্রেয়ঃ হবে। এবং কল্পনার উন্মাদনায় একদিন সে তার সব চেয়ে বিশ্বস্ত কর্ম্মী বুলানভকে বলেছিল, ষ্টালিনকে সরিয়ে সে হবে রাশিয়ার সর্বময় কর্ত্তা, নতুন যে পার্টি পুনর্গঠিত হবে তার সেক্রেটারী হবে বুলানভ, ট্রেড য়ুনিয়নের ভার থাকবে টমস্কীর ওপর, বুখারিন হবে তাদের ডাঃ গোয়েবল্‌স্। আর ট্রটস্কী? তাঁকে রাশিয়াতে পুনঃ-প্রবেশ করতে দেবে কি দেবে না, সে-সম্বন্ধে ইয়াগোডা এত আগে থাকতে কিছু বলতে পারে না।

হায় ট্রটস্কী!

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

চিকিৎসকের বৃত্তি হলো জগতের পবিত্রতম বৃত্তি। তাকেও তারা জঘন্য হত্যার কাজে টেনে নিয়ে এলো।

এই অভূতপূর্ব ষড়যন্ত্রে যতগুলি প্রধান দল ষ্টালিনের বিরোধিতায় সাময়িক ভাবে একত্র হয়েছিল, তাদের প্রত্যেকের দলপতির সংগোপন মনে ছিল, নিজের নিজের স্বতন্ত্র অভিব্যক্তির অভিলাষ। এই হত্যার অরণ্যে মার্কস্‌-বাদ-বর্ণিত জগৎ-কল্যাণের আদর্শ ঝোপের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া খরগোসের মত খুঁজে বার করতে হয়।

কিন্তু ইয়াগোডার সেই দুরাকাঙ্ক্ষার স্বপ্নের মধ্যে ট্রটস্কীর স্থান যে একেবারেই ছিল না তা নয়। ট্রটস্কী তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং রাজনৈতিক বাগ্মিতার সাহায্যে

জাপান আর জার্ম্মাণীর সঙ্গে যে গোপন চুক্তি করছিলেন, ইয়াগোডার তাতে পূর্ণ সম্মতি ছিল। রাশিয়ার ভেতরে তারা যখন শাসন-যন্ত্র অধিকার করবার জন্যে সশস্ত্র আক্রমণ করবে, ঠিক সেই সময় যাতে জাপান এবং জার্ম্মাণী বাইরে থেকে সোভিয়েট রাশিয়াকে আক্রমণ করে, তার জন্যে ঘড়ি ধরে ব্যবস্থা করে রাখতে হবে। বুলানভকে ইয়াগোডা বলেছিল, এই অভ্যুত্থানকে আগিয়ে আনবার জন্যে যা-কিছু উপায় সম্ভব সবই অবলম্বন করতে হবে, সশস্ত্র আক্রমণ, গুপ্তহত্যা, এমন কি বিষ-প্রয়োগ। এমন অনেক সময় আসে, যখন ধীরে-সুস্থে পা গুণে-গুণে অগ্রসর হতে হয়, আবার এমন এক সময় আসে যখন ঝড়ের মতন তীব্র বেগে এবং ঝড়ের মতন অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়।

যখন ট্রটস্কী-জেনোভিভের দল টেরারিজিম্-এর পন্থা অবলম্বন করে, তখন ইয়াগোডার সম্মতি তারা যথারীতি নিয়েছিল। কিন্তু তাদের অনুষ্ঠিত হত্যা-কাণ্ডের প্রকরণ সম্পর্কে ইয়াগোডার একটা স্বতন্ত্র পরিকল্পনা ছিল। বোমা, ছুরি বা বুলেটের দ্বারা ইদানীং টেরারিষ্টরা যে ভাবে তাদের কার্য্যসিদ্ধি করে এসেছে, ইয়াগোডার কাছে সেগুলো পুরোন, সেকেলে বলে মনে হয়। রাজনৈতিক হত্যার জন্যে সূক্ষ্মতর অস্ত্র প্রয়োগের সম্ভাবনার কথা ইয়াগোডার উর্ব্বর মস্তিষ্কে ঘোরা-ফেরা করছিল। তাই মেসালিনার মত ইয়াগোডা গোপনে হত্যার সূক্ষ্ম অস্ত্র নিয়ে গবেষণা করতে সুরু করে। বুলেটের বা বোমার একটা প্রধান দোষ যে, কার্য্যোদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে সে সশব্দে নিজেকে সকলের কাছে জাহির করে। এমন অস্ত্র বার করতে হবে, যা নিঃশব্দে নীরবে সন্দেহাতীত ভাবে কার্য্যোদ্ধার করবে।

তাই ইয়াগোডা প্রথমে বিষ নিয়ে গবেষণা বা পরীক্ষা করতে সুরু করে। সহর থেকে কিছু দূরে একটা বাড়ীতে তার জন্যে রীতিমত একটা ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠিত করে। এবং কয়েকজন বিশিষ্ট রাসায়নিক এই গবেষণার জন্যে নিযুক্ত হন। বিংশ শতাব্দীর দিবালোকে এ যেন মধ্যযুগের নিষ্প্রদীপ রাত্রির অন্ধকার। ইয়াগোডার লক্ষ্য ছিল, হত্যার এমন একটা উপায় উদ্ভাবন করা, যাতে ধরা পড়বার কোনই সম্ভাবনা থাকবে না, অথচ যা হবে, "Murder with a guarantee"···একেবারে গ্যারান্টি দিয়ে হত্যা। কথাটা ইয়াগোডার উর্ব্বর মস্তিষ্কেরই সৃষ্টি!

কিন্তু বহু গবেষণার পর ইয়াগোডা দেখলো, আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের চেয়ে বিষ-প্রয়োগে ঢের বেশী হাঙ্গামা। কিন্তু এই সূত্রেই ইয়াগোডা নিজস্ব একটা পন্থা আবিষ্কার করলো। দলের একান্ত অন্তরঙ্গদের সামনে সেই নতুন আবিষ্কারের কথা ইয়াগোডা প্রকাশ করলো, মানুষের অসুখ তো লেগেই আছে, কারুর কারুর আবার ক্রনিক ব্যাধি আছে। যে ডাক্তারের ওপর চিকিৎসার ভার থাকে, সে চেষ্টা করলে, রোগীকে শীগ্‌গির নিরাময় করতে পারে, কিম্বা দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়েও দিতে পারে। কি করে পারে? সেইটেই হলো এর টেকনিক···

বিস্মিত হয়ে বিপ্লবীরা শোনে। আসল প্রয়োজন, সেই ধরণের চিকিৎসকের।

রাজনৈতিক প্রয়োজনের মধ্যে, এতদিন মানুষের সব বৃত্তির মধ্যে যা ছিল পবিত্রতম তাকে বাদ দিয়েই রাখা হয়েছিল, হিংসার তাড়নায় তাকে পর্য্যন্ত কলুষিত করলো বিংশ শতাব্দীর মানুষ। হিংসা-তন্ত্রের স্বাভাবিক পরিণতি। এক দিকে এটম্ বোম, আর এক দিকে এই বিষ-চক্র···শক্তি-মদ-মত্ততা আর হিংসার প্রতিযোগিতার অনিবার্য্য ফল। মনে হয় যেন, ধরিত্রীর একান্ত স্বাভাবিক আত্মরক্ষার প্রেরণা থেকেই ভারতবর্ষে ঠিক সেই সময় কৌপীনবাস শুদ্ধাচারী ক্ষমাসুন্দর এক মহা-মানবের উদ্ভব হয়। এই হিংসার উন্মাদ বিশ্ব-সংক্রমণের মধ্যে কোথায় যেন তীব্র প্রয়োজন ছিল এর বলিষ্ঠ প্রতিবাদের···মহাত্মা গান্ধীর কণ্ঠে সেই প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠল ভারতবর্ষে। এই দায়িত্বই তিনি দিয়ে গিয়েছেন স্বাধীন ভারতবর্ষের উপর। সামনের পৃথিবীতে তাই আজ আমাদের প্রত্যেককে উপলব্ধি করতে হবে, ভারতবর্ষের আভ্যন্তরিক দৈন্য ও দুঃখ-দুর্দ্দশার সমস্যা মোচনের সঙ্গে সঙ্গে, বিশ্ব-ব্যাপারে ভারতবর্ষের একটা বিরাট কর্ত্তব্য আছে। এই হিংসার আর শক্তি-লোলুপতার অন্ধ প্রতিযোগিতার মধ্যে ভারতবর্ষকে আবার নতুন করে হতে হবে বিশ্ব-ধাত্রী। বিশ্বের রাজনীতি-ধারায় ভারতকে আনতে হবে পরিবর্ত্তন। ভারতের ইতিহাসের মধ্যে রয়েছে সে-সম্ভাবনার ইঙ্গিত।

আপাতবিচ্ছিন্ন বোধ হলেও, আজ পৃথিবীর কোন ঘটনাই বিচ্ছিন্ন নয়। রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত সেই হিংসার ষড়যন্ত্রের কাহিনীর সঙ্গে হয়ত আমাদের কোন আপাত সংযোগ নেই। কিন্তু তবুও মনে হয়, আজ এই সূত্রে যে ভারতের কথা উত্থাপন করলাম, তা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকও নয়।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

"আপনি ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণী এ-সম্বন্ধে কিছু জানলে, পৃথিবীতে হয় আপনি থাকবেন, না হয় আমি।"

এখন আবার ফিরে আসা যাক মূল কাহিনীর মধ্যে, বাস্তব ঘটনার মধ্যে। জগতের সব চেয়ে বড় ক্রাইম্ উপন্যাস এই ঘটনার চেয়ে খুব বেশী রোমাঞ্চকর নয়।

আগের অধ্যায়েই বলেছি, ইয়াগোডার পূর্বে O G P U-র চেয়ারম্যান বা সর্বময় কর্তা ছিলেন মেনঝিনস্কী। মেনঝিনস্কী বহুদিন থেকেই হৃদরোগে কষ্ট পাচ্ছিলেন, হঠাৎ ১৯৩৩ সালের মে মাসে তিনি হার্টফেল করে মারা গেলেন এবং তাঁর জায়গায় O C P U-র অধিনায়ক হলো ইয়াগোডা। এই সামান্য সংবাদটির পিছনে আছে উপন্যাসের চেয়ে রোমাঞ্চকর এক ঘটনা।

ইয়াগোডা হত্যার যে নতুন উপায় উদ্ভাবন করেছিল, তার প্রয়োগের জন্যে সে আগে থাকতেই একজন ডাক্তারকে অতি সযত্নে লালন-পালন করে রেখেছিল। তাঁর নাম ডাক্তার লিও লেভিন। লেভিন ইয়াগোডার নিজের চিকিৎসক ছিলেন। কিন্তু অন্য আর এক কারণে লেভিনকে ইয়াগোডা তার সব চেয়ে প্রয়োজনীয় মানুষ হিসাবে খাতির করতো। দুর্ভাগ্য অথবা সৌভাগ্যক্রমে লেভিন ছিল ক্রেমলিনের মেডিকেল ষ্টাফের একজন বিশিষ্ট ডাক্তার। অর্থাৎ তাঁর চিকিৎসাধীনে ক্রেমলিনের বহু বিশিষ্ট সোভিয়েট অফিসর বা কর্ম্মী ছিলেন। O C P U-র চেয়ারম্যান মেনঝিনস্কীরও গৃহ-চিকিৎসক তিনি ছিলেন।

ইয়াগোডা একটু বিশেষ ভাবেই তাই লেভিনকে খাতির করতো। ভাল বিদেশী মদ এনে লেভিনের জন্যে আলাদা করে রেখে দিত। তাঁর থাকবার জন্যে শহর থেকে কাছেই একটা আলাদা বাড়ী সে ঠিক করে দিয়েছিল। তার জন্যে লেভিনকে এক পয়সাও ভাড়া দিতে হতো না। সময়ে-অসময়ে প্রায়ই লেভিনের বাড়ীতে ইয়াগোডা উপহার পাঠাতো। লেভিন রাশিয়া ছেড়ে বাইরে বেড়াতে যেতেন, ফিরে আসবার সময় সঙ্গে করে অনেক বিদেশী জিনিস তিনি নিয়ে আসতেন, ইয়াগোডার জন্যেই সেই সব জিনিসের কোন শুল্ক না দিয়েই তিনি ছাড়পত্র পেতেন। লেভিন এই অতিরিক্ত সৌভাগ্যে মাঝে মাঝে যে নিজেই বিস্মিত হতেন না, তা নয়। তখন তিনি কল্পনাই করতে পারেন নি, এই ভাবে তার কাছ থেকে সুবিধা-সুযোগ নিতে নিতে তিনি কতখানি সেই লোকটির চক্রান্তের মধ্যে পড়ে যাচ্ছেন। এই ভাবে সুবিধা-সুযোগ দিতে দিতে ক্রমশ ইয়াগোডা অতি কৌশলে ডাক্তারকে কতকগুলি ঘোরতর আইন-বিরোধী কাজের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে... যেমন ঘুষ নেওয়া এবং ছোট-খাট আরো অনেক ব্যাপার, সোভিয়েট আইনের চক্ষে যা ঘোরতর অপরাধ। ক্রমশ ডাক্তার লেভিনকে সে বুঝিয়ে দেয় যে তার বিরুদ্ধে গেলে, সে-ও ডাক্তার লেলিনকে সমান বিপন্ন করতে পারে। তারপর O G P U-র সহকারী চেয়ারম্যান হিসেবে তার শক্তির কথা লেভিনের অজানা ছিল না। এই ভাবে লেভিনকে সম্পূর্ণ ভাবে করায়ত্ত করে ইয়াগোডা সুকৌশলে তাঁকে তার অভিসন্ধি-সাধনের সহকর্ম্মিরূপে আমন্ত্রণ করে।

একদিন ইয়াগোডা স্পষ্টই ডাক্তারকে জানিয়ে দিল যে, বর্ত্তমান শাসকদের বিরুদ্ধে একটা শক্তিশালী দল গোপনে গড়ে উঠেছে এবং সে নিজে সেই দলের একজন প্রধান অধিনায়ক। এই দল একান্ত শক্তিশালী এবং জার্ম্মাণী ও জাপানের সঙ্গেও তাদের গোপন চুক্তি হয়েছে। অচিরকালের মধ্যে তারা ষ্টালিনকে সরিয়ে শাসন-যন্ত্র অধিকার করবে। তার ইচ্ছা যে ডাক্তার লেভিন এই দলের কাজে তাদের সাহায্য করবেন।

ডাক্তার লেভিন তখন স্পষ্টই বুঝেছিলেন যে তাঁর ভবিষ্যৎ এই কুটচক্রী লোকটির উপর নির্ভর করছে। তাকে অসন্তুষ্ট করে তাঁর বেঁচে থাকবার দ্বিতীয় কোন পথ নেই। সে ক্ষেত্রে তাকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলে ভবিষ্যতে তার মঙ্গলই হবে। তিনি সম্মত হলেন এই গোপনবিরোধী বলে যোগদান করতে। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত তাঁর ধারণা ছিল না যে এই দলের হয়ে কি ভাবে তাঁকে সাহায্য করতে হবে। এই ভাবে লেভিনকে সব দিক থেকে বেঁধে নিয়ে কুটচক্রী ইয়াগোডা তার আসল উদ্দেশ্যের কথা একদিন জানালো, ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে বড়-বড় সোভিয়েট অফিসার বহু আছে। তাদের কাউকে কাউকে দ্রুত সরিয়ে ফেলতে হবে।

ডাক্তার লেভিনের মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়লো। তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল যে, ইয়াগোডা তাঁকে এই ভাবে হত্যার কাজে লিপ্ত করাবে।

তাঁকে বিচলিত এবং বিভ্রান্ত দেখে ইয়াগোডা স্পষ্ট ভাষায় তাঁকে জানিয়ে দিল, এখন আমার কাছ থেকে আপনার সরে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। আমার সমস্ত জীবন নির্ভর করছে আপনার ওপর। আপনি ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণী এ-সম্বন্ধে কিছু জানলে, পৃথিবীতে হয় আপনি থাকবেন, না হয় আমি থাকবো। আজ

আপনি বিচলিত হয়ে পড়েছেন ; বাড়ী গিয়ে বিশ্রাম করুন। দু'-একদিন পরে আপনাকে ডেকে পাঠাব। ইতিমধ্যে আপনার যেন মনে থাকে, আমি কে···মনে থাকে যেন, O G P U-র যে সর্বময় কর্তা হবে, সে তার সব চেয়ে গোপন কথা আপনাকে বলেছে।

বিহ্বলের মত ডাক্তার লেভিন বাড়ী ফিরে আসেন। পরে ডাক্তার লেভিন নিজে তাঁর সেই সময়কার মনের অবস্থা সম্বন্ধে নিজেই স্বীকারোক্তি করেছেন : "এ-কথা বলা বাহুল্য যে, ইয়াগোডার সেই প্রস্তাব শুনে আমার মনের কি নিদারুণ অবস্থা হলো ! অষ্ট-প্রহর একটা তীব্র দ্বন্দ্বে অন্তর জ্বলে-পুড়ে যেতে লাগলো···নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। ইয়াগোডা স্পষ্টভাবেই আমাদের জানিয়ে দিয়েছিল, তার কথা মত যদি না চলি, তাহলে ভবিষ্যতে আমার বা আমার সংসারের কারুর নিস্তার থাকবে না। সেই নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা আর উদ্বেগ সহ্য করতে না পেরে, অবশেষে আমি তার কথাতেই রাজী হতে বাধ্য হলাম।"

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মেনঝিনস্কীর বেঁচে থাকাতে আমাদের কোন লাভ নেই, অতএব তার মৃত্যুকে আগিয়ে আনাই আমাদের প্রথম কাজ···

এই ভাবে ডাক্তার লেভিনকে চক্রান্তের মধ্যে টেনে নিয়ে, ইয়াগোডা তাঁর সঙ্গে আর একজন ডাক্তারের পরিচয় করিয়ে দিলেন, ডাক্তার কাজাকভ্। তিনিও মাঝে মাঝে মেন্‌ঝিনস্কীর চিকিৎসা করতেন। সেই বিভীষিকার পথে আর একজন সহধর্মীকে সহায়স্বরূপ পেয়ে ক্রমশ লেভিনের অন্তরের নৈতিক দ্বন্দ্ব শান্ত হয়ে এলো। সেই দুই ডাক্তার মিলে ইয়াগোডার নির্দেশ অনুযায়ী হত্যার নতুন পন্থা আবিষ্কারে মনোযোগ দিলো। তাদের প্রথম শিকার হলো মেনঝিনস্কী।

এখানে ডাক্তার কাজাকভের একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। যদিও পরবর্তী কালে প্রমাণিত হয় যে, লোকটি এ্যামেচার বৈজ্ঞানিক দলেরই একজন কিন্তু সেই সময় সে এমন ভাবে চিকিৎসকমণ্ডলীর উপর প্রভাব বিস্তার করে যে, অনেকের ধারণা হয়ে যায় যে সে বিশেষ প্রতিভাশালী একজন বৈজ্ঞানিক এবং তার গবেষণার দ্বারা চিকিৎসা-জগতে সে নিশ্চয়ই একটা যুগান্তর আনবে। অন্তত কাজাকভের নিজের সম্বন্ধে সেই বিশ্বাসই ছিল। তার জন্যে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট তাকে এক বিরাট লেবরেটরীর ভার ছেড়ে দেয় এবং তার গবেষণার জন্যে সমস্ত-কিছু সুযোগ-সুবিধা তাকে দেওয়া হয়। অবশ্য তার যে খানিকটা প্রতিভা ছিল, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই, নতুবা এতগুলি লোককে দীর্ঘকাল ধরে ধাপ্‌পা দিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো না। কিছুকাল পরে সে ঘোষণা করে যে, কতকগুলি বিশেষ রোগের সে এক স্বতন্ত্র চিকিৎসা-প্রণালী আবিষ্কার করেছে। সেই নতুন প্রণালীর সে নামকরণ করে Iysatotherapy. ল্যাটিন নামের আড়ালে সেই নতুন প্রণালীটির আসল বক্তব্য কি, তা সে তখন প্রকাশ করেনি। কাজাকভ্ বলে যে, বহু রোগীর ওপর পরীক্ষা করে সে এই প্রণালীতে বিশেষ সুফলই পেয়েছে কিন্তু প্রকাশ্য ভাবে জগতে ঘোষণা করবার অবস্থায় সে এখনো আসেনি। তাই তাকে এখন সে-প্রণালীটিকে সংগোপনেই রাখতে হয়েছে। অচিরকালের মধ্যেই সে বৈজ্ঞানিক-মহলে ঘোষণা করবে এবং তখন নিঃসন্দেহে সে বলতে পারে যে জগতের চিকিৎসা ব্যাপারে একটা যুগান্তর ঘটে যাবে। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট তাকে সন্দেহ করবার মত প্রমাণই তখন পায় নি, তাই তাকে পৃষ্ঠপোষকতাই করে এসেছে এবং সেই পৃষ্ঠপোষকতার সুযোগে সে চিকিৎসক-মহলে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছিল।

মেন্‌ঝিন্‌স্কী বহুদিন থেকে হাঁফানিতে ভুগছিলেন। ইদানীং ডাক্তার কাজাকভের চিকিৎসায় তাঁর খানিকটা উপশমও হয়েছিল। সেই জন্যে কাজাকভের ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস জন্মায়। তিনি সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে তার চিকিৎসা-ব্যবস্থার ওপর ছেড়ে দেন। তাঁকে সারিয়ে তুলতে পারলে, কাজাকভের সেই নতুন আবিষ্কারের একটা বড় রকমের স্বীকৃতি পাওয়া যাবে, সেই আশায় কাজাকভ্ ধীরে-সুস্থে খুব বিচক্ষণতার সঙ্গেই মেনঝিনস্কীর চিকিৎসা করছিল।

ইয়াগোডা ডাক্তার লেভিনকে নিযুক্ত করলো, কাজাকভ্‌কে সরাসরি সেই চক্রান্তে টেনে নিতে এবং যাতে করে মেনঝিনস্কীর মৃত্যু অচিরকালের মধ্যে ঘটে, তার ব্যবস্থা করতে।

একদিন লেভিন উপযাচক হয়েই কাজাকভের সঙ্গে দেখা করলো। মেনঝিনস্কীর অসুখ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে লেভিন রহস্যজনক ভাবে বলে বসলো, মেনঝিনস্কী তো জীবন্ত মড়া···তার ওপর আপনি অকারণে সময় নষ্ট করছেন।

লেভিনের কথার ইঙ্গিতে কাজাকভ্ বিস্মিত হয়ে তার দিকে চায়। এ-কথার তাৎপর্য্য কি ?

লেভিন বলে, এই সম্পর্কে একটা জরুরী পরামর্শ করবার জন্যেই আমি আপনার কাছে এসেছি।

তখনও পর্য্যন্ত লেভিনের কথার তাৎপর্য্য বুঝতে না পেরে কাজাকভ জিজ্ঞাসা করে, কি সম্পর্কে ?

লেভিন বলে, মেনঝিনস্কীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে।

ক্রমশ লেভিন তার অন্তরের আসল কথা কাজাকভের কাছে একটু একটু করে উদ্‌ঘাটিত করে। বলে, আমি ভেবেছিলাম, আপনাকে এতখানি বুঝিয়ে বলবার দরকার হবে না। আমি কি বল্‌ত চাইছি, আপনি একটুতেই তা বুঝে নেবেন। মেনঝিনস্কীর চিকিৎসা আপনি যতখানি আন্তরিকতার সঙ্গে করছেন, তা করবার কোন প্রয়োজন নেই। আপনার চিকিৎসায় তিনি একটু সেরেও উঠেছেন। কিন্তু তা হলে তো চলবে না।

কাজাকভের বিস্ময় উদগ্র হয়ে ওঠে। তখন লেভিন সোজাসুজি ইয়াগোডার কথা উত্থাপন করে বলে, আপনি যদি মেনঝিনস্কীকে সারিয়ে তোলেন, তাহলে ইয়াগোডার আর ঐ পদে অধিষ্ঠিত হওয়া এখন সম্ভব হয় না। অথচ ইয়াগোডাকে এই মুহূর্ত্তেই ঐ আসন দখল করতে হবে। আপনি তো ইয়াগোডাকে বিশেষ ভাবেই জানেন, তারই হাতে সব, এবং সে যে-জিনিস ধরে তা শেষ না করে ছাড়ে না এবং তার জন্যে যে-কোন পন্থা অবলম্বন করতে তার একটুও বাধে না।

কাজাকভ ভয়ে-বিস্ময়ে যেন প্রস্তরীভূত হয়ে যায়।

লেভিন আশ্বাস দেয়, আমারও ঠিক ঐ অবস্থা হয়েছিল কিন্তু ভেবে দেখলাম, যদি বেঁচে থাকতে হয় তবে ইয়াগোডাকে সাহায্য করা ছাড়া আর উপায়ান্তর নেই। আমি যে-ভাবে তার চিকিৎসা করছি, আপনি আর তার মধ্যে কিছু করবেন না। খুব সাবধান, যেন মেনঝিনস্কী বা জগতের আর কোন লোক, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র জানতে না পারে। এর বিরুদ্ধাচরণ যদি করেন, তাহলে জগতে যেখানেই থাকুক না কেন, ইয়াগোডার প্রতিহিংসা থেকে নিষ্কৃতি পাবেন না।

সেদিনের মত লেভিন চলে এল। কাজাকভ বুঝলো, এক ভয়াবহ অক্‌টোপাশের বন্ধনে সে পড়ে গিয়েছে।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আমেরিকার ক্রাইম-উপন্যাসে কাল্পনিক ঘটনা এর চেয়ে বেশী রোমাঞ্চকর নয়।

এই ঘটনার দু'-তিন দিন পরেই একদিন হঠাৎ কাজাকভের টেলিফোন বেজে উঠলো। টেলিফোন ধরতেই শুনতে পেলো, মেনঝিনস্কীর বাড়ী থেকে এক্ষুনি যাবার জন্যে তাকে ডাকছে। মেনঝিনস্কীর অবস্থা নাকি হঠাৎ খুবই খারাপ হয়ে পড়েছে···দম আটকে আসবার মতন হচ্ছে !

কাজাকভ তাড়াতাড়ি যন্ত্রপাতির বাক্স নিয়ে মেনঝিনস্কীর বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলো। বাড়ীতে ঢুকতেই একটা তীব্র তারপেনটাইনের গন্ধ তার নাকে এসে লাগলো। তারপেনটাইনের সঙ্গে অন্য আর একটা কিছু মেশানো আছে, যার জন্যে সুস্থ মানুষেরও সেই বাতাসে নিশ্বাস নিতে রীতিমত কষ্ট হয়। কাজাকভ সিঁড়িতে ওঠবার সময় নিজেই সেই গন্ধে মাথা ঘুরে পড়ে যাবার মতন হলো। নিজেকে সামলে নিয়ে পাশের লোককে জিজ্ঞাসা করলো, কিসের এই গন্ধ ?

লোকটি জবাব দিল, বাড়ীতে নতুন রঙ ধরানো হয়েছে, তার গন্ধ।

রোগীর ঘরের ভেতর ঢুকে কাজাকভ দেখে, দরজা-জানলা সব বন্ধ। সেই বন্ধ আবহাওয়ার মধ্যে মেনঝিনস্কী কোন রকমে অতি কষ্টে শ্বাস নিচ্ছেন। সমস্ত ঘর সেই তীব্র গন্ধে ভরপূর। ডাক্তারের অভ্যাস বশত কাজাকভ তাতাতাড়ি দরজা-জানলা সমস্ত খুলে দিল।

তার ফলে কিছুক্ষণ পরেই গন্ধটা পাতলা হয়ে গেল। সাময়িক ভাবে শ্বাসকষ্ট দূর করবার জন্যে কাজাকভ একটা ইন্‌জেকসন দিল। ফলাফল দেখবাব জন্যে রোগীর পাশেই বসে রইলো। ইনজেকসনের ফলে সেই নিদারুণ শ্বাসকষ্টটা দূরীভূত হয়ে গেল। ক্লান্ত হয়ে মেনঝিনস্কী ঘুমিয়ে পড়লো। কাজাকভ বাড়ী ফিরে এলো।

সঙ্গে সঙ্গে আবার ফোন বেজে উঠলো। O G P U-র সহকারী চেয়ারম্যান ইয়াগোডার অফিস থেকে ফোন এসেছে। ইয়াগোডা এক্ষুনি কাজাকভের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

কম্পিত অন্তরে কাজাকভ তৎক্ষণাৎ ইয়াগোডার অফিসের গোপন-কক্ষে তার সামনে হাজির হলো। দেখে, গম্ভীর-মুখ ইয়াগোডা বসে আছে। তাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করে উঠলো, মেনঝিনস্কীকে আপনি দেখতে গিয়েছিলেন ?

—হাঁ···হঠাৎ একটা জোর ধাক্কা লাগে বুকে··· সেই জন্যে বড় কষ্ট পাচ্ছিলেন······

—আপনার সঙ্গে লেভিনের দেখা হয়েছিল ?

কাজাকভের কণ্ঠ শুকিয়ে আসে, বলে—হাঁ !

চেয়ার থেকে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে পড়ে,

ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে ইয়াগোডা গর্জ্জন করে উঠলো, তাহলে কিসের জন্যে আপনি এত দেরী করছেন? কি সাহসে আপনি আর একজনের কাজের মধ্যে মাথা গলাচ্ছেন?

বিভ্রান্ত-মস্তিষ্ক কাজাকভ, বিহ্বল ভাবে জিজ্ঞাসা করে, আপনি কি বলছেন? কি চান আপনি আমার কাছ থেকে?

ইয়াগোডা বলে, কে বলেছিল আপনাকে ওষুধ দিয়ে মেনঝিনস্কীকে সারিয়ে তুলতে? যে মরে গিয়েছে, তাকে তাড়াতাড়ি শ্মশানে পাঠানোর ব্যবস্থাই এখন করতে হবে। মেনঝিনস্কীর বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই আর। অকারণে শুধু সে পথ জুড়ে আছে। শুধু আপনার নয়, সোভিয়েট রাশিয়ার কল্যাণকামী প্রত্যেকের পথ জুড়ে সে বসে আছে। অতএব আমার আদেশ, আপনি আর ডাক্তার লেভিন দুজনে মিলে এমন একটা ব্যবস্থা করুন, যাতে কেউ কোন সন্দেহ করতে পারবে না অথচ মেনঝিনস্কীকে মরতে হবে, বুঝলেন?

অতি স্পষ্ট কথা, এতটুকু ধোঁয়া তার মধ্যে নেই। কাজাকভের মাথার ভেতরে যেন ঝড় বইতে থাকে।

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে ইয়াগোডা বলে, হাঁ, আর একটা কথা···এই ব্যাপার যদি কেউ জানতে পারে অথবা আপনি যদি আমার বিরুদ্ধাচরণ কোন রকমে করতে যান, তাহলে জানবেন, আমি জানতে তো পারবোই এবং তখন আপনার নিষ্কৃতি নেই। এখন যান, ডাক্তার লেভিনের সঙ্গে পরামর্শ করে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফেলুন!

উন্মাদের মত কাজাকভ, বাড়ী ফিরে আসে। ভয়ে, দুশ্চিন্তায় কারুর সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করতে পারে না। কি করবে, কি করা উচিত, কিছুই ঠিক করতে পারে না। কার সঙ্গেই বা পরামর্শ করবে, সে যদি ইয়াগোডার স্পাই হয়! চারিদিকেই ইয়াগোডার স্পাই···কর্ত্তৃপক্ষদের জানাতে গেলে নিশ্চয়ই তার চরেদের দৃষ্টি এড়াতে পারবে না···বিশেষ করে এখন হয়ত, তার চারিদিকেই স্পাই ঘুরছে!

উন্মাদের মত একা-একা ঘরের মধ্যে বসে থাকে। একমাত্র লোক আসে, ডাক্তার লেভিন। লেভিন ক্রমশ তাকে বুঝিয়ে বলে, বর্ত্তমান পরিচালকদের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী চক্রান্ত গড়ে উঠেছে, সে-চক্রান্তে ইয়াগোডা, পিয়াটাকভ, রায়কফের মতন বড়-বড় অফিসররা যোগদান করেছেন, কার্ল র‍্যাডেক আর বুখারিনের মত খ্যাতনামা লেখক আর দার্শনিকেরাও আছেন এবং সেনানায়কেরাও অনেকে যোগদান করেছে। অচিরকালের মধ্যেই এই চক্রান্তকারীরা জয়ী হবে। সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তখন তাদের অবস্থাও যে খুব উন্নত হবে, সে-কথা বলাই বাহুল্য।

এই ভাবে কয়েক দিনের প্ররোচনায় লেভিন ক্রমশ কাজাকভের মনকে তৈরী করে আনে। নিরুপায় ভাবে সেই চক্রান্তের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে কাজাকভও, অবশেষে লেভিনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। ইয়াগোডার নির্দেশ অনুযায়ী হত্যার অভিনব প্রক্রিয়া আবিষ্কার করবার জন্যে তখন দুজনেই তৎপর হয়ে ওঠে। এবং অচিরকালের মধ্যেই তারা একটা ব্যবস্থা উদ্ভাবনও করে। মেনঝিনস্কীর ওপর সেই ব্যবস্থা প্রয়োগ করে তারা কৃতকার্য্যই হয়। লোকে শুনলো, মেনঝিনস্কী অনেক দিন ধরে হাঁফানিতে ভুগছিলেন হঠাৎ হৃদযন্ত্র বিকল হওয়াতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন।

কিন্তু এই ঘটনার বহুদিন পরে ডাক্তার কাজাকভের নিজের জবানবন্দী থেকে জানা যায় যে, তারা দুজনে মিলে তাঁকে এমন ভাবে ওষুধ পরিবেশন করে, যার ফলে তাঁর হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে যায়। মেনঝিনস্কীর মৃত্যু—মৃত্যু বটে কিন্তু হত্যা। জগতে যত বৃত্তি আছে, তার মধ্যে চিকিৎসকের বৃত্তি হলো সব চেয়ে পবিত্র, সব চেয়ে দায়িত্বপূর্ণ। গৃহ-চিকিৎসককে মানুষ বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করে। এই হলো জগতের সনাতন অভ্যাস। সেদিন রাশিয়ার চক্রান্তকারীরা সেই পবিত্রতম বিশ্বাসকে জঘন্যতম রাজনৈতিক স্বার্থে অপ-প্রয়োগ করে। মৃত্যু সম্পর্কে চিকিৎসককে কেউই অবিশ্বাস করে না। তাই সেদিন তারা সকলের চোখে ধূলো দিয়ে জঘন্যতম ঘাতকের কাজ করেও সমাজে নিরাপদে বাস করতে পেরেছিল। আমেরিকার ক্রাইম্ নভেলে এই জাতীয় বৈজ্ঞানিক হত্যার নানা রকমের কাহিনী আমরা পড়েছি, বাস্তব জীবনে তা যে এমন সত্য ভাবে দেখা দিতে পারে, তা কেউ কল্পনাও করেনি।

মেনঝিনস্কীর মৃত্যুর পর স্বাভাবিক ভাবেই ইয়াগোডা O G P U-র সর্বময় কর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত হলো।

ইয়াগোডা সংগোপনে যে টেরারিষ্ট দল গড়ে তুলছিল তার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ছিল ইয়েহকিড্‌জ্। তারই ওপর ভার ছিল কেন্দ্রের আসল পরিচালনার। ইয়েহুকিড্‌জ্‌ অবশ্য প্রচলিত ব্যবস্থা অনুযায়ী বুলেটকেই চিনতো কিন্তু ইয়াগোডা তাকেও সেই নতুন আবিষ্কৃত

অস্ত্রের প্রয়োগ-বিদ্যায় দীক্ষিত করে তোলো। রিভলবারের একটা প্রধান অসুবিধা, সে সশব্দে চীৎকার করে প্রয়োগকর্ত্তাকে জানিয়ে দেয়। আত্মগোপন করা অনেক সময় দুরূহ হয়ে ওঠে। সেই জন্যেই বহু ষড়যন্ত্র আঁতুড়-ঘরেই একটা রিভলবার ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায়। ইয়াগোডা তাই এই চিকিৎসক-ঘাতকের অস্ত্রকে ষড়যন্ত্র পরিচালনার পক্ষে সব চেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস বলে গ্রহণ করে। ইয়েহুকিড্‌জ্‌ অচিরকালের মধ্যেই ইয়াগোডার ব্যবস্থাকেই গ্রহণ করে এবং এই নতুন অস্ত্র প্রয়োগের জন্যে নতুন ভাবে দলের কর্ম্ম-পদ্ধতিকে অদল-বদল করতে হয়। তখন ক্রেমলিনের ভেতর তাদের দলের অন্যতম প্রধান কর্ম্মীরূপে ছিল, তেনিয়ামিন এ, ম্যাকসিমভ। সে তখন ছিল সুপ্রীম কাউন্সিল অফ ন্যাশন্যাল ইকনমীর চেয়ারম্যান কুইবিশেভের সেক্রেটারী। ম্যাকসিমভকে ডেকে ইয়েহুকিড্‌জ্‌ তাদের নতুন কর্ম্মপ্রণালীর কথা যখন জানালো, পুরোন টেরারিষ্টরূপে ম্যাকসিমভের মনটাও কেমন যেন তাতে হঠাৎ সায় দিতে পারলো না। কিন্তু ইয়েহুকিড্‌জ্‌ তাকে বুঝিয়ে বললো এখন আর প্রত্যাবর্ত্তন করবার উপায় নেই, তারা এই নতুন ব্যবস্থা সম্পর্কে রীতিমত অনেকখানি অগ্রসর হয়েও গিয়েছে এবং তার জন্যে দুটি বিচক্ষণ ডাক্তার রীতিমত ল্যাবরেটারীতে গবেষণা করছে—কোন্ কোন্ রোগে কি ভাবে কি ওষুধ প্রয়োগ করলে লোকে সহসা সন্দেহ করতে পারবে না। এই ভাবে তারা বিনা সন্দেহে অনেকগুলি বড় মাথাকে সারিয়ে ফেলতে পারবে। টেরারিজিমের এর চেয়ে ভাল অস্ত্র আর কিছু হতে পারে না।

কুইবিশেভ তখন মধ্যে মধ্যে হার্টের অসুখে কষ্ট পাচ্ছিলেন। ইয়াহুকিড্‌জ্‌ ম্যাকসিমভকে পরামর্শ দিল, তার সেক্রেটারিরূপে তাকে শুধু ব্যবস্থা করে দিতে হবে, যাতে তাদের নিযুক্ত ডাক্তারই কুইবিশেভকে চিকিৎসা করতে পারে এবং চিকিৎসা করবার সময় যাতে তারা অবাধে আসা-যাওয়া করতে পারে। আর একটা বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখতে হবে, যদি কখনও অসুখ বাড়াবাড়ি হয় তাহলে যেন সে-সময় বাইরের অন্য কোন ডাক্তারকে আর না ডাকা হয়। আর যা-কিছু করবার তা তাদের ডাক্তারেরাই করবে।

যথাকালে ম্যাকসিমভ ডাক্তার লেভিনের সঙ্গে কুইবিশেভের যোগাযোগ করে দিল এবং লেভিনের চিকিৎসাধীনে প্রথমটা কুইবিশেভ একটু ভালও বোধ করতে লাগলেন। হঠাৎ তার কয়েক সপ্তাহ পরে একদিন কুইবিশেভের বুকের ভিতর অসহ্য যন্ত্রণা করে উঠলো, অফিসের কাজ ছেড়ে বাড়ীতে গিয়ে বিছানায় শুতে বাধ্য হলেন। সেক্রেটারী ম্যাকসিমভ সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। তৎক্ষণাৎ ডাক্তার লেভিনকে খবর পাঠানো হলো। ডাক্তার লেভিন এসে রোগীকে দেখে বুঝলেন যে, তাঁর ওষুধের কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

সেদিন একটা ইন্‌জেকসন দেওয়ার ফলে কুইবিশেভ সাময়িক ভাবে একটু স্বস্তি পেলেন। নিভৃতে ম্যাকসিমভকে ডেকে লেভিন জানালো, এই রকম ভাবে হঠাৎ আবার আর একদিন ব্যথা উঠবে। তোমাকে শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে সেই অবস্থায় রোগী শুয়ে না পড়ে। অন্তত কয়েক মিনিট নাড়াচাড়া পেলেই আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হয়ে যাবে।

ভাগ্যক্রমে তার কয়েক দিন পরেই অফিসে কাজ করতে করতে কুইবিশেভের বুকে আবার সেই রকম বেদনা জেগে উঠলো। ম্যাকসিমভ পাশের ঘরেই ছিল। লেভিনের নির্দ্দেশ মত সে কুইবিশেভকে বললো, চলুন, তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে যাই। এবং সেই অসুস্থ লোককে হাঁটিয়ে বাড়ীতে নিয়ে এলো। তেতলার উপরে ছিল কুইবিশেভের ঘর। তেতলার সিঁড়ি ভেঙ্গে কুইবিশেভ যখন নিজের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, তখন আর তার কথা বলবার শক্তি ছিল না। পরিচারিকা ছুটে এসে তাকে ধরে বিছানায় শোয়াতে শোয়াতে তার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়ে গেল।

ম্যাকসিমভ ফোনে ইয়াহুকিড্‌জ্‌কে সে-সংবাদ জানালো। ইয়াহুকিড্‌জ্‌ বুঝলো, ডাক্তার লেভিনের চিকিৎসা-বিদ্যার জ্ঞান সত্যই প্রশংসনীয়। কি উপায়ে ডাক্তার লেভিন কুইবিশেভের মৃত্যুকে আগিয়ে আনেন, তার নিখুঁত বৈজ্ঞানিক বর্ণনা পরবর্ত্তী কালে সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ তার কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছিলেন। ডাক্তার লেভিনের জবানবন্দী মস্কো-বিচারের সরকারী কাগজপত্রে নথী-বদ্ধ হয়ে আছে। মাইকেল সেয়ারস তার বিখ্যাত বই "The great conspiracy against Russia" পুস্তকের ৯১ পৃষ্ঠায় সেই সরকারী নথী থেকে ডাক্তার লেভিনের উক্তি যথাযথ ভাবে উদ্ধৃত করে দিয়েছেন।

কুইবিশেভের হত্যায় কৃতকার্য্য হয়ে ডাক্তার লেভিন, তাঁর তৃতীয় শিকার হিসাবে জগৎ-খ্যাত সাহিত্যিক ম্যাক্‌সিম্ গর্কীকে গ্রহণ করেন। এবং তাঁর প্রতিভার চরম প্রমাণস্বরূপ, এ ক্ষেত্রেও তিনি কৃতকার্য্য হন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পেশকভের অপরাধ, তার তরুণী স্ত্রী ছিল অপরূপ সুন্দরী।

অতঃপর ইয়াগোডার দৃষ্টি পড়লো, জগৎ-খ্যাত সাহিত্যিক ম্যাকসিম্ গর্কী এবং তাঁর একমাত্র পুত্র পেশকভের ওপর।

এই সম্পর্কে ট্রটস্কীরও আগ্রহ কম ছিল না। হত্যার তালিকায় গর্কীর নামকে পয়লা থাকে রাখার মধ্যে তাঁরও যে যথেষ্ট প্রভাব ছিল, সে-বিষয়ে আজ আর কোন সন্দেহ নেই। যে ব্যক্তিটির মারফৎ তিনি রাশিয়া থেকে সংবাদ আদান-প্রদান করতেন, সেই সাঙ্গ বেসোনভ পরবর্তী কালে যে স্বীকারোক্তি করে, তাতে জানা যায় যে, ১৯৩৪ সালের জুলাই মাস নাগাদ তার সঙ্গে ট্রটস্কীর এই সম্পর্কে একটা পাকা কথাবার্তা হয়ে যায়। তাকে বুঝিয়ে ট্রটস্কী বলেন, ষ্টালিনের ওপর এখন যদি কারুর বিশেষ কোন প্রভাব থাকে, তাহলে সে ব্যক্তি হলো একমাত্র গর্কী। আমেরিকার এবং রাশিয়ার বাইরে অন্য সব দেশে বর্তমান সোভিয়েট রাষ্ট্রের অনুকূল অবস্থা তৈরী করার ব্যাপারে, গর্কীই হলো ষ্টালিনের প্রধান সহায়। রাশিয়ার ভেতরেও, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মস্তিষ্ক-জীবিদের মধ্যে অনেকে, যারা আগে আমাদের দলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল, গর্কীর লেখা এবং সাহিত্যিক প্রতিপত্তির দরুণ—তারা এখন আমাদের বিরূপ হ'য়ে উঠেছে। অতএব আমাদের দলের অগ্রগতির পক্ষে এখন এই লোকটিই সব চেয়ে বড় বাধা সৃষ্টি করেছে। তাই পিয়াটাকভ্‌কে আমার দ্ব্যর্থহীন আদেশ পৌছে দেবে, যেমন করেই হোক অচিরকালের মধ্যে গর্কীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

গর্কীর তখন বয়স প্রায় সত্তর হয়ে এসেছে। বৃদ্ধ। সারা জীবন দুঃখ দৈন্য এবং অসাধারণ দুর্দৈবের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে তাঁর দেহ জীর্ণ হয়ে এসেছে। তা ছাড়া যৌবনের সেই অনাহারী অর্দ্ধাহারী দিনগুলির ছাপ স্থায়িভাবে তাঁর দেহাভ্যন্তরে রয়ে গিয়েছিল। ক্ষয়রোগে তাঁর শ্বাস-যন্ত্র আক্রান্ত হয় এবং সেই থেকে তাঁর হার্টের অবস্থা খুব খারাপ হয়েই ছিল। অতি সযত্নে সেই ক্লান্ত রোগ-জীর্ণ দেহকে লালন-পালন করে তাঁকে বেঁচে থাকতে হয়।

কিন্তু তাঁর মনের শক্তি এতটুকু কমে নি। সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে তিনি নিপীড়িত মানবতার যে মুক্তি-বাণী প্রচার সুরু করেন যৌবনে, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁর কলম সেই মহৎ আদর্শ সমান ভাবেই প্রচা[র] করে চলে। মানবতার কল্যাণ-মন্ত্রের যে আদর্শ তি[নি] গ্রহণ করেন, কোন প্রলোভনে, কোন রাজনৈতিক যুক্তির কাছে সে-আদর্শকে তিনি বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ করে[ন] নি। উনিশ শো পাঁচে রাশিয়ায় প্রথম যে গণ-বিপ্ল[ব] হয়, তিনি তার একজন নেতা ছিলেন। বোলশেভিক অভ্যুত্থানের প্রথম যুগে সদ্য-বন্ধন-মুক্ত সশস্ত্র শ্রমিকরা যখন নবলব্ধ শক্তির উন্মাদনায় কালাপাহাড়ী মূর্তিতে অতীতের সমস্ত শিল্প-স্মৃতি ধ্বংস করতে অগ্রসর হয়, তখন সেই উন্মাদ বিভ্রান্তির মধ্যে, প্রবল জনমতকে উপেক্ষা করে, একমাত্র গর্কীই সেদিন সেই আত্মঘাতী সর্বনাশ থেকে তাদের বিরত করতে অগ্রসর হন। ফলে কিছুকালের জন্যে, সেই যুগের নায়কদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। পরে যখন সেই গণ-উন্মাদনার তরঙ্গ শান্ত হয়ে আসে, তখন লেনিন পুনরায় গর্কীকে সেই তরুণ রাষ্ট্রের ভাব-ভিত্তি গঠনের জন্যে আহ্বান করেন। এবং লেনিনের আহ্বানে গর্কী সেদিন কম্যুনিজিমের অন্তর্নিহিত মানবীয়তার সুরকে আবার জগতের সামনে অনবদ্য সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেন। লেনিন যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন গর্কীর সঙ্গে তিনি যোগসূত্র বজায় রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করতেন এবং বহু জটিল সমস্যায় লেনিন গর্কীর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। ষ্টালিনও গর্কীকে সেই মর্য্যাদা দান করেন এবং বে-সরকারী ভাবে গর্কী ছিলেন, তদানীন্তন সোভিয়েট শাসকবর্গের সাহিত্যিক প্রতিনিধি। রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ লেখকরূপে নবীন লেখকদের ওপর তাঁর অসাধারণ প্রভাব ছিল এবং রাশিয়ার বাইরে সাহিত্য-জগতে গর্কীই 'ছিলেন রাশিয়ার প্রধানতম প্রতিনিধি।

নিজেদের গোপন-কেন্দ্রে ইয়াগোডা এক অধিবেশন আহ্বান করে এবং সে-অধিবেশনে সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে, অতঃপর গর্কীকেই সরিয়ে ফেলতে হবে। গর্কীর নামের সঙ্গে ইয়াগোডা তাঁর ছেলে পেশকভের নামও 'জুড়ে দেয়। পেশকভের ওপর ব্যক্তিগত কারণে তার আক্রোশ ছিল। গর্কী ও পেশকভ, দুর্ভাগ্য বশত দুজনেই ডাক্তার লেভিনের চিকিৎসাধীনে ছিলেন। পেশকভ দুর্বল হার্ট নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

ইয়াগোডার প্ল্যান-অনুযায়ী পেশকভকেই আগে হত্যা করবার ব্যবস্থা হয়। কারণ, ইয়াগোডা ভেবেছিল যে, পুত্রের শোকে হয়ত বৃদ্ধ গর্কী আপনা থেকেই মারা যাবে. মারা না গেলেও, এমন একটা

মানসিক অবস্থায় গিয়ে পড়বেন, যেখান থেকে তাঁর আর কোন কাজকর্ম্ম করা সম্ভব হবে না। ১৯৩৮ সালে ইয়াগোডার যখন বিচার হয়, তখন তাকে পেশকভের হত্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, কি উদ্দেশ্যে সে পেশকভকে হত্যা করতে চেয়েছিল? শেষ মুহূর্তে ইয়াগোডা তার আসল কারণ জানাতে রাজী হয় কিন্তু কোর্টের কাছে সে অনুরোধ জানায় যে, যদি গোপনে তাকে সে কথা প্রকাশ করতে দেওয়া হয়, তবেই সে বলতে পারে। এবং গোপনেই সে কোর্টকে সে-কথা জানায়। আমেরিকার রাষ্ট্র-দূত ডেভিস্ তাঁর বিখ্যাত বই Mission to Moscowতে এই গোপন কথার রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন। পেশকভ্‌কে হত্যা করার আসল উদ্দেশ্য হলো, পেশকভের সুন্দরী তরুণী পত্নী, যার রূপে ইয়াগোডা মুগ্ধ হয়েছিল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ইয়াগোডার কাছে ম্যাক্‌সিম গর্কীর হত্যা ছিল ঐতিহাসিক প্রয়োজন। হায় ইতিহাস!

ম্যাক্‌সিম গর্কী এবং পেশকভ্‌কে সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত যখন ইয়াগোডা প্রথম ডাক্তার লেভিনকে জানায়, তখন ডাক্তার লেভিনের মত লোকও ভীত ও বিচলিত হয়ে উঠেছিল। রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের তিনি ছিলেন গৃহ-চিকিৎসক। মানবতার চির-উপাসক সেই চিররুগ্ন বৃদ্ধ শুধু তাঁর ওষুধের ওপর ভরসা করেই জীবনের কর্ত্তব্য তখনও নিষ্ঠা সহকারে পালন করে চলেছিলেন। তখনও তাঁর কলমের জোর এতটুকুও কমে নি। গর্কী যে ইয়াগোডার দলের কণ্টকস্বরূপ, তা বুঝতে লেভিনের দেরী হয় নি কিন্তু তাঁর তরুণ পুত্র পেশকভ্, তাকেও সেই সঙ্গে সরিয়ে ফেলার কি দরকার, তা লেভিন কল্পনাও করতে পারেন নি। সেই ভয়াবহ পাপ-পঙ্কিলপথে তখন ইয়াগোডার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এতদুর নেমে গিয়েছিলেন যে, সে-পথ থেকে প্রত্যাবর্ত্তন করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। তবুও সেই প্রস্তাব শুনে লেভিন রীতিমত কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন।

লেভিনের সেই কুণ্ঠা দেখে ইয়াগোডা তাঁকে বুঝিয়ে বলেন যে গর্কীকে সরিয়ে ফেলা হলো, স্রেফ্ একটা ঐতিহাসিক প্রয়োজন। ইতিহাস দাবী করছে, তাঁর মৃত্যু। সুতরাং সে ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কোন দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। বিপ্লবীকে সমস্ত নৈতিক দুর্বলতার উর্দ্ধে উঠতে হবে।

এই সূত্রে ইয়াগোডা দিনের পর দিন লেভিনকে বোঝাতে থাকে, আজ সোভিয়েট শাসকদের সব চেয়ে বড় বন্ধু হচ্ছে গর্কী। তাঁর পরামর্শের ওপর ষ্টালিন সব চেয়ে বেশী নির্ভর করে থাকে। তা ছাড়া রাশিয়ার বাইরে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গর্কীর প্রভাব অনন্যসাধারণ। সে ক্ষেত্রে গর্কীকে না সরিয়ে ফেললে, আমাদের দলের প্রতিপত্তি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। তাঁর একটা কথায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের মর্য্যাদা বিপন্ন হয়ে উঠতে পারে। সেই জন্যে স্থিরচিত্তে দলের কল্যাণের জন্যে, রাশিয়ার কল্যাণের জন্যে এই কাজের ভার আপনাকে নিতেই হবে। অচিরকালের মধ্যেই আমরা জয়ী হব, তখন আপনার কাজের পুরস্কার সকলের আগে বিবেচনা করা হবে।

এই জঘন্য প্রস্তাবকে গ্রহণ করতে ডাক্তার লেভিনের মত লোকেরও সেদিন হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কিন্তু ইয়াগোডা বিপ্লবের স্বধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে তার অন্তরের কুণ্ঠাকে ভাঙ্গতে উঠে-পড়ে লাগে। এটা হলো বিপ্লবের একটা অবশ্যম্ভাবী স্তর, সে-স্তরের মধ্যে দিয়ে তাদের প্রত্যেককেই যেতে হবে, তারা প্রত্যেকেই তার সাক্ষিস্বরূপ হয়ে থাকবে। সে ক্ষেত্রে দর্শকরূপে চুপ করে দাঁড়িয়ে না থেকে, তাদের উচিত সেই কাজের দ্রুত সমাধানের মধ্যে দিয়ে বিপ্লবের পরবর্তী স্তরকে আগিয়ে আনা। প্রত্যেকের হাতে যেটুকু ক্ষমতা আছে, তার প্রয়োগ করে বিপ্লবকে সার্থক করে তুলতে হবে। যখন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, তখন তাকে শেষ করতেই হবে।

লেভিনকে ইয়াগোডার নির্দ্দেশকে মেনে নিতেই হলো। এবং পিতার পূর্ব্বে পুত্রকে সরিয়ে ফেলবার জন্যে তিনি যথারীতি গবেষণা সুরু করে দিলেন। লেভিনের পন্থা অনুসারে যাকে সরিয়ে ফেলতে হবে, আগে তার দেহ-যন্ত্রের সমস্ত ব্যাপারটা নিখুঁত ভাবে অনুশীলন করে জেনে নিতে হবে। কোথায় দেহ-যন্ত্রের মধ্যে কি ত্রুটী আছে, এবং কি ভাবে ওষুধের সাহায্যে সেই ত্রুটীকে মারাত্মক করে তোলা যায়। যে-বিজ্ঞানকে মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করবার জন্যেই মানুষ সৃষ্টি করেছিল, সে দিন রাজনীতি-বিষ-দগ্ধ মানুষ তাকে মৃত্যুর কাজেই প্রয়োগ করলো। এই ভাবে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাহায্যে বেমালুম হত্যা করার অভিনব ক্রাইম্ রাশিয়ার বাইরে অন্য কোন কোন দেশেও দেখা দেয়। ভারতবর্ষেও তার দু'-একটা উদাহরণ খবরের কাগজের

পাতায় দৃষ্টিগোচর হয়। এই ক্রাইমের সফলতা নির্ভর করে অনুষ্ঠাতার বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বৈশিষ্ট্যের ওপর। যে যত-বড় বৈজ্ঞানিক, তার কাজ তত বেমালুম হবে।

পরবর্তী কালে ডাক্তার লেভিনের জবানবন্দী থেকে জানা যায়, কি উপায়ে তিনি পেশকভ্ এবং গর্কীকে ওষুধ প্রয়োগের দ্বারা হত্যা করেছিলেন। তার জন্যে তিনি দু'জনেরই দেহ-যন্ত্রের যে অংশ দুর্বল, তার সুযোগ গ্রহণ করেন। পেশকভের দেহ অনুশীলন করে, তিনি তিনটি দুর্বল ক্ষেত্র আবিষ্কার করেন। একটি হলো, Cardiac vascular system ; আর একটি হলো respiratory organs ; এবং তৃতীয়টি হলো vegetative nervous system. তিনি অনুশীলন করে দেখেছিলেন যে, পেশকভের দেহ-গত এই তিনটি দুর্বল ক্ষেত্রের দরুণ, এক ফোঁটা মদও তার দেহে সহ্য হতো না কিন্তু পেশকভ্ তা সত্ত্বেও নিয়মিত মদ খেতেন। ডাক্তার লেভিন তাকে সে-সম্বন্ধে সতর্ক হবার কোন উপদেশই দেন নি, বরঞ্চ প্রত্যেক ওষুধের সঙ্গে ঘনীভূত তীব্র সুরা মেশাতে আরম্ভ করলেন। তার ফলে একদিন হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে মারাত্মক নিউমোনিয়া দেখা দিল। ডাক্তার লেভিন চিকিৎসা সুরু করলেন। পাছে লেভিন দুর্বল হয়ে পড়েন, সেই জন্যে ইয়াগোডা তার কানে অষ্টপ্রহর জপতে লাগল, এই সুযোগ। ডাক্তাররা ইচ্ছা করলে যে ক্ষেত্রে একটা সুস্থ লোককে অনায়াসে মেরে ফেলতে পারে, সে ক্ষেত্রে একটা মুমূর্ষু রোগীকে নিয়ে এতদিন টাল-বাহানা করার কোন মানে হয় না!

লেভিন সযত্নে ওষুধ থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো বাদ দিয়ে, তার জায়গায় উত্তেজক মারাত্মক ওষুধগুলো পরিবেশন করতে লাগলেন। ফলে কয়েক দিনের মধ্যেই পেশকভ্ মারা গেল। লেভিন সার্টিফিকেট লিখলেন, নিউমোনিয়ায় মৃত্যু।

পুত্রকে সরিয়ে ফেলে এবার পিতার ওপর দৃষ্টি দিলেন। কিন্তু অসুবিধা হলো একটা ব্যাপারে। গর্কী প্রায়ই মস্কো ছেড়ে বাইরে চলে যেতেন। তখন আর ডাক্তার লেভিন কোন সুযোগ পেতেন না। যেটুকু কাজ ওষুধের মধ্যে দিয়ে হতো, বাইরে স্বাস্থ্যাবাসে বাস করার দরুণ তা কেটে যেতো। এই ভাবে পরের বৎসরের (১৯৩৬) গোড়ার দিকে হঠাৎ গর্কী মস্কোতেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। লেভিনের চিকিৎসার কৌশলে অচিরকালের মধ্যেই তা নিউমোনিয়াতে দাঁড়ালো। একেই তাঁর বুকের দোষ বরাবরই ছিল, তার ওপর নিউমোনিয়ার দরুণ তা সঙ্কটময় হয়ে উঠলো। এ-হেন ক্ষেত্রে যে সব ওষুধ প্রয়োগ করা উচিত, লেভিন সব ওষুধই দিতে লাগলেন। কিন্তু তার মাত্রা এমন ভাবে বাড়িয়ে দিলেন যে, তার ফল মারাত্মক হতে বাধ্য। ক্যাম্ফর আর ডিগালিন ইন্জেকসন দিয়েছেন, তাতে সন্দেহ করবার কারুর কিছু থাকতে পারে না। কারণ সে ক্ষেত্রে তাই ওষুধ। কিন্তু তার মাত্রা যে তিনি মারাত্মক ভাবে বাড়িয়ে দিয়েছেন, সেদিকে কারুরই নজর পড়লো না। শেষ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ডাক্তার লেভিন ক্যাম্ফরের চল্লিশটা ইন্জেকসন দিয়েছিলেন…তার সঙ্গে দুটো ডিগালিন…তার ওপর চারটে ক্যাফিন…তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে, আরো দুটো ষ্ট্রীক্‌নিন্ ইন্জেকসন্……

তার ফলে ১৮ই জুন ১৯৩৬, জগৎ স্তব্ধ শোকে শুনলো রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক এবং জগতের মানবতা-উপাসকদের অন্যতম অগ্রগণ্য লেখনী-নায়ক ম্যাকসিম্ গোর্কী তাঁর বেদনাময় জীবনের হাত থেকে মুক্তি অর্জন করেছেন।

কিন্তু সেই নিরীহ শোক-সংবাদের অন্তরালে কত-বড় যে একটা জঘন্য পাপের ষড়যন্ত্র ছিল, সেদিন কেউ তা কল্পনাও করতে পারে নি।

প্রথম জীবনের দারিদ্র্যের যে রূঢ় অভিজ্ঞতা তাঁকে সঞ্চয় করতে হয়েছিল, তার দরুণই তিনি গর্কী ছদ্মনাম গ্রহণ করেন। রুশ ভাষায় গর্কী মানে হলো তিক্ত। পৃথিবীর কাছ থেকে তিক্ততম আঘাত নিয়েই তাঁকে শেষ-বিদায় গ্রহণ করতে হলো।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

একদা হয়ত অচিরকালের মধ্যে, এই ভারতবর্ষ থেকেই আবার দ্বিতীয় বিবেকানন্দ পরিভ্রমণে বেরুবেন বিশ্বচিত্ত জয়ে………

গত যুগে সাম্রাজ্যবাদী য়ুরোপ আর বিত্ত-ব্যবসায়ী আমেরিকা সোভিয়েট রাশিয়ার অভ্যুদয়ে এতদূর শঙ্কিত এবং নার্ভাস্ হয়ে পড়ে যে, সেদিন তাদের সমস্ত ভাবনা-চিন্তা, ক্রিয়া-কর্ম কেন্দ্রীভূত হয়েছিল শুধু সেই উদীয়মান শক্তির নিধন-সংকল্পে। গত-যুগের য়ুরোপীয় রাজনীতির জটিল সন্ধি-পত্র এবং পরস্পর-গোষ্ঠীবদ্ধতার হেরফের, দূর থেকে লক্ষ্য করে দেখলে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার সেদিন-কার নার্ভাস্ বিভ্রান্তিতে সত্যিই লজ্জিত হয়ে উঠতে হয়। এবং আজ যে ভয়াবহ তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের দিকে পৃথিবী দ্রুত অগ্রসর হয়ে চলেছে, তার মূলেও দেখি, এই

দুই শক্তির পরস্পর সন্দেহ ও প্রতিযোগিতা। সেদিন সোভিয়েট রাষ্ট্রকে ধ্বংস করবার জন্যেই য়ুরোপ আর আমেরিকা সজ্ঞানে নাৎসী জার্ম্মাণীকে সৃষ্টি করে। সেদিন তারা নিজেরাই যে ফ্রাঙ্কেনষ্টাইনকে গড়ে তোলে, চিরকালের ঐতিহাসিক ভুলের অনুসরণ করে, সেদিন তারাও পরম নিশ্চিন্ত মনে ধরে নিয়েছিল যে, তা থেকে তাদের কোন আশঙ্কা নেই। এই ভাবে পাশ্চাত্য রাজনীতির কূট চক্রে তারা নিজেরাই এমন ভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে তা থেকে উদ্ধারের কোন সহজ পথ আজ আর তারা খুঁজে পাচ্ছে না। সেদিন সোভিয়েট রাশিয়াকে ধ্বংস করবার জন্যেই যারা সম্মিলিত হয়ে বিগতশক্তি জার্ম্মাণীকে আবার শক্তিশালী হয়ে ওঠবার সুযোগ দিয়েছিল, তারাই আবার কয়েক বছর পরে সেই সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে যেচে মিতালী করে, নাৎসী জার্ম্মাণীর প্রবল সমর-অভিযানকে রোধ করবার জন্যে। আবার তার কয়েক মাস পরেই, যখন নাৎসী জার্ম্মাণীর ধ্বংস হয়ে গেল, তখন, যে সোভিয়েট রাষ্ট্রকে সেদিন তারা নিজেরাই বন্ধুত্বের দ্বারা স্বীকার করেছিল, তখন তারই বিরুদ্ধে আবার তারা সঙ্ঘবদ্ধ হলো। এই ভাবে এক সংগ্রাম থেকে আর এক সংগ্রামে, ক্রমশ সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিকতার অন্তর্নিহিত চরম বিরোধিতাই পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। এবং একদিন এক প্রলয়ঙ্কর চরম সংগ্রামেই মানব-ইতিহাসের এই বিশেষ স্তরের শেষ অধ্যায় লেখা হবে। রক্ত-স্নাতা ধরণী হয়ত তখন ফিরে পাবে তার শুভ্র-শুচি মূর্তি, সূচনা হবে মানব-ইতিহাসের আর এক নূতন অধ্যায়। আজ শুধু এক শ্রেণীর মুষ্টিমেয় আদর্শবাদীর মনে এই পরম-জিজ্ঞাসা জেগে উঠেছে, যে-মানুষ লক্ষ-যোজন দূরের সূর্য্য-তারকার খবর সংগ্রহ করবার মত বুদ্ধি ধরে, যে-মানুষের মধ্যে আছে শক্তি, অণুর প্রাণ-বস্তু সন্ধান করে বার করবার, সে-মানুষ কি পারে না বিনা রক্তপাতে ইতিহাসের অনিবার্য্যতাকে স্বীকার করে নিতে? আজ যে ধনতান্ত্রিক রাজ্যলোলুপতা তার অস্তিত্বের শেষ-সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছে, তার সেই শেষ-বিদায়-রশ্মিকে অনেকে এখনও মনে করছেন তার উদয়-বিভারই ছটা বলে। আজ সমগ্র পৃথিবীর পটভূমিকায় জেগে উঠেছে মানব-সভ্যতার অনিবার্য পরিণাম-স্বরূপ, বিশ্ব-মানবের পরম অস্তিত্বের চরম দাবী। কোন জাতি নয়, সম্প্রদায় নয়, কোন বিশেষ রাষ্ট্র বা বিশেষ রাষ্ট্রমত নয়, আজ পৃথিবী জুড়ে মানুষ হিসেবে সকল মানুষের মুক্তির স্বপ্ন সত্য মূর্ত্তিতে জেগে উঠেছে। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে আজ সাধারণ মানুষের বুকে জেগে উঠেছে অসাধারণ কামনা, জেগে উঠেছে সাধারণ মানুষের বুকে বিশ্ব-পরিবারের সংগ্রামহীন মূর্ত্তি। সেই আদর্শকে যে-মতবাদ যতখানি সম্পূরণ করবে, স্বভাবতই আজ সেই মতবাদের দিকে সাধারণ মানুষ ততখানি এগিয়ে যাবে। তাকে বিলম্বিত করা হয়ত যায় কিন্তু তাকে অস্বীকার করবার আর উপায় নেই। আজ তাই রাজনৈতিকদের হাত থেকে কেড়ে নিতে হবে সংগ্রামে লিপ্ত করবার তাদের ক্ষমতা, আজ তাই সাধারণ মানুষকে নতুন চেতনায় জেগে উঠতে হবে···বিশ্বব্যাপী এক নতুন সত্যাগ্রহে··· কোন রাজনৈতিকের ক্ষমতা নেই কোন জাতিকে স্বাভাবিক পথ থেকে টেনে নিয়ে সংগ্রামে লিপ্ত করার। আজ তাই রাজনীতিতে নবরূপ দিতে হবে কল্যাণ নীতির। সেই পথই দেখিয়ে গিয়েছেন মহাত্মা গান্ধী। অহিংস অসহযোগের পথেই সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক-দের ষড়যন্ত্র ভেদ করে জগতে প্রতিষ্ঠা করতে পারে মানব-তন্ত্র, সাধারণ-তন্ত্র। হয়ত আগামী যুগে, পরিশ্রান্ত জনসাধারণ বিভিন্ন দেশে দেশে, ভারতের সেই মহা-পুরুষের আবিষ্কৃত নব রণনীতির প্রয়োগে যুদ্ধ-ব্যবসায়ী পাশ্চাত্য রাজনীতি-নেতাদের হাত থেকে বিশ্ব-সভ্যতার পরিচালনের দায়িত্ব কেড়ে নেবে। অন্তত আজকে যারা ভারতের ভাব-জীবনের নায়ক, তাঁদের প্রধান কর্ত্তব্য সেই আদর্শকেই জীবন্ত করে তুলে জগতের সামনে প্রকট করা।

একদা হয়ত কোন নিকট-ভবিষ্যতে এই ভারতবর্ষ থেকেই দ্বিতীয় বিবেকানন্দ আবার পরিভ্রমণে বেরুবেন বিশ্বচিত্ত-জয়ে, জগতের বিভিন্ন দেশের জনগণ-চিত্তে প্রতিষ্ঠা করতে এই নতুন কল্যাণ-তন্ত্রের বীজমন্ত্র। মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিরক্ষার জন্যে ভারতবর্ষে যে অর্থ-ভাণ্ডার গড়ে তোলা হচ্ছে, আমার মনে হয়, সেই ভাণ্ডার থেকে যদি মহারাজ অশোকের মতন আবার জগতের বিভিন্ন দেশে পীতবাস ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের প্রেরণ করা হয়, যাঁরা তাঁদের জীবন ও সাধনার মধ্যে দিয়ে জগতের কল্যাণ-অস্তিত্বকে মহাসত্যরূপে উপলব্ধি করেছেন, যাঁরা ভয়হীন, লোভহীন, স্বার্থহীন, যাঁরা দেশে দেশে পরিভ্রমণ করে সেই সব দেশের জন-সাধারণের সঙ্গে আত্মিক যোগ স্থাপন করবেন, তা হলেই এই মহাপুরুষের প্রকৃত স্মৃতিরক্ষা হয় এবং স্মৃতিরক্ষার এই হলো ভারতের সনাতন ধারা। স্বাধীন ভারতবর্ষ আজ বিভিন্ন রাষ্ট্রে রাজদূত এবং রাজপ্রতিনিধি নিয়োগ করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে আজ ভারতবর্ষ আবার তুলে নিক তার সনাতন ঐতিহাসিক পদ্ধতিকে, দিকে দিকে প্রেরণ করুক তার কল্যাণ-ধর্ম্মের

ব্রতধারীদের ; ইংলণ্ড যেমন তার রাষ্ট্রের সমস্ত শক্তি দিয়ে গড়ে তোলে সিভিল সার্ভিসের সেবকদের, তেমনি আজ স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্র গড়ে তুলুক তার নতুন সিভিল সার্ভিস্ প্রতিষ্ঠান, যে প্রতিষ্ঠানে নিবেদিত-জীবন তৈরী হবে এই সব বিশ্ব-পরিভ্রমণকারী ব্রতধারীর দল, রাজনৈতিকদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে দেশে দেশে সাধারণ মানুষের অন্তরে যাঁরা জাগিয়ে তুলবেন সকলকে নিয়ে বেঁচে থাকার এই কল্যাণ-আদর্শকে সবরমতীতে, শান্তিনিকেতনে, পণ্ডিচারী অরবিন্দ আশ্রমে, বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মঠে গড়ে উঠুক তার শিক্ষাকেন্দ্র…মন্ত্রিত্বের মোহ ত্যাগ করে কংগ্রেস তুলে নিক এই বিশ্ব-জোড়া সত্যাগ্রহ পরিচালনার ভার…বিশ্ব-সভ্যতার যে-রাজপথ দিয়ে একদিন ভারতবর্ষ যাতায়াত করতো, আবার উদ্‌ঘাটিত হোক মানব-কল্যাণের সেই রাজপথ…বিশ্বের ভাব-জীবনে নতুন করে প্রতিফলিত হোক ভারতের জাতিহীন বর্ণহীন আরণ্যক সভ্যতার উদার প্রভাব… ভারতের কণ্ঠে আবার ধ্বনিত হয়ে উঠুক, শৃণ্বন্তু বিশ্বে……

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আদিম বর্বর মানুষের সামরিক রীতি-নীতিতে যে ব্যক্তিগত শৌর্য্য ও বীর্য্যের আদর্শ ছিল বিংশ শতাব্দীর সভ্য মানুষের হাতে তা এক জঘন্য নীচ প্রবৃত্তিতে পরিণত হয়েছে।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিবেশী জার্ম্মাণীকে শক্তিশালী করে দাঁড় করাবার জন্যেই সেদিন বৃটিশ এবং ফরাসী রাজনৈতিকরা ভার্সেই চুক্তির লৌহ-নিগড়, যা তারা একদিন নিজেরাই পরাজিত জার্ম্মাণীর সর্ব্বাঙ্গে চাপিয়েছিল, তা একে একে খুলে দিতে চেষ্টা করে। ভার্সেই চুক্তির আড়ালে, আসল উদ্দেশ্য ছিল জার্ম্মাণীকে অস্ত্রহীন করা, যাতে জার্ম্মাণী আর নিকট-ভবিষ্যতে কোন দিন সমর-আয়োজন না করতে পারে। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার ক্রমবর্দ্ধমান প্রতাপের দিকে চেয়ে ফ্রান্স আর ইংল্যাণ্ড নিজেদের মনোভাব পরিবর্ত্তিত করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করলো। তখন ফ্রান্সের কর্ণধার পিয়ারে লাভাল্ আর ইংলণ্ডের পর-রাষ্ট্র বিভাগের কর্ত্তা হলেন স্যার জন সাইমন। তাঁরা দুজনে দেখাশোনা করে ঠিক করলেন যে, হতভাগ্য জার্ম্মাণীকে ভার্সেই চুক্তিতে যে-ভাবে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা হয়েছে, তা থেকে এখন তাকে একটু একটু করে রেহাই দেওয়া উচিত। সুতরাং যে-চুক্তি অনুযায়ী জার্ম্মাণী কোন সামরিক আয়োজন করতে পারতো না, সে-চুক্তি একরকম তুলে নেওয়া হলো। এবং জার্ম্মাণী যাতে দ্রুত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হতে পারে, উল্টে এখন তারই সাহায্য তাঁরা করতে লাগলেন। সামান্য সৈনিক থেকে যে-ব্যক্তিটি একটা সমগ্র জাতির প্রথম পুরুষে উন্নীত হয়েছিল, সেই দুরাকাঙ্ক্ষাবিলাসী হিটলার সম্পূর্ণ-মাত্রায় সে-সুযোগ গ্রহণ করলেন। সোভিয়েট রাশিয়াকে দেখিয়ে, হিটলার তাঁর নাৎসী বাহিনীকে এক অপূর্ব্ব সমর-সজ্জায় গড়ে তুললেন। এবং সেই সঙ্গে এক অভিনব প্রচার-বিজ্ঞানের সহায়তায় মধ্য-য়ুরোপের মধ্যে নাৎসী প্রসারের ভিত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। যে সার অঞ্চল নিয়ে ফ্রান্সের সঙ্গে মনোমালিন্য ছিল, আবার তা জার্ম্মাণীকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো। এই সার অঞ্চলই হলো জার্ম্মাণীর শিল্প-কেন্দ্রের প্রাণ, কারণ জার্ম্মাণীর কয়লা এখানকার খনি থেকেই সরবরাহ হয়। হিটলারের বৈদ্যুতিক প্রভাবে নাৎসী জার্ম্মাণী এক রকম রাতারাতি প্রথম শ্রেণীর সামরিক শক্তিতে পরিণত হলো। ১লা মার্চ্চ সার অঞ্চল জার্ম্মাণীর অধিকারভুক্ত হয়। তার পনের দিন পরেই, হিটলার প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা করেন যে অতঃপর ভার্সেই চুক্তি মানতে জার্ম্মাণী আর বাধ্য নয়। ইংলণ্ড আর ফ্রান্স কেউই তাতে বাধা দিল না। সঙ্গে সঙ্গে হিটলার জার্ম্মাণীর মধ্যে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন করলেন এবং তার পরের মাসেই জগৎ শুনলো, নাৎসী জার্ম্মাণী এক বিরাট আকাশ-বাহিনী গড়ে তুলেছে। ইংলণ্ড আর ফ্রান্স তখন পরমানন্দে হিটলারের এই সামরিক আয়োজনে পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করে চলেছে। স্যার জন সাইমনের পর ইংলণ্ডের পর-রাষ্ট্র বিভাগের ভার নিলেন স্যার স্যামুয়েল হোর। তিনিও পূর্ব্ববর্তীর পন্থা অনুসরণ করে হিটলারের সমরায়োজনে সাহায্য করতে লাগলেন। সোভিয়েট রাশিয়া স্পষ্ট বুঝতে পারলো, তার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্য-বাদীরা শেষবারের মতন সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে।

ট্রটস্কীর দলও অপেক্ষা করেছিল, এই লগ্নের জন্যে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই তারা আত্মপ্রকাশ করবে, সেই জন্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা যতই এগিয়ে আসতে লাগলো, ততই ট্রটস্কীর দলের ধ্বংসাত্মক কাজ ব্যাপকতর হতে লাগলো। যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যাতে সোভিয়েট কল-কারখানার মধ্যে একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা দেয়, তার জন্যে ট্রটস্কীর দল পূর্ণ উদ্যমে স্যাবোটাজ করতে সুরু করে দিল। গত যুদ্ধে নানা রকম নতুন যুদ্ধাস্ত্রের এবং যুদ্ধ-নীতির সৃষ্টি হয়েছে;

সেই সঙ্গে এই স্যাবোটাজের টেকনিকও যুদ্ধের একটা প্রধান অস্ত্ররূপে বিশেষ ভাবে উন্নত হয়। শত্রুর দেশের ভিতরে পঞ্চম বাহিনীরূপে সংগোপনে থেকে, কি করে তার কল-কারখানা, এবং যুদ্ধোপকরণ-নির্ম্মাণ-শিল্পকে ভেতর থেকে পঙ্গু এবং অচল করে দিতে পারা যায়, সেইটেই হলো স্যাবোটাজের প্রধান লক্ষ্য। এই স্যাবোটাজের কত যে বিভিন্ন মূর্ত্তি হতে পারে, তা নিম্নের তালিকা থেকে খানিকটা বোঝা যায়। এই সমস্ত কাজ ষ্টালিন-বিরোধী দলের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রত্যেক অপরাধীর নিজের স্বীকারোক্তি থেকে এর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

Ivan Knyazev—উরাল রেল-লাইনের একজন বিশিষ্ট কর্ম্মকর্ত্তা। ট্রটস্কী এবং জাপানী দলের গোপন প্রতিনিধি। এঁর ওপর ভার ছিল, রেলপথে ট্রেণ-দুর্ঘটনার স্মৃষ্টি করা। সৈন্য এবং সমর-উপকরণবাহী ট্রেণগুলিকে লাইনচ্যুত করিয়ে নষ্ট করা ছিল এঁর প্রধান কাজ। এঁর দল এই ভাবে পনেরোটি রেল-দুর্ঘটনার জন্মে দায়ী।

Leonid Serebryakov—রেলপথ-পরিচালনা বিভাগের একজন কর্ম্মকর্ত্তা :···এঁর উপর ভার ছিল, মালগাড়ীর চলাচল গোলমাল করে দেওয়া; যাতে করে খালি গাড়ীর যাতায়াত বাড়ে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা; এবং এঞ্জিনের শক্তি অকাজে নষ্ট করে দেওয়া, চেষ্টা করে রেলপথে এমন ভিড়ের স্মৃষ্টি করা যাতে করে ট্রেণ-চলাচল আটক থাকে।

Alexei Shestov—সাইবেরিয়ার কয়লার খনির পরিচালকদের অন্যতম। এঁর ওপর ভার ছিল যাতে খনির কাজে গোলমালের দরুণ কম কয়লা ওঠে এবং ইচ্ছে করে এমন সব ভুল করা যাতে খনির ভেতর দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়ে। এঁর কীর্ত্তিস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে Prokobyevek খনির অঞ্চলে এঁর দলের চেষ্টায় ষাট বার মাটির তলায় খনির ভেতর অগ্নিকাণ্ড ঘটে।

Yakov Drobnis—কামেরেভো অঞ্চলের শিল্প-কার্য্যের অন্যতম অধিনায়ক। এঁর ওপর ভার ছিল, বাজেট-নির্দ্দিষ্ট টাকা পরিকল্পনার অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় কাজেই যাতে নিঃশেষিত হয়ে যায় সেই রকম ব্যবস্থা করা; যে-সব তারিখে বড় বড় পরিকল্পনার সূচনা ঘোষণা করা হতো, এমন ভাবে তার প্রাথমিক আয়োজনে গোলমাল স্মৃষ্টি করা, যাতে সেই নির্দ্দিষ্ট তারিখ মেনে চলা অসম্ভব হয়। খনির ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা, যাতে এক মিনিটের নোটিশে খনিতে জলপ্লাবন এনে দিতে পারা যায়।

Mikhail Chernov—সোভিয়েট রাষ্ট্রের কৃষি-বিভাগের কমিশার বা মন্ত্রী। ট্রটস্কীর দলে যোগদান করার ওপরেও ইনি জার্ম্মাণ গুপ্তচর বিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। এঁর ওপর ভার ছিল, ঘোড়ার প্রজনন ব্যাপারে গোলমাল স্মৃষ্টি করা; ভাল জাতের বীজ ঘোড়াগুলোকে অসুখ ধরিয়ে নষ্ট করে ফেলা; চাষের ব্যাপারে ভাল ঘোড়াগুলো সরিয়ে তার জায়গায় পোকায় ধরা বীজ চালানো, যাতে করে উৎপাদন কম হয়, তার দিকে লক্ষ্য রাখা। ঘোড়া, গরু এবং ছাগলের মধ্যে রোগের বীজ ছড়িয়ে মড়কের স্মৃষ্টি করা। এই ভাবে পূর্ব্ব-সাইবেরিয়া অঞ্চলে ইনি প্রায় পঁচিশ হাজার ঘোড়া ধ্বংস করেন।

Vasily Sharangovitch—বায়লো-রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী। এঁর ওপর কৃষি-উৎপাদনের মাত্রা কমাবার ভার ছিল। শূকরদের মধ্যে প্লেগের বীজ ছড়িয়ে সেই অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ শূকর ধ্বংস করেন। বায়লো-রাশিয়ার সেনাবিভাগে অশ্বারোহীর বিশেষ প্রয়োজন। সেই জন্মে ঘোড়াদের মধ্যে এ্যানিমিয়ার মড়ক স্মৃষ্টি করেন, যাতে সেনাবিভাগ দরকার মত ঘোড়া না পায়।

এই তালিকা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, গত যুগের য়ুরোপের এক শ্রেণীর বিপ্লবীরা স্যাবোটাজকে রীতিমত একটা বৈজ্ঞানিক কার্য্য-পদ্ধতির আকার দান করে। এই নতুন পদ্ধতিকে ক্ষতি-বিজ্ঞানের দান বলা যেতে পারে। আদিম বর্ব্বর মানুষের সামরিক রীতি-নীতিতে যে ব্যক্তিগত শৌর্য্য ও বীর্য্যের আদর্শ ছিল, বিংশ শতাব্দীর সভ্য মানুষের হাতে তা ক্রমশ এক জঘন্য নীচ প্রবৃত্তিতে পরিণত হয়েছে। যে-জিনিস গড়ে তুলতে সভ্যতাকে প্রাণপাত করতে হয়েছে, নিরঙ্কুশ চিত্তে এক নিমেষের মধ্যে তাকে ধ্বংস করতে কোথাও তাদের বাধে না। বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সমর-বিজ্ঞান এই ক্ষতি-ধর্ম্মের নীচতায় প্রতিষ্ঠিত। এবং কত নিম্নে যে এ-কে সভ্য মানুষ নিয়ে যেতে পারে বা নিয়ে যাবে, তার ইয়ত্তা নেই। এই আত্মধ্বংসী সভ্যতার বিরুদ্ধে আজ ভারতবর্ষকে দাঁড়াতে হবে।

—

ষড়্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

য়ুরোপের রাজনীতি হলো শুধু সাময়িক সুবিধা আর স্বার্থের একরাত্রির কুটুম্বিতা।

১৯৩৫এ ফ্রান্সে মন্ত্রী-পরিবর্ত্তন ঘটে। বর্ষার আকাশে মেঘের পরিবর্ত্তনের মত এই বিচিত্র জাতির ভাগ্যাকাশে মন্ত্রিত্বের পরিবর্ত্তন ঘটে। এটা ফ্রান্সের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। পপুলার ফ্রন্ট গভর্ণমেণ্ট গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ট্রটস্কীকে তাঁরা ফ্রান্স থেকে তল্পী গোটাতে আদেশ করলেন। চির-যাযাবরের মত ট্রটস্কী আবার বেরুলেন আশ্রয়-অনুসন্ধানে। যেখানেই আবেদন করেন সেইখানেই রুদ্ধদ্বারের অভ্যর্থনা পান।

সৌভাগ্য বশত সেই সময় নরওয়েতে ট্রটস্কী তাঁর অনুকূল আশ্রয় পেলেন। সেই সময় নরওয়ের রাজ-নীতিতে যে দুটি দল প্রভাবশালী ছিল সে দুটি দলই সোভিয়েট-বিরোধী। একটি দলের নাম ওয়াকার্স পার্টি। কমিণ্টার্ণ থেকে সরে এসে এই দল ট্রটস্কীর আদর্শই গোপনে অনুসরণ করতো এবং দ্বিতীয় দলের নেতা ছিল, স্বনামখ্যাত কুইস্‌লিঙ মেজর ভিদ্‌কুন কুইস্‌লিঙ। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে কুইস্‌লিঙ নরওয়ের রাষ্ট্রদূতরূপে রাশিয়ায় যায় এবং সেখানে হোয়াইট রাশিয়ান্ এক রমণীকে বিবাহ করে। ১৯২৭ সালে যখন ইংলণ্ডের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন রাশিয়ায় বৃটিশ-স্বার্থ উদ্ধারক করবার জন্যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট গোপনে কুইস্‌লিঙকে নিযুক্ত করেন। কুইস্‌লিঙের এই কর্ম্মতৎপরতার দরুণ বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাকে 'কমাণ্ডার অফ দি বৃটিশ এম্‌পায়ার' উপাধিতে ভূষিত করেন। ওয়ার্কার্স পার্টি এবং এই কুইস্‌লিঙের চেষ্টার ফলেই ট্রটস্কী ওসলো থেকে কিছু দূরে এক নির্জন অঞ্চলে এক পরিত্যক্ত বাড়ীতে তাঁর তৃতীয় হেড-কোয়ার্টার্স গড়ে তুললেন। সেখান থেকে তিনি নাৎসী জার্ম্মাণী এবং জাপানের সঙ্গে একটা গোপন চুক্তির কথাবার্ত্তা চালাতে লাগলেন। ট্রটস্কী চাইলেন নাৎসী জার্ম্মাণী আর সাম্রাজ্যবাদী জাপানের সোভিয়েট-বিদ্বেষকে কাজে লাগাতে, নাৎসী জার্ম্মাণী চাইলো কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে, ষ্টালিনের বিরুদ্ধে ট্রটস্কীর বিদ্বেষকে কাজে লাগাতে। তাই বিন্দুমাত্র কোথাও বাধলো না নাৎসী জার্ম্মাণীর সঙ্গে রাজনৈতিক চুক্তি করতে। ভারতবাসীর পক্ষে এই জাতীয় রাজনৈতিক সুবিধাবাদীদের বুঝতে সত্যিই কষ্ট হয়। রাজনীতি যেন এমন একটা জিনিস যার সঙ্গে আদর্শবাদ বা নৈতিক ধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নেই। শুধু সাময়িক সুবিধা আর স্বার্থের এক রাত্রির কুটুম্বিতা। অথচ তার ওপর নির্ভর করছে, বিধাতার শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি, মানুষের অস্তিত্বের সমস্যা। এ খেলার পণ্য হলো সাধারণ মানুষ। অথচ এই গূঢ় লেন-দেনের ব্যাপারে বিন্দু-বিসর্গও তার জানবার কোন উপায় নেই। তাই আজ মনে হয়, গণ-চেতনাকে এই শ্রেণীর মুষ্টিমেয় রাজনৈতিবিদের একাধিপত্যের প্রভাব থেকে মুক্ত করতে হবে। তার অজ্ঞাতে তার ভাগ্য নিয়ে মারাত্মক ভাবে জুয়া খেলবে, তা কেন সাধারণ মানুষ সহ্য করবে? জগতের সাহিত্য কি এই সম্পর্কে তার কর্ত্তব্য পালন করবে না? দেশে দেশে গড়ে উঠুক নতুন সাহিত্যিকের দল, নতুন ভাবুকের দল, যারা অগ্নি-অক্ষরে এই ভয়াবহ ভবিতব্যতা সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে সাধারণ মানুষকে।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

জমাট হয়ে আসে ক্রমশ রাত্রির অন্ধকার…

ট্রটস্কী বিশেষ এক দূতের মারফৎ তাঁর এই গোপন চুক্তির কথা রাশিয়াতে কার্ল র‍্যাডেককে জানালেন। কার্ল র‍্যাডেক সেই পত্র পেয়ে দলের ওপর থাকের কয়েক জন বিশেষ নেতাকে নিয়ে এক পরামর্শ-সভা করলেন। সেই সভায় ট্রটস্কীর পত্রের বিষয় নিয়ে তাঁরা আলোচনা করে দেখলেন যে, ট্রটস্কীর চুক্তি অনুযায়ী অতঃপর তাঁদের জার্ম্মাণ এবং জাপানী গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের অধীনে কাজ করতে হবে। সেই চুক্তিতে ট্রটস্কী জার্ম্মাণ এবং জাপান গভর্ণমেণ্টকে শাসনভার হাতে পেলে যে-সব সুবিধা-সুযোগ দেবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন, সে-সম্বন্ধে তাদের বিশেষ কোন বক্তব্য নেই কিন্তু চুক্তির চরম সর্ত্ত হচ্ছে, ট্রটস্কীর দলকে অতঃপর অক্ষশক্তির নির্দ্দেশ অনুসারে চলতে হবে। যদিও তাঁরা কথা দিয়েছেন যে, প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে ট্রটস্কীর ওপরই থাকবে পরিচালনা-ভার।

পিয়াটাকভ্ ঠিক করলো, যে-কোন উপায়ে ট্রটস্কীর সঙ্গে দেখা করা প্রয়োজন এবং দেখা করে সামনাসামনি এই ব্যাপারের বিশদ আলোচনা করা দরকার। দূর থেকে এই নিয়ে বাদানুবাদ করা সম্ভব নয় এবং তার সময়ও নেই। যে-কোন উপায়ে এখন ট্রটস্কীর সঙ্গে একবার দেখা-সাক্ষাৎ করতে হবে। সেই সময় গভর্ণমেণ্টের কাজেই পিয়াটাকভ্ বার্লিনে যাচ্ছিলেন।

র‍্যাডেক এক দূত মারফৎ ট্রটস্কীকে তৎক্ষণাৎ খবর পাঠালেন, যে-কোন উপায়ে বার্লিনে পিয়াটাকভের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে।

বার্লিনে পৌছবার মাত্রই ডিমিট্রি বুখারশেভ নামে একজন রুশ পিয়াটাকভের সঙ্গে দেখা করে জানালো যে, ট্রটস্কী তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ষ্টার্ণার নামে একজন লোককে পাঠিয়েছেন।

পিয়াটাকভ্‌কে সঙ্গে নিয়ে ডিমিট্রি টিয়ারগার্টেন অঞ্চলের এক সরু গলিতে প্রবেশ করতেই রাস্তায় ষ্টার্ণারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ষ্টার্ণার তাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিল। পিয়াটাকভকে দেখেই ষ্টার্ণার তার হাতে এক টুকরো কাগজ দিল। কাগজে ট্রটস্কীর নিজের হাতে লেখা এক লাইনে সংক্ষিপ্ত পরিচয়-পত্র ছিল, ওয়াই, আই, (পিয়াটাকভের দলীয় নাম) পত্র-বাহক ষ্টার্ণারকে তুমি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে পার।

একান্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে ষ্টার্ণার পিয়াটাকভকে শুধু জানালো, ট্রটস্কী তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন। তাঁকে নিয়ে যাবার যা-কিছু আয়োজন করা দরকার, তা সে করবে। পিয়াটাকভ্‌ কি এরোপ্লেন করে ওসলোতে যেতে রাজী আছেন?

এই ভাবে এরোপ্লেনে প্রকাশ্য ভাবে ওসলোতে যাওয়ার মধ্যে জানাজানি হয়ে যাবার একটা গুরুতর আশঙ্কা আছে। কিন্তু ট্রটস্কীর সঙ্গে দেখা করারও একান্ত প্রয়োজন। ষ্টার্ণার জানালো, আলাদা একটা প্লেনের বন্দোবস্ত সে করবে। জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট তাকে সে-বিষয়ে সাহায্য করবে। সুতরাং জানাজানি হবার আশঙ্কা নেই। পিয়াটাকভ সম্মত হলো। ষ্টার্ণার জানালো, পরের দিন সকাল বেলা পিয়াটাকভ যেন একলা টেম্পেলহফ্‌ এয়ার-পোর্টে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত থাকে।

পরের দিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে এয়ার-পোর্টে পৌছতেই পিয়াটাকভ্‌ দেখে, ষ্টার্ণার পাসপোর্ট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে একটা আলাদা প্লেন তার জন্যেই অপেক্ষা করেছিল। পিয়াটাকভ্‌ গিয়ে উঠতেই প্লেন ওসলোর দিকে অগ্রসর হলো।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বৃহৎ এক বেড়াজাল ফেলে ষ্টালিন একসঙ্গে সবাইকে টেনে তুললেন।

ক্রমশ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে পড়তে আরম্ভ করে য়ুরোপের ওপর।

১৯৩৬ সালের নভেম্বর মাসের শেষের দিকে বার্লিন শহরে রিবেনট্রপের দফ্‌তরে জাপানী রাজদূত শুভাগমন করলেন, সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্ম্মাণী আর জাপানের মিলিত অভিযানের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গেল।

ট্রটস্কী-জেনোভিভ্‌ দলের গোপন বিপ্লবীরা ব্যগ্র হয়ে উঠলো···কখন বাইরে থেকে জার্ম্মাণী আক্রমণ করবে রাশিয়া। চারদিক থেকে তারি সম্ভাবনা এগিয়ে আসতে থাকে।

রাশিয়ার ভেতরে সমর আয়োজনের একটা তীব্র ব্যস্ততা সুরু হয়ে যায়। আসন্ন যুদ্ধের সময় সব চেয়ে আশঙ্কার কথা, দেশের ভিতর থেকে দেশবৈরী গোপন বিপ্লবীদের মারাত্মক ধ্বংস-ক্রিয়া···তাই ষ্টালিন পুরামাত্রায় O G P U-কে সজাগ করে তুললেন, দেশের ভেতর থেকে সমস্ত গোপন বিপ্লবীদের ছেঁকে বার করতে হবে···সময় নেই···মূল শুদ্ধ টেনে তাদের উপড়ে ফেলে দিতে হবে।

কিরূভের হত্যাকাণ্ড নিয়ে অনুসন্ধান তখনো চলছিল এবং একটু একটু করে অনুসন্ধানের মুখে বিস্ময়কর সব খবর ষ্টালিনের কাছে আসতে লাগলো। অনুসন্ধান সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত খুচরা ভাবে অপরাধীদের গ্রেফতার করার ফলে অনেক সময় অনুসন্ধান সম্পূর্ণ হবার আগেই মূল আসামীরা সতর্ক হয়ে সরে পড়ে। তাই তাদের ছাড়া রেখেই অনুসন্ধান-কাজ চালাতে হয়।

ইয়াগোডা ক্রমশ বুঝতে পারে সরকারী পদমর্য্যাদার নির্বিঘ্ন আড়ালে সে যে ভাবে বিপ্লবীদের সাহায্য করে চলেছিল, সে আড়াল বোধ হয় ভেঙ্গে গিয়েছে। শিকারীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থেকে সে স্পষ্ট বুঝতে পারে তার চারদিকে এবার যেন একটা বিরাট জাল তাকে গ্রাস করবার জন্য এগিয়ে আসছে। উন্মাদের মত সে তখন সমস্ত ভব্যতা, নীতি-জ্ঞানকে উড়িয়ে দিয়ে আত্মরক্ষার ছিদ্রপথের সন্ধান করতে থাকে।

তার দলের একজন প্রধান কর্ম্মী স্মার্ণভ তখন কারাগারে। কারাগারের ভেতর থেকে স্মার্ণভ বহু চেষ্টা করে কোড-লেখা একটা চিঠি বাইরে দলের কাছে পাঠায়। সে চিঠি অভীষ্ট লক্ষ্যে না পৌছে পৌছল ষ্টালিনের হাতে।

হঠাৎ একদিন ইয়াগোডা দেখলো, পুতনী ইনষ্টিটিউট থেকে বোরিসভ্‌কে জরুরী তলব করা হলো; বোরিসভ্‌ ছিল ইয়াগোডার দক্ষিণ হস্ত। ইয়াগোডার বুঝতে বাকি রইলো না যে, বোরিসভ্‌কে

জেরা করবার জন্যেই ডাক পড়েছে। ইয়াগোডার নির্দিষ্ট গাড়ীতে বোরিসভ যাত্রা করলো স্মলনী ইনষ্টিটিউটের দিকে। বোরিসভ যাতে কিছুতেই পৌঁছতে না পারে সেখানে···তার ব্যবস্থা করতে ইয়াগোডা বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা দেরী করলো না। পথের মধ্যেই ভীষণ এক মোটর দুর্ঘটনায় বোরিসভ তৎক্ষণাৎ মারা গেল।

একটা সাক্ষীর হাত থেকে ইয়াগোডা বাঁচলো। কিন্তু সাক্ষী যদি একটাই হতো, তাহলে ইয়াগোডা নিশ্চিন্ত থাকতে হয়ত পারতো। ক্রমশ উন্মাদের মত আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে দিয়ে সে আরো বিপন্ন হয়ে পড়তে লাগলো। কালবিলম্ব না করে সোভিয়েট রাশিয়ার ভেতরে প্রত্যেক শহরে ধর-পাকড় সুরু হয়ে গেল। সারা দেশব্যাপী এক বেড়াজালে ষ্টালিন একসঙ্গে সমস্ত বিপ্লবীদের ছেঁকে তুললেন। সমগ্র জগৎ বিস্মিত হয়ে শুনলো, সোভিয়েট রাশিয়ার ভেতরে সোভিয়েট শাসকদের বিরুদ্ধে এক মারাত্মক ষড়যন্ত্রের কথা। ক্যামেনভ, জেনোভিভ, সবাই সেই ষড়যন্ত্রে পুনরায় কারারুদ্ধ হলেন। একদিন যারা লেনিনের পাশে দাঁড়িয়ে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জ্জন করেছিল, সেই ষড়যন্ত্রের আসামীর তালিকায় দেখা গেল, তাদেরই অধিকাংশের নাম···

মস্কো শহরে ট্রেড য়ুনিয়ন প্রতিষ্ঠানের বিখ্যাত অকটোবর হলে এই জগৎখ্যাত বিচারের অধিবেশন বসলো···বিচারক হলেন, সোভিয়েট রাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের সামরিক বিভাগ। সমসাময়িক ইতিহাসে এই বিচার "মস্কো ট্রায়াল্" নামে পরিচিত।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের তরফ থেকে উকীল হলেন ভিসিন্স্কী, আজকে সোভিয়েট য়ুনিয়নের সহকারী পররাষ্ট্র-সচিবরূপে যাঁর নাম জগতের রাজনৈতিক মহলে অতি সুপরিচিত। ভিসিন্স্কীর জেরায় ক্রমশ য়ুরোপব্যাপী এই বিরাট ষড়যন্ত্রের কথা একে একে প্রকাশিত হতে লাগলো।

ভিসিন্স্কী জেরা করছেন ভ্যালেনটাইন ওল্‌বার্গকে ···যে-সব টেরারিষ্টদের ট্রটস্কী স্বয়ং জার্ম্মাণী থেকে পাঠিয়েছিলেন, ওলবার্গ তাদেরই একজন,—

—ফ্রিডম্যান্ সম্বন্ধে তুমি কি জান?

—বার্লিনে ট্রটস্কী-পন্থীদের যে দল ছিল, ফ্রিডম্যান্ তার একজন বিশিষ্ট সভ্য···তাকে সোভিয়েট য়ুনিয়নে পাঠানো হয়।

—তুমি কি জান যে, জার্ম্মাণ গুপ্তচর বাহিনীর সঙ্গে ফ্রিডম্যানের যোগ ছিল?

—আমি শুনেছি সে-কথা।

—জার্ম্মাণ পুলিশের সঙ্গে বার্লিনের এই ট্রটস্কীর দলের রীতিমত ধারাবাহিক যোগ ছিল···তাই নয় কি?

—হাঁ···তাই···এবং ট্রটস্কীর অনুমোদনেই তা সম্ভব হয়েছিল।

—ট্রটস্কী এ-সম্বন্ধে জানতেন এবং এই ব্যাপারের পেছনে তাঁর অনুমোদন ছিল, তুমি কি করে জানলে?

—ট্রটস্কী আর পুলিশের মধ্যে যে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল, আমি নিজে ছিলাম তার একটা সংযোজক। ট্রটস্কীর অনুমোদন নিয়েই আমি এদের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে সংযুক্ত হই।

—কাদের সঙ্গে?

—ফাসিস্তি গোপন পুলিশবাহিনীর সঙ্গে।

—তাহলে এ-কথা আমরা ধরে নিতে পারি যে তুমি নিজে স্বীকার করছো তোমার সঙ্গে গেষ্টাপো-বাহিনীর যোগ ছিল?

—আমি তা অস্বীকার করছি না। ১৯৩৫ থেকে জার্ম্মাণ ট্রটস্কীপন্থীদের সঙ্গে জার্ম্মাণ ফাসিস্তি পুলিশের যোগাযোগ চলতে থাকে।

এই জেরা প্রসঙ্গে ওলবার্গ বিশদ ভাবে বর্ণনা করে কি ভাবে কখন সে রাশিয়াতে আসে। দক্ষিণ-আমেরিকান্ সেজে সেখানকার এক জাল পাসপোর্ট নিয়ে সে সোভিয়েট য়ুনিয়নে প্রবেশ করে। এই পাসপোর্ট তাকে জোগাড় করে দেয় টুকালেভেস্কী, প্রাগের একজন জার্ম্মাণ গুপ্তচর অফিসর।

ট্রটস্কীর অন্যতম দূত, নাথান্ ল্যুর, জেরার উত্তরে বলে যে জার্ম্মাণী ত্যাগ করবার সময় তাকে আদেশ দেওয়া হয়, সোভিয়েট য়ুনিয়নে গিয়ে সে যেন জার্ম্মাণ এঞ্জিনীয়ার ফ্রানজ্ হবুইট্‌জএর সঙ্গে দেখা করে এবং তার নির্দ্দেশ মত কাজ করে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সোভিয়েট রাশিয়াতে যে বিরাট শিল্প-উন্নয়নের কাজ সুরু হয়েছিল, তাতে জার্ম্মাণ-বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া হয়।

ভিসিনস্কী ল্যুরেকে জেরায় জিজ্ঞাসা করেন,—ফ্রানজ্ হবুইট্‌জ্ কে?

ল্যুরে জবাব দিল, ফ্রানজ জার্ম্মাণীর নাৎসী দলের একজন বিশিষ্ট সভ্য। হিম্‌লারের নির্দ্দেশ মত তিনি সোভিয়েট রাশিয়াতে প্রেরিত হয়েছিলেন।

—তাহলে ফ্রানজ্‌কে হিম্‌লারের প্রতিনিধি বলতে পারি?

—হিম্‌লারের ব্যবস্থা মতই তিনি রাশিয়াতে

আসেন, সেখানে গোপনে বিপ্লবাত্মক কাজ চালাবার জন্যে।

এই ভাবে ভিসিনস্কীর জেরার ফলে এক একজন আসামীর স্বীকারোক্তি থেকে এই বিরাট ষড়যন্ত্রের বিভিন্ন স্তরের কথা প্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত এই ষড়যন্ত্রের একটা প্রধান স্তরের কথা অপ্রকাশিতই ছিল। এই স্তরের সঙ্গে বুখারিন, র‍্যাডেক, টমস্কী প্রভৃতি জড়িত ছিলেন। অবশেষে ক্যামেনভ, জেরায় ভেঙ্গে পড়ে এবং স্বীকারোক্তি করতে বাধ্য হয়। ক্যামেনভের স্বীকারোক্তি থেকেই এই স্তরের সকল কথা প্রকাশিত হয়ে পড়লো।

ক্যামেনভ, জেরায় প্রকাশ করে, পাছে আমরা ধরা পড়ে যাই, এই আশঙ্কায় আমরা আলাদা একটা ছোট দল গড়ে তুলি, সেই দলের ওপরই আসল বিপ্লবাত্মক কাজ হাঁসিল করবার ভার দেওয়া হয়। বাহ্যত সেই দলের সঙ্গে আমরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখতে চেষ্টা করি। এই দলের কর্তৃত্ব দেওয়া হয় সোকোলনিকভের ওপর। ট্রটস্কীর পক্ষ থেকে এই দলে প্রতিনিধিত্ব করে সেরিব্রিয়াকভ, আর র‍্যাডেক। ১৯৩২ সালে আমি নিজে বুখারিন আর টমস্কীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা সুরু করি, তাদের হাব-ভাব জানবার জন্যে। এই কথাবার্ত্তার ফলে জানতে পারলাম, তারা দুজনেই আমাদের মতে সায় দিতে রাজী। টমস্কীর মধ্যবর্তিতায় রায়কভের সঙ্গে যোগ স্থাপনের চেষ্টা করি। রায়কভের মনের কথা জানবার জন্যে টমস্কীকে ঠিক করা হয়। টমস্কী জানায়, রায়কভও আমাদের মত ও পথ গ্রহণ করতে রাজী। বুখারিন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি যে, বুখারিনও ঠিক আমার মতই ভাবছে, তবে তার পন্থা আলাদা। আমাদের পার্টি যে কায়দা মাফিক অগ্রসর হয়ে চলেছে, তাতে তার অনুমোদন নেই। সে সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত্র চালে এগুচ্ছে। তার পন্থা হলো, কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে থেকে, পার্টির নায়কদের ষোল আনা বিশ্বাস অর্জন করা।

ক্যামেনভের এই স্বীকারোক্তির ফলে বিরুদ্ধ দলের সমস্ত আশা-ভরসা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। নিরুপায় দেখে কেউ কেউ ক্ষমা-প্রার্থনার জন্যে স্বেচ্ছায় আবেদন করলো এবং অকপটে সমস্ত ভেতরের কথা, তারা যা জানতো তা সরকারী উকিলের হাতে তুলে দিল। কেউ কেউ ভাগ্যের হাতে নিজেদের ছেড়ে দিয়ে অন্তিম শাস্তির অপেক্ষায় মনকে প্রস্তুত করতে লাগলো।

ড্রিট্জার বলে এক জার্ম্মাণ বিপ্লবী এই সঙ্গে ধরা পড়ে। এক সময় সে ট্রটস্কীর দেহরক্ষীদের নায়ক ছিল। প্রকাশ্য আদালতে হতাশ হয়ে সে বলে উঠলো, আমাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব অবশ্য সকলের সমান নয় এবং সকলেই যে এক মতাবলম্বী ছিলাম, তাও নয়, কিন্তু আজ আমাদের সকলের ভাগ্যই এক হয়ে দাঁড়িয়েছে। খুনে হিসেবে আজ আমরা সকলেই সমান। তবে, এ-কথা ঠিক, অন্তত আমার দিক্ থেকে আমি বলতে পারি, দয়া চাইবার মত কোন অধিকারই আমার নেই।

মামলা যতই অগ্রসর হতে লাগলো ততই আসামীদের মনস্তত্ত্বে বিপর্য্যয় ঘটতে সুরু হয়ে গেল। নিরুপায় বুঝে কেউ-কেউ মরিয়া হয়ে উঠলো। আসামী ফ্রিট্জ ডেভিড, চীৎকার ক'রে বলে উঠলো, ট্রটস্কীর মাথায় বজ্রাঘাত হোক্! যে লোক এই ভাবে আমার সমস্ত জীবন নষ্ট করে দিলো, আমার অভিশাপ রইলো তার ওপর।

আদালতের মধ্যে একটা চরম নাটকীয়তার লক্ষণ ফুটে উঠতে লাগলো।

২৩শে আগষ্ট বিচারের রায় প্রকাশিত হলো···

জেনোভিভ, ক্যামেনভ, স্মার্ণভ, প্রভৃতি ট্রটস্কী-জেনোভিভ, দলের প্রধান তেরো জনকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে গুলী ক'রে মেরে ফেলা হবে······

এই দণ্ডদানের এক সপ্তাহ পরে চেকার পুলিশ র‍্যাডেক, সোকোলনিকভ, আর পিয়াটাকভ,কে গ্রেফ্‌তার করলো। ইয়াগোডা তখনোও পর্য্যন্ত নিজেকে অতি কৌশলে সরিয়ে রাখতে পেরেছিল। কিন্তু সন্দেহ থেকে সে মুক্ত হতে পারে নি। তাই তাকে সরিয়ে দেওয়া হলো। তার স্থলে নিযুক্ত হলো ইয়াজব। মরিয়া হয়ে ইয়াগোডা একবার শেষ চেষ্টা করলো, ইয়াজবকে বিষ দিয়ে হত্যা করতে কিন্তু তা কার্য্যকরী হলো না।

এই ষড়যন্ত্র-চক্রের দ্বিতীয় স্তরের তিন জন নেতা তখনও বাইরে ছিল, বুখারিন, রায়কভ আর টমস্কী। এই তিন জনই পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত ছিল। প্রতি মুহূর্তেই তারা আশঙ্কা করেছিল বুঝি এইবার ওয়ারেন্ট আসে। তারা বুঝলো, অপেক্ষা ক'রে থাকার আর সময় নেই। যে-কোন মুহূর্ত্তে তারাও কারারুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। তাই যা-হোক একটা কিছু করবার জন্যে তারা মরিয়া হয়ে উঠলো। এক গোপন বৈঠকে টমস্কী প্রস্তাব করলো, তাদের দলভুক্ত সৈন্যদের নিয়ে অবিলম্বে ক্রেমলিন আক্রমণ করা যাক্। কিন্তু বিচার করে দেখা গেল, আক্রমণ করবার মত সৈন্য যোগাড় করা এখনি সম্ভব হবে না। কিন্তু সশস্ত্র

আক্রমণ ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন পথ নেই। তাই অবশিষ্ট বিপ্লবীদের নিয়ে তারই আয়োজনে তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করলো। ক্রেস্টেনস্কীর ওপর ভার দেওয়া হলো, প্রাথমিক আয়োজনের। সশস্ত্র অভ্যুত্থান পরিচালনা করতে হলে, সামরিক বিভাগের সাহায্য চাই। তার জন্যে মার্শাল টুকাচেভস্কীর সঙ্গে তারা অনেক দিন থেকেই আলোচনা চালিয়ে আসছিল। টুকাচেভস্কী তখন সোভিয়েট রাশিয়ার সামরিক বিভাগের সহকারী কমিশার। তাঁর অন্তরে ছিল, শক্তির প্রবল মাদকতা। নেপোলিয়ানের প্রেতাত্মা তাঁরও কাঁধে ভর করেছিল। নিরুপায় হয়ে বিপ্লবীরা তাঁর শরণাপন্ন হলো। আর সময় নেই। অবিলম্বেই একটা অতর্কিত সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে শাসন-যন্ত্র দখল করে নিতে হবে। আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টা।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

নেপোলিয়ানের মৃত্যুর পর তাঁর প্রেতাত্মা উপযুক্ত আধারের আশায় য়ুরোপের আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে……

সেণ্টহেলেনার নির্জন কারাবাসে দেহত্যাগ করার পর, নেপোলিয়ানের প্রেতাত্মা য়ুরোপের আকাশে-বাতাসে ঘুরে বেড়ায় এবং যখনি কোন উপযুক্ত আধার পায়, সেইখানেই ভর ক'রে নেমে পড়ে। একজন সামান্য সৈনিক, সে যে চেষ্টা করলে একটা বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারে, এই সম্ভাবনার কথা নেপোলিয়ানের স্মৃতি আপনা থেকে জাগিয়ে তোলে। তাই গত শতাব্দীর য়ুরোপে আমরা প্রায়ই এই ধরণের দুরাকাঙ্ক্ষী সৈনিক বা সেনাপতির সাক্ষাৎ পাই। তাদের দুরাকাঙ্ক্ষা সফল হয়নি বলে তাদের নাম আমরা জানি না। কিন্তু এই জাতীয় দুরাকাঙ্ক্ষী লোকের অস্তিত্ব গত শতাব্দীর ইতিহাসে প্রায়ই চোখে পড়ে।

মার্শাল টুকাচেভস্কী ছিলেন এই ধরণের দুরাকাঙ্ক্ষী লোক। তাঁর পুরো নাম হলো মিখাইলনিকোলিভিচ টুকাচেভস্কী। জারের আমলের এক বড় জমিদারের ছেলে। ছেলেবেলা থেকে সামরিক বিভাগের দিকে তাঁর প্রবল আকর্ষণ ছিল। তাই যৌবনের প্রারম্ভেই মিলিটারী কলেজে প্রবেশ করেন এবং সেখান থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে ঘোষণা করেন, ত্রিশ বছরের মধ্যে হয় জেনারেল হবো, না হয় আত্মহত্যা করবো। তাঁকে আত্মহত্যা করতে হয় নি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জারের সৈন্যবিভাগে সামান্য অফিসার হিসাবে তিনি যোগদান করেন। তার পরের বছরেই জার্মাণদের হাতে কারারুদ্ধ হন। যৌবন থেকেই তাঁর মনে জার্মাণ দার্শনিক নীট্‌শে রীতিমত প্রভাব বিস্তার করেন।

বোলশেভিক উত্থানের পূর্বাহ্ণে তিনি জার্মাণ কারাগার থেকে পালিয়ে রাশিয়ায় চলে আসেন। এবং বোলশেভিকদের বিরুদ্ধে যে হোয়াইট আর্মি দল সমর-আয়োজন করছিল, তাদের সঙ্গে যোগদান করেন। কিছুদিন পরেই তিনি মত বদলে ফেললেন। বললেন, এদের দ্বারা কোন-কিছু হ'তে পারে না, এদের মধ্যে নায়ক হবার মতন কেউ নয়। তৎক্ষণাৎ তিনি একেবারে বিপক্ষ বোলশেভিক দলে যোগদান করলেন। ট্রটস্কী তখন নতুন করে রেড-আর্মি গড়ে তুলছেন।

এই ব্যাপারে টুকাচেভস্কী প্রভূত সাহায্য করলেন। তখন রেড-আর্মির মধ্যে প্রকৃত অভিজ্ঞ কোন সেনা-নায়ক ছিল না বললেই হয়, সেই জন্যে টুকাচেভস্কী দেখতে দেখতে সামান্য অফিসর থেকে একেবারে ওপরের থাকে গিয়ে উঠলেন। তিন-চারটে বড় বড় অভিযানে নায়কত্ব করে জয়লাভ করলেন। তাতে সেনানায়ক হিসাবে বোলশেভিক মহলে তাঁর খ্যাতি রীতিমত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। রেড-আর্মি মিলিটারী একাডেমীর সর্বময় কর্তা হলেন এবং সেখান থেকে আর এক ধাপ উঁচুতে মার্শাল পদে উন্নীত হলেন।

যদিও ট্রটস্কীর মতবাদের সঙ্গে টুকাচেভস্কী নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে কোন দিন সম্পৃক্ত করেন নি কিন্তু তাঁর ওপরে ট্রটস্কীর প্রভাব তিনি অস্বীকার করতে পারতেন না। তাই তিনি স্বতন্ত্র ভাবে জার্মাণ সামরিক বিভাগের সঙ্গে একটা গোপন সম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন। ট্রটস্কীও মনে মনে জানতেন, চরম প্রয়োজনের সময় তিনি টুকাচেভস্কীকে নিশ্চয়ই কাজে লাগাতে পারবেন, সেই ভাবেই তিনিও তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন। টুকাচেভস্কীর বিশ্বাস ছিল যে, ষ্টালিনের হাত থেকে সোভিয়েট রাশিয়ার শাসনের ভার অচিরকালের মধ্যেই চলে যাবে। জার্মাণী আর জাপানের মিলিত সামরিক শক্তির সাহায্যে সোভিয়েট রাশিয়াকে নতুন ভাবে গড়ে তুলতে হবে। এবং প্রত্যেক উচ্চাকাঙ্ক্ষী বিপ্লবী নেতার মতন, তাঁরও গোপন উচ্চাভিলাষ ছিল যে, সেই নব-গঠিত রাশিয়ার শাসক তিনিই হবেন।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে রাজা পঞ্চম জর্জের যে সমাধি-উৎসব হয়, তাতে সোভিয়েট রাশিয়ার

প্রতিনিধিরূপে টুকাচেভস্কীকে পাঠানো হয় এবং সেই উপলক্ষেই তাঁর পদমর্য্যাদা বাড়িয়ে তাঁকে মার্শাল করা হয়।

লণ্ডনে যাবার পথে তিনি ওয়ারশ এবং বার্লিনে নামেন এবং সেখানকার ষড়যন্ত্রকারী নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। জার্ম্মাণ সামরিক আয়োজন এবং কৃতিত্ব সম্বন্ধে তিনি এক রকম প্রকাশ্য ভাবেই তাঁর অন্তরের প্রশংসা ঘোষণা করেন।

ফেরবার পথে ফ্রান্সে এক রাজকীয় ভোজে তিনি রুমানিয়ার পররাষ্ট্র-সচিব তিতুলেস্কুর পাশেই বসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তায় তিনি বলেন, আপনার দেশ বৃটেন আর ফ্রান্সের মতন "বুড়ো" রাষ্ট্রের সঙ্গে তার ভাগ্য যে বিজড়িত করছে, আমার মনে হয়, সেটা খুব বুদ্ধির কাজ হচ্ছে না। আজ য়ুরোপে একমাত্র শক্তি হচ্ছে, হিটলারের নতুন জার্ম্মাণী। আমার স্থির বিশ্বাস, আগামী যুগে য়ুরোপের রাজনীতিতে জার্ম্মাণীই সকলের নায়ক হবে। সুতরাং বুদ্ধিমানের মতন এখন আমাদের উচিত হিটলারের পাশে দাঁড়ানো।

এই সব ঘটনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, টুকাচেভস্কী সম্পূর্ণ ভাবে জার্ম্মাণীর প্রভাবে গিয়ে পড়েছিলেন। এবং তাঁর স্থির বিশ্বাস হয় যে, অচিরকালের মধ্যে জার্ম্মাণী রাশিয়া আক্রমণ করবে এবং সে-আক্রমণের ফলে বর্ত্তমান শাসকরা উচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সুতরাং বুদ্ধিমানের মত, আগে থাকতে সেই পরিস্থিতির জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখা দরকার।

কিন্তু ট্রটস্কী-জেনোভিভ মামলায় ষড়যন্ত্রের অধিকাংশ কথা প্রকাশিত হয়ে যাওয়াতে টুকাচেভস্কী আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তাড়াতাড়ি তিনি ক্রেস্টেনস্কীর সঙ্গে দেখা করলেন এবং এ-অবস্থায় কি করা যায় তার পরামর্শ করতে লাগলেন। যাই করা হোক্, বিলম্ব করা চলবে না এবং এখন যা চরম ব্যবস্থা তাই অবলম্বন করতে হবে। আগে ব্যবস্থা হয়েছিল যে, বাইরে থেকে সোভিয়েট রাশিয়া আক্রান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ষড়যন্ত্রকারীদের সামরিক বিভাগ কোন উচ্চবাচ্য করবে না। কিন্তু এখন পরিস্থিতি এ-রকম দাঁড়িয়েছে যে, তার জন্যে অপেক্ষা করে থাকা চলবে না। সামরিক বিভাগকেই এখন তৎপর হয়ে সশস্ত্র অভ্যুত্থান করতে হবে।

ক্রেস্টেনস্কী সেই সিদ্ধান্ত জানিয়ে ট্রটস্কীকে খবর পাঠালেন এবং যাতে বাইরে থেকে আক্রমণের ব্যাপারটা দ্রুততর ঘটে তার জন্যে ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানালো।

টুকাচেভস্কী কিন্তু ক্রমশ নার্ভাস হয়ে উঠতে লাগলেন। একে একে প্রত্যেক ষড়যন্ত্রকারীই ধরা পড়ছে। কোন্ দিন যে তাঁরাও ধরা পড়বেন, তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। সুতরাং সামরিক অভ্যুত্থানের আর একদিনও বিলম্ব করা উচিত নয়।

ট্রটস্কীর জার্ম্মাণ-প্রতিনিধিস্বরূপ তখন রোজেনগল্জ রাশিয়াতে ছিলেন। ক্রেস্টেনস্কী তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে জানলেন যে, তাঁরও সেই অভিমত। আর বিলম্ব করলে সমস্ত ষড়যন্ত্রই ভেঙ্গে পড়বে। ক্রেস্টেনস্কী ট্রটস্কীর কাছে দ্রুত অনুমোদনের জন্য আবার খবর পাঠালেন এবং তাতে একটা নতুন জিনিস প্রস্তাব করলেন। তিনি জানালেন যে, সশস্ত্র অভ্যুত্থান করার সঙ্গে সঙ্গে জনতার কাছে একটা ঘোষণা দিতে হবে, শুধু জনতার কাছে কেন, বাইরের অন্য সব রাষ্ট্রের কাছেও এই অভ্যুত্থানের কারণস্বরূপ একটা রাজনৈতিক নীতি উপস্থিত করতে হবে। আমার বিবেচনায় সেখানে আমাদের আসল উদ্দেশ্য এখন লুকিয়ে ছদ্ম ভাষায় ঘোষণা করতে হবে যে, মূল সাম্যবাদী নীতির কোন পরিবর্ত্তন করতে আমরা চাই না……আমরা দুর্নীতিপরায়ণ সোভিয়েট শাসন-ব্যবস্থা বদলিয়ে একটা সু-পরিচালিত সোভিয়েট য়ুনিয়নেরই প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

ট্রটস্কীও সেই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করতে বিলম্ব করলেন না। বাইরে আক্রমণের জন্যে অপেক্ষা না করে থেকে, অবিলম্বে সামরিক অভ্যুত্থানের একান্ত প্রয়োজন।

সোভিয়েট শাসকেরাও চুপ করে বসেছিলেন না। তাঁরা ট্রটস্কী-জেনোভিভ্ ষড়যন্ত্র মামলা থেকে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ ষড়যন্ত্র আরো ঢের বেশী গভীর এবং এর মূল রাশিয়ার বাইরে জার্ম্মাণী এবং জাপানে।

দেখতে দেখতে পিয়াটাকভ্, র‍্যাডেক, সোকোল-নিকভ্, শেষ্টভ, মুরালভ এবং তাঁদের দলের জার্ম্মাণ এবং জাপানী চরেরাও গ্রেফতার হলো। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী এই মামলার বিচার সুরু হলো।

মামলার প্রথম দিকে প্রত্যেক আসামীই তাদের অভিযোগ অস্বীকার করলো। কিন্তু যতই মামলা অগ্রসর হতে লাগলো, ততই জেরার মুখে একে একে সমস্ত বেরিয়ে পড়তে লাগলো। তখন আর মূল আসামীদের পক্ষে সব অভিযোগ অস্বীকার করা সম্ভব হয়ে উঠলো না। তাদেরও মনস্তত্ত্বের মধ্যে তাজ্জব সুরু

হলো। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত তারা ষড়যন্ত্রের শেষ স্তরের কথা, অর্থাৎ সামরিক বিভাগের কথা গোপনই রেখেছিল। ক্রেস্টেনস্কী, টুকাচেভস্কী বা গোজেন-গোল্জের কথা তারা সর্বরকমে তখনও এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে।

কিন্তু মামলার শেষের দিকে স্পষ্ট প্রমাণ যখন আদালতে দাখিল করা হতে লাগলো, তখন আসামীদের আর আত্মগোপন করে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠলো। সোকোলনিকভ্ যে জবানবন্দী দিল, তাতে হেসের সঙ্গে কথাবার্ত্তা, বর্ত্তমান শাসন-তন্ত্রের বদলে জার্ম্মাণ ফ্যাসিস্তিদের সঙ্গে আপোষ বন্দোবস্ত সমস্তই তিনি স্বীকার করলেন। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত অতি কৌশলে তিনি ষড়যন্ত্রের শেষ স্তরের কথা লুকিয়ে চলেছিলেন। সাম্যবাদী হয়ে ফ্যাসিস্তিদের সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তি করার ব্যাপারে, সোকোলনিকভ কারণ দেখালেন, আমরা স্থির সিদ্ধান্তে আসি যে, ফাসিসিম্ হলো বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিকতার চরম অভিব্যক্তি এবং অচিরকালের মধ্যে ফ্যাসিসিম্ তার সামরিক শক্তির সাহায্যে সমস্ত য়ুরোপকে গ্রাস করে ফেলবে, তখন সোভিয়েট রাশিয়ার অবস্থা অতীব শোচনীয় হতে বাধ্য। সেই জন্যে আপদ-ধর্ম্ম হিসেবে আমরা স্থির করি যে, ফ্যাসিসিমের সঙ্গে একটা আপোষ যদি করা যায়, তাহলে অন্তত কিছুটা রক্ষা করা যাবে। আমাদের যুক্তি হলো, সর্ব্বস্ব হারানোর চেয়ে, যদি কিছুটা ত্যাগ করে, যদিও সেই কিছুটা নীতির দিক থেকে খুব মারাত্মকও হয়, খানিকটাও রক্ষা করা যায়, সেটা বাঞ্ছনীয়।

পিয়াটাকভ্ স্বীকার করলেন যে, ট্রটস্কীর দলের নেতারূপে তিনি গ্রেফতার হবার আগে পর্য্যন্ত স্যাবোটাজ পরিচালনা করে এসেছেন। এবং তা করেছেন ট্রটস্কীর নির্দ্দেশ অনুসারেই।

ভিসিনস্কী জেরার মধ্যে দিয়ে পিয়াটাকভের কাছ থেকে বার করতে চেষ্টা করছিলেন, কি করে জার্ম্মাণী আর জাপানী ষড়যন্ত্রকারীরা পরস্পর পরস্পরকে জানবার সুযোগ পেলো। কি ভাবে এই যোগসাধন সম্ভব হয়েছিল?

ভিসিনস্কী—তুমি বলেছ যে জার্ম্মাণ চর রাটাইচক্ তোমার কাছে সব কথা বলে…কেন সে তা করলো?

পিয়াটাকভ—দুজন লোক আমার কাছে…

—আমার কথা হলো, সে তোমার কাছে জানান দেয়, না, তুমি তার কাছে জানান দিয়েছিলে?

পিয়াটাকভ্ অতি সতর্ক ভাবে জবাব দেয়, সেটা পারস্পরিক বলা যেতে পারে।

—তাহলে বল, কে প্রথম জানান দেয়?

—কে আগে…সে না আমি…মুরগী আগে, না ডিম আগে…ঠিক বলতে পারি না।

এই উত্তর থেকে বোঝা যায় যে তারা তখনও পর্য্যন্ত সজাগ ভাবে চেষ্টা করছিল, এড়িয়ে যাবার জন্য। সরকারী উকীলের সঙ্গে তারা তখনও সমানভাবে কথা-কাটাকাটি করে চলেছিল।

কিন্তু পিয়াটাকভ বেশীক্ষণ এই ভাবে তর্ক করে এড়িয়ে যেতে পারলো না। একটার পর একটা প্রমাণ থেকে, অন্য আসামীদের স্বীকারোক্তি থেকে, স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যেতে লাগলো, পিয়াটাকভ যে-সব মারাত্মক কাজ করেছিল, তাকে জঘন্য স্বদেশদ্রোহী ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। সরকারী উকীলের হাতে প্রমাণ নেই ভেবে পিয়াটাকভ তেজের সঙ্গে সে-সব কথা প্রথমে অস্বীকার করেছিল, জেরার শেষের দিকে পিয়াটাকভের চোখের সামনে ভিসিনস্কী যখন একটার পর একটা সেই-সব প্রামাণ্য দলিল আর ফটোগ্রাফ তুলে ধরতে লাগলেন, পিয়াটাকভ্ তখন একেবারে ভেঙ্গে পড়ল।

অবশেষে পিয়াটাকভ্ আত্মরক্ষার শেষ অস্ত্রস্বরূপ ট্রটস্কীকে হেয় পতিপন্ন করতে সুরু করলো।

—ট্রটস্কীর প্রভাবেই আমরা ভুল পথে চলে গিয়েছিলাম…শেষের দিকে তাই আমি ট্রটস্কীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করি…তাঁকে অস্বীকার করি…

কিন্তু ট্রটস্কীকে নিন্দা ক'রে নিজেকে রক্ষা করবার লগ্ন বহুকাল আগেই উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

বিচারের শেষের দিকে একে একে অভিযুক্ত নায়কেরা অর্দ্ধ-উন্মাদ অবস্থায় যে ভাবে জীবনের অন্তিম ভুলের কথা প্রকাশ্য আদালতে বলতে সুরু করে, যে কোন বিয়োগান্ত নাটকের নায়কের মুখে তা বসানো যেতে পারে।

পিয়াটাকভ্ সোভিয়েট রীতি অনুযায়ী বিচারকদের আহ্বান করে শেষ-উক্তি করলো, হে নাগরিক-বিচারক, সত্যিই বহু বৎসর ধরে আমি ট্রটস্কীর অনুচর ছিলাম… অন্য সব ট্রটস্কাইটদের সঙ্গে দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি…এই যে ক'বছর ট্রটস্কীবাদের অন্ধকার গহ্বরে শ্বাসরুদ্ধ জীবন যাপন করে এসেছি, মনে করবেন না তার মধ্যে দেশে কি হচ্ছে তা ভেবে দেখি নি। দেশের মধ্যে শিল্পে বাণিজ্যে যে অভ্যুদয় ঘটছিল তা যে আমি লক্ষ্য করি নি তা নয়। মাঝে মাঝে যখন ট্রটস্কীর দলের অন্ধকার সুড়ঙ্গ-পথ থেকে বাইরে বেরিয়ে, সাধারণ রাজনীতির সহজ কাজের মধ্যে নিজেকে ব্যাপৃত

রেখেছি, একটা স্বস্তি অনুভব করেছি। আমার মনের মধ্যে এই দো-টানায় ক্লান্ত হয়ে পড়ি…আমি জানি, কয়েক ঘণ্টা পরেই আপনারা বিচারে আপনাদের শেষ রায় জাহির করবেন…আমার একমাত্র অনুরোধ, একটি জিনিস থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না। আজ এইখানে দাঁড়িয়ে, আপনাদের চোখের সামনে দিকে চেয়ে আমার অতীত পাপ-জীবনের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করবার অধিকার আমি অন্তরে অনুভব করছি, যদিও জানি, আজ তার অত্যন্ত বিলম্ব ঘটে গিয়েছে, তবুও, আমার অন্তিম মিনতি, আমার এই শেষ কথা আপনারা বিশ্বাস করবেন।

এই আন্তরিক উচ্ছ্বাসের মধ্যেও পিয়াটাকভ্ অতি সযত্নে বিপ্লবের শেষ স্তরের কথা লুকিয়ে রাখলো। যে বিভাগের ওপর এই বিপ্লবের সামরিক আয়োজন নির্ভর করেছিল, তার কথা পিয়াটাকভ্ বিন্দুমাত্র উল্লেখ করলো না।

আসামীদের মধ্যে প্রধানতম যারা ছিল,তাদের মধ্যে মুরালভ্ একজন। এক সময় মুরালভ্ মস্কোর মিলিটারী শিবিরের প্রধান কমাণ্ডার ছিলেন এবং ট্রটস্কীর দেহরক্ষী বাহিনীর অন্যতম নায়ক ছিলেন ১৯৩২ থেকে উরাল অঞ্চলে ট্রটস্কীর গোপন দলের নেতারূপে শেষ্টভ এবং জার্ম্মাণ বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে তিনি বিপ্লবী দলের কাজ পরিচালনা করে চলেছিলেন। বিচারের শেষ দিকে প্রকাশ্য আদালতে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। বন্দী-দশায় তাঁর মনের মধ্যে যে তুমুল দ্বন্দ্ব চলেছিল, তার পরিণামে তিনি বিচারকদের সামনে অকপটে সমস্ত কথা প্রকাশ করতে রাজী আছেন। এবং করলেনও।

নিজের জবানবন্দীর শেষে বললেন, বিচারের প্রথম দিকে আমি কোন উকিল নিযুক্ত করি নি এবং নিজেকে রক্ষা করবার জন্যে নিজের স্বপক্ষে কোন কথাও বলি নি। তার কারণ, চিরকাল আমি নিজেকে রক্ষা করবার জন্যে কিংবা শত্রুকে আঘাত করবার জন্যে ধারালো তলোয়ারই ব্যবহার করে এসেছি। আমি জানি, আজ নিজেকে সমর্থন করবার মত কোন ধারালো অস্ত্র আমার হাতে নেই।…আমাকে যে অন্য কেউ এই ট্রটস্কীর অনুমোদিত বিপ্লব-পন্থায় টেনে নিয়ে এসেছে, একথা আমি বলতে চাই না। তার জন্যে আমি অন্য কারুর ওপর দোষারোপও করতে চাই না। আমি জানি, তার জন্যে যা-কিছু দোষ, সে আমারই প্রাপ্য। সেই আমার অপরাধ…আমার দুর্ভাগ্য যে এক যুগেরও বেশীকাল আমি ট্রটস্কীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে এসেছি…

কার্ল র‍্যাডেক প্রথম প্রথম জেরার মুখে রীতিমত তেজ দেখিয়ে সমানে উত্তর দিয়ে এসেছিল, কিন্তু শেষের দিকে যখন সে দেখলো আর আত্মগোপন করে থাকার চেষ্টা বৃথা, তখন সে-ও প্রকাশ্য আদালতে ভেঙে পড়লো এবং ট্রটস্কীর সঙ্গে তার যোগাযোগের কথা নিজের মুখেই প্রকাশ করলো। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত নিজেকে বাঁচার চেষ্টার আশা সে ছাড়ে নি। তাই ভিসিনস্কীর জেরায় সে শেষের দিকে জানালো, যখন জানতে পারলাম যে, ট্রটস্কী সোভিয়েট রাশিয়ায় বিপ্লব আনবার জন্যে জাপান আর জার্ম্মাণীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন; তখন আমার মনে ঘোরতর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় এবং তখন থেকে আমার মনের মধ্যে একটা চেষ্টা চলতে থাকে, ট্রটস্কীকে অস্বীকার করে এই দল ত্যাগ করতে। এমন কি, আমি মনে মনে ঠিক করি যে এই ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করে দেবো।

ভিসিন্স্কী—আমি মেনে নিচ্ছি, তুমি মনে মনে ঠিক করেছিলে ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করে দেবে, কিন্তু কি ভাবে তা' প্রকাশ করবে, সে সম্বন্ধে কিছু ভেবেছিলে?

র‍্যাডেক…আমি ঠিক করেছিলাম, প্রথমে সোজা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সামনে উপস্থিত হব এবং এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে যারা যারা আছে, তাদের প্রত্যেকের নাম জানিয়ে দেবো। কিন্তু আমি তা করি নি। জি, পি, ইউ-এর কাছে আমি যাবার আগেই, জি, পি, ইউ আমার কাছে উপস্থিত হলো।

ভিসিন্স্কী—চমৎকার জবাব!

র‍্যাডেক—চমৎকার নয়, শোচনীয়!

নিজেকে রক্ষা করবার চেষ্টায় র‍্যাডেক যে আত্ম-বিবরণী দাখিল করে, তাতে সে নিজের সম্বন্ধে বলে, "এই ষড়যন্ত্রের গোড়া থেকেই দুর্ভাবনা আর সন্দেহে আমার মন পথভ্রান্ত হয়ে পড়ে। পার্টির প্রতি আনুগত্য না তার বিরোধিতা, এই দুই পথের মাঝখানে আমার মন ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। যতই দিন এগিয়ে যেতে লাগলো, ততই আমার ধারণা বদ্ধমূল হতে লাগলো যে, বাইরের সম্মিলিত বিরোধিতার চাপ ছাড়িয়ে বর্ত্তমান সোভিয়েট শাসন-তন্ত্র উঠতে পারবে না। আমার মনের সেই অবস্থার সুযোগে ট্রটস্কী ধীরে ধীরে আমাকে তার দলের অভ্যন্তরে টেনে নিলেন। তখন ট্রটস্কীর নির্দ্দেশে চলা ছাড়া আর গত্যন্তর কিছু রইলো না। কিন্তু যখন ট্রটস্কী জাপান আর জার্ম্মাণীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে গেল, তখন আমি বুঝতে পারলাম, এ-পথ ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু ট্রটস্কী আমাদের প্রতিবাদ জানাবার কোন সুযোগই দেন নি।

তিনি চুক্তি শেষ ক'রে আমাদের ওপরে সেই চুক্তিমত চলবার আদেশ করে পাঠালেন।"

কি ভাবে র‍্যাডেক ধরা পড়ে এবং নিজের দোষ স্বীকার করতে বাধ্য হয়, সে-সম্বন্ধে তার জবানবন্দীতে সে বললো, যখন আমাকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করে আভ্যন্তরিক বিভাগের মন্ত্রীর দফতরে নিয়ে আসা হলো, তখন সরকারের পক্ষ থেকে যিনি আমাকে জেরা করছিলেন তিনি বিরক্ত হয়ে শেষকালে আমাকে বললেন, তুমি কচি খোকা নও......এই দেখ, তোমার বিরুদ্ধে পনেরো জন লোক লিখিত সাক্ষ্য দিয়েছে...সুতরাং তোমার এ-টুকু বুদ্ধি অন্তত আছে যে এ থেকে তুমি কোন মতে নিষ্কৃতি পেতে পার না...সে চিন্তাই তোমার এখন পরিত্যাগ করা উচিত।

কিন্তু তবুও তখন আমি একান্ত তেজের সঙ্গে আমার জিদ বজায় রাখি। আড়াই মাস ধরে ক্রমাগত সরকারী লোকেরা আমাকে জেরা করেছে, আমার কাছ থেকে কথা বার করবার জন্যে নানা রকমে চেষ্টা করেছে কিন্তু কোন মতেই আমি তখন তাদের কোন কথার উত্তর দেই নি। আদালতে অবশ্য এখন কথা উঠেছে, এই আড়াই মাসের মধ্যে আমার কাছ থেকে কথা বার করবার জন্যে আমাকে কোন নির্য্যাতন করা হয়েছিল কি না। আমি অকপটে স্বীকার করছি যে, আমাকে তো নির্য্যাতন করা হয় নি-ই, উল্টে আমিই বরঞ্চ তাঁদের এই আড়াই মাস ধরে নির্য্যাতন করেছি। আমার জন্যেই তাঁরা এই আড়াই মাস ধরে বাজে মাথা ঘামিয়ে মরেছেন। এই আড়াই মাস ধরে তাঁরা একটির পর একটি করে যে-সব আসামীরা স্বীকারোক্তি করেছে, তাদের কাগজ-পত্র আমাকে দেখিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকের স্বীকারোক্তি থেকে দিনের পর দিন নীরবে দেখেছি, এই ষড়যন্ত্রের কথা কি ভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ছে। অবশেষে একদিন প্রধান অফিসর আমার কাছে এসে বললেন, এখন আপনার পালা......আপনিই হলেন শেষ...সুতরাং অযথা আর কেন সময় নষ্ট করছেন? আপনার যা বক্তব্য, এবার আপনি ব'লে ফেলুন। সেদিন তার কথার জবাবে আমি বলেছিলাম, হাঁ, আমার যা বলবার, আমি কাল তা বলবো।

এবং পরের দিন র‍্যাডেক স্বীকারোক্তি করে। র‍্যাডেকের স্বীকারোক্তির পর এই ঐতিহাসিক মামলার শেষ-পর্ব্বের সুরু হয়। ১৯৩৮-এর ৩০শে জানুয়ারী রায় প্রকাশিত হলো, পিয়াটাকভ, মুরালভ, শেষ্টভ প্রভৃতি দশ জনের মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা......গুলী করে তাদের মেরে ফেলা হবে। র‍্যাডেক, সোকোলনিকভ এবং আর দু'জন জার্ম্মাণ চয়ের যাবজ্জীবন কারাবাস।

কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত এই ষড়যন্ত্রের সব চেয়ে ওপরের থাকের ওপর সোভিয়েট সরকারের নজর পড়ে নি। পিয়াটাকভের মতন র‍্যাডেকও শেষ মুহূর্ত্তে বিচারকদের বোঝাতে চেষ্টা করেছিল যে, সে অকপটে ষড়যন্ত্রের সব কথাই প্রকাশ করছে কিন্তু আসলে সে-ও এই ষড়যন্ত্রের আসল সামরিক স্তরের কথা চেপে যায়। সমস্ত উচ্ছ্বাসের মধ্যে অতি সযত্নে এবং অতি সন্তর্পণে সে সেই স্তরের অস্তিত্বের কথা লুকোতে চেষ্টা করে কিন্তু দৈবক্রমে দ্বিতীয় দিনের জেরার অসতর্ক মুহূর্ত্তে র‍্যাডেকের মুখ থেকে হঠাৎ একটা কথা বেরিয়ে যায়। ভিসিনস্কীর দুর্দান্ত জেরায় উদ্‌ব্যস্ত হয়ে হঠাৎ একবার সে টুকাচেভস্কীর নাম উল্লেখ করে বসে। দুরন্ত শিকারীর মতন ভিসিনস্কী এই ছিদ্রপথের অপেক্ষাতেই ছিলেন। র‍্যাডেক বলে বসলো, পুটনা টুকাচেভস্কীর একটা অনুরোধ নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে।

টুকাচেভস্কীর নাম উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই সে বুঝতে পারে, কি মারাত্মক ভুল সে করে ফেলেছে। কথাটা চাপা দেবার জন্যে সে তাড়াতাড়ি অন্য নানা কথার অবতারণা করলো কিন্তু ক্ষুরধার-বুদ্ধি দুরন্ত প্রতিভাশালী ভিসিনস্কীকে আর সে ঠকাতে পারলো না।

ভিসিনস্কী স্থির কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো, এখন আমার জিজ্ঞাস্য হলো, কি অনুরোধ টুকাচেভস্কী তোমার কাছে করে পাঠিয়েছিল?

র‍্যাডেক কোন উত্তর দিতে পারে না। সমস্ত আদালত কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে নিস্তব্ধ হয়ে থাকে। সেই অল্প সময়ের মধ্যে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে র‍্যাডেক অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর দিতে চেষ্টা করে, সরকারী কাজের কোন বিভাগীয় ব্যাপারের পরামর্শ করার জন্যেই টুকাচেভস্কী অনুরোধ জানিয়ে পাঠায়। খুব সম্ভব, ইজ্‌ভেষ্টিয়া কাগজ সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে...তার কারণ, ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমার কি সম্বন্ধ তা' টুকাচেভস্কী আদৌ জানতেন না।

টুকাচেভস্কী সম্বন্ধে আর কোন উল্লেখ বিচারের সময় হয় নি। কিন্তু বিচার শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, ষড়যন্ত্রের অবশিষ্ট নেতারা যারা তখনও পর্য্যন্ত ছাড়া ছিল, তারা বুঝলে, আর হাত গুটিয়ে বসে থাকার কোন মানে হয় না। দেরী না করে, অবিলম্বেই তাদের সশস্ত্র বিপ্লব ঘোষণা করতে হবে। নতুবা তার সময় হয়ত আর পাওয়া যাবে না।

গোপনে টুকাচেভস্কী, দলের অপর নেতাদের নিয়ে

ত পরামর্শের আয়োজন করলো। প্রত্যেকের কাজ স্বতন্ত্র ভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হলো। ১৯৩৭এর মার্চের শেষের দিকে বিপ্লব উত্থানের আয়োজন-পর্ব প্রায় শেষ হয়ে এলো। টুকাচেভস্কী ঠিক করলো, সামনে দু'সপ্তাহের মধ্যেই বাকী যা-কিছু আয়োজন তা সম্পূর্ণ করে আত্মপ্রকাশ করতে হবে।

কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করলে সব চেয়ে দ্রুত কার্য্যসিদ্ধি হতে পারে এবং সব চেয়ে কম বাধার সম্মুখীন হতে হয়, তাই নিয়ে তারা প্রস্তাবের পর প্রস্তাব আলোচনা করে দেখতে লাগলো। অবশেষে যে ব্যবস্থা তারা সকলে মিলে স্থির করলো, সেটা হলো, সর্বপ্রথমে ক্রেমলিনের টেলিফোন একস্‌চেঞ্জটাকে দখল করতে হবে। তার জন্যে, নির্দিষ্ট দিনে একটা কাজের অছিলায় তারা সকলে সশস্ত্র হয়ে ক্রেমলিনে রোসেন্‌গল্‌জের অফিসে সমবেত হবে···সেখান থেকে টেলিফোন এক্‌স্‌চেঞ্জ কাছেই···এক দল টেলিফোন দখল করবে···আর এক দল অসতর্ক নেতাদের সেইখানেই গুলী করে মেরে ফেলতে সুরু করবে···

লক্ষ্য যত কঠিন হয়, এক ধরণের বিপ্লবীদের মনে হয় সেটা ততই সহজসাধ্য। তাই রোসেন্‌গল্‌জের বাড়ী থেকে সেদিন এই সিদ্ধান্ত স্থির করে তারা যে-যার যখন আবার ছড়িয়ে পড়লো, তাদের মনে কোথাও কোন বিঘ্নের সম্ভাবনার আশঙ্কা ছিল না।

এই ভাবে এপ্রিল মাস শেষ হয়ে এলো।

ক্রেস্‌টেনস্কী রাত্রিতে কাগজ-পত্র নিয়ে লিষ্ট করেন, বিপ্লব ঘোষণার পরে, বর্ত্তমান শাসকদের মধ্যে কাকে কাকে সরাতে হবে এবং তার জায়গায় তাদের দলের কাকে বসানো যায়···কালনেমীর লঙ্কা ভাগ!

ক্রমশ অভ্যুত্থানের দিনে, কার কি কাজ হবে, তার লিষ্ট তৈরী হলো, যাতে ঘড়ির কাঁটার মতন কাজ চলে··· গামারনিকের সঙ্গে এক দল গোলন্দাজ থাকবে, মলোটভ আর ভেরোশিলভকে খুন করতে হবে। রোসেনগল্‌জ আগে থাকতে সেদিন ষ্টালিনের সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত করে রাখবে···এবং অভ্যুত্থান ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ষ্টালিনের অফিস-ঘরেই তাঁকে গুলী করে মেরে ফেলা হবে···এই ভাবে প্রত্যেকের এক একটা স্বতন্ত্র দায়িত্ব নির্দ্দিষ্ট হয়ে গেল···

তখন ১৯৩৭এর মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ।

কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীদের অভ্যুত্থানের আগেই ষ্টালিনের লৌহ-দণ্ড তাদের মাথার ওপর সহসা উত্তোলিত হলো।

১১ মে, জেনারেল টুকাচেভস্কী হঠাৎ আদেশ পেলেন, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁকে রাজধানী পরিত্যাগ করে দূর ভল্‌গা অঞ্চলে একটা ছোট সেনা-দলের নায়ক হিসাবে যেতে হবে···যুদ্ধ বিভাগের সহকারী কমিশনারের পদ থেকে তাঁকে বিচ্যুত করা হলো।

সেই সঙ্গে জেনারেল গামারনিকও পদচ্যুতির আদেশ পেলেন।

তাঁর সঙ্গে জেনারেল ইয়াকির আর উবরভিচ্‌ও সহসা স্থানচ্যুত হলেন। জেনারেল কর্ক আর ইউম্যান, স্থানচ্যুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কারারুদ্ধও হলেন। ষড়যন্ত্রকারীদলের সামরিক-নেতারা সকলেই বিপন্ন ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। তার কয়েক দিন পরেই ক্রেস্‌টেনস্কী কারারুদ্ধ হলেন। বুখারিন, রায়কভ আর টমস্কীকে পুলিশ পাহারায় আটক করা হলো। আটক অবস্থায় টমস্কী আত্মহত্যা করে আদালতকে ফাঁকি দিলেন! জেনারেল গামারনিকও সেই অবস্থা অবলম্বন করলেন, ৩১শে মে তিনিও আত্মহত্যা করলেন। ভল্‌গা যাবার পথে টুকাচেভস্কী কারারুদ্ধ হলেন। অবশিষ্ট ছিলেন, রোজেনগল্‌জ। পালিয়ে ট্রটস্কীর সঙ্গে যোগদান করবার তাঁর বাসনা ছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তা সম্ভব হলো না। তিনিও কারাবদ্ধ হলেন। এই ভাবে এই বিরাট ষড়যন্ত্রের সর্বশেষ স্তরের প্রত্যেকটি নায়ক কারারুদ্ধ হয়ে গেলেন। আবার বসলো কোর্ট মার্শাল। আসামীদের মধ্যে প্রত্যেকেই হলেন, সামরিক বিভাগের সর্বোচ্চ পদধারী, তাই এই বিচার সম্পূর্ণভাবেই গোপনে পরিচালিত হলো। ১১ই জুনের সকাল এগারোটায় সময় সোভিয়েট সুপ্রীম্ কোর্টের গোপন বিচারশালার আসামীর কাটগড়ায় সোভিয়েট রাশিয়ার সেনাবিভাগের এগারো জন বড় বড় জেনারেল বিচারের অপেক্ষায় দাঁড়ালেন। কি নিষ্ঠুর, নির্ম্মম, এই রাজনীতির খেলা!

এক দিনের মধ্যেই বিচার শেষ হয়ে গেল। ১২ই জুন এইএগারো জন জেনারেলকে চোখ বেঁধে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে গুলী করে মেরে ফেলা হলো। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বিচার এবং দণ্ডদান শেষ হয়ে গেল।

অনাগত কালে সভ্যতার ইতিহাস-লেখক এই সব হত্যাকাণ্ডকে কি ভাবে দেখবেন, তা আর বলা সম্ভব নয়। রাজনীতির পক্ষে এই জাতীয় চরম হিংস্র ব্যবস্থা সত্যিকারের কতখানি প্রয়োজনীয় অথবা নীতির জগতে এর মূল্য কতখানি, তা নিয়ে বিচার-বিতর্কের অন্ত নেই। এখানে তা নিয়ে আমিও আলোচনা করতে চাই না। শুধু এই ঘটনার কি প্রতিক্রিয়া সেদিন জগতে হয়েছিল, তা-ই লিপিবদ্ধ করছি।

মস্কো বিচার এবং তার ফলে যখন দেশের বড় বড়

নেতাদের এই ভাবে গুলীর মুখে সরিয়ে ফেলা হলো, তখন য়ুরোপ আর আমেরিকায় ষ্টালিনের শাসন নিয়ে একটা তুমুল সমালোচনা পড়ে গেল। সোভিয়েট রাশিয়ার বন্য বর্ব্বরতার শাসন-যুগ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, এই জাতীয় একটা তীব্র প্রচার-কার্য্য রাশিয়ার বিরুদ্ধে চলতে লাগলো। আমরা এই সংঘর্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে তৃতীয় পক্ষরূপে এই দু' দলেরই কথা শুনছি এবং বাইবেলে যিশুর কথা স্মরণ করছি, যখন তিনি ক্রুদ্ধ জনতাকে বলেছিলেন, তোমাদের মধ্যে যে কখনো অন্যায় কর নি, তারই অধিকার আছে ঢিল ছোঁড়বার! কে আছ, সে এগিয়ে এসো।

সেই সময় সোভিয়েট রাশিয়ায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরূপে ছিলেন জোসেফ ই ডেভিস্। এই ব্যাপার নিয়ে ডেভিসের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার তদানীন্তন পররাষ্ট্র-সচিব লিটভিনভের বহু বাদানুবাদ হয়। সেই বাদানুবাদকে কথোপকথনের আকারে সাজালে কতকটা এই রকম দাঁড়াবে।

ডেভিস্—কিন্তু এই মস্কো-বিচার এবং তার ফল-স্বরূপ যে ভাবে আপনারা দেশের বড় বড় লোকদের সোজা গুলী করে মেরে ফেলে শাস্তি দিলেন, তার প্রতিক্রিয়া আমেরিকা আর য়ুরোপে কি হবে, সেটা ভেবে দেখা উচিত ছিল।

লিটভিনভ,—আমেরিকার প্রতিনিধিরূপে আপনার কাছ থেকেই জানতে চাই, আমেরিকায় এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া কি খুব খারাপ দাঁড়িয়েছে?

—নিঃসন্দেহ।

—নৈতিক কারণে?

—সে-কারণ বাদ দিয়েই বলছি। রাজনীতি ক্ষেত্রে আমি আত্মিক নীতির কথা তুলছি না। এই ঘটনার ফলে ইংলণ্ড আর ফ্রান্সের মনে সন্দেহ ঢুকতে পারে।

—কিসের জন্য?

—হিটলারের শক্তির বিরুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়া যে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে আমাদের আন্তর্জ্জাতিক মৈত্রীর পক্ষে, সোভিয়েট রাশিয়া সম্পর্কে এই বিশ্বাস ইংলণ্ড আর ফ্রান্সের থাকা দরকার।

—সে-কথা খুবই সত্য। আমি জানি, হিটলারকে আমরা বাধা দিতে পারি বলেই, ফ্রান্স আর ইংলণ্ড, আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে।

—কিন্তু দেশের যারা বড় বড় জেনারেল, যারা দেশের বড় বড় মাথা, তাদের যদি এই রকম পাইকারী ভাবে সাফ্ করে ফেলেন, তাহলে ষ্টালিন কাদের ভরসায় জার্ম্মাণীর সেই দুর্দ্ধর্ষ শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন?

—একটা কথা কি জানেন? আপনাদের আর আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ আলাদা। সাধারণ মানুষের মধ্যে যে কতখানি শক্তি আছে, আপনারা স্বীকার করতে চান না। আমরা সকলেই সেই সাধারণ মানুষের স্তর থেকে উঠেছি। তাই আমাদের বিশ্বাসের মূল একটু স্বতন্ত্র।

—সে-সম্পর্কে আপনার কথা স্বীকার করে নিলেও, আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আমরা যুদ্ধের মধ্যে বসে রয়েছি এবং হিটলার প্রস্তুত। সে আপনাকে নতুন শক্তি তৈরী করতে সময় দেবে না।

—কাজেই কোন দিক থেকে আজকে অপেক্ষা করে থাকা চলে না, এটা আপনার কথা থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে। ধীরে-সুস্থে কোন-কিছু করবার সময় এটা নয়। এখন আমাদের কথাটা শুনুন, আমার বক্তব্য হলো, ইংলণ্ড আর ফ্রান্স সোভিয়েট রাশিয়ার কাছে যে-জিনিস চাইছে, এই ভাবেই সে-জিনিস ষোল আনা সোভিয়েট রাশিয়া তাঁদের দিতে পারে হিটলারের সঙ্গে যে যুদ্ধ বাধবে, সেই যুদ্ধে যদি দেশের ভেতরে এতগুলো শক্তিশালী লোক তার বিরুদ্ধতা করবার জন্যে বেঁচে থাকে, তাহলে সোভিয়েট রাশিয়া কখনই জার্ম্মাণীকে হারাতে পারবে না। জার্ম্মাণীকে হারানোর জন্যেই সোভিয়েট রাশিয়াকে একান্ত নির্ম্মম ভাবে তার ভবিষ্যৎ কণ্টকগুলোকে সরিয়ে ফেলতে হলো এবং অচিরকালের মধ্যে জগৎ একদিন বুঝতে পারবে যে, এই কতকগুলি হত্যাকাণ্ডের ফলে সোভিয়েট রাশিয়া জগতের বৃহত্তর কল্যাণকেই বাঁচিয়েছিল।

ডেভিস তাঁর বইতে লিটভিনভের এই ভবিষ্যৎ-বাণীকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, লিটভিনভ বলেছিলেন, Some day the world will understand what we have done…we are doing the whole world a service in protecting ourselves against the menace af Hitlers Nazi World domination……

জাগতিক ক্ষেত্রে লিটভিনভের ভবিষ্যৎ-বাণী মিথ্যা হয় নি।

১৯৪১-এ যদি ১৯৩৬ বা ১৯৩৭-এর সোভিয়েট রাশিয়া থাকতো, তাহলে আজ পৃথিবীর মানচিত্রের চেহারা যে কি হতো তা বলা খুবই কঠিন।

১৯৪১-এ হিটলারকে সাহায্য করবার জন্যে একটা লোকও সোভিয়েট রাশিয়ার ভেতরে ছিল না এবং এই সঙ্ঘবদ্ধ একমুখীনতার দরুণই ষ্টালিনগ্রাদের এপিক সম্ভব হয়েছিল।

সর্বশেষ অধ্যায় ট্রটস্কীর অপমৃত্যু।

কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের যিনি আসল নায়ক, তিনি ষ্টালিনের কাছ থেকে পাঁচ হাজার মাইল দূরে চলে যান এবং সেই পাঁচ হাজার মাইল দূর থেকেও সোভিয়েট রাশিয়ার দিকে তিনি তেমনি হাত বাড়িয়ে রইলেন। সে-হাতে তখনও তেমনি গুলীভরা রিভলভার।

১৯৩৬-এর ডিসেম্বর মাসে যখন প্রথম জেনোভিভের বিচার সুরু হয়, সে-সময় ট্রটস্কী নরওয়েতে ছিলেন কিন্তু সেখানে থাকা তাঁর আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। বাধ্য হয়ে তাকে নরওয়ে-ত্যাগ করতে হলো। সমগ্র য়ুরোপে কোথাও আর তাঁর স্থান হলো না। বাধ্য হয়ে তিনি আটলান্টিক মহাসমুদ্র পার হয়ে দক্ষিণ-আমেরিকায় এলেন। পৃথিবীর অপরার্দ্ধে।

১৩ই জানুয়ারী ১৯৩৭, তিনি মেক্সিকো শহরে স্বনামখ্যাত ধনী শিল্পী দিইগো রিভেরার অতিথিস্বরূপ এসে উঠলেন। সেখানে কয়েক দিন বাস করার পর, মেক্সিকো শহরের উপান্তে কোয়াকান্ অঞ্চলে একটা ভিলা ধরনের বাড়ীতে তাঁর নতুন হেড-কোয়ার্টার্স গড়ে তুললেন। মৃত্যুর শেষ-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি তাঁর সামরিক বিদ্রোহিতার অংশ নিপুণ ভাবেই অভিনয় করে গিয়েছেন। সেখানে দাঁড়িয়ে দিনের পর দিন তিনি শুনেছেন, আটলান্টিক মহাসাগরের ওপারে তাঁর জন্মভূমিতে তাঁর সৃজিত দলের একটির পর একটি অঙ্গচ্ছেদের শোচনীয় কাহিনী···আটলান্টিক মহাসাগরের ঢেউ তাঁকে যে-সংবাদ বহন করে এনে দিয়েছে, তাতে তিনি নিঃসন্দেহাতীত ভাবে বুঝেছিলেন, যে-সংগ্রামের তিনি অধিনায়ক, তাঁর সৈনিক-সংখ্যা জগতের মধ্যে সব চেয়ে কম, মাত্র একজন···এবং সে-একজন হলো তিনি নিজে।

কিন্তু ট্রটস্কী তাতে বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহ হলেন না। নিজের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁর নিজের মনে এতটুকু সন্দেহ ছিল না, অন্ততঃ তাঁর ব্যবহার থেকে তা বোঝবার কোন অবকাশই ছিল না। চির-বিপ্লবীর এক নতুন চরিত্র যেন তিনি বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে সৃজন করতে চান, যে-কোন পরাজয়কেই পরাজয় বলে স্বীকার করবে না। তাই নির্বাসিত অবস্থায় যখন যেখানে থাকতেন, সেখানে তিনি সামরিক হেড-কোয়ার্টার্সের সমস্ত আবহাওয়া তৈরী করে নিতেন এবং নিপুণ অভিনেতার মতন তাঁর সমস্ত পারিপার্শ্বিককে তাঁর কল্পিত বিশ্ব-বিপ্লবীর ভূমিকার অনুরূপ করে গড়ে তুলতেন। বিশ্ব-ইতিহাসে তাঁর মতন রোমান্টিক বিপ্লবী আর দুটি হয়নি।

মেক্সিকোতে তিনি যে ভিলাতে এসে উঠলেন, সেটাকে তিনি রীতিমত একটা দুর্গ করে তুললেন। কুড়ি ফিট উঁচু একটা দেয়াল বাড়ীর চার দিকে আগে থাকতেই ছিল। তার চার কোণে চারটে ছোট ছোট ঘুণ্টি-ঘর তৈরী করালেন। চার কোণের সেই চারটি ঘরে অষ্টপ্রহর পালা করে চার জন প্রহরী সঙ্গীন হাতে পাহারা দিতে লাগলো। মেক্সিকান্ গভর্ণমেণ্ট বিশেষ করে তাঁর জন্যে এক দল স্বতন্ত্র পুলিশ সেই বাড়ীর চারিদিকে মোতায়েন করে রাখলেন, কিন্তু ট্রটস্কী তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে নিজের স্বতন্ত্র দেহরক্ষী দল গড়ে তুললেন। তারা দিন-রাত সেই বাড়ীর চারদিকে পাহারা দিতো। কিন্তু হায়, মানুষের ভাগ্য-বিধাতা মানুষের হাতে গড়া সব আয়োজনকে কখন কি ভাবে যে খেলনার সামিল ক'রে তোলেন, তা মানুষ আজও পর্য্যন্ত বুঝতে পারে না। ট্রটস্কী সেদিন কল্পনাও করতে পারেন নি যে, তাঁর এই শত চেষ্টায় সুরক্ষিত দুর্গের মধ্যেই একদিন একান্ত অসহায় ভাবে তাঁকে নিহত হতে হবে। মানুষের সকল চেষ্টার ইতিহাসের মধ্যে মাঝে মাঝে কথামালার সেই একচক্ষু হরিণের ট্রাজিক গল্পই দেখি বড় হয়ে দেখা দেয়।

যুদ্ধের সময় প্রত্যেক রাষ্ট্র তার সীমান্ত অঞ্চলে লোকের যাতায়াতের ওপর যে-রকম কড়া নজর রাখে, ট্রটস্কীর সঙ্গে যাঁরা দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসতেন, তাঁদের ওপর ঠিক তেমনি কড়া নজর রাখার বন্দোবস্ত ট্রটস্কী করেন। ট্রটস্কীর সঙ্গে দেখা করা সেই জন্যে একটা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন দরজা পার হয়ে অবশেষে তাঁর কামরায় আসতে হতো এবং প্রত্যেক দরজায় স্বতন্ত্র ভাবে ছাড়পত্র পরীক্ষা করা, খোঁজ-খবর নেওয়া হতো। ভিলার ভিতর প্রবেশ করবার পর, রক্ষীরা সাক্ষাৎকারীর সঙ্গে কোন রকম অস্ত্র-শস্ত্র আছে কি না, তা ভাল ভাবে দেখে নিতেন। এত সতর্কতা সত্ত্বেও, মৃত্যু এলো তাঁর নিজের কামরায় সম্পূর্ণ অতর্কিত এক ছদ্মরূপে···লোহার বাসর-ঘর করে কোন লখীন্দরই তার ভাগ্যকে আটকাতে পারেনি। এত সতর্কতা সত্ত্বেও ট্রটস্কী পারলেন না। সারা জগৎ জুড়ে যে মৃত্যুর বিভীষিকা ছড়িয়ে ছিলেন, সেই বিভীষিকার ছুরিতে তিনি নিজে নিহত হলেন।

ভিলার ভিতরের আবহাওয়া দেখলে যে-কোন আগন্তুকের বুঝতে এক মুহূর্ত্ত দেরী হবে না যে, সেখানে একটা বিরাট রাজ্য যেন পরিচালনা করা হচ্ছে। অসংখ্য সেক্রেটারী, দূত, গুপ্তচর, রাত-দিন সেই বিপ্লবী নেতার পরিচালনায় অসংখ্য কাজে ব্যস্ত। সারা জগৎ জুড়ে ট্রটস্কী চেয়েছিলেন তদানীন্তন সোভিয়েট

শাসকদের বিরুদ্ধে একটা বিরাট আন্দোলন সৃষ্টি করতে, প্রত্যেক দেশে তার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হবে, তার জন্যে য়ুরোপের এবং এশিয়ার বিভিন্ন ভাষায় প্রতিদিন পুস্তিকা, প্রচার-পত্র প্রবন্ধ, বই লেখা হচ্ছে। এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় তা আবার অনূদিত হচ্ছে।

জগতের বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন ভাষায় প্রত্যেক মেলে ঝুড়ি-ঝুড়ি চিঠি আসে। এক একটি ভাষার দরুণ একজন স্বতন্ত্র সেক্রেটারী। চিঠির রকম আবার নানান ধরণের। কোন চিঠি সংগোপন কোডে লেখা। সেই কোড থেকে তার পাঠোদ্ধার করতে হবে। কোন চিঠিটা হয়ত দেখতে নিরীহ একটা ব্যবসার চালান-পত্র কিন্তু অদৃশ্য কালিতে তার লাইনের ফাঁকে ফাঁকে আসল চিঠি অদৃশ্য ভাবে আছে। ল্যাবরেটরীতে বিশেষজ্ঞরা রসায়নবিদ্যার সাহায্যে সেই-সব চিঠির পাঠোদ্ধার করছেন। এই ভাবে সারা জগৎ থেকে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় আসছে সোভিয়েট-ধ্বংস যজ্ঞের ইন্ধন। আবার এখান থেকে জগতের বিভিন্ন কেন্দ্রে যাচ্ছে তার উত্তর-প্রত্যুত্তর। রাশিয়ায়, জার্মাণীতে, ফ্রান্সে, ইতালীতে, যুক্তরাষ্ট্রে, কানাডায়, চীনে, ভারতবর্ষে জগতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে এই একটি লোক সকলের আড়াল থেকে নিজের স্বতন্ত্র দল গড়ে তুলছেন, ট্রটস্কাইটরূপে যারা আত্মপরিচয় দিতে সুরু করলো।

জগতের অগ্রগামী সংবাদপত্রের দৃষ্টি এই অপূর্ব্ব রোমান্টিক বিপ্লবীর দিকে সেই সময় স্থির নিবদ্ধ হয়ে থাকে। তারা প্রত্যেকেই প্রতিনিধির পর প্রতিনিধি পাঠিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করবার চেষ্টা করতো। পরাজিত ট্রটস্কী রাজাধিরাজের মতন তাদের সঙ্গে মোলাকাৎ করতেন। মোলাকাৎ করে তারা যখন বেরিয়ে আসতো, আসল বক্তব্যের চেয়ে সেই অদ্ভুত লোকটির ব্যক্তিত্বই তাদের বেশী করে প্রভাবান্বিত করতো।

জগৎ-খ্যাত লাইফ্ পত্রিকার স্বনামখ্যাত প্রতিনিধি বেটী কার্ক (Betty Kirk) এই সাক্ষাৎকারের এক বিবরণী তাঁর কাগজে প্রকাশিত করেন। তাতে তিনি লিখছেন, আমরা ঘরে ঢুকতেই ট্রটস্কী তাঁর হাতঘড়ির দিকে চেয়ে গম্ভীর ব্যস্ততায় বলে উঠলেন, আট মিনিটের বেশী সময় তিনি দিতে পারবেন না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রাশিয়ান সেক্রেটারীকে ডেকে পাঠালেন, তাঁর কথার সর্ট-হ্যাণ্ড নেবার জন্যে, সেই সঙ্গে তাঁর আমেরিকান্ সেক্রেটারী বার্ণার্ড উলফ্, কাগজপত্র নিয়ে এগিয়ে এলেন। উলফ্, বোধ হয় পেনসিল আনবার জন্যে ঘরের টেবিলের কাছে যাচ্ছিলেন, ট্রটস্কী তা লক্ষ্য করে বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, "তাড়াতাড়ি কর। এক মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট করবার নেই।"

এবং ঘড়ি ধরে আট মিনিট সময়ই তিনি বেটী কার্ককে তাঁর সামনে থাকতে দিলেন।

কিন্তু দিনের পর দিন রাশিয়া থেকে যে-সংবাদ আসতে লাগলো, তাতে ট্রটস্কীর নার্ভও ভেঙ্গে যেতে আরম্ভ করলো। একটার পর একটা মস্কো বিচারের ফলে, তাঁর বিপ্লব-সঙ্গীদের মৃত্যুদণ্ডের কথা শুনে ষ্টালিনের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যক্তিগত উষ্মাই প্রবলতর হয়ে উঠতে লাগলো। বিশেষ করে এই-সব বিচারের সময় দলের লোকেরাই যে-সব জবানবন্দী দিলো, তাতে ট্রটস্কী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেস মারফৎ তিনি যে-সব ঘোষণা প্রকাশ করতে লাগলেন, তার মধ্যে পরাজয়ের দৈন্য পরিস্ফুট হয়ে উঠতে লাগলো। মতবাদের দ্বন্দ্ব থেকে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের আক্রোশই স্ফুটতর হয়ে উঠলো। ট্রটস্কী ক্ষিপ্তের মতন ষ্টালিনকে গালাগাল দিতে সুরু করে দিলেন। ট্রটস্কীর এই ষ্টালিন-বিরোধিতাকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ষোল আনা নিজেদের কাজে লাগাতে সুরু করে দিল। ষ্টালিন-শাসিত সোভিয়েট রাশিয়াকে হেয় করবার জন্যে ট্রটস্কীর এই বুক-চোঁয়ানো গালাগালের চেয়ে উপাদেয় জিনিষ আর কি হতে পারে? পাশ্চাত্য রাজনীতির স্বধর্ম্ম অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র ট্রটস্কীকে প্রশ্রয় দিয়ে ষ্টালিনের প্রতাপকে ক্ষুণ্ন করবার সুযোগ নির্লিপ্ত ভাবে গ্রহণ করলো।

কিন্তু ভাগ্যবিধাতা লোকচক্ষুর অন্তরালে আর এক দিক থেকে এই বিশ্ব-নাট্যের শেষ অঙ্কের যবনিকা-পাতের আয়োজন করছিলেন।

জ্যাকো মোর্নার্ ফন্ ডেন্ ড্রেস্ নামে এক ফরাসী যুবক ট্রটস্কী দলের একজন বিশ্বস্ত কর্মী হয়ে উঠে। নিজের দীর্ঘায়তন নাম বদলে সে নতুন নাম গ্রহণ করে, ফ্রাঙ্ক জ্যাক্‌সন এবং সেই নামেই সে ট্রটস্কীর গোপন দলে পরিচিত ছিল।

প্যারিসে যখন সে সোরবোর্ণ কলেজের ছাত্র ছিল, সেই সময় সিল্‌ভিয়া এজ্‌লফ্ নামে এক আমেরিকান তরুণীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। এই তরুণীই ফ্রাঙ্ককে ট্রটস্কীর মতবাদে দীক্ষিত করে। সিলভিয়া সেই অল্প বয়সেই আমেরিকান ট্রটস্কাইটদের মধ্যে প্রতিপত্তি অর্জ্জন করে। এই নতুন রাজনৈতিক মতবাদে দীক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই তরুণী নারী তার তরুণ শিষ্যের হৃদয়ে অনেকখানি জায়গা দখল করে বসে।

সিলভিয়ার চেষ্টার ফলেই ফ্রাঙ্ক ট্রটস্কীর অন্তরঙ্গ সহকর্মীদের দলে স্থান লাভ করবার সুযোগ পেলো। প্যারিসে একদিন সে আদেশ পেলো, অবিলম্বে মেক্‌সিকোতে চলে আসতে। একজন কানাডিয়ান্ সৈনিকের পাসপোর্ট যোগাড় করে ফ্রাঙ্ক যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসে। সেখানে সিল্‌ভিয়া এবং তাদের দলের ট্রটস্কীপন্থীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের পর ফ্রাঙ্ক মেক্‌সিকোতে দলাধিপের দুর্গে স্থান পাওয়া সৌভাগ্য অর্জ্জন করলো এবং নিউইয়র্ক থেকে কোয়াকানে চলে এলো।

সেখানে ট্রটস্কীর অন্তরঙ্গ কর্ম্মীর দলে ফ্রাঙ্ক নিজের আসন করে নেয়। তার বেশী কোন সংবাদ আজও পর্য্যন্ত ইতিহাস জানে না।

তারপর যবনিকা উঠলো, একেবারে শেষ যবনিকা পড়ার দিনে। সমগ্র জগৎ বিস্মিত হয়ে শুনলো, নিজের তৈরি সুরক্ষিত দুর্গের মধ্যে বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী একান্ত শোচনীয় ভাবে নিহত হয়েছেন। কোন রিভলভারের গুলী নয়, তরবারির আঘাত নয়, একটা সাধারণ কুড়ুলের আঘাতে আততায়ী তাঁর মাথা চূর্ণ করে দিয়েছে। এবং সে আততায়ী হলো তাঁরই দলের লোক ফ্রাঙ্ক জ্যাকসন।

আদালতে জ্যাকসন যে জবানবন্দী দেয়, তাতে জানা যায় যে, ট্রটস্কী জ্যাকসনকে রাশিয়াতে পাঠাতে চেয়েছিলেন, সেখানে স্যাবোটাজের কাজ চালাবার জন্যে।

মেক্‌সিকো ছেড়ে চলে যাবার ইচ্ছা জ্যাকসনের ছিল না। অথবা আরো স্পষ্ট করে বলা যেতে পারে যে, সিল্‌ভিয়াকে ছেড়ে চলে যেতে তার ইচ্ছা ছিল না।

সিল্‌ভিয়াকে সে বিবাহ করতে চায় এবং সেই কথা সে যখন ট্রটস্কীকে জানায়, তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন, বাধা দিয়েছিলেন।

এবং তার কথাগত, একদিন এই ব্যাপার নিয়ে যখন ঘোরতর বিতর্ক চলছিল, সে উত্তেজিত হয়ে ট্রটস্কীকে আক্রমণ করে। সামনেই হাতের কাছে একটা কুড়ুল দেখতে পায়। সেই কুড়ুল দিয়েই ট্রটস্কীকে মাথায় আঘাত করে। এবং সেই আঘাত এত গুরুতর হয় যে, ট্রটস্কী আর কোন কথাই বলতে পারেননি। অন্তরের পুঞ্জীভূত সমস্ত নিষ্ফল বিদ্বেষকে সঙ্গে নিয়েই এবারকার মতন যাত্রা শেষ করতে হয়।

আদালতে ফ্রাঙ্ক তার দলপতির জন্যে যে অভিশাপ-বাণী বর্ষণ করে, হতভাগ্য বিপ্লবীর সমাধি-স্তম্ভকে ঘিরে সেই ক্রুদ্ধ অভিশাপই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—এই একটি লোক, আমার সমস্ত প্রবৃত্তিকে সে পরিবর্ত্তিত করে দিয়েছে; এই একটি লোক আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ, আমার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। সেই আজ আমাকে রূপান্তরিত করে নামহীন, দেশহীন যাযাবর করেছে, এক টুকরো কাগজের মতন সেই একটি লোক আমার জীবনকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে…

ফ্রাঙ্ক জ্যাকসন, আর যার আক্ষেপ করবার থাক, তোমার তো নেই। তুমি তো কড়ির বদলে কড়ি ফেরত দিয়েছ, চোখের বদলে চোখ উপড়ে নিয়েছ!

এই কাহিনীর পরিসমাপ্তি কি এইখানে হ'য়ে গেল?

রাজনীতির সংগ্রামের বাইরে, মতবাদের সংঘর্ষের বাইরে, এ কাহিনী থেকে কি আমরা আদায় করতে পারি?

ট্রটস্কীর নিহত দেহের সামনে দাঁড়িয়ে কি দীর্ঘশ্বাস ফেলবো? এক ফোঁটা চোখের জল? একটা হায়?

ষ্টালিন আজ লিখিত ইতিহাসের পাতা থেকে ট্রটস্কীর নাম ঘসে-ঘসে তুলে দিয়েছেন। আর এক যুগ পরে, এই পৃথিবীতে যারা আসবে, তারা হয়ত শুধু ট্রটস্কীকে তাঁর অপরাধ দিয়েই চিনবে। তাঁর সাহিত্য-প্রতিভা, তাঁর বাগ্মিতা, অসাধারণ তেজ, সংগঠন ক্ষমতা, অনমনীয় কর্মশক্তি, মানুষকে মুগ্ধ করবার ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা, আশ্রয় অভাবে তারা বৃন্তচ্যুত ফুলের মত অচিরকালের মধ্যে শুষ্ক হয়ে বিলীন হয়ে যাবে।

বিলীন হয়ে যেতো না, ষ্টালিনের শত চেষ্টা সত্ত্বেও, ষ্টালিন তাঁর নাম মুছে ফেলতে পারতেন না, যদি এই প্রমত্ত অভিযানের পেছনে না থাকতো, হিংসা…

পৃথিবীর মৃৎপাত্র হিংসার হলাহলে এমন ভাবে পূর্ণ হয়ে আছে, তাতে আর একটা বিন্দুও ধরে না…

তাই তোমার নিহত দেহের সামনে, ট্রটস্কী, সমস্ত পৃথিবী রেখাহীন প্রস্তর-মুখে দাঁড়িয়ে রইলো।

মা

ম্যাক্সিম গোর্কী



ভূমিকা

রাশিয়া এক অদ্ভুত দেশ। সেখানে যা-কিছু ঘটে তা চরম মাত্রায় ঘটে।

উদাসীন অত্যাচারী রাজতন্ত্র সেখানে যে বিকট মূর্ত্তি গ্রহণ করেছিল—জগতের ইতিহাসে তার সমকক্ষ দৃষ্টান্ত বিরল বললেই হয়। সত্তর বছরের মধ্যে আট লক্ষ লোক জার-তন্ত্রের প্রতিবাদের অপরাধস্বরূপ একই পথ দিয়ে সাইবেরিয়ার চির-তুহিনে চির-নির্ব্বাসিতের জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হয়।

উদাসীন অত্যাচারী শাসক জাতির অন্তরকে কশাঘাতে যখন দীর্ণ করে ফেলে, তখন সেই দীর্ণ অন্তর থেকে রক্ত-কমলের মত ফুটে ওঠে, জাতির মুক্তি-বাণী!

গোর্কীর জগৎ-বিখ্যাত উপন্যাস—"মাদার" সেই অপরূপ রক্ত-কমল। নির্য্যাতিত, নিপীড়িত মানবত্বের মুক্তি-বাণী।

একটা সমগ্র জাতির অন্তর-বেদনার ইতিহাস এমন ভাবে জগতের আর কোন ভাষায় লেখা নেই।

"গোর্কী" মানে হলো তিক্ত! এই ছদ্ম-নামে তিনি আজ জগতে খ্যাত। তাঁর অর্দ্ধেক জীবন দিয়ে জগতের নানা ক্ষেত্রে তিনি যে তিক্ততম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন—জগতের ইতিহাসে বেদনার সঙ্গে সে রকম ঘনিষ্ঠ এবং নিগূঢ় পরিচয় খুব কম লোকেরই ভাগ্যে ঘটেছে দেখা যায়। তাঁর সাহিত্য সেই নিগূঢ় অভিজ্ঞতার পুণ্যতম স্মৃতি! বেদনার নব বেদ!

সমস্ত অনাচার, সমস্ত ভয়াবহতা, সমস্ত পঙ্কিলতার সকল রকম তিক্ততার সীমা-রেখা পায়ে হেঁটে পার হয়ে, বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যে গোর্কী অতি বলিষ্ঠ পরুষ-কণ্ঠে এই বাণী প্রচার করেছেন—তবু ঘৃণা নয়, প্রেম হোক জীবনের ধাত্রী!

এই অপরূপ বাণী এবং সকল রকম গ্লানির মধ্যে মানুষের মুক্তির চরম আশ্বাসের কথা—তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি "মাদার"-এ রূপ নিয়েছে। যদিও "মাদার" একান্ত ভাবে রাশিয়ার রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত এবং এই গ্রন্থের সঙ্গে একটা জাতির মুক্তি-পণের ইতিহাস সাক্ষাৎ ভাবে বিজড়িত, তবুও রসের ক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতির লোক এই গ্রন্থকে আদর করে বরণ করে নিয়েছেন, কেন না—যে-বেদনায় সন্তানের জন্য মায়ের মন কাঁদে, মায়ের মনের সে-বেদনা তার নিজের ছেলের জন্যে হলেও, তার মধ্য দিয়ে যে-মাতৃত্ব ফুটে উঠে, সেটা সকল দেশে এক! মাতৃত্বের এক অপরূপ সন্তান-সন্তাপহারিণী মূর্ত্তি এই বইতে ফুটে উঠেছে বলে—জগতের সকল জাতির লোকের অন্তরে কোথায় অলক্ষিতে এই বইখানি একটা দাগ রেখে গিয়েছে।

অনুবাদ দুর্ব্বল হলেও, অনুবাদকের একমাত্র ভরসা যে, মাতৃরূপের উপাসক বাঙালীর মন, জননীর নতুন এই চিত্রটিকে নিশ্চয়ই সাদরে বরণ করে নেবে এবং সেইটুকু উদ্দেশ্য যদি সফল হয়, তা হলে তার মধ্যে এই অনুবাদের সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও, অনুবাদক নিজেকে কৃতার্থ মনে করবে।

মা

প্রথম ভাগ

প্রতিদিন প্রভাতে কারখানার বাঁশী বাজিয়া ওঠে। কম্পিত-কর্কশ দীর্ঘ শব্দ শ্রমজীবীদের আবাসের উপরের ধূম্র-ধূসর পরিম্লান আকাশকে ছাইয়া ফেলে। যন্ত্র-দানবের এই নিষ্করুণ আহ্বানে নত মস্তকে অসংখ্য নর-নারী ম্লান গৃহ-গহ্বর হইতে দলে দলে পথে বাহির হইয়া পড়ে; বিশুষ্ক বিষণ্ন-মুখে, সন্ত্রস্ত জন্তুর মত তাহারা আগাইয়া চলে,—অনিদ্রায়, অল্প-নিদ্রায় দেহ কাঠ হইয়া থাকে। অদূরাগত প্রভাতের মন্দ-আলোকে, কর্দ্দমাক্ত পথে তরল বিবর্ণ নয়নের অর্থহীন দৃষ্টি লইয়া সঙ্কীর্ণ খোয়ার পথ বাহিয়া তাহারা চলে—যেখানে তাহাদের জন্য হিম-স্নেহে অপেক্ষায় রহিয়াছে দীর্ঘ প্রস্তরের পিঞ্জরগুলি। কাদায় পায়ে-চলার শব্দ হয়—অনুকম্পার অভিনয়ের শব্দ। তন্দ্রাচ্ছন্ন গভীর কর্কশ শব্দে পথ ভরিয়া যায়; ক্ষুব্ধ আক্রোশের নির্লজ্জ ভাষা আকাশ ছাইয়া ফেলে। আর সেই সমস্ত অতিক্রম করিয়া তাহাদের অভ্যর্থনার জন্য গভীর বধির গতি-রোলে যন্ত্রের পীড়িত আর্ত্তনাদ তাহাদের চতুর্দ্দিকে অতিক্রম করিতে থাকে। নির্দ্দয় অনিবার্য্যতার মত অন্ধকারে কারখানার চিমনিগুলি দীর্ঘ সরল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে।

সন্ধ্যা বেলায় যখন আবার সূর্য্য অস্ত যায়, অস্ত-সূর্য্যের বিলম্বিত রক্ত-আলো যখন বাতায়নে বাতায়নে আসিয়া পড়ে, তখন আবার কারখানা হইতে দাহ-অন্তে ভস্মের মত অসংখ্য নর-নারী দলে দলে পথে আসিয়া পড়ে। অন্ধকার-মুখ, ধোঁয়ায় ধূসর; সারা দেহে কল-চালানো তেলের তীব্র গন্ধ; গোধূলির ঈষৎ আলোকে ক্ষুধার্ত্ত দাঁতগুলির রক্তহীন পীত আভা মাঝে মাঝে জ্বলিতে থাকে। ফিরিবার সময় কিন্তু তাহাদের ভাষা একটু যেন সতেজ মনে হয়—একটু আনন্দের আভাস থাকে। একটি দিনের দীর্ঘ শ্রমের অবসান ত' হইল, ঘরেতে আহার আছে, তাহার সঙ্গে আছে বিরাম।

জীবন হইতে যন্ত্রদানব নিঃশব্দে দিবসকে গ্রাস করিয়া লইয়াছে। মাংসপেশী ও শিরা-উপশিরা হইতে যতদূর পারা যায় যন্ত্র তাহার আহারের জন্য রস চুষিয়া লইয়াছে। মানবের জীবন হইতে দিবসের রৌদ্রের সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। একটিও রবির কর জীবনের সঙ্গে গাঁথা হয় না। আপনার অগোচরে মানব মৃত্যুর গহ্বরের দিকে আরও একটু অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু তবুও তাহার মনে বিরামের আনন্দের বাসনা আছে—সম্মুখেই পূতিগন্ধময় ভাঁটিখানায় আনন্দ-আশ্রম খোলা। আনন্দে সে তাহাই গ্রহণ করে।

ছুটির দিনে তাহারা বেলা দশটা পর্য্যন্ত ঘুমায়। তারপর বিবাহিত এবং অপেক্ষাকৃত শান্ত প্রকৃতির লোকেরা যথাসম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া গির্জ্জায় উপাসনার জন্য যায়। যাইবার সময় ছোকরাদের ধর্ম্মে অনাস্থার বিষয়ে তীব্র মন্তব্য করে। গির্জ্জা হইতে ফিরিয়া আসিয়া রুশজাতির মোহন-ভোগ 'পিরগ' খায়। খাওয়ার পর আবার ঘুমাইতে যায়—সেই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। বহু বর্ষের স্তূপীকৃত অবসাদ ক্ষুধাকে কখন নষ্ট করিয়া দিয়াছে, তাই আহারের প্রবৃত্তিকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাহারা জাগিয়া উঠিয়া আকুল ভাবে মদ্যপান করে। উদরের অসহায় তন্ত্রীগুলি 'ভোদকার' তীব্র বিষজ্বালায় জ্বলিয়া ওঠে।

তারপর তাহারা পথে এমনি ঘুরিতে বাহির হয়। এমনি অলস ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে তাহাদের ভাল লাগে। কেউ কেউ কাদায় ব্যবহারের জন্য "ওভার-সু" পরে, যদিও পথ শুক্না থাকে; ছাতি লইয়া ছড়ির মত হাতে করিয়া চলে—রৌদ্র থাকিলেও। প্রত্যেকেরই যে জুতা ও ছাতা আছে তাহা নয় কিন্তু প্রত্যেকেরই মনে বাসনা আছে যে, সে তাহার প্রতি-বেশীর অপেক্ষা অধিকতর শোভন হইবে।

পথে দেখাশোনা হইলে তাহারা কারখানা আর যন্ত্রপাতির কথাই বলাবলি করে। ফোরম্যানকে লইয়া বেশ দু'-কথা অসাক্ষাতে বলা-কওয়া চলে। তাহাদের চিন্তার সীমানা কারখানা আর যন্ত্রপাতিকে ছাড়াইয়া

যায় না। কচিৎ, এবং তাহাও একান্ত আভাসে, তাহাদের সেই প্রতিদিনের অতি পুরাতন ক্লান্ত কথার মধ্যে সহসা কোন বন্ধ্যা বাসনার একটি স্ফুলিঙ্গ হয়ত দেখা দিত। বাড়ীতে ফিরিয়া তাহারা নিয়মিত ভাবে তাহাদের স্ত্রীদের উপর কব্জীর জোর পরীক্ষা করিত। ছোকরারা ভাটিখানানায় স্ফূর্ত্তি জমায়, কারুর বাড়ীতেই হয়ত আড্ডা বসে, বাজনা বাজে, সৌন্দর্য্যের নাম-গন্ধ-শূন্য অশ্লীল গান পুরাদমে চলে, নাচ হয়, শ-কার ব-কারের সঙ্গে ভরা 'ভোদ্‌কা'র ভাঁড় অনবরত ভরা আর খালি হইতে থাকে।

শ্রমে অবসন্ন-অন্তর তাহারা অতিক্রুত পান করিয়া চলে। প্রত্যেক চুমুকের সঙ্গে প্রত্যেকের অন্তরে একটা অর্থহীন ব্যাধিগ্রস্ত চাঞ্চল্য জাগে। সে চাঞ্চল্য বাহিরে রূপ লইতে চায়। তাই সামান্য কারণে তাহারা বন্ধুদের সামান্যতম কথার ছল ধরিয়া বিষম ঝগড়ার সৃষ্টি করে। অন্তরের পিঞ্জরে আবদ্ধ সেই বিরক্তিকর চাঞ্চল্য মুক্তি চায়। কলহ ঘন হইয়া ওঠে; মত্ত পশুর মত তাহারা আপনাদের মধ্যে কলহ করে—কামড়া-কামড়ি করে—রক্তারক্তি এবং কখন কখন হত্যাও হয়।

স্নায়ুতে বদ্ধমূল অবসাদের মত তাহাদের অন্তরেও এই হিংসার সংগোপন প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে সমস্ত হৃদয়-মন ছাইয়া ফেলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্তরের এই দুরারোগ্য ব্যাধি লইয়াই তাহারা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। যত দিন না মৃত্যু আসিয়া আবার তাহাদের এই পৃথিবী হইতে সরাইয়া লইয়া যাইত, তত দিন পর্য্যন্ত ঘন-কৃষ্ণ ছায়ার মত এই ব্যাধি তাহাদের ঘিরিয়া থাকিয়া নিত্য নব উদ্দেশ্যহীন অনাচারের ইন্ধন জোগাইত।

ছুটির দিনে ছেলেরা বাড়ী ফিরিত গভীর রাতে—কাপড়-চোপড় ছেঁড়া, সর্ব্ব-দেহ ক্ষত-বিক্ষত। কেউ তার-স্বরে চীৎকার করিয়া জানাইতেছে কেমন আর একজনকে বেশ দু-ঘা দিয়া আসিয়াছে অথবা জোর দু-কথা শোনাইয়া আসিয়াছে; কেউ বা অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া কাঁদিত। এমনি ভাবে নিশীথ রাতে তাহারা বাড়ী ফিরিত, মাতাল, অসহায়, বীভৎস হতভাগ্যের দল! কখনও মা বাবা মাতাল অবস্থায় ছোকরাদের রাস্তা বা সরাইখানা হইতে অচৈতন্য অবস্থায় তুলিয়া আনে, গালাগালি দিয়া বকে, মদ্য-রসে ভরা স্পঞ্জের দেহে বৃথাই আঘাত করে। আবার তাহাদিগকে ধরিয়া কোনও রকমে বিছানায় শোয়াইয়া দেওয়া হয়, কারণ আবার প্রভাত হইতে না হইতেই ভূঁ বাতাস কাঁপাইয়া কারখানার বাঁশী বাজিয়া উঠিবে।

মাতলামি আর এই ভাঁটিখানার জীবন যে বুড়োদের কাছে অন্যায় লাগিত তাহা নয়, বরঞ্চ সেটা তাহাদের ন্যায্য অধিকার—এ কথা বুড়োরা মানিত, তবুও ছেলেদের প্রহার ও গালাগালি করিত। তাহাদেরও যখন যৌবন ছিল, তাহারাও এমনি উন্মত্ত হইয়াছে, কলহ করিয়াছে, আবার তাহাদেরও এমনি তাহাদের মা বাবা রাস্তা হইতে তুলিয়া আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিয়াছে। জীবন চিরকাল ধরিয়া এমনি বহিয়া চলিয়াছে। বৎসরের পর বৎসর এমনি একই-সুরে-বাঁধা জীবনধারা কোনও রকমে পঙ্কিল আবর্ত্তনের তলা দিয়া নিঃশব্দে বহিয়া চলিত। অতি পুরাতন অভ্যাসের ক্রীতদাসস্বরূপ তাহারা প্রতিদিন একই কাজ অবিরত দিবারাত্রি ঘুরিয়া-ফিরিয়া করিয়া চলিত; জীবনের এই ধারাকে পরিবর্ত্তিত করে—এমন সময় ও ইচ্ছা তাহাদের কাহারও ছিল না।

বহুদিন অন্তর সহসা হয়ত একটু নূতন ধরণের কোনো লোক গ্রামে আসে। নবাগত বলিয়াই সে প্রথমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কাজের খাতিরে সে যে-সমস্ত জায়গায় গিয়াছে সেখানকার গল্প করিয়া ধীরে-ধীরে অনেকের মধ্যে একটা আবছায়া কৌতূহলের সৃষ্টি করে। কিন্তু কিছু কাল পরেই আবার এইটুকু নতুনত্ব তাহাও পুরাতন হইয়া আসে। এই সমস্ত গল্প শুনিয়া তাহারা বুঝিয়া লয় যে, সকল দেশেই কুলী-মজুরদের জীবন এমনি সমান বৈচিত্র্যহীন। তাহাই যদি হয়, তবে ইহা লইয়া আলোচনা করিয়া কি লাভ?

কচিৎ কখনও গ্রামে এমন এক-একটি লোক আসে যাহার কথা একেবারে নূতন লাগে। তাহার সঙ্গে তাহারা কোনও তর্ক করে না, অদ্ভুত যাহা-কিছু সে বলিয়া যায়, চরম অবিশ্বাসে তাহারা তাহাই চুপ করিয়া শোনে। এই রকম লোকের কথায় কখনও হয়ত কাহারও অন্তরে অজানা একটা অন্ধ চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিত; বিশ্বাস করিতে গিয়া কাহারও বা অন্তরে কি একটা এলোমেলো আশঙ্কা জাগিত; কেহ বা তাহার মধ্যে কোন অজানা সম্ভাবনার ক্ষীণ ছায়াময় আভাস দেখিতে পাইত। কিন্তু এই নিতান্ত উত্যক্তকারী অপ্রয়োজনীয় ক্ষণিক উত্তেজনার হাত হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাহারা সকলেই আবার অধিকতর মাত্রায় পান করিত।

এই রকম নবাগতের চারিদিকে একটা অস্বাভাবিক কিছু তাহারা লক্ষ্য করিত বলিয়াই একটু বেশী দিন ধরিয়া তাহার স্মৃতি ইহাদের মনে জাগিয়া থাকিত এবং লোকটি তাহাদের মত হইতে পারে নাই বলিয়া সর্ব্বদাই

শঙ্কিত সন্দেহের সঙ্গে দেখিত। তাহাদের ভয় হইত যে, হয়ত এই লোকটি তাহাদের জীবনে এমন একটা কিছু ঘটাইয়া তুলিতে পারে যাহাতে তাহাদের জীবনের এই অন্ধকার-বাহিনীর সনাতনী ধারা বুঝি বা ব্যাহত হইবে। অন্ধকার অথবা কুটিল যাই হ'ক, এ জীবনের ধারা তাহাদের সুপরিচিত। তাই তাহাদের মনে এই ধারণা দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গিয়াছে যে, জীবনের মাত্র একটি মাত্রা আছে—তাহার চেয়ে ভাল কি, তাহা তাহারা জানিত না, তাই তাহারা ভাবিত—পরিবর্ত্তন মানে শুধু জীবনের বোঝার মাত্রা বাড়ান।

সেই জন্য বস্তির লোকেরা যাহারা জীবন সম্বন্ধে নূতন কথা বলিত তাহাদের নীরবে এড়াইয়া চলিত। এই সব নূতন লোকের মধ্যে কেউ কেউ যেমন সহসা আসিত, তেমনি সহসা অদৃশ্য হইয়া যাইত। যদি কেহ সেই গ্রামে থাকিয়া যাইত, পাছে সেই গ্রামের রেখাহীন অসংখ্যের মধ্যে মিশাইয়া যাইতে হয়, সেই আশঙ্কায় সে আলাদা হইয়াই বাস করিত।

এমনি ভাবে জীবন যাপন করিয়া পঞ্চাশ বৎসর বয়সে একজন শ্রমজীবী পৃথিবী হইতে অবশেষে বিদায় গ্রহণ করিত।

ঠিক এমনি জীবন যাপন করিয়া যায় মাইকেল ভ্লাসব। মুখে তাহার কোনও হাসির চিহ্ন ছিল না। একরাশ ভ্রূর মধ্যে ছোট ছোট দুটো চোখ দিয়া সর্ব্বদাই এমন ভাবে চাহিয়া থাকিত যে দেখিলেই মনে হইত যে জগৎশুদ্ধ লোককে সে সন্দেহের চোখে দেখিতেছে।

গ্রামের মধ্যে সে সব চেয়ে ভাল মিস্ত্রী ছিল। দেহের শক্তিতেও তাহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। কারখানার ফোরম্যান বা ম্যানেজারকে সে মোটেই গ্রাহ্য করিত না; ফলে রোজগার হইত কম। ছুটির দিন সে কাহাকেও না কাহাকেও প্রহার না করিয়া বড়-একটা বাড়ী ফিরিত না। সেই জন্য প্রত্যেক লোক তাহাকে ঘৃণা এবং ভয় করিত।

বহু বার তাহাকে উত্তম-মধ্যম শিক্ষা দিবার চেষ্টাও হইয়াছিল; কিন্তু কোনও চেষ্টা ঠিক সফল হইতে পারে নাই। সে যেই বুঝিত যে তাহার উপর কোনও আক্রমণের সম্ভাবনা আছে, তৎক্ষণাৎ সে হাতের কাছে ইট, পাথর যাহা পাইত, তাহা লইয়া পা ফাঁক করিয়া সোজা হইয়া নীরবে আক্রমণকারীর অপেক্ষায় ফিরিয়া দাঁড়াইত; যে তাহার দিকে আগাইয়া আসিবে, তাহারই মাথা গুঁড়া হইয়া যাইবে। তাহার চেহারার মধ্যে এমন একটা বীভৎসতার ছাপ ছিল যে, তাহাকে দেখিলেই লোকের ভয় করিত। বিশেষ করিয়া ভয়ের ছিল, তাহার ছোট ছোট চোখ দুটি। কোটরের ভিতর হইতে ছোট চোখ দুটির দৃষ্টি যেখানে গিয়া পড়িত, মনে হইত গরম লোহার সিকের মত সে জায়গা যেন ভেদ করিয়া চলিয়াছে। চোখাচোখি হইলে মনে হইত যেন সম্মুখে এক হিংস্র বন্য জন্তু দাঁড়াইয়া আছে, চোখে এক আদিম ভয়াল হিংস্র দৃষ্টি, এ দৃষ্টি যাহার, কোন নির্ম্মমতায় তাহার কোনও কুণ্ঠা নাই।

সে খুব অল্প কথাই কহিত; কিন্তু তাহার সকল কথার মাত্রা ছিল "পাজী বদমায়েস"। ঐ নামে সে কারখানার উপরিওয়ালাদের ডাকিত, ঐ নামে সে পুলিশের লোকদের গালাগালি দিত। বাড়ীতে ঐ নামে স্ত্রীকে সম্বোধন করিত।

তাহার ছেলে পাভেলের বয়স তখন চোদ্দ। একদিন বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া সহসা ছেলের চুলের মুঠি ধরিয়া টানিয়া তুলিবার তাহার বাসনা হইল। মাথায় হাত দিতে না দিতেই, পুত্রও গর্জ্জিয়া উঠিল। সামনে একটা হাতুড়ি পড়িয়াছিল, তাহা তুলিয়া লইয়া পুত্র রুখিয়া দাঁড়াইল।

"খবরদার! আমার গায়ে হাত দিও না বলছি। অনেক সহ্য করেছি আর আমি কিছুতেই সহ্য করবো না।"

পুত্রের দিকে চাহিয়া মাইকেল হাসিয়া উঠিল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, পাজী বদমায়েস!"

এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরে সে তাহার স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল, "দেখ্, কাল থেকে আর আমার কাছে পয়সা চাইবি না, এবার থেকে তোর ছেলে তোকে রোজগার করে খাওয়াবে।"

ভয়কুণ্ঠিত স্বরে নারীটি বলিল, "আর তুমি যা রোজগার করবে, সব মদ খেয়ে ওড়াবে তো?"

"তোর তাতে কি পাজী বদমায়েস!"

সেই দিন হইতে তিন বৎসর পর্য্যন্ত যত দিন সে বাঁচিয়া ছিল, সে পুত্রের কোন খোঁজখবর লইত না—পুত্রের সঙ্গে কোন কথাও বলিত না।

ভ্লাসবের সঙ্গিহীন জীবনে একটি নিত্যসঙ্গী ছিল, সে তাহার কুকুর। কুকুরটি ছিল তাহারই মত ভীষণ ও বীভৎস। প্রতিদিন সকালে সে যখন কারখানায় যাইত, কুকুরটিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে কারখানার গেট পর্য্যন্ত যাইত। সন্ধ্যা বেলায় কারখানা হইতে সে যখন ফিরিয়া আসিত, কুকুরটি তাহার অপেক্ষায় গেটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিত। ছুটির দিন কুকুরটিও সারা দিন তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া ফিরিত। রাত্রে মাতাল

অবস্থায় বাড়ী ফিরিয়া কুকুরটিকে লইয়া সে খাইতে বসিত, আপনার প্লেট হইতে তাহাকে খাওয়াইত। কুকুরটিকে সে কোনও দিন মারে নাই, কোনও দিন আদরও করে নাই। খাওয়া শেষ হইলে, স্ত্রীর অপেক্ষা না করিয়াই ডিসগুলি সে ছুড়িয়া চতুর্দ্দিকে ফেলিয়া দিত; একটি হুইস্কীর বোতল লইয়া দেওয়ালে ঠেসান দিয়া বসিয়া গান গাহিত। গানের ভাষা তাহার দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে আসিয়া জড়াইয়া যাইত। সেই বীভৎস স্বরের ধাক্কায় দাঁতের ফাঁক হইতে রুটির টুকরা ছিটকাইয়া পড়িয়া গোঁফে দাড়িতে আসিয়া লাগিত। সে আপনার মনে জগতের সকলের অনধিগম্য ভাষায় যতক্ষণ বোতলের মদ থাকিত, ততক্ষণ গাহিয়া চলিত। তাহার এই সঙ্গীত শুনিয়া মনে হইত, শীত-সন্ধ্যার নিস্তব্ধ প্রান্তরে ক্ষুধিত শার্দ্দূল চীৎকার করিতেছে।

মদ ফুরাইয়া গেলে সেইখানেই সে ঘুমাইয়া পড়িত। কুকুরটিও তাহার পাশে শুইয়া পড়িত। রাত্রিশেষে যখন আবার কারখানার বাঁশী বাজিয়া উঠিত, যন্ত্রচালিতের মত তখনই সে আহ্বানে আবার জাগিয়া উঠিত।

এমনি করিয়াই সে বাঁচিয়া ছিল, মরিল যখন তখন ঠিক এমনি কঠোর রূপেই মরণ তাহার নিকটে আসিল। সর্ব্বশরীর তাহার কালো হইয়া গিয়াছিল। পাঁচ দিন ধরিয়া অসীম যন্ত্রণায় সে বিছানায় গড়াগড়ি দিল। শুধু মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া উঠিত, "আমাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেল্, মেরে ফেল্ আমাকে!"

স্ত্রী ডাক্তার ডাকল। ডাক্তার আসিয়া জানাইলেন যে হাসপাতালে পাঠাইতে হইবে, এখানে চিকিৎসা হওয়া সম্ভবপর নয়।

হাসপাতালের কথা শুনিয়া ভ্লাসভ চীৎকার করিয়া উঠিল, "বেরোও পাজী বদমায়েস। আমি কোথাও যেতে চাই না, এইখানেই মরবো।"

ডাক্তার চলিয়া গেলে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে স্ত্রী কাতর-নিবেদন করিল, "হ্যাগা, চল না হাসপাতালে?"

"খবরদার বলছি, হাসপাতালে পাঠাস্ নি! হয়ত আমি সেখানে সেরে উঠতে পারি, আর তাতে তোরই বিপদ বেশি।"

ভোর বেলা সে দেহত্যাগ করিল। ঠিক তখন কারখানার বাঁশী বাজিতেছিল। অন্য সব মজুরেরা তখন প্রতিদিনকার অভ্যাসে কারখানার দিকে আগাইয়া চলিতেছিল। যখন তাহাকে কবর দেওয়া হয় তখন সেখানে তাহার স্ত্রী, তাহার পুত্র এবং কুকুরটি ছাড়া একজন বৃদ্ধ মাতাল, একটি দাগী চোর ও সেখানকার কয়েক জন ভিখারী উপস্থিত ছিল। স্ত্রী কাঁদিতেছিল, কিন্তু পুত্রের চোখে অশ্রুর বাষ্পও ছিল না। রোরুদ্যমানা স্ত্রীর দিকে চাহিয়া সমাগত লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল, "ভ্লাসব মরেছে, না মাগীর হাড় জুড়িয়েছে।"

কবরের কার্য্য শেষ হইয়া গেলে যে যাহার ঘরে ফিরিয়া গেল। কিন্তু সেই নিস্তব্ধ প্রান্তরে শুধু একটি প্রাণী পড়িয়া রহিল; সদ্য-খোড়া মাটির উপর বসিয়া কুকুরটি মাটিতে মুখ রাখিয়া গন্ধের মধ্য দিয়া কাহার সন্ধানের জন্য তখনও বসিয়াছিল।

পিতার মৃত্যুর দুই সপ্তাহ পরে একদিন রবিবার পাভেল রীতিমত মাতাল হইয়া বাড়ীতে ফিরিল। কোন রকমে হামাগুড়ি দিয়ে যেখানে বসিয়া তাহার বাবা আহার করিত, ঠিক সেইখানে বসিয়া টেবিলের উপর জোরে ঘুষি মারিয়া ঠিক তাহার বাবা যেমন করিয়া চীৎকার করিত তেমনি ভাবে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "খাবার নিয়ে আয়।"

পুত্রের চীৎকার শুনিয়া মাতা ধীরে ধীরে পুত্রের পাশে গিয়া বসিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইলেন। মাতার এই আদরে পাভেল আরও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, এবং মার হাত তাহার ঘাড় হইতে জোরে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, 'শীগ্‌গির, খাবার দে শীগ্‌গির!"

শান্ত স্নেহসিক্ত কণ্ঠে পুত্রের হাত ধরিয়া মা শুধু বলিলেন, "দুষ্ট ছেলে!"

মায়ের দিকে না চাহিয়াই জড়িত কণ্ঠে পাভেল বলিল, "আমি তামাকও খাব, বাবার পাইপটা আমাকে এনে দে।"

জীবনে এই প্রথম সে মদ খাইয়াছে। তীব্র মদিরা তাহার সর্ব্বদেহকে অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল কিন্তু তখনও তাহার চৈতন্য হারায় নাই। তাহার মাথার ভিতরে কে-যেন তখন অনবরত জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "মদ? মদ খেয়েছ? মাতাল হয়েছ?"

মায়ের আদরে সে আরও আসোয়াস্তি বোধ করিতেছিল। মার চোখের দিকে চাহিতেই সেই বিষণ্নদৃষ্টি তাহার মর্ম্ম-মূলে যেন বিঁধিতেছিল। ডাক ছাড়িয়া কাঁদিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু উদ্বেলিত কান্নাকে চাপিবার জন্য, যতখানি না মাতাল হইয়াছিল সে তাহার বেশী ভাণ করিতে লাগিল।

পুত্রের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে মা বলে, "কেন তুই এ কাজ করলি? তোর কি এ কাজ করা উচিত ছিল?"

পাভেলের শরীর ঝিমাইয়া আসিতেছিল। সে ভীষণ ভাবে হুঙ্কার করিতে লাগিল। তারপর অবসন্ন

হইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল, দূর হইতে যেন তার মা বলিতেছে,—"তুই যা আমাকে খাওয়াবি, তা বুঝতে পারছি!"

চোখ বন্ধ করিয়াই সে উত্তর দিল, "কেন, সবাই তো মদ খায়।"

পুত্রের উত্তর শুনিয়া মা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। সে ঠিকই বলিয়াছে, সবাই তো মদ খায়। তিনি খুব ভাল রকমেই জানিতেন যে সরাইখানা ছাড়া জগতে এমন কোনও জায়গা নাই যেখানে এরা বুকের জ্বালা জুড়ায়, 'ভোদকা'র আস্বাদ ছাড়া এমন কোনও আনন্দের স্বাদ নাই যে তাহাদের জীবনকে ক্ষণিকের জন্য ভরিয়া তোলে। তবুও তিনি বলিলেন, "সবাই খায় বলে, তুইও খাবি? তোর বাবা যে তোদের দুজনের হয়ে খেয়ে গেছে! কত যে সয়েছি! একবার অভাগী মায়ের দিকে ফিরে চা—দেখবি তোর আর খেতে প্রবৃত্তি হবে না—"

মায়ের শান্ত স্নেহ-কোমল কথায় পাভেলের মনে পড়িল যত দিন তাহার বাবা বাঁচিয়াছিল তত দিন মায়ের অস্তিত্বের কোনও খবর কেহ যেন পাইত না। একান্ত নীরবে তিনি যেন সর্ব্বদাই অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন কখন অতর্কিত প্রহারের পালা আরম্ভ হইবে। ইদানীং বাবার সঙ্গে যাহাতে দেখা-সাক্ষাৎ না হয়, তাহার জন্য পাভেল বাড়ীতে খুব অল্প সময়ই থাকিত। এই সমস্ত কারণে তাহার মন হইতে মায়ের কথা এক রকম দূরে সরিয়াই গিয়াছিল।

একটু সুস্থির হইয়া পাভেল বহুদিন পরে মায়ের মুখের দিকে চাহিল। বহুদিনের পরিশ্রমে তাঁহার দীর্ঘ দেহ নুইয়া পড়িয়াছে। চোখের কোলে কোলে বিষাদের ছায়া জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। গ্রামের অন্য সমস্ত নারীদের চোখের কোলেও এই একই ছায়া। ঘন কৃষ্ণ কেশগুচ্ছের মধ্যে এক এক জায়গা শাদা হইয়া গিয়াছে, মনে হয় যেন কাহারও বজ্রমুষ্টির ছাপ এখনও রহিয়া গিয়াছে। পাভেল দেখিল, মায়ের চোখে জল।

"আঃ, কেঁদো না, দাঁড়াও, একটু জল দাও দেখি।"

"দাঁড়া, একটু বরফ-জল এনে দিচ্ছি!"

বরফ-জল লইয়া যখন তিনি ফিরিয়া আসিলেন, তখন দেখেন পাভেল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নিঃশব্দে ঝুঁকিয়া পুত্রের মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন। তারপর ধীরে পেয়ালাটি টেবিলে রাখিয়া ঘরের এক কোণে ক্রুশবিদ্ধ মহাপুরুষের যে বিমলিন ছবিটি টাঙানো ছিল, তাহার সম্মুখে নতজানু হইয়া নীরবে শুধু অশ্রু-জলে পুত্রের কল্যাণ কামনায় প্রার্থনা জানাইলেন।

বাহিরে তখন অন্ধকারে নষ্ট-জীবনের নিশীথ-উন্মাদনার শব্দ উঠিয়াছে। শরতের কুয়াশাচ্ছন্ন বাতাসে দূর হইতে একটি ভাঙ্গা সেতারের শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে। কোথাও তারস্বরে কেহ চীৎকার করিয়া গান করিতেছে, কেহ বা অবিশ্রান্ত কুৎসিত গালাগাল বকিয়া চলিয়াছে। আর তাহার মাঝে মাঝে নারী-কণ্ঠের তিক্ত অভিশাপবাণী নিশীথ অন্ধকারকে আরও গাঢ় করিয়া তুলিতেছে।

নিতান্ত একঘেয়ে ভাবে কোনও রকমে মাতা-পুত্রের জীবন বহিয়া চলিয়াছিল। গ্রামের অন্য সমস্ত ছেলে যেমন ভাবে দিন কাটায় ঠিক সেই রকম ভাবেই পাভেল তাহার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চেষ্টা করে। গ্রামের অন্য সব ছেলেদের দেখাদেখি সে-ও একটা বাজনা কিনিল, ছুটির দিন বেড়াইতে বাহির হইবার জন্য একটা ছড়ি, নেকটাই ওভার-সুও কিনিল। সরাইখানার সান্ধ্য সমিতিতে এখন সে নিয়মিত যাতায়াত করে এবং সেখানে নাচিতেও শিখিল। ছুটির দিনে রাত্রে সে মাতাল হইয়াই বাড়ীতে ফিরে এবং যন্ত্রণায় ছটফট করে। সকাল বেলা বুক জ্বালা করে, মুখ ফ্যাকাসে হইয়া যায়, মাথা তুলিবার তার ক্ষমতা থাকে না।

একদিন সকাল বেলায় মা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ রে, কাল রাত্রে কেমন ছিলি?"

বিরক্ত হইয়া পাভেল বলিয়া উঠিল, "মনে হচ্ছে যেন একটা মস্ত কবরের মধ্যে বসেছিলাম—উঃ, কিছু আর ভাল লাগে না—মানুষগুলো সব যেন এক-একটা কলকব্জা। নাঃ, এবার ছুটির দিন মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়বো, না হয় একটা বন্দুক কিনবো।"

কিন্তু মাছ ধরা অথবা শীকার করা কোনটাই তাহার হইয়া উঠে নাই। তবে যত দিন যাইতে লাগিল ততই সে প্রতিদিনের বাঁধা পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। সরাইখানার সান্ধ্য-সমিতিতে তাহার গতায়াত ক্রমশ কমিয়া আসিতে লাগিল। ছুটির দিনে সে বাহিরে কোথায় চলিয়া যাইত, কিন্তু বেশ সুস্থ অবস্থাতেই বাড়ী ফিরিত। মা বিস্মিত হইয়া পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। দেখিতেন, তাহার মুখের রেখাগুলি যেন ক্রমশ বদলাইয়া আসিতেছে, চোখের দৃষ্টিতে যে ভাষা ফুটিয়া উঠিত, মা তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিতেন কিন্তু পারিতেন না। পাভেলের মুখ দেখিয়া মনে হইত সে যেন কাহারও উপর ভয়ানক রাগিয়া আছে, অথবা তাহার বুকের কোথাও কোনও ভীষণ ক্ষত যেন তাহার দেহের সমস্ত শুষিয়া লইতেছে।

পুরানো বন্ধুরা তাহার অদর্শনে তাহাকে ডাকিয়া লইতে প্রথম প্রথম তাহার বাড়ীতে আসিত, কিন্তু বাড়ীতে তাহাকে বার বার না পাওয়ার দরুণ, তাহারাও আসা বন্ধ করিয়া দিল।

ছেলের মতিগতি ফিরিয়াছে দেখিয়া মায়ের মনে আনন্দ হইত। কিন্তু সেই সঙ্গে কোথা হইতে তাঁহার মনে এক অজানা আশঙ্কা জাগিয়া উঠিত। পুত্রের মতিগতি যে ফিরিয়াছে তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন কিন্তু যেন কোন এক দুরধিগম্য রহস্যময় পথে সে চলিয়াছে—সে পথের কোন দিশাই তিনি ঠিক করিতে পারিতেন না।

ইদানীং বাড়ী ফিরিবার সময় সে প্রত্যহ সঙ্গে করিয়া নানা রকমের বই লইয়া আসে। প্রথমে সে লুকাইয়া প'ড়িত এবং পড়া শেষ হইয়া গেলে বইগুলি লুকাইয়া রাখিয়া দিত। মাঝে মাঝে বই হইতে গোপনে কাগজে সে কি লিখিয়া লইত এবং লেখা কাগজখানিও লুকাইয়া রাখিত।

মাঝে মাঝে মা জিজ্ঞাসা করেন, "হাঁ রে পাভলুসা, তোর কি কোন অসুখ করেছে?"

মাথা নাড়িয়া পাভেল বলে, "কই না, মা!"

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মা বলেন, "রোজ রোজ রোগা হয়ে যাচ্ছিস্!—" এই পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা হয়।

যত দিন যায়, মাতাপুত্রের কথাবার্ত্তা তত কমিয়া আসে। সকালে নিঃশব্দে চা খাইয়া সে কাজে চলিয়া যায়—দুপুর বেলায় খাবার সময় দুই-একটা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক কথা ব্যতীত সে আর কোনও কথা বলিত না। রাত্রে কাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া গা হাত-পা ধুইয়া তেমনি নীরবে আহার সমাপন করিয়া সে আপনার বইপত্র লইয়া বসিত, ছুটির দিন ভোর না হইতেই সে বাড়ী হইতে বাহির হইত এবং গভীর রাত্রে ফিরিত। মা ভাবিতেন, ছেলে শহরে থিয়েটারে যায়। ইদানীং মা দেখিতেন যে পাভেল প্রায়ই এমন সব ভাষা ব্যবহার করে, যাহা ইহার পূর্ব্বে তিনি কোনও দিন আর শোনেন নাই এবং যার অর্থও তিনি বুঝিতে পারেন না। সবার চেয়ে তাঁহার নজরে বেশী পড়িল যে আগে তাহার কণ্ঠস্বরে একটা কর্কশতা ছিল, তাহা যেন কেমন কোমল নমনীয় হইয়া উঠিয়াছে। আগে গ্রামের ছোকরাদের মত বাবু সাজিতে পাভেল ব্যস্ত থাকিত; এখন মা দেখিলেন যে বাবুয়ানির দিকে আদৌ তাহার লক্ষ্য নাই অথচ পোষাক-পরিচ্ছদ সর্ব্বদাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। পাভেল যত কোমল হয়, যত সহজ ও সরল হয়, মায়ের মন ততই কি এক অজানা আশঙ্কায় দুলিয়া দুলিয়া ওঠে।

একদিন সে একটি ছবি আনিয়া দেওয়ালে টাঙাইল। ছবির দিকে চাহিয়া মা দেখিলেন যে, তিনজন লোক ধীর-গম্ভীর ভাবে চলিয়াছে, চলিতে চলিতে কি কথা বলিতেছে।

মায়ের বিস্মিত দৃষ্টির উত্তরে পাভেল বলিল, "মৃত্যুর ওপার থেকে যিশু নব-জীবন লাভ করেছেন—"

যিশুর মুখের দিকে চাহিয়া ছবিখানি মায়ের ভাল লাগিল। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহার মনে এক বিরাট ভাবনার উদয় হইল, "এ কি রকম! যিশুকে যে এত ভালবাসে, সে কেন গির্জ্জায় যায় না একদিনও?"

ক্রমে দেওয়ালে একটার পর একটা করিয়া ছবিতে ভরিয়া উঠিল। বই-এর থাকে খালি জায়গাগুলিও ভরিয়া উঠিল। ইট-কাঠের দেয়ালে ঘেরা ঘর বলিয়া মনে হইত লাগিল।

কিন্তু মায়ের মনের আশঙ্কা আর কমিল না। যত দিন যায়, পাভেলের গতিবিধি, হাবভাব তাঁহার নিকট ততই রহস্যময় লাগে এবং তাঁহার অন্তর এক অজানা আশঙ্কায় ততই দুলিয়া দুলিয়া ওঠে। এই দুর্জ্ঞেয় রহস্যের কোনও সন্ধান করিতে না পারিয়া মনে মনে তিনি ভাবেন, "আর সকলে কেমন মানুষের মত হাসে খেলে, এ এক কোন্ সন্ন্যাসী, এই বয়সে নির্ব্বাক্ গম্ভীর!" মাঝে মাঝে মায়ের মনে আর একটা কথা জাগিয়া ওঠে, হয়ত শহরে কোনও মেয়ের সঙ্গে পাভেল প্রেমে পড়িয়াছে—

কিন্তু মা ভাল রকমই জানিতেন যে প্রেম করিতে অর্থের প্রয়োজন আছে। পাভেল যাহা-কিছু উপার্জ্জন করে, সমস্তই তো তাঁহাকে ধরিয়া দেয়। তবে?

এমনি করিয়া দিনের পর দিন চলিয়া যায়। এমনি করিয়া নিঃশব্দে কখন দুইটি জীবনের ধারা দীর্ঘ দুই বৎসর বহিয়া চলিয়া গেল। কেহ কাহাকেও জানিল না। শুধু মায়ের অন্তরে পথ-হীন রেখা-হীন ভাবনার বোঝা জমা হইয়াই রহিল।

একদিন খাওয়া-দাওয়ার পর পাভেল নিত্য যেমন আলো জ্বালিয়া পড়িতে বসে তেমনি পড়িতে বসিয়াছিল।

অতি সন্তর্পণে পুত্রের পিছনে আসিয়া একটু ঝুঁকিয়া মৃদুকণ্ঠে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা তোকে জিজ্ঞাসা করি, এ সব কি তুই রোজ পড়িস্?"

মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বই বন্ধ করিয়া দিয়া পাভেল বলিল, "এখানে বসো, বলছি।"

পুত্রের ইঙ্গিতে মা সম্মুখে আসিয়া বসিলেন, অন্তরে গুরু আশঙ্কা, এখনই বুঝি ভয়ানক কি শুনিবেন—

মায়ের মুখের দিকে না চাহিয়াই পাভেল বলিতে লাগিল, "আমি যে-সমস্ত বই পড়ি, সে-সমস্ত পড়া বা কাছে রাখা নিষিদ্ধ। কেন নিষিদ্ধ জান? তোমার আমার, আমাদের চারিদিক্‌কার এই সব শ্রমিকদের জীবনের সম্বন্ধে সত্যি কথা এই সব বই-এ লেখা আছে—তাই এ নিষেধ! গোপনে এ সমস্ত ছাপা হয়, গোপনে বিলি হয়, যদি কারুর কাছে এই সমস্ত বই পাওয়া যায়, তাহলে তখুনি তাকে কারারুদ্ধ করা হয়। আমাকেও কারাগারে যেতে হবে—কারণ, আজ আমি সত্যকে জানতে চাই—"

সহসা মায়ের সমস্ত নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। কোনও মতে চোখ তুলিয়া ছেলের মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিলেন—তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে তাঁহার সম্মুখে তাঁহার পুত্রের বদলে যেন কে একজন নূতন লোক বসিয়া আছে—তাহাকে ইহার পূর্ব্বে তিনি যেন আর কখনও দেখেন নাই।

"তুই কেন এ-সব পড়িস্?"

"আমি সত্যকে জানতে চাই!"

পাভেলের মুখের দিকে তিনি আরও ভাল করিয়া চাহিলেন। তাহার চক্ষু হইতে স্থির জ্যোতি বাহির হইতেছিল। সেই মুখের দিকে চাহিয়া জননীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়া তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার পুত্র যেন কোন্ এক রহস্যময় ভয়াল শক্তির নিকট চিরকালের মত আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

জীবনে যাহা-কিছু ঘটিয়াছে তাহাকে অবশ্যম্ভাবী বলিয়া তিনি স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। কোন-কিছু চিন্তা না করিয়া সেই ভবিতব্যতার নিকট আত্মসমর্পণ করাই তিনি জানিতেন। তাই আজও তাঁহার কোনও কথা যোগাইল না। বেদনার গুরুভার অন্তরে চাপিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

"কাঁদছো কেন মা?"

পুত্রের প্রশ্ন শুনিয়া মায়ের মনে হইল, বিদায়ের কালে পুত্র যেন শেষ প্রশ্ন করিতেছে!

"একবার ভেবে দেখো, কি রকম ভাবে তুমি বেঁচে আছ। তোমার আজ চল্লিশ বছর বয়স হলো কিন্তু বল তো একদিনও তুমি বাঁচার মত করে বাঁচতে পেরেছো? বাবা তোমাকে নিয়তই মারতেন—তার কারণ অবশ্য আজ আমি বুঝতে পেরেছি। তাঁর নিজের জীবনে যে সব দুঃসহ অবিচার ও অত্যাচার সইতে হতো, নিরুপায় হয়ে তিনি তোমার উপর তারই প্রতিশোধ নিতেন। তিরিশ বছর ধরে ক্রমান্বয়ে ভূতের মত খেটে চলে গেছেন। যখন ছেলেবেলায় তিনি কারখানায় ঢোকেন তখন কারখানায় মাত্র দুটো বাড়ী ছিল, আজ সেখানে সাত সাতটা বাড়ী উঠেছে। এমনিই হয়, কল বাড়ে, কারখানা বাড়ে, তার তারই চাকায় তেল যোগাতে মানুষ মরে।"

যৌবনের উদ্দাম উচ্ছ্বাসে বাধাবন্ধহারা ভাবে আপনার সত্য অনুভূতির প্রথম প্রকাশ-আনন্দে অন্তরের অন্তস্তলে যাহা আসিতেছিল পাভেল তাহাই আজ বলিয়া চলিতে লাগিল। সে যে বিশেষ করিয়া তাহার মাকে উপলক্ষ করিয়া কিছু বলিতেছিল, তাহা নয়, আপনার অন্তরের সদ্যোজাত সত্য-উপলব্ধিকেই সে রূপ দিতেছিল।

সহসা মায়েব মুখের দিকে চাহিয়া পাভেল জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, বল তো মা, জীবনে কোনও দিন তুমি এতটুকু আনন্দের স্বাদ পেয়েছ? পেছন দিকে চাহিলে কোন আনন্দের স্মৃতি তোমার মনে পড়ে?"

সমগ্র নারী-জীবনের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম এই তিনি শুনিলেন যে তাঁহার জীবন সম্বন্ধে, তাঁহার আনন্দ-নিরানন্দ সম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন করিতেছে। অসংলগ্ন অস্পষ্ট ভাবনার মেঘলোকে বহুদিনের তন্দ্রাচ্ছন্ন বেদনার বিদ্যুৎ যেন নড়িয়া উঠিল; বহুদিন-বিস্মৃত কবেকার যৌবনের লাঞ্ছিত জীবনের মূক বিদ্রোহ আজিকার দিনকে ঈষৎ সচকিত করিয়া তুলিল। কত দিন কত প্রতিবেশী রমণীর সঙ্গে তিনি ঘরকন্না জীবন-মরণ কত কি লইয়া কত গল্প করিয়াছেন—সবাই দুঃখ করিত, কাঁদিত, কিছুই ভাল লাগে না বলিত, কিন্তু কই, কেহই তো কোন দিন ভাবে নাই, কেন এই দুঃখ, কেন এই কান্না, কেন জীবনে এত জ্বালা?

আজ সহসা তাঁহার আপন পুত্রের মুখে তাঁহার নারী-জীবনের গোপন ব্যথার কথা এই রকম ভাবে শুনিয়া পুত্র-গর্ব্বে তাঁহার অন্তর ভরিয়া উঠিল। আজকালকার জগতে মায়ের বেদনা কে বোঝে, কে বুঝিতে চায়? পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে তাহার মুখ, চোখ, কথা যেন তাঁহার বুককে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে।

বহুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিবার পর মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু তুই কি করতে চাস্?"

"আমি জানতে চাই—জানাতে চাই। আমাদের আজ শিখতে হবে এবং সঙ্গে এই সব মজুরদের শেখাতে হবে—তাদের বোঝাতে হবে—কেন জীবন এত নিদারুণ!"

অন্তরের আবেগে সে অনর্গল বকিয়া চলিতে লাগিল। পুত্রের মুখের দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মত চাহিয়া মা শুধু মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করেন, "সত্যি! এ সব কি সত্যি?"

"নিশ্চয়ই! জগতে এমন লোকও আছে, যারা মানুষের কল্যাণ চায় এবং সেই মহা অপরাধের জন্য তারা হাসিমুখে সব লাঞ্ছনা সব ক্ষতি সহ্য করে, কারাগারে বনের পশুর মত পচে মরে। আমি স্বচক্ষে তাদের দেখেছি—তারা এই মাটির পৃথিবীর অমর সন্তান।"

কিন্তু এই সমস্ত লোকদের কাহিনী যতই তিনি শোনেন ততই তাঁহার মন ভয়ে ভরিয়া ওঠে। তাহারাই তাঁহার পুত্রকে এই সমস্ত ভয়ানক কথা বলিতে শিখাইয়াছে, তাহারাই তাঁহার সন্তানকে মাতৃবক্ষ হইতে টানিয়া লইয়া কোন্ এক অনির্দেশ্য ভয়ঙ্কর পথে লইয়া চলিয়াছে।

"তোর যা ইচ্ছে তাই কর। তবে একটা কথা বলি …কখনও বেফাঁস কোথাও কিছু বলিস না। তুই জানিস্ না ওরা কি ভয়ানক লোক সব। ওরা সবাই সবাইকে ঘৃণা করে। আঘাত করাই ওদের একমাত্র আনন্দ। ওদের যদি তুই বোঝাতে যাস্, ওদের যদি ভাল করতে চাস্, ওরা তোকে অবিশ্বাস করবে, তোকে টুকরো টুকরো করে জবাই করে তবে শান্তি পাবে। ওদের তুই জানিস্ না—"

"আমি জানি ওরা কতদূর ঘৃণ্য। কিন্তু যেদিন আমি আমার অন্তরে সত্যকে উপলব্ধি করতে পেয়েছি, সেদিন থেকে এই পৃথিবী আমার চোখে সুন্দরতর হয়ে উঠেছে। ছেলেবেলা থেকে আমি মানুষকে ভয়ই করে এসেছি…যখন বড় হলাম তখন তাদের নীচতা দেখে তাদের ঘৃণাই করতে শিখলাম। তারপর জানি না কেমন করে আমার সব ধারণা বদলে গেল। আজ আমি মানুষকে আর এক নতুন দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছি। আজ সকলের জন্যে, সকলের সব ক্ষুদ্রতার জন্যে শুধু আমার দুঃখ হয়! বেদনায় মন ভরে আসে। যেদিন থেকে আমি অন্তরে সত্যকে উপলব্ধি করেছি সেদিন থেকে মনে হয়েছে, এই ক্ষুদ্রতা এই নীচতার সবখানির জন্যে তারা দায়ী নয়!"

আপনার মনের মধ্যে যে-সব বাণী জাগিয়া উঠিতেছিল, যেন তাহা শুনিবার জন্য সহসা পাভেল স্তব্ধ হইয়া গেল। তার পর অস্ফুট স্বরে আপনার মনে বলিয়া উঠিল—"এমনি ভাবেই সত্য বেঁচে থাকে!"

রাত্রি সুগভীর হইয়া আসিয়াছিল। পাভেল শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। নিদ্রিত পুত্রের সম্মুখে আসিয়া অন্তরের দেবতার নিকট কল্যাণ কামনায় মাতার চোখ দিয়া নিঃশব্দে জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল!

আবার নিঃশব্দে তাহাদের দুই জনের জীবন-ধারা বহিয়া চলে। কাছাকাছি থাকিয়াও তাহাদের মনে হয় যেন তাহারা বহু দূরে আছে।

একদিনে বাহিরে যাইবার সময় পাভেল মাকে ডাকিয়া বলিল, "দেখ, শনিবার এখানে জনকয়েক লোক আসবে।"

"কারা?"

"কতক লোক আমাদের এই গাঁয়ের, আর কতক আসবে শহর থেকে।"

"শহর থেকে?"—বলিতেই মা কাঁদিয়া ফেলিলেন।

"এ কি, কাঁদছো কেন?"

"কেন তা জানি না—কান্না আসে তাই কাঁদি!"

"তুমি ভয় পেয়েছ বুঝি?"

কোনও দ্বিরুক্তি না করিয়া মা বলিলেন, 'সত্যিই আমার ভয় করে, শহরের লোকগুলো—কে জানে কেমন তারা—"

মাতার মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে পাভেল বলিয়া উঠিল, "দেখ মা, এই ভয়ই হলো আমাদের সকল সর্বনাশের মূল। যারা আমাদের পায়ের তলায় রাখে—তারা আমাদের এই ভয় পাওয়ার সুবিধে নিয়েই আমাদের আরও ভয় দেখায়। মনে রেখো মা, যত দিন আমরা এমনি করে শুধু ভয় করেই থাকবো – তত দিন এঁদো পুকুরে শুকনো ডালের মত পচেই মরতে হবে। আজ সব ভয় দূরে ফেলে দেবার দিন এসেছে। আজ কি আর কান্না শোভা পায়?"

ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া যাইবার সময় পাভেল বলিয়া গেল, "ভয়ই কর, আর যা ই কর, তারা শনিবার এখানে আসবে।"

যাইবার সময় শুনিল মা কাঁদিয়া বলিতেছেন, "ওরে রাগ করিস্ নে—এ ছাড়া আর আমি কি করতে পারি বল।"

তিন দিন ধরিয়া মায়ের মনে এক মুহূর্তেরও শান্তি ছিল না। সেই অজানা আগন্তুকদের আগমন-আশঙ্কায় তাঁহার বুক ক্ষণে ক্ষণে কাঁপিয়া ওঠে। তাহাদের কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহাদের এক ভয়ঙ্কর মূর্তি মায়ের মনে জাগিয়া উঠে তাহারাই তো তাহার পুত্রকে এই সর্বনাশের পথে টানিয়া লইতেছে।

শনিবার দিন সন্ধ্যা বেলা কারখানা হইতে ফিরিয়া আসিয়া পোষাক বদলাইয়া বাহিরে যাইবার সময় পাভেল বলিল, "দেখ, তারা যখন আসবে, তাদের

বলো যে আমি একটু কাজে বেরিয়েছি। এক্ষুণি ফিরে আসবো, আর দেখো, মিছিমিছি ভয় ক'রো না—তারা সবাই তোমার মত, আমার মত মানুষ—আর কিছু নয়।"

পুত্রের কথা শুনিয়া মা কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন।

মায়ের অবস্থা দেখিয়া পাভেল শান্ত ভাবে বলিল, "দেখছি, তোমাকে অন্য জায়গায় রেখে আসতে হবে।"

পুত্রকে ছাড়িয়া অন্য জায়গায় থাকার কথায় মা অন্তরে ক্ষুব্ধ হইলেন, বলিলেন, "তাতেই বা কি লাভ? আমি এখানেই থাকবো।"

তখন নভেম্বর মাস শেষ হইয়া আসিতেছিল। সারা দিন ধরিয়া মুহ্যমান ধরণীর উপর দিয়া তুষারের ঝঞ্চা বহিয়া চলিয়া গিয়াছে। জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইতেই মায়ের মনে হইল যে পৃথিবীর সমস্ত অন্ধকার যেন তাঁহারই জানালার আশে-পাশে আজ জমা হইয়া আছে। সেই অন্ধকারে যেন অসংখ্য লোক, অদ্ভুত তাহাদের চেহারা, হামাগুড়ি দিয়া তাঁহারই দিকে আগাইয়া আসিতেছে।

এমন সময় বাহিরে বাঁশীর শব্দ হইল—করুণ, কোমল। সে সুর যেন অন্ধকারের অরণ্যানী ভেদ করিয়া কাহার সন্ধানে চলিয়াছে। ক্রমশ শব্দটি আগাইয়া আসিতে আসিতে সহসা জানালার ধারে আসিয়া যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে দরজার নিকট পায়ের শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। বিহ্বল হইয়া মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সহসা ঘরের দরজা খুলিয়া গেল। প্রথমে একটা বৃহৎ টুপিওয়ালা মাথা দরজার ফাঁক দিয়া ঢুকিল, তার পর সেইটুকু ফাঁক দিয়া একখানি রোগা শরীর সোজা ভাবে ঘরে আসিয়া নীরবে ডান হাতটি তুলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "নমস্কার!"

মা নীরবে অভিবাদন গ্রহণ করিলেন।

"পাভেল এখনও ফেরেনি বুঝি?"

কোন অভ্যর্থনার অপেক্ষা না করিয়াই আগন্তুক যুবকটি আপনার মনে ওভারকোটটি খুলিয়া রাখিয়া গা হইতে বরফ ঝাড়িয়া ঘরের চারি দিকে দেখিতে লাগিল।

"এ কি আপনাদের নিজেদের বাড়ী, না ভাড়া নিয়েছেন?"

"ভাড়া নিয়েছি।"

"তেমন সুবিধের বাড়ী নয় তো!"

সে-কথার আর কোনও উত্তর না দিয়া মা বলিলেন, "একটু বসো, পাভেল এক্ষুণি আসবে।"

"তাতে কি হয়েছে! বসবো তো নিশ্চয়ই!"

আগন্তুকের কোমল কণ্ঠস্বর এবং সরল অমায়িকতায় মায়ের মনে একটু সাহসের সঞ্চার হইল। যুবকটির দিকে চাহিয়া তাঁহার ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করেন, নাম কি, কোথায় থাকে, কত দিনই বা পাভেলের সঙ্গে আলাপ। মা প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই সহসা যুবকটি প্রশ্ন করিয়া বসিল, "তোমার কপালে কাটার দাগ কেন মা?"

মানুষের কণ্ঠে যতখানি কোমলতা ও করুণা থাকা সম্ভব, ঠিক ততখানি করুণ-কোমলতায় আগন্তুক এই প্রশ্ন করিয়াছিল কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি তাহাতে অপমানিত বোধ করিলেন। ক্রুদ্ধ স্বরে বলিতে গিয়া ঈষৎ সংযত হইয়া তিনি বলিলেন, "তা'তে তোমার কি প্রয়োজন?"

তেমনি সহজ ও নির্ব্বিকার চিত্তে যুবক বলিয়া উঠিল, "রাগ করো না মা! কেন জিজ্ঞেসা করলাম, জানো? যে মা আমাকে পালন করেছিল, তারও কপালে ছিল ঐ রকম একটা দাগ। তাঁর স্বামীটি ছিলেন মুচি আর সে ছিল ধোপানী। একদিন রাগের মাথায় জুতো-শেলাই-করা একটা যন্ত্র দিয়া সে-লোকটা মার কপালে ঐ রকম দাগ করে দেয়। নিত্যই সে লোকটা মাকে মারতো আর রাগে আমার সমস্ত শরীর ফুলে-ফুলে উঠতো!"

সহসা যুবকের এই কুণ্ঠাহীন আত্মপ্রকাশে তাহার উপর যে তিনি রাগিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া মনে মনে লজ্জিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "না, রাগ করি নে বাছা, তবে, তবে কিনা তুমি বড় শীগ্‌গির প্রশ্নটা করে ফেললে কিনা! আমার এই দাগ—এ আমার স্বামীর পুণ্যস্মৃতি। তিনি এখন স্বর্গে—সে অনেক দিনের কথা—বাছা, তুমি কি তাতার!"

"এখনও তাতার হই নি।"

"তবে, তুমি?"

"আমি লিটল্ রাশিয়ান্—আমার বাড়ী কেনিয়াভ শহরে।"

"কত দিন হল এখানে আসা হয়েছে?"

"এক মাস হলো আপনাদের কারখানা দেখতে আমি এখানে আসি। সেখানে কতকগুলি ভালো লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়। তার মধ্যে আপনার ছেলেও ছিল। এখানে হয়ত আরও কিছু দিন থাকতে হবে।"

আগন্তুকের মুখে পুত্রের প্রশংসা শুনিয়া মায়ের অন্তর গলিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "একটু চা খাবে কি?"

"বাঃ, আমি একা-একা খাবো কি করে? ওরা সবাই আসুক—তখন আপনার হাতের চা সবাই মিলে খাবো।"

আরো অনেকে আসিবে, এই কথা মনে পড়িতেই মায়ের মন আবার আশঙ্কায় দুলিয়া উঠিল। মনে মনে অন্তর্যামীকে ডাকিয়া বলিলেন, "হে প্রভু, তারা যেন সবাই এরই মত হয়।"

আবার বাহিরে পদশব্দ হইল। এবারে যে আসিল, সে নারী। অতি সামান্য পোষাক, মাঝামাঝি গড়ন—মাথায় এক-রাশ ঘন কালো চুল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই সে বলিল, "দেরী হয়ে গেছে বুঝি?"

লিট্‌ল্ রাশিয়ান বলিল, "না। হেঁটে এলে বুঝি?"

"নিশ্চয়ই। আপনি বুঝি পাভেলের মা! নমস্কার! আমার নাম জানেন না তো? আমার নাম নাটাশা।"

মেয়েটির কণ্ঠস্বরের পরম আত্মীয়তায় মার মন শান্ত হইল।

মেয়েটির গা হইতে বরফ ঝাড়িয়া দিতে দিতে লিট্‌ল্ রাশিয়ান্ জিজ্ঞাসা করিল, "বাইরে ভয়ানক ঠাণ্ডা—না?"

"ওঃ—ঠাণ্ডা বলে ঠাণ্ডা! আর কি হাওয়া দিচ্ছে, উঃ—"

ঠাণ্ডায় দুই হাত দিয়া দুই কপোল ঘষিতে লাগিল। মা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "আহা, বাছা, একটু আগুন করে দি, কেমন?" বলিয়াই তিনি রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন।

রান্নাঘরে আসিয়া মেয়েটির মুখ মনে করিতেই মায়ের মনে হইল যেন মেয়েটি তাঁহার বহু কালের পরিচিত। আপনার প্রবাসী কন্যা যেন বহু কাল পরে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। আগুন তৈয়ারী করিতে করিতে মা শুনিতে লাগিলেন, পাশের ঘরে তাহারা কথা বলিতেছে—মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিতেছে, "তোমাকে কেমন বিষণ্ণ মনে হচ্ছে, নাখোদকা?"

লিট্‌ল্ রাশিয়ান উত্তরে বলে, "পাভেলের মায়ের চোখ দেখে আমার নিজের মায়ের কথা মনে পড়ছে। মনে হচ্ছে—তাঁরও ঠিক ঐ রকম চোখ ছিল। আমার বিশ্বাস কি জানো, আমার মা এখনো বেঁচে আছেন—"

"তুমি না বলেছিলে তোমার মা মারা গেছেন?"

"যে-মা আমাকে পালন করেছিল সে মারা গিয়েছে। আমার নিজের গর্ভধারিণী—তাঁর কথা এখন আমার মনে হচ্ছে হয়ত এই কিয়েভ্ শহরের কোন্ অন্ধকার গলিতে মা আমার ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে—ভিক্ষে করে যা পায় তাই দিয়ে মদ খায়—"

"আঃ—ও-রকম করে কেন ভাবচো?"

"জানি না। হয়ত বেহুঁস হয়ে গিয়ে রাস্তায় পড়ে গিয়েছে। পুলিশ মারতে মারতে থানায় নিয়ে যাচ্ছে—"

রান্নাঘরে মায়ের চোখ অশ্রুতে ভরিয়া ওঠে। আগুন তৈয়ারী করিয়া মা ঘরে আসেন। এমন সময় আবার পায়ের শব্দ। এবারে প্রবেশ করিল গাঁয়ের নামজাদা চোরের ছেলে নিকোলে। নিকোলেকে দেখিয়া মা বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি এখানে!"

"পাভেল আছে? এই যে তোমরা এসেছ—"

মা বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া দেখিলেন, নাটাশা আগাইয়া আসিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে বসাইল। তা হলে এ-ও এ-দলে আছে।

তারপর আরও দুটি লোক আসিল—দুটি বালক। তাহাদের একটিকে তিনি আবার চিনেন। কারখানার দরওয়ানের ছেলে ইয়াকুব। অবশেষে আরও দুইটি পরিচিত লোককে লইয়া স্বয়ং তাঁহার পুত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। পরিচিত লোক দুইটি তাঁহাদের কারখানারই কুলী। সকলের মুখের দিকে চাহিয়া মায়ের মনে হইল, ইহারা তো কেহই ভয়ানক নয়! তবে পাভেল কেন তাঁহাকে মিছামিছি ও-সব কথা বলিয়া ভয় দেখাইল?

একটু আড়ালে পাইয়া ছেলেকে চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এদেরই ভয়ানক লোক বলে?"

ঘাড় নাড়িয়া পাভেল বলিল, "এরাই ভয়ানক লোক।"

মমতায় সকলের দিকে চাহিয়া মা বলে, "মাগো, এরা যে সব দুধের বাছা!"

মা চা তৈরী করিতে লাগিলেন।

নাটাশা কথা বলিতে আরম্ভ করিল। বলিল, "মানুষ কেন এত জঘন্য ভাবে জীবনযাত্রা পরিচালনা করতে বাধ্য হয়, তা বুঝতে হলে—"

লিট্‌ল্ রাশিয়ান বাধা দিয়া বলিল, "বল, মানুষ নিজে কেন এত জঘন্য হয়, তা বুঝতে হলে—"

"কি রকম ভাবে তারা জীবন আরম্ভ করে সেটা দেখতে হবে প্রথমে—"

চা করিতে করিতে সহসা মা বলিয়া উঠিলেন, "তাই দেখ, বাছা, তাই দেখ!" সহসা সকলের কথা থামিয়া গেল। পাভেল বিস্মিত হইয়া কপাল কুঁচকাইয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলছো, মা?"

অপ্রস্তুত হইয়া মা বলিলেন, "কিছু নয় বাবা, আমি নিজের মনের কথা বলছিলাম"—বলিয়াই তিনি চা পরিবেশন করিতে লাগিলেন।

ছোট মেয়েটির মত নাটাশা বলিয়া উঠিল, "মাগো, তোমার বাড়ীতে তোমার ছেলে-মেয়েরা এসেছে—এতে আবার বাধার কি আছে? উঃ—বাবা—বড় ঠাণ্ডা—শীগ্‌গির চা দাও—"

নাটাশা এবং পাভেল হাসিয়া উঠিল। ব্যাপারটা চাপা দিবার জন্য লিট্‌ল রাশিয়ান বলিয়া উঠিল, "চমৎকার চা হয়েছে মা!"

"বা রে ছেলে, না খেয়েই বলল ভাল হয়েছে।" তারপর পুত্রের নিকটে গিয়া সঙ্কুচিত ভাবে বলেন, "তোদের কাজে বাধা দিলাম না কি রে?"

নাটাশা পড়িতে আরম্ভ করিল। অতি সন্তর্পণে মা কাপ আর ডিস নাড়িতে লাগিলেন—পাছে শব্দে তাহাদের কোনও অসুবিধা হয়। স্টামোভারের অগ্নি-শিখায় মথিত শব্দের সঙ্গে নাটাশার কণ্ঠস্বর মিশিয়া ঘরে এক অপূর্ব্ব সঙ্গীতের সৃষ্টি করিল। নাটাশা পড়িতেছিল—প্রাচীনতম মানুষের কাহিনী—যখন তাহারা বন্যপশু শিকার করিয়া গুহায় গুহায় জীবন অতিবাহিত করিত—মা আনন্দিত চিত্তে সেই অপরূপ গল্প শুনিতেছিলেন এবং মাঝে-মাঝে বিস্ময়ে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন—"ইহার মধ্যে বে-আইনী কি আছে?"

পাভেল নাটাশার পাশেই বসিয়াছিল। দলের মধ্যে সে-ই সব চেয়ে সুন্দর। নাটাশা বই-এর উপর ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল—মাঝে মাঝে হাত দিয়া ঝুলিয়া-পড়া চুলের গোছাগুলি পিছন দিকে সরাইতে সরাইতে বিমুগ্ধ শ্রোতাদের দিকে চাহিয়া বই-ছাড়া দুই-একটা কথা বলিতেছিল।

ঘরখানির রূপ যেন বদলাইয়া গিয়াছে। যেন কোথা হইতে একটা অপরূপ স্বচ্ছন্দতা ফুলের মত অনাড়ম্বরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মায়ের মন অজ্ঞাতসারে তাহাতে সায় দিয়া উঠিল। জীবনে তিনি সন্ধ্যার এই অপরূপ শান্তির স্পর্শ কখনও পান নাই। তাই আজিকার এই শান্ত সন্ধ্যার আনন্দ-স্পর্শ চরম দুঃখে তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিল—তাঁহার যৌবনের কোলাহল-ক্লেদাক্ত সন্ধ্যার কথা—নিশ্বাসে তাঁহাদের ভোদ্‌কার তীব্র গন্ধ—মুখে কি কুৎসিত সব ভাষা—! এই সব, আরও অনেক কথা মায়ের মনে জাগিয়া উঠিল। সহসা নিজের শতছিন্ন হৃদয়ের দিকে চাহিয়া নিজের জন্য এক অপরূপ করুণার বোঝা তাঁহাকে পাইয়া বসিল।

মনে পড়িল, তাঁহার স্বামীর সহিত প্রথম সাক্ষাতের দিন!—এক আড্ডায় তাঁহার সঙ্গে দেখা। উন্মাদ মাতাল হইয়া লোকটি হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া অন্ধকার দেয়ালে কোণ ঠাসা করিয়া ধরিল—দেহের সমগ্র ভার দিয়া দেয়ালে ঠেলিয়া মত্ত-তিক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "এই, আমাকে বিয়ে করবি?"

মত্ত দানবের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে কি বৃথা চেষ্টাই না সে দিন করিতে হইয়াছিল!

"চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক, বলছি—নইলে জবাব দে আমার কথার—ন্যাকামো, ও-সব ন্যাকামো খুব জানি—মনে মনে তো খুব খুশী—যাঃ, কাল তোদের বাড়ীতে ঘটক পাঠাবো বুঝলি?"

পরের দিন ঘটক আসিল। বিবাহ হইয়া গেল। সমস্ত দৃশ্য মনে করিতে, মায়ের অন্তর হইতে একটি সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

তখন আলোচনা তুমুল তর্কে পরিণত হইয়াছে। প্রত্যেকেই তারস্বরে চেঁচাইতেছে এবং মায়ের মনে হইল তাহারা সকলেই যেন রাগিয়া গিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার, কেহই কোন কুৎসিত কথা উচ্চারণ করিতেছে না এবং যে যেখানে ছিল সেইখানেই বসিয়া আছে।

মা শুনিতেছিলেন ছেলে বলিতেছে, "যারা আজ আমাদের ঘাড়ে চেপে বসে আমাদের চোখ বেঁধে রাখতে চাইছে তাদের আমরা জানিয়ে দিতে চাই, আমরা অন্ধ নই—পশুও নই। শুধু দু'মুঠো অন্নের জন্যে এ জীবন নয়। আমাদেরও অধিকার আছে এই পৃথিবীতে মানুষের মতন মানুষ হয়ে বেঁচে থাকবার। আজ যারা আমাদের এই দাসত্বে, এই প্রাণহীন জড়ত্বে, এই অবিরাম বোঝা দিয়ে বেঁধে রেখেছে, তারা জানুক যে, তাদের বিদ্যাবদ্ধি মেপে দেখবার মত শক্তি এখনও আমাদের লুপ্ত হয়নি। আর আত্মিক ধর্ম্মের কথা। আমরা এখনও সে দিকে তাদের ঢের ঊর্দ্ধে!…"

মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত তর্ক চলিল। বিদায়ের সময় নাটাশাকে কাছে লইয়া মা বলিলেন, "এই ঠাণ্ডায় এত পাতলা মোজায় কি চলে? একটা পশমের মোজা বুনে দেব, কেমন?"

আনন্দ-কলহাস্যের মধ্যে যে-যাহার বিদায় গ্রহণ করিল।

পুত্রকে একান্তে পাইয়া মা বলিলেন, "বড় ভাল লোক সব। লিটল্ রাশিয়ান্ ছেলেটির মন বড় ভাল, আর মেয়েটি কেমন ফুটফুটে মেয়ে—ও কে রে?"

ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে করিতে পাভেল উত্তর দিল, "একজন শিক্ষয়িত্রী।"

"খুব গরীব—না? এই ঠাণ্ডায় ও-রকম পাতলা

ছেঁড়া পোষাক পরে থাকলে যে অসুখ করবে—ওর কি আত্মীয়-স্বজন নেই ?"

"আত্মীয়-স্বজন! আছে বই কি! তাঁরা সব মস্কো শহরে থাকেন। বাবা মস্ত বড়লোক—লোহার ব্যবসা আছে। ও এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছে বলে ওর বাবা ওকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ছেলেবেলাটা আদরে-যত্নে লালিত-পালিত হয়েছে, যখনি যা চেয়েছে তাই পেয়েছে, আর আজ এই অন্ধকার রাত্রিতে এই ঠাণ্ডার মধ্যে চার মাইল পথ পায়ে হেঁটে সে একলা চলেছে—"

মা অবাক্ হয়ে গেলেন। বলিলেন, "এই রাত্তিরে একা এখন চললো সেই শহরে ?"

"হাঁ।"

"ভয় করবে না ওর ?"

"না।"

"আচ্ছা, এত রাত্তিরে যাবারই বা কি দরকার ছিল, ও তো অনায়াসে আজ রাত্তিরে আমার কাছে শুয়ে থাকতে পারতো ?"

"তা পারতো, কিন্তু কাল সকালে যদি কেউ ওকে এখানে দেখতে পায় তাহলে বিপদ হবে !"

ভুলে-যাওয়া আশঙ্কার ছিন্ন সূত্র আবার মার মনে জোড়া লাগে। বলেন, "আচ্ছা, এতে বে-আইনী কি আছে ? এই তো আমি সব শুনলাম, এতে ভয় করবারই বা কি আছে ? কই, কেউ তো একটাও অন্যায় কিছু করলো না !"

"আমরা যা করেছি, তাতে অন্যায় কিছু নেই, আমরা যা করবো তাতেও অন্যায় কিছু থাকবে না। কিন্তু তবুও আমাদের জন্যে জেলের দরজা খোলাই রয়েছে। এ-কথা তোমার জানা দরকার, মা !"

মায়ের দুর্বল দেহ কাঁপিয়া উঠিল। কণ্ঠস্বর ধরিয়া আসিল। বিহ্বলের মত তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ভগবান্ করুন, তোরা কোনও রকমে বেঁচে যা !"

শান্ত কণ্ঠে পুত্র বলিল, "তোমার কাছে আজ আর লুকোবো না মা! ভগবানও আমাদের বাঁচাতে পারবেন না। জেলে যাওয়া ছাড়া আর আমাদের মুক্তি নেই। যাও, রাত হয়েছে, আজ খাটুনিও হয়েছে অনেক—আমি ঘুমুতে চললুম—"

একা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া মা বাহিরের পথের দিকে চাহিয়াছিলেন। বাহিরে তখন গাঢ় অন্ধকারে ঝড়ে তুষারকণা উড়িতেছে।

বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সহসা মায়ের চোখের সম্মুখে জাগিয়া উঠিল,—তুষার-ভরা এক বিরাট প্রান্তর! দুরন্ত বাতাস তুষারের কণা লইয়া দুর্মদ খেলায় রত। সেই তুষার আর ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়া একা চলিয়াছে এক ক্ষীণ-দেহা বালিকা। অবনত শাখার মত তাহার সর্ব্বদেহ বাতাসে দুলিয়া উঠিতেছে। কখনও বরফে পা ডুবিয়া যাইতেছে, কখনও ঝড়ে ঘাসের মত বাঁকিয়া বরফের উপর পড়িয়া যাইতেছে, আবার উঠিতেছে, পাশে তাহার গভীর দুর্গম বন ঝঞ্ঝা-আহত হইয়া ক্রন্দন করিতেছে। সামনে, ঐ দূরে প্রান্তরের শেষে ক্ষীণ উষালোকে জাগে শহর···

ঊর্দ্ধ আকাশের দিকে হাত তুলিয়া মা বলিয়া উঠেন, "রক্ষা করো ভগবান !"

জপের মালার মত নিঃশব্দে দিনের পর দিন চলিয়া যায়। প্রতি শনিবার পাভেলদের বাড়ীতে আড্ডা বসে। প্রতি সপ্তাহ যেন একটা সিঁড়ির এক একটা ধাপের মত। তাহার উপরের ধাপে যে কি আছে তখনও অদৃশ্য।

নূতন লোক আসে। পাভেলের ছোট্ট ঘর লোকে ভরিয়া ওঠে। ক্রমে সপ্তাহে দুই বার করিয়া সভা বসে।

মা বিস্ময়ে তাহাদের কথাবার্ত্তা শোনেন। মাঝে-মাঝে তাহারা গান গায়—কিন্তু তাহার সুর, ভাষা মায়ের কাছে সব নূতন লাগে। সকলে মিলিয়া চাপা গলায় তাহারা এক রকম গান গায়। শুধু উপাসনা-মন্দিরে মা সেই রকম গম্ভীর সুর শুনিয়াছিলেন।

মায়ের আরও বিস্ময় লাগিত, যখন দেখিতেন কথা বলিতে বলিতে সহসা তাহাদের সকলের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। বিশেষ করিয়া যেদিন তাহারা অপর কোন দেশের শ্রমিকদের কথা খবরের কাগজ হইতে পড়িত, সেদিন তাহারা আরও চঞ্চল, আরও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত। চোখ দিয়া তাহাদের আনন্দ ঠিকরাইয়া পড়িত—ছোট ছেলেদের মত আনন্দে তাহারা সমস্ত ভুলিয়া যাইত। আনন্দে উত্তেজিত হইয়া কেহ চীৎকার করিয়া উঠিত। জয়, ফ্রান্সের শ্রমিকদের জয়।

কখনও বলিত, দীর্ঘজীবী হক ইতালীর কমরেড্‌রা !

বহুদূরের সেই সমস্ত অজানা সঙ্গীতের উদ্দেশ্যে কায়মনে নতি জানাইয়া তাহারা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া মায়ের মনে হইত যে, তাহারা বিশ্বাস করে যে দূরে থাকিয়াও তাহারা এই অভিবাদন শুনিয়াছে, না দেখিয়াও তাহারা জানিয়াছে, রুশিয়ার এক কোণে এক বদ্ধ ঘরে কয়েক জন সহযাত্রী বন্ধু তাহাদের হৃদয় দিয়া বুঝিয়াছে।

লিট্‌ল্ রাশিয়ান বলিয়া উঠিত, "কমরেড, তাদের

লিখে জানান দরকার যে, সুদূর রুশিয়ায়ও তাদের বন্ধুরা আছে, যারা তাদের মত এক আদর্শ ধরে চলেছে এবং তাদের জয়ে আজ আনন্দে উৎফুল্ল।"

তারপর তাহারা আনন্দোদ্ভাসিত মুখে জার্ম্মাণ, ইংরেজ, ইতালীয়ান, ফরাসী দেশের শ্রমিকদের কথা বলিত, যেন তাহারা সব অতি নিকট-বন্ধু, রহিলই বা তাহারা দূরে, ব্যক্তিগত পরিচয়ের সীমানার বাহিরে।

সেই ক্ষুদ্র ঘরে সেই কয়েক জন অজ্ঞাতনামা যুবকের আলোচনায় নিখিল বিশ্বের আর্ত্ত সর্ব্বহারাদের এক অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার অনুভূতি মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিত। এই নিবিড় অনুভূতির প্রেরণায় তাহারা সকলে একাত্ম হইয়া যাইত। তাহারই স্পর্শে মায়ের অন্তর সহসা সচকিত হইয়া উঠিত। না জানিয়াও, না বুঝিয়াও সেই আনন্দময় যৌবন-উন্মাদনার গতিবেগে আনন্দে তাঁহার মন সায় দিত।

একদিন লিটল্ রাশিয়ানকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "ভারি মজার লোক তোরা বাছা! তোদের সবাই বন্ধু, আর্ম্মেনিয়ানরা তোদের বন্ধু, যিহুদীরা তোদের বন্ধু, জার্ম্মাণরাও তোদের বন্ধু। সবার দুঃখে তোরা কাঁদিস্, সবার সুখে তোরা হাসিস্।"

অন্তরের আবেগে লিটল্ রাশিয়ান বলে, "সবার জন্যে আমরা, আমাদের জন্যে সবাই—মা! এই পৃথিবীতে আমাদের কোনও জাত নেই, কোনও আলাদা দেশ নেই! আমরা জানি, শুধু শত্রু আর মিত্র। জগতের যত শ্রমিক আছে, তারা আমাদের মিত্র, আর যত ধনী আছে, যত আছে প্রভুত্বপরায়ণ ব্যক্তি সবাই আমাদের শত্রু! আমরা শ্রমিক, সবাই এক মায়ের সন্তান! একই আদর্শ আমাদের সকলের বুকে। এক সূত্রে গড়ে তুল্‌তে হবে এই বিশ্ব-জোড়া ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে। বুকের ভেতরে এই কথা মনে দেয় আলো, দেহে দেয় তেজ; দ্বিতীয় সূর্য্যের মত আলোয় ভরিয়ে তোলে এই অন্ধকার জীবন, জাগায় নতুন স্বর্গ। সে-স্বর্গ কোথায় জানো মা? আমাদের বুকে, বঞ্চিত মানুষের বুকে রয়েছে সে স্বর্গ। তাই, সে যেই হোক, যেখানেই থাকুক, যাই হোক তার নাম, সে যদি সাম্যবাদী হয়, তা হলে সে আমার বন্ধু, অন্তরের মিতা,—যুগে-যুগান্তরে।"

এই উন্মাদনা, এই শিশু-সুলভ উল্লাস, অন্তরের আদর্শে এই সুবিপুল বিশ্বাস ধীরে ধীরে দলের সকলের চিত্ত অধিকার করিতে লাগিল। প্রতিদিন সেই দৃশ্য দেখিয়া অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে মা অনুভব করিতে লাগিলেন যে, সূর্য্যের মত প্রদীপ্ত রশ্মি লইয়া সত্য জাগিয়া উঠিতেছে—আকাশের সূর্য্যের মত তাহার অস্তিত্ব মা অন্তরে অনুভব করিতে লাগিলেন।

নিকোলের বাবা চুরি করিয়া মাঝে-মাঝে প্রায়ই শ্রীঘর বাস করিত। সেই সময় নিকোলে পরমোল্লাসে ঘোষণা করিত, "এখন দিন কতকের জন্যে আমার বাড়ীতে সভার অধিবেশন বসতে পাবে। পুলিশ আমাদের বড়-জোর চোর বলে সন্দেহ করবে।"

প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলা পাভেলের সঙ্গে কারখানার ছুটির পর কোন না কোন একজন লোক আসিত। চুপি চুপি পাভেলের সঙ্গে কি পড়িত, তারপর কাগজ-পেন্সিল লইয়া বই হইতে কি লিখিয়া লইত। এই কাজে তাহারা এতদূর মত্ত হইয়া থাকিত যে, কারখানা হইতে আসিয়া হাত-মুখ পর্য্যন্ত ধুইত না। বই হাতে করিয়াই চা পান করিত। তাহাদের কথা মায়ের কানে আসিয়া পৌঁছিত, কিন্তু ক্রমশ তাহাদের কথা তাঁহার কাছে আরও দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিতে লাগিল।

মা প্রায়ই তাঁহার ছেলেকে বলিতে শুনিতেন, এবার একখানা খবরের কাগজ চাই।

যত দিন যায়, মা দেখেন, চারি দিকের জীবন যেন আরও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। ছেলের দল যেন আরও ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ফুল ফোটার সময় বাগানে ভ্রমরদের অবিরাম ভিড়ের মত মায়ের মনে হইল সহসা তাহাদের যাওয়া-আসা ঘোরাঘুরি যেন বাড়িয়া গিয়াছে।

কিন্তু লিটল্ রাশিয়ানকে মা যত দেখিতেন, ততই তাঁহার হৃদয় স্নেহে উথলিয়া উঠিত, তাঁহার মনে হইত যেন কে একটি শিশু কোমল হাতে তাঁহার কণ্ঠ বেড়িয়া ধরিতেছে। রবিবার দিন পাভেলের অবসর না থাকিলে সে আসিয়া মায়ের রান্নার জন্য কাঠ কাটিয়া উনুন ধরাইয়া দিত। কাজ করিবার সময় প্রায়ই সে শীষ দিত। গানের সুরের মত কোমল, করুণ।

একদিন ছেলেকে ডাকিয়া মা বলিলেন, "আচ্ছা, লিটল্ রাশিয়ান যদি আমাদের এখানে থাকে, তা হলে তো বেশ হয়। তোদের দুজনেরই সুবিধে হয়—ছোটাছুটি করতে হয় না।"

"নিজের বোঝা বাড়িয়ে তোমার কি লাভ?"

"ঐ দেখো কি কথা। চিরকাল কিসের জন্যে এত বোঝা বয়ে বেড়ালাম, আজও জানি না। তবে মনে হয় একজন ভাল লোকের জন্যে যদি একটু বোঝা বাড়ে ত বাড়ুক।"

"তোমার যা ইচ্ছে কর মা। সে যদি থাকে, আমি খুব সুখীই হব।" মায়ের অনুরোধে লিটল্ রাশিয়ানকে পাভেলদের বাড়ীতেই থাকিতে হইল।

গ্রামের ধারে পাভেলদের ছোট্ট বাড়ীটি ক্রমশ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। নানা রকমের সন্দেহের দৃষ্টি বাড়ীর দরজার আশে-পাশে উঁকি-ঝুঁকি দিতে লাগিল। এই বাড়ীর ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য গ্রামের লোকদের কৌতূহলের আর সীমা-পরিসীমা নাই। রাত্রিবেলা কেউ হয়ত পাঁচিল বাহিয়া জানালা দিয়া উঁকি দিয়া দেখে ঘরের মধ্যে কি হইতেছে; কেউ বা দুষ্টামি করিয়া বাড়ীর কড়া-নাড়া দিয়া চলিয়া যায়।

পাভেলের মা রাস্তায় বাহির হইলে, লোকের প্রশ্নের আর বিরাম থাকে না। একদিন গ্রামের সরাইখানার বুড়ো মালিক রাস্তায় পাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বলি পাভেলের মা, ব্যাপারখানা কি? তোমার বাড়ীতে রোজ কোথাকার সব ছোঁড়া-ছুঁড়ীদের মেলা বসে—ফিস্-ফাস্ করে সব কথা কয়, বলি ব্যাপার-খানা কি? অত ফিস্-ফাস্ করে কি কথা হয়? কই, আমার হোটেলে এসে তারা কথা-বলাবলি করুক না? আর নির্জ্জন যায়গা যদি চাও, বাবা, গির্জ্জে আছে। হোটেলেও আসবে না, গির্জ্জেয়ও যাবে না—এর মধ্যে নিশ্চয়ই গোলমাল আছে। ও-সব ভাল বুঝি না তো। উপযুক্ত ছেলে, বিয়ে না দিলে উচ্ছন্নে যাবে।"

বাড়ীর কাছে কামারদের গিন্নী মারিয়ার সঙ্গে দেখা। সে বলে, "বলি ছেলেকে একটু সাবধানে রেখো।"

"কেন?"

"তারা সব কি দল গড়েছে শুনছি? ওরা বলছিলো, ও-সব ভাল নয়। চাবুক নিয়ে ওরা নিজেরা মারামারি করে নাকি?"

মায়ের মুখ হইতে বাহিরের এই সমস্ত কথা শুনিয়া পাভেল আর লিটল্ রাশিয়ান হাসে।

একদিন রহস্যচ্ছলে মা বলিলেন, "গাঁয়ের মেয়েগুলো তোদের ওপর ভারী চটা। তোরা মদ খাস্ না, মার-ধোর করিস্ না, তবুও বিয়ে করবি না কেন? তোদের মত ছেলে ক'টা মেয়ে পায়? কিন্তু মেয়েগুলোর রাগ, তোরা তাদের দিকে একবার ফিরেও তাকাস্ না। ওরা কি বলে জানিস, আমাদের বাড়ী যে-সব মেয়ে আসে, তাদের নাকি চরিত্র খারাপ—"

পাভেল গম্ভীর ভাবে বলে "তা তো হবেই।"

লিটল্ রাশিয়ান মায়ের কাছে আগাইয়া আসে। বলে, "কি জান মা, পানাপুকুরের সবই দুর্গন্ধ লাগে। বিয়ে-করা যে কি জিনিস, মেয়েগুলোকে বুঝিয়ে বলতে পার না মা? হাড় ক'খানা দেহে আছে, তাতে কি আয়েসোয়াস্তি হচ্ছে তাদের?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মা বলেন, "তারা কি জানে না তবে তারা কি করবে? এ ছাড়া আর উপায় কি আছে, তাদের ডেকে এনে তোরা বোঝাতে পারিস না?"

পাভেল তেমনি গম্ভীর ভাবে উত্তর দেয়, "তাদের যদি এখানে ডেকে আনি কি হবে জানো না? কিছু-দিন পরে দেখবে যে-যার জোড়া বেঁধে চলে গেছে ঘর-সংসার করতে—"

মায়ের চিন্তা আর বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে না। পুত্রের গাম্ভীর্য্য তাঁহার অন্তরকে ব্যথিত করিয়া তোলে।

একদিন রাত্রিবেলা মা শুইয়া শুইয়া শুনিতেছেন, তাঁহার ছেলে আর লিটল্ রাশিয়ান কথা বলিতেছে। লিটল্ রাশিয়ান বলিতেছে, "তুমি তো জানো, আমি নাটাশাকে ভালোবাসি—"

"জানি।"

"আচ্ছা, সে কি জানে যে আমি তাকে ভালবাসি?"

"জানে! এবং সেই জন্যেই সে ইদানীং এখানে আসা ইচ্ছে করে বন্ধ করেছে।"

লিটল্ রাশিয়ান বিছানা হইতে উঠিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতে করিতে কি ভাবে। তারপর বলে, "আচ্ছা, আমি যদি তাকে সব কথা বলি? যদি বলি আমি—"

"কেন বলবে?"

"কেন? কাউকে যদি তুমি ভালবাস, আর তাকে না জানাও—তা হলে তার মানে কি থাকে?"

"এ থেকে তুমি কি মানে চাও?"

"বাঃ!"

"হাসি নয়, আন্দ্রি! তুমি যা চাইছো তার সম্বন্ধে তোমার স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত।—ধরে নিলাম যে, সে-ও তোমাকে ভালবাসে। বেশ, তোমাদের দুজনের বিয়ে হলো। তারপর এলো ছেলেমেয়ে। সে রইলো তার ঘর-সংসার নিয়ে, তুমি রইলে তোমার ছেলেমেয়ের আহার সংস্থানের ব্যবস্থা করতে। সেই গড্ডলিকা স্রোত। যে কাজের জন্যে তুমি এলে, যে আদর্শের জন্য জীবন, তার কি হলো? আমি বলি কি জানো? যা মনে আছে, তা মনেই থাক্। ওকে কিছুই জানাবার কোনও দরকার নেই।"

"কিন্তু এ কথা তুমি কেন বলছো—সেদিন আই-ভানোভিচ যা বললেন, তা মানো না? মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে, চাই তার পরিপূর্ণ বিকাশ, দেহের এবং মনের।"

"সে আমাদের জন্যে নয়। তুমি-আমি কেমন করে পাবো পরিপূর্ণ জীবন? সে আমাদের জন্যেই নয়। ভবিষ্যৎকে যে ভালবেসেছে তাকে বর্ত্তমানের সব-কিছু বিসর্জ্জন দিয়ে যেতে হবে। তা ছাড়া উপায় নেই, ভাই।"

"কিন্তু এ বড় কঠোর।"

"তা ছাড়া মুক্তি কোথায়?"

নিস্তব্ধ ঘরে শুধু ঘড়ির পেণ্ডুলামের উদাসীন গতি জীবন হইতে প্রতি মুহূর্ত্তে এক একটি ক্ষণ অপহরণ করিয়া চলিয়াছিল। মা বিছানায় আড়ষ্ট হইয়া শুইয়া আছেন। পাছে শব্দ হয়, তিনি পাশ ফিরিতে পর্য্যন্ত পারিতেছেন না।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া লিটল্ রাশিয়ান বলিয়া উঠিল, "এ কি দুর্ভোগ, অর্দ্ধেক হৃদয় ভালবাসবে, অর্দ্ধেক হৃদয় ঘৃণা করবে! আচ্ছা, তা হলে চুপ করে থাকতে হবে ভাই—"

একটু কোমল কণ্ঠে এবার পাভেল বলিল, "সে-ই ভাল হবে ভাই—"

"তবে তাই হোক বন্ধু! সেই পথেই হোক আমাদের যাত্রা! কিন্তু যেদিন তুমি এর স্পর্শ পাবে সেদিন তুমিও বুঝবে এ কত কঠোর, কত কঠিন।"

"বন্ধু, সে আমি এখনি বুঝছি।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ।"

বাহিরে ঝড় বাড়ীর পাঁচীলে আছাড় খাইয়া ফিরিয়া ফিরিয়া চলিয়াছে। ঘরে পেণ্ডুলাম তেমনি দুলিতেছে। বালিশে মুখ গুঁজিয়া শিশুর মত মা কাঁদিয়া উঠিলেন।

সাম্যবাদীদের সম্বন্ধে গ্রামে ক্রমশ প্রকাশ্য আলোচনা চলিতে লাগিল। তাহারা এক রকম নীল কালিতে লেখা কাগজ গ্রামের চারিদিকে ছড়াইতেছিল। এই সমস্ত কাগজে কারখানার শ্রমিকদের দুরবস্থার কথা, সেণ্ট পিটর্স্‌বুর্গ এবং অন্যান্য শহরের শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটের ব্যাপারে, তাহাদের মালিকদের অত্যাচারের কাহিনী এবং সর্ব্বশেষে তাহাদের সকলের হইয়া এই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য আবেদন থাকিত।

যে সমস্ত লোক বেশ দুই পয়সা রোজগার করিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করে, তাহারা এই সমস্ত কাগজ পড়িয়া রাগিয়া যাইত, বলিত, "যত সব বিপ্লবীর দল! ব্যাটাদের চোখ উপড়ে নেওয়া দরকার।"

ছোকরারাই সকলের চেয়ে বেশী আগ্রহে এই সমস্ত পড়িত। বলিত, "এ সবই সত্যি।"

ইহা ব্যতীত অধিকাংশ লোক, গুরু কর্ম্মভারে যাহাদের জীবন পঙ্গু হইয়া আসিতেছে, তাহারা অলস ঔদাসীন্যে ভাবিত, এতে কি হবে? অসম্ভব!

কিন্তু একটা কথা বিশেষ ভাবে সত্য হইয়া দেখা দিল যে, এই সমস্ত নীল-কালিতে লেখা কাগজ গ্রামের চারিদিকে একটা নূতন উত্তেজনার সৃষ্টি করিতেছিল। কোনও সপ্তাহ কাগজ না আসিলে, তাহারা আপনাদের মধ্যে বলাবলি করিত, কই, এ সপ্তাহে তো পাওয়া গেল না, বোধ হয় ছাপা বন্ধ করে দিয়েছে।

হঠাৎ আবার তাহার পরের দিন সেই কাগজ দেখা দিত। শ্রমিকদের মহলে একটা সাড়া পড়িয়া যাইত।

সেই সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের সরাইখানাগুলোয়, কারখানায় কারখানায় নতুন ধরণের সব লোক দেখা দিতে লাগিল। তাহারা লোক ধরিয়া সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, তাহাদের চোখ দেখিলে মনে হয় যে, সর্ব্বদাই যেন তাহারা কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

কিন্তু মা জানিতেন, এই সমস্তই তাঁহার ছেলের কীর্ত্তি। দেখিতেন পাভেলকে ঘিরিয়া অনবরত এক দল লোক ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহাতে প্রথম মনে সাহস পাইতেন কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে যত দিন যায়, ততই এক অনির্দ্দেশ্য ভয় তাঁহার মনকে পাইয়া বসিতে লাগিল।

একদিন সকাল বেলা মারিয়া বাড়ী আসিয়া জানাইয়া গেল—আজ সন্ধ্যাবেলা পাভেলদের বাড়ী খানাতল্লাসী হইবে। চলিয়া যাইবার সময় সে বলিয়া গেল, "দেখ, আমি কিছু জানি না, আমি এখানে এসেছিলুম, সে-কথাও কেউ যেন না জানে। মনে রেখো, আমি এ বিষয়ের বিন্দু-বিসর্গ কিছু জানি না।"

কি এক অজানা আতঙ্কে মায়ের সর্ব্ব দেহ-মন শিহরিয়া উঠিল। ঘরের মধ্যে স্তূপীকৃত বই-এর দিকে চাহিয়া মায়ের মনে হইতে লাগিল, সকল বিপদের মূল যেন সেই বইগুলোর মধ্যেই আছে। বইগুলি বুকে তুলিয়া কোথায় লুকাইয়া রাখিবেন, তাহার জন্য সমস্ত বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কখন পাভেল আর লিটল্ রাশিয়ান আসিবে!

একটু বিলম্বে দুই বন্ধুতে বাড়ী ঢুকিতে না ঢুকিতেই মা দৌড়াইয়া গিয়া বলিলেন, "জানিস—"

মায়ের আতঙ্কিত মূর্ত্তি দেখিয়া হাসিয়া পাভেল বলিল, "জানি, তোমার বুঝি ভয় করছে?"

"বুকের ভেতরটা আমার কি রকম করছে।"

লিটল্ রাশিয়ান মাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, "ভয়ের কি আছে মা? ভয় পেলে কারুর কোন সুবিধে হবে না।"

উনুনের দিকে চাহিয়া পাভেল বলিল "বাঃ, আজ বুঝি উনুনে আগুনই দাও নি?"

স্তূপীকৃত বই-এর দিকে চাহিয়া মা বলিলেন, "ওই, ওইগুলোর জন্যে পারি নি—"

দুই বন্ধুতে হাসিয়া উঠিল। রাশীকৃত বই-এর ভিতর হইতে খানকতক বই বাছিয়া লইয়া মা দেখিলেন, পাভেল বাহিরের উঠানে লুকাইয়া রাখিয়া আসিল। মাকে বসাইয়া লিটল্ রাশিয়ান উনুনে আগুন দিতে দিতে বলিতে লাগিল, "এর মধ্যে ভয়ঙ্কর কিছু নেই, মা। গম্ভীর-মুখওয়ালা কতকগুলো লোক আসবে—ঘরদোর ঘাঁটকিয়ে বিছানা তুলে, মই লাগিয়ে চারদিকে সব দেখবে। তাদেরও যে এ-সব করতে ভালো লাগে, তা নয়। তবে তাদের চাকরি তো বজায় রাখতে হবে? হয়ত এমনও হতে পারে যে, তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে, তারপর এখানে ওখানে পাঁচ জায়গায় ঘুরিয়ে নিয়ে ছেড়ে দেবে—এই তো ব্যাপার।"

লিটল্ রাশিয়ানের কথা শুনিয়া মা আপনার অতর্কিতে বলিয়া ফেলিলেন, "তোরা কি রকম ভাবে যে কথা বলিস্!"

"কেন মা?"

"যেন কেউ তোদের কোনও অনিষ্ট কখনও করে নি!"

"তা নয় মা! তবে কি জানো, এত অন্যায় সয়েছি, এত নির্য্যাতন সয়েছি যে, নির্য্যাতনে আর অত্যাচারে মনে রাগ হয় না।"

সে-রাত্রি সেই অজানা অতিথিদের আগমন-উৎকণ্ঠায় কাটিয়া গেল। কিন্তু কেহই আসিল না।

কিন্তু তাহারা ভোলে নাই। ঠিক এক মাস পরে একদিন মধ্যরাত্রে সহসা বাহিরে লৌহ-পাদুকার পদ-ধ্বনি বাজিয়া উঠিল। পাভেল, নিকোলে এবং লিটল্ রাশিয়ান খবরের কাগজ বাহির করিবার পরামর্শ করিতেছিল। মা বিছানায় শুইয়া তন্দ্রামগ্ন অবস্থায় ছেলেদের কথা শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িতে-ছিলেন।

ঘরের দরজায় বাহির হইতে কে ধাক্কা মারিল। পাভেল জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

দরজা খুলিতেই দুই জন পুলিশের লোক পাভেলকে ধাক্কা দিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। পিছনে দীর্ঘাকৃতি একজন লোক মৃদু হাসিয়া বলিল, "যাদের জন্যে মশাইরা অপেক্ষা করছেন, তারা নিশ্চয়ই নয়, কি বলেন?"

মা যেখানে শুইয়াছিলেন, সেখানে একজন পুলিশের লোক আসিয়া মাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "হুজুর, এই সেই মা-টা আর এই পাভেল—ওর ছেলে!"

"এই বুড়ী, ওঠ, বাড়ী সব তল্লাস করতে হবে!"

মা উঠিয়া পুত্রের পাশে একধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভয়ে তাঁহার পা কাঁপিতেছিল।

পুলিশের লোক ঘর ওলট-পালট করিয়া যেখানে যে বই পাইতেছিল, তাহা একবার দেখিয়া যেদিকে ইচ্ছা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে লিটল্ রাশিয়ান্ গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিল, "বইগুলো ও-রকম ভাবে ছুঁড়ে ফেলবার কি দরকার?"

কেহই তাহার কথার কোনও উত্তর দিল না। রাগে নিকোলে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "বইগুলো ভালো করে রাখা হোক—"

ইন্‌স্পেক্টর নিকোলের দিকে চাহিয়া হাসিয়া তাঁহার অনুচরদের বলিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, ওহে বইগুলো ঠিক করে রাখো ত।

মা পাভেলের কানে কানে বলে, "নিকোলেকে চুপ করে থাকতে বল্ না।"

মায়ের দিকে চাহিয়া ইন্‌স্পেক্টর ধমকাইয়া উঠিল, "কানে কানে কি ফিস্-ফাস্ হচ্ছে—চুপ। এ বাইবেল কে পড়ে?"

পাভেল বলিল, "আমি।"

"এ সব বই কার?"

পাভেল উত্তর দিল, "আমার"।

"হুঁ।"

সহসা নিকোলের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তাহাকে লিটল্ রাশিয়ান মনে করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের নাম বুঝি, আন্দ্রি নাখোদকা—"

দ্বিরুক্তি না করিয়া আগাইয়া আসিয়া নিকোলে বলিল, "হাঁ।"

লিটল্ রাশিয়ান্ পিছন হইতে হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া ইন্‌স্পেক্টরকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আপনি ভুল করেছেন, আমার নাম আন্দ্রি নাখোদকা—"

ইন্‌স্পেক্টর নিকোলের দিকে তর্জ্জনী তুলিয়া বলিলেন, "সাবধান বলছি—" তারপর লিটল্ রাশিয়ানের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিলেন, "এই নাখোদকা, এর আগে রাজনৈতিক অপরাধে পুলিশ তোমাকে কখনও ধরেছিল?—"

"দু'বার। কিন্তু তারা নাখোদকা বলে ডাকতো না—তারা মিঃ নাখোদকা বলতো—"

"যে আজ্ঞে মিঃ নাখোদকা—নিশ্চয়ই মিঃ নাখোদকা—কারখানায় এই সমস্ত কাগজ বিলি কোন বদমায়েস করেছে বলতে পারেন?"

লিটল্ রাশিয়ান উত্তর দিবার পূর্ব্বেই নিকোলে বলিয়া উঠিল, 'বদমায়েস লোকদের খবর আমরা রাখি না। এই জীবনে প্রথম আজ বদমায়েস লোকদের দেখা পেলাম।"

কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত নিস্তব্ধ হইয়া গেল। মার মুখ ভয়ে সাদা হইয়া আসিল। ইন্‌স্পেক্টর হুংকার দিয়া বলিলেন, "এই কুকুরটাকে বাইরে নিয়ে যা।"

দুজন পুলিশের লোক আসিয়া টানিতে টানিতে নিকোলেকে বাহিরে লইয়া গেল।

খানিকক্ষণ ধরিয়া খোঁজাখুঁজি হইল কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। হাসিয়া ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "কিছু যে পাওয়া যাবে না, তা আমি জানতাম। বোঝা যাচ্ছে, এখানে একজন ঘাগী লোক নিশ্চয়ই আছে,—"

লিটল্ রাশিয়ানের কাছে আসিয়া ইন্‌স্পেক্টর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "মিঃ আন্দ্রি অনিসিমভ্ নাখোদকা, আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল।"

"কেন?"

"হুজুরকে যথাসময়ে তা নিবেদন করা হবে।" তারপর পাভেলের মার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই বুড়ী, লিখতে-পড়তে জানিস?"

হঠাৎ লোকটার দিকে চাহিতেই মার মনে একটা কেমন প্রবল ঘৃণা জাগিয়া উঠিল। সর্ব্বাঙ্গ তাঁহার কাঁপিতেছিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "অত চেঁচাচ্ছ কেন বাছা, জীবনে দুঃখ-কষ্ট কি কিছু বোঝ না?"

"এ সমস্ত ব্যাপারে মা দাঁত দিয়ে বুকের কথা চেপে রাখতে হয়"—লিটল্ রাশিয়ান বলিয়া উঠিল।

মা যেন কাহারও কথা শুনিতে পাইতেছিলেন না। ইন্‌স্পেক্টরের নিকট আগাইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন তোমরা এ রকম করে লোকদের ছিনিয়ে নিয়ে যাও?"

পুলিশ অফিসার ধমকাইয়া উঠিলেন, "চুপ কর বলছি!"

তারপর একজন পুলিশকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাইরের কয়েদীকে ভিতরে নিয়ে আয়।"

নিকোলেকে ঘরে আনা হইল—

"মাথা থেকে টুপী নামা—"

"হাত বাঁধা থাকলে কি করে টুপী নামাতে হয় জানি না—"

মা দেখিলেন, একটা কাগজে একে-একে সকলে কি সই করিল। উত্তেজনার প্রথম ঝোঁক মার কাটিয়া গিয়াছিল। উত্তেজনার পরিবর্ত্তে তাঁহার অন্তরে একটা অসহায় শক্তিহীন বেদনা—যাহা বিশ বৎসর ধরিয়া তিনি ভোগ করিয়া আসিয়াছেন—শুধু দিন কতকের জন্য যাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, আবার তাহা তাঁহার সমস্ত চিত্তকে অবসন্ন করিয়া তুলিল। তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন—এ তিক্ত লবণাক্ত জলের সঙ্গে তাঁহার বিশ বৎসরের পরিচয়।

তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিয়া পুলিশ অফিসার হাসিয়া বলিলেন, "বড় আগে থাকতে কাঁদছিস্ বুড়ী! সব কান্না এখনি শেষ করে ফেললে কি হবে?"

কাঁদিতে কাঁদিতে মা বলেন,—"মার চোখের জলের কি শেষ আছে? তোমার যদি মা থাকেন, তিনি হয়ত তা জানেন!"

সার্চ্চ শেষ হইতে তাহারা চলিয়া গেল—সঙ্গে লইয়া গেল লিটল্ রাশিয়ান আর নিকোলেকে। বিদায়ের সময় বন্ধুর হাত ধরিয়া তাহারা বিদায় প্রার্থনা করিল।

চলিয়া যাইবার সময় হাসিয়া অফিসারটি বলিলেন, "ভয় কি, আবার দেখা হবে!"

তাহারা চলিয়া গেলে পাভেল গম্ভীর স্বরে মা'র দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখলে কি রকম অপমান করে গেল—আমাকে ফেলে গেল—"

"দুঃখ কি, তোকেও নিয়ে যাবে—"

"নিশ্চয়ই—"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মা বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা ছেলে তুই; মাকে কি একটুও সান্ত্বনা দিতে নেই! আমি একগুণ বললে তুই দশগুণ বাড়িয়ে বলিস্—"

মাকে কাছে টানিয়া লইয়া পাভেল বলিল—"মাগো, তোমাকে মিথ্যে বলে প্রতারণা করবো না। তোমাকে এ সব সইতে হবে!"

ক্রমশ পাভেল সম্বন্ধে গ্রামের লোকদের ধারণা বদলাইতে লাগিল। প্রায়ই কারখানার বৃদ্ধ লোকেরাও পাভেলের বাড়ীতে আসিয়া কোনও সমস্যা হইলেই তাহার সঙ্গে পরামর্শ করে। বলে, "ওহে, তুমি তো অনেক লেখাপড়া করেছ—এ ব্যাপারটা কি করা যায় বল তো?"

পাভেলও মন দিয়া সকলের কথা শুনিত। অনেক

সময় চিঠি দিয়া কাহাকেও হয়ত শহরের কোনও বন্ধু উকীলের কাছে পরামর্শের জন্য পাঠাইয়া দিত কিন্তু অধিকাংশ সময়ই সে নিজেই তাহার বিবেচনা মত বুদ্ধি দিত। ক্রমশ গ্রামের লোকেরা এই অল্পবয়স্ক যুবকটিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখিতে লাগিল। সর্ব্বদাই সে স্থির শান্ত হইয়া থাকে, কোনও আড্ডায় যায় না, প্রত্যেক কথা সহজ সরল ভাবে বলে। প্রত্যেক লোকের সঙ্গে কোথায় তাহার শত-সহস্র গোপন বন্ধনের সূত্র রহিয়াছে অনবরতই যেন সে তাহার সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে।

পুত্রের দিকে চাহিয়া মার গর্ব্ব হয়—তিনি প্রাণপণ করিয়া পুত্রের সকল কথা বুঝিতে চেষ্টা করেন; কোন একটা কিছু ঠিক বুঝিলে, অন্তর তাঁহার আনন্দে ভরিয়া উঠে।

সহসা সেই সময় গ্রামের কারখানার ম্যানেজারের সঙ্গে শ্রমিকদের একটা বিবাদ উপস্থিত হইল। কারখানার পিছনে একটা বৃহৎ জলাভূমি পড়িয়াছিল। ম্যানেজার স্থির করিয়াছিলেন যে, এই জলাভূমিটি যদি পরিষ্কার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে কারখানার প্রভূত কাজে লাগে এবং পরিষ্কারের সময়ও তিনি আবর্জ্জনা হইতে যথেষ্ট পরিমাণ পিচ প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন। এই মতলব স্থির করিয়া তিনি কারখানায় ঘোষণা করিলেন যে, প্রত্যেক শ্রমিককে তাহার মাহিনার প্রত্যেক রুবল হইতে এক কোপেক করিয়া চাঁদা দিতে হইবে। সেই টাকায় জলাভূমি পরিষ্কার করা হইবে এবং তাহাতে শ্রমিকদেরই লাভ, কেন না এই জলা জায়গার জন্যই কারখানার আশে-পাশের হাওয়া দূষিত হইয়া আছে। কারখানার মজুরদের উপর এই হুকুমজারী হইল, কিন্তু কারখানার সম্পর্কে যে-সমস্ত কেরাণী ছিল, তাহারা ইহা হইতে অব্যাহতি পাইল।

এই ব্যাপারে শ্রমিকরা সকলে ক্ষেপিয়া উঠিল এবং স্থির করিল যে কিছুতেই তাহারা এই চাঁদা দিবে না। নিজেদের মধ্যে জটলা করিয়া তাহারা স্থির করিল যে, এই বিষয়ে পাভেলের একবার পরামর্শ লওয়া দরকার। অসুস্থ হইয়া পড়ায়, পাভেল দিনকতকের জন্য কারখানায় যাইতে পারে নাই।

পাভেলের বাড়ীতে আসিয়া সকলে উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ সিজব সমস্ত ব্যাপার বর্ণনা করিবার পর বলিল, "আমরা নিজেদের মধ্যে এই নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেছি। তুমি তো অনেক বই-টই পড়েছ—এমন কোনো আইন আছে বলতে পারো যাতে বলে, আমাদের পয়সা নিয়ে মশায় সঙ্গে যুদ্ধ করবার অধিকার কারখানার ম্যানেজারের আছে?"

আর একজন কারিগর বলিয়া উঠিল, "আরে, মশা মবলে তো? মনে নেই, সেই সেবার একটা নাইবার জায়গা করে দেবে বলে আমাদের মাইনে থেকে তিন হাজার আটশো রুবল সংগ্রহ করলো কিন্তু কোথায় গেল সেই সমস্ত টাকা, আর কোথায় বা হল নাইবার জায়গা।"

পাভেল স্থির ধীর ভাবে সমস্ত ব্যাপার আলোচনা করিয়া ম্যানেজারের অন্যায়ের কথা বিশদ ভাবে তাহাদের বুঝাইয়া দিল। এ রকম ভাবে টাকা আদায় করিবার কোনও অধিকার ম্যানেজারের নাই। সেদিন-কার মত তাহারা চলিয়া গেল।

তাহারা চলিয়া গেলে পাভেল মাকে ডাকিয়া একখানি কাগজ তাহার হাতে দিয়া বলিল, "মা, এই লেখাটা নিয়ে তোমাকে এক্ষুণি শহরে যেতে হবে। শহর থেকে আমরা একখানা খবরের কাগজ বের করছি, এ লেখাটা কালকের কাগজে বেরুনোই চাই।"

কালবিলম্ব না করিয়াই মা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই প্রথম তাঁহার ছেলে তাঁহার উপরে কাজের ভার দিয়াছে। জীবনে এই প্রথম তাঁহার পুত্র তাঁহাকে আপনার অন্তরের কথা খুলিয়া বলিল এবং তাহাদের অন্তরঙ্গতার মধ্যে গ্রহণ করিল। পুত্রের কোন কাজে তিনি যে লাগিয়াছেন এই চিন্তায় আনন্দে তাঁহার বুক ভরিয়া উঠিল।

সন্ধ্যা বেলা ক্লান্ত হইয়া মা কাজ সারিয়া বাড়ী ফিরিলেন।

"শাশাঙ্কা বলে একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হলো। ভারী ভালো মেয়ে—সে তোকে অভিবাদন জানিয়েছে আর তোদের সেই আইভান ওভিচ, লোকটিও দেখলুম ভারী সদাশয়—"

"ওদের যে তোমার ভাল লেগেছে, জেনে সুখী হলাম!"

সোমবার দিনও শরীর তেমন সুস্থ না হইয়া উঠায় পাভেল কারখানায় যায় নাই। দুপুর বেলা হঠাৎ ফিডিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল, কারখানার লোকেরা সব কাজ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে—এখনই তোমাকে সেখানে যেতে হবে—সে কি হুলুস্থুল ব্যাপার!

ফিডিয়া পাভেলেরই একজন ভক্ত।

পাভেল তখনি উঠিয়া পোষাক পরিতে লাগিল।

মেয়েরাও সব এক-জোট হয়ে তুমুল চেঁচামেচি আরম্ভ করে দিয়েছে।

হঠাৎ মেয়েদের কথা শুনিয়া মার মনে হইল, তাঁহারও হয়ত যাওয়া কর্ত্তব্য। পুত্রের দিকে চাহিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তা হলে আমিও যাব, নিশ্চয়ই যাব, কেমন?"

পাভেল গম্ভীর স্বরে বলিল, "এসো।"

পুত্রের পাশে পথে চলিতে চলিতে মার মনে হইল যেন কি একটা বিরাট ঘটনা এখনি ঘটিবে এবং তাহারই মধ্যে যে পুত্রের পার্শ্বে তিনি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছেন, সেই এক গোপন গর্ব্বে তাঁহার সর্ব্বদেহ আজ উল্লসিত হইয়া উঠিল।

কোনও রকমে লোকের ভিড় ঠেলিয়া তাঁহারা যখন জনতার মধ্যে প্রবেশ করিলেন তখন রাইবিন বক্তৃতা দিতেছিল। জনতাকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিতেছিল, "আমাদের আজ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে হবে, কয়েকটা পয়সার জন্যে নয়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সুবিচারের জন্যে আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। ম্যানেজারের থলির পয়সার মত আমাদেরও পয়সা ঠিক তেমনি গোল কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, আমাদের পয়সায় মাখানো আছে আমাদের বুকের রক্ত!"

জনতা একস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ঠিক বলেছ, রাইবিন!"

পাভেল ভিতরে আসিতেই সকলেই তাহার নাম ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। চারিদিক হইতে লোক আসিয়া ক্রমশ জনতা আরও গাঢ় করিয়া তুলিতেছিল। প্রত্যেকেই আজ তারস্বরে চীৎকার করিতেছে। এত দিন ধরিয়া যে-সমস্ত অপমান তাহারা নীরবে সহ্য করিয়া আসিয়াছে, যে-কথা এত দিন প্রকাশহীন হইয়া তাহাদের ক্লান্তজীবনে মূক হইয়া পড়িয়াছিল, আজ সহসা তাহা জাগিয়া উঠিয়াছে। আশঙ্কার পাষাণ-বাধা দূর করিয়া আজ কথার পাগলা ঝোরা নামিয়া আসিয়াছে। সেই সমস্ত ক্রুদ্ধ ধ্বনি আর হৃদয়-ভাঙ্গা কলোচ্ছ্বাস উর্দ্ধাকাশে সম্মিলিত হইয়া যেন এক বিরাট-পক্ষ বিহঙ্গমের মত তাহাদের ছাইয়া রহিল।

কথা বলিতে গিয়া পাভেলের আজ মনে হইল, সে নিজেকে আজ এই জনতার মধ্যে উৎসর্গ করিয়া দিয়া যাইবে। যে সত্যের আবির্ভাব-স্বপ্নকে সে এত দিন অন্তরে সংগোপনে লালন-পালন করিয়াছে, আজ বুঝি তাহা মূর্ত্তি ধরিয়া জাগিয়া উঠিবে।

বিপুল উল্লাসে গর্জ্জিয়া উঠিল, "হে বন্ধু সহযাত্রী, এই আমরা এই হাতে গড়েছি গির্জ্জা আর কারখানা, আমরা ভেঙেছি লোহা, গড়েছি নগর; এই হাত, এই আমাদের হাত, টাঁকশালে গড়েছে টাকা, কারখানায় গড়েছে যন্ত্র, গড়েছে সভ্যতার হাজার রকম খেলনা। যে শক্তি পৃথিবীর মুখে তুলে দেয় অন্ন, বুকে দেয় আনন্দ, সে শক্তির জীবন্ত মূর্ত্তি আমরা। সকল কালে এবং সকল দেশে এই আমরাই এগিয়ে গিয়ে কাজে হাত দিয়েছি প্রথম; কিন্তু সকল কালে সকল দেশে আমরাই থেকে গেছি জীবনের শেষে। কে চায় আমাদের আনন্দ? কে চায় আমাদের কল্যাণ? মানুষ বলে কে ভাবে আমাদের? কেউ না!"

জনতার মধ্য হইতে একজন কর্কশ স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "কাজের কথা বল হে!"

তাহার উত্তরে আর একজন বলিয়া উঠিল, "চুপ কর, অসভ্য!"

একজন বলিল, "লোকটা সাম্যবাদী, কিন্তু বোকা নয়।"

যাই হোক্, খুব জোর গলায় স্পষ্ট কথা বলতে পারে কিন্তু—আর একজন বলে!

পাভেল জনতাকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া আবার বলিয়া চলিল, "আজ সময় হয়েছে বন্ধু, তার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার, যে-শক্তি তার অদম্য লোভে আমাদের শ্রমে বেঁচে থাকতে চায়। সময় এসেছে আত্মরক্ষার এবং আজ আমাদের এ কথা ভাল করে বুঝতে হবে যে, আমরা ছাড়া আমাদের আর কেউ সাহায্য করবে না। সকলের জন্যে আমরা প্রত্যেকে, আমাদের প্রত্যেকের জন্যে সবাই—এই হোক আজ আমাদের সব চেয়ে বড় নীতি!"

মন্ত্র-মুগ্ধ জনতা যেন সহস্র-মুখ দিয়া এই বাণীর আস্বাদ সম্মিলিত ভাবে ভোগ করিতেছিল।

পাভেল বলিয়া উঠিল, "আমরা এ ক্ষেত্রে এখনি ম্যানেজারকে ডেকে মুখোমুখী সকল কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই—"

জনতা চীৎকার করিয়া উঠিল, "নিশ্চয়ই, ম্যানেজারকে এখানে ডেকে আনান হোক—"

অবশেষে ঠিক হইল যে, পাভেল, সিজব ও রাইবিন গিয়া ম্যানেজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে। এমন সময় পিছন হইতে শোনা গেল—ম্যানেজার স্বয়ং আসছেন।

দুই পাশ হইতে ভিড় আপনিই সরিয়া গেল। দীর্ঘাকৃত এক ব্যক্তি জনতার ভিতর দিয়া গম্ভীর ভাবে অগ্রসর হইয়া যেখানে পাভেল, সিজব ও রাইবিন দাঁড়াইয়াছিল, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

একবার চোখ তুলিয়া সকলকে যেন একসঙ্গে দেখিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ভিড়ের মানে কি?"

কয়েক সেকেণ্ডের মত সকলেই নিস্তব্ধ। সিজব মাথা হেঁট করিয়া রহিল, ম্যানেজার আবার বলিলেন, "আমার প্রশ্নের উত্তর দাও!"

সিজব ও রাইবিনকে দেখাইয়া পাভেল বলিল, "আমাদের বন্ধুরা আমাদের এই তিন জনের ওপর ভার দিয়েছে, চাঁদার হুকুম তুলে নেবার জন্যে আপনাকে বলতে।"

পাভেলের দিকে না চাহিয়াই ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

বেশ জোর-গলায় পাভেল উত্তর দিল, "আমরা মনে করি, এরকম ভাবে চাঁদা আদায় করা অন্যায়।"

"—ওঃ, এই যে জলা জায়গাটা পরিষ্কার করবার জন্যে চেষ্টা হচ্ছে, তোমরা মনে কর যে এতে শুধু মজুরদের ঠকান হচ্ছে? তাদের স্বাস্থ্য যে ভালো করবার চেষ্টা হচ্ছে, সে তোমরা ভাবতে চাও না, না?"

পাভেল বলিল, "ঠিক তাই!"

রাইবিনের দিকে চাহিয়া ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করিল, "তোমারও কি এই মত?"

—"হাঁ।"

তারপর সিজবের দিকে চাহিয়া ব্যঙ্গের স্বরে ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করিল, "বন্ধু, তোমারও কি এই মত?"

"নিশ্চয়ই!"

পাভেলের সর্ব্বাঙ্গ দৃষ্টি দিয়া যেন পরিমাপ করিয়া লইয়া ম্যানেজার আবার বলিলেন, "তোমাদের দেখে তো মনে হয় যে একটু-আধটু বুদ্ধি-শুদ্ধি তোমাদের আছে। তোমরা এ ব্যবস্থার মধ্যে কিছু ভালো দেখ্‌তে পেলে না, কেমন?"

পাভেল তেমনি জোর-গলায় উত্তর দিল, "যদি কারখানার মালিক তাঁর নিজের খরচে এই জলাভূমি পরিষ্কার করে দিতেন, তা হলে নিশ্চয়ই আমরা এ ব্যবস্থার প্রতিবাদ করতাম না।"

ম্যানেজারের কণ্ঠস্বর পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

"বলি, কারখানাটা কি দানছত্র? ওসব চলবে না বলছি—আমি হুকুম দিয়ে যাচ্ছি, এক্ষুণি সকলকে কাজে লাগতে হবে—"

আর কোনও কথা না বলিয়া তিনি ধীরে জনতার ভিতর দিয়া বাহিরের দিকে চলিলেন। একটা রুদ্ধ প্রতিবাদের গুঞ্জনধ্বনি উঠিতে তিনি একবার ফিরিয়া দেখিলেন। জনতার মধ্য হইতে কে একজন স্পষ্ট স্বরে বলিয়া উঠিল, "হুজুর এক৷ কাজে হাত দিন্ গে যান—"

আর একবার পিছন ফিরিয়া স্পষ্ট স্বরে তিনি হুকুম দিলেন, "পনেরো মিনিটের মধ্যে কাজে হাত না দিলে, প্রত্যেককে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।"

ম্যানেজার চলিয়া যাইতেই জনতার মধ্যে অস্পষ্ট গুঞ্জন পুনরায় চীৎকারে পরিণত হইল। চারিদিক হইতে পাভেলকে উদ্দেশ করিয়া নানা রকমের প্রশ্ন হইতে লাগিল।

"এখন তা হলে আমরা কি করবো, পাভেল?"

পাভেল সেই সহস্রকণ্ঠের মিলিত প্রশ্নের উত্তরে জানাইল, "আমার মতে, কমরেডরা, তোমাদের উচিত যতক্ষণ না চাঁদার হুকুম তুলে নেওয়া হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমাদের ধর্ম্মঘট করে থাকা।"

চারিদিক হইতে উত্তেজিত কণ্ঠে নানা কথা আবার জাগিয়া উঠিল,—"মনে করেছ আমরা বোকা?"

"নিশ্চয়ই আমাদের ধর্ম্মঘট করা উচিত!"

"ধর্ম্মঘট?"

"একটা কোপেকের জন্যে?"

"কেন না? নিশ্চয়ই ধর্ম্মঘট!"

"যদি আমাদের সবাইকে তাড়িয়ে দেয়..."

"কিন্তু কারখানা চালাবে কাদের দিয়ে?"

"যদি নতুন লোক নিয়ে আসে?"

"বিশ্বাসঘাতকের দল—তাদের আমরা—"

পাভেল মায়ের পাশে আসিয়া নীরবে ক্ষিপ্ত জনতার উন্মাদনা শুনিতেছিল। সকলেই নিজেদের চীৎকার লইয়া ব্যস্ত—পাভেলের দিকে তখন কাহারও দৃষ্টি নাই।

জনতার সেই দোদুল্যমান অবস্থা দেখিয়া রাইবিন পাভেলকে ডাকিয়া বলিল, "এদের দিয়ে ধর্ম্মঘট করা চলে না। একটা পয়সার মায়া ত্যাগ করতে যেমন এদের বুকে বাজে, এরা অন্তরে আবার তেমনি কাপুরুষ!"

পাভেল নীরবে সমস্ত কথা শুনিতেছিল আর তাহার মনে হইতেছিল, এতক্ষণ ধরিয়া সে যে সমস্ত কথা বলিয়াছে—বহুদিনের শুষ্ক মৃত্তিকায় জলকণার মত যেন তাহা কোথায় নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কোনও চিত্তে তাহার কথা বিন্দুমাত্র রেখাপাত করে নাই, ভাবিতে তাহার অন্তর শিহরিয়া উঠিতেছিল। ক্রমশ যে-যাহার একে একে ঘরে ফিরিয়া যাইতে লাগিল। যাইবার সময় প্রত্যেকে পাভেলের নিকট আসিয়া তাহার বক্তৃতার প্রশংসা করিল এবং তাহারই সঙ্গে জানাইল, ধর্ম্মঘট করিয়া বিশেষ কোনও সুবিধা হইবে না এবং প্রত্যেকে নিজেকে বাদ দিয়া অপর সকলকে দুর্ব্বলচিত্ত বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া গেল।

পাভেল যে শুধু হতাশ হইল তাহা নয়, সে নিজেকে ভয়াবহ ভাবে আহত মনে করিল। সহসা তাহার মনে হইল, সে যেন একা, তাহার বন্ধু-বান্ধব কেহ নাই। এত দিন ধরিয়া আপনার অন্তরে যে সত্যকে নানা চিন্তা ও অনুরাগের মহিমায় অপরূপ করিয়া সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল, আজ যখন তাহাকে সে অন্তরের সংগোপন-লোক হইতে বাহিরে বাণীরূপ দিল, তাহার আশঙ্কা হইল যে হয়ত সেই সত্যকে সে যে-ভাষায় রূপ দিল—তাহা প্রাণহীন, অনুরাগহীন—নহিলে লোকে তাহার কথা শুনিল না কেন? হয়ত সে সত্যকে এমন দারিদ্র্যের আবরণে আজ লোক-চক্ষুর সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছে যে, লোকে তাহার সৌন্দর্য্য বুঝিতেই পারিল না। এই প্রকাশের দৈন্যের জন্য সে আপনাকেই ধিক্কার দিতে লাগিল।

মা, সিজব আর রাইবিনের সঙ্গে সে বাড়ী ফিরিল। সারা পথ সে গম্ভীর ও বিষণ্ণ হইয়া রহিল। চলিতে চলিতে বৃদ্ধ সিজব মাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "বুঝলে নিলোভনা, এখন আমাদের মত বুড়ো লোকদের সরে পড়া দরকার। নতুন লোক সব আসছে —নতুন তাদের জীবন। আমরা চিরদিন হাত জোড় করে মাটিতে বুক দিয়ে হেঁটে চলে এসেছি—এক মুহূর্ত্তের জন্যে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারিনি। কিন্তু এরা—হয় এরা নিজেদের বুঝতে পেরেছে, নয়ত এরা আমাদের চেয়েও মারাত্মক ভুল করছে—কিন্তু যাই করুক—এদের সঙ্গে আমাদের কোথাও যেন কোনও মিল নেই। দেখলে—এই ছোঁড়া, ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বললো ঠিক যেন ম্যানেজারের সমকক্ষ—"

তারপর তাহার বাড়ীর নিকটে আসিয়া পাভেলের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "আচ্ছা এখন তা-হলে আসি পাভেল! মজুরদের জন্যে তুমি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছ —ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।"

সিজবও চলিয়া গেল।

বাড়ী আসিয়া পাভেলের অশান্তি যেন আরও বাড়িয়া গেল। তাহার সর্ব্বদাই মনে হইতে লাগিল, আজ সেই জনতার মাঝখানে সে যেন কি হারাইয়া ফেলিয়া আসিয়াছে।

রাত্রে মা তখন ঘুমাইতেছিলেন—সে আপনার মনে পড়িতেছিল—এমন সময় বাহিরে পদশব্দ শোনা গেল। পদশব্দে মায়ের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—পাভেল ফিরিয়া দেখিল, দরজার সম্মুখেই পুলিশের লোক।

পাভেল মায়ের কানে কানে বলিল, "আমাকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে এসেছে, বুঝেছ?"

মাথা নত করিয়া ধীরে মা বলিলেন, "বুঝেছি।" সভায় বক্তৃতা শুনিয়াই মায়ের মন বলিয়াছিল, নিশ্চয়ই পুলিশে এবার তাহাকে ধরিবে কিন্তু তবুও মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে, যে-কথায় এত লোকে সায় দেয় সে কথার জন্য নিশ্চয়ই তাহাকে বিশেষ কোনও শাস্তি হয়ত দেওয়া হইবে না।

পুলিশের লোক আসিয়া পাভেলের পাশে গিয়া দাঁড়াইল। পুত্রকে একবার আলিঙ্গন করিবার জন্য মায়ের সর্ব্ব-দেহ-মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কোথা হইতে প্রবল অশ্রুর বন্যা তাঁহার হৃদয়ের দ্বারে আছাড়িয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু পুলিশের লোকগুলির দিকে চাহিয়া আজ সে অশ্রুর জোয়ার হৃদয় ভাঙ্গিয়া চক্ষুর দ্বারপ্রান্তে আসিয়া ঠেকিয়া যাইতেছিল।

পাভেলকে তাহারা ধরিয়া লইয়া গেল। মা নীরবে দাঁড়াইয়া দেখিলেন! একান্ত সংযত কণ্ঠে শুধু একবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সঙ্গে কিছু চাই?"

পুত্র স্থির ভাবে বলিল, "না।"

প্রত্যুত্তরে মা শুধু বলিলেন, "সবার উপরে যিনি, তিনি রইলেন তোর সঙ্গে।"

শূন্য অন্ধকার-ঘরে একলা মা কাঁদিয়া ফেলিলেন। আপনার মনে ততক্ষণ যে উনি কাঁদিয়াছেন, তাহা তিনি জানেন না। সেই শূন্য অন্ধকারে, সেই অবিরাম অশ্রুধারায় মায়ের মনে আজ স্পষ্ট জাগিয়া উঠিল, কত অসহায়, কত দুর্ব্বল তিনি! আপনার অসহায়তার কথা যত ভাবেন ততই তাহার চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া ওঠে পুলিশের লোকগুলোর চেহারা। সত্যকে জানিতে চায় এই অপরাধে যাহারা তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার পুত্রকে ছিনাইয়া লইয়া গেল, তাহাদের বিরুদ্ধে একটা তীব্র আক্রোশ এবং ঘৃণা ধীরে ধীরে গুটীর সূতার মত মায়ের মনের সঙ্গে জড়াইয়া যাইতেছিল।

রাত্রিশেষে তখন বাহিরে বর্ষা নামিয়াছে। বর্ষার জলধারার শব্দে মায়ের মনে হইতেছিল, বাড়ীর চারিদিকে যেন কাহারা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অতি কুৎসিত তাহাদের মুখ—মুখে যেন চক্ষু নাই!

কখনও আপনার মনে বলিয়া ওঠেন, "আমাকেও কেন তারা ধরে নিয়ে গেল না?"

বাহিরে রাত্রিশেষে বর্ষার কর্দ্দমাক্ত পথে আর একদিনের প্রভাত নামিয়া আসিতেছিল। সহসা কারখানার বাঁশী বাজিয়া উঠিল। বাহিরে আবার পদশব্দ হইল। মা উঠিয়া বসিলেন।

জলে ভিজিয়া রাইবিন ঘরে প্রবেশ করিল। বলিল, "পাভেলকে ধরে নিয়ে গেছে, না? আমার ওখানেও

তাঁরা দেখা দিয়েছিলেন। সারা বাড়ী ওলট-পালট করে সার্চ্চ করলো; প্রাণের আনন্দে যা খুশী তাই আমাকে গালাগাল দিল কিন্তু দয়া করে আমাকে আর ধরে নিয়ে গেল না। এমনিই হয়! ম্যানেজার গিয়েই পুলিশকে টিপে দিয়েছে—"

"সে তোমাদের সকলের জন্যে জেলে গেছে—তোমাদের সকলের উচিত পাভেলের পক্ষে দাঁড়ান!"

"আপনি যা বলছেন, তাই হয়ত হওয়া উচিত কিন্তু সে রকম কিছুই হবে না। আজ হাজার বছর ধরে আমাদের পরস্পরকে অসীম দুঃখের মধ্যে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে। সারা গায়ে আমাদের কাঁটা। কেউ কারুর কাছে এলেই আগে কাঁটা এসে গায়ে বেঁধে। যত দিন না আমরা সেই সমস্ত কাঁটার হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারবো, তত দিন আমাদের একসঙ্গে কোনও কাজে মেলা অসম্ভব।"

রাইবিনের কথা মায়ের মোটেই ভাল লাগিত না। মা লক্ষ্য করিতেন যে, দলের অন্য সব ছেলে যেমন আশার কথা, আনন্দের কথা বলে রাইবিন কোনও দিন সে-রকম কোনও কথা বলিত না।

রাইবিন চলিয়া গেলে কিন্তু তাহার কথায় মায়ের মন আরও অশান্ত হইয়া উঠিল। ইদানীং তিনি রান্নাবাড়া আর করিতেন না, এমন কি, চা-ও খাইতেন না, শুধু সন্ধ্যার দিকে কয়েক টুকরা রুটি খাইতেন। কয়েক দিন আগেও যেখানে সন্ধ্যা বেলা ঘর মানুষে আর কথায় সরগরম হইয়া থাকিত, সেখানে এখন কেউ আসে না, সাড়া-শব্দ নাই। একা ঘরে বিষণ্ণ অন্তরে মায়ের দিন কাটে। মাঝে মাঝে রাইবিন আসিত কিন্তু তাহার কথাবার্ত্তা মায়ের মোটেই ভাল লাগিত না।

একদিন এমনি বিষণ্ণ অন্তঃকরণে বসিয়া আছেন, বাহিরে বৃষ্টি পড়িতেছে—এমন সময় দরজায় মৃদু করাঘাত হইল। বাহিরে করাঘাত হইতেই মায়ের হৃদয় চমকাইয়া উঠিল। দরজা খুলিতেই দুইটি মূর্ত্তি ঘরের ভিতর আসিয়া ঢুকিল। একজনকে মা জানিতেন—তাহার নাম সামোলভ, পাভেলেরই কর্ম্ম-সহচর। আর একজন গলার কোটের 'কলার' উল্টাইয়া এবং চোখের সামনে ভ্রূর নীচে এমন ভাবে টুপি টানিয়া দিয়াছিল যে, তাহার মুখই দেখা যাইতেছিল না।

অভিবাদনের কোন আড়ম্বর না করিয়াই সামোলভ মাকে বলিল, "ঘুমুচ্ছিলেন নাকি? তাই তো ঘুম ভাঙালাম! এটিকে চিনতে পারছেন কি? এই সেই আইভানোভিচ—যার কাছে পাভেলের লেখা এনে দিয়েছিলেন?"

মাথা হইতে টুপি খুলিয়া আইভানোভিচ মাকে অভিনন্দন করিল। তাহাকে দেখিয়া মায়ের অসহায় চিত্ত যেন কতকটা শান্ত হইল।

আইভানোভিচ বলিল, "আমরা একটু দরকারে এসেছি আপনার কাছে। আপনি হয়ত জানেন না যে ভ্যাসিলি পরশু দিন জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। তার সঙ্গে পাভেল আর লিটল্ রাশিয়ানের দেখা হয়েছিল। তারা দুজনেই আপনাকে অভিনন্দন জানিয়ে দুঃখ করতে বারণ করে পাঠিয়েছে। পাভেল কি বলে পাঠিয়েছে জানেন, জীবনের রাজপথে মানুষ যতই অগ্রসর হয়, ততই পথের মাঝে-মাঝে বিশ্রামের জন্যে এই জেলগুলোর দরকার হয়। এখন আসল কাজের কথা! জানেন কালকে কত লোক আবার গ্রেফতার হয়েছে?"

"তা তো আমি কিছুই জানি না। আরও লোক গ্রেফতার হয়েছে?"

"পাভেলকে নিয়ে উনপঞ্চাশ জন লোক সব শুদ্ধ গ্রেফতার হয়েছে। এবং এখনও আজকালের মধ্যে আরও জন দশেকের গ্রেফতার হবার সম্ভাবনা আছে। সামোলভ খুব সম্ভবতঃ আজকালের মধ্যে ধরা পড়বে।"

এই সংবাদ শুনিয়া মা একটু আশ্বস্ত হইলেন, তাহলে সে সেখানে একলা নাই। আপনার অজ্ঞাতে মা বলিয়া ফেলিলেন, "অত লোককে যখন ধরেছে তখন নিশ্চয়ই তাদের বেশী দিন ধরে রাখবে না।"

আইভানোভিচ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "ঠিক বলেছ মা! এই সময় যদি আমরা একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলতে পারি তা হলে পুলিশকে রীতিমত ঠকান যায়। ব্যাপারটা হচ্ছে যে, কারখানায় আমাদের লেখা প্রচার যদি এখন বন্ধ হয়ে যায়, তা হলে পুলিশের লোক ভাববে যে নিশ্চয়ই পাভেল আর তার সঙ্গে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদেরই এ সব কীর্ত্তি! এবং তখন জেলে তাদের উপর হয়ত দুর্ব্যবহার বাড়তে পারে।"

মায়ের মন আতঙ্কে দুলিয়া উঠিল, বলিলেন, "কি করে তারা বুঝবে যে এ সব পাভেলের কাণ্ড?"

অনেক সময় পুলিশের লোকও যে সব কথা ধরে নেয়, তা ঠিকই হয়। তারা ভাববে পাভেল যখন বাইরে ছিল, তখন কারখানায় নিত্য বই বিলোনো হত। এখন পাভেল আর বাইরে নেই, কারখানায়ও বই বিলি আর হচ্ছে না। অতএব সোজা বোঝা যাচ্ছে যে, পাভেলই এই সমস্ত বই বিলি করতো। এবং তারা যখন এটা বুঝতে পারবে তখন জ্যান্ত ওদের ধরে ধরে খাবে।"

পাভেলের নির্য্যাতনের আশঙ্কায় মায়ের বুক শুকাইয়া আসিল। বলিলেন, "তবে, তবে কি হবে?"

সামোলভ বলিল, "সেই জন্যেই তো আমরা এসেছি। এখন সমস্যা হচ্ছে যে, আমাদের কাজ বন্ধ করা একদম চলবে না। কারখানায় ঠিক আগেকার মতই আমাদের বই বিলি করতে হবে। তাতে আমাদের কাজও এগোবে, জেলে তারাও পুলিশের নির্য্যাতনের হাত থেকে বাঁচবে।"

আইভানোভিচ বলিল, "কিন্তু এই কাজের ভার নেবে এমন একজন লোকও বাইরে নেই। হাতে আমাদের বেশ ভাল ভাল বই তো আছে তার দায়িত্ব আমি নিজে নিতে পারি কিন্তু আসল সমস্যা হচ্ছে যে কারখানার ভেতরে কেমন করে সেগুলো গোপনে বিলি করা যায়! আজকাল আবার কারখানায় কড়াকড়ি নিয়ম হয়েছে—গেটে সকলকে আগে সার্চ্চ করে তবে ঢুকতে দেয়।"

তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া মা স্পষ্টই বুঝিলেন যে, তাঁহাকে দিয়াই কোনও কাজ ইহারা করাইয়া লইতে চাহিতেছে। যদি পুত্রের কোনও কাজে বা উপকারে নিজেকে লাগান যায়, সেই সম্ভাবনার আশায় মায়ের মনে কোথা হইতে এক নূতন শক্তি দেখা দিল। বলিলেন, "তাহলে, এখন আমরা কি করতে পারি?"

সামোলভ উত্তরে বলিল, "মেরিয়ানা বলে একটা খাবার-ফিরিওয়ালী আছে, আপনি তাকে চেনেন?"

"চিনি। কিন্তু তাকে দিয়ে—"

"তার সঙ্গেই বন্দোবস্ত করুন। সে কোনও রকমে কারখানার ভেতরে গিয়ে বই বিলি করুক—আমরা অবশ্য এর জন্যে তাকে পয়সা দেবো।"

কি মনে করিয়া মায়ের এ পন্থা ভাল লাগিল না। গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়িয়া তিনি বলিলেন, "সে মাগীকে নিয়ে এসব কাজ হবে না—সে যে বকবক করে—এখনি সে সকলকে সব কথা বলে দেবে।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর সহসা উল্লসিত হইয়া মা বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে, আমি নিজেই এ কাজ করবো। তোমাদের বইগুলো সব আমাকে দাও। আমি নিজেই যাব কারখানায়! মেরিয়ানাকে বলবো আমাকে সঙ্গে নিতে—তার মোট বইবো। তারই লোক হয়ে কারখানায় মজুরদের কাছে আমি খাবার বেচতে যাব—আমার ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে, পেটের জন্যে তো একটা যা-হোক-কিছু কাজও আমাকে করতে হবে। সেই বেশ হবে, কেউ সন্দেহ করবে না।"

পরমোল্লাসে তাহারা তিন জনেই চীৎকার করিয়া উঠিল, "সেই ঠিক!"

একটা গোপন-গর্ব্বে মায়ের সমস্ত অন্তর ভরিয়া উঠিল, বলিলেন, "তারা জানুক যে, আমার পাভেলকে তারা বন্দী করে রেখেছে বটে কিন্তু তার হাত জেলের লোহার গারদ পেরিয়ে বহুদূর পর্য্যন্ত এসেছে—"

সামোলভ বলিয়া উঠিল, "এটা যদি আমরা করতে পারি, তা হলে জেলে গিয়ে মনে করবো যে ইজি-চেয়ারে শুয়ে আছি।"

কল্পনায় মা ভাবিতেছিলেন—তিনি কারখানার ভিতরে বই বিলি করিতেছেন, পুলিশের লোকেরা বুঝিবে যে তাঁহার পুত্র এই সমস্তের জন্য দায়ী নয় এবং সে মুক্ত হইবে। ভাবিতে ভাবিতে মায়ের সর্ব্ব শরীর আনন্দে শিহরিয়া উঠিতেছিল।

মায়ের দিকে চাহিয়া আইভানোভিচ বুঝিল যে, তিনি পুত্রের কথাই ভাবিতেছেন! আশ্বাস দিবার জন্য চলিয়া যাইবার সময় সে বলিল, "পাভেলের কথা ভেবে আপনি মন খারাপ করবেন না। জেল থেকে যখন সে বেরিয়ে আসবে, দেখবেন সে আরও কত ভালো হয়ে গেছে। কারাগারই হচ্ছে আমাদের বিশ্রামের জায়গা—পড়ার ঘর! বাইরে থাকলে কাজের ভিড়ে তো সে সব আর হয় না। জানেন মা, আমি তিন বার জেলে গিয়েছিলাম! অবশ্য খুশী হবার মত কর্ত্তাদের কাছে কিছুই পাইনি কিন্তু এই তিন বারে আমার নিজের অনেক উন্নতি হয়েছে—"

স্নেহার্দ্র কণ্ঠে মা বলিলেন, "তা দেখতে পাচ্ছি, কথা বলতে গেলে তোমাদের দম আটকে আসে—"

"সে সব অন্য কারণে মা! আচ্ছা, এখন সে সব কথা থাক্! তাহলে এই বন্দোবস্তই ঠিক রইলো! কালই আপনার কাছে বইগুলো পাঠিয়ে দেবো। আবার চাকা ঘুরুক—তলায় তার যাক পিষে হাজার হাজার যুগের জমাট-বাঁধা অন্ধকার। জয় হোক চিন্তার স্বাধীনতার! চির-অক্ষয় আর চির-সুন্দর হয়ে থাক মায়ের অন্তর! আসি তা হলে!"

দরজার কাছে আসিয়া সামোলভ বলিল, "আমার নিজের মায়ের কাছে এ সব কথার বিন্দুমাত্রও উচ্চারণ করতে পারি না।"

তাহার অন্তরের ব্যথা বুঝিতে পারিয়াই মা বলিলেন, "দুঃখ করো না, বাছা, একদিন সবাই বুঝবে, আমার মত একদিন সবাইকেই বুঝতে হবে।"

তাহারা বিদায় লইলে মা ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া ক্রুশের সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিলেন। বাহিরে বর্ষার

অশান্ত ছন্দে তাঁহার অন্তর হইতে ভাষাহীন এক অপূর্ব্ব প্রার্থনার সুর জাগিয়া উঠিল। তাঁহার সেই ক্ষুদ্র ঘরকে সচকিত করিয়া যে-সমস্ত লোক একদিন তাঁহার অন্তরে নব নব সুর ধ্বনিয়া তুলিয়াছে, তাহাদের সকলের মিলিত চিন্তা আজ বাণীহীন প্রার্থনায় তাঁহার অন্তরকে ভরিয়া তুলিল। সামনের ক্রুশের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহার মনে হইল, সেই ক্রুশের মধ্য দিয়া অনবরত তাহারাই যাতায়াত করিতেছে। মাগো, একরাশ ফুলের মত সুন্দর, পবিত্র, শিশুর মত মুখ, কিন্তু কি উদাসীন শিশু সব!

পরের দিন সকাল বেলা ঘুম হইতে উঠিয়াই মা সোজা মেরিয়ানার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

মেরিয়ানা আপনিই বকিয়া চলিল, "দুঃখ করিস্ না বোন। আগে চুরি করার জন্যে লোককে ধরে নিয়ে যেতো—আজকাল নিয়ে যায় সত্যি কথা বললে। পাভেল হয়ত অন্যায় কিছু বলে থাকবে কিন্তু যাই বলিস্ বোন, সকলের হয়ে তো সে দাঁড়িয়েছিল, সকলের হয়ে তো সে-ই কথা বলেছিল। এখন অবিশ্যি সকলের উচিত তাকে দেখা। তা বোন্, তোর সঙ্গে দেখা করবো করবো আমিই মনে করছিলাম কিন্তু যে কাজের ভিড়, গিয়ে আর উঠতে পারি নি। এই বাজার থেকে জিনিস আনছি, ভাজছি, আবার ফিরি করতে বেরুচ্ছি। সে আবার এক ঝকমারি! ব্যাটারা সব ঝুড়ি থেকে চুরি করবার মতলবে থাকে। সাবধানে ফিরতে হয়! তারপর তাতেও কি শান্তি আছে? দু'-চার পয়সা জমিয়ে রাখ, কোন্ সময় কোন্ হারামজাদা এসে তাও চুরি করে নিয়ে যাবে! একা থাকার এই বিড়ম্বনা! তাও আবার বলি বোন, লোক নিয়ে থাকা আরও বিড়ম্বনা।"

মা দেখিলেন, মেরিয়ানাকে না থামাইলে সে থামিবে না। বলিলেন, "বুঝলি বোন, আমি এসেছি কিছু সাহায্যের জন্যেই; বোঝোই ত দিন চলে না—আমাকে তোমার সঙ্গী করে নাও, তোমার সঙ্গেই খাবার ফিরি করবো!"

মায়ের দুরবস্থার কথা শুনিয়া মেরিয়ানার দয়া হইল। বলিল, "আচ্ছা তাই হবে; এক্‌দিন তুই বোন আমাকে আমার স্বামীর অত্যাচার থেকে বাঁচিয়েছিস্! মনে আছে তোর? আজ আমি তোকে তোর দুঃখ থেকে একটু বাঁচাতে পারবো না?"

পরের দিনই কারখানার ভিতরে মেরিয়ানার জায়গায় মা খাবারের ঝুড়ি লইয়া উপস্থিত হইলেন। মেরিয়ানা কারখানার ভার মায়ের উপর দিয়া নিজে বাজারে ফিরি করিতে আরম্ভ করিল।

নূতন খাবারওয়ালীর সঙ্গে মজুরদের অল্পকালের মধ্যেই ঘনিষ্ঠতা হইয়া গেল। পাভেলের মা বলিয়া অনেকে আসিয়া সহানুভূতি জানায়, দুঃখ করিয়া জিজ্ঞাসা করে, "তাই তো খাবার ফিরি করে বেড়াতে হচ্ছে?"

কিন্তু কেউ কেউ আবার পাভেলের মা বলিয়া তাঁহাকে বেশ দু'কথা শুনাইয়া দেয়। এই সব ধর্ম্মঘট, গণ্ডগোল তাহারা আদৌ পছন্দ করিত না। একজন একদিন বেশ নির্ম্মম ভাবে মাকে শুনাইয়া দিল, আমি যদি এ দেশের শাসনকর্ত্তা হতাম, তা হলে তোমার ছেলেকে ফাঁসী দিতাম। লোকদের ক্ষেপিয়ে বেড়ান কত মজার ব্যাপার, যাদু বুঝতে পারতেন।

খাবার লইয়া কারখানার ভিতর বসিয়া আছেন, সহসা দেখেন দুই জন পুলিশের লোক সামোলভকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। পিছনে পিছনে প্রায় শতখানেক মজুর চলিয়াছে। কেহ পুলিশের লোককে গালাগাল দিতেছে, কেহ বা ঠাট্টা করিতেছে কিন্তু সবাই ক্রুদ্ধ।

একজন সামোলভকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, "তা হলে একান্তই বেড়াতে চললি ভাই?"

আর একজন চেঁচাইয়া বলিল, "এমনি করেই ওরা আমাদের সম্মান করে।"

তাহার উত্তরে আর একজন বলিয়া উঠিল, "সম্মান করে না? আমরা যখনি বেড়াতে যাই, তখনি সঙ্গ নেয় আমাদের বডি-গার্ড।"

সামোলভ মায়ের কাছে আসিতেই মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, গোপন অভিবাদনস্বরূপ তিনি মাথা নত করিলেন।

এই সমস্ত যুবক যখন হাসিমুখে কারাগারের দিকে যাত্রা করিত, মায়ের মন তখন মাতৃ-সুলভ এক অপরূপ করুণায় ভরিয়া উঠিত। সঙ্গে সঙ্গে মজুররা নানা ভাবে তাহাদের অন্তরের বিক্ষোভও জানাইত। মা গোপন-গর্ব্ব অনুভব করিতেন, এ সবই তাঁহার ছেলের প্রভাব।

কারখানায় খাবার বিলি হইয়া গেলে মা সোজা মেরিয়ানার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাহার কাজে-কর্ম্মে সহায়তা করিয়া যখন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার আর কিছুই ভালো লাগিতেছিল না। আইভানোভিচের বই দিয়া যাইবার কথা ছিল, কিন্তু তাহারও দেখা নাই। আপনার মনে ঘরময় পায়চারি করিয়া বেড়ান—কোথাও যেন একটু বিশ্রামের স্থান নাই।

বাহিরে নিঃশব্দে জানালার উপর বরফ আসিয়া

পড়িতেছিল। রাত্রি ক্রমশ গভীর হইয়া আসিতেছিল। এমন সময় মা শুনিলেন, দরজায় কে খুব সন্তর্পণে করাঘাত করিতেছে। দরজা খুলিতে দেখিলেন একটি বলিষ্ঠ ধরণের মেয়ে। ভাল করিয়া দেখিতে তিনি চিনিতে পারিলেন, শাশাঙ্কা। মাঝে দুই-একদিন দেখিয়াছিলেন, কিন্তু কেমন করিয়া হঠাৎ সে এত মোটা হইয়া গেল তাহা মা কিছুতে বুঝিতে পারিলেন না। সেই সঙ্গিহীন নির্জ্জনতার মধ্যে একজন সাথী পাইয়া তাঁহার অন্তর যেন একটু শান্তি লাভ করিল।

"এসো, এসো, এত দিন তো তোমায় দেখিনি! কোথায় ছিলে?"

"বাঃ, আপনি জানেন না, আমিও যে জেলে গিয়েছিলাম। নিকোলের সঙ্গে একসঙ্গে জেলে ছিলাম। আপনার নিকোলেকে মনে আছে?"

"মনে আছে বই কি! আইভানোভিচের কাছে শুনলাম সে ছাড়া পায়নি, কিন্তু তোমার সম্বন্ধে সে তো কিছু বললে না—"

"বলে আর কি হবে, তাই সে বলেনি। কিন্তু দেখুন, আমি একেবারে ভিজে গেছি। আইভানোভিচ আসবার আগেই পোষাকটা একটু বদলাতে হবে—তার আগে শুনুন, আমিই বইগুলো এনেছি—"

আকুল আগ্রহে মা বলিয়া উঠিলেন, "কই?"

জামার বোতাম খুলিতেই তাহার সর্বদেহ হইতে পাতলা কাগজের পার্শেল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল—ঝড়ো হাওয়ায় যেমন গাছের শুকনো পাতা ঝরিয়া পড়ে।

মা হাসিয়া ফেলিলেন। "ও মা, তাই তো বলি, কোথাও কিছু নেই, মেয়েটা হঠাৎ এত মোটা হল কি করে? এই বোঝা বয়ে সারা পথ নিশ্চয়ই হেঁটে এসেছ?"

"নিশ্চয়ই!" ভারমুক্ত হইতেই আবার শাশাঙ্কাকে অনুদেহা যুবতীটির মত দেখাইল। মা এইবার লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, তাহার মুখ-চোখ যেন বসিয়া গিয়াছে, সর্ব্বদেহে ক্লান্তি মাখা!

"আহা, বড্ড কষ্ট হয়েছে, না? বসো, এক্ষুণি চা আর রুটি তৈরী করে দিচ্ছি।"

"বাঃ, আপনি কেন করতে যাবেন, আমি করে নিতে পারি না?"

রান্নাঘরে গিয়া দুইটি নারী জলন্ত আগুনের সম্মুখে আপনাদের সুখ-দুঃখের কথা বলিতে লাগিল।

"সত্যিই মা, বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। যাই বলি না কেন, কারাগার মানুষের খানিকটা শক্তি আহরণ করে নেয়। সব চেয়ে ভয়ানক জিনিস কি জানেন, যখন কাজ করবার জন্যে মন উৎসুক, সেই সময় বাধ্য হয়ে পঙ্গু হয়ে বসে থাকতে হয়। বাইরে কত কাজ রয়েছে, একটু জ্ঞানের অভাবে লাখ-লাখ লোক মরে আছে। আমরা জানি, আমরা খানিকটা পারি তাদের সেই অভাব মেটাতে কিন্তু সেই সময় মন যখন চায় দিতে তখন তারা খাঁচার জন্তুর মত আমাদের রাখে ধরে। সে যে কি যন্ত্রণা! সমস্ত মন শুকিয়ে যায়।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মা বলিলেন, "এ সমস্তের পুরস্কার কে দেবে? আমার বিশ্বাস, ঈশ্বর একদিন না একদিন এর পুরস্কার দেবেন! তোমরা তো আবার ঈশ্বরেও বিশ্বাস কর না!"

ঘাড় নাড়িয়া শাশাঙ্কা বলিল, "না!"

হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া মা বলিয়া উঠিলেন, "আমিও তোমাদের বিশ্বাস করি না। কি আশ্চর্য্য লোক তোমরা! তোমরা এখনও নিজেদের জানো না! তোমরা যে রকম ভাবে জীবন চালাও, ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকলে কি তা কখনও সম্ভব হয়?"

হঠাৎ বাইরে আবার পায়ের শব্দ শোনা গেল। দুই জনেই চমকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শাশাঙ্কা উঠিয়াই মায়ের কানে চুপি চুপি বলিল, "যদি দেখেন যে পুলিশের লোক, তাহলে তাদের সামনে দেখাবেন যে আপনি আমাকে চেনেন না। আমি রাত্রে পথ ঠিক করতে না পেরে ভুল বাড়ীতে ঢুকে পড়েছি এবং হঠাৎ মূর্চ্ছা যাই—আপনি আমার জামা খুলতেই এই সমস্ত বই দেখতে পেয়েছেন।"

শাশাঙ্কার মনোভাব বুঝিয়া করুণ-কোমল স্বরে মা বলিলেন, "ও সব কথা বলবার কি দরকার?"

কিন্তু পুলিশের লোকের বদলে আসিল আইভানোভিচ, সর্ব্বশরীর জলে ভেজা এবং কোনও রকমে যেন শেষ শ্বাস গ্রহণ করিতেছে।

ঘরে ঢুকিতেই বলিয়া উঠিল, "মাগো, সামোভারে আগুন দাও! ওঃ, ওর চেয়ে ভালো জিনিস জগতে আর নেই! এই যে শাশাঙ্কা, তুমি আগে থাকতেই উপস্থিত দেখছি—"

মায়ের দিকে চাহিয়া আইভানোভিচ বলিয়া চলিল, "এই যে মেয়েটি দেখছেন, পুলিশের পায়ে কাঁটার মত ইনি লেগে আছেন। জেলের ইন্‌স্পেক্টর ওকে অপমান করে, তাতে ও বেঁকে বসলো যে, যদি ইন্‌স্পেক্টর ক্ষমা না চায়, তাহলে জেলে না খেয়ে ও আত্মহত্যা করবে। আট দিন ক্রমান্বয় এক ফোঁটা জল গ্রহণ করলো না—অবস্থা এ রকম হয়ে উঠলো যে, এই যায় এই যায়—"

বিস্ময়ে শাশাঙ্কার মুখের দিকে চাহিয়া মা বলিলেন, "আট দিন কিছু না খেয়ে রইলি কেমন করে?"

শাশাঙ্কা গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "কি করব? আস্পর্দ্ধা! অন্যায় করে ক্ষমা চাইবে না?"

"যদি মরে যেতিস্, পাগলী?"

"তা কি করব! অবশ্য সে ক্ষমা চাইলো। বিন্দুমাত্র অপমান আর কারুর সহ্য করা উচিত নয়!"

ক্রমশ কথাবার্ত্তায় রাত্রি গভীর হইয়া আসিতেছিল। শাশাঙ্কা বিদায় গ্রহণের জন্য উঠিতেই মা বলিয়া উঠিলেন, "সে কি, এই পরিশ্রমের পর এই রাত্রে কোথায় যাবে?"

আইভানোভিচ বলিল, "ওকে এখনি শহরে যেতে হবে। দিনের আলোয় রাস্তায় ওকে মুখ দেখালে চল্‌বে না!"

"এই রাত্রে, একলা যাবে? কি লোক তোমরা—"

শাশাঙ্কা উঠিয়া দাঁড়াইল। মা দরজা পর্য্যন্ত তাহাকে পৌঁছাইয়া দিলেন। যাইবার সময় কি মনে করিয়া শাশাঙ্কা ফিরিয়া দাঁড়াইল। অতি মৃদুস্বরে মাকে বলিল, "মাগো, তোমার হাতটা দাও, একটু চুমু খাবো।" শাশাঙ্কাকে জড়াইয়া ধরিয়া মা তাহার কপোল চুম্বন করিলেন। শাশাঙ্কা চলিয়া গেল।

মা নীরবে অনেকক্ষণ জানালার কাচের ভিতর দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আহা, বাছা আমার কি করে শহরে পৌঁছবে!"

আইভানোভিচও এতক্ষণ গম্ভীর হইয়া বসিয়াছিল। মায়ের কথায় সায় দিয়াই সে বলিল, "এবার জেল থেকে এসে ওর শরীর একদম ভেঙে গিয়েছে। আগে ওর শরীর খুব ভালই ছিল। ওর মুখ দেখলে আমার কিন্তু মনে হয় যেন ওর ক্ষয়রোগ ধরেছে।"

"ওর কে আছে?"

"মস্ত জমিদারের মেয়ে। কিন্তু বলে যে বাপ নাকি ভয়ানক পাজী। আপনি আর একটা ব্যাপার বোধ হয় জানেন যে, ওদের দুজনের বিয়ে হবে।"

"কার সঙ্গে!"

"কেন, পাভেল আর শাশাঙ্কা ওরা দুজনে দুজনকে ভয়ানক ভালবাসে। তবে বিয়ে ওদের আর ঘটে উঠছে না। ও যখন থাকে জেলে, সে তখন থাকে বাইরে, আবার ও যখন বেরিয়ে আসে, দেখে সে জেলে গেছে।"

"কই, আমাকে পাভেল তো কিছুই বলেনি!"

হঠাৎ মেয়েটির প্রতি মায়ের অন্তরের সমস্ত নিরুদ্ধ স্নেহ উথলিয়া উঠিল। মনে হইল, তাঁহারই স্নেহের পুত্রবধূকে অসহায় ভাবে এমনি করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এবং সেই সঙ্গে রাগ হইল আইভানোভিচের উপর। বলিলেন, "তোমার উচিত ছিল ওর সঙ্গে যাওয়া!"

"অসম্ভব! কাল সকালে এখানে আমার পর্ব্বত-প্রমাণ কাজ করতে হবে। সকাল থেকে এই হাঁপানি নিয়ে ঘুরতে ঘুরতেই প্রাণ যাবে!"

আইভানোভিচের কথা যেন মা ভাল করিয়া শুনিতে পাইলেন না। তিনি তখন শাশাঙ্কার কথাই ভাবিতেছিলেন।

আপনার মনে বলিয়া উঠিলেন, কি সুন্দর মেয়ে! কিন্তু মনে মনে তাঁহার ভয়ানক অভিমান হইতেছিল যখন ভাবিতেছিলেন যে, পুত্রের যে-সংবাদে তিনি সকলের চেয়ে বেশী সন্তুষ্ট হইতেন, সেই সংবাদ পুত্র ছাড়া আর একজনের কাছে শুনিতে হইল!

মায়ের অবস্থা বুঝিয়া আইভানোভিচ বলিল, "সত্যিই বড় ভালো মেয়ে। আমি বুঝতে পারছি তার জন্যে আপনার মনে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এই হতভাগ্য বিপ্লবীদের সকলের জন্যে যদি আপনি এমনি করে দুঃখ করেন, তাহলে মা, একটা হৃদয়ে কুলোবে না। যাক, এখন কাজের কথা আরম্ভ করা যাক।"

কেমন করিয়া মা কারখানায় বই লইয়া যাইবেন, সেখানে কাহার কাছে কি ভাবে বইগুলো দিবেন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মাকে তাহা বুঝাইতে লাগিল। এত পরিষ্কার ভাবে সমস্ত ব্যাপারটা সে মাকে বুঝাইয়া দিল যে মা লোকটির বুদ্ধিবৃত্তি দেখিয়া অবাক হইলেন।

সকাল বেলা চলিয়া আসিবার সময় আইভানোভিচ জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা ধরুন, পুলিশের লোক যদি জানতে পেরে আপনাকে ধরে ফেলে এবং জিজ্ঞেস করে, এ সমস্ত বই কোথা থেকে পেলে—তখন কি বলবেন?"

মা হাঁকিয়া উত্তর দিলেন—"বলবো—যেখানেই পাই না, তোমাদের তাতে কি!"

"তাতে তো তারা শুনবে না—তাদের ধৈর্য্য বড় বেশী; তারা যতক্ষণ না উত্তর পাবে, ততক্ষণ আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে।"

"আমি কিছুতেই বলবো না।"

"তারা ধরে নিয়ে গিয়ে আপনাকে জেলে রাখবে।"

"তাতে কি? তাহলে জীবনে ভাববো যে অন্তত একটা কাজেও লাগলাম। আমার এ জীবনে কি দরকার? কেই বা আমাকে চায়।"

"কিন্তু জেলে ভয়ানক কষ্ট।"

"জেলে যারা যায়, তারা প্রত্যেকেই তো সে কষ্ট সহ্য করে। হয়ত যারা জীবনকে বুঝেছে, তাদের মনে তত কষ্ট লাগে না। কিন্তু আজ আমার মনে হয় যে, আমিও যেন একটু একটু করে জীবনকে বুঝছি।"

উল্লাসে আইভানোভিচ বলিয়া উঠিল, "যদি তাই বুঝে থাকেন, তাহলে আজ আপনাকেও সকলের চেয়ে বেশী প্রয়োজন।"

দুপুর বেলা আইভানোভিচের নির্দেশ-মত মা বুকের ভিতরে কাগজের বাণ্ডিলগুলি ভরিয়া লইলেন। এমন ভাবে সেগুলি লইলেন, যেম বহুকাল ধরিয়া তিনি সেই কাজে অভ্যস্ত।

আধ ঘণ্টার মধ্যে খাবারের ঝুড়ি লইয়া কারখানার দরজায় হাজির। দুই জন পুলিশের লোক ফটকে দাঁড়াইয়া প্রত্যেক মজুরের সর্ব্বাঙ্গ পরীক্ষা করিয়া তবে তাহাদের কারখানায় ঢুকিতে দিতেছিল। মাঝে-মাঝে মজুরগুলো প্রহরীদের উপর বিরক্ত হইয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলে, "পকেটে কি দেখছো—মাথার ভেতরে দেখ!"

পুলিশের লোক রাগে কোনও সময় উত্তর দেয়, "মাথায় দেখবো কি? মাথায় তো শুধু উকুন আর পোকা।"

মজুরদের কাছ থেকে উত্তর আসিতে বিলম্ব হয় না। একজন বলিয়া ওঠে, 'মানুষ শীকার করার চেয়ে উকুন বাছো গে, পুণ্যি হবে।"

এমন সময় খাবারের ঝুড়ি লইয়া আসিয়া খাবার-ওয়ালী বলে, "আমাকে আর জ্বালাস্ নে বাবা, একে বুড়ো মানুষ, তারপর এই বোঝা, আর দাঁড়াতে পারি না। পিঠ ভেঙ্গে পড়লো বাবা!"

কোনও সন্দেহ না করিয়া প্রহরীরা বলিয়া উঠিল, "যা বুড়ী, যা!"

যথাস্থানে বসিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া মা একবার চারিদিক দেখিয়া লইলেন। মাকে দেখিয়াই দুটি লোক আগাইয়া আসিল। দুই ভাই। বড় ভাইয়ের নাম ভাসিলি, ছোট ভাইয়ের নাম আইভান।

ভাসিলি আগাইয়া আসিয়া অর্থপূর্ণ দৃষ্টি লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বলি মোহন-ভোগ এনেছ?"

এই সাঙ্কেতিক কথাই আইভানোভিচের কাছে মা শুনিয়াছিলেন। উত্তরে তিনিও বলিলেন, "আজ নেই, কাল আনবো।"

দুই ভাই-ই সঙ্কেতের অর্থ বুঝিল। আইভান আহ্লাদে চীৎকার করিয়া বলিল, "সত্যিই তুই মা, মাথার মণি!" ভাসিলি আগাইয়া আসিয়া হাঁড়ির ভিতর হইতে এক বাণ্ডিল কাগজ তুলিয়া লইয়াই বুকের ভিতরে পুরিল! আইভান বুটের পা-ঢাকা চামড়ার ভিতর আরও কতকগুলি লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

দূরে মজুরদের আসিতে দেখিয়া মা অনভ্যস্ত সুরে হাঁকিতে লাগিলেন, "চাই গরম ঝোল টাটকা মাংসের রোষ্ট চা—ই—!"

মজুররা যথারীতি তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সময় বুঝিয়া ভাসিলিও গায়ের জামাটি আঁট করিয়া পরিয়া কারখানার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

মজুরদের খাবার দিতে দিতে মা আনন্দে ভাবেন, তাঁহার এই প্রথম অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়া পুত্র কত না আনন্দিত হইবে! একটা অনাস্বাদিত আনন্দের পুলক তাঁহার সর্ব্বদেহকে আলোড়িত করিয়া তুলিতেছিল। মনে হইতেছিল, কি একটা পাখী প্রভাতে প্রথম জাগিয়া ডানার ঝাপট দিতে দিতে আনন্দ-সঙ্গীত গাহিতেছে। মজুররা খাবার চায়! আনন্দের ঝোঁকে জোরে জোরে মা বলেন, "আরও আছে! আরও আছে!"

কারখানায় কাজ সারিয়া মেরিয়ানার বাড়ী হইয়া যখন সন্ধ্যায় মা বাড়ী ফিরিলেন, তখন তাঁহার মনে হইতেছিল, যেন সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া কে তাঁহাকে স্নেহালিঙ্গন করিতেছে। সে কি অপূর্ব্ব পুলক!

চা তৈয়ারী করিয়া খাইতেছেন এমন সময় বাহিরে পায়ের শব্দ হইল। তাড়াতাড়ি দরজার সামনে আসিয়া কোনও রকমে দরজা খুলিতেই দেখেন, অন্ধকারে লিট্‌ল্ রাশিয়ান দাঁড়াইয়া! একা!

অতি-পরিচিত স্নেহ-মাখা কণ্ঠস্বরে শুনিলেন, লিট্‌ল্ রাশিয়ান ডাকিতেছে, "মাগো!"

তাহাকে দেখিয়া এক দিকে যেমন তাঁহার অন্তর আনন্দের আতিশয্যে ভরিয়া উঠিতেছিল, অন্য দিকে তাহাকে একা দেখিয়া এক নিদারুণ নৈরাশ্য তাঁহাকে মুহ্যমান করিয়া তুলিল। আশ্রির বুকে মুখ রাখিয়া তিনি শিশুর মত কাঁদিয়া উঠিলেন।

আদরে মাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া, মায়ের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে, তাহার অপরূপ কোমল করুণ কণ্ঠস্বরে লিট্‌ল্ রাশিয়ান বলে, "কেঁদো না মা! এমনি করে আমাকেও কাঁদিও না! বিশ্বাস কর, শীগ্‌গিরই পাভেল ছাড়া পাবে। তার বিরুদ্ধে তারা কিছুই পায়নি। আর আমাদের সঙ্গে যারা গিয়েছিল, তারা কেউই একটি কথাও বার করেনি।"

ধীরে মাকে বিছানার উপর বসাইয়া লিট্‌ল্

রাশিয়ান বলিয়া চলিল, "মাগো, আসবার সময় পাভেল তোমার কথা বললো। সেখানে সে দিব্যি আরামে আছে। একেবারে এক দঙ্গল লোক। এখান থেকে আর শহর থেকে নিয়ে প্রায় শত খানেক লোক ধরেছে। চার-পাঁচজন করে একটা ঘরে রেখেছে। জেলের ওয়ার্ডাররাও দেখলুম মন্দ লোক নয়। বেশী কাজটাজ তেমন কিছুই দেয়নি। কিন্তু মুস্কিল হবে নিকোলের। সব সময়েই মারমূর্ত্তি হয়ে আছে। ওকে তারা কিছুতেই শীগ্‌গির ছেড়ে দেবে না। তবে পাভেল শীগ্‌গিরই ছাড়া পাবে। এখন বল ত মা তুমি কেমন ছিলে?"

লিটল্ রাশিয়ানের কথা শুনিয়া মায়ের মন স্নেহে ভরিয়া উঠিল। আদরে তাহার মাথায় হাত দিয়া মা বলিলেন, "তুই জানিস্ না তোকে আমি কত ভালবাসি!"

"সে কি জানি না মা! শুধু আমি কেন, তোমার স্নেহে আমরা সবাই ধন্য!"

"না, না, আমি তোকে সকলের থেকে আলাদা করে ভালবাসি। যদি তোর মা থাকতেন, তাহলে সবাই তাঁর হিংসে করতো!"

গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া লিটল্ রাশিয়ান বলে, "হয়ত আমার মা এখনও এই পৃথিবীর এক কোণে কোথাও বেঁচে আছেন!"

"জানিস্, আমি আজ কি করেছি?" বলিয়া আত্মতৃপ্তির আবেগে কাঁপিতে কাঁপিতে মা কারখানার সমস্ত ঘটনা বলিলেন।

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া লিটল্ রাশিয়ান চীৎকার করিয়া উঠিল, "এই ত চাই মা! তুমি হয়ত জানো না যে, এতে পাভেলের এবং তার সঙ্গে যারা গ্রেফতার হয়েছিল তাদের কি উপকারই না হবে?"

লিটল্ রাশিয়ানের উৎসাহে মায়ের অন্তর পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে বিকশিত হইয়া উঠিল। তিনি আনন্দ গদগদ স্বরে বলিয়া চলিলেন, "সারা জীবন শুধু এই কথাই ভেবেছি, হে প্রভু, এ জীবন কিসের জন্যে দিলে? শুধু কি মার খেতে আর মুখ বুজে ভূতের বোঝা বইতে? এই সংসারের খাওয়া-দাওয়া ওঠা-বসা ছাড়া আর কিছু জানতাম না। স্বামীকে ছাড়া আর কারুকেই দেখতে পেতাম না। কেমন করে আমার পাভেল মানুষ হয়ে উঠলো তাও জানি না। তখন আমার একমাত্র চিন্তা আর কর্ত্তব্য ছিল—আমার দানবটির যথাসময়ে খাদ্য সরবরাহ করা—যাতে সে আমাকে প্রহার না করে তার জন্যে সর্ব্বদাই তার সেবায় থাকা। কিন্তু তবুও প্রহার করতে একদিনও কার্পণ্য করেনি। স্ত্রীকে যেমন সাধারণত লোকে প্রহার করে সে রক নয়, সে আমাকে প্রহার করতো, যেমন দুর্ব্বল শত্রুকে মানুষ প্রহার করে। কুড়ি বছর ধরে আমি এ জীবন যাপন করে এসেছি। তারপর যখন সে মারা গেল, পাভেলের দিকে চাইলাম। মাগো, সেও তখন এই ব্যাপারে ডুবে গেছে। জীবনের সব শেষ আশ্রয় তাকে হারাবার আতঙ্কে দিন-রাত যে কেমন করে কাটে, সে আর কাকে জানাবো? তারপর একদিন বুঝলাম, আমাদের স্ত্রীলোকের এই ভালবাসা—এ ঠিক আসল ভালবাসা নয়! যে জিনিষ আমাদের দরকার, আমরা শুধু তাকেই ভালবাসি। আর তোরা? তোরা যাদের ভালবাসিস্ তাদের সঙ্গে তোদের দরকারের কোনও সম্পর্ক নেই! যে লোককে জানিস্ না তার জন্যে তোরা হাসতে হাসতে কারাগারে যাস্, যে লোককে চিনিস্ না তার জন্যে চলেছিস কোথায় দূর সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসনে! মেয়েগুলো রাত্রির ঠাণ্ডায় চলেছে মাইলের পর মাইল, পেটে নেই খাবার, গায়ে নেই জামা! কার জন্যে? কিসের জন্যে? আমি বুঝি, তারাই সত্যি ভালবাসতে জেনেছে—আর আমি আজও সে রকম ভালবাসতে পারলাম না—আমি শুধু ভালবাসি আমার অন্তরের প্রিয় যারা তাদের।"

মায়ের মনের অর্গল যেন বহুদিন পরে অতর্কিতে খুলিয়া গিয়াছিল। তাই কথার বন্যায় তাঁহার হৃদয়ের তটভূমি বারে বারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল।

লিটল্ রাশিয়ান মায়ের কথার উত্তরে বলিল, "তুমিও পার মা এমনি ভালবাসতে। কাছের যারা তাদের সবাই ভালবাসে। কিন্তু হৃদয় যাদের বড়—দূরও তাদের কাছে নিকট। তুমি জানো না কতখানি মাতৃত্ব তোমার হৃদয়টুকু জুড়ে আছে।"

"তাই যেন হয়, আমি যেন এই রকম ভাবে সকলকে ভালবেসে একদিন এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারি। মাঝে-মাঝে আমার মনে হয় যে হয়ত তোকে আমি আমার পাভেলের চেয়েও ভালবাসি। পাভেল কি-এক রকমের! কোন দিন কোন কথা সে আমাকে বলে না। শুনলাম সে শাশাকে বিয়ে করতে চায়—অথচ আমাকে একবারও জানায়নি।"

লিটল্ রাশিয়ান বাধা দিয়া বলিল, "কে তোমাকে বললে সে বিয়ে করতে চায়? অবশ্য এ-কথা ঠিক যে, তারা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে, কিন্তু শাশাকা চাইলেও পাভেল কিছুতেই বিয়ে করবে না—কখনই না।"

পুত্রের এই কঠোর জীবন-সাধনার গর্ব্বে মায়ের

অভিমান-আহত অন্তর সকল ব্যথা ভুলিয়া বলিয়া উঠিল, "এই দেখ, তোরা কি আশ্চর্য্য রকমের লোক! আপনাদের তোরা কি রকম করে বিকিয়ে দিয়েছিস!"

"পাভেলের কথা বলো না মা! জগতে সে এক অসাধারণ লোক! লোহা দিয়ে তার বুক তৈরী!"

আবার মায়ের অন্তরে দুলিয়া উঠে কথার তরঙ্গ। বলেন, আজ দেখি হঠাৎ যেন সব বদলে গেছে। সকলে সকলকে অন্য ভাবে দেখতে শিখেছে। মনের আজ চোখ ফুটেছে। সে চোখ মেলে আজ যেন নতুন করে এই পুরানো পৃথিবীটাকে দেখছে—দেখছে আর একই সঙ্গে তার হচ্ছে আনন্দ আর বিষাদ। আজ আমি অনেক জিনিস বুঝি, তবুও মনে হয়, অনেক জিনিস এখনো বোঝবার বাকি পড়ে রয়েছে। কিন্তু আমি তোদের বুঝেছি। বুঝেছি তোরা দুঃখী মানুষদের জন্যে এই দারুণ দুঃখের জীবন আপনা থেকে বেছে নিয়েছিস্। যে সত্যের জন্যে তোরা আজ মাথায় বজ্র নিয়ে দাঁড়িয়েছিস্ তাও বুঝি। বুঝি যতদিন পৃথিবীতে একদল লোক থাকবে, যারা শুধু টাকা জমিয়ে রাখবে—আর একদল লোক শুধু দু'মুঠো অন্নের জন্য উদয়াস্ত খেটে মরবে, ততদিন পৃথিবীতে শান্তি আর কেউ পাবে না। এক একদিন রাত্রিবেলায় যখন হঠাৎ এই সব মনে পড়ে, তখন আমার অতীত জীবনের কথা আপনা থেকে মনে ভেসে ওঠে—দেখি, আমার সমস্ত শক্তি পথের কাদার মত কে মাড়িয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে—আমার এই বুককে কে ছেঁড়া নেকড়ার মত টুক্‌রো টুক্‌রো করে দিয়েছে। সেই পেছনের দিকে চেয়ে আজকের এই সব কথা মিলিয়ে দেখলে—তৃপ্তি পাই। মনে হয় জীবনের আর একটা আলাদা রূপ আছে।"

অতি নিম্নস্বরে লিটল্ রাশিয়ান বলিয়া উঠিল, "ঠিক কথা মা, ঠিক কথা!"

"ঠিক কি-না জানি না। আমি যে আজ কি বলছি তা আমি নিজেই ভাল করে বুঝি না। সারা জীবন আমি চুপ করে কাটিয়ে দিয়ে এসেছি। আমি যে বেঁচে আছি, প্রাণপণে সবার কাছে থেকে সেই কথাই লুকিয়ে এসেছি। আজ কেন মনে হয়, সব জিনিষের সঙ্গে আমার একটা সম্বন্ধ আছে—সকলের জন্যে আমার দুঃখ হয়, মনে হয় সকলকে ভালবাসি।"

উত্তেজনায় তখন মায়ের সর্ব্বদেহ কাঁপিতেছিল। ছোট ছেলের মত মায়ের হাত দুখানি লইয়া লিটল্ রাশিয়ান নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিল, "আচ্ছা মা, একটা কথা বলি, তুমি যদি নিকোলেকে আমাদের মত ভালবাস, তাহলে বড় ভাল হয়। আমাদের মধ্যে ওর সব চেয়ে দরকার তোমার স্নেহের। চুরি করে বাপ প্রায়ই জেলে আটক থাকেন। জেলে ও যে-ঘরে আটক ছিল তার জানালা থেকে ওর বাপ যে-ঘরে আটক আছে তা দেখা যায়। মাঝে মাঝে দুজনের চোখাচোখি হতো। সেই অবস্থায় জেলে বসেও বাপ তাকে উদ্দেশ করে গালাগাল দিতো। লোকটা ইঁদুর, বেড়াল, কুকুর—এই সব ভালবাসে কিন্তু নিজের ছেলেকে একদম দেখতে পারে না।"

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আপনার মনে বলিয়া উঠিলেন, "মা-টা গেল পালিয়ে, বাপ রইলেন মদ আর চুরি নিয়ে।"

লিটল্ রাশিয়ান বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার মাথার শিয়রে দাঁড়াইয়া বুকের উপর হাত রাখিয়া নিঃশব্দে মন্ত্র পড়িয়া মা আপনার শয্যায় গেলেন।

পরের দিন সকাল বেলা যথারীতি মাল-পত্র লইয়া মা কারখানার ফটকে উপস্থিত হইতেই পুলিশের লোক আগাইয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "দাঁড়া!"

জিনিস-পত্র নামাইয়া রাখিয়া মা দাঁড়াইলেন। প্রহরীরা আসিয়া থালা-বাসন নাড়িয়া ভাল করিয়া দেখিল। একজন পিঠে ও ঘাড়ে টোকা মারিয়া দেখিল।

"আমার খাবার যে সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল, ছেড়ে দে বাবা আমাকে!"

কিছু অনুসন্ধানে মিলিল না দেখিয়া বিজ্ঞের মত একজন পুলিশের লোক বলিল, "আমি বলছি, পেছনের পাঁচিল থেকে বইগুলো ছুঁড়ে দিয়েছে!"

বৃদ্ধ সিজব মায়ের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া চাপা গলায় বলিল, "শুনেছ নিলোভ্‌না?"

"কি?"

"আবার সেই সব বই দেখা দিয়েছে! রুটিতে যেমন করে চিনি ছড়িয়ে দেয় তেমনি করে আবার কারা সেই সব বই কারখানার ভেতরে ছড়িয়ে দিয়ে গেছে! মিছিমিছি কতকগুলো নিরীহ লোককে ধরে জেলে রেখে দিলে! আমার ভাইপোটাকে ধরে নিয়ে গেছে—তোমার ছেলেকে তো নিয়েছেই। কই, তাতেও তো এ সব বন্ধ হলো না! স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এ তাদের কাজ নয়!"

মায়ের নিকট অগ্রসর হইয়া সিজব বিজ্ঞের মত দাড়ি নাড়িয়া বলিল, "লোক ধরে কি করবি? আসল ব্যাপার তো লোক নয়—এসেছে নতুন মন! নতুন

তার ভাবনা! মানুষের ভাবনাকে তো আর মশা-মাছির মত ধরা যায় না!"

কারখানার ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, একদিনে কারখানার ভিতরকার আবহাওয়া বদলাইয়া গিয়াছে। মজুররা চারিদিকে জটলা করিয়া উত্তেজিত ভাবে কি সব বলাবলি করিতেছে। পুলিশের লোক দেখিলেই চুপ হইয়া যাইতেছে। কর্তৃপক্ষদের মুখ গম্ভীর হইয়া গিয়াছে—তাহারা অনবরত পুলিশের লোকের সঙ্গে কি কথা বলিতেছে। সকলের চেয়ে একটা বিষয়ে মায়ের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে পড়িল—মজুরেরা যথাসম্ভব সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া কারখানায় আসিয়াছে!

দূরে আইভান ও ভাসিলির মূর্ত্তি দেখা দিল। মা হাঁকিলেন, চাই গরম ঝোল আর টাটকা মাংসের রোষ্ট চাই-ই—

হাসিতে হাসিতে আইভান মায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, "আজকে গরম গরম কিছু আছে নাকি? কালকের গুলো বেশ ছিল।"

আনন্দে মায়ের শত-রেখাঙ্কিত মুখ বিকশিত হইয়া ওঠে। আইভান আজ 'আপনি' বলিয়া মায়ের সঙ্গে কথা বলিতেছিল। মায়ের কাছে আগাইয়া আসিয়া চুপি চুপি আইভান বলে, "দেখছেন, কি রকম একদিনে সব বদলে গেছে! ওষুধ ধরেছে!"

দূরে তিন জন মজুর দাঁড়াইয়া একটু উচ্চৈঃস্বরে আলোচনা করিতেছিল! একজন দুঃখ করিয়া বলিতেছিল, "আমি একখানাও দেখতে পেলাম না—বড় আফসোসের কথা!"

দ্বিতীয় ব্যক্তিটি বলিতেছিল, "তুই তো দেখতে পেলি না—আমি দেখতে পেলেই বা কি করতাম—আমি তো আর লেখাপড়া জানি না!"

তৃতীয় ব্যক্তিটি একবার চারিদিক চাহিয়া বলিল, "দেখ, একটা কাজ করা যাক্! চল আমরা বয়লার ঘরে যাই! সেখানে এখন কেউ নেই। সেখানে আমি তোদের পড়ে শোনাব। আমি একখানা বুকের ভেতর লুকিয়ে রেখেছি।"

মা সমস্তই শুনিলেন। বুঝিলেন মানুষের লিখিত ভাষার কি মূল্য! চক্ষুর সম্মুখে দেখিলেন, চাকা ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সেদিন বাড়ী ফিরিয়াই অন্তরের পরিপূর্ণ আনন্দে মা লিটল্ রাশিয়ানকে ডাকিয়া বলিলেন, "কারখানার কতকগুলো লোক দুঃখু করছিলো তারা পড়তে জানে না। আমি এককালে একটু-আধটু পড়তে জানতাম—কিন্তু আজ বোধ হয় সব ভুলে গেছি!"

কালবিলম্ব না করিয়াই লিটল্ রাশিয়ান বলিয়া, "আজ থেকেই আবার তাহলে শিখতে আরম্ভ করে দাও না কেন!"

এই বয়সে? হাঁ রে, আমার সঙ্গেও তুই ঠাট্টা করলি?"

বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া টেবিল হইতে একখানি বই লইয়া গম্ভীর মুখে একটা অক্ষরের উপর আঙুল দিয়া লিটল্ রাশিয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা বল তো এ অক্ষরটা কি?"

"এ—A।"

"আর এটা?"

মা হাসিয়া বলিলেন—"আর (R)।"

মা কিন্তু মনে মনে লজ্জিত হইয়া উঠিতেছিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল লিটল্ রাশিয়ান যেন তাঁহাকে লইয়া একটু দুষ্টুমি করিতেছে। কিন্তু তাহার শান্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া মায়ের সে ধারণা বদলাইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যি সত্যিই এই বুড়ো বয়সে তুই আমাকে লেখাপড়া শেখাতে চাস্?"

"নিশ্চয়ই! একদিন যখন পড়তে শিখেছিলে, তখন নিশ্চয়ই একটু চেষ্টা করলেই পারবে। এতে ভোজবাজী কিছু নেই আর যদিই বা থাকে তা তো ভালই!"

"কিন্তু কথায় যে বলে ঠাকুরের দিকে চেয়ে থাকলেই সাধু হওয়া যায় না!"

"মা! কথায় কি না বলে? ধর, লোকে যে কথায় কথায় ছড়া কাটে, যত কম জানবে, তত মজাতে ঘুমুবে—সেটা কি ঠিক! যারা পেট দিয়ে ভাবে, তারাই এই সব ছড়া মানে। কেন না, তাদের পেট চায় মনকে লাগাম দিয়ে রাখতে কিন্তু মন কি লাগাম মানে? আচ্ছা, এটা বলো তো কি?"

"এস (S)।"

"দেখ দেখি, কেমন সহজেই মনে পড়ছে—আর এটা?"

ঝুলিয়া-পড়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অতীতের বিস্মৃতির গর্ভ হইতে এই সমস্ত একদিনের পরিচিত অক্ষরগুলির নাম মনে করিতে দৃষ্টিপীড়া ঘটিতেছিল। প্রথমে সেই জন্য মায়ের চোখে জল দেখা দিল। তারপর কখন হৃদয়ের অশ্রুধারা তাহার সহিত মিশিয়া সমস্ত দৃষ্টিকে ঝাপসা করিয়া দিল। মা কাঁদিয়া ফেলিলেন।

"জীবনের পাঠ আজ শেষ হয়ে এলো আর এখন আমি বসেছি বর্ণ-পরিচয় নিয়ে!"

মাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য লিটল্ রাশিয়ান বলিল,

"কিন্তু সে তো তোমার দোষ নয় মা। তুমি তো আজ বুঝেছ যে কি জীবন তুমি যাপন করতে কিন্তু আজও হাজার লোক আছে যারা সেই রকম জীবনই যাপন করে অথচ তারা তার গর্ব্ব করে। তাদের জীবনে কি লাভ? আজকে কোন রকমে কাজ সারা হল, তারা খেলো আর ঘুমুলো, কাল এলো, কোনো রকমে কাজ সারলো, খেলো আবার ঘুমুলো! এমনি করে তারা চলেছে বছরের পর বছর—খাওয়া আর - টা, খাটা আর খাওয়া। তারপর এলো ছেলেমেয়েদের দল! প্রথম তাদের একটু ভালো লাগলো। তারপর তারা এত খেতে আরম্ভ করলো যে, তাদের ধরে ধরে পাঠালো খাটতে। এমনি করে তারাও চললো খাওয়া আর খাটা, খাটা আর খাওয়া নিয়ে। জীবনে তাদের এক মুহূর্ত্তের জন্যেও আনন্দের সেই অপূর্ব্ব ক্ষণ আসে না, যা নিমেষে দেয় বুককে দুলিয়ে। কেউ বেঁচে থাকে ভিখারির মত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চেয়ে; কেউ বা থাকে চোর হয়ে—এর-তার জিনিষ ছিনিয়ে নিয়ে। এই সব মানুষের মধ্যে সে-ই আসল মানুষ যার সাহস আছে, মনের আর দেহের—এই সব শেকল ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে। সেই মানুষ তুমি মা, চলেছ সেই শেকল ছিঁড়তে। কিসের তোমার বাধা?"

"আমি? আমি—এই বয়সে?"

"কেন না? মানুষের এক ফোঁটা চেষ্টা ব্যর্থ হয় না। বৃষ্টির বিন্দুর মত সে কোথায় কোন্ বীজকে ফুটিয়ে তোলে গোপনে! তারপর যখন তুমি পড়তে শিখবে—"

সহসা কথা বলিতে বলিতে সে আপনার মনে হাসিয়া উঠিল। তারপর ঘরের এ-কোণ ও-কোণ পর্য্যন্ত লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া পায়চারি করিতে করিতে সে আবার বলিল—"তোমাকে লেখাপড়া শিখতেই হবে। পাভেল ফিরে এসে তোমাকে দেখে অবাক হয়ে যাবে, কেমন হবে বলো তো?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মা বলিলেন, "পাগলা ছেলে আমার, তোরা কি বুঝবি, এই বুড়ো বয়সের কি গ্লানি! তোদের এখন সবই সম্ভব। বয়স কখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে আমার, কখন শেষ হয়ে গেছে মনের শেষ শক্তিটুকু, এখন এই অবেলায়—"

সন্ধ্যা বেলা কার্য্যান্তরে লিটল্ রাশিয়ান চলিয়া গেল। মা একেলা বসিয়া আছেন—এমন সময় দরজায় কে ধাক্কা দিল।

উঠিয়া দরজা খুলিবার পূর্ব্বে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?"

"আমি রাইবিন!"

দরজা খুলিতেই গম্ভীর ভাবে রাইবিন ঘরে প্রবেশ করিয়া ততোধিক গম্ভীর ভাবে বলিল, "একদিন আপনি এই ঘরে বিনা পরিচয়ে বহু লোককে আসতে-যেতে দিতেন—আজ আর পরিচয় দিয়ে ঢুকবো কেন? আর কেউ নেই এখানে?"

-"না।"

"ওঃ! আমি ভেবেছিলাম এখানে হয়ত লিটল্ রাশিয়ানের দেখা পাবো। তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। দেখলুম, জেলখানা মানুষকে নষ্ট করতে পারে না। মানুষকে নষ্ট করে—তার নিজের গড়া বোকামি।"

রাইবিনের এই সব গম্ভীর কঠোর কথা মায়ের ভাল লাগিত না। তাহার কণ্ঠস্বর, কথার ভঙ্গী এবং সর্ব্ববিষয়ে একটা বিতৃষ্ণা আর রাগ—মায়ের মনে তাঁহার স্বামীর পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগাইয়া তুলিত। তিনিও ছিলেন এই রকম কঠোর, রুক্ষ, সবার উপর ক্রুদ্ধ, কিন্তু অধিকাংশ সময় মৌনী। এই লোকটার সে সমস্ত স্বভাবই আছে, প্রভেদ শুধু কথা কয় বেশী। কিছু না কিছু প্রতিবাদ করার তাগিদ যেন তাহার মনে সর্ব্বদাই জাগ্রত রহিয়াছে।

মায়ের কাছে বসিয়া সে বলিয়া চলিল, "একলা আছেন, আসুন একটু কথা বলা যাক। একটা দরকারী কথা আপনাকে বলা প্রয়োজন। আমি মনে মনে একটা মতলব তৈরী করেছি।"

রাইবিনের কথা শুনিয়া মা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। রাইবিন তেমনি কঠোর রুক্ষ স্বরে বলিয়া চলিল, "এ জগতে টাকা না হলে কিছু হয় না। জন্মাতেও টাকা দরকার, মরতেও টাকা দরকার। বই ছড়াতেও টাকা লাগে। কিন্তু এ সব টাকা আসে কোত্থেকে?"

রাইবিনের প্রশ্নের ভঙ্গীতে মা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। কোনও অজানা বিপদের আশঙ্কায় তিনি রাইবিনের মুখের দিকে চাহিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "সে আমি কি করে জানবো?"

"আমিও কি জানি ছাই। আমার আর একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার আছে। এ সমস্ত বই লেখে কে? নিশ্চয়ই শিক্ষিত লোকেরা—আমাদের মনিব-শ্রেণীর লোকেরা। তারাই এই সমস্ত বই লিখে আমাদের ছড়াতে দেয়। কিন্তু মজার ব্যাপার, তারা পয়সা খরচ করে যে-সমস্ত বই লেখে, তাতে তাদেরই বিরুদ্ধে সমস্ত লেখা থাকে। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, তারা কেন পয়সা খরচ করে নিজেদের ক্ষতি নিজেরা করে?"

এ ধরনের কোনও কথাবার্ত্তা মা আজ পর্য্যন্ত শুনেন নাই। তিনি বিহ্বলের মত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি তো কিছুই জানি না। তোমার কি মনে হয়, তাই বল আমি শুনি।"

"হুঁ! আমারও মনে যখন এই প্রশ্ন মাথা তুলে উঠেছিল, তখন আমিও এই রকম বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। সর্ব্ব শরীরের ভেতর দিয়ে যেন বরফের তরঙ্গ বয়ে গেল—"

"কিন্তু তুমি কি বলতে চাও? কি তোমার মনে হয় বলো।"

"সব জোচ্চুরি! ধাপ্পাবাজি! আমি ঠিক কিছুই জানি না বটে কিন্তু আমার মনে হয় এ সব আমাদের প্রভুদের ধাপ্পাবাজি। নিশ্চয়ই প্রভুরা কোনও নূতন প্যাঁচে আমাদের ফেলবার চেষ্টায় আছেন। এই প্যাঁচের হাত থেকেই তো আজ মুক্ত হতে চাই—সেই জন্যেই তো চাই সত্য! আর আমি বুঝি একমাত্র সেই সত্যকেই। দয়াময় প্রভুদের প্যাঁচে পড়তে আমি চাই না। কোন্ দিন দেখবো যে তাঁরাই আমাদের কোণঠাসা করে ফেলেছেন আর আমাদের হাড়ের ওপর দিয়ে চলেছেন তাঁদের ঈপ্সিত পথে যেমন করে মানুষ চলে সাঁকোর ওপর দিয়ে।"

এত দিন যে-সমস্ত কথা মা শুনিয়া আসিয়াছেন সহসা রাইবিনের এই কথায় সমস্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। কোন কিছু বুঝিতে পারার যেটুকু আনন্দ মা অন্তরে সঞ্চিত করিয়াছিলেন, সহসা যেন তাহা নিঃশেষিত হইয়া গেল। বেদনায় তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "তবে, তবে কি হবে? পাভেলও কি বোঝে না এ সব? এই কি সত্যি? না, না, মানুষের জীবন নিয়ে শিক্ষিত লোকেরা কখনও এ রকম জঘন্য খেলা খেলতে পারে না।"

"আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। যারা সাক্ষাৎ ভাবে এই আন্দোলন চালাচ্ছে তারা হয়ত সত্যি বলেই এ সমস্ত বিশ্বাস করে। কিন্তু তাদেরও পেছনে আর একদল লোক হয়ত আছে, যারা নিশ্চিত মনে এই সব কল ঘোরাচ্ছে।"

দীর্ঘ শতাব্দীর পুঞ্জীভূত সন্দেহে বলিষ্ঠ সেই প্রৌঢ় কৃষকের অন্তর একান্ত আত্মনির্ভরের সহিত গাজিয়া উঠিল, "না, না মনিবদের সঙ্গে কোনও সংস্পর্শে কোনও কল্যাণ আসবে না, আসতে পারে না।"

উদ্বেগে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে তুমি কি করতে চাও?"

"আমি? আমি চাই প্রথমত মনিবদের আওতা থেকে সকল রকমে দূরে থাকতে। আমি এখান থেকে এই শহর থেকে দূরে চলে যাব রুশিয়ার গ্রামে গ্রামান্তরে। আমার মন চেয়েছিল এদের দলে মিশে এদের সঙ্গে কাজ করতে। আর আমি কাজও করতে পারি অনেক। লিখতে জানি, পড়তেও জানি, সবার ওপরে জানি লোকে কি চায়। কিন্তু তবুও এই দল ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হবে। আমি এ সমস্ত কিছুই বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না—তাই আমি চলে যেতে চাই। আমি জানি, গাঁয়ের লোকেরা একেবারে অন্ধকারে ডুবে আছে—সব স্বার্থপর পাজী বদমায়েস! জানি, জীবনে পেট ভরে তারা খেতে পায় না। তাই নিজেদের কামড়াকামড়ি করে খায়—তবু আমি যাব তাদের মধ্যে। কেউ যদি সঙ্গে না যায়, একলা যাব। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে জাগিয়ে তুলবো তাদের। বলবো তাদের মুক্তি-সংগ্রামেব ভাব তাদেরই নিজের হাতে নিতে হবে! তারা এগিয়ে আসুক, তারা বুঝুক! তাহলেই একটা পথ আপনা হতে একদিন বেরিয়ে পড়বে। তাদেব মুক্তির আর কোনও পথ নেই, তাদের কল্যাণের আর কোনও পন্থা নেই! আর আমার মনে হয়, এইটিই একমাত্র সত্য।"

স্তম্ভিত ভাবে মা বলিলেন, "তখনি তোমাকে তারা গ্রেফতার করে ধরে রেখে দেবে!"

"জেলে যাব, আবার বেরিয়ে এসে তাদের দলের সামনে এসে দাঁড়াব, আবার যাব—"

"যাদের দরজায় দরজায় ঘুরবে সেই কৃষকরাই তোমাকে মারবে।"

"হয়ত তারা তাই করবে। একবার, দু'বার, তিন বার তাই করবে। তারপর তারাও একদিন বুঝবে যে, আমার সঙ্গে ও রকম ব্যবহার করা ঠিক হচ্ছে না। ক্রমশ তারাই আমার কথা শুনতে শিখবে। তাদের বলবো, আমি যা বলছি, ইচ্ছে না যায় ত বিশ্বাস করো না, কিন্তু যা বলি তা শোন।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিষ্ঠ দেহখানি একবার দোলাইয়া বলিয়া উঠিল, "এতে আমার নিজের কোনও আনন্দ নেই। বহুদিন এখানে কাটালাম, অনেক কিছুই দেখলাম, শিখলাম। এখন মনে হচ্ছে—যা কিছু শিখেছি, যা কিছু বুঝেছি সে শুধু নিজের মনের ভেতর পুষেই রেখেছি! নিয়ত মনে হয়, যে শিশুকে জন্ম দিয়েছি—তাকে খেতে না দিতে পেরে মেরে ফেলেছি।"

একান্ত সকরুণ ভাবে চাহিয়া মা বলেন, "তুমি মরবে রাইবিন!"

"আপনি জানেন, বাইবেলে যীশুখৃষ্ট বীজ সম্বন্ধে কি বলেছেন? বলেছেন, তোর মৃত্যু নেই; আর একদিন আবার তুই নবজন্ম লাভ করবি। আচ্ছা, অনেকক্ষণ বকলাম—এখন যাই হোটেলে গিয়ে একটু আড্ডা দি। লিটল্ রাশিয়ান এলে আমার কথা বলবেন—বলবেন আমি কালই চলে যাব। বিদায়!"

রাইবিন চলিয়া গেল! দরজা বন্ধ করিয়া মা ঘরের মধ্যে নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঘরের চারিদিকে শুধু অন্ধকার, আর অন্ধকার। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আপনা হইতে মা বলিয়া উঠিলেন, "চিরদিনই আমি রইলাম এমনি অন্ধকার রাত্রির মধ্যে।"

গভীর রাত্রে লিটল্ রাশিয়ান ফিরিয়া আসিল। মা তাহাকে রাইবিনের কথা সমস্ত বলিলেন।

"ভালই তো! যাক্ না সে গ্রামে গ্রামে! সেখানে জাগিয়ে তুলুক সত্যের অমর বাণী; এখানে তার ভালো লাগলো না!"

"কিন্তু সে যে-সমস্ত কথা বলছিলো, যাদের কথায় তোরা চলছিস্ তারাই তোদের ঠকাচ্ছে।"

"আসল কথা কি জানো মা, টাকা! টাকার যে কি অভাব তা আর কি বলবো! এক রকম বলতে গেলে আমাদের এই দল পরের দয়ার ওপর বেঁচে আছে! ধরো, নিকোলয় আইভানোভিচ মাসে পঁচাত্তর রুবল উপায় করে, কিন্তু তার মধ্য থেকে আমাদের পঞ্চাশ রুবল দেয়। আরও অনেকে এই রকম করে আমাদের দলটিকে কোনও রকমে বাঁচিয়ে রেখেছে! দরিদ্র ছাত্রেরা না খেয়ে দিনের পর দিন পয়সা জমিয়ে আমাদের কিছু কিছু পাঠায়। মাঝে মাঝে প্রভুদের কাছ থেকেও সুবিধে পেলেই সাহায্য নিতে হয়! আমাদের উপরওয়ালাদের মধ্যেও আবার অনেক শ্রেণী-বিভাগ আছে! তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের দিয়ে তাদেরই কাজ পরোক্ষ ভাবে গুছিয়ে নেবার চেষ্টায় যে না আছেন, তা নয়! কেউ কেউ আবার আমাদের ফাঁদে ফেলবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে, যারা শেষ পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে চলবে।"

লিটল্ রাশিয়ানের সহজ ও প্রাণভরা কথা মায়ের শুনিতে বড় ভাল লাগিত। তাহার কথা শুনিলেই মায়ের বিশ্বাস হইত যে, নিশ্চয়ই অদূর ভবিষ্যতে কোনও কল্যাণ তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে এবং সমস্তই নির্দ্ধারিত পথে চলিয়াছে।

লিটল্ রাশিয়ান আপনার আবেগে বলিয়া চলিল, "কি জানো মা, মাঝে মাঝে মনে একটা অদ্ভুত ভাব আসে। মনে হয় যে, এই বিশ্বশুদ্ধ লোককে আঁকড়ে ধরি। মনে হয় যত দূরে যাই, যেখানেই যাই, সেখানেই আছে অন্তরের মিতা। জগতে যেন সবাই সবার বন্ধু, সবারই অন্তরে একই আলোক-শিখা জলছে। কারুর সঙ্গে কারুর দেখা নেই, কোনও কথার পরিচয় নেই, তবুও মনে হয়, সবাই যেন সবাইকে জানে, বোঝে। দুর্জ্জেয় পাহাড়ের বুক থেকে পরিচয়হীন কত ঝরণা বেরিয়ে প্রান্তরে এসে নদীর জলে মেশে; কত বিভিন্ন তট দিয়ে সেই সব নদী আবার এক বিরাট মহা সমুদ্রে এসে এক হয়ে মিশে যায়। তেমনি আমাদের সকলের হৃদয় থেকে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন সুর জেগে উঠছে। কারুর সঙ্গে কারুর পরিচয় নেই কিন্তু একদিন দেখবো সেই সমস্ত সুরের ধারা কখন অপরিচয়ের ব্যবধান ঘুচিয়ে এক মহা প্রাণ-সমুদ্রে এসে মিশেছে। যখন মনে হয় যে, কোনও একদিন এই মহা-আদর্শ সম্ভব হয়ে উঠবে তখন আনন্দে অধীর হয়ে উঠি। এত আনন্দ হয় যে, আপনা থেকে কেঁদে ফেলি।"

মা নিশ্চল হইয়া তাহার কথা শুনিতেছিলেন—পাছে কোনও রকমে বাধা পায় বলিয়া মা জোরে নিশ্বাস পর্য্যন্ত ফেলিতে ছিলেন না। লিটল্ রাশিয়ানের কথা শুনিতে তাঁহার ভাল লাগিত এবং সর্ব্ব-মন-প্রাণ দিয়া তিনি তাহার কথা শুনিতেন—শুনিতে শুনিতে মনে হইত, তাঁহারই হৃদয়ের মূক অংশ যেন আজ ঐ যুবক শিশুর কথায় জাগিয়া উঠিয়া কথা কহিতেছে। একদিন সারা পৃথিবীতে মানুষ একসঙ্গে ছুটি পাইবে সকল বেদনার বন্ধন হইতে, সকল অতৃপ্তির অশান্তি হইতে, সকল দৈন্যের প্রাণঘাতী লজ্জা হইতে! পৃথিবীব্যাপী এই মহামহোৎসবের কাহিনীর মধ্যে মা যেন জীবনের একটা সুসঙ্গত অর্থ খুঁজিয়া পাইতেন।

লিটল্ রাশিয়ান বলিয়া চলিল, "কিন্তু এই কল্পনা থেকে জেগে উঠে যখন চারিদিকের পৃথিবীকে দেখি, দেখি চারিদিকে পাঁকের পোকার মত মানুষ গ্লানিতে ডুবে আছে—সবাই বিরক্ত, ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত্ত—রাস্তার কাদার মত মানুষ জীবন-পথে পড়ে রয়েছে, উদাসীন পথিক দু'পায়ে চটকে চলেছে—মনে অবিশ্বাস আসে, ঘোরতর সন্দেহ জাগে—এই মানুষ? দুঃখের বিষয়, মনে আঘাত লাগলেও, এই মানুষকেই করতে হবে অবিশ্বাস, এই মানুষকেই করতে হবে ঘৃণা। ভালবাসতে প্রাণ চায়—কিন্তু ভালবাসব কাকে? বনের পশুর মত যে মানুষ বারে বারে তোমাকে অপমান করে, তোমার আত্মাকে অপমান করে, তোমার মানুষের

বুকে তুলে দেয় পা, তাকে ক্ষমা করা যায়? তাকে ক্ষমা করা উচিত নয়! অপমানকে প্রশ্রয় দেওয়া মহাপাতক। বিশেষ কিছু ক্ষতি করলো না, মনে করে—আজ আমি যদি অপমানিত হয়ে কোনও প্রতিকার না করি, তাহলে কাল সেই অপমানকারী পরমোৎসাহে আবার আর একজনকে অপমান করবে। এমন করে অপমানের ধারা বয়েই চলবে—সেই জন্যই মানুষের বিচারে শ্রেণী-বিভাগ এসেই পড়ে—"

তিন বার মা পুত্রের সঙ্গে কারাগারে দেখা করিবার চেষ্টা করেন কিন্তু তিন বারই ব্যর্থ-মনোরথ হন। অবশেষে একদিন পুত্রের সহিত সাক্ষাৎকারের অনুমতি পাইয়া তিনি জেলখানার দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, তাঁহারই মত আরও বহু লোক সমবেত—সবাই বিমর্ষ, বিরক্ত! জেলের প্রহরী একে একে নাম ধরিয়া ডাকিতেছে এবং এক একজন করিয়া গিয়া দেখা করিয়া আসিতেছে। অবশেষে একটি মোটা পুলিশ কর্ম্মচারী আসিয়া মাকে ডাকিয়া জেলের ভিতরে লইয়া গেল।

একটি ক্ষুদ্র আধ-অন্ধকার ঘরে কয়েদীর বেশে পুত্রকে দেখিয়াই মা কেমন বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কথা বলিতে গিয়া সহসা কোনও কথা না আসায় মৃদু হাসিয়া ফেলিলেন। অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "কেমন আছিস্ পাভেল,—"

পাভেল মায়ের হাত ধরিয়া বলিল, "ও রকম করো না মা, আমি তো বেশ ভালই আছি।"

এমন সময় প্রহরী জানাইল, "দেখ মেয়ে, অত কাছাকাছি দাঁড়ালে তো চলবে না—একটু সরে দাঁড়িয়ে কথা বল।"

মা প্রহরীর মুখের দিকে চাহিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। সাধারণ স্বাস্থ্যালাপের পর মা সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কত দিন তোকে জেলে রাখবে? জানি না কেন যে ওরা তোকে জেলে রেখেছে! সেই সব বই কাগজপত্র তো তেমনি আবার কারখানায় কারা ছড়াচ্ছে!"

সহসা পাভেলের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, "তাই নাকি? সত্যি?"

প্রহরী গর্জিয়া উঠিল "ওসব কথার আলোচনা এখানে চলবে না! শুধু ঘর-সংসারের কথা ছাড়া আর অন্য কোনও কথা বলার হুকুম নেই।"

"আচ্ছা তাই হবে। ঘরের কথাই জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি করো মা?"

মা সহসা বলিয়া উঠিলেন—"আমিই এই সব কারখানায় নিয়ে যাই—এই মাংস, খাবার, মেরিয়ানার বদলে আরো অনেক জিনিস।"

মায়ের চোখের দিকে চাহিয়া পাভেল ব্যাপার বুঝিল। আনন্দের উচ্ছ্বাসে তাহার বুক স্ফীত হইয়া উঠিল। কোনও রকমে জোর করিয়া উচ্ছ্বাস রুদ্ধ করিয়া পাভেল বলিল, "আমার মা-মণি! ভাল, যা-হোক একটা কাজ পেয়েছ—তেমন একলা বোধ হয় না তো?"

প্রহরীর সাবধানতা ভুলিয়া মা বলিয়া ফেলিলেন, "কারখানার কাগজ বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে তারা আমার ঘরও সার্চ্চ করে।"

প্রহরী গর্জ্জিয়া উঠিল, "আবার সেই কথা!"

"আচ্ছা মা, ও কথা আর তুলো না!"

এমন সময় ঘড়ি দেখিয়া প্রহরী জানাইল, "সময় হয়ে গেছে।"

চলিয়া যাইবার সময় পাভেল মাকে আলিঙ্গন করিতেই মায়ের চোখ দিয়া নিরুদ্ধ অশ্রুর বন্যা নামিয়া আসিল।

বাড়ীতে আসিয়া মা লিটল্ রাশিয়ানকে সকল কথা বলিলেন। তাহার তিন দিন পরে একদিন সন্ধ্যা বেলায় লিটল্ রাশিয়ান ও মা গল্প করিতেছিলেন—এমন সময়, মুখে বসন্তের দাগ লইয়া নিকোলে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঝড়ের মত অন্ধকার মুখ, যেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উপর সে রাগিয়া গিয়াছে।

ঘরে প্রবেশ করিয়াই সে বলিল, "সোজা জেল থেকে আসছি। পথে যেতে দেখলাম তোমাদের এখানে আলো জ্বলছে—তাই ঢুকে পড়লাম!"

আগে মা নিকোলেকে দেখিতে পারিতেন না। তাহার কথাবার্ত্তা, ভাবভঙ্গী, মুখের চেহারা দেখিলেই মায়ের কেমন ভয় হইত—হঠাৎ হিংস্র জন্তুকে সামনাসামনি দেখিলে পথিক যেমন আতঙ্কিত হইয়া ওঠে। কিন্তু আজ তাঁহার নিকোলেকেও ভাল লাগিল। আদর করিয়া লিটল্ রাশিয়ানের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "দেখছিস্ এণ্ড্রাসা, নিকোলে কি রকম রোগা হয়ে গেছে! হাঁ রে, পাভেল যে এখনও ছাড়া পেলো না!"

"ছাড়া তো পায়নি দেখছি! আমাকেই যে কেন ছাড়লো, তাও ঠিক জানি না। একদিন একেবারে ক্ষেপে গিয়ে ওয়ার্ডারকে বললাম, আমাকে ছেড়ে দাও বলছি, নইলে এখানে আমি একটা খুন করে বসবো, হয়ত বা নিজেকেই খুন করবো! পরের দিন দেখি তারা আমাকে ছেড়ে দিয়েছে।"

লিটল্ রাশিয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "ফিডিয়া কেমন আছে? সেখানে বসে এখনও কবিতা লিখছে?"

"ওই, ওকে আমি একদম বুঝতে পারি না। খাঁচার ভেতর তাকে পুরে রেখেছে, তবুও সে গান গায়। আগে যাও বা কিছু বুঝতাম এখন আর কিছুই বুঝতে পারছি না। শুধু এইটুকু বুঝছি যে, বাড়ীতে পা দিতে আর মন চাইছে না।"

সমবেদনায় মা বলিয়া উঠিলেন, "সত্যি ই তো, বাড়ী যেতে মন চাইবে কেন? সেখানে আছে কে? কেউ তো বসে নেই ওর জন্যে উনুন জ্বালিয়ে!"

পকেট হইতে একটা সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইয়া ধূমকুণ্ডলীর দিকে চাহিয়া নিকোলে উদাস কণ্ঠে বলিল, "বাড়ী! শূন্য ঘর পড়ে আছে, ঠাণ্ডা, হিম! বেশ দেখতে পাচ্ছি মেঝেতে আরসুলা সব ঠাণ্ডায় শাদা হয়ে গিয়ে গাদা গাদা পড়ে আছে—ইঁদুরগুলোও বোধ হয় দেখবো ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে মেঝেতেই পড়ে আছে। কোথায় যাব? আজকের রাত্তিরেব মত আমাকে এখানে শুতে দেবেন?"

মা তাড়াতাড়ি বলিলেন, "বাঃ, সে তোমায় বলতে হবে কেন? নিশ্চয়ই, তুমি এখানে শোবে।"

তারপর যে কি বলিতে হইবে, মা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। নিকোলে আপনার মনে বলিয়া চলিয়াছিল, "যে দিনকাল পড়েছে, ছেলেরা লজ্জায় আর বাপ-মাদের কথা উল্লেখ করতে চায় না!"

সহসা মা ক্ষুব্ধ হইয়া নিকোলের দিকে চাহিতেই সে নিজের উক্তি ব্যাখ্যা করিয়া বলিল, "আমি আপনার বা পাভেলের কথা বলছি না। আপনার পরিচয় দিতে পাভেল কোনও দিন লজ্জিত হবে না। আমি, আমার ও আমার মত যারা, তাদের কথাই বলছি। আমার বাবার নাম উচ্চারণ করতে আমার লজ্জা হয় আর সেই জন্যেই আমি কখনও আর ও-বাড়ীতে পদার্পণ করবো না। আমি জানবো, আমার বাপ নেই, মা নেই, ঘর নেই, পৃথিবীতে আমি একা! আমাকে পুলিশ নজরে নজরে রেখেছে, তা না হলে আমার ইচ্ছে —আমি স্বেচ্ছায় সাইবেরিয়ায় চলে যাই—সেখানে নির্বাসিতদের পালাবার ব্যবস্থা করবার অনেক কাজ আছে। তা যদি না হয়, তাহলে একটা জিনিষ প্রথম করা দরকার—"

উৎসুক হইয়া লিটল্ রাশিয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

"আমার মনে হয়, কতকগুলো লোককে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলা দরকার!"

"বটে? এই জীবন্ত মানুষকে খুন করবার অধিকার তুমি কোথা থেকে পেলে?"

"কেন, যাদের হত্যা করতে চাই, তারাই আমাকে সে অধিকার দিয়েছে। তারা যদি আমাকে লাথি মারে, আমারও অধিকার আছে তাদের লাথি মারবার! আমাকে ছুঁয়ো না, আমিও তোমাকে ছুঁতে চাই না। লোকালয় ছেড়ে দূরে চলে যাব—সেখানে কেউ আমাকে আঘাত করতে পারবে না, আমিও কাউকে আঘাত করবো না। সেখানে কোনও নির্জ্জন বনে এক নদীর ধারে গাছের শুকনো ডাল দিয়ে এক কুঁড়ে ঘর তৈরী করবো—সেইখানে থাকবো একলা—"

লিটল্ রাশিয়ান মাথা নাড়িয়া বলিল, "বেশ তো, তাই করো না কেন?"

"এখন তা করা অসম্ভব!"

"কেন?"

"এই যে-সমস্ত পাজী লোকদের থেকে দূরে যেতে চাইছি, আমি বেশ বুঝি, তারাই কেমন করে আমাকে টেনে রেখেছে তাদের সঙ্গে—মনে হয়, আমরণ তারা আমাকে এমনি আকর্ষণ করে রাখবে। ঘৃণার কাঁটা-বেড়া দিয়ে আমার সমস্ত মনকে তারা ঘিরে রেখেছে। মুক্তি নেই, আমি জানি মুক্তি নেই! আমি এই সমস্ত লোকদের ঘৃণা করি, সেই জন্যেই আমি তাদের ফেলে যেতে পারি না। তারা আমার জীবনকে কণ্টকিত করেছে—আমি কেন তাদের ভয়ে পালিয়ে যাব? আমিও পদে পদে তাদের জীবনকে বিষাক্ত করে তুলবো—ঐ গরমভ—কি বদমায়েস লোক! লুকিয়ে আমাদের সর্ব্বনাশ করছে, আমার বাবাকেও তার দলে নেবার ফিকিরে আছে—"

সহসা নিকোলে উঠিয়া দাঁড়াইল—তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল, যেন বিশ্বের সমস্ত লোক তাহার বিপক্ষে দাঁড়াইয়া তাহাকে আঘাত করিতে আসিতেছে। তাহাকে শান্ত করিবার জন্য লিটল্ রাশিয়ান বলিল, "আমি বুঝছি, তোমার অন্তরে আজ কি ব্যথা জেগেছে—"

"আমার অন্তরে ব্যথা জেগেছে কিন্তু তোমার কি জাগেনি? হয়ত আমার ব্যথায় চেয়ে তোমাদের ব্যথা আরও মহৎ আরও বৃহৎ—কিন্তু আসলে আমরা সবাই পাজী! আমাদের পরস্পরের মধ্যে একমাত্র বন্ধন হচ্ছে ঘৃণা করার, ক্ষতি করার, আঘাত করার এবং আহত হওয়ার—কি বল?"

তাহার কথায় বাধা দিয়া লিটল্ রাশিয়ান বলিল, "আজ আর কোন তর্ক নয়! বুক চুঁয়ে যখন রক্ত পড়ে,

আমি জানি তখন তর্ক করার চেয়ে নির্মমতা আর কিছু নেই, ভাই।"

লিটল্ রাশিয়ানের কোমল সুগভীর কণ্ঠস্বরে নিকোলে সহসা অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। বলিল, "সত্যিই আজ আমার সঙ্গে তর্ক করা অসম্ভব।"

"আমার মনে হয়, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে দিয়ে এই রক্ত-ঝরা নৈরাশ্যের ঝড় বয়ে গেছে—নয় ত যা যাবে; আমরা প্রত্যেকেই খালি পায়ে কাচের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে বাধ্য হয়েছি—আজ তুমি যেমন অন্ধকারে একটুকু নিশ্বাসের জন্যে হাঁপিয়ে উঠছো তেমনি একদিন আমরা সবাই কেঁদেছি—"

"আমি ওসব কিছু শুনতে চাই না—আমার খালি মনে হচ্ছে, আমার মনের মধ্যে যেন অনবরত পিঁজরেয় পোরা বাঘ গর্জ্জে গর্জ্জে উঠছে—সে চাইছে—"

ধীর স্থির শান্তভাবে লিটল্ রাশিয়ান বলিল, "আমি তোমাকে বিশেষ কিছুই বলতে চাই না—শুধু এইটুকু জানিয়ে দিতে চাই যে, এক দিন সমগ্র ভাবে না হোক, অধিকাংশ ভাবেই তোমার এ মনোভাব দূর হয়ে যাবে। ছোট ছেলেদের অসুখের মত, কতকটা হামের মত, এও এক রকম মানুষের মনের রোগ। দুর্ব্বল আর শক্তিমান, অল্প-বিস্তর আমরা সবাই এ রোগে ভুগি। যে মুহূর্ত্তে মানুষ আপনাকে চিনতে আরম্ভ করে, অথচ জীবনকে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, বুঝে উঠতে পারে না জীবনে তার স্থান কোথায়, ঠিক সেই ক্ষণেই এই রোগ মনকে পেয়ে বসে। তখন মনে হয়, পৃথিবীতে কেউ আমার প্রাপ্য আমাকে দিল না, কেউ বুঝলো না আমার অন্তরের গভীর ব্যথার কথা, সবাই যেন আছে শুধু আমাকে নিঃশেষে গ্রাস করে ফেলবার জন্যে। তারপর দিন যাবে—বুঝবে, তোমারও বুকে যে ব্যথা বাজে, আর সবারও বুকে তেমনি ব্যথা বাজতে পারে—তখন বুঝবে, জীবনের সঙ্গে তোমার যোগসূত্র কোথায় এবং সেই বোঝার সঙ্গে সঙ্গে তুমি আপনার অতীত উক্তির জন্য আপনার কাছেই লজ্জিত—হাঁ, লজ্জিতই হবে। ছোট্ট তোমার বাঁশী, সামান্য তার সুর; মহামহোৎসবের বিরাট ঐক্যতানে তোমার সেই ছোট্ট বাঁশীর সুর সবার সুরের ওপর স্পষ্ট হয়ে বেজে উঠলো কি-না তা শোনবার জন্যে গির্জ্জের চূড়োয় বসে থেকে কি লাভ? কিন্তু একদিন দেখবে, উৎসবের ঐক্যতানে তোমারও বাঁশী সুর মেলাচ্ছে—স্বাতন্ত্র্যের গর্ব্ব আর তার নেই—সবার সুরে সুর মিলিয়ে কখন সে আপনাকে হারিয়ে ফেলেছে—সেই হবে তার সার্থকতা—বুঝলে?"

গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া নিকোলে বলিল, "হয়ত বুঝি। কিন্তু বিশ্বাস করি না।"

মা আসাতে তাহাদের তর্ক সহসা থামিয়া গেল। একটা আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজের মুখের দীর্ঘ কৃষ্ণ ছায়া দেখিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নিকোলে বলিল, "কত দিন হল আয়নাতে মুখ দেখিনি! উঃ! কি কুৎসিত আমার মুখ!"

স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া লিটল্ রাশিয়ান বলিল, "তাতে কি যায়-আসে?"

একান্ত ধীরে নিকোলে বলিল, "শাশাঙ্কা একদিন বলেছিল মুখই হচ্ছে মনের আয়না!"

বাধা দিয়া লিটল্ রাশিয়ান বলিল, "মিথ্যে কথা! শাশাঙ্কার নাক চ্যাপ্টা, চোয়ালের হাড় বেরিয়ে আছে, কিন্তু তবুও তো তার মন নক্ষত্রের মত সুন্দর।"

চা আসিতে উভয়ের বচসা থামিয়া গেল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চা পান করার পর নিকোলে জিজ্ঞাসা করিল, "এখানকার ব্যাপার কি রকম চলছে?"

লিটল্ রাশিয়ান সোৎসাহে তাহাদের দলের কার্য্যাবলী বলিতে লাগিল—কেমন করিয়া ধীরে ধীরে তাহাদের সাম্যবাদের নীতি অনুসারে শ্রমিকদের সংহত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে।

বিরক্ত হইয়া নিকোলে বলিয়া উঠিল, "ওরে বাপ, রে, ও-রকম ভাবে ধীরে-সুস্থে মেপে-জুখে চললে তো অনন্তকাল বসে থাকতে হবে—"

নিকোলের কথার ভঙ্গীতে মা মনে মনে ভয়ানক বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। লিটল্ রাশিয়ান একটু ভর্ৎসনার সুরে উত্তর দিল—"মানুষের জীবন তো ঘোড়া নয় যে, তাকে চাবকে ছুটিয়ে নিয়ে যাবে—"

ঘাড় নাড়িয়া নিকোলে বলিল, "তা জানি না, কিন্তু আমার অত ধৈর্য্য নেই। আমি কি করি?"

"আমাদের মত তোমাকেও অপেক্ষা করতে হবে—নিজে শিখতে হবে, অপরকে শেখাতে হবে—সেই আমাদের কাজ।"

"কিন্তু যুদ্ধ করবো কখন?"

"কখন যে রণ-তূর্য্য বেজে উঠবে জানি না কিন্তু প্রথমে আমাদের তৈরী করতে হবে মস্তিষ্ককে, তারপর গড়তে হবে হাতকে—"

ব্যঙ্গের সুরে নিকোলে বলিল, "আর তোমাদের হৃদয়?"

"মাথার সঙ্গে সঙ্গে তাকেও গড়ে তুলতে হবে নিশ্চয়ই।"

সেদিন রাত্রে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে বিছানায় শুইয়া

মা আপনার মনে মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "এ জগতে, হে প্রভু, যত লোক আছে, প্রত্যেকেই তারা কাঁদে প্রত্যেকের আলাদা সুরে—কবে এমনি উঠবে আনন্দের সুর?"

লিটল্ রাশিয়ান আপনার বিছানায় থাকিয়া মায়ের অন্তরের এই সকরুণ আবেদন শুনিতে পাইল। শান্ত সমাহিত কণ্ঠে সে বলিল, "মাগো, সে সময় আসতে আর দেরী নেই! বুঝি তার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।"

প্রতিদিন আসিত নূতন নূতন লোক, নূতন নূতন অভিজ্ঞতা লইয়া। মায়ের ভাল লাগিত। সন্ধ্যা বেলায় আসর বসিত। লিটল্ রাশিয়ান সকলকে নানা বিষয় পড়িয়া শুনাইত! নিকোলে একধারে বসিয়া শুনিত। খবরের কাগজে শ্রমিকদের উপর কোনও অত্যাচারের খবর শুনিলে, সে গম্ভীর ভাবে লিটল্ রাশিয়ানকে জিজ্ঞাসা করিত, "তা হলে, দোষ কার? নিশ্চয় জারের!"

তাহার সেই অসাধারণ গাম্ভীর্য্যে লিটল্ রাশিয়ান হাসিয়া উত্তর দিত, "অপরাধ তার যে প্রথম বলেছিল—এটা আমার। তবে সে লোকটা কয়েক হাজার বছর আগে মারা গেছে—এখন তার সঙ্গে ঝগড়া করে লাভ কি বলো?"

"কিন্তু তার ভূত যাদের ঘাড়ে চেপে আছে, এখন এই সব কথা বলায় তারা কি প্রসন্ন হবে?"

এই সব সময় নিকোলেকে আলাদা করিয়া লিটল্ রাশিয়ান জীবনের জটিল সমস্যার কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিত। কিন্তু কখন যে আবার তাহার মাথা গরম হইয়া যাইত তাহার কোনও স্থিরতা ছিল না।

এক একবার বিশ্ব-সংসারের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিত, "শক্ত জমিতে ফসল গজাতে হলে—যেমন একহাত মাটি উপড়ে ফেলতে হয়—তেমনি একবার এই পৃথিবীটাকে আগাগোড়া চষে ফেলা দরকার!"

সেই সময় মা বলিয়া উঠিলেন, "গরমভও একদিন তোদের সম্বন্ধে ঠিক এই কথাই বলছিল!"

নিকোলে গর্জ্জিয়া উঠিল, "কে?"

"গরমভ।"

"ব্যাটার আজকাল বদমায়েসী বেড়েছে—"

অতি সরল ভাবে মা বলিলেন, "প্রায়ই রাত্তিরে আমার জানালা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারে!"

নিকোলে যেন এই সংবাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, "তা না হলে সময় কাটবে কি করে?—আচ্ছা—"

নিকোলে কাহারও কোনও কথা না শুনিয়া রাগে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে মা সভয়ে বলিলেন, "নিকোলেকে দেখলে আমার কেমন ভয় করে—ও যেন একটা গরম উনুনের মতো—যা পায়, তাই পুড়িয়ে ফেলে।"

গম্ভীর ভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে করিতে লিটল্ রাশিয়ান বলে, "ওর সামনে গরমভের কথা আলোচনা করা ঠিক নয়।"

সেদিন কারখানার ছুটি ছিলো। সন্ধ্যা বেলা বাহির হইতে ঘুরিয়া আসিয়া সহসা বাড়ীর মধ্যে একটি অতি-পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া মায়ের চিত্ত আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। দরজা ঠেলিয়া প্রবেশ করিতেই তিনি শুনিলেন, পাভেল কথা বলিতেছে।

ছুটিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আনন্দোদ্ভাসিত আননে মা পুত্রকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ, এত দিন পরে ছুটি পেলি!"

মায়ের পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া পাভেলের চোখের কোণে সহসা জল দেখা দিল। এত দিন পরে মাতৃ-গর্ব্বে তাহার সর্ব্ব-দেহ-মন উথলিয়া উঠিতেছিল। কম্পিত-কণ্ঠে সে শুধু বলিল, "মাগো, মা আমার!"

এত দিন পরে যেন পুত্র আবার মাকে ফিরিয়া পাইল, মা যেন এত দিন পরে পুত্রকে হৃদয় ভরিয়া দেখিল। পুত্রের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে মা বলিলেন, "আমি তো তোকে জন্ম দিইনি—তুই-ই আমাকে জন্ম দিয়েছিস্—আমি আর তোর জন্যে কি করতে পেরেছি বল্?"

পাভেল তেমনি বিহ্বল ভাবে বলিল, "তুমি আমাদের সাধনার পথে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছ। তোমাকে কি বলবো মা, আজ আমার কত আনন্দ যে, তুমি আমাকে জগতে এনেছ—জগৎ চলার পথে তোমাকেই পাশে পাওয়া—জানো না মা জীবনের সব চেয়ে বড় সৌভাগ্য!

আনন্দে মায়ের বাক্-রোধ হইয়া আসিতেছিল। বহু কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া মা বলিলেন, "ঐ দুষ্টু ছেলে এণ্ড্রিয়াসা, আমাকে এরই মধ্যে অনেক জিনিষ শিখিয়েছে—ওর কাছে আমি চির-ঋণী।"

বন্ধুর দিকে চাহিয়া পাভেল বলিল, "আমি ওর কাছেই সব শুনেছি।"

"মাগো, এণ্ড্রিয়াসা বুড়ো বয়সে আমাকে বলে কি না লেখাপড়া শিখতে হবে—"

"তাইতে বুঝি তুমি ওর কাছে অভিমান দেখিয়ে লুকিয়ে পড়তে আরম্ভ করলে?"

"মাগো, লুকিয়ে কি পড়বার জো আছে? তাও একদিন দুষ্ট ছেলে একেবারে হাতে নাতে ধরে ফেললে—"

মা তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। দুই বন্ধুতে বহু দিন পরে আবার প্রাণ ভরিয়া আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিল।

দুইটি কণ্ঠের বাদ-প্রতিবাদে সেই ঘর আবার ভরিয়া উঠিল।

রাশিয়ার গ্রামে গ্রামে বসন্তের আবির্ভাবলগ্ন আগাইয়া আসিতেছিল। চারিদিক হইতে বরফ গলিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইতেছিল এবং তাহার স্থলে কর্দ্দমাক্ত দেহে পৃথিবী আর এক নূতন রূপে জাগিয়া উঠিতেছিল। যত দিন যায়, তত বাড়ে কাদা। চিমনির ধোঁয়া আর কাদার গন্ধে গ্রামের বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়া আসিতে লাগিল।

পাভেল এবং তাহার সহযাত্রী বন্ধুগণ 'মে' দিবস উৎসবের আয়োজনে ব্যস্ত। প্রত্যহই আবার তাহাদের দেখা হয়; আবার আলোচনা চলে দীর্ঘ রাত্রি ধরিয়া। মা এখন অনেকটা সঙ্কোচহীন হইয়া সেই সমস্ত আলোচনায় যোগদান করেন। আইভানোভিচ তাহার স্বাভাবিক হাস্য-রসের অবতারণা দ্বারা মাঝে মাঝে সাম্যবাদীদের এই রস-হীন আলোচনায় একটু সুরের বৈচিত্র্য আনিয়া দেয়। একদিন গম্ভীর ভাবে ঘরে প্রবেশ করিয়া সমবেত বন্ধুদের আহ্বান করিয়া বলিল, "সহযাত্রী বন্ধুগণ, বর্ত্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া একটা নূতন যুগ আনা অতি গুরুতর ব্যাপার—"

সহসা আইভানোভিচের এই বিষণ্ণ সুরে সকলে তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। আইভানোভিচ বলিয়া চলিল, "কিন্তু সেই পরিবর্ত্তনকে দ্রুতগতিতে সম্ভবপর করিয়া তুলিতে হইলে অবিলম্বে আমার এক জোড়া বুটের প্রয়োজন—আর সেলাই করিয়াও ইহার সদ্ব্যবহার করা যায় না, এবং শ্রমিকদের মুক্তি না দেখিয়া আমার এই জগৎ হইতে অন্য কোনও গ্রহে যাইতে বিন্দুমাত্র প্রবৃত্তি নাই।"

একদিন আইভানোভিচের কথা উল্লেখ করিয়া পাভেল লিটল্ রাশিয়ানকে বলিল, "জানো আন্দ্রি, যাদের বুকে যত তীব্র ব্যথা, তাদের মুখে হাসি তত বেশী।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া স্বাভাবিক শান্ত ভাবে লিটল্ রাশিয়ান বলিল, "তা হলে এত দিনে সমগ্র রাশিয়া হেসে ফেটে পড়তো—"

নাটাশাও আসিত। সেও এবার কারারুদ্ধ হইয়াছিল কিন্তু অন্য কারাগারে ছিল। মা লক্ষ্য করিতেন যে যতক্ষণ নাটাশা থাকিত ততক্ষণ লিটল্ রাশিয়ান খুব হাসিত, সকলকে ক্ষেপাইয়া দুষ্টুমি করিত এবং বিশেষ করিয়া নাটাশাকে হাসাইতে কত না চেষ্টা করিত। সে চলিয়া গেলে সে আপনার মনে শীষ দিতে দিতে সারা ঘর শুধু পায়চারি করিয়া বেড়াইত।

শাশাঙ্কা যখনই আসিত, তখনই তাহাকে বিশেষ ব্যস্ত দেখাইত। তাহার মুখ সর্ব্বদাই বিষণ্ণ গম্ভীর। একদিন পাভেল তাহাকে ঘর হইতে ডাকিয়া রান্নাঘরের সম্মুখে লইয়া গোপনে কি বলিতেছিল। রান্নাঘরে থাকিয়া মা তাহা সমস্তই শুনিতে পাইলেন।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "নিশান কি তোমার হাতেই থাকবে?'

"নিশ্চয়ই।"

"এ কি একেবারে ঠিক হয়ে গেছে?"

"নিশ্চয়ই, এ অধিকার—"

"আবার যাবে কারাগারে?"

পাভেল কোন উত্তর দিল না।

শাশাঙ্কা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "ওটার ভার অন্য আর একজনের ওপর দিলে হতো না?"

বেশ জোর করিয়া পাভেল উত্তর দিল, 'না।'

"কিন্তু একবার ভেবে দেখো—তোমার প্রভাব কতখানি! তুমি আর লিটল্ রাশিয়ান হলে এখানকার বিপ্লব-আন্দোলনের প্রাণ। তুমি যদি এবার কারারুদ্ধ হও, তা হলে তোমায় কোন্ দূর দেশে পাঠিয়ে দেবে—"

শাশাঙ্কার কথায় মায়ের অন্তর ক্ষণে ক্ষণে সচকিত হইয়া উঠিতেছিল। মনে হইতেছিল, তাঁহার অন্তরে কে যেন বিন্দু বিন্দু করিয়া হিম বর্ষণ করিতেছে।

"না—সে যাই হোক—আমি স্থির করেছি, সেদিন আমার হাতেই থাকবে পতাকা—"

শুনিতে পাইলেন যে পাভেল সহসা উত্তেজিত হইয়া একান্ত কঠোর ভাবে বলিতেছে, "তোমার এ রকম কথা বলা উচিত নয়। তুমি, তুমি কেন এর মধ্যে আসছো?"

একান্ত নিম্ন সুরে শাশাঙ্কা বলিল, "আমিও তো মানুষ।"

পাভেল যেন আপনার অসহায়তা গোপন করিবার জন্য আরও দ্রুতগতিতে বলিল, "মানুষ—তা জানি,

খুব আল মানুষই। তুমি জানো তুমি আমার কত প্রিয়, তাই সেই সুবিধে বুঝে—"

সহসা শাশাঙ্কা বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, তা হলে বিদায়।"

রান্নাঘরে বসিয়া পায়ের শব্দে মা স্পষ্টই বুঝিলেন যে শাশাঙ্কা ছুটিয়া চলিয়া গেল। একটা ভারী বোঝা যেন মায়ের বুকে চাপিয়া বসিল। কথা তাঁর মধ্যে আসল ব্যাপার কি তিনি তাহার কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। শুধু এইটুকু বুঝিয়াছেন যে, সম্মুখে আর একটি ভীষণতর বিপদ কিছু আসিতেছে। তাঁহার সমস্ত অন্তর মথিত করিয়া শুধু এই প্রশ্ন জাগিতেছিল, পাভেল কি করিতে চায়?

ঘরের মধ্যে তখন গর্মভকে লইয়া পাভেল ও লিটল্ রাশিয়ানের আলোচনা হইতেছিল। ঘরের এ-কোণ থেকে ও-কোণ পর্য্যন্ত পায়চারি করিতে করিতে একান্ত চিন্তিত ভাবে লিটল্ রাশিয়ান বলিয়া উঠিল, "গর্মভকে নিয়ে কি করা যায়? গ্রামের লোক হয়েও এই রকম আমাদের পেছনে লাগবে?"

পাভেল গম্ভীর ভাবে বলিল, "একটা কাজ করা যাক। তাকে গিয়ে স্পষ্টই বলি এ কাজ ছেড়ে দিতে—"

"তা হলে সে আগে তোমাকেই ধরিয়ে দেবে—"

এমন সময় ঘরের মধ্যে আসিয়া মাথা নত করিয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাভেল, আবার তুই কি করতে চলেছিস্?"

"কবে? কখন?"

"পয়লা মে, পয়লা মে!"

"ও! তুমি শুনেছ বুঝি? কিছু না—আমি আমাদের দলের সামনে দাঁড়িয়ে শোভাযাত্রায় বেরুবো—আমার হাতে থাকবে আমাদের পতাকা। অবশ্য এর জন্যে পুলিশ আবার আমাকে গ্রেফতার করতে পারে।"

সহসা মায়ের মনে হইতে লাগিল যেন তাঁহার চোখ জ্বলিতেছে, মুখের ভিতর শুকাইয়া আসিতেছে। কম্পিত হস্তে তিনি পুত্রের হাত ধরিলেন।

"তুমি বুঝছো না মা! এ আমাকে করতেই হবে! এ যে আমার আনন্দ!"

কোনও রকমে ধীরে মাথা তুলিয়া বলিলেন, "কই, আমি তো কিছু বারণ করছি না।" চোখ তুলিয়া পুত্রের চোখের দিকে চাহিতেই মুখ নত করিয়া মা কাঁদিয়া ফেলিলেন।

মায়ের হাত ছাড়িয়া দিয়া মৃদু তিরস্কারের সুরে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পাভেল বলিল, "এ সম্বন্ধে তোমার এ রকম কাতর হওয়া উচিত নয়, মা! তোমারও উচিত আনন্দ করা! কবে ছেলেরা এমন মা পাবে, যারা হাসিমুখে ছেলেদের মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হবে না।"

লিটল্ রাশিয়ান গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়া মাতা-পুত্রের আলাপ শুনিতেছিল। পাভেলের কথায় সে বলিয়া উঠিল, "খুব হয়েছে। আর বেশী বক্তৃতা করতে হবে না।"

মা মুখ তুলিয়া বলিলেন, "কই, আমি তো তোকে কিছুই বলিনি। আমি তোর কাজে বাধা দিতে চাই না। তবে কি করবো, পোড়া চোখে জল আসে—মা হয়েছি যে!"

পাভেল আরও উত্তেজিত হইয়া একটু দূরে সরিয়া গিয়া রূঢ় স্বরে আপনার মনে বলিয়া উঠিল, "ভালবাসা! স্নেহ! জীবনের প্রতি পদক্ষেপে যারা দেয় বাধা তারাও বুঝি এমনি ভালবাসে।"

পাভেলের কণ্ঠস্বরে মা ভীত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইল হয়ত ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্র তাঁহার অন্তরে আরও রূঢ় আঘাত করিবে। তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "ভুল বুঝিস্ না বাছা! আমি কি তাই বলছি। আমি বুঝছি বই কি। নিশ্চয়ই, তোর সঙ্গীদের জন্যে তোর এ কাজ করাই উচিত।"

"না, তুমি বোঝনি। আমার সঙ্গীদের জন্যে নয়, এ আমি একান্ত আমার জন্যেই করছি। শুধু তাদের জন্যে যদি হতো তা হলে আমি পতাকা না নিলেও পারতাম। কিন্তু আমার মন চাইছে—এ আমাকে করতেই হবে।"

আবার চোখে জল ভরিয়া আসিতেই মা তাড়াতাড়ি চোখের জল লুকাইবার জন্য রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন। আধ-ভেজান দরজার মধ্য হইতে তিনি শুনিতে লাগিলেন—পাভেল ও লিটল্ রাশিয়ানে ঝগড়া বাঁধিয়া গিয়াছে—

"ওঁকে আঘাত করে খুব কৃতিত্ব হলো, না পাভেল?"

পাভেল উত্তেজিত হইয়া বলিল, "তোমার কোন অধিকার নেই এ রকম ভাবে প্রশ্ন করবার।"

"তা হলে আমি কিসের তোমার কমরেড—যদি বোকামীর হাত থেকে তোমাকে উদ্ধার করার অধিকার আমার নেই? কেন মাকে বলতে গেলে এ সব কথা?"

"আমি চাই মানুষ সর্ব্বদাই স্পষ্ট ভাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কথা বলবে। যখন সে মনে করবে হাঁ—তখন

তাকে স্পষ্ট করে বলতেও হবে, হাঁ। এর মধ্যে আর কোনও কথা নেই।"

"কিন্তু ওঁকেও তুমি এ রকম ভাবে কথা বলবে?"

"নিশ্চয়ই ওঁকে কেন—প্রত্যেক লোককেই বলবো। যে-ভালবাসা, যে-বন্ধুত্ব জড়িয়ে চলার পথে আনে বাধা, সে-ভালবাসা সে বন্ধুত্ব আমি চাই না।"

"সাধু! সাধু! কিন্তু হে মহাবীর, শাশাঙ্কার সঙ্গে যখন কথা বললে তখন তো এ সুরে সব কথা বলো নি!"

"নিশ্চয়ই বলেছি।"

"যে ভাবে তুমি মায়ের সঙ্গে কথা বললে? কখখনই না। আমি স্বকর্ণে সমস্ত শুনি নি—কিন্তু আমি বেশ বুঝছি তুমি সেখানে কণ্ঠস্বরে কত কোমলতা এনেছিলে—সে সুরই আলাদা। আর বুড়ো মায়ের সম্মুখেই যত তোমার বীরত্ব। তোমার এ রকম বীরত্বের মূল্য এক কাণা কড়িও না।"

রান্নাঘরে বসিয়া মায়ের মনে হইল, বোধ হয় এই ব্যাপার লইয়া পাভেল ও লিটল্ রাশিয়ানের মধ্যে কলহ হইবার উপক্রম হইয়াছে। তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া তাঁহার উপস্থিতির কথা জানাইবার জন্য তিনি উচ্চৈঃস্বরে আপনার মনে বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"উঃ! কি ঠাণ্ডা! বসন্ত এলো, তবুও এ কি ঠাণ্ডা!"

আপনার মনে রান্নাঘরের জিনিস-পত্রগুলি অকারণে নাড়াচাড়া করিয়া শব্দ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "উঃ, কি দিনকালই পড়েছে! দিন দিন ঠাণ্ডা বাড়ছে কিন্তু মানুষগুলো হচ্ছে দিন দিন গরম!"

মা শুনিলেন, তাঁহার কথায় ফল ধরিয়াছে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর লিটল্-রাশিয়ান বলিতেছে, "শুনতে পেয়েছ মায়ের কথা? বুঝলে কি কিছু? তোমার কথার চেয়ে ওতে ঢের বেশী মানে আছে।"

কম্পিত দেহে ঘরে প্রবেশ করিয়া মা দুজনকেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোদের একটু চা দেবো কি?"

কেহই কোনও উত্তর দিল না। কথা বলিতে মায়ের কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল। তাহা লুকাইবার জন্য তিনি আপনার মনে বলিলেন, "উঃ, ঠাণ্ডায় মরে গেলুম!"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর পাভেল নিঃশব্দে উঠিয়া মায়ের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল ও অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিল, "রাগ করেছ মা-মণি। আমায় ক্ষমা করো—আমি এখনও সেই ছোট্ট পাভেল—তেমনি বোকা।"

পাভেলের মাথা বুকে টানিয়া লইয়া এক অপূর্ব্ব বেদনার স্বরে মা বলিয়া উঠিলেন, "আমাকে আর আঘাত দিস্ নে। ভগবান্ তোর চিরকল্যাণ করুন—এই আমার একমাত্র কামনা। জানি—তোর জীবন শুধু তোরই কিন্তু তুই কি জানবি মায়ের বুকের জ্বালা? অসম্ভব! অসম্ভব! তোদের সকলকে দেখলেই আমার কান্না পায়—মনে হয়, তোরা সবাই আমারই রক্ত-মাংস! তোদের জন্যে যদি আমি না কাঁদবো—তবে তোদের জন্যে কাঁদবে কে? আজ এই তোরা আছিস্—কাল হয়ত নিরুদ্দেশ হয়ে যাবি—আবার তোদের মতন নতুন ছেলে সব আসবে—তারাও যাবে—তোদের পেছনে পেছনে—এমনি করে দলের পর দল তোরা চলেছিস পিছনের সর্ব্বস্ব ফেলে। আমি কি জানি না!—এর চেয়ে সুন্দর, এর চেয়ে পবিত্র শোভাযাত্রা জগতে আর নেই!"

একটা অপূর্ব্ব বেদনা-বিহ্বল আনন্দ আজ সহসা মায়ের অন্তরে অভূতপূর্ব্ব এক বিরাট ভাব-রসের উদ্দীপনা জাগাইয়া তুলিল। সহসা আর মায়ের কোনও কথা যোগাইয়া উঠিতেছিল না, শুধু এই অপ্রকাশের মৌন পীড়নে তাঁহার সর্ব্বদেহ ক্ষণে ক্ষণে দুলিয়া উঠিতেছিল। এত দিন যে-নয়নে শুধু নির্য্যাতনের গ্লানি স্তূপাকারে জমা হইয়াছিল, আজ কোথা হইতে বেদনার ইন্ধনে সহসা সেখানে সহস্র বহ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল।

পাভেলের দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া মা মৃদু হাসিয়া লিটল্ রাশিয়ানকে বলিল, "আর তোমাকেও বলি এণ্ড্রুয়াসা, তুই ওর চেয়ে ঢের বয়সে বড়—তোর কি উচিত ওর সঙ্গে এই রকম জোর দেখিয়ে চেঁচিয়ে তর্ক করা!"

ঘাড় সোজা করিয়া লিটল্ রাশিয়ান বলিল, "চেঁচাব না—আলবাৎ চেঁচাব! আরও জোরে চেঁচাব এবং প্রয়োজন হলে একদিন ওকে রীতিমত প্রহার করবো—"

মা অগ্রসর হইয়া লিটল্ রাশিয়ানের দুটি হাত সস্নেহে নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওরে আমার দুষ্টু ছেলে!"

পাভেলের দিকে চাহিয়া গম্ভীর মুখে লিটল্ রাশিয়ান বলিয়া উঠিল, "হে বীরপুরুষ, তুমি শুনো না—জানেন মা, ওকে কতখানি ভালবাসি! তবে ও আজকাল নতুন জামা পরেছে কি না! ওর ঐ নতুন জামা আমার ভাল লাগে না। ওর ধারণা, জামাটা ওর গায়ে মানিয়েছে খুব ভাল—তাই দু'হাত দিয়ে জামাটা তুলে ও লোকের গায়ে পড়ে বলে বেড়াচ্ছে—দেখছো, কেমন জামা পরেছি! জামাটা হয়ত ভালই, কিন্তু লোকের গায়ে

পড়ে তা জানাবার দরকার কি? ও জামা গায়ে না দিলেও আমাদের শীত দিব্যি কেটে যায়।”

লিটল্ রাশিয়ানের ব্যঙ্গে পাভেল হাসিয়া ফেলিল। বলিল, “বলি, বকবকানি থামাবে কি না? তোমার জিভে যে যথেষ্ট বিষ আছে তা তো একবার ভাল করেই জানিয়েছ—আবার কেন?”

পাভেল বসিয়া লিটল্ রাশিয়ানের হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল।

“হাত ছাড়; এখন হাত ধরে টানছো কখন নিঃশব্দে ছেড়ে দেবে, সামলাতে না পেরে আমিই যাব পড়ে।”

একটা কিছু করা উচিত মনে করিয়া মা হাসিয়া দুজনের হাত ধরিয়া বলিলেন, “তোরা দুজনে উঠে দাঁড়া—আমার সামনে তোরা—আজ একবার আলিঙ্গন কর—আমি দেখি—লজ্জা কিসের—”

বিহ্বল হইয়া লিটল্ রাশিয়ান বলিল, “লজ্জা—লজ্জা কেন?”

দুই বন্ধুতে উঠিয়া দুই জনকে আলিঙ্গন করিল। একটি মুহূর্ত্তের জন্য দুইটি দেহ ও একটি আত্মা মৃত্যুঞ্জয়ী মৈত্রীর অগ্নিশিখায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। এবার বেদনার নয়, আনন্দের উদ্বেলিত অশ্রুধারা মায়ের গণ্ড-দেশ বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল। হাত দিয়া চোখ মুছিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মা বলিয়া উঠিলেন, “মেয়েদের চোখ শুধু কাঁদতেই জানে—যখন সে দুঃখ পায় তখনও সে কাঁদে—যখন আনন্দে তার মন ভরে ওঠে, তখনও সে কাঁদে।”

পাভেল উঠিয়া মায়ের পাশে আসিয়া বসিল। অন্তরের দুর্ব্বলতাকে লুকাইবার প্রচেষ্টায় লিটল্ রাশিয়ান উঠিয়া গম্ভীর ভাবে ঘোষণা করিল, “মা আপনি একটু বসুন, আমি রান্নাঘরে গিয়ে দেখি উনুনে কয়লা আছে কি না—নইলে খানকতক কাঠ চেলা করে আনি—”

মাতা ও পুত্র শুনিল, লিটল্ রাশিয়ান রান্নাঘর হইতে তাহারা যাহাতে শুনিতে পায়, এমনি ভাবে বলিতেছে, “গর্ব্ব করা উচিত নয়, তবুও এ কথা আজ বলবো—আসল জীবনের স্বাদ—করুণায় স্নেহে সহানুভূতিতে সুগভীর জীবনের অমৃত আস্বাদ আজ জীবনে প্রথম পেলাম—”

পাভেল মায়ের দিকে চাহিয়া সায় দিয়া বলিল, “সত্যি!”

বাহিরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া মা শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, “আজকাল মনে হয় সব যেন বদলে গেছে। আজকের আনন্দ আলাদা, আজকের দুঃখ আলাদা। সব কথা ভাল করে বুঝি না—বোঝাতে পারি না—কিন্তু মনে হয় কোথায় কি যেন বদলে গেছে—”

মায়ের কথা শুনিয়া রান্নাঘর হইতে আসিয়া লিটল্ রাশিয়ান যোগদান করিল, এই সময় ঠিক এই রকমই হয় মা! এই পুরানো দেহে আজ নতুন প্রাণ জন্ম গ্রহণ করেছে—অন্ধকারে আজ নবীন সূর্য্যোদয়। সবার অন্তর আজ স্বার্থের সংঘাতে সংক্ষুব্ধ, অন্ধ লোভ ও মোহে আজ জীবন বিষাক্ত; হিংসায় ক্রূর, নীচতায় নির্ম্মম, গ্লানিতে আর দৈন্যে পঙ্গু, মনুষ্যত্ব আজ মুমূর্ষু। মনে হয় যেন সমগ্র ধরণী ব্যাধিগ্রস্ত। বেঁচে থাকতে যেন ভয় করে সবার। প্রত্যেকেই ভাবছে শুধু তারই বুকে বুঝি ব্যথা লাগছে। কিন্তু এরই মাঝখানে আজ এসেছে এক নতুন মানুষ, হাতে তার প্রজ্ঞার প্রদীপ্ত দীপ-শিখা। আলোর উল্লাসে সে চীৎকার করে বলে, ওরে অন্ধ, ব্যথা তোর একার নয়, বেঁচে থাকবার, আনন্দ পাবার অধিকার শুধু তোর একলার নয়। আজ সবারই সমান দরকার বেঁচে থাকবার আনন্দে বেঁচে থাকবার! কিন্তু যে-মানুষ নিয়ে এসেছে আজ এই নতুন বার্ত্তা, সে দাঁড়িয়ে আছে একলা, কেউ নাই তার সঙ্গী। সেই নিঃসঙ্গ নির্জ্জনতার মধ্যে তার চিত্ত আজ বেরিয়েছে বন্ধুর অনুসন্ধানে। তাই সকল ক্ষুদ্রতা, সকল জীর্ণতার ঊর্দ্ধে তার মাঙ্গলিক আহ্বান ধ্বনি বেজে উঠছে—সকল দেশের সকল জাতির হে মানবের দল, এই রক্ত সন্ধ্যায় আবার ফিরে এসো সব এক গোষ্ঠীর মধ্যে। ঘৃণা নয়, প্রেম আজ জীবনের ধাত্রী। মাগো, আজ শুনি সেই আহ্বান ধ্বনি বেজে উঠছে দূরে দূরান্তরে, দেশে দেশান্তরে—”

পাভেল চীৎকার করিয়া উঠিল, “আমিও শুনি, বন্ধু, আমিও শুনি!”

সহসা এই পরমোৎসাহে মা বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া তাহাদের দুইজনের দিকে চাহিয়া রহিলেন—ভিতরে তাঁহার অন্তর প্রতিমুহূর্ত্তে কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

আপনার অন্তরের উল্লাসে লিটল্ রাশিয়ান বলিয়া চলিয়াছিল, “যখন একলা থাকি, রাত্রে যখন ঘুমোতে চেষ্টা করি, সর্ব্বদাই শুনি সেই ধ্বনি মানুষের দ্বারে দ্বারে যেন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে হয়, এই উৎপীড়িতা, এই দুঃখ-দগ্ধা ধরণীর অন্তরতম তল থেকে যেন সেই ধ্বনির প্রত্যুত্তর জেগে উঠছে, জয়, নব-অরুণ-উদয়!”

পাভেল কি বলিতে যাইতেছিল, মা তাড়াতাড়ি তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে বসাইয়া চুপি চুপি বলিলেন, “চুপ কর্ এখন, ওকে বাধা দিস নে—”

লিটল্ রাশিয়ানের চোখে যেন এই অরুণ-উদয়ের আভা। দুই হাতে দরজার দুই দিক ধরিয়া সে বলিযা চলে, "কিন্তু তবুও মানুষের ভাগ্যে এখনও সঞ্চিত আছে বহু বেদনার বিষতিক্ত গ্লানি ; জানি লৌহ-হস্তের পীড়নে অন্তর চুঁয়ে রক্ত-ঝরার এখনও বহু আছে বাকি— কিন্তু তবুও সেই সমস্ত বেদনাব—এই আমার, এই তোমার হৃদয়-চোঁয়া রক্তের বিনিময়ে যে আশা আজ জাগলো বুকে, যে আনন্দ আজ এলো রক্তে, শিরায়, উপশিরায়, তার তুলনা হয় না। মনে হয়—বিরাট ওই নক্ষত্রের মত আপনার জ্যোতির্লোকে আমি সুমহান্। তাই এই দুঃখ, এই বেদনা, এই গ্লানি এই সমস্তই সইছি পরমানন্দে, পরমোল্লাসে—শুধু অন্তরের সেই পরম অনুভূতির জন্যে। কেউ নেই, কোন শক্তি নেই, সে আনন্দকে মেরে ফেলতে প'রে। দুর্ব্বার অমোঘ তার শক্তি, উদার তার অভ্যুদয়।"

পরের দিন সকাল বেলায় পাভেল আব লিটল্ রাশিয়ান চলিয়া যাইবার পরই মেরিযানা ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া খবর দিল, গবুমভকে খুন করেছে !

সহসা এই সংবাদ শুনিয়া মা চমকিয়া উঠিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে হত্যাকারীর মূর্ত্তি যেন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। বিহ্বল ভাবে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে, "কে করলো এ কাজ ?"

—"বলি, সে কি মড়া আগলে বসে আছে যে তার নাম জানবো। কাজ সেরেই সে পালিয়ে গেছে— কেউ তার পাত্তা পায়নি।"

মা মেরিয়ানাকে লইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। পথে মেরিয়ানা বলিতে লাগিল, "এখন হলো বিপদ। পুলিশ এসে আবাব বাড়ী-ঘরদোর ওলট-পালট করবে। একটা ভালো, তোমার বাড়ীর ছেলে-গুলো কাল রাত্তিরে বাড়ীতে ছিলো, আমি নিজে সাক্ষী দেবো। কাল রাত্তিরে বাড়ী ফেরবার সময় একবার তোমার জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি, তোমরা সব বসে গল্প করছো।"

মেরিয়ানার কথায় মা সচকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি যে বলিস্ তুই। এ ব্যাপারে ওদের কি কেউ সন্দেহ করছে নাকি ?"

লোকে সন্দেহ করছে বই কি। ঐ ছোঁড়াদের মধ্যেই কেউ এ কাজ করেছে—কেন না গবুমভ ওদের পেছনেই তো লেগে ছিল—"

মায়ের নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। কি এক অজানা আশঙ্কায় সহসা তিনি দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

"দাঁড়ালে যে, চলো। দেরী হলে হয়ত আর দেখতে পাবে না।"

মা বিহ্বল ভাবে চলিতে লাগিলেন। তাঁহার চোখের সম্মুখে খালি নিকোলেব ক্রুদ্ধ মুখখানি ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

ঘটনাস্থলে আসিয়া দেখিলেন, চারিদিকে কৌতূহলী জনতা। মধ্যে গবুমভের মৃতদেহ পুলিশ-পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়া আছে। এক হাত তাহার জামার ভিতরে ঢোকান, আর এক হাতের আঙুল মাটী আঁকড়াইযা রহিয়াছে।

পাশ হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "কোথাও রক্তের চিহ্ন নেই। এক ঘুষিতেই সাবাড় করে দিয়েছে।"

ধীরে মা বাড়ী ফিরিলেন।

পাভেল ও লিটল্ রাশিযান বাড়ী আসিতেই মা উৎসুক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ রে, কাউকে গ্রেফ্‌তার করেছে না কি ?"

গম্ভীর ভাবে লিটল্ বাশিযান বলিল, "কই, এখনো তো শুনি নি।"

তাহাদেব দুইজনেব মুখের দিকে চাহিয়া মা দেখিলেন, তাহারা দুইজনেই গম্ভীর, বিমর্ষ।

মা তাহাদের নিকট অগ্রসর হইয়া অতি নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ রে, নিকোলেকে কেউ সন্দেহ করছে না তো ?"

মাযের দিকে দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ করিয়া পাভেল বলিল, "না, তার নাম কেউ করছে না। সে তো এখানে নেই। কাল সকাল বেলাই নদী পেরিযে সে কোথায় চলে গেছে—আজও ফেরে নি।"

দুই হাত উর্দ্ধে তুলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিযা মা বলিয়া উঠিলেন, "ভগবান রক্ষা কর।"

খাবাব সময হঠাৎ পাভেল বলিয়া উঠিল, "আমি এ সব বুঝতে পারি না, কিছুতেই বুঝতে পারি না—"

গম্ভীর স্বরে লিটল্ রাশিয়ান বলিল, "কি, কি বুঝতে পারো না ?"

"দু'মুঠো খেয়ে বেঁচে থাকতে হবে বলে যে হত্যা করতে হবে—এ কথা ভাবতে আমার ভয়ানক কুৎসিত লাগে।"

হাসিয়া লিটল্ রাশিয়ান বলিল, "নিরুপায়। এই সনাতন জীবনধারা।"

পাভেল ধীরে উত্তর দিল, 'নিরুপায় নয়, অন্যায়।"

হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া লিটল্ রাশিয়ান টেবিল হইতে উঠিয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি বলছো অন্যায় ? কিন্তু এ অন্যায়ে কে প্রণোদিত করেছে ? ওই যারা

সৈন্য রেখেছে, ওই যারা ঘাতক রেখেছে, ওই যারা অন্ধকার কারাগার তৈরী করেছে মনুষ্যত্বকে পিষে ফেলবার জন্যে—তারাই তো অধিকার দিয়েছে আমাকে হাত তুলতে তার বিরুদ্ধে যে সব চেয়ে এগিয়ে আসে তাদের মধ্যে থেকে আমাকে পিষে ফেলবার জন্যে ?"

উত্তেজিত হইয়া লিটল্ রাশিয়ান ঘরের এ-কোণ হইতে ও-কোণ পর্য্যন্ত পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। মনে হইতেছিল, প্রতি পাদক্ষেপে কোন এক অদৃশ্য বাধাকে যেন সে এড়াইয়া চলিতেছে। সে বলিয়া উঠিল, "কিন্তু এ কথাও সত্য যে জীবনের যাত্রাপথে সহসা কখন কখন এমন এক সন্ধিক্ষণ আসে যখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও মানুষকে নিজেরই বিরুদ্ধে নিজেকে চলতে বাধ্য হতে হয়। তোমার আদর্শের জন্যে তোমার প্রাণ দেওয়া—সে তো খুব সহজ সোজা ব্যাপার। তার চেয়েও যা প্রিয়, তাই দাও—"

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিবার পর সে আবার বলিয়া চলিল, "জানি, একদিন এই পৃথিবীতে সে মহাদিন আসবে, যেদিন প্রত্যেকে প্রত্যেককে দেখলে আনন্দে দুলে উঠবে। এই মহা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীতে সেদিন নক্ষত্রের মত ভাস্বর হয়ে উঠবে মানুষ। প্রত্যেকের বাণী হবে সঙ্গীতের মত সুন্দর। সেদিনকার পৃথিবীর মানুষ স্বাধীনতার পরম-প্রসাদে মুক্ত হৃদয়ে বিচরণ করবে। অন্তর হবে তার সর্ব্বদ্বেষ সর্ব্বহিংসা বিমুক্ত ; জানি, সেদিন ঘুচে যাবে যুক্তির আর অন্তরের সকল দ্বন্দ্ব। মানবতার দেউলে জীবন ফুটে উঠবে সব চেয়ে সুন্দর ফুলের মত। তখনি হবে পরিপূর্ণ জীবন, মুক্ত, সত্য, সুন্দর। সেই অনাগত মহাদিনের জন্যে আমি আজ প্রস্তুত—আমার সমস্ত কিছু উৎসর্গ করতে, যদি প্রয়োজন হয়, আমার হৃদয় উপড়ে ফেলে আমি নিজে মাড়িয়ে যাব তাকে।"

মা চাহিয়া দেখিলেন যে লিটল্ রাশিয়ানের দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে।

পাভেল উঠিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে লিটল্ রাশিয়ানের দিকে চাহিল। বলিল, "কি হল তোমার আন্দ্রি ?"

বেহালার তারের মত সমস্ত দেহকে টানিয়া উন্মাদের মত মাথা নাড়িয়া মায়ের দিকে চাহিয়া লিটল্ রাশিয়ান্ বলিল, "আমি গব্‌মভকে হত্যা করেছি।"

সহসা বজ্রাহতের মত মা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া লিটল্ রাশিয়ানের দুটি হাত জড়াইয়া ধরিলেন। জগতের কেউ যেন সে শোকোচ্ছ্বাস না শুনিতে পায়, এমনি মৃদু কম্পিত স্বরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ওরে এণ্ড্রুয়াসা, ওরে, এ কি তুই করলি, ওরে দুঃখী—"

আপনাকে সংহত করিয়া লইয়া লিটল্ রাশিয়ান স্থির কণ্ঠে বলিল, "আমি সবই স্বীকার করবো—কেমন করে আমি এ কাজ করলাম—"

"আমি যদি নিজের চোখেও দেখতাম তাহলেও বিশ্বাস করতাম না যে এ তোর কাজ। না, না, তুই কখনও এ কাজ করতে পারিস্ না।"

"সত্যি, আমিও ভাবতে পারি না যে তুমি এ কাজ করেছ।"

করুণ মথিত কণ্ঠে ধীরে ধীরে লিটল্ রাশিয়ান বলিতে লাগিল, "তুমি তো জানো, বন্ধু, আমি এ-কাজ করতে চাই না, চাই নি! তুমি আগিয়ে চলে গেলে, আমি আইভানের সঙ্গে গল্প করতে করতে কারখানার দিকে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি কোথা থেকে এক পথের বাঁকে গব্‌মভ আমাদের সঙ্গ নিয়েছে। কিছুক্ষণ পরে আইভানও বাড়ী চলে গেল। আমি কারখানার দিকে চলেছি, দেখি তখনও সে আমার সঙ্গে চলেছে ! কিছুক্ষণ পরে সে হেসে আমার সঙ্গে আলাপ করতে লাগলো। রাগে সর্ব্বাঙ্গ আমার জ্বলছিলো। সে বলতে লাগলো, আমাদের কাণ্ডকারখানা সব পুলিশ জানতে পেয়েছে—পয়লা মে'র আগেই আমাদের সব যথাস্থানে পৌছে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমি একটিও কথা বলিনি। তারপর—"

পাভেল দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বুঝি, বন্ধু, তোমার ব্যথা আমি বুঝি।"

"তারপর সে আমায় নানারকম প্রশংসা করতে লাগলো—আমার মত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ লোক আর সে দেখে নি—আমার উচিত নয় দলে পড়ে এই কাজ করা—আমার উচিত—"

একটু থামিয়া লিটল্ রাশিয়ান একবার গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, "আমার উচিত তাদের সঙ্গে যোগদান করা! সে যদি আমাকে মারতো, সে ছিল অনেক ভাল। আমার পক্ষে তা সহ্য করা সহজ হতো, তারও পক্ষে তা হতো ভাল। কিন্তু আমার অন্তরের অন্তরতম স্থলে সে যখন এমনি ভাবে কাদা ছিটিয়ে দিল, তখন হঠাৎ আমার সর্ব্বদেহ রাগে জ্বলে উঠলো, কোনও কথা না বলে সমগ্র দেহের শক্তি দিয়ে এক ঘুষি মেরে তার দিকে আর না তাকিয়ে আমি সোজা চলে এলাম। চলতে চলতে শুনতে পেলাম সে পড়ে গেল, একটা শব্দ হলো। স্বপ্নেও ভাবিনি ভয়ঙ্কর কিছু হবে। রাস্তার ধারে একটা ব্যাঙকে

টিপটে দিয়ে মানুষ যে ভাবে নির্ভাবনায় চলে, তেমনি ভাবে আমি চলে এলাম। তারপর হঠাৎ শুনি চারিদিক থেকে রব উঠছে—গবৃমভকে কে হত্যা করেছে! আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলাম না—কিন্তু ক্রমশ আমার সর্ব্ব-শরীর হিম হয়ে এলো···এই হাত দুটো একেবারে অচল না হয়ে গেলেও মনে হচ্ছে যেন হঠাৎ খুব ছোট হয়ে গেছে।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া নিজের দুটি হাতের দিকে চাহিয়া সে বলিয়া উঠিল, "মনে হয় সমগ্র জীবনেও হাত থেকে এই দুঃসহ গ্লানির পঙ্কিলতা ধুয়ে ফেলতে পারবো না।"

ক্রন্দন-রত কণ্ঠে মা বলিলেন, "ধুয়ে যাবে, ওরে ধুয়ে যাবে, যদি মন তোর থাকে এমনি সাদা!"

লিটল্ রাশিয়ানের দিকে চাহিয়া পাভেল জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করবে ভাবচো?"

ঈষৎ চিন্তিত ভাবে লিটল্ রাশিয়ান উত্তর করিল, "আমি যে এ-কাজ করেছি তা স্বীকার করতে আমার বিন্দুমাত্র ভয় নেই—কিন্তু এ কথা বলতে আমার নিজেরই লজ্জা হচ্ছে। এ আমি চাই নি, চাই না। অনর্থক এই ব্যাপারে আজ কারাগারে যেতে আমার লজ্জা হচ্ছে। যদি পুলিশ আজ কাউকে অপরাধী বলে ধরে, তা হলে আমি ধরা দিয়ে সব কথা স্বীকার করবো। তা না হলে আমি মুখ ফুটে এ কথা কিছুতেই আর উচ্চারণ করবো না। এ আমার নিদারুণ লজ্জার কথা।"

এমন সময় কারখানার বাঁশী বাজিয়া উঠিল তীব্র, কঠোর আদেশের সুরে!

মাথাটা একটু একপাশে করিয়া লিটল্ রাশিয়ান অনেকক্ষণ ধরিয়া একমনে সেই গর্জ্জমান আহ্বান-ধ্বনি শুনিল। তারপর বলিল, "আজ আর কারখানায় বেরুব না।"

পাভেলও ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আমিও না।"

"বাইরে থেকে একবার ঘুরে আসি"—বলিয়া ধীরে ধীরে লিটল্ রাশিয়ান চলিয়া গেল।

মাতার বিমর্ষ মুখের দিকে চাহিয়া পাভেল বলিল, "আমি জানি, আন্দ্রি এ ব্যাপারের দরুণ নিজেকে কোন মতেই ক্ষমা করবে না, কখনও না। কি বিচিত্র জীবনের আবর্ত্ত। তুমি চাও না, তবুও তোমাকেই আঘাত করতে হয়। আর কাকে আঘাত করতে হয়? ওই রকম একটা অসহায় প্রাণীকে। ও ছিল তোমার চেয়েও অসহায়, কেন না, ও ছিল একেবারে মূর্খ। তবুও আমাদেরই মত সেও মানুষ। কিন্তু একদল লোক ওদের গড়ে তুলেছে আমাদের শত্রু করে—মানুষে মানুষে তারা বাধিয়ে দিয়েছে এক অতি জঘন্য কলহ। ভয়ে চোখ অন্ধ করিয়ে, হাত পা বেঁধে তারা এক শ্রেণীর সঙ্গে আর এক শ্রেণীর সংঘর্ষ বাধিয়ে কাউকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে লাঠির কাজ, কাউকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে মুগুরের কাজ! মানুষকে ওরা করেছে অস্ত্র, আর তারই নাম দিয়েছে সভ্যতা! এই হলো পাপ, বর্ত্তমান সভ্যতার এই মহাপাপ। লক্ষ লক্ষ মানুষ, লক্ষ লক্ষ আত্মার এই নিত্য হত্যা চলেছে চারিদিকে। ওরা শুধু মানুষকে হত্যা করে না—মানুষের আত্মাকেও ওরা মেরে ফেলতে চায়। এই লিটল্ রাশিয়ান একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও দৈবক্রমে একজনকে হত্যা করে ফেলেছে কিন্তু তার ফলে তার সমস্ত মন তীব্র অনুশোচনায় আর গ্লানিতে ভরে গেছে। কিন্তু ওরা যখন একান্ত শান্ত ও ধীর ভাবে শুধু নিজেদের স্বার্থগত সুবিধাগুলি বজায় রাখার জন্যে হত্যা করে, তার পিছনে, সামনে বা উর্দ্ধে কোথাও কোনও গ্লানি থাকে না। শুধু তাদের ঘরের ছাদটুকু শক্ত করবার জন্যে, শুধু তাদের সোনা-রূপো, ঘটী-বাটী আর প্রাণহীন ছেঁড়া কতকগুলো পুরানো কাগজের পুঁটুলীকে সাবধানে রাখবার জন্যে তাদের এই নিত্য মরণ-যজ্ঞের আয়োজন। ভেতরের দিক দিয়ে নিজেদের রক্ষা করবার পথ তারা ভুলে গেছে—তাই বাইরের দিক দিয়ে আত্মরক্ষা পাবার তাদের এই বিপুল চেষ্টা। এই জীবন, এই তার গ্লানি আর তার পঙ্কিলতা যদি জীবনে কোনও দিন অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে থাক, তবে বুঝবে, আমাদের আদর্শের প্রয়োজনীয়তা কতখানি। বুঝবে আমরা যে পথে চলেছি, তার শেষে কি সুন্দর, কি সুমহান্ সার্থকতা।"

পুত্রের প্রজ্জ্বলিত আননের দিকে চাহিয়া মায়ের মনে হইতেছিল, যেন ক্ষুদ্র দীপশিখার মত সেই বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে তিনি বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছেন। উত্তেজিত হইয়া দাঁড়াইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বুঝি না? সবই বুঝি। আমিও মানুষ, কেন পারবো না আমি বুঝতে?"

এমন সময় সহসা বাহিরে পদশব্দ হইল। পাভেল বাহিরের দিকে চাহিয়াই মায়ের কানে কানে বলিল, "বোধ হয় আন্দ্রির খোঁজে পুলিশ এসেছে—"

দরজা খুলিতেই রাইবিন আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই সে কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল।

পুলিশের বদলে রাইবিনকে দেখিয়া পাভেল বলিয়া উঠিল, "ওঃ, তুমি রাইবিন—তোমাকে দেখে সত্যিই

আনন্দ হলো। কেমন আছ? কোথায় ছিলে এত দিন?"

"বেশ ভালই আছি। তোমরা ক্রমশ ভদ্দরলোক হয়ে উঠছো, আমি ক্রমশ হয়ে যাচ্ছি চাষা। এখান থেকে এদিলগায়েব গাঁয়ে গিয়ে বসবাস স্থাপন করেছি। সেখানে তোমাদের অনেক বই-ই নিয়ে গিয়েছি, তবে সরকারী বাইবেলের সাহায্যেই অধিকাংশ কাজ চালাই। মোটা বইটার মধ্যে অনেক দরকারী জিনিস আছে—অনেক জিনিস আছে যা তোমার আমার কাজে লাগতে পারে, অথচ সরকারের বলবার কিছু নেই; এবং লোকেও বিশ্বাস করে সহজে। কিন্তু আজকাল দেখছি, ওতে আর কুলুচ্ছে না। তাই এসেছি তোমাদের নতুন বইগুলো নিতে যেতে। সঙ্গে এফিম বলে একজন চাষাকে নিয়ে এসেছি। আলকাতরা চালান দেবার জন্যে সে এখানে এসেছে। কিন্তু সে আসবার আগেই বইগুলো আমাকে দিয়ে দাও—তাকে আর এ বিষয়ে জানাতে চাই না।"

মায়ের দিকে চাহিয়া পাভেল বলিল, "মা, শাগ্‌গির গিয়ে কতকগুলো বই নিয়ে এসো। কি কি বই লাগবে, তা তারা জানে। শুধু বলো গ্রামের জন্যে দরকার।"

মায়ের দিকে চাহিয়া রাইবিন হাসিয়া বলিল, "বাঃ, আপনিও তা হলে দেখছি এদের দলে জুটে গেছেন। আমাদের ওখানে এই সমস্ত বই পড়বার জন্যে বহু লোক পাগল। সেখানে আমরা একজন ভালো প্রচারক পেয়েছি। তিনি পড়ার দিকে লোকদের খুব উৎসাহ দিয়ে বেড়ান। শুনেছি লোকটি বেশ ভাল যদিও পাদ্রী। আর একজন শিক্ষয়িত্রী আছেন। তবে এঁরা সব হলেন আইন-বাগীশ-দল—বে-আইনী বই এঁরা ছুঁতেও চান না—ভয়ও করেন। কিন্তু আমি তাঁদের প্রচার-কার্য্যের বাধা দিই না। ওদেরই আঙুলের ফাঁক দিয়ে আমার বই সব চালিয়ে দেবো। দেখলেই পুলিশের লোক মনে করবে ওদেরই কাজ—আমার নাম-গন্ধও তারা পাবে না।"

রাইবিনের কথা শুনিয়া মা মনে মনে ভাবিতেছিলেন, দেখতে ভাল্লুকের মতো, কিন্তু বুদ্ধিতে এধারে ধূর্ত্ত শেয়াল!

পাভেল কিন্তু গম্ভীর হইয়া গেল। বলিল, "বই আমরা তোমাকে এখনি দিচ্ছি, কিন্তু তুমি প্রচারের যে-পন্থা অবলম্বন করেছ, তা ঠিক নয়। তোমার কাজের জন্যে সর্ব্বদাই তোমার নিজের জবাবদিহি হওয়া উচিত। অপরকে বিপন্ন করে লুকিয়ে নিজের কাজ হাসিল করা অন্যায়।"

"কি বলছো, তোমার কথা বুঝতে পারছি না!"

"পুলিশের লোকেরা যদি সন্দেহ করে যে তারা এই কাজ করছে, তা হলে তাদেরই ধরে জেলে পুরবে—"

পুরলোই বা, তাতে কি?

"কিন্তু নিষিদ্ধ পুস্তক তারা তো আসলে বিলোচ্ছে না—বিলোচ্ছো তো তুমি।"

মা দেখিলেন পাভেল রাইবিনের কথার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিতেছে না। তিনি বলিলেন, "রাইবিনের ইচ্ছে যে পুলিশ সন্দেহক্রমে অন্য লোককে গ্রেফতার করে করুক, ইত্যবসরে সে তার নিজের কাজ গুছিয়ে নেবে।"

উত্তেজিত হইয়া পাভেল বলিয়া উঠিল, "বাঃ, এ তারি মজার ব্যবস্থা! ধর আন্দ্রি যদি কোনো অপরাধ করে, আর তার জন্যে আমাকে যদি কারাগারে নিয়ে যায়?"

পাভেলের কথা শুনিয়া রাইবিন হাসিয়া উঠিল, 'তোমার বয়স এখনও অল্প. কি-না তাই এ-সব ভাবতে তোমার কষ্ট হয়! লুকোনো কাজের ধারাই এই! তারপর ধর, প্রথমত, পুলিশ যার কাছে বই পাবে তাকে ধরবে, পাদ্রীটাকে বা শিক্ষয়িত্রীটাকে ধরবে ন ; দ্বিতীয়ত, ধর তারা যে-সব বই থেকে ধর্ম্ম কথা প্রচার করে—সেখানেও এই সব কথাই লেখা আছে—তবে বিভিন্ন ধরণে ; তৃতীয়ত—তারা আমার কে? যে চলেছে পায়ে হেঁটে, আর যে যায় ঘোড়া ছুটিয়ে তাদের মধ্যে কি সম্বন্ধ হতে পারে? একজন চাষীর বেলায় হয়ত আমি এ-রকম করতে চাইতাম না—কিন্তু এই পাদ্রী বা সেই জমিদারের মেয়েটি—যিনি শিক্ষয়িত্রী সেজেছেন—আমি বুঝতে পারি না, তারা কি করে বলে জনসাধারণের মুক্তির কথা! হাজার হাজার বছর ধরে নিয়মিত ভাবে শুধু শিখে এসেছে কি করে প্রভুত্ব করতে হয়, হাজার হাজার বছর ধরে তারা শিখে এসেছে কি করে চাষাদের গায়ের চামড়া খুলে নিতে হয়—আজ দেখি হঠাৎ ঘুম ভেঙে তারা লেগে গেছে চাষাদের উন্নতির জন্যে!-এ হয় না। এ-সব রূপকথায় সম্ভবে, আর আমি রূপকথার রাজ্যে বাস করি না। জীবনকে নিয়ে রসিকতা করবার সময় বা মনোবৃত্তি আমার নেই—"

রাইবিনের কথায় বাধা দিয়া মা বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু যাদের মানব-শ্রেণীর বলে দূরে রাখছো, তাদেরও মধ্যে তো ভাল লোক আছে—যারা সত্যি সত্যিই লোকের মঙ্গলের জন্যে কারাগার পর্য্যন্ত যেতে কুণ্ঠিত নয়।"

"কিন্তু আমার মনে হয় তাদের ধারণা, তাদের

আদর্শ সম্পূর্ণ আলাদা। যে প্রবৃত্তি নিয়ে তারা জন্ম-গ্রহণ করেছে আজ সহসা সেই প্রবৃত্তি বদলে যাবার কোন কারণ ঘটেনি—অবশ্য একথা ঠিকই যে প্রত্যেক দলের ভালো-মন্দ দুই-ই আছে। কিন্তু যারা ভালো, তারা ব্যতিক্রম হিসাবেই সত্যি। যাদের জন্য এই আন্দোলন, তারাও যে খুব ভাল, তাদের মধ্যে যে খারাপ লোক নেই একথাও বলা চলে না। পাঁচ বছর ধরে ক্রমান্বয় আমি কারখানার দরজায় ঘুরে বেড়িয়েছি। তারপর হঠাৎ একদিন গ্রামে ফিরে গেলাম। সেখানে গিয়ে এখন কি মনে হচ্ছে জানো? মনে হয়, এ জীবন আরও অসহ্য। এ আমি কিছুতেই সইতে পারি না। তোমরা এখানে থাকো, তোমরা খিদে কাকে বলে তার কি জানো? সেখানে গেলেই দেখতে পাবে—ছায়ার মত এই জঠরের জ্বালা লোকের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে—এক টুকরো রুটি পাবার কোন আশা নেই—কোন সম্ভাবনা নেই। মানুষের সর্ব্বদেহ থেকে যেন মনুষ্যত্বের শেষ চিহ্নটুকুও চলে গেছে। কে বলে তারা বেঁচে আছে? দারুণ দুর্ভিক্ষে তারা শাকসব্জীর মত শুধু পচছে। আর তাদের ঘিরে চারিদিকে শকুনির মত ওরা সব পাহারা দিয়ে আছে—সে-দৃশ্য অসহ্য হলেও মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম—এইখানেই থাকবো—তাদের যে রুটি সংগ্রহ করে দিতে পারবো সে ভরসায় নয়—মনে দুরাশা হলো, এক বিচিত্র রান্না তৈরী করবো—এই দুঃখ দিয়ে, এই অপমান দিয়ে, এই লাঞ্ছনা দিয়ে—এবং সেই কাজে চাই তোমাদের সহায়তা। আমাকে শুধু দাও বই—তোমাদের লেখা—যে লেখা পড়ে লোকে এক মুহূর্ত্তও শান্তিতে বিশ্রাম করতে পারবে না। তাদের মাথায় যেন কাঁটার মত সর্ব্বদা বিঁধতে থাকবে। তোমাদের হয়ে যারা এই কারখানার লোকদের জন্যে বই লেখে তাদের বলো, গ্রামের চাষীদের জন্যেও যেন লেখে। এমন লেখা চাই যা জীবনকে ঝলসে পুড়িয়ে দেবে—লোক যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে, মৃত্যুকে আঁকড়ে ধরতে কুণ্ঠিত না হয়।”

ঊর্দ্ধে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলিয়া প্রত্যেক কথার উপর জোর দিয়া সে বলিয়া উঠিল, “মৃত্যুতে হোক মৃত্যুর ঋণ পরিশোধ। মৃত্যু তাদের হোক, তাহলে তারা আবার পাবে নতুন জীবন। মরুক কতকগুলো লোক, জগতে তাহলে বাঁচবে আরও বেশী লোক।”

রাইবিনের কথা শুনিয়া ঘাড় নাড়িয়া পাভেল বলিল, “সে কথা ঠিকই—গ্রামের জন্য একখানা আলাদা খবরের কাগজের দরকার। আমাদের মালমশলা জোগাও—আমরা ছেপে পাঠাবো—”

“এমন ভাবে লিখবে যেন গ্রামের গরু-বাছুরগুলোও বুঝতে পারে—”

এমন সময় বাহিরে পায়ের শব্দ হইতে রাইবিন পিছন ফিরিয়া দেখে যে এফিম আসিতেছে; মাথায় পাতলা চুল, ভারী মুখ, দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ। এফিম ঘরে আসিতেই রাইবিন তাহার সহিত পাভেলের পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিল, “এই এরি কথা বলছিলাম, একে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি—”

প্রীতিসম্ভাষণের পর এফিম কৌতুহল দৃষ্টি লইয়া ঘরের চারিদিকে দেখিতে লাগিল। হঠাৎ বইয়ের আলমারির দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে উঠিয়া একেবারে তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

রাইবিন চোখ ইসারা করিয়া পাভেলকে বলিল, “দেখলে, একেবারে সোজা আলমারির কাছে!”

আলমারির সম্মুখে দাঁড়াইয়া এফিম একটি একটি করিয়া বইগুলি দেখিতে লাগিল। পরম উৎসাহে সে বলিয়া উঠিল, “ওঃ, এত বই! কিন্তু এখানকার লোকদের পড়বার সময় কোথায়? গ্রামে আমাদের অফুরন্ত অবসর—”

পাভেল জিজ্ঞাসা করিল, “অবসর আছে সত্যি কিন্তু ইচ্ছা?”

“বাঃ, ইচ্ছেও আছে। এমন দিনকাল পড়েছে যে, হয় মাথা ঘামাতে হবে, চুপ করে শুয়ে মরণকে ডেকে নিতে হবে। লোকে সহজে মরতে চায় না—তাই বাধ্য হয়ে এখন তারা ভাবতে আরম্ভ করেছে, একটু একটু করে মাথা ঘামাচ্ছে। জিওলজি—এটা কি?”

পাভেল বুঝাইয়া দিল। এফিম ঘাড় নাড়িয়া বলিল, “ও সব জানবার আমাদের দরকার নেই।”

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া রাইবিন বলিল, “চাষাবা জানতে চায় না কেমন করে মাটি তৈরী হলো, তারা জানতে চায় কেমন করে তাদের হাত থেকে মাটি সরে গেল। কি কি ধাতু তাতে আছে, কি বা তার গঠন, তাতে তার কিছু আসে-যায় না। পৃথিবী দড়িতে যদি ঝুলে থাকে তবে তাই থাক—যদি তা থেকে আসে তার শস্য, আকাশে যদি ঝুলে থাকে তা-ই থাক—যদি তা থেকে আসে তার দুবেলার রুটি।”

সহসা ঘর্ম্মাক্ত, পরিশ্রান্ত ও গম্ভীর ভাবে লিটল্ রাশিয়ান প্রবেশ করিল। কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া নবাগত এফিমের সহিত নীরবে করমর্দ্দন করিয়া সে রাইবিনের পাশে গিয়া বসিল। তাহার বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া রাইবিন জিজ্ঞাসা করিল, “কি হয়েছে তোমার? এ রকম চেহারা কেন?”

"কিছু না।"

এফিম অগ্রসর হইয়া কুণ্ঠিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনিও বুঝি কারখানায় কাজ করেন?"

"হাঁ! কিন্তু এ প্রশ্ন কেন?"

এফিমের হইয়া রাইবিন উত্তর দিল, "জীবনে ও এই প্রথম সামনা-সামনি একজন মজুরকে দেখলো।"

ইত্যবসরে মা রান্নাঘর হইতে চা প্রস্তুত করিয়া হাজির হইলেন।

মায়ের ইঙ্গিতে রাইবিন একবার রান্না-ঘরে গেল।

চায়ের কাপ হাতে লইয়া এফিম পাভেলের পাশে গিয়া একান্ত মিনতির সুরে বলিল, "আমাকে একখানা বই দেবেন?"

"নিশ্চয়ই দেবো!"

আনন্দে এফিমের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—বলিল, "আমি ফেরত দেবো অবশ্য। প্রায়ই গাঁয়ের লোকেরা এখান থেকে আলকাতরা নিয়ে যেতে আসে। আমি তাদের কারুর হাতে পাঠিয়ে দেবো। জানেন না, এই সব বই আমাদের কাছে কি! আমাদের অন্ধকার ঘরে একমাত্র আলো।"

রান্নাঘর হইতে জামা বেশ ভাল রকম আঁট করিয়া লইয়া রাইবিন পুনরায় ঘরে প্রবেশ করিয়া বিদায়-অভিনন্দন জ্ঞাপন করিল।

পাভেলের নিকট হইতে একখানি বই লইয়া আনন্দোদ্ভাসিত মানসে এফিমও রাইবিনের সহিত বিদায় গ্রহণ করিল।

তাহারা বিদায় লইয়া চলিয়া গেলে লিটল্ রাশিয়ানকে উদ্দেশ্য করিয়া পাভেল বলিল, "লক্ষ্য করলে এদের?"

ধীর গম্ভীর ভাবে লিটল্ রাশিয়ান উত্তর দিল, 'হাঁ, দেখলাম। সূর্য্যাস্তের সময় মেঘের যে রূপ হয় গভীর, ঘন—গতি আছে কিন্তু মন্থর।

কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন আলুথালু ময়লা পোষাকে নিকোলে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘরে প্রবেশ করিয়াই পাভেলকে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "হাঁ হে, তোমরাও জান না, কে গরুমভকে খুন করলো?"

পাভেল উত্তর দিল, "না!"

"আঃ, লোকটা আমার কাজ মাটি করে দিলে, এখন কি করি?"

মৃদু ভর্ৎসনার স্বরে পাভেল, বলিল, "যা-তা বকো না নিকোলে!"

এত দিন পরে নিকোলেকে দেখিয়া তাহার জন্যও মায়ের অন্তরে আজ কেমন একটা স্নেহ উথলিয়া উঠিতেছিল। পাভেলের ভর্ৎসনায় ব্যথিত হইয়া মা বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ রে, তুইও ওই রকম রুক্ষ স্বরে কথা বলবি?"

মায়ের দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়া দিয়া নিকোলে বলিল, "দেখুন দেখি, এ পৃথিবীতে আমি কি করি? আমি ভাবি, অনবরত ভাবি, এ পৃথিবীতে আমার জায়গা কোথায়! অনেক দেখলাম, কোথাও আমার স্থান নেই। দুটো কথা যে লোককে বুঝিয়ে বলবো, সে শক্তিও আমার নেই। আমি সব দেখি, সব বুঝি কিন্তু কোনও মতে মনের কথা খুলে বলতে পারি না। আমারও হৃদয় আছে, কিন্তু সে হতভাগা কথা বলতে শেখেনি।"

মাথা নত করিয়া সে পাভেলের সম্মুখে গিয়া টেবিলে আঙুল ঘষিতে ঘষিতে বলিল, "দেখ, আমাকে কাজ দাও, খুব শক্ত কাজ। আমি এ রকম করে আর বেঁচে থাকতে পারি না। কোন মানে নেই, কোন মতলব নেই—কেন যে আছি, তার না আছে কোন অর্থ। তোমরা সবাই এ আন্দোলনের জন্যে খাটছো—দেখছি তোমাদের সাধনায় এ আন্দোলন বেড়ে উঠছে—আমি শুধু তার বাইরে দাঁড়িয়ে আছি শুধু কাঠ কেটেই চলেছি। কাঠ কেটে আর কত দিন বেঁচে থাকা যায়? আমাকে একটা কাজ দাও—তোমাদের সঙ্গে নাও—"

পাভেল তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই তোমাকে সঙ্গে নেবো ভাই।"

পিছন হইতে লিটল্ রাশিয়ান সমস্ত কথাই শুনিয়াছিল। পর্দা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া সে বলিল, "নিকোলে, আমি তোমাকে কম্পোজিটারের কাজ শেখাবো—তুমি আমাদের হয়ে কম্পোজিটারী করবে, কেমন?"

উল্লাসে নিকোলে বলিয়া উঠিল, "শেখাবে তো, তা হলে তোমাকে আমার এই ছুরিখানা উপহার দেবো, সত্যি!"

"দূর হো'কগে তোমার ছুরি!" বলিয়া লিটল্ রাশিয়ান হাসিয়া উঠিল।

"সত্যি বলছি, ছুরিটা যা-তা মনে করো না!"

এবার কি মনে করিয়া পাভেলও হাসিয়া উঠিল। নিকোলে অপ্রস্তুত হইয়া বলিয়া উঠিল, "বাঃ, বেশ মজা তো, আমাকে নিয়ে হাসবার কি পেলে?"

তাহার পিঠ চাপড়াইয়া লিটল্ রাশিয়ান বলিল, "আজ রাত্তিরটা ভারী সুন্দর লাগছে—চল বাইরে

একটু বেড়াতে যাই—কেন যে হাসছি তখন বলবো'খন !"

জানালায় মা দাঁড়াইয়া দেখিলেন,—বাহিরে চন্দ্রালোকে তাহারা তিন জনে চলিয়াছে। ঘরের আলো নিবাইয়া দিতে খানিকটা চাঁদের আলো ঘরের মেঝেতে আসিয়া পড়িল। সেইখানে নতজানু হইয়া জানালার বাহিরে উর্দ্ধাকাশের দিকে চাহিয়া মায়ের অন্তর বলিয়া উঠিল, প্রভু রক্ষা করো !

দিনগুলি এত তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতেছিল যে, পয়লা মে'র ব্যাপার মা ভাল করিয়া মনে ভাবিতে পারিতেছিলেন না। রাত্রি বেলায় সারা দিনের ক্লান্তির পর যখন বিছানায় শুইতেন তখনই সেই অনাগত দিনের ছায়া তাঁহার মনে আসিয়া পড়িত, একটা অজানা আশঙ্কার ব্যথা করিয়া উঠিত, আপনার মনে বলিয়া উঠিতেন, হে প্রভু, কবে কাটবে পয়লা মে'র রাত্রি !

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই কারখানার বাঁশী বাজিয়া উঠিলেই তাড়াতাড়ি কোনও রকমে হাত-মুখ ধুইয়া ডজন খানেক কাজের ভার মায়ের উপর চাপাইয়া পাভেল আর লিটল্ রাশিয়ান কারখানায় বাহির হইয়া যাইত। সারা দিন ধরিয়া চাকার মত মা ঘুরিয়া বেড়াইতেন, রান্না-বান্না করিতেন এবং সমস্ত সাংসারিক কাজ শেষ হইয়া গেলে মে'-দিবস উপলক্ষে পোষ্টার মারিবার জন্য আঠা তৈরী করিতেন। মাঝে মাঝে কোথা হইতে অচেনা লোক সব আসিয়া পাভেলের নামে চিঠি রাখিয়া যাইত—চিঠি দিয়া কোন কথা না বলিয়া আবার তাহারা অদৃশ্য হইয়া যাইত। আশঙ্কায় মায়ের মন কাঁপিয়া উঠিত।

পয়লা মে'র অনুষ্ঠানে যোগদানের আহ্বান-লিপিতে সমস্ত গ্রাম আর কারখানা ভরিয়া উঠিল। প্রতিদিন রাত্রি বেলা কখন নিঃশব্দে গাছের গায়ে, বেড়ার ধারে, এমন কি, পুলিশ-ষ্টেশনের সামনে সেই সমস্ত পোষ্টার মারা হইত। সকাল বেলাই দেখা যাইত রাগে ফলিতে ফুলিতে পুলিশের লোকেরা সেই সমস্ত পোষ্টার ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে এবং যাহাদের এই কার্য্য তাহাদের গতিবিধি বুঝিতে না পারিয়া শত অভিশাপ বর্ষণ করিতেছে। দুপুর যাইতে না যাইতেই আবার কোথা হইতে গ্রামের পথঘাট এই সমস্ত হ্যাণ্ডবিলে ভরিয়া উঠিত—সেগুলি প্রত্যেক পথিকের পায়ের তলায় গিয়া যেন গড়াগড়ি দিত। শহর হইতে গুপ্তচর আনা হইয়াছে। কারখানার পথে পথে দাঁড়াইয়া তাহারা সকলের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে। কিন্তু কাহাকেও ধরিতে পারিতেছিল না। মজুরেরা তাহাতে সবাই বেশ খুশী বোধ করিতেছিল। বুড়োরাও বেশ একটু হাসিয়া পথ চলিতে চলিতে বলাবলি করে, "একটা কিছু ঘটছে, কি বল ?"

গ্রামের চারিদিকে লোক দল বাঁধিয়া এই আবেদনের কথা আলোচনা করে। প্রত্যেকেরই জীবনে যেন অতর্কিতে এবারের বসন্তে কোথা হইতে একটা নূতন চেতনা আসিয়া লাগিয়াছে। বহুদিন পরে সবাই উত্তেজিত হইবার একটা যথেষ্ট হেতু যেন পাইয়াছে। কেহ উত্তেজিত হইয়া গোপনে বিদ্রোহীদের দেয় অভিশাপ ; কেহ অজানা আশঙ্কা আর আশার মাঝখানে দোলে। খুব অল্প সংখ্যক লোকের মনে এই সমস্ত আবেদন এক নিগূঢ় আনন্দ জাগাইয়া তোলে। এক নব জাগ্রত চেতনার স্পন্দনে আনন্দে তাহাদের অন্তর ভরিয়া ওঠে।

পাভেল আর লিটল্ রাশিয়ানের বিছানার সহিত সকল সম্পর্ক উঠিয়া গিয়াছে। ঠিক ভোর হইবার পূর্ব্বে তাহারা দুই জনে বাড়ী আসিত, ক্লান্ত, বিবর্ণ, বিশুষ্ক। মা জানিতেন যে গ্রামের বাহিরে জলা মাঠের মাঝখানে—বনে, তাহাদের নিশীথ-সভা বসে ; জানিতেন গ্রামের মধ্যে অশ্বারোহী পুলিশ পাহারায় জাগে, পথে প্রত্যেক মজুরকে ধরিয়া পুলিশের লোকেরা সার্চ করিয়া তবে ছাড়িয়া দেয়। সেই সঙ্গে ইহাও জানিতেন যে, হয়ত কোন রাত্রিতে তাহারা দুইজনেও গ্রেফতার হইয়া যাইতে পারে। মাঝে মাঝে মায়ের মনে হইত, পয়লা মে'র আগে যদি ইহারা দুইজনে গ্রেফতার হইয়া যায়, তাহা হইলে হয়ত ভালই হয়।

আশ্চর্য্যের কথা, গরমভের হত্যার ব্যাপার সম্বন্ধে পুলিশ সকল অনুসন্ধানের চেষ্টা ত্যাগ করিয়াছে—লোকেও আর সে সম্বন্ধে আলোচনা করে না। পুলিশ যখন সে ব্যাপার সম্বন্ধে একেবারে চুপ হইয়া গেল তখন একদিন বিরক্ত হইয়া লিটল্ রাশিয়ান পাভেলকে বলিল, "দেখলে ব্যাপার, ওরা যে শুধু আমাদের মানুষ বলে গণ্য করে না তা নয়, আমাদের ওপর যাদের লেলিয়ে দেয়, তাদেরও ওরা তেমনি দেখে। যতই লোকটার কথা আমাদের মনে হয়, ততই তার জন্যে আমার দুঃখ হয়—আমি তো তাকে হত্যা করতে চাই নি !"

কঠোর কণ্ঠে পাভেল বলিয়া উঠিল, "হয়েছে, থামো, আন্দ্রি !"

সান্ত্বনা দিবার জন্যে মা বলেন, "তোর কি অপরাধ ? একটা পচা জিনিসের সঙ্গে তোর হঠাৎ

ধাক্কা লেগে গিয়েছিল—তাতে সে জিনিসটা পড়ে গেছে পচা ছিল বলেই না?"

"হয়ত তোমার কথাই সত্যি মা! কিন্তু তবু এ আমার অন্তরের সান্ত্বনা নয়।"

অবশেষে একদিন রাত্রি-শেষে পয়লা মে'র প্রথম সূর্য্যকর দ্বারে আসিয়া করাঘাত করিল। প্রভাতে তেমনি কারখানার বাঁশী বাজিয়া উঠিল—দীর্ঘ, কর্কশ, কঠোর! সারা রাত্রি মা নিদ্রা যাইতে পারেন নাই। কারখানার বাঁশী শুনিয়াই বিছানা হইতে উঠিয়া তিনি সামোভারে আগুন জ্বালাইতে চলিলেন। আগুন জ্বালাইয়া প্রতিদিনের মত পাভেল আর লিটল্ রাশিয়ানের ঘরের সম্মুখে আসিয়া তাহাদের ডাকিতেই, তাহার মনে পড়িল, আজ পয়লা মে! নির্ব্বাক্ হইয়া তিনি মুক্ত জানালার নিকটে গিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাত্রিশেষে নীলাভ আকাশে প্রথম অরুণ-রাগ-স্পর্শে রঞ্জিত হইয়া রক্তাভ মেঘখণ্ডগুলি দ্রুত ভাসিয়া চলিয়াছে, যেন যন্ত্রের ধূমোদ্গারের ভীষণ রবে ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া আকাশচারী কোন বিহঙ্গমের দল নীড়াভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। আপনার মধ্যে আপনি মগ্ন হইয়া মা সেই মেঘের গতির দিকে চাহিয়াছিলেন। একটা আশ্চর্য্য রকমের প্রশান্তি তাঁহারও অন্তর ভরিয়া বিরাজ করিতেছিল। হৃদয়ের গতিও সহজ মৃদু ছন্দে বহিতেছিল এবং মনে মনে তিনি এই প্রতিদিনের জীবনের সহজ সুখ-দুঃখের কথাই আপনার অজ্ঞাতসারে ভাবিতেছিলেন।

দ্বিতীয় বার কারখানার বাঁশী বাজিয়া উঠিল। মায়ের মনে হইল, আজ বাঁশীর আহ্বান যেন দীর্ঘতর শোনাইতেছে। এমন সময় শুনিলেন, স্বভাবকোমল কণ্ঠস্বরে নিদ্রাজড়িত ভাবে লিটল্ রাশিয়ান পাভেলকে বলিতেছে, "বন্ধু, শুনছো, ঐ ডাকছে!"

বাহির হইতে মা প্রতিদিনের মত জানাইলেন, "আগুন তৈরী।"

সহাস্য কণ্ঠে পাভেল উত্তর দিল, "আমরাও প্রস্তুত!"

জানালার নিকটে আসিয়া বাহিরের আকাশের দিকে চাহিয়া লিটল্ রাশিয়ান আপনার মনে বলিয়া উঠিল, "সেই সূর্য্য আজও উঠেছে, মেঘেরা তেমনি চলেছে ছুটে, কিন্তু আজ যেন মনে হয় কোথায় এদের সঙ্গে যোগ ছিন্ন হয়ে গেল।"

বাহিরে আসিয়া মাকে দেখিয়া প্রাতরভিবাদন জানাইতেই মা তাহার নিকটে অগ্রসর হইয়া কানে কানে বলিলেন, "আজ ওর সঙ্গ-ছাড়া তুই হস্ নি!"

"কখনই না। তুমি নিশ্চিন্ত থেকো মা, এ শুধু আজ বলে নয়, চিরদিনই তার চেষ্টা করবো।"

ঘর হইতে বাহির হইয়া তাহাদের উভয়কে একত্র দেখিয়া পাভেল বলিয়া উঠিল, "চুপি চুপি কি ষড়যন্ত্র হচ্ছিল?"

গরম জলে হাত-মুখ ধুইতে ধুইতে লিটল্ রাশিয়ান বলিল, "কিছু না! মা বলছিলেন যে ভালো করে হাত-মুখগুলো ধুতে, যাতে মেয়েদের দৃষ্টি তোর চেয়ে আমার উপর বেশী পড়ে, বুঝলি?"

পাভেল তখন আপনার মনে গুন-গুন করিয়া গাহিতেছিল, "জাগো, জাগো হে নিপীড়িত মানব!"

বেলা বাড়িতে লাগিল। বায়ু-বিতাড়িত হইয়া কখন আকাশ হইতে মেঘের দল অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। মা চায়ের আয়োজন করিতেছিলেন আর তাহাদের দুইজনের সহাস্য রসিকতা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছিলেন, কয়েক ঘণ্টা পরে জীবনে যাহাদের কি হইবে কিছুরই স্থিরতা নাই তাহারা কেমন নিরঙ্কুশ নিঃশঙ্ক অবস্থায় আলাপ করিতেছে! সকলের চেয়ে মায়ের আশ্চর্য্য লাগিল – কোথা হইতে তাঁহারও অন্তরে এক অপূর্ব্ব প্রশান্তি আসিয়া দেখা দিয়াছে।

চায়ের টেবিলে আজ তাহারা অনেকক্ষণ ধরিয়া চা-পান করিল। পাভেল প্রতিদিন ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে চায়ের কাপে চিনি মিশাইত, আজ যেন কাপের মধ্যে চামচটিকে বারে বারে ধীরে ধীরে নাড়িতেই তাহার ভাল লাগিতেছিল। টেবিলের আড়ালে লিটল্ রাশিয়ান অনবরত পা নাচাইতেছিল—একবারও সে পা দুটিকে স্থির করিতে পারিতেছিল না এবং মুক্ত বাতায়ন দিয়া আগত সূর্য্যকরের গতিস্পন্দনের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল।

বহুক্ষণ দেওয়ালে-পড়া রৌদ্রটুকুর দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে লিটল্ রাশিয়ান বলিয়া উঠিল, "তখন আমার দশ বছর বয়স, ছোট্ট ছেলে—সাধ গিয়েছিল কাচের গেলাসে রোদ ভরে রাখবো। একদিন একটা কাচের গেলাস নিয়ে আস্তে আস্তে দেওয়ালের কাছে গিয়ে রোদটুকু গেলাসে পুরে নেবো ভেবে গেলাসটা সজোরে দেয়ালে বসিয়েছি—আর যায় কোথা! কাচের গেলাস টুকরো টুকরো হয়ে মাটিতে পড়ে গেল—হাত গেল কেটে, তার উপর হলো প্রহার। বড় রাগ হলো সূর্য্যের ওপর। প্রহারান্তে বাইরে গিয়ে দেখি একটা ডোবার জলে এসে পড়েছে সূর্য্যের আলো। প্রাণের আনন্দে জলে লাথি মারতে লাগলাম। ফলে সর্ব্বাঙ্গ ভরে গেল কাদায়। ফলে আর একবার হলো প্রহার।

তখন আর কি করি? জানালার উপর বসে আকাশের দিকে চেয়ে সূর্য্যকে ডেকে বললাম, 'আমার এই কচুটি, আমায় তো লাগেনি!' দু'বার আকাশের দিকে চেয়ে মুখ ভ্যাংচালাম, আর তখন যেন একটু শান্তি এলো।"

এই সমস্ত অবান্তর কথায় মায়ের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতেছিল। তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "আজকের শোভাযাত্রার কি আয়োজন হবে সেই কথাই এখন ভাব।"

পাভেল মৃদু হাসিয়া বলিল, "সমস্ত বন্দোবস্তই ঠিক হয়ে গিয়েছে।"

লিটল্ রাশিয়ান তেমনি উদাস দৃষ্টিতে বলিয়া উঠিল, "একবার যে জিনিস স্থির হয়ে গেছে, তা নিয়ে আর আলোচনা করা বৃথা—তাতে শুধু মনটা গুলিয়ে ওঠে। যদি আমরা গ্রেপ্তার হই—তা হলে নিকোলে এসে তোমাকে সব খবর দেবে এবং তুমিই বা কি করবে তা তার মুখ থেকে জানতে পারবে।"

"চল, এবার বেরিয়ে পড়ি," পাভেল বলিয়া উঠিল।

"আঃ—অত ব্যস্ত কেন? এত সকাল থেকেই পুলিশের চোখের সামনে ঘুরে বেড়িয়ে কি লাভ হবে?"

এমন সময় ফিডিয়া উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া ছুটিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। চীৎকার করিয়া উঠিল, "যাত্রা আরম্ভ হয়েছে। দলে দলে লোক কারখানা ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। কারখানার ফটকে নিকোলে গুসেভ্‌রা দুই ভাই আর সামোলভ বক্তৃতা দিচ্ছে! আর নয়, তোমরাও এসো এবার। আমি এখনই যাই।"—বলিয়াই যেমন ঝড়ের মতন আসিয়াছিল তেমনি ঝড়ের মতন চলিয়া গেল।

পাভেল ও লিটল্ রাশিয়ান যাত্রার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখিল, মা-ও সাজগোজ করিতেছেন।

"কোথায় যাবে মা?"—পাভেল জিজ্ঞাসা করিল।

"কেন তোদের সঙ্গে।"

"তাই চল। কিন্তু মা, আমিও তোমাকে কোন কথা বলতে চাই না—তুমিও আমাকে কোন কথা বলো না। কেমন?"

"বেশ তাই হবে, তাই হবে।"

বাহিরে আসিতেই মা শুনিলেন কোথা হইতে ছুটির দিনের গুঞ্জনের মত এক সমবেত শব্দ উঠিতেছে। পথ দিয়া চলিবার সময় দেখেন চারিদিক হইতে লোকে পাভেল ও লিটল্ রাশিয়ানের দিকে চাহিয়া আছে। দরজায়, ফটকে, জানালায়, চারিদিকে লোক—আর সবাই উৎসুক দৃষ্টিতে তাঁহাদের দিকেই চাহিয়া আছে।

শুনিলেন, লোকে তাহাদের দুই জনকে দেখাইয়া বলাবলি করিতেছে, এই দুই জন হল আসল নেতা।

চারিদিক হইতে নানা রকমের কথা উঠিতেছে। জসিমভের বাড়ীর পাশ দিয়া যাইবার সময় ভাঙা পায়ে লাঠির ভর দিয়া জসিমভ জানালা হইতে গলা বাড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "শুনছো পাভেল, ও-সব চালাকি রেখে দাও—যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর পাবে'খন—যাও না!" জসিমভ ঘরে বসিয়া ভাঙা পায়ের জন্যে কারখানা হইতে পেন্সন পাইত।

একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া পাভেলকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ হে, শুনছি নাকি তোমরা আজকে একটা ভয়ানক কাণ্ড করবে, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ঘরে গিয়ে তার দোর-জানালা ভেঙে ফেলবে?"

হাসিয়া পাভেল উত্তর দিল, "কেন, আমরা কি মাতাল?"

তাহাকে বুঝাইয়া লিটল্ রাশিয়ান বলিল, "আমরা ও-সব কিছুই করবো না—আমরা শুধু আমাদের পতাকা-হাতে রাস্তা দিয়ে গান গেয়ে যাব—সেই গানেই থাকবে আমাদের প্রাণের কথা—"

আর একজন আসিয়া মাকে দেখিয়া গম্ভীর ভাবে জানাইল, "ওবা দেখছি সত্যিই বলতো—তুমিই তা হলে কারখানায় লুকিয়ে বই দিয়ে যেতে, না?"

কথাটা পাভেলের কানে যাইতেই সে জিজ্ঞাসা করিল, "কে বলে এ কথা?"

"কে আর বলবে? লোকের এই ধারণা।" বলিয়া লোকটি চলিয়া গেল।

লোকে যে এই কথা জানিতে পারিয়াছে, তাহাতে মা মনে মনে আনন্দিতই হইলেন। মায়ের দিকে ফিরিয়া পাভেল হাসিয়া বলিল, "মা গো, এবার তোমাকেও দেখছি জেলে যেতে হবে।"

"দরকার হয় তো যাব, তাতে কি!"

ক্রমে সূর্য্য আরও প্রখর হইয়া উঠিল। স্বচ্ছ সূর্য্যালোক আসিয়া সমগ্র গ্রামখানিকে বাসন্তী শোভায় ভরিয়া তুলিল। যত বেলা হইতে লাগিল, রাস্তায় জনতা ততই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমশ জনতার গুঞ্জনের অন্তরালে কখন কারখানার যন্ত্রের ঘর্ঘর ধ্বনি ডুবিয়া গেল।

পথের এক কোণে নিকোলে তাহার সাধ্যমত বক্তৃতা দিতেছিল। বলিতেছিল,..."ফল থেকে যেমন রস নিঙড়ে বার করে, তেমনি করে তারা আমাদের জীবন থেকে সমস্ত আনন্দ, সমস্ত অনুভূতি নিঙড়ে বার করে নিয়েছে।"

জনতার মধ্য হইতে প্রতিধ্বনির মত শব্দ জাগে, "সত্যি, সত্যি!"

নিকোলেকে অবসর দিবার জন্য লিটল্ রাশিয়ান ইঙ্গিতে তাহাকে সরিয়া যাইতে বলিয়া স্বয়ং বক্তৃতা-মঞ্চে আরোহণ করিল।

"কমরেড, ওরা আমাদের শিখিয়েছে যে, জগতে নানান জাতি আছে, জার্ম্মাণ, ফরাসী, ইংরেজ, য়িহুদী—আরও কত কি! কিন্তু আসলে জগতে আছে দুটো জাত—মাত্র দুটো। একেবারে বিভিন্ন জাত—এক জাতের নাম দরিদ্র, অন্য জাতের নাম ধনী। তারা কথা বলে আলাদা রকমের, তারা পোষাক পরে আলাদা রকমের, ধর্ম্ম তাদের আলাদা রকমের। ধনী ইংরেজ, ধনী জার্ম্মাণ, ধনী রুশ যখন তাদের নিজেদের দেশেরই দরিদ্র শ্রমজীবীদের সঙ্গে ব্যবহার করে তখন তারা সবাই এক। আর এই আমরা দরিদ্র রুশ-শ্রমজীবী, দরিদ্র ফরাসী-শ্রমজীবী, দরিদ্র ইংরেজ-শ্রমজীবী যে কুকুর-বেড়ালের জীবন যাপন করতে বাধ্য হই—সেখানেও আমরা এক।..."

ক্রমশ জনতা বাড়িয়া ওঠে। উৎসুক আগ্রহে গলাগলি দাঁড়াইয়া নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে সবাই শোনে—

"...অপর দেশের শ্রমিকেরা এই সহজ সত্য বুঝতে পেরেছে তাই আজ মে মাসের এই প্রথম দিনে, তারা সকল দেশের শ্রমিকদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্যে উৎসবের আয়োজন করে। এই দিন তারা সব কাজ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। এক-দিনের জন্যে তারা উদার আকাশের তলায় পরস্পরকে ভাল করে দেখে, বোঝে; এবং সকলে মিলে সেই দেখাশোনার মধ্যে দিয়ে জেগে ওঠে সকল জাতির শ্রমিকদের সম্মিলিত শক্তির সম্ভাবনার কথা। প্রত্যেকের বুকে জেগে ওঠে এক পরম আত্মীয়তা—প্রত্যেকের মনে জাগে এই মুক্তি-পণ, প্রয়োজন হলে জীবন-আহুতি দিতে হবে জগতের সকলের মুক্তির জন্যে, সত্যের মুক্তির জন্যে..."

এমন সময় জনতা হইতে কয়েকটি কণ্ঠে চীৎকার ধ্বনিয়া উঠিল, "পুলিশ!"

বড় রাস্তা হইতে বার জন অশ্বারোহী সৈন্যকে আসিতে দেখিয়া জনতা দেখিতে দেখিতে ভাঙিয়া গেল। লিটল্ রাশিয়ান এক কোণে সরিয়া দাঁড়াইল। অশ্বারোহীরা চলিয়া গেল, সে, পাভেল ও মায়ের সঙ্গে আবার পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

পার্কের নিকটে আসিয়া দেখিল সেইখানেই সমস্ত লোক এখনও সমবেত হইয়া আছে। পাভেলরা জনতার মধ্য দিয়া প্রবেশ করিল। তাহাদের দেখিয়া সকলেই একেবারে নীরব হইয়া গেল।

একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়াইয়া পাভেল সেই জনতাকে আহ্বান করিতে সকলের মৌন দৃষ্টি তাহার উপর গিয়া পড়িল। পাভেল বলিয়া উঠিল, "ভাইরা সব, আজ সময় এসেছে আমাদের এই জীবন-ধারা পরিবর্ত্তন করে এই লোভে কুৎসিত, অন্ধকারে ম্রিয়মাণ, মিথ্যায় পঙ্গু, অনাচারে ব্যর্থ জীবন পরিবর্ত্তন করে বিশ্ব-জোড়া মানুষের সমাজে আমাদের মানবত্বকে তুলে ধরবার!"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর পাভেল আবার বলিয়া চলিল, "কমরেড, তাই আজ আমরা স্থির করেছি, প্রকাশ্য ভাবে আত্মপরিচয় দেব—জানাবো আমরা কারা, কি চাই! তাই আজ তোমাদের সকলের সম্মুখে এই পতাকা তুললাম—এই সত্যের, ন্যায়ের ও মুক্তির পতাকা!"

পাভেলের উদ্যত হস্তে শূন্যে পতাকা দুলিয়া উঠিল। রক্তবর্ণ এক বিরাট বিহঙ্গমের মুক্ত পক্ষের মত জনতার মাথার উপর পতাকা নড়িয়া উঠিল।

পাভেল পতাকা হস্তে চীৎকার করিয়া উঠিল, "দীর্ঘজীবী হোক আমাদের এই বঞ্চিত শ্রমিকদের দল!"

জনতার মধ্য হইতে শত কণ্ঠে প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিল, "দীর্ঘজীবী হোক আমাদের সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি, আমাদের সঙ্ঘ, আমাদের জননী!"

প্রতিধ্বনির উত্তরে পাভেল চীৎকার করিয়া উঠিল, "দীর্ঘজীবী হোক সকল দেশের সকল জাতির নির্য্যাতিত মানুষের দল!"

জনতার মধ্য হইতে সহস্র কণ্ঠে এক বাণীহীন বিরাট আনন্দ-উচ্ছ্বাস জাগিয়া উঠিল।

মা পাভেলের নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলেন। উৎসাহে পুত্রের হাত জড়াইয়া ধরিতে গিয়া তিনি আর একজন অপরিচিতের হাত জড়াইয়া ধরিলেন। তখন মায়ের চোখ দিয়া আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল।

উন্মাদ জনতাকে শান্ত করিয়া আবার লিটল্ রাশিয়ানের কণ্ঠস্বর জাগিয়া উঠিল, "বন্ধুরা সব, আজ এক নতুন দেবতার নামে, সাম্যের, প্রীতির ও মুক্তির দেবতার নামে আমরা এক দীর্ঘপথে তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছি। বহু দূর-পথ, বড় বন্ধুর! সেখানে পৌঁছতে হবে—জানি সে অনেক দূর, আর এও জানি কাঁটার মুকুট আছে খুবই কাছে—বুকের ভেতরে। এই জনতার মধ্যে যে আছ অবিশ্বাসী সত্যের অদম্য শক্তিতে, যে আছ ভীরু, সত্যের জন্যে পারবে না

মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে, নিজেকে যে আজও চেনো নি, জানো নি, বেদনার ভয়ে পঙ্গু হয় চিত্ত, সে আজ এসো না আমাদের এই তীর্থযাত্রায়। আজ আমাদের এই আহ্বান শুধু তাকে, যে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করেছে আমাদের এই আদর্শকে। কে আজ আত্মবিশ্বাসী, কে আছ বন্ধু, এগিয়ে এসো আমাদের সঙ্গে, আজ এই মে মাসের প্রথম দিনে, মুক্ত-চিত্ত মানুষের এই মহা-মহোৎসবের দিনে!"

পাভেল পতাকা হাতে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পিছনে দেখিতে দেখিতে বিরাট জনতা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহারা আগাইয়া চলিল—শতকণ্ঠে সঙ্গীত জাগিয়া উঠিল:

'জাগো জাগো হে নির্য্যাতিত শ্রমিকের দল,
ঐ রণভেরী বাজে, এগিয়ে চল হে—
ক্ষুধিত-মানবের দল।"

মা বহুবার এই সঙ্গীত শুনিয়াছিলেন—চাপা গলায় চুপি চুপি পাভেল গাহিত—লিটল্ রাশিয়ান তাহার সঙ্গে শীষ দিত। সেদিন বোঝেন নাই—আজ বুঝিলেন সেই সঙ্গীতের সার্থকতা কোথায়।

"এগিয়ে চল যেখানে রয়েছে বেদনা-বিদ্ধ
বন্ধুরা সব—"

জনতার চাপে মা ক্রমশ পুত্রের নিকট হইতে পিছাইয়া পড়িতেছিলেন। তিনি শুধু চাহিয়া ছিলেন পাভেলের হাতের রক্ত-পতাকার দিকে। সকলের দৃষ্টি ছিল সেই দিকেই এবং সবাই সচেষ্ট কোন রকমে সেই পতাকার নিকট স্থান অধিকার করিতে। জনতার মধ্যে প্রত্যেকে আপনার উচ্ছ্বাসে কথা কহিতেছিল কিন্তু প্রত্যেকের এই বিচ্ছিন্ন কথার উর্দ্ধে জাগিয়া উঠিতেছিল নূতন দিনের এই নূতন সঙ্গীত! অতীত দিনের অন্ধবিলাপ তাহাতে ছিল না! নির্বীর্য্য বিষণ্ণতার ম্লান অরণ্যপথে যে অসহায় চিত্ত কাঁদিয়া বেড়ায়, এ তাহার বাণী নয়! রুদ্ধ-শ্বাস বদ্ধ-ঘরে একটুকু নিশ্বাস লইবার জন্যে যে আকুতি—এ তাহার সুর নয়! ভাল-মন্দ একসঙ্গে ভাঙিয়া ফেলিবার জন্য ক্ষুব্ধ আক্রোশের উচ্ছ্বাসও ইহাতে ছিল না—আদিম আরণ্যক প্রবৃত্তির দোহাই দিয়া স্বাধীনতার জন্যে স্বাধীনতা ছিনাইয়া আনিবার কথাও ইহাতে নাই। এ সঙ্গীত ফুটিয়া উঠিয়াছে অতি সহজ, সরল, সবল এক ভঙ্গীতে। নির্য্যাতিত মানুষের বেদনার কথা, যে-বেদনা সে পাইয়াছে—ভবিষ্যতে এখনও যাহা তাহাকে পাইতে হইবে—;

যুদ্ধের জন্য জারের চাই সৈন্য!
তোমরা দিয়েছ তোমাদের বুকের সন্তানদের
সেই জন্য—

সহসা মা দেখিলেন, রাস্তার মোড়ে পাঁচিলের মত একটা নিশ্চল মানুষের পাঁচিল দাঁড়াইয়া আছে ইটের মত তাহাদের প্রত্যেকের চেহারা এক এবং ম ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন, দেখিলেন যেন তাহাদের কাহারও মুখ নাই। প্রত্যেকের কাঁধের উপর শুধু তরবারি সূর্য্যকরে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। সেই নিশ্চল পাঁচিলের দিক হইতে একটা তীব্র হিমানী-প্রবাহ যেন জনতার বুকে আসিয়া লাগিল। মা সমস্তই অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।

শুনিলেন পাভেল চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "বন্ধুরা সব, এমনি এগিয়ে চলতে হবে—সারা জীবন। এ ছাড়া আর গতি নেই—এগিয়ে এস, এগিয়ে চল বন্ধু!"

সহসা সঙ্গীতের সম্মিলিত সুর কাটিয়া গেল। মাত্র কয়েকটি কণ্ঠে সঙ্গীত ধ্বনিয়া উঠিতেছিল। মা চাহিয়া দেখিলেন, জনতা দাঁড়াইয়া আছে, জনতাকে ছাড়াইয়া মাত্র কয়েকটি লোক গান গাহিতে গাহিতে আগাইয়া চলিয়াছে। তাদের সামনে পতাকা-হস্তে পাভেল, পার্শ্বে লিটল্ রাশিয়ান।

মা শুনিলেন, ফিডিয়ার কণ্ঠস্বর, "জীবনের সংগ্রামে—"

কে একজন তাহারই সূত্র ধরিয়া গাহিল, "তোমরাই দিয়াছ আত্মবলি—"

ভাল করিয়া চারিদিক চাহিতেই দেখিলেন, কখন জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। পিছনে আর তিনি ফিরিয়া চাহিলেন না, শুনিলেন, ছুটিয়া পলাইবার শব্দ হইতেছে। সম্মুখে দেখিলেন মাত্র জন বারো লোক সেই নিশ্চল মানুষের পাঁচিলের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। এমন সময় কঠোর কঠিন কণ্ঠে কে আজ্ঞা দিল, "বেয়নেট চালাও!"

মা চাহিতে চেষ্টা করিলেন, মনে হইল তিনি যেন অসীম অনন্তের দিকে চাহিয়া আছেন। ধীরে ধীরে তিনি পাভেল এবং লিটল্ রাশিয়ানের দিকে আগাইয়া চলিলেন। দেখিলেন লিটল্ রাশিয়ান তাহার দীর্ঘ দেহ লইয়া পাভেলকে আগাইয়া সবার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। পাভেল ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল, "এ কি, আমার সামনে এসে দাঁড়ালে কেন?'

তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া দুই হাত পিছনে দিয়া লিটল্ রাশিয়ান গান গাহিয়া আগাইয়া আসিল।

পাভেল চীৎকার করিয়া উঠিল, "পাশে এস, পতাকা থাক সকলের আগে!"

এমন সময় পাঁচিল নড়িয়া উঠিল। একজন অফিসার আগাইয়া আসিয়া মাটিতে পা ঠুকিয়া হুকুম করিল, "ফিরে যাও বলছি।"

মা দেখিলেন প্রচুর সূর্য্যকরে অফিসারটির পোষাকের পালিস ঝিক্‌মিক করিয়া উঠিল। আচ্ছন্নের মত মা আগাইয়া চলিলেন। পিছনে আর ফিরিয়া চাহিলেন না; স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছিলেন যে, জনতা বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে, ঝড়ো-হাওয়ায় শুকনো পাতার মত তাহারা কোথায় ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে।

যে কয়েক জন লোক আগাইয়া চলিয়াছিল, তাহারা পতাকাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। হুকুম হইল, "পতাকা কেড়ে নাও।"

মা শুনিলেন দূর হইতে কাহারা চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "পাভেল, পালিয়ে এস!"

"পতাকাটা ফেলেই দাও না!"

নিকোলে পাভেলের পিছন হইতে বলিল, "পতাকাটা আমার হাতে দাও, আমি লুকিয়ে ফেলি।"

নিকোলের দিকে না চাহিয়া পাভেল গৰ্জ্জিয়া উঠিল, "চুপ কর বলছি!"

নিকোলে পতাকা লইবার জন্য হাত বাড়াইয়াছিল —মনে হইল তাহার হাতে কে যেন জ্বলন্ত অঙ্গার ফেলিয়া দিল।

"কেড়ে নাও এক্ষণি!"

একজন সৈন্য লাফাইয়া পাভেলের হাত হইতে পতাকাটি ছিনাইয়া লইল। রক্ত-পতাকাটি উর্দ্ধে একবার নড়িয়া উঠিয়া একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

"গ্রেপ্তার কর!"

বেয়নেট আগাইয়া কয়েক জন সৈনিক অগ্রসর হইল। মা শুনিলেন, কাতর কণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল, "ওঃ!" উন্মাদের মত মা চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

শুনিলেন, সৈন্যদের ভিড়ের মধ্য হইতে পাভেলের স্পষ্ট স্বর, সে বিদায় চাহিতেছে, 'মা গো, বিদায়!'

শুনিলেন লিট্‌ল্ রাশিয়ান বলিতেছে, "আসি মা!"

বুকের মধ্যে কে যেন পরম আশ্বাসে বলিয়া উঠিল, তারা বেঁচে আছে তা হলে!

কোনও রকমে দুইটি হাত উর্দ্ধে তুলিয়া তাহাদের বিদায়-সম্ভাষণের প্রত্যুত্তর দিলেন। তারপর তাহাদের শেষ বার দেখিয়া লইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন! দেখিলেন, আন্দ্রির সুগোল মুখখানি তাঁহার দিকে ফিরিয়াই হাসিতেছে।

মা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "ওরে এণ্ড্রয়াসা, ওরে পাশা—" অদূরে তাহারা শেষ বার সহকর্ম্মী বন্ধুদের নিকট বিদায় লইতেছিল, বলিতেছিল, "বিদায়, বন্ধুরা সব, বিদায়!"

শুনিলেন বহুমিশ্রিত ভগ্নকণ্ঠে উত্তর ধ্বনিয়া উঠিল, "বিদায় বন্ধু, বিদায়!"

সহসা মা শুনিলেন, একজন সৈন্য রূঢ়ভাবে তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া বলিতেছে, সরে যা এখান থেকে মাগি!

আপাদমস্তক তাহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেই মায়ের দৃষ্টি পড়িল,—সৈন্যটির পায়ের তলায় পাভেলের হাতের পতাকার অংশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে। ধীরে নত হইয়া সেই ছিন্ন-পতাকা হইতে একটা লাল টুক্‌রা তুলিয়া লইতেই সৈনিকটি জোরে তাঁহার হাত হইতে তাহা ছিনাইয়া লইয়া পায়ের তলায় ফেলিয়া ঘষিতে লাগিল!

এমন সময় অদূরে শোনা গেল দুইটি কণ্ঠের মিলিত সঙ্গীত—

"জাগো হে নিদ্রিত শ্রমিকের দল!"

সেই সঙ্গীতে অফিসার ক্ষিপ্ত হইয়া সৈন্যদের লক্ষ্য করিয়া হুকুম দিলেন, সার্জ্জেণ্ট ক্রোভ, গান থামাও!"

কে বলিয়া উঠিল, "মুখ বন্ধ করে দাও ওদের!"

সহসা গানের ভাষা মাঝপথে যেন ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল; অবশেষে ক্ষীণ স্বরটুকুও একবার যেন কাঁপিয়া উঠিল, তারপর সব নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

সার্জ্জেণ্টটি চলিয়া গেলে মা সেই মথিত পতাকার অংশটুকু বুকের মধ্যে লইয়া ফিরিয়া চলিলেন। কিছু দূর যাইতে না যাইতেই এক গলির মুখে দেখিলেন, বহু লোক তখনও জটলা বাঁধিয়া রহিয়াছে।

একজন বলিতেছে, "মনে রেখো, শুধু বাহাদুরী দেখাবার জন্যে তারা আজ বেয়নেটের মুখে এগিয়ে যায় নি—"

কেহ বলিতেছে, "সৈন্যগুলোর সামনে যখন এগিয়ে গেল—দেখেছিলে, ওঃ—"

"একবার পাভেলের কথা ভাব—"

"লিট্‌ল্ রাশিয়ান কম কি?"

"তা বটে, হাত পেছনে পিছ-মোড়া করে বেঁধেছে—কিন্তু হাসিটুকু মুখে লেগেই আছে—"

সহসা তাহাদের সেই প্রশংসার বাণী শুনিয়া মা বলিয়া উঠিলেন, 'ভগবানের দোহাই, তোরা শোন। তোরা সবাই এত ভালো—একবার শুধু তোরা তোদের হৃদয়-মন খুলে দেখ। সমস্ত ভয় দূর করে দিয়ে তোরা একবার স্পষ্ট করে চেয়ে দেখ দেখি—দেখ আমাদের

বুক-চেরা ধন সব চলেছে এগিয়ে জগতের পথে—সত্যকে খুঁজে বার করবার জন্যে; আমাদের দেহের রক্ত আজ মূর্ত্তি ধরে, ওরে চেয়ে দেখ, চলেছে একলা পথে। তোদের জন্যে, তোদের সকলের কল্যাণের জন্যে, তারা আহুতি দিতে চলেছে তাদের প্রাণ। তারা তাদের আলো দিয়ে নতুন সূর্য্য গড়তে চায়, তাদের জীবন দিয়ে তারা চায় নতুনতর জীবন গড়ে তুলতে—কল্যাণে সুন্দর, সত্যে সুমহান্ নতুনতর এক বিরাট জীবন—"

সহসা মায়ের মনে হইল যেন দেহের অভ্যন্তরে হৃৎপিণ্ড স্থানচ্যুত হইয়া গিয়াছে, গলা শুকাইয়া আসিল। অন্তরের অন্তস্তলে কোথায় কোন্ গভীরতম প্রদেশে সর্ব্বব্যাপী এক সর্ব্বংসহা প্রেমের মহাবাণী নবজন্ম লাভ করিতেছিল—তাহারই জন্মবেদনায় তাঁহার মাতৃদেহ জীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, লোকে মন্ত্রমুগ্ধের মত নীরবে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে—তাঁহার কথা শুনিবে বলিয়া সকলেই উদ্‌গ্রীব।

"চেয়ে দেখ, আনন্দ-লোকের দিকে চলেছে আমার আনন্দ গোপালরা। তোদের সকলের জন্যে, তোদের সকলের সুখের জন্যে, সমস্ত অনাচারের বিরুদ্ধে আজ তারা যাত্রা করলো। এই দুঃখিনী মায়ের একমাত্র অনুরোধ—তাদের তোরা ত্যাগ করিস্ না, পথে তাদের একলা দাঁড় করিয়ে তোরা পালিয়ে যাস্ নি। নিজেদের দিকে চেয়ে, নিজেদের লজ্জা করতে শেখ। তাদের কথা মনে করে ভালবাসতে শেখ।"

সহসা মায়ের সর্ব্ব-দেহ অবশ হইয়া আসিল। মূর্চ্ছিত হইয়া তিনি সেইখানেই পড়িয়া গেলেন।

দ্বিতীয় ভাগ

নানা রঙের আবছায়া স্মৃতির অস্পষ্টতার মধ্যে সেদিন মায়ের আচ্ছন্নের মত কাটিয়া গেল। সারা দেহে ও মনে অবসাদের গ্লানি। মাঝে মাঝে চলিয়া-যাওয়া ছেলে কয়টির মুখ মনে পড়ে। ভাব ঘোরে দেখেন,—তাহারা চলিয়াছে, পতাকা দুলিতেছে, পুলিশের লোকটি ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়াইতেছে। গানের শব্দ কানে আসিয়া লাগে, তারপর সমস্ত পাংশু হইয়া যায়। সেই পাংশু মহাশূন্যতার মধ্যে ফুটিয়া উঠে রৌদ্রে-পুড়িয়া-যাওয়া পাভেলের মুখখানি আর সেই সঙ্গে আন্দ্রির দু'টি চোখ,—আকাশের মত স্বচ্ছ নীল।

অস্থির হইয়া ঘরময় ঘুরিয়া বেড়ান, কখনও জানালায় গিয়া বাহিরে পথের দিকে চাহিয়া থাকেন; আবার কি মনে করিয়া জানালা হইতে সরিয়া আসিয়া মাটির দিকে মাথা নীচু করিয়া ঘরময় ঘুরিয়া বেড়ান। চলিতে-ফিরিতে চমকাইয়া ওঠেন। লক্ষ্যহীন ভাবে ঘরের চারিদিকে কি যেন খুঁজিবার জন্য চাহিয়া দেখেন। বার বার জল খান কিন্তু তৃষ্ণা তবুও দূর হয় না। ভিতরের দাবাগ্নি-জ্বালা কিছুতেই নিবে না। আজিকার দিনটাকে যেন নিষ্ঠুর আঘাতে কে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। সূর্য্যোদয়ে ছিল উৎসাহ, ছিল নির্ভরতা; তারপর মধ্য দিন যাইতে না যাইতে শুরু হইল, নিরন্ধ্র, নিরর্থকতা—বুঝি ইহার সমাপ্তি কোথাও নাই। শূন্য বিমূঢ় চিত্তে শুধু এই প্রশ্ন জাগিতেছিল, এখন কি হবে?

দুই-একজন প্রতিবেশিনী সমবেদনা জানাইয়া গেল কিন্তু তাহাতে মায়ের মন কিছুমাত্র সাড়া দিল না।

সন্ধ্যা বেলায় পুলিশের লোক আবার আসিল। তাহাদের আগমন-বার্ত্তা সজোরে জ্ঞাপন করিয়া অঙ্গ দোলাইয়া তাহারা ঘরে ঢুকিল। মুখে তৃপ্তির হাসি।

একজন অফিসার মায়ের দিকে অগ্রসর হইয়া ব্যঙ্গচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার পরম সৌভাগ্য, এই নিয়ে তিনবার আপনার দরজায় আসতে হলো! কেমন আছেন?"

শুষ্ক জিহ্বা ততোধিক শুষ্ক ওষ্ঠে স্পর্শ করাইয়া মা চুপ করিয়া রহিলেন। অফিসারটি আপনার মনে উপদেশ-বাণী বর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার একটি কথাও মায়ের মনে গিয়া পৌছাইতেছিল না—যেন কোথায় ঝিঁঝি পোকা নিরর্থক শব্দ করিতেছে। এবার অফিসারটি বলিয়া উঠিল, "এ তোমার নিজের দোষ। ভগবান আর জারকে শ্রদ্ধা করতে তোমার ছেলেকে তুমি শেখাতে পার নি—এ ত তোমারই দোষ!"

এইবার মায়ের মুখ হইতে কথা বাহির হইল। তিনি আপনার মনে উদাস ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "সেই পথে একলা তাদের ছেড়ে দেওয়ার জন্যে যে শাস্তি সে আমাদের ছেলেরাই আমাদের দিচ্ছে! আজকাল তারাই আমাদের বিচারক!'

কথাগুলি ভাল করিয়া শুনিতে না পাইয়া অফিসারটি হুঙ্কার দিয়া উঠিল, "কি বললে? জোরে বল!"

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মা বলিলেন, "বলছিলাম, আমাদের ছেলেরাই আজ আমাদের শাস্তি-দাতা।'

অফিসারটি রাগে তাড়াতাড়ি কি বলিল—কিন্তু মায়ের কানে তাহার একটি বর্ণও গিয়া পৌছিল না।

সাক্ষীর জন্য পুলিশের লোকেরা মেরিয়ানাকে ধরিয়া আনিয়াছিল। মায়ের পাশে চুপটি করিয়া সে দাঁড়াইয়াছিল—মায়ের মুখের দিকে চাহিবার শক্তিও তাহার ছিল না।

মেরিয়ানার দিকে লক্ষ্য করিয়া অফিসারটি কি প্রশ্ন করিতেই সন্ত্রস্ত ভাবে সে বলিয়া উঠিল, "হুজুর, আমি কিচ্ছু জানি না। আমি মুখ্যু মেয়েমানুষ, এ-সবের কিচ্ছু জানি না। গরীব লোক—ফিরি করে কোন রকমে দিন চালাই।"

অফিসারটি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "চুপ কর, তবে!"

মাকে খানাতল্লাস করিবার ভার কিন্তু মেরিয়ানার উপর পড়িল। চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া আতঙ্কে অফিসারটির দিকে চাহিয়া সে বলিল, "হুজুর, সে আমি কেমন করে পারি?"

রাগে মাটিতে পা ঠুকিয়া অফিসারটি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া মায়ের কাছে আগাইয়া আসিয়া মিনতির সুরে সে বলিল, "কি আর করি বল! কিছু মনে করিস না দিদি!"

মায়ের গায়ের জামায় হাত দিতেই, ক্ষোভে এবং লজ্জায় মেরিয়ানার মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল। দাঁতে দাঁত চাপিয়া সে বলিয়া ফেলিল, "কুকুরের দল!"

ঘরের এক কোণ হইতে অফিসারটি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ফিস্‌ফাস্ কি হচ্ছে ওখানে?"

ভয়ে মেরিযানা উত্তর দিল, "কিছু না হুজুর; আমাদের ঘর-কান্নার কথা, হুজুর!"

খানাতল্লাসীর ওয়ারেণ্টে সহি করিবার সময় মা কম্পিত হস্তে ছাপান নামটির উপর হাত বুলাইয়া গেলেন—

"পেলাগুয়ে নিলোভন', বিধবা কুলী-কামিন।"

কাজ শেষ করিয়া তাহারা চলিয়া গেল। আবার একা মা জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন! বুকের উপর হাত দুটি রাখিয়া নিষ্পলক নয়নে বাহিরের শূন্য অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিলেন! প্রদীপে তৈল ফুরাইয়া আসিয়াছিল; শেষ বার দপ্ করিয়া ক্ষণকালের জন্য জ্বলিয়া উঠিয়া তাহাও নিবিয়া গেল। অন্ধকারে একা বসিয়া রহিলেন—কাহারও বিরুদ্ধে কোন আক্রোশ নাই—অন্তরে যেন কোনও আঘাতের চিহ্ন নাই। বুকের ভিতরে নিবিড় কালো মেঘ জমাট বাঁধিয়া সমস্ত অন্তরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। কতক্ষণ এই ভাবে জানালায় দাঁড়াইয়াছিলেন তাহা তিনিও জানিতেন না। একবার শুনিলেন, পথে জানালার তলায় দাঁড়াইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া মেরিযানা বলিয়া গেল, হতভাগি, এখনও দাঁড়িয়ে আছিস্—যা, একটু ঘুমুগে যা! তারপর কখন অবসন্ন হইয়া সেই জানালার ধারেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

পরের দিন দুপুর বেলা আইভানোভিচ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া মায়ের মন ভয়ে চমকাইয়া উঠিল। তাহার অভিবাদন গ্রহণ না করিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আজই আবার কেন তুমি এলে? পুলিশের লোকে যদি তোমাকে এখানে গ্রেফতার করে তা হলে পাভেলের আর নিষ্কৃতি নাই।"

মায়ের হাত দুইটি জড়াইয়া ধরিয়া চোখের উপর চশমাটি ঠিক করিয়া লইয়া আইভানোভিচ বলিল, "পাভেল আর আন্দ্রির সঙ্গে আমার বন্দোবস্ত হয়েছিল, যদি তারা গ্রেপ্তার হয়, তাহলে তার পরের দিনই যেন তোমাকে শহরে নিয়ে যাই।"

—"যদি তাদের তাই ইচ্ছে—আমার কোনও আপত্তি নেই—আর আমি কারুর গলগ্রহ হয়ে চুপ করে বসে থাকবো না।"

—"সে কথা মনেই আনবেন না। আমি একলা থাকি, একটা বোন আছে—সে কচিৎ কখন আসে।"

—"কিন্তু আমি কারুর গলগ্রহ হয়ে চুপ করে বসে থাকতে চাই না—"

—"আঃ, তার ভাবনা কি, যদি কাজ করতে চান তাও একটা জুটে যেতে পারে—"

কাজ বলিতে মা এখন বুঝেন, যে আদর্শ অসমাপ্ত রাখিয়া তাঁহার ছেলে চলিয়া গিয়াছে, সেই একমাত্র কাজ!

আইভানোভিচের দিকে অগ্রসর হইয়া উৎসুক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যি বলছো কাজ পাওয়া যাবে?"

—"অবশ্য আমার সংসারটি ছোট, এত ছোট যে নেই বললেই চলে—বিয়ে-থা তো আর করা হয়নি।"

—"ওসব কথা কেন তুলছো—আমি ঘরকন্নার কাজের কথা বলছি না—আমি চাইছি কঠিন যা-কিছু কাজ তাই করতে—এই জগতের কোন কাজ—"

মায়ের দিকে অগ্রসর হইয়া চোখেতে হাসি ভরিয়া আইভানোভিচ বলিয়া উঠিল, "যদি তুমি চাও জগতের কাজ, তোমারও জায়গা হবে, মা।"

ইত্যবসরে মনে মনে মা এই সহজ ব্যাপারটি ভাবিয়া লইলেন, আমি পাভেলের কাজে একদিন সাহায্য করতে পেরেছিলাম—এবারেও তাই করবো। তার আদর্শের জন্যে যত বেশী লোক কাজ করবে ততই লোকের সামনে তার কথা সত্যি হয়ে উঠবে। তবুও তাঁহার অন্তরের আবেগ এবং উদ্বেলতা সমগ্র ভাবে যেন প্রকাশ করিতে পারিতেছিলেন না। অপরিজ্ঞাত ইচ্ছার ঘূর্ণাবর্তে ব্যথিত হইয়া শান্তকণ্ঠে মা বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু আমি "কি করতে পারি! কি আমার কাজ?"

কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিয়া আইভানোভিচ বিপ্লবী দলের ক্রিয়াকাণ্ডের খুটিনাটি ব্যাপার মাকে বুঝাইতে লাগিল। হঠাৎ একটা কথা স্মরণে আসিতে সে বলিল, "দেখুন, আপনাকে একটা কাজ করতে হবে—যখন জেলে পাভেলের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন—তখন কোনও রকমে যে চাষাটা সেই খবরের কাগজের কথা বলেছিল, তার ঠিকানাটা জেনে আসবেন।"

আনন্দে মা বলিয়া উঠিলেন, "আমি জানি—তাদের ঠিকানা আমি জানি। তোমাদের কি কাগজপত্র আছে আমাকে দাও—আমি এক্ষুণি তাদের কাছে পৌছে দিয়ে আসছি। আমার কাছে বই থাকলে কেউ সন্দেহ করবে না—কারখানায় তো কত বিলি করেছি।"

মা মনে মনে তখনই চিত্র দেখিতেছিলেন, দীর্ঘপথ বাহিয়া, অরণ্য-প্রান্তর গ্রামান্তরের মধ্য দিয়া তিনি চলিয়াছেন, পিঠে তাঁহার একটা চামড়ার থলি, হাতে একটা লাঠি···

—"বুঝলে বাছা, এখন তুমি সব ঠিক-ঠাক করে দাও, যাতে আমি তোমাদের এই কাজে লাগতে পারি। তোমাদের জন্যে আমি সব জায়গায় যাব। গ্রীষ্ম বর্ষা

শীত সারা বছর ধরে আমি চলবো। যত দিন না মৃত্যু এসে টেনে নিয়ে যায় তত দিন এমনি চলবো। ওরে, বুড়ো বয়সে আজ আমি সত্যের পথে তীর্থযাত্রায় বেরুবো—আমার মত বুড়ীর ভাগ্যে এর চেয়ে ভাল আর কি ঘটতে পারে? ভবঘুরের জীবন আমার বড় ভাল লাগে। সারা পৃথিবী সে আপনার মনে ঘুরে বেড়ায়, কিছু নেই তার সম্বল, কিছু নেই তার কামনা, শুধু দিনান্তে এক টুকরো রুটি। কেউ নেই তাকে হিংসা করবার—সবাইকে এড়িয়ে সে চলেছে একা। তেমনি করে আমিও বেরুবো—যেখানে থাকবে আমার আন্দ্রি, যেখানে থাকবে আমার পাভেল—"

এক অপূর্ব্ব বিষণ্ণতায় মায়ের মন পূর্ণ হইয়া উঠিল। চোখের সামনে তিনি দেখিতে পাইতেছিলেন, গৃহহীন হইয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন—যিশুর নামে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চাহিতেছেন—

আইভানোভিচ সন্তর্পণে মায়ের হাত দুইটি ধরিয়া বলিল, "আপনি মস্ত-বড় একটা দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিতে চলেছেন—একবার ভাল করে ভেবে দেখুন—"

—"ভেবে দেখবো কি? এতে ভাববারই বা আমার আছে কি? এ ছাড়া কিসের জন্য আর বেঁচে থাকবো? কার কাজে আমি আর লাগবো? একটা সামান্য গাছ সে-ও ছায়া দেয়, কাঠ দেয়, আগুন হয়, হিমে লোককে দেয় আনন্দ। একটা বোবা গাছ, সে-ও মানুষের কাজে লাগে—আর আমি রক্ত-মাংসের জীবন্ত মানুষ, আমি লাগবো না কোনো কাজে? ছেলেরা—বুকের তাজা রক্ত দিয়ে গড়া ছেলেরা, আমাদের বুক-ছেঁড়া রত্ন সব, তারা আজ অম্লান বদনে স্বাধীনতার জন্যে, মুক্তির জন্যে নিজেদের হাসতে হাসতে বিলিয়ে দিচ্ছে, আর আমি ছেলের মা হয়ে—শুধু দাঁড়িয়ে তাই দেখবো?"

মায়ের চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল—সম্মুখে জন-সমুদ্র চলিয়াছে—মুখে তাহাদের জয়গান—পতাকা-হস্তে সবার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহারই পুত্র—

—"আমার ছেলে যদি সত্যের জন্যে প্রাণ দিতে পারে—আমি মা, কেমন করে তা দেখে চুপ করে বসে থাকবো? আজ আমি তাকে বুঝেছি—সত্যের জন্যে সে জীবন উৎসর্গ করেছে। এত দিন পরে আমি বুঝেছি সেই সত্যকে। আজ আমি বুঝি, কি নিদারুণ বোঝা তাদের ঘাড়ে! আমিও ভার নেবো তার—দোহাই তোদের, আমাকে নে তোদের সঙ্গে—"

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আইভানোভিচ সকরুণ দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "জীবনে এই প্রথম আমি এই রকম কথা শুনছি—"

—"এ ছাড়া আর আমি কি বলতে পারি? এই হতভাগিনী মায়ের বুকে আজ যে-সমস্ত কথা জমা হয়ে উঠছে তাকে যদি ভাষা দিতে পারতাম, তা হলে মনে হয় হাজার পাথরের চোখ ফেটে জল ঝরে পড়তো—মানুষকে দুঃখ দিয়ে যাদের আনন্দ তাদেরও বুক দুলে উঠতো। একদিন যেমন তারা যিশুকে জানিয়েছিল আর আজ যেমন তারা জানাচ্ছে দুধের বাছাদের বিষের আস্বাদ কি, তেমনি আমিও আজ তাদের জানাতে চাই বিষের আস্বাদ কি! ওরে মায়ের বুকে দাগ কেটেছে ওরা—"

আইভানোভিচ যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। তাঁহার হাতের শীর্ণ আঙুলগুলি কাঁপিতেছিল। ঘড়ির দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি যাইবার জন্য সে বলিল, "তা হলে সমস্ত ঠিক রইলো—আপনি আমার সঙ্গে শহরে যাচ্ছেন?"

ঘাড় নাড়িয়া মা সম্মতি জানাইলেন।

—"যত শীগ্‌গির পারেন চলে আসুন—"

সহসা কণ্ঠস্বর কোমল হইয়া আসাতে সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "বুঝেছেন তো—আপনার জন্যে মন বড় চিন্তিত হয়ে থাকবে—"

মা মাথা তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। কে সে তাঁহার? কেন তাঁহার এই স্নেহ-দুর্ব্বলতা?

চক্ষু নত করিয়া তেমনি কণ্ঠস্বরে আইভানোভিচ জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার কাছে পয়সা-কড়ি কিছু আছে কি?"

—"না!"

তাড়াতাড়ি পকেট হইতে ব্যাগটা বাহির করিয়া কিছু অর্থ মায়ের হাতে দিয়া বলিল, "যৎসামান্য এখন রাখুন।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মা হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, "তোদের সবই উল্টো। তোদের কাছে টাকা-কড়ির কোন মূল্য নেই। লোকে দুটো পয়সা পাবার জন্যে কি না করে? আর তোরা, এক টুক্‌রো কাগজ ও এক টুকরো তামা একই মনে করিস্। অন্য লোকের ওপর মায়া-মমতা আছে বলেই ওগুলো সঙ্গে রাখিস্!"

আইভানোভিচ হাসিয়া বলিল, "ও বড় গণ্ডগোলের জিনিস—দিতেও গণ্ডগোল, নিতেও গণ্ডগোল।"

যাইবার সময় মায়ের হাত ধরিয়া আইভানোভিচ জিজ্ঞাসা করিল, "তাহলে শীগ্‌গির আসছো, মা?"

মা সম্মতি জানাইতে সে ধীর পাদক্ষেপে চলিয়া গেল।

তার চার দিন পরে দুইটি ট্রাঙ্ক বোঝাই করিয়া মা ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিলেন। গ্রামের সীমান্ত ছাড়িয়া আসিবার সময় সহসা মা একবার পিছনের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন—জীবনের আঁধারতম দিনগুলি যেখানে কাটাইয়া আসিয়াছেন, মনে হইল যেন চিরকালের মত তিনি সেই গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়াছেন। একটা বৃহৎ রক্ত-কালো মাকড়সার মত দেখিলেন কারখানাটা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ছোট্ট ছোট্ট একতলা বাড়ীগুলো জলার ধারে দাঁড়াইয়া যেন ধাক্কাধাক্কি করিতেছে। ধোঁয়ায় চারিদিক কালো। তাহারই মধ্যে খোলা জানালা দিয়া বাড়ীগুলি যেন পরস্পর পরস্পরকে সকরুণ দৃষ্টিতে দেখিতেছে। ক্রমে গ্রামের গির্জ্জাকে পিছনে ফেলিয়া চলিলেন।—কিছু দূরে গিয়া পিছনে সেই গির্জ্জার দিকে চাহিয়া মায়ের মনে হইল, কারখানার মত তাহারও রঙ রক্ত-কালো হইয়া গিয়াছে।

গাড়োয়ান আপনার মনে গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়াছে। ঘোড়াকে বকিতেছে, কাদার কাছে আসিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া ঘোড়ার রাশ ধরিয়া আবার খানিকটা হাঁটিয়া চলিতেছে।

হাঁটিয়া চলিতে চলিতে বলে, "দিদি, যে পথেই যাও দুঃখুর হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় নেই! দুঃখু থেকে দূরে নিয়ে যাবার জেনো একটিও পথ নেই, যত পথ দেখছো সব সেই এক জায়গায় পৌঁছে দেয়—"

বহুদিন গাড়ীর চাকায় তেল দেওয়া হয় নাই। অরণ্য-পথ চাকার প্রতিবাদ-শব্দে মুখর হইয়া উঠিতেছিল।

একটা পরিত্যক্ত জনবিরল পথের ধারে বহুকালের পুরানো একটা দোতলা বাড়ীতে এক পাশে তিনখানি ঘর লইয়া আইভানোভিচ বাস করিত। ঘরগুলির সামনে একটি ছোট্ট ফুলের বাগান। বাগান হইতে নানা রকম গাছের শাখা খোলা জানালায় ভিড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। চারিদিক্ নিস্তব্ধ। নীরব ঘরের দেওয়ালে, মেঝেতে গাছের ছায়াগুলি কাঁপিতেছে। ঘরের মধ্যে দেওয়ালের সঙ্গে লাগান সেল্‌ফ-ভরা বই। তাহার উপরে দেওয়ালের গায়ে গম্ভীর মূর্ত্তি কাহাদের সমস্ত ছবি টাঙানো রহিয়াছে।

বাগানের দিকে জানালাওয়ালা একটি ছোট্ট ঘরে মাকে লইয়া গিয়া আইভানোভিচ জিজ্ঞাসা করিল, "এ ঘরে আপনার কোনও বিশেষ অসুবিধা হবে না বোধ হয়?"

মা দেখিলেন, এ ঘরেও সেল্‌ফ-ভরা বই। জানালায় ফুলের টবে হাত দিয়া দেখেন, মাটি শুকনো। কত দিন তাহাতে জল দেওয়া হয় নাই।

লজ্জিত হইয়া আইভানোভিচ বলে, "ফুল বড় ভালবাসি কিন্তু সময় নেই ওদের দেখবার!"

জীবনে এই প্রথম মা অপরের বাড়ীতে সম্পূর্ণ অজানা জায়গায় বাস করিলেন কিন্তু তিনি নিজে ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে, আদৌ তাঁহার কোনও অসোয়াস্তি বোধ হইতেছে না। মনে হইতেছে যে, তিনি যেন তাঁহার নিজের ঘরেই আছেন।

ঘরের জিনিস-পত্রের উপর কাহারও যে কোন দৃষ্টি নাই—মা ঘরে প্রবেশ করিয়াই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। চারিদিক এলোমেলো, অগোছালো। সামোভারে 'মরচে' পড়িয়া গিয়াছে, বই খাতাপত্র চারিদিকে ছড়ান, নূতন করিয়া মা গৃহস্থালী সাজাইতে লাগিয়া গেলেন।

পরের দিন সকাল বেলা চা খাইবার সময় আইভানোভিচ ও মা গল্প করিতেছিলেন। আইভানোভিচ নিজের পরিচয় দিবার সূত্রে বলিতেছিল, "আমি ছিলাম একজন গ্রাম্য শিক্ষক। আমার বাবা ছিলেন কারখানার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। গ্রামে চাষাদের মধ্যে আমি লুকিয়ে বই বিলি করতাম ও তাদের পড়ে শোনাতাম। পুলিশ জানতে পেরে আমাকে গ্রেফতার করে। সে-বার জেল থেকে বেরিয়ে একটা বইয়ের দোকানে চাকরি পেলাম কিন্তু পুলিশের বিবেচনায়, সৎভাবে জীবন-যাপন না করার অপরাধে আবার জেলে যেতে হলো। জেল থেকে সে বার আর্চ্চ আঞ্জেলে আমাকে নির্ব্বাসিত করা হয়। সেখানেও শান্তি নেই, সেখানকার গবর্ণরের সঙ্গে একদিন বাধিয়ে দিলাম ঝগড়া। প্রতিফল-স্বরূপ সেখান থেকে নির্ব্বাসিত হয়ে যাই শ্বেত-সমুদ্রের ধারে এক নির্জ্জন গ্রামে। সেই জনহীন গ্রামে নির্ব্বাসিত হয়ে পাঁচ বৎসর বাস করতে হয়।—"

ইতিমধ্যে এই রকমের কিছু-কিছু কাহিনী মা শুনিয়াছিলেন। সকলের বেলাতেই তিনি লক্ষ্য করিতেন যে, ইহারা নিজেদের দুঃখ-কষ্টের কথা পরম নির্ব্বিকার ভাবে কাহারও প্রতি কোনও আক্রোশ প্রকাশ না করিয়া একান্ত সহজ ভাবে কেমন বলে—যেন সেই সমস্ত নির্য্যাতনের জন্য কেহই দায়ী নহে—তাহা যেন বাঁচিয়া থাকার মতই অবশ্যম্ভাবী।

"আজ আমার বোন আসবে এখানে।"

"বিয়ে হয়েছে তার?"

"হয়েছিল, এখন সে বিধবা, তার স্বামী সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হয়।—সেখান থেকে পালিয়ে আসবার

সময় ভয়ানক ঠাণ্ডা লেগে তার অসুখ হয় এবং তার ফলেই ভদ্রয় লোক এই পৃথিবী থেকে ছুটি পান।"

"সে কি তোমার ছোট ?"

"না, সে আমার চেয়ে দু'বছরের বড়। তার কাছে আমি বহু জিনিসের জন্য ঋণী! ভারী গুণী মেয়ে—এই যে পিয়ানো দেখছেন—সে এসে বাজায়—এই যে গানের খাতা চারিদিকে ছড়ান—তারই কীর্ত্তি—ভারী সুন্দর বাজায়—"

"কোথায় থাকে ?"

মৃদু হাসিয়া আইভানোভিচ বলিল, "সর্ব্বত্র! যেখানে বুক পেতে দেবার প্রয়োজন সেইখানেই আছে সে—"

"তোমাদের এই আন্দোলনে ?"

"নিশ্চয়ই।"

আইভানোভিচ তখন বাহির হইয়া গিয়াছিল—দ্বিপ্রহরে বিছানায় শুইয়া মা আন্দোলনের কথা ভাবিতেছিলেন। সহসা দেখেন, ঘরের মধ্যে এক দীর্ঘাকৃতি সুন্দর-দেহা অপরূপ সুসজ্জিতা নারী দাঁড়াইয়া!

ধীরে অগ্রসর হইয়া নারীটি মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি পাভেলের মা ?"

সহসা সেই সুসজ্জিতা সম্ভ্রান্তা নারীকে দেখিয়া মা শশব্যস্ত হইয়া উত্তর দিলেন, "হাঁ, আমিই পাভেলের মা।"

দুই হাত দিয়া মায়ের হাত দুইটি ধরিয়া নবাগতা বলিল, "আমি ঠিক এই রকমই ভেবেছিলাম! পাভেল আমাদের অনেক দিনের বন্ধু। আপনার কথা সে প্রায়ই বলতো! কিন্তু এখন রীতিমত খিদে পেয়ে গিয়েছে, এক কাপ কফি দিতে পারেন ?"

"নিশ্চয়ই, এক্ষুণি তৈরী করে দিচ্ছি!"

কফির সরঞ্জাম ঠিক করিতে করিতে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যি সে আমার কথা বলতো ?"

"নিশ্চয়ই, আপনার সম্বন্ধে সে অনেক কথাই বলতো!" একটা সিগারেটের বাক্স হইতে সিগারেট ধরাইয়া নবাগতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাভেলকে নিয়ে আপনার খুব অশোয়াস্তি হতো, না ?"

স্পিরিট-ল্যাম্পের নীলাভ শিখার দিকে চাহিয়া মা হাসিয়া ফেলিলেন। এই নবাগতার সম্মুখে সমস্ত সঙ্কোচ পুত্র-গর্ব্বের মধ্যে তলাইয়া গেল।

"অশোয়াস্তি বোধ করতাম নিশ্চয়ই! কিন্তু আমি দেখছি, সে যেখানেই থাকুক, সঙ্গিহীন নয়—এমন কি, আমিও আজ আর একা নই!" পরে নবাগতার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম ?"

—"আমার নাম সোফিয়া—আইভানোভিচের দিদি।"

তারপর কোনও ভূমিকা না করিয়া সোফিয়া বলিল, "দেখুন, এখন আমাদের সব চেয়ে বড় কাজ কি জানেন ? ওরা এখন হাজতে আছে, শীগ্‌গিরই বিচার হবে এবং খুব সম্ভব বিচারে পাভেল নির্ব্বাসিত হবে। সাইবেরিয়াতে পচতে তাকে দেওয়া হবে না—তাকে আমাদের একান্ত প্রয়োজন! সেই জন্যে আমাদের প্রথম চেষ্টা হবে তাকে সাইবেরিয়া থেকে লুকিয়ে সরিয়ে আনা—"

"কিন্তু লুকিয়ে সে কত দিন থাকতে পারবে ? আর লুকিয়ে থাকবেই বা কি করে ?"

"ও, তার কোনও ভাবনা নেই। কত লোক এমনি পলাতক হয়ে কাজ করছে। এইমাত্র একজনের সঙ্গে দেখা হল, তাকে নিরাপদে পার করে দিয়ে এলাম। আমার এই সব বড়লোকের পোষাক যা দেখছেন—এই যে আমার চাল-চলন—সব তৈরী-করা এবং এর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে কার্য্য উদ্ধার করা। তা না হলে মনে করেন, এই সমস্ত পরতে আমার ভাল লাগে ? অনাড়ম্বর রূপ নিয়ে মানুষ পৃথিবীতে আসে, অনাড়ম্বরতাই তার একমাত্র রূপ।"

বিকাল চারটার সময় আইভানোভিচ ফিরিয়া আসিল। খাওয়া-দাওয়ার পর সন্ধ্যা বেলা গল্পচ্ছলে আইভানোভিচ কাজের কথা তুলিল।

"দিদি, এখন শোন, তোমার জন্যে একটা নতুন কাজ আছে। বোধ হয় জানো, গ্রামের লোকদের জন্যে একটা খবরের কাগজ বার করবার ভার আমরা নিই। কিন্তু গ্রেফতারের ফলে গ্রামের লোকদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। ইনি একজনের ঠিকানা জানেন সে কাগজ বিলি করবার ভার নেবে। তোমাকে এঁর সঙ্গে গিয়ে শীগ্‌গির একটা বন্দোবস্ত করে আসতে হবে।"

"বেশ, তাই হবে। এখান থেকে কত দূর ?"

"মাইল পঞ্চাশ হবে।"

"চমৎকার! আচ্ছা, যাবার আগে তা হলে একটা গান গেয়ে যাই, কি বলুন ? আপনার আপত্তি নেই তো!"

"আমার কথা তুমি ভেবো না—মনে করো, আমি এখানে উপস্থিত নেই—"

"তা হলে আইভানোভিচ শোনো—এটা গ্রীগের রচনা—তার আগে জানালাটা বন্ধ করে দাও।"

পিয়ানো খুলিয়া সোফিয়া প্রথমে সন্তর্পণে বাম

হাত দিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে ঘন মন্দ্রাগ্র একটি সুর বাহির হইল। তারপর আর একটি সুর গভীর, দীর্ঘ—তাহার সহিত আসিয়া মিশিল। দুইটি সুর আপনার ভার সহিতে না পারিয়া যেন কাঁপিয়া উঠিল। সহসা দক্ষিণ হাতের স্পর্শে, এক ঝাঁক পাখীর একসঙ্গে উড়িতে উড়িতে গায়ে গা-লাগার মত একসঙ্গে তেমনি দ্রুত অসংখ্য সুরের বিহঙ্গম উড়িয়া চলিল। এবং এই সমস্ত মিলিত সুরের পিছনে ঝঞ্ঝা-মথিত সমুদ্রতরঙ্গের মত একটি আর্ত্ত উন্মাদ শব্দ সারাক্ষণ দুলিতে লাগিল।"

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত এই সমস্ত বিচিত্র সুরের প্রতি একান্ত উদাসীন হইয়া মা নীরবে বসিয়াছিলেন। এ সঙ্গীতের কিছুই তিনি বুঝিতেন না। তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে তিনি দেখিতেছিলেন, ঘরের এক কোণে পায়ের উপর পা দিয়া তন্ময় হইয়া আইভানোভিচ বসিয়া আছে। একটি পথভ্রান্ত সূর্য্যের আলো কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া সোফিয়ার সোনালী কেশগুচ্ছের উপর পড়িয়াছে। সেখান হইতে পাশ কাটাইয়া পিয়ানোর পর্দ্দার উপর পড়িয়া সোফিয়ার অঙ্গুলিস্পর্শে নিত্য স্পন্দমান হইতেছিল। খোলা জানালা দিয়া দেখা যাইতেছিল, বাহিরে বাগানে এ্যাকেসিয়া গাছের ডালগুলি আরামে দুলিতেছে। কখন সুরের তরঙ্গে সমস্ত ঘর ভরিয়া গিয়াছে, মা জানিতে পারেন নাই। কখন তিনি সেই শব্দ-তরঙ্গের মধ্যে তলাইয়া গিয়াছেন, তিনি তাহাও জানিতে পারেন নাই।

বহুদূরে তাঁহার মন চলিয়া গিয়াছিল। অন্ধকার অতীতের গহ্বর হইতে বহুদিনের ভুলিয়া-যাওয়া অন্যায় অত্যাচার আর অবিচারের স্মৃতি তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল।

—একবার তাহার স্বামী গভীর রাত্রে পরিপূর্ণ মাতাল হইয়া বাড়ী ফিরিল। কোনও কথা না বলিয়া হাত ধরিয়া বিছানা হইতে টানিয়া মাটিতে ফেলিয়া লাথি মারিতে লাগিল। চীৎকার করিয়া উঠিল,—দূর হয়ে যা, এখান থেকে—তোকে দেখতে চাই না—

তাহার সেই লাথির আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য কোনও মতে উঠিয়া তাড়াতাড়ি দুই বছরের শিশু ছেলেটিকে কোলে জড়াইয়া ধরিলেন—যেন সে তাহার বর্ম্ম। উলঙ্গ শিশু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

—দূর হয়ে যা এখনও বলছি। বলিয়া স্বামী তাড়া করিয়া আসিল। লাফাইয়া রান্নাঘরে আসিয়া একটা ছেঁড়া জামা গায়ের উপর ফেলিয়া ছেলেটিকে একটি কাঁথায় মুড়িয়া লইয়া কোনও প্রতিবাদ, কোনও চীৎকার না করিয়া সেই দিন গভীর রাত্রে নগ্নপদে নির্জ্জন পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। ছেলেকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ঘুম-পাড়ানি গান গাহিতে গাহিতে রাস্তা দিয়া চলিলেন।

ক্রমশ রাত্রি শেষ হইয়া আসিতে লাগিল। পাছে সেই অর্দ্ধ-নগ্ন অবস্থায় কেউ দেখিয়া ফেলে—এই লজ্জায় এবং আশঙ্কায় পথের শেষে জলার দিকে একটা ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। রাত্রি শেষের সেই ভয়াবহ নির্জ্জনতার মধ্যে বহুক্ষণ ধরিয়া নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া রহিলেন—দু'বছরের শিশুটিকে বুকে দোলা দিতে দিতে অস্ফুট স্বরে ঘুম-পাড়ানি ছড়া গাহিতে লাগিলেন। শিশুটি ঘুমাইয়া পড়িল কিন্তু তাঁহার ক্ষত-বিক্ষত অন্তর তেমনি জাগিয়া রহিল।

ভোরের দিকে মাথার উপর দিয়া কি একটা পাখী ডানার ঝাপট মারিয়া চলিয়া গেল। আর বিলম্ব করা উচিত নয় বিবেচনা করিয়া ঘরের দিকে ফিরিলেন। হয়ত ঘুমাইয়া আছে, নয়ত নূতনতর আঘাত সহিতে হইবে—

পিয়ানোর শেষ-পর্দ্দার সুর মিলাইয়া গেলে সোফিয়া ভাইয়ের দিকে ফিরিয়া ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম লাগলো ?"

ঘাড় নাড়িয়া আইভানোভিচ বলিল, "অতি সুন্দর ! লোকে বলে গান শুনে ভাবতে নেই ! কিন্তু আমি না ভেবে পারি না ! তোমার গান শুনতে শুনতে আমার মনে হতে লাগলো মানুষ যেন অনবরত প্রকৃতিকে প্রশ্ন করছে—অনবরত যেন কাঁদছে, চীৎকার করছে, বুক চাপড়ে বলছে, কেন ? প্রকৃতি কোনও উত্তর দেয় না —সে নীরবে শুধু নব-নব সৃষ্টি করে চলেছে। তার এই নির্ব্বাক্ মৌনতার মধ্যে এই প্রশ্নের উত্তর জেগে ওঠে—আমি জানি না।"

নীরবে মা আইভানোভিচের কথাগুলি শুনিলেন কিন্তু তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, বুঝিবার ইচ্ছাও তাঁহার যেন ছিল না। তাঁহার অন্তর তখন স্মৃতির কণ্টকে ভরিয়া উঠিয়াছে। সমস্ত মন-প্রাণ তাঁহার সঙ্গীত চাহিতেছিল—আরো সঙ্গীত ! অতীতের দিকে ফিরিয়া চান আর সামনের ভাই-বোন দুজনকে দেখেন —আর মনে মনে ভাবেন—এই তো এরাও মানুষ—দুটি ভাই-বোন বন্ধুর মত কেমন সুখে বাস করছে—বই পড়ে, গান গায়—গালাগালি করে না—মদ খায় না—একজন আর একজনকে আঘাত দিয়ে আনন্দ পাবার জন্যে উৎসুক নয়।

পিয়ানোর পর্দায় আঙুল দিয়া আঘাত করিয়া সোফিয়া ভাইকে ডাকিয়া বলিল, "এই গানখানি কোষ্টিয়ার বড় প্রিয় ছিল। প্রায়ই তার জন্যে আমি এই গানটা বাজাতাম। তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই গানের সুরকে কেমন সে ভাষা দিতে পারতো?"

একটু থামিয়া আপনার মনে হাসিয়া সোফিয়া বলিয়া উঠিল, "সে একটা পুরোদস্তুর মানুষ ছিল—জগতে যে-কোনও জিনিস তার মনে সাড়া জাগিয়ে তুলতো, এমনি অপরূপ ছিল তার মন!"

মা বুঝিতে পারিলেন সোফিয়া তাহার মৃত স্বামীর কথা স্মরণ করিতেছে। লক্ষ্য করিলেন, পুরাতন স্মৃতি ভাবিতে আজও আনন্দে তাহার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে।

আত্মমগ্ন ভাবে পিয়ানোর এক-আধটি পর্দায় মৃদু আঘাত দিতে দিতে সোফিয়া বলিতেছিল, "কি শান্তি, কি তৃপ্তিই না সে আমাকে দিয়েছিল! জীবনকে অনুভব করার কি প্রচণ্ড শক্তিই না ছিল তার! সর্ব্বদাই আনন্দে উৎফুল্ল—শিশুর মতন!"

আপনার মনে মা বলিলেন, "ঠিক, শিশুর মতন!"

"যখন আমি প্রথম তাকে এই গানটা শোনাই—তখন গান শোনাবার পর সে এইটে লিখে দিল"—এই বলিয়া ধীরে সে আবৃত্তি করিতে লাগিল,—'নিরুত্তর উত্তর-দেশে মহাশূন্য এক সাগরের বুকে, পরিবর্ত্তনহীন নিস্পন্দ আকাশের ধূসর চন্দ্রাতপতলে চির-তুহিনে-ঢাকা এক দ্বীপ আছে—জনহীন একটি পাহাড়। স্বচ্ছ নীল তুহিনের স্তর প্রাণহীন হিম-জলে অবাঞ্ছিত অতিথির মত ভাসিয়া সেই পাহাড়ের মসীকৃষ্ণ শৈল-গাত্রে নিয়ত প্রতিহত হইতেছে। সেই আঘাতের প্রতিধ্বনি মৃত্যুর মত স্থির সেই মহাশূন্যের বুকে এক সকরুণ ধ্বনি জাগাইয়া তুলিতেছে। অনাদিকাল ধরিয়া সেই অতল সাগরের নির্জ্জনতায় তাহারা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—তীরের কাছে আসিয়া পরস্পর পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া আবার ফিরিয়া যাইতেছে। ফিরিয়া যাইবার সময় তাহারা প্রত্যেকে প্রত্যেককে শুধু এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে,—কেন'?"

আবৃত্তি শেষ করিয়াই সোফিয়া সেই নিরুত্তর-দেশে মহাশূন্য সাগরের বুকে জনহীন দ্বীপের গান বাজাইতে আরম্ভ করিল।

বাজনা শেষ হইলে মায়ের দিকে ফিরিয়া সোফিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "একটু চেঁচামেচি করলুম, কিছু মনে করবেন না।"

মায়ের অন্তর তখন স্মৃতির কণ্টকে ভরিয়া উঠিয়াছিল। অন্তরের চাঞ্চল্য তিনি আর গোপন করিতে পারিতেছিলেন না।

"আমি তো বলেছিলাম, আমার দিকে তোমরা চেয়ো না। মনে কোরো আমি এখানে নেই। আমি বসে বসে তোমাদের কথা শুনছি আর আমার নিজের কথাই ভাবছি।"

তারপর একে একে মা তাঁহার জীবনের সমস্ত ঘটনা শান্তভাবে তাহাদের সামনে বলিয়া যাইতে লাগিলেন। যে-সমস্ত অত্যাচার নিজের জীবনে নীরবে সহিয়াছেন, যে-সমস্ত বেদনার তিক্ততম দিন মূক হইয়া তাঁহার জীবনে মরিয়া গিয়াছে—আজ সহসা সমবেদনার স্পর্শে তাহারা সজীব হইয়া উঠিল।

ভাই-বোন দুজনে বিস্মিত তন্ময়তার সহিত সেই নিরলঙ্কার কাহিনী শুনিল। মানুষ ছাগল-গরুকে যে ভাবে দেখে, একটি নারীর জীবন সেই ভাবে অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং সে-নারীকে যাহা বোঝান হইয়াছিল সে-ও বিনা প্রতিবাদে তাহাই বুঝিয়া সেই রকম জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছে। মায়ের সেই কাহিনী শুনিয়' তাহাদের মনে হইতেছিল যেন ঐ কাহিনীর মধ্য দিয়া লক্ষ লক্ষ অনুচ্চারিত নারী-জীবনের কথা জাগিয়া উঠিতেছে।

মায়ের কথা শেষ হইলে সোফিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আগে এক সময় আমার প্রায়ই মনে হতো, আমি কি অসুখী! জীবনটা মনে হতো একটা বিকার। তখন নির্ব্বাসিতের জীবন যাপন করতাম। কোনও কাজ ছিল না, নিজের কথা ছাড়া ভাববারও কিছু ছিল না। একলা বসে জীবনের সমস্ত দুঃখ মনে মনে এক জায়গায় জড় করে প্রতিদিন ওজন করে দেখতাম আর বেদনায় মন ভারী হয়ে উঠতো। কিন্তু আপনার জীবনের কথা শুনে আজ মনে হচ্ছে, আমার সেই সমস্ত দুঃখ যদি দশ গুণ আরও বেশী হতো, তা হলেও আপনার জীবনের একটা মাসের তুলনা হতো না। প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত্ত ধরে বছরের পর বছর এ কি নির্য্যাতন! এত দুঃখ সইবার ক্ষমতাই বা কোথা থেকে পায় মানুষ?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মা বলিলেন, "তা জানি না, তবে সবই সয়ে যায়!"

মায়ের দিকে চাহিয়া আইভানোভিচ বলিয়া উঠিল, "আমার গর্ব্ব ছিল যে আমি জীবনকে জানি, বুঝি! কিন্তু আজ আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আপনি যে জীবনের কথা বললেন—তাকে তো আমি জানি না! যে সমস্ত মুহূর্ত্ত দিয়ে এই জীবনের দীর্ঘ দিনগুলি তৈরী,

এত ভয়ানক বীভৎস তারা, তা আমি ভাবতেও পারি নি।"

সহানুভূতির স্পর্শে মায়ের চিত্ত গলিয়া গেল। অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "এত দুঃখ আছে যে, বলে সব শেষ করতে পারি না!"

সোফিয়া সকরুণ দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিল—মায়ের মনে হইল সে দৃষ্টি যেন তাঁহার সর্বাঙ্গ লেহন করিতেছে!

এই পরিচয়ের চার দিন পরে একদিন ভোর বেলায় মা ও সোফিয়া দুই কাঠ-কুড়োনী স্ত্রীলোকের বেশে আইভানোভিচের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কাঁধে কাঠ-কুড়োনোর থলি, হাতে লাঠি।

বিদায় দিবার সময় ভগিনীর দিকে চাহিয়া আই-ভানোভিচ বলিল, "তোকে এই বেশে দেখে মনে হচ্ছে যেন তুই পৃথিবীর সমস্ত তীর্থ এমনিধারা ঘুরে বেড়িয়েছিস্।"

ক্রমে পথ ছাড়াইয়া দুইটি কাঠ-কুড়োনী গ্রামের পথে প্রান্তরের মধ্যে আসিয়া পড়িল।

মা জিজ্ঞাসা করেন, "হ্যাঁ রে, যেতে পারবি?"

হাসিয়া সোফিয়া বলে, "মা গো, মনে করেন কি জীবনে এই প্রথম?"

পথ চলিতে চলিতে সোফিয়া একে একে তাহার বিপ্লবী-জীবনের সমস্ত কাহিনী মাকে বলে—বিস্ময়ে মা শোনেন—কত বার নাম বদলাইতে হইয়াছে, কত জাল ছাড়পত্র-চিঠি তৈয়ারী করিতে হইয়াছে, কত ছদ্মবেশে দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছে, নির্ব্বাসন হইতে বন্ধুদের পলাইবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে, লুকাইয়া তাহাদের লইয়া নিরাপদ স্থানে পৌছাইয়া দিতে হইয়াছে,—চাকর সাজিয়া পুলিশ ঢুকিবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী ছাড়িয়া পলাইতে হইয়াছে—এমনি সব কাহিনী। যত পথ চলেন, তত মা লক্ষ্য করেন যে ছোট্ট মেয়ের মত সোফিয়া আজ যেন নূতন করিয়া আবার এই পৃথিবীকে দেখিতেছে। পথের ধারে যাহা দেখে, তাহাতেই আনন্দে তার প্রাণ ভরিয়া ওঠে।

চলিতে চলিতে হঠাৎ থামিয়া মাকে দেখাইয়া সে বলে, "দেখুন দেখি, ঐ পাইন-গাছটা কি সুন্দর উঠেছে, না?"

মা চাহিয়া দেখেন, অন্য সমস্ত পাইন-গাছের মতই সেই গাছটি।

হঠাৎ মাথার উপর একটা পাখী ডাকিয়া উড়িয়া যায়। সোফিয়া একদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে। মনে হয় যেন তাহার সর্ব্বদেহ ওই পাখীর গানের সহিত ওই সুদূর নীলে ভাসিয়া চলিয়াছে। কখনও বা পথের ধারের ঝোপ হইতে অতি সন্তর্পণে একটি বনকুসুম তুলিয়া মাকে দেখাইয়া অকারণে হাসিয়া ওঠে।

মাথার উপরে বসন্ত-দিনের সূর্য্য করুণ-কিরণে সমুজ্জ্বল। নিস্তরঙ্গ নীলাম্বর আলোকে মৃদু কম্পমান। দু'ধারে পাইন বন, অন্তহীন সুগভীর। ঈষৎ তপ্ত বন-সুরভির কোমল মৃদুল স্পর্শ চোখে-মুখে আসিয়া লাগে।

মায়ের হৃদয় দুলিয়া ওঠে। সাধ যায়, পাশের মেয়েটির ঐ গাঢ় দুটি চোখ, এই বাসন্তী-মধ্যাহ্ন-উদার প্রকৃতির মত স্বচ্ছ ওই মেয়েটির হৃদয় যেন তাঁহার হৃদয়ের অতি নিকটতম স্থলে টানিয়া লন। কখন পথ চলিতে চলিতে অজ্ঞাতে মা সোফিয়ার ঘাড়ে আসিয়া পড়েন—যদি কোনও উপায়ে সোফিয়ার সেই কুণ্ঠাহীন দীপ্ত সজীবতা তিনি আপনার মধ্যে আকর্ষণ করিয়া লইতে পারেন!

হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলেন, "তুই এখনও তরুণ, এখনও কত সজীব!"

সোফিয়া হাসিয়া বলে, "মা গো, জানো আমার বয়স হলো কত? একেবারে বত্রিশ!"

"আমি সে কথা বলছি না। তোর মুখ দেখলে হয়ত তোকে তার চেয়েও বেশী বয়সের মনে হয়; কিন্তু তোর চোখ, তোর কণ্ঠস্বর বলে দেয় যে, এই বসন্ত-দিনের মতই তুই নবীন। জানি, জীবন তোর অতি কঠোর দুঃখে ভরা, কিন্তু মনটি তোর এখনও হাসছে।"

"বেশ বলেছ, মা! মনটি আমার এখনও হাসছে। তুমি তো মা বেশ কথা বলতে পার। কেমন সোজা, সুন্দর! কিন্তু ওই যে বললে কঠোর জীবন—মোটেই না। এক মুহূর্ত্তের জন্যেও আমার মনে হয় না যে, যে জীবন আমি যাপন করি তা কঠোর বা দুঃখময়; এর চেয়ে মজার জীবন আমি কল্পনা করতে পারি না।"

"তোদের আমার কেন এত ভাল লাগে জানিস্? মানুষের মনে পৌছবার যেটা সোজা রাস্তা তোরা সবাই তা জানিস্। তোদের দেখলেই মানুষের মনের সব দরজা আপনা থেকেই খুলে যায়—মন যেন এগিয়ে এসে ধরা দেয়। তোরা পাপকে জয় করেছিস্, তাকে একেবারে ক্ষয় কর!

সোফিয়ার কণ্ঠে চরম আত্মনির্ভরতা ফুটিয়া ওঠে। সে বলে "নিশ্চয়ই হবো আমরা জয়ী। কেন না যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য বাড়ায় তারা রয়েছে আমাদের সঙ্গে। সত্য যে একদিন জয়যুক্ত হবেই, এই চরম বিশ্বাস আমরা তাদের কাছ থেকেই

পেয়েছি। তারাই হলো সকল রকম শক্তির, কি আত্মিক, কি দৈহিক, একমাত্র অফুরন্ত ভাণ্ডার। যা হয় নি, তা হবার সমস্ত সম্ভাবনা রয়েছে তাদের মধ্যে নিহিত। শুধু জাগিয়ে তুলতে হবে তাদের চেতনাকে, তাদের আত্মাকে শিশুর দেহে সুপ্ত মহাচৈতন্যকে।"

"কিন্তু তোদের এই কাজের জন্যে কে তোদের পুরস্কার দেবে?"

"পুরস্কার আমরা পেয়ে গেছি মা! এই যে জীবন—উদার অকুণ্ঠ, চেতনায় নিত্য প্রদীপ্ত—এই যে তার স্পর্শ পেয়েছি—এতেই আমরা পুরস্কৃত হয়ে গেছি, এর চেয়ে অন্য আর কি কাম্য থাকতে পারে?"

আবার তাহারা নিঃশব্দে দুই জন পাশাপাশি চলিতে লাগিল। পথ চলিতে চলিতে মায়ের ছেলেবেলার কথা মনে পড়িতেছিল—ছুটির দিন গ্রাম হইতে দূরে কোথায় কোন্ মঠে দৈব-শক্তি-সম্পন্ন ক্রুশ আছে তাহা দেখিবার জন্য উৎসুক আগ্রহে যাইতেন। আজ মায়ের বারে বারে সেই কথাই মনে পড়িতেছিল। তিনি যেন আবার সেই দৈবশক্তিসম্পন্ন ক্রুশের জন্য তীর্থযাত্রায় চলিয়াছেন।

সোফিয়া আপনার মনে কত অজানা সুর গাহিয়া ওঠে—আকাশের সম্বন্ধে, ভালবাসার সম্বন্ধে, পুষ্পগন্ধ-ঘনবাসন্তী দিন সম্বন্ধে পুণ্যপীযুষদায়ী ভোলগা সম্বন্ধে···

তৃতীয় দিনের দিন তাঁহারা এক গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং একজন কৃষককে ডাকিয়া রাইবিনের খবর জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার নিকট হইতে অনুসন্ধান করিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিতে অদূরে দেখেন, সেই আলকাৎরার কারখানার একটা কাঠের টেবিলে রাইবিন, তাহার ভাই ও আরও দুই জন কৃষক আহারে বসিয়াছে।

রাইবিনকে দেখিয়াই মা দূর হইতে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কেমন আছ মাইকেল?"

রাইবিন টেবিল হইতে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। ধীর পাদক্ষেপে মৃদু হাস্যে দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে মায়ের দিকে অগ্রসর হইল।

আর একটু অগ্রসর হইয়া নিজেকে সপ্রতিভ করিয়া লইয়া মা বলিলেন, "তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছি,—এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম—ভাবলুম একবার ভাইএর সঙ্গে দেখা করে যাই—এটি—এটি হলো আমার বন্ধু—নাম আন্না!"

কথা কয়টি বলিয়াই মা আপনার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের গর্ব্বে সোফিয়ার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন।

মৃদু হাস্যে মায়ের দিকে অগ্রসর হইয়া গম্ভীর স্বরে রাইবিন বলিলেন, "কেমন আছেন?"

তারপর ধীরে মাথা নত করিয়া সোফিয়াকে অভিবাদন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "দেখুন, মিথ্যে কথা বলবেন না। এটা আপনাদের শহর নয়। এখানে মিথ্যে কথা বলবার কোনও প্রয়োজন নেই। এরা সবাই আমাদের লোক—খাঁটি লোক সব!"

নিজের ভাই এফিম ছাড়া সেখানে আরও যে দুজন লোক ছিল তাহাদের পরিচয় দিয়া রাইবিন বলিল, "এর নাম হলো ইয়াকুব, আর এর নাম হলো ইগ্‌নেটি। এখন বলুন আপনার ছেলে কেমন আছে!"

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মা বলিলেন, "সে এখন জেলে।"

"আবার জেলে! জেলই দেখছি তার ভাল লাগে!"

ইগ্‌নেটি মায়ের হাত হইতে পুঁটলীগুলি নামাইয়া লইয়া একটি আসন দেখাইয়া বলিল, "বসুন মা!"

সোফিয়ার দিকে চাহিয়া রাইবিন বলিল, "আপনি বসবেন না?"

সোফিয়া সামনের একটা গাছের কাটা গুঁড়ির উপর বসিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাইবিনকে লক্ষ্য করিতে লাগিল।

এফিম একটা দুধের ভাঁড় লইয়া কাপে দুধ পরিবেশন করিতে লাগিল। মা তখন পাভেলের গ্রেফতার হওয়ার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সকলে স্তব্ধ হইয়া মায়ের কথা শুনিতে লাগিল। দূরে বসিয়া সোফিয়া আড় চোখে, এই সব বিমুগ্ধ কৃষকদের লক্ষ্য করিতেছিল।

মায়ের কথা শেষ হইলে রাইবিন জিজ্ঞাসা করিল, "শুনলুম নাকি পাভেলের বিচার হবে?"

"হাঁ—তাই তো স্থির হয়েছে।"

"শাস্তির কি রকম ব্যবস্থা হবে কিছু শুনেছেন কি?"

শান্ত-করুণ স্বরে মা বলিলেন, "হয় কঠোর সশ্রম কারাবাস, নয় দীর্ঘকালের মত সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসন!"

মাটির দিকে মাথা নীচু করিয়া কি-যেন ভাবিতে ভাবিতে রাইবিন বলিল, "আচ্ছা, যখন সে এই সব আয়োজন করছিল—তখন কি সে জানতো যে তার এই শাস্তি হতে পারে?"

"তা বলতে পারি না—বোধ হয় জানতো।"

সোফিয়া তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয়ই জানতো।"

সোফিয়ার কণ্ঠস্বরে সবাই ক্ষণিকের জন্য চমকাইয়া উঠিয়া আবার তেমনি স্তব্ধ হইয়া রহিল।

ধীর-গম্ভীর ভাবে রাইবিন বলিতে আরম্ভ করিল, "আমারও মনে হয় সে জানতো। জীবন যার কাছে খেলা নয়, এগিয়ে দেখতে সে জানে। সে জানতো যে বেয়নেটের আঘাতে হয়ত আহত হতে হবে, হয়ত বা চির-নির্ব্বাসনে যেতে হবে। কিন্তু তবুও সে এগিয়ে চললো। সে বিশ্বাস করতো যে তাকে চলতেই হবে—তাই সে চলে গেল। যদি তার চলার পথে তার মা এসে শুয়ে পড়তো—তা হলে তাঁর দেহের উপর দিয়েই সে চলে যেতো। বল, সত্যি কি না?"

চারিদিকে চাহিয়া কি এক অজানা আতঙ্কে শিহরিয়া মা বলিলেন, "সত্যিই, তাই!" সোফিয়া নিঃশব্দে মায়ের মাথায় হাত রাখিল।

সহসা ইযাকুব অগ্রসর হইয়া মাথা নাড়িয়া যেন আপনার মনে বলিয়া উঠিল, "যদি এফিমের সঙ্গে আমি সৈন্য বিভাগে চাকরী নিই তাহলে দেখছি—পাভেলের মত লোকের পেছনে আমাদেরই লেলিয়ে দেবে।"

গম্ভীর ভাবে রাইবিন উত্তর দিল, "তা না তো মনে কোরেছ কি? আমাদের হাত দিয়ে ওরা আমাদেরই কণ্ঠরোধ করে রেখেছে! এইখানেই তো মজা!"

তা সত্ত্বেও এফিম বলিয়া উঠিল, "তবুও আমি সৈন্য-বিভাগে যোগদান করবো।"

বিরক্ত হইয়া ইগ্‌নেটি বলিয়া উঠিল, "যাও না, তোমাকে বাধা দিচ্ছে কে? তবে একটা অনুরোধ ভাই, যদি কোন দিন তোমার বন্দুকের সামনে পড়ি, তা হলে মাথা লক্ষ্য করে মেরো—মিছেমিছি শুধু আহত করে চলে যেও না—একেবারে সাবাড় করে দিও।"

"সে দেখা যাবে তখন।"

সেই ছোট্ট দলটির সকলের উপর একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া রাইবিন ইচ্ছা করিয়া গম্ভীর ভঙ্গীতে তাহাদের সকলকে ডাকিয়া বলিয়া উঠিল, "শোন, ছোকরার দল!" তারপর মায়ের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল, "এই যে তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন—এই বৃদ্ধা নারী—হয়ত এতক্ষণে এঁর ছেলে সাবাড় হয়ে গিয়েছে—"

সহসা সেই কথা শুনিয়া মা করুণ ব্যথিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "কেন তুমি ও কথা বলছো?"

নিষ্করণ ভাবে রাইবিন বলিল, "তার প্রয়োজন আছে! বৃথাই তোমার মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে, বৃথাই তোমার বুক চুঁয়ে রক্ত ঝরছে? শোন ছোকরারা, যা বলছিলাম—এই নারী—নিজের ছেলেকে হারিয়েছে। কিন্তু তাতে এঁর কি হয়েছে? আপনি বইগুলো নিয়ে এসেছেন?"

রাইবিনের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর মা বলিলেন, "হাঁ, এনেছি।"

সামনের কাঠের টেবিলে জোর করিয়া হাতের চাপড় দিয়া রাইবিন বলিয়া উঠিল, "আপনাকে দেখেই আমি তা বুঝেছিলাম। আমি জানি, শুধু এরই জন্যে আপনি এত দীর্ঘ পথ হেঁটে এসেছেন। কেমন, না?"

তারপর ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া আর একবার সেই ছোট্ট দলটির সকলের মুখ ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া রাইবিন পরমোল্লাসে বলিয়া চলিল, "দেখছো, ছেলেকে তারা সরিয়ে দিলো কিন্তু মা এসে দাঁড়ালো সেই যায়গায়।"

সহসা উত্তেজিত হইয়া একটা ভয়ঙ্কর শপথ করিয়া রাইবিন বলিয়া উঠিল, "তারা জানে না, অন্ধের মত চারিদিকে কিসের বীজ তারা ছড়িয়ে চলেছে। জানবে, সেদিন বুঝবে, যেদিন আমরা জাগবো, সমস্ত আগাছা উপড়ে ফেলে সমান করে দেবো আবার সব, সেদিন তারা জানবে!"

রাইবিনের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে আতঙ্কে মায়ের মন ভরিয়া উঠিতেছিল।

রাইবিন বলিয়া চলিয়াছিল,—"সেদিন একজন সরকারের লোক আমাকে ধরে জিজ্ঞেস করলো—'এই বদমায়েস, পুরোহিতদের সঙ্গে কি ঝগড়া করিস্?' তার কথার উত্তর না দিয়ে বললাম, 'কিসে আমি বদমায়েস! নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করি—কোন লোকের কোন অনিষ্ট করি না—আমি বদমায়েস কিসে!' রেগে চীৎকার করে উঠে লোকটা সজোরে আমার মুখে মারলো—তিন দিন হাজতে আটকে রাখলো! কিন্তু মনে কোরো না তোমরা ক্ষমা পাবে! আমার ওপর যে অত্যাচার তোমরা করলে, তার প্রতিশোধ আমি না নিতে পারি—আমার ছেলেরা নেবে—তোমার উপর যদি না নিতে পারে—তোমার ছেলেদের উপর নেবে! ঘেন্নার বীজ চারিদিকে ছড়িয়েছ—ভেবো না—তাতে ক্ষমার ফল ফলবে!"

রাইবিন রাগে টগবগ করিতেছিল। সে বলিয়া চলিল; "আর পুরুতদের সঙ্গে আমি কি নিয়ে ঝগড়া করেছিলাম, জানো? গ্রামের সমস্ত লোক জড় করে তিনি বলছিলেন, তোমরা হচ্ছ মেষের দল—তোমাদের সর্ব্বদাই সেই জন্যে চাই একজন মেষপালক! আমি সেই সময় ঠাট্টা করে বলেছিলাম—কিন্তু নেকড়েকে যদি মেষপালক করা যায়—তা হলে মেষ আর একটিও পাওয়া যাবে না, কতকগুলো শিং আর খুর পড়ে থাকবে। আমার দিকে আড়-চোখে চেয়ে তিনি

আবার বক্তৃতা দিয়ে যেতে লাগলেন—তোমরা ধৈর্য্য ধরতে শেখো—ঈশ্বরের কাছে অবিরত প্রার্থনা করো, যেন তিনি তোমাদের ধৈর্য্য-শক্তি দেন। আমি থাকতে না পেরে বলে উঠলাম—লোকে তা প্রার্থনা করে কিন্তু ঈশ্বরের সময় কোথায়? হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে আমাকে জব্দ করবার জন্যে পুরুত মশাই জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি নিজে প্রার্থনা করো—কি প্রার্থনা করো? আমি বলেছিলাম—প্রার্থনা নিশ্চয়ই করি, আমি নিত্য প্রার্থনা করি, হে প্রভু, যারা মানুষ চরিয়ে খায়, সেই মনিবদের ইটের বোঝা বইতে শেখাও, শেখাও কেমন করে পাথর চিবিয়ে খেয়ে—"

হঠাৎ থামিয়া সোফিয়ার দিকে চাহিয়া রাইবিন বলিয়া উঠিল, "আপনি তো তাদের ঘরেরই মেয়ে?"

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এই প্রশ্নে আহত হইয়া সোফিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে তা মনে করবার হেতু কি?"

হাসিয়া রাইবিন বলিয়া উঠিল, "হেতু কি? একটা মোটা ময়লা রুমাল মাথায় জড়িয়ে এসেছেন বলে আমাদের চোখে লুকিয়ে যাবেন মনে করেছেন? চটের কাপড় পরেও যদি পুরুত মশাই আসেন তা হলেও আমাদের এ চোখ ধরে ফেলতে পারে। একটা ব্যাপার ধরুন, এই ভিজে টেবিলে কনুই রাখতে গিয়ে যেই আপনার হাতে ঠাণ্ডা লাগলো অমনি চিরদিনের অভ্যেস মত আপনি একবার চমকে উঠে ভ্রূ কোঁচকালেন। ভিজে টেবিলে যে আপনাদের হাত রাখার অভ্যেস নেই। আপনার মেরুদণ্ড এখনও সোজা রয়েছে—মজুরদের ঘরের মেয়ের মেরুদণ্ড অত সোজা থাকে না—"

রাইবিনের কথার ভঙ্গীতে মা শঙ্কিত হইয়া উঠলেন। সোফিয়া অপমানিত বোধ করে এই আশঙ্কায় তিনি উষ্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি কেন এ সব কথা বলছো! সোফিয়া আমার বন্ধু। তোমাদের এই আন্দোলনে খেটে খেটে এই বয়সেই ওর চুল শাদা হয়ে এসেছে—"

রাইবিন দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। বলিল, "আমি যা বলছি—তাতে কি আপনি অপমানিত হয়েছেন—"

"আমাকে তো তুমি কিছু বল নি?"

সহসা কথার মোড় ফিরাইয়া রাইবিন বলিল, "আমাদের এখানে আর একজন নতুন লোক এসেছে। হাঁপানিতে লোকটা বড় ভুগছে—লোকটার কিছু জানা-শোনা আছে—তাকে ডেকে পাঠাবো?"

সোফিয়া শান্ত কণ্ঠে বলিল, "নিশ্চয়ই!"

এফিমকে ডাকিয়া রাইবিন তাহাকে সন্ধ্যা বেলা আসিবার জন্য খবর দিতে বলিল।

সহসা সমস্ত কথাবার্তা থামিয়া গেল। মৌমাছি আর বোল্‌তারা অশ্রান্ত ধ্বনিতে ঘুরিয়া ফিরিতেছে। দূরে কোথায় বনের মধ্যে একটা পাখীর ডাক কানে আসিয়া বাজিতেছে।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর রাইবিন বলিল, "যাক্, সে সব কথা, এখন আমাদের অনেক কাজ আছে। আপনাদের একটু বিশ্রামও বোধ হয় দরকার। ঐ কাঠের চালের তলায় শোবার জায়গা আছে। ইয়াকুব! বেশ করে শুকনো পাতা বিছিয়ে দাও! তার আগে আপনারা বইগুলো দিন্ দেখি।"

থলি খুলিয়া মা এবং সোফিয়া ধীরে ধীরে বইগুলি ঢালিতে লাগিলেন। বই দেখিয়া রাইবিন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সোফিয়ার দিকে চাহিয়া বলিল, "এই তো, এই তো চাই! ওঃ—অনেক বই দেখছি! আপনি বুঝি এ কাজে অনেক দিন ধরে আছেন? আপনার নামটি কি?"

"আনা আইভানোভনা। বারো বছর। কিন্তু কেন?"

"না, এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম!"

"তুমি কি কখনও জেলে গিয়েছিলে?"

"হাঁ।"

কতকগুলি বই লইয়া নানাচাড়া করিতে করিতে রাইবিন দাঁত চাপিয়া বলিল, "আমার কথাবার্তায় আপনি রাগ করবেন না। জল আর আলকাৎরার মত সম্ভ্রান্ত লোকদের সঙ্গে চাষীদের কখনও মেলে না।"

ঈষৎ হাসিয়া সোফিয়া বলিল, "আমাকে কেন মনে করছ যে, সম্ভ্রান্ত ঘরের কোন মেয়ে। আমি এমনি একজন মানুষ!"

—হতে পারে তা। কিন্তু আমার পক্ষে তা বিশ্বাস করা বড় কঠিন। কিন্তু শুনেছি, তাও নাকি কখন কখন হয়। জ্ঞানী লোকেরা ত বলেন, এই সব কুকুর, তারাও নাকি একদিন নেকড়ে বাঘ ছিল। তাও তো হয়। তা যাক—এখন বইগুলো লুকিয়ে ফ্যালা যাক—"

এই বলিয়া তাহারা তিনজনে সামনের চালাঘরের ভিতরে ঢুকিল। রাইবিনের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া মা মৃদুস্বরে সোফিয়াকে বলিলেন, "লোকটার মনে আগুন লেগে গেছে।"

তাহারা তিনজনে যে দিকে গিয়াছিল সেইদিকে চাহিয়া সোফিয়া বলিল, "সত্যিই তাই! ওর মতন

মুখের চেহারা আর আমি কখনো দেখি নাই—আত্ম-বলিদানের মহা-সঙ্কল্প এমন স্পষ্ট কোথাও আর ফুটে উঠতে দেখি নি। চলুন, ভেতরে যাই—বড় দেখতে ইচ্ছে করে ওরা বইগুলো নিয়ে কি করে।"

চালাঘরের দরজার সামনে তাঁহারা দুইজনে আসিয়া উপস্থিত হইতেই দেখেন, ঘরের ভিতর খবরের কাগজ লইয়া ইতিমধ্যেই তাহারা একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছে। ইগ্‌নেটি একটা কাঠের চৌকির উপর বসিয়া, হাঁটুর উপরে খবরের কাগজ খোলা, আঙুল দিয়া অনবরত চুল টানিতেছে। পায়ের শব্দে একবার মাথা তুলিয়া তাঁহাদের দুইজনকে এক পলকে দেখিয়া লইয়া আবার তৎক্ষণাৎ মাথা নীচু করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। ভাঙ্গা ছাদের এক ফাঁক দিয়া এক টুকরা সূর্য্যের আলো ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছিল—তাহারই সুবিধা লইয়া রাইবিন দাঁড়াইয়াই পড়িয়াছিল। পড়িবার সময় তাঁহার ঠোঁট দুটি কাঁপিতেছিল।

জীবনের সত্য বাণীর প্রতি লোকগুলির সেই একান্ত মর্ম্মান্তিক আকর্ষণ দেখিয়া সোফিয়ার অন্তর উল্লসিত হইয়া উঠিল। আনন্দিত-স্মিত হাস্যে তাহার মুখ ভরিয়া উঠিল। নিঃশব্দে এক কোণে বসিয়া কাঁধে হাত রাখিয়া সে সেই অপরূপ দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

খবরের কাগজ হইতে মাথা না তুলিযাই ইয়াকুব রাইবিন্‌কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়া উঠিল, "খুড়ো, এরা দেখছি আমাদের হতভাগা কৃষকদের উপর বড় নির্দ্দয়!"

রাইবিন চারিদিক একবার চাহিয়া লইয়া বলিল, "তারা আমাদের ভালবাসে! যে ভালবাসে তার হাত দিয়ে কখনও অপমান আসে না, যত কঠিনতম আঘাত সে হাত করুক না কেন!"

ইগ্‌নেটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কাগজ হইতে মাথা তুলিল। ঈষৎ ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া চোখ বুজিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "দেখছো, এখানে কি লিখেছে—বলে কিনা, চাষীদের মধ্যে মনুষ্যত্ব আর নেই—তাদের আর মানুষ বলে ধরা চলে না। একবার একদিনের জন্যে, বাছা, আমার এই চামড়া গায়ে দিয়ে বাস করো, তখন বুঝবে পণ্ডিত, কিসে কি হয়।"

সোফিয়াকে ডাকিয়া মা বলিলেন, "আমার মাথাটা কেমন করছে—আমি একটু শুতে চললুম—তুমি যাবে না?"

সোফিয়া উত্তর দিল, "না।"

একটা কাঠের চৌকির উপর মা শুইয়া পড়িলেন। সোফিয়া তেমনি নীরবে বসিয়া লোকগুলিকে দেখিতেছিল আর মাঝে মাঝে মায়ের মুখের কাছে মৌমাছিরা ভন্-ভন্ করিয়া আসিলে তাড়াইতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে রাইবিন উঠিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন?"

"হাঁ।"

সেই নিদ্রাচ্ছন্ন স্নেহার্দ্র মুখের দিকে রাইবিন অনেকক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া আপনা হইতে মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিল, "ছেলের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চললো—বোধ হয় এই প্রথম মা—এই সর্ব্বপ্রথম—"

সোফিয়া এবং মাকে রাখিয়া তাহারা তিনজনে চলিয়া গেল। দূরে বনে কোথায় কে গাছ কাটিতেছিল, তাহারই প্রতিধ্বনি লতায়-পাতায় ব্যাহত হইয়া সেই জীর্ণ কুটীরের দ্বারে আসিয়া পড়িতেছিল। বনসুরভির মদিরায় মোহাচ্ছন্ন হইয়া অর্দ্ধ-স্বপ্নাবিষ্ট অবসন্নতায় সোফিয়া ঘরের বাহিরে দরজার কাছে আসিয়া বসিল। দেখিল, অরণ্য গ্রাম আচ্ছন্ন করিয়া সন্ধ্যা নামিতেছে। দূরে কাহাকে স্মরণ করিয়া তাহার নীলাভ নয়ন দুটি করুণায় ভরিয়া উঠিল।

বিদায়-সূর্য্যের রক্ত-আলো ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। নীড়ে-ফেরা পাখীর অশ্রান্ত কলরব কখন নিস্তব্ধ হইয়া আসিল। অন্ধকারে অরণ্য নিবিড়তর হইয়া উঠিল। অরণ্যমাতার শ্বাস-রুদ্ধ বক্ষে বৃক্ষশিশুগুলি যেন ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া আসিল।

কিছুক্ষণ পরে তাহারা সকলেই আবার ফিরিয়া আসিল। তাহাদের কথাবার্ত্তা এবং পায়ের শব্দে মায়ের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; ঘুম ভাঙ্গিতেই বাহিরে সকলের সঙ্গে আসিয়া বসিলেন।

রাইবিনের বিকেল বেলার রূপ এখন শান্ত হইয়া আসিয়াছে। উদ্‌বৃত্ত উত্তেজনা অবসাদের মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে।

ইগ্‌নেটিকে ডাকিয়া সে বলিল, "এখন একটু চা-পান করা যাক্! ইগ্‌নেটি, আজকে তোমার পালা! এখানে আমরা পালা করে ঘর-সংসার করি! আজকে ইগ্‌নেটিকে আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।"

শুকনো ডাল আর পাতা দিয়া আগুন তৈয়ারী করিতে করিতে ইগ্‌নেটি উত্তর দিল, "তথাস্তু!"

কিছুক্ষণ পরে ছাইয়ের আগুনে একটা বড় পাউরুটি সেঁকিয়া টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া টেবিলের উপর সাজাইতে লাগিল।

সহসা এফিম বলিয়া উঠিল, "শুনছো, কাশির শব্দ আসছে!"

রাইবিন মাথা তুলিয়া শুনিয়া ঘাড় নাড়িল। সোফিয়াকে ডাকিয়া বলিল, "সে আসছে, আমি ওকে নগর থেকে নগরে নিয়ে যাব! যেখানে সব জড় হবে, সেইখানে ওকে দিয়ে কথা বলাবো। তারা শুনুক ওর কথা। যদিও ওর বলবার মাত্র একটি কথা আছে এবং সেইটিই ও বার বার করে বলে, তবুও ওর কথা শোনাতে হবে সকলকে।"

ক্রমশ ছায়া নিবিড়তর হইয়া উঠিল। গোধূলির আলো রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে কখন হারাইয়া গেল। সে অন্ধকারে সকল শব্দ শান্ত হইয়া আসিল। মা আর সোফিয়া নীরবে চাষীদের ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিলেন। দেখিতেছিলেন, তাহারা কেমন ধীরে নড়াচড়া করিতেছে, এক অদ্ভুত সন্তর্পণতার সহিত। তাহারাও সমস্ত কাজের মধ্যে সেই নবাগতা নারী দুইটির দিকে লক্ষ্য করিতেছিল। তাহাদের দুইজনের কথাবার্ত্তা একটু শুনিবার জন্য তাহারা সকলেই সজাগ হইয়াছিল।

এমন সময় বনের মধ্য হইতে একজন দীর্ঘকায় লোক বাহির হইয়া আসিল। মাঠ পার হইয়া ধীরে ধীরে একটা ছড়ির উপর ভর দিয়া সে তাহাদেরই দিকে আগাইয়া আসিতেছিল। ক্রমশ তাহার নিশ্বাসের ভারী আওয়াজ স্পষ্টতর হইয়া উঠিল।

ইয়াকুব বলিয়া উঠিল, "এই যে সেভেলি!"

কর্কশ গম্ভীর কণ্ঠে লোকটি উত্তর দিল, "হাঁ আমিই!" বলিয়াই সে আবার কাশিতে আরম্ভ করিল।

সোফিয়ার সঙ্গে যখন রাইবিন তাহার পরিচয় করাইয়া দিতেছিল, তখন সে আপনা হইতেই কথা পাড়িল, "শুনলাম, আপনারা বই-পত্র সব নিয়েই এসেছেন!"

"হাঁ!"

"এই সব হতভাগ্য অবজ্ঞাত লোকদের হয়ে তার জন্যে আপনাদের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এরা আজও এই সব বইয়ের বাণী বুঝতে পারে না। আজ তাদের ধন্যবাদ আপনারা পাবেন না। তারা আজ ধন্যবাদ দিতে পারে না। তাই আমি, আমি বুঝি সত্য বাণীর মর্ম্ম কি, তাদের হয়ে আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

কথা শেষ হইতে না হইতেই তাহার হাঁপানি যেন বাড়িয়া উঠিল। মাংসহীন দীর্ঘ আঙুল দিয়া কোটের বোতামগুলি সে ভাল করিয়া আঁটিয়া দিল।

সোফিয়া বলিল, "এত রাত্তিরে বনের মধ্যে এই ভিজে জায়গায় আপনার থাকা তো ভাল নয়!"

কোনও রকমে নিশ্বাস লইয়া সে বলিল, "জগতে আমার সমস্ত ভালো চুকে গিয়েছে—শেষ ভালোর অপেক্ষায় এখন আছি।"

তাহার কথা বলার ভঙ্গীতে কোথা হইতে অন্তরে বেদনা জাগিয়া উঠে।

শুকনো কাঠের আগুন হাওয়ায় শেষবার জ্বলিয়া উঠিল। সেই আগুনের আঁচে চারিদিক্ যেন কাঁপিয়া নড়িয়া উঠিল। সেভেলি বলিয়া উঠিল, "তবুও মহাপাপের সাক্ষী হয়ে আজও বেঁচে আছি। এবং আমার এই সাক্ষ্য দিয়ে আমি মানুষের কল্যাণ করে যাবো। চেয়ে দেখুন আমার দিকে—আমার বয়স মাত্র আটাশ বছর—কিন্তু আমি মরতে চলেছি! দশ বছর আগে আমার এই কাঁধে আমি অনায়াসে পাঁচশো পাউণ্ড ভার তুলে নিয়ে বইতে পারতাম। তখন ভাবতাম, এমন শক্তি নিয়ে সত্তর বছর পর্য্যন্ত এগিয়ে চলবো—কিন্তু মাত্র এই দশ বছর চলে, আজ আর চলতে পারছি না। তারা সব লুঠ করে নিয়েছে—আমার জীবন থেকে চল্লিশটা বছর তারা লুঠ করে নিয়েছে—"

রাইবিন গম্ভীর ভাবে বলিল, "এই হলো ওর একমাত্র কথা।"

উত্তেজিত হইয়া সেভেলি বলিয়া উঠিল, "এ আমার কথা নয়! হাজার হাজার লোকের এই কথা! তাদের সঙ্গে আমার তফাৎ শুধু এই, তাদের কথা তারা শুধু তাদের মধ্যেই আটকে রেখেছে। তারা জানে না তাদের কথা দিয়ে তারা কি মহাদীক্ষা এই পৃথিবীকে দিয়ে যেতে পারে! উদয়াস্ত খেটে হাজার হাজার মানুষ আজ হীন, পঙ্গু, অথর্ব্ব, ক্ষুধার্ত্ত, ক্লান্ত হয়ে মৃত্যুর গহ্বরের মধ্যে এগিয়ে চলেছে! সে-কথা চেঁচিয়ে বলতে হবে—সকলকে ডেকে চেঁচিয়ে সে-কথা জানিয়ে দিতে হবে।"

এফিম বলিয়া উঠিল, "তা কেন? আমার দুঃখ-কষ্ট সে আমার একলার ব্যাপার। সব নিয়ে এই তো আমি বেশ আনন্দে আছি!"

তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া রাইবিন বলিল, "চুপ্ করো, ওকে বলতে দাও।"

এফিম ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "তুমিই তো বলো যে নিজের দুঃখ নিয়ে বড়াই করতে নেই!"

গম্ভীর ভাবে রাইবিন প্রত্যুত্তর দিল, "সে আলাদা কথা। সেভেলির দুঃখ তার একার দুঃখ নয়। সে মাটির তলায় নেমে দেখেছে—সেখানে অন্ধকারে দম

আটকে আসে—তাই যতটুকু তার শক্তি আছে তাই দিয়ে সে জগতকে সাবধান করবার জন্য বলছে—সাবধান, এখানে তোমরা আর এসো না।"

ইয়াকুব এক পাত্র দুধ লইয়া সেভেলিকে ডাকিল। সে-আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে ইয়াকুব আগাইয়া আসিয়া ধীরে তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে টেবিলের নিকট লইয়া গেল।

সোফিয়া রাইবিনকে আড়ালে ডাকিয়া অনুযোগের সুরে বলিল, "আপনি কেন ওকে এই রাত্তিরে আসতে বলেছিলেন? ভয় হয়, যে-কোন মুহূর্ত্তেই মারা যেতে পারে!"

রাইবিন সোফিয়ার ভর্ৎসনায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিল, "তা তো পারেই! মরতে হয়, মানুষের মধ্যে মরুক! একলা মরার চেয়ে সেটা একটু সুবিধের! ইতিমধ্যে যতক্ষণ বেঁচে থাকে—কথা বলুক! অকারণে সমস্ত জীবনটাই ও খুইয়েছে! যেটুকু আছে, সেটুকু দিয়ে যদি মানুষের কল্যাণ করে যেতে পারে তাতে ক্ষতি কি?"

"আপনার দেখছি এ-বিষয়ে একটা বিশেষ আনন্দ আছে!"

"আনন্দ আমার নেই। আপনি যে-শ্রেণী থেকে এসেছেন তারাই এ-সব ব্যাপারে আনন্দ পায়—তারাই আনন্দ পেয়েছিল যখন ক্রুশে-বিদ্ধ যিশুর কাতরধ্বনি উঠেছিল। আমরা চাই একটা মানুষের কাছ থেকে কিছু শিখে নিতে এবং আপনাদেরও কিছু শেখাতে।"

টেবিলে বসিয়া তখন সেভেলি বলিতেছিল, "খাটিয়ে ওরা মানুষকে মেরে ফেলে। কিসের জন্যে, কিসের জন্যে তারা মানুষের জীবন থেকে এমনি করে তার আয়ু কেড়ে নেয়? আমি কাপড়ের কলে কাজ করতুম। আমার মনিব শহরের সেরা সুন্দরীর মুখ-ধোবার টবের জন্যে সোনার টব তৈরী করে দিলেন—সোনা দিয়ে তার প্রসাধনের সমস্ত জিনিস তৈরী করে দিলেন। সেই সোনার টবে আমার সমস্ত রক্ত আছে—সেই সোনার রঙে আমার সমস্ত জীবন হারিয়ে গেছে। তার রক্ষিতার মন রাখবার জন্যে সে আমাকে হত্যা করে আমারই রক্ত দিয়ে গড়িয়ে দিলে সোনার টব! এই তো ব্যাপার!"

এফিম মৃদু হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "শুনেছি, তাঁর নিজের মূর্ত্তির ছাঁচে ভগবান মানুষকে গড়েছিলেন, সেই ছাঁচকে ওরা কি কাজেই লাগালো! আশ্চর্য্য!"

সোফিয়ার দিকে ঝুঁকিয়া মা মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকটা যা বলছে—তা কি সব সত্যি?"

সোফিয়া উচ্চকণ্ঠে স্পষ্ট ভাবে উত্তর দিল, "হাঁ, সবই সত্যি! খবরের কাগজে প্রায়ই এই-সব খবর বেরোয়। মস্কোতে সেদিনও এরকম একটা খবর পড়েছিলাম।"

রাইবিন সোফিয়ার দিকে অগ্রসর হইয়া চাপা কণ্ঠে বলিল, "বইয়ের কথার চেয়ে সেভেলির মুখের এই সব কথা আরও তীক্ষ্ণ। কারখানায় যখন কোনও মজুরের কলে হাত কাটা যায় কিংবা তাকে না খাইয়ে মারা হয় তখন লোককে বোঝান যায় যে, তারই অপরাধ। কিন্তু যেখানে মানুষের দেহ থেকে রক্ত চুষে নিয়ে মড়ার মতন তাকে ফেলে দেওয়া হয়—সে-সব ক্ষেত্রে বুঝিয়ে দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়। হত্যা যে-কোনও রকম হোক—আমি বুঝি। কিন্তু খেলার ছলে এই নির্য্যাতন—আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না। শুধু নিজেদের আনন্দের জন্যে, তারা নিশ্চিন্ত ভাবে চলেছে মানুষকে নির্য্যাতন করে। আমরা দেবো বুকের রক্ত—সেই রক্তে তৈরী তাদের ছেলেদের খেলনা, তাদের খেলনা, তাদের ঘোড়া, গাড়ী, বাড়ী, সোনার বাঁটা-চামচে। তুমি খাটো, রাত-দিন খাটো, আর আমি টাকা জমিয়ে রক্ষিতার সোনার টব কিনে দিই। চমৎকার!"

মা নীরবে সমস্ত শুনিতেছিলেন, নীরবে চারিদিক্ চাহিয়া দেখিতেছিলেন এবং এই সব শুনিতে শুনিতে সহসা আবার সেই অন্ধকার রাত্রির মধ্যে তাঁহার মানস-চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল—অন্ধকারে উজ্জ্বল একটি রক্ত-রাঙা পথ দিয়া তাঁহার পুত্র অন্য সকলের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে।

রাত্রির আহার শেষ করিয়া তাহারা সকলে আগুনের চারিদিকে ঘিরিয়া বসিল। পিছনে আকাশ ও অরণ্যানীকে আলিঙ্গন করিয়া এক মহা-অন্ধকার! সেভেলি দীর্ঘ বিস্ফারিত চক্ষু দিয়া অগ্নিকুণ্ডের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। ক্রমাগত সে কাশিতেছিল এবং প্রত্যেক কাশির সঙ্গে তাহার সর্ব্ব দেহ কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সেই কাঁপুনি দেখিয়া মনে হইতেছিল, যে-টুকু জীবন দেহের অভ্যন্তরে এখনও অবশিষ্ট আছে তাহাও যেন সেই শুষ্ক বিরস দেহ-যষ্টিতে আর থাকিতে চাহে না—অধীর আগ্রহে বুক ছিঁড়িয়া বাহিরে চলিয়া আসিবার জন্য যেন ছটফট করিতেছে।

ইয়াকুব সেভেলির কাছে আসিয়া অনুনয়ের সুরে বলিল, "সেভেলি, এখন তোমার উচিত চালাঘরের ভিতরে গিয়া বসা।"

কথা বলিতে তাহার কষ্ট হইতেছিল। তবুও চেষ্টা

করিয়া সে বলিল, "কেন? ঘরের ভেতর যাবার কি দরকার? তোমাদের সঙ্গে থাকবার আমার তো বেশী সময় নেই। তবুও যতটুকু সময় এখনও আছে তোমাদের সঙ্গে থাকলে ভাল থাকি। তোমাদের দিকে চাই, আর মনে মনে ভাবি, হয়ত আমারই মত যারা লোভের আর স্বার্থের ইন্ধনে আত্মাহুতি দিতে বাধ্য হয়েছে, তোমরা তাদের উপর সেই সব অবিচারের প্রতিশোধ নেবে।"

কেউ তাহার কথায় কোনও উত্তর দিল না। সকলেই নীরব। কিছুক্ষণ পরে নিজের বুকের কাছে মাথা গুঁজিয়া সে ঝিমাইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া থাকিবার পর রাইবিন বলিয়া উঠিল, "এমনি রোজ ও আমাদের কাছে আসে, বসে বসে এই একই কথা রোজ বলে। এই ক'টি কথা হলো ওর প্রাণ। এ ছাড়া আর কোনও জিনিস ওর মন অনুভব করে না।"

চিন্তাকুল কণ্ঠে মা বলিলেন, "এ ছাড়া ভাববারই বা কি আছে? এক দিকে মানুষ দিনের পর দিন খেটে বুকের রক্ত দেবে আর এক দিকে সেই রক্ত দিয়ে লোক নিরর্থক বিলাসিতা করবে—এই যখন জগতের ব্যাপার তখন এ রকমটি ছাড়া অন্য কি আর আশা করতে পার?"

ইগ্‌নেটি বলিয়া উঠিল, "কিন্তু রোজ রোজ এক কথা শুনতে যে কি অসীম ধৈর্য্য দরকার, তা কি বলবো! যে-সব কথা সে বলে, সে-সব কথা একবার শুনলে কখনও ভোলা যায় না কিন্তু সেই কথাই যদি আবার রোজ-রোজ কেউ শুনিয়ে দেয়—"

রাইবিন রুক্ষ স্বরে উত্তর দিল, "কিন্তু মনে রেখো, সমস্ত কথা ঐ ক'টা কথায় জড় হয়ে আছে আর ওর কাছে ঐ কথা ক'টার দাম হলো ওর সমস্ত জীবন!"

ঝিমাইয়া একবার চোখ চাহিয়া সেভেলি মাটিতে শুইয়া পড়িল। ইয়াকুব ধীরে উঠিয়া চালাঘরের ভিতর হইতে দুটি ওভারকোট আনিয়া তাহাকে জড়াইয়া দিল। তারপর সন্তর্পণে সোফিয়ার পাশে আসিয়া বসিল।

ইন্ধন-তৃপ্ত অগ্নিশিখা আনন্দে উর্দ্ধমুখী হইয়া উঠিয়াছে। তাহার রক্ত-আলোয় অন্ধকারের অগ্নিকুণ্ডের চারিদিকে সমবেত লোকগুলির মুখ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সোফিয়া গল্প বলিতে লাগিল। জগতের সকল দেশের মানুষের মুক্তি-সংগ্রামের কাহিনী—প্রাচীন কালে জার্ম্মাণ কৃষকদের আত্মোন্নতির জন্য সংগ্রামের কাহিনী, আইরিশ শ্রমিকদের দুর্দ্দশার কথা, ফ্রান্সেয়রদের মজুর কীর্ত্তি-কাহিনী—

রাত্রির অন্ধকার-চেলাঞ্চলে আবৃত বনানীর ধারে, সেই লতাগুল্ম-পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র মাঠে, নৃত্যপর অগ্নিশিখার রক্ত-আলোয় যে সমস্ত ঘটনা একদিন জগতকে দোলা দিয়া বিস্মৃতির গহ্বরে গিয়েছে তাহারা যেন আবার সে রাত্রিতে নবজীবন লাভ করিল। একটির পর একটি রণশ্রান্ত মুমূর্ষু জাতি সেই রক্ত-আলোয় ক্ষণিকের জন্য নবজীবন লাভ করিয়া আবার রাত্রির নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে মিলাইয়া যাইতেছিল।

শ্রোতারা বিমুগ্ধ-বিস্ময়ে শুনিতেছিল। ক্ষণে ক্ষণে তাহাদের মনে আশা এবং বিশ্বাস জাগিয়া উঠিতেছিল সোফিয়ার নীলাভ নয়নের শব্দহীন হাসির স্পর্শে তাহাদেরও অন্তর ক্ষণে-ক্ষণে হাসিয়া উঠিতেছিল। আজ তাহাদের সম্মুখে জগতের সকল জাতির সকল লোকের মুক্তি-সংগ্রামের ব্যাপার এক নূতনতর পবিত্র এবং স্পষ্ট সংজ্ঞা লাভ করিল। দূরে অন্ধকারের যবনিকার পটে তাহারা দেখিল, মুক্তি-সংগ্রামের যোদ্ধাদের ভাব ও ভাবনা সজীব হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। তাহাদের কথা শুনিতে শুনিতে মনে মনে কখন তাহারা সেই সমস্ত অতীতের নামহীন মহাযোদ্ধাদের সহিত নিজেদের এক-পরিবারভুক্ত মনে করিয়া লইয়াছিল। যাহারা বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার অর্জ্জনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, অসীম যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছে, অবশেষে নিজেদের রক্তে পৃথিবীকে রঞ্জিত করিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে…সেই রক্ত-আহুতি লইয়া পরবর্ত্তী মানুষ নব-জীবনের মন্দিরে অর্ঘ্য দিয়াছে।

সোফিয়ার আত্মপ্রত্যয় বলিষ্ঠ কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল, "শীগ্‌গিরই সেদিন আসছে যেদিন জগতের সকল দেশের মজুররা মাথা তুলে দাঁড়াবে, স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করবে…যথেষ্ট হয়েছে, এ-রকম জীবন-যাপন করতে আমরা আর চাই না। যারা লোভে অন্ধ হয়ে মানুষকে মেরে ফেলে নিজেদের ক্ষমতার ভেল্কী তৈরী করেছে, সেই দিনই তাদের সিংহাসন টলে উঠবে, পায়ের তলা থেকে সেই দিনই তাদের মাটি সরে যাবে!"

নিস্পন্দ হইয়া নীরবে তাহারা সোফিয়ার কথা শুনিতেছিল। যে সূত্রের সঙ্গে আজ রাত্রে তাহারা জগতের সঙ্গে বাঁধা পড়িয়াছে, কোন রকমে সে সূত্রটিকে ছিন্ন করিতে তাহাদের মন চাহিতেছিল না। একান্ত সন্তর্পণে মাঝে-মাঝে কেহ শুধু আগুনে দুই-একটি করিয়া শুকনা কাঠ দিতেছিল।

একবার শুধু ইয়াকুব বলিয়া উঠিয়াছিল, "একটু দাঁড়ান!"

ছুটিয়া চালাঘরের ভিতরে গিয়া একটা চাদর লইয়া আসিয়া মা এবং সোফিয়ার পিঠ এবং পা ঢাকিয়া দিল।

ভোর বেলা, রাত্রি যখন শেষ হইয়া আসিতেছিল তখন, পরিশ্রান্ত হইয়া সোফিয়া নীরব হইল। তাহাকে ডাকিয়া মা বলিল, "এখন চল, আমরা বিদায় হই।"

ক্লান্ত স্বরে সোফিয়া উত্তর দিল, "হাঁ, যাত্রা করবার এই সময়।"

কাহার যেন একটা দীর্ঘশ্বাস উষার বাতাসকে উষ্ণ করিয়া তুলিল।

অনভ্যস্ত মৃদু কণ্ঠস্বরে রাইবিন বলিল, "সত্যিই, আপনাদের যেতে হবে, না?"

রাইবিনের গায়ে মাত্র একটি শার্ট ছিল, তাহারও আবার গলার বোতাম ছিল না। চলিয়া যাইবার সময় তাহার সেই বিপুল দেহটিকে স্নেহ-দৃষ্টি দিয়া আলিঙ্গন করিয়া মা বলিলেন, "এখন যে বড় ঠাণ্ডা পড়েছে, গায়ে একটা কিছু দাও না!"

রাইবিন উত্তর দিল, "আমার ভেতরে আগুন জ্বলছে —বাইরের ঠাণ্ডা লাগে না!"

যাত্রার সময় সন্নিকট হইলে রাইবিন সোফিয়ার হাত দুটি জোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "শহরে গিয়ে আপনার দেখা কি করে পাবো?"

তাহার উত্তরে মা বলিলেন, "আমার ওখানে খবর দিলেই ওঁর খবর পাবে। তা হলে আসি"

হঠাৎ ইয়াকুব বলিয়া উঠিল, "যাবার সময় একটু গরম দুধ খেয়ে গেলে হয়ত ভাল হতো।"

এফিম বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দুধ কি আর আছে?"

ইগ্‌নেটি একটু যেন বিপন্ন হইয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "যেটুকু ছিল, আমি অসাবধানে ফেলে দিয়েছি—"

সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। তারপর বিদায় দিবার জন্য তাহারা কিছুদূর অগ্রসর হইয়া মৃদু স্বরে সকলে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "বিদায়"

বহুদূর পর্য্যন্ত সেই মিলিত কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি সেই দুই জন নারীর পায়ে-পায়ে জড়াইয়া চলিল।

মায়ের জীবনের ধারা সহসা এত শান্ত এবং নিরুদ্বেগ হইয়া উঠিল যে, মাঝে মাঝে তাহাতে তিনিই বিস্মিত হইয়া উঠিতেন। গ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিয়াই কিছুদিনের জন্য সোফিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। আবার পাঁচ দিন পরে আনন্দে নাচিতে নাচিতে আসিয়া উপস্থিত। তারপর আবার কয়েক ঘণ্টার পরে কোথায় চলিয়া গেল, দু'সপ্তাহ আর আসিল না।

আইভানোভিচ সর্ব্বদাই কাজে ব্যস্ত। ঘড়ি ধরিয়া তাহার জীবনের ধারা প্রতিদিন একমাত্রায় প্রবাহিত হয়। সকাল আটটার সময় উঠিয়া সে চা-পান করে, তারপর খবরের কাগজ পড়িয়া মাকে শোনায়। শাসন-পরিষদে ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিরা যে সমস্ত বক্তৃতা দিত তাহার মর্ম কোনও রকম বিকৃত না করিয়া মাকে বুঝাইয়া দেয়। তারপর ঠিক ন'টা বাজিতেই সে অফিসের কাজে চলিয়া যায়।

ঘরদোর পরিষ্কার করিয়া মা রান্নাঘরে ঢুকেন। দ্বিপ্রহরের আহারের বন্দোবস্ত করিয়া স্নান-অন্তে পরিষ্কার একটি পোষাক পরিয়া ঘরের আলমারীতে থাকে-থাকে সাজানো বইগুলি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখেন। এখন তিনি পড়িতে শিখিয়াছেন বটে, কিন্তু বানান করিয়া পড়িতে পড়িতে তিনি এত বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন যে, যাহা উচ্চারণ করেন, তাহার অর্থ সংগ্রহ করিতে আর পারেন না। কিন্তু ছবি বা ছবির বই তাঁহার পরম বিস্ময়ের জিনিস ছিল। সেই সমস্ত ছবির বই তাঁহার বিমুগ্ধ চোখের সম্মুখে এক নূতন জগতের বাস্তব রূপ ফুটাইয়া তুলিত—সুন্দর নগরী, অপরূপ উদ্যান, সুন্দরতর সব ঘর, অপূর্ব্ব তাহাদের সজ্জা, সুন্দর বলিষ্ঠ নর-নারী, সমুদ্র, জাহাজ, অট্টালিকা, স্মৃতিস্তম্ভ, মানুষের ঐশ্বর্য্যের নিত্য নব-নব বিকাশ! প্রতিদিন সেই সব ছবির বই দেখেন, আর তাঁহার চোখের সম্মুখে পৃথিবীর সীমা-রেখা যেন আরও দূরে সরিয়া যায়। প্রতিদিনই মায়ের কাছে পৃথিবী সুন্দরতর বৃহত্তর হইয়া ওঠে। বহুদিন-বঞ্চিত এই বুভুক্ষিত নারীর আত্মা ধরণীর রূপ-রস-ঐশ্বর্য্যের বিশালতার সম্ভাবনায় নিত্য স্পন্দিত হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রাণিতত্ত্বের ম্যাপগুলি মায়ের বিশেষ ভাল লাগিত। নানা দেশের সেই সমস্ত বিচিত্র চিত্র হইতে এই পৃথিবীর রূপ, ঐশ্বর্য্য এবং বিশালতার কথা মা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন। একদিন আহারের সময় মা আপনা হইতে বলিয়া উঠিলেন, "কত বড় এই পৃথিবী!"

আইভানোভিচ হাসিয়া বলিল, "তবুও জায়গার অভাবে ঘাড়ের'পরে ঘাড়ে মানুষকে বাস করতে বাধ্য করায় ওরা!"

আবেগে উদ্বেলিত হইয়া মা বলেন, "কি রূপ, আইভানোভিচ! অথই রূপের সাগরের মধ্যে আমরা বাস করি, কিন্তু আমাদের চোখ বন্ধ করে রেখে দিয়েছে কে! কোথা দিয়ে কি চলে যায়, কখন যায় আমরা জানতেও পারি না। অন্ধের মত লোক শুধু ঘুরেই মরে, আনন্দ পাবার শক্তিটুকুও তারা হারিয়ে ফেলেছে,

সে প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত ঘুচে গেছে। যদি তারা জানতো, যদি তারা সত্যই বুঝতো—এই পৃথিবী কত সুন্দর, কত তার ঐশ্বর্য্য, কত আশ্চর্য্য জিনিস আছে এই পৃথিবীতে, তা হলে এমন করে মন প্রাণ তাদেরও শুকিয়ে উঠতো না।"

সন্ধ্যাবেলায় অনেক লোক আসিত। আলেকসি, পেট্রোভিচ, আইভান। ইহাদের বলিয়া একদিন অতি রুগ্ন অসুস্থ লোক প্রায়ই আসিত। নিজের কাল-ব্যাধি লইয়া সর্ব্বদাই সে ব্যঙ্গ করিত, হাসত। মাঝে মাঝে দূর-দূরান্তরের শহর হইতেও দেখা-শোনা করিবার জন্য লোক আসিত।

তাহারা কথাবার্ত্তা বলিত। মা নীরবে তাহাদের চা পরিবেশন করিতে করিতে শুনিতেন, কুলিদের জীবন সম্বন্ধে তাহারা কত কি বলিতেছে। তাহাদের কথা শুনিয়া মা মনে মনে বুঝিতেন, কুলিদের জীবন সম্বন্ধে ইহারা কতটুকু জানে। তাহারা যে দায়িত্ব লইতে চলিয়াছে, তাহার গুরুত্ব কতখানি তাহা তাহাদের অপেক্ষা মা বেশী বুঝিতেন।

মাঝে মাঝে শাশাঙ্কাও আসিত। বেশীক্ষণ থাকিত না—কাজের কথা ছাড়া অন্য কোনও কথা বলিত না। ভুলিয়াও হাসিত না। প্রত্যেক বার বিদায় লইবার সময় মায়ের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিত, "পাভেল কেমন আছে?"

মা বলিতেন, "ভগবানের আশীর্ব্বাদে সে ভালই আছে।"

"দেখা হলে আমার অভিবাদন জানাবেন"—বলিয়াই সে চলিয়া যাইত।

কোন কোন বার শাশাঙ্কা আসিলে মা আপনা হইতেই পাভেলের কথা তুলিতেন। দুঃখ করিয়া বলিতেন, "এত দিন ধরে হাজতে রয়েছে, এখনও বিচারের দিন পর্য্যন্ত ঠিক হলো না?"

দেখিতেন শাশাঙ্কার গম্ভীর মুখ বেদনায় বিদীর্ণ হইয়া আসিত। তবুও সে কোন কথা বলিত না। নীরবে আঙুলগুলি নিষ্পেষণ করিত। এক একবার মায়ের মনে হইত যে তিনি বলিয়া ফেলেন, "দুষ্টু মেয়ে, জানি রে, সব জানি! জানি তুই তাকে কতখানি ভালবাসিস্!" কিন্তু শাশাঙ্কার সেই গম্ভীর মুখ, সেই নীরবতা, সেই চেষ্টা করিয়া বাজে কথা না-বলার ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া মা অন্তরের কথা তাহার সম্মুখে উত্থাপন করিতে পারিতেন না। শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তাহার হাত দুইটি বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিতেন, "অভাগী কোথাকার!"

মাঝে নাটাশাও একদিন আসিয়াছিল। মাকে দেখিয়া তাহার আনন্দ ধরে না। নানা কথার মধ্যে সে জানাইল যে তাহার মা মরিয়া গিয়াছে।

"মায়ের জন্যে দুঃখু হয়। তবে আর একদিক দিয়ে যখন ভাবি যে সে যে-জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছিল, মৃত্যু তার চেয়ে ঢের শান্তিময় তখন আর দুঃখু করি না। ভালোর জন্যে মানুষ আশা করে বেঁচে থাকে, কিন্তু পায় শুধু অপমান।"

তাহার কাঁধে সস্নেহে হাত রাখিয়া মা বলেন, "তা হলে তুই এখন একেবারে একা!"

অন্যমনস্ক ভাবে নাটাশা বলে, "একেবারে।"

নাটাশা এখন যে-শহরে স্কুল-মাষ্টারী করে, মাকে মাঝে-মাঝে সেই শহরে যাইতে হইত। সেখানে একটা কাপড়ের কল আছে। সেই কলে নিষিদ্ধ বই, খবরের কাগজ বিলি করিবার জন্য তাঁহাকে যাইতে হইত। নিষিদ্ধ লেখা পত্র বিলি করাই মায়ের একমাত্র কাজ হইয়া উঠিয়াছিল। মাসের মধ্যে প্রায়ই হয় পুরোহিত-রমণীর বেশে, নয় ফিরিওয়ালার পোষাকে, নয় তীর্থযাত্রীরূপে বা কোনও বড়লোকের বিধবা পত্নীর সাজে, কখনও হাঁটিয়া, কখনও গাড়ী করিয়া সহরে সহরে ঘুরিতে হইত। ট্রেনে, ষ্টীমারে, হোটেলে সর্ব্বত্র অতি স্বচ্ছন্দ ভাবে বিচরণ করিতেন এবং তাঁহার স্বাভাবিক সরলতার ভঙ্গীতে নূতন লোক সহজেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত।

অজানা লোকের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে তাঁহার ভাল লাগিত। একান্ত সহানুভূতির সহিত তাহাদের অন্তরের অভিযোগ, বিপদ-আপদের কথা শুনিতেন। যদি দেখিতেন কাহার মনে জীবন সম্বন্ধে স্পষ্ট তিক্ততা জাগিয়াছে, যদি দেখিতেন কাহারও বিমুগ্ধ অন্তর ব্যাকুল প্রশ্নে সংক্ষুব্ধ, অমনি তাহার অন্তর এক অপূর্ব্ব আনন্দরসে অভিষিক্ত হইয়া উঠিত। চারিদিকে তিনি দেখিতেন, শুধু উদর-পূরণের জঘন্য উন্মাদ প্রচেষ্টায় নির্লজ্জের মত প্রকাশ্য ভাবে মানুষ মানুষকে বঞ্চনা করিতেছে, তাহাকে নিঙড়াইয়া সমস্ত রস বাহির করিয়া লইতেছে। বিশাল এই ধরণী, বিপুল তাহার ঐশ্বর্য্য, তবুও লোকে নিরন্তর অভাবে বিমূঢ়। অনন্ত ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডারে বসিয়া মানুষ অর্দ্ধাহারে দিনযাপন করিতেছে। নগরে নগরে ঈশ্বরের উপাসনার মন্দির তৈয়ারী হইয়াছে—স্বর্ণে আর রৌপ্যে বেদী পরিপূর্ণ, আর সেই সব মন্দিরের দ্বারে দ্বারে নিরন্ন বস্ত্রহীন ভিখারীর দল শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে ঘুরিয়া মরিতেছে—যদি কেহ হাতে এক টুকরা তামা দিয়ে যায়। স্বর্ণ-রৌপ্যে ভরা এই সমস্ত গীর্জ্জা, সোনার

সুতার কাজকরা পুরোহিতের পোষাক, গীর্জ্জার দ্বারে বস্ত্রহীন এই সব ভিখারীদের ভিড়—এই সমস্তই তিনি পূর্ব্বেও দেখিয়াছেন, কিন্তু তখন মনে হইত—ইহাই স্বাভাবিক জীবনের ধারা। কিন্তু আজ তিনি বুঝিয়াছেন, এই বৈষম্যের মিল কোথাও নাই। যাহাদের জন্য গীর্জ্জার সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন, তাহারাই রহিল গীর্জ্জার বাহিরে দাঁড়াইয়া—ভিক্ষুকের বেশে।

যিশুখৃষ্টের গল্প শুনিয়া এবং ছবি দেখিয়া মা বুঝিয়াছেন যে, তিনি ছিলেন দরিদ্রের বন্ধু—অতি সাধারণ ছিল তাঁহার অঙ্গের আবরণ। যাঁহার কাছে নিখিলের আর্ত্ত দরিদ্র লোক আসিবে সান্ত্বনার জন্য, গীর্জ্জায় গীর্জ্জায় তাঁহারই মূর্ত্তি কি না সোনার পেরেকে ক্রুশে বিদ্ধ? স্বর্ণের এ কি অসহ্য ঔদ্ধত্য! রাইবিনের কথা মায়ের মনে পড়িত। সে বলিয়াছিল, "আমাদের মেরে ফেলবার জন্যে, তারা ভগবানকেও বিকৃত করেছে। ক্ষেতে পাখীদের ভয় দেখাবার জন্য যেমন চাষীরা একটা নকল ন্যাকড়ার মানুষ টাঙিয়ে রাখে, তেমনি ওরা আমাদের ভয় দেখাবার জন্যে ঈশ্বরের প্রতিনিধির বদলে গীর্জ্জেয় একটা নকল ভগবান টাঙিয়ে রেখেছে।"

এই সব কথা চিন্তা করিতে করিতে কখন অজ্ঞাতে মা তাঁহার প্রাত্যহিক প্রার্থনা কমাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু অন্তরে অহরহ যিশু এবং তাঁহারই আলোকে যাহারা কলরবহীন জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কথা প্রায়ই ভাবিতেন! বাহিরে যাহা-কিছু শোনেন, যাহা-কিছু দেখেন, অন্তরের সেই নবজাগ্রত অপূর্ব্ব অনুভূতির সঙ্গে তাহা মিলাইয়া দেখেন। এবং এই চিন্তাধারাই এক অপরূপ প্রার্থনার রূপে তাঁহার অন্তরকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিত। মনে হইত যেন তাহারই মধ্যে সমস্ত অন্ধকার জগৎ সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই মনে হইতে লাগিল যে, এত দিন পরে আজ তিনি যেন সত্যই তাঁহার অন্তরের নিকট আসিয়াছেন। স্পষ্ট তাঁহাকে দেখা যাইতেছে—জনতার উর্দ্ধে আনন্দ-বিভাসিত আননে ক্রুশে দাঁড়াইয়া আছেন। নয়নে কি অমৃত-সান্ত্বনা—তাঁহারই ক্ষুব্ধ মাতৃ-হৃদয়ের দিকে চাহিয়া আছেন। কি আশ্বাস প্রসারিত করে! যুগে যুগে তাঁহার নামে যে তপ্ত রক্ত-অর্ঘ উৎসব করা হইয়াছে, তাহারই স্পর্শে নবজীবন লাভ করিয়া আজ সত্যই যেন তাঁহার নব-আবির্ভাব!

আইভানোভিচ ঘড়ি ধরিয়া প্রত্যহ ঠিক নিয়মিত সময় রাত্রে বাড়ী ফিরিত। একদিন তাঁহার ফিরিতে দেরী হইল। যে সময় ফিরিবার কথা তাহার অনেক পরে ব্যস্ত হইয়া ঘরে ঢুকিয়া মাকে ডাকিয়া বলিল, "শুনেছেন, আজকে জেলে ভীষণ গণ্ডগোল হয়েছে! গণ্ডগোলের সময় কে একজন আসামী জেল থেকে পালিয়ে গেছে। কিন্তু কে যে পালালো—এখনও পর্য্যন্ত সে খবর পাই নি!"

উত্তেজনায় মায়ের সমস্ত দেহ কাঁপিয়া উঠিল। একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া কম্পিত-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাভেল নয় তো?"

"হতেও পারে। কিন্তু এখন সমস্যা হচ্ছে যে, তাঁকে খুঁজে বার করতে হবে। তাঁকে লুকিয়ে রাখতে হবে তো? সারাক্ষণ সেই জন্যে পথে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম—যদি দেখতে পাই। অবশ্য এ-রকম করে খোঁজা বোকামী বই আর কিছুই নয়—তবুও একটা কিছু করতে হবে তো! আমাকে এখনই বেরুতে হবে আবার—"

মা বলিয়া উঠিলেন, "আমিও তোমার সঙ্গে যাব!"

বাধা দিয়া আইভানোভিচ বলিল, "তার চেয়ে বরঞ্চ আপনি আর এক কাজ করুন—আপনি এখুনি ইয়াগরের কাছে যান—সে যদি কোন খবর পেয়ে থাকে।"

পুত্রকে দেখিবার গোপন আশায় কালবিলম্ব না করিয়া মাথায় একটা বড় রুমাল জড়াইয়া লইয়া রাজপথে বাহির হইয়া পড়িলেন। এত দ্রুত বুকের মধ্যে নিশ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছিল যে, তিনি চলিতে পারিতেছিলেন না, চোখের সামনে ক্রমশ যেন সব ঝাপ্‌সা হইয়া আসিতেছিল।

ইয়াগরের বাড়ীর সিঁড়ির কাছে আসিয়া তিনি এতদূর ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন যে একটু অপেক্ষা করিতে হইল। পিছনে ফিরিয়া চাহিতেই তিনি সহসা চাপা গলায় অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়া কয়েক সেকেণ্ডের জন্য চক্ষু বুঁজিলেন। তাঁহার মনে হইল, নিকোলে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে। চোখ চাহিয়া দেখিতেই আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না।

ছুটিয়া বাহির হইতেই দেখেন, অদূরে সত্যই নিকোলে দাঁড়াইয়া। মুখে সেই বসন্তের দাগ। তাহলে পাভেল নয়, নিকোলে! এই নূতন নৈরাশ্যে বহুদিনের ভুলিয়া-যাওয়া অন্তর-পোড়ানি অগ্নি-শিখা সহসা মায়ের বুকে জ্বলিয়া উঠিল।

চাপা-গলায় ডাকিলেন, 'নিকোলে, নিকোলে?'

হাত নাড়িয়া নিকোলে তেমনি চাপা-গলায় উত্তর দিল, "আপনি এগিয়ে যান!"

ইয়াগরের ঘরে ঢুকিয়া মা দেখেন রোগ-পাণ্ডু মুখে

ইয়াগর বিছানায় শুইয়া আছে। নড়িতে পারিতেছে না। চুপি চুপি তাহার কানের কাছে গিয়া বলিলেন, "নিকোলে জেল থেকে পালিয়ে এখানে আসছে।"

ইয়াগর তেমনি শুইয়া উত্তর দিল, "চমৎকার! এগিয়ে গিয়ে তাকে সম্বর্দ্ধনা করবার শক্তি আমার আর নেই!"

বলিতে না বলিতেই দরজা খুলিয়া নিকোলে ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। মাথা হইতে টুপী খুলিয়া হাসিতে হাসিতে ইয়াগরের বিছানার দিকে অগ্রসর হইল।

কনুইয়ের উপর ভর দিয়া ইয়াগর বলিল, "আসতে আজ্ঞা হয়, মহাপ্রভু।"

মায়ের দিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহার হাত দুটি ধরিয়া নিকোলে বলিল, "আপনার সঙ্গে যদি দেখা না হতো তাহলে আবার আমাকে জেলেই ফিরে যেতে হতো। এখানে কে আছে না আছে আমি কিছুই জানি না। আর কিছুক্ষণ বাইরে থাকলেই ধরা পড়তাম—আবার যেতে হতো জেলে। জেল থেকে বেরিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম কি বোকা আমি—কেন জেল থেকে পালিয়ে এলাম? এমন সময় দেখি আপনি হন্‌হন্ করে চলেছেন—আমিও আপনার পিছু পিছু চলতে সুরু করলাম।"

—"কিন্তু কেমন করে জেল থেকে পালালে?"

—"আমি নিজেই জানি না কেমন করে। হঠাৎ ঘটে গেল। জেলের মধ্যে বিকেল বেলা ছাড়া পেয়ে হাওয়া খাচ্ছিলাম। এমন সময় দেখি জেলের ওভার-সিয়ারকে ধরে কয়েদীরা প্রচুর প্রহার লাগাচ্ছে। দেখতে দেখতে চারদিকে একটা হট্টগোল পড়ে গেল। আমি ঘুরতে ঘুরতে দেখি, জেলের দরজা খোলা। পাহারায় যারা ছিল তাড়াতাড়ি সব ভেতরে চলে এসেছে। বেশ ধীরে-সুস্থে ফটকের কাছে গেলাম, ফটকের বাইরে এলাম। কেউ কিছু বললে না। কিছুদূর এগিয়ে নিজের মনেই প্রশ্ন করলাম—এখন যাই কোথা? পিছন ফিরে জেলের দিকে চাইলাম—দেখি দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কি রকম অশোয়াস্তি বোধ হতে লাগলো। বন্ধুদের ফেলে রেখে এ রকম করে চলে আসা আমার উচিত হয়নি—এ যে কি একটা বোকার মত কাজ হয়ে গেল, কিছুই বুঝতে পারছি না।"

ইয়াগর তাহার স্বাভাবিক বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলিল, "হুজুরের উচিত ছিল ফিরে গিয়ে ভদ্র ভাবে জেলের দরজায় কড়া-নাড়া দেওয়া! দরজা খুললে, বলা—ধর্ম্মাবতার ক্ষমা করবেন—ক্ষণিকের লোভ হয়েছিল—আবার ফিরে এসেছি! যাক্, সে-সব কথা এখন! এখন দরকার হচ্ছে তোমার লুকিয়ে থাকা। কিন্তু আমি যে উঠতে পারছি না—"

নিকোলে ইয়াগরের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিল, "তুমি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছ, ইয়াগর!"

মা সেই ছোট্ট ঘরটির চারিদিকে উদাস-দৃষ্টিতে চাহিতেছিলেন।

দুই হাত দিয়া বুক চাপিয়া ইয়াগর বলিয়া উঠিল, "অসুস্থ হওয়া না-হওয়া সে আমার ব্যাপার। তোমার তাতে মাথা ঘামাতে হবে না। মা গো, আপনি পাভেলের কথা ওকে জিজ্ঞাসা করুন। চেষ্টা করে উদাসীন হবার কি দরকার?"

মায়ের জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই নিকোলে বলিতে লাগিল, "পাভেল বেশ ভালই আছে। শরীর তার বেশ সুস্থ এবং সবল আছে। আমাদের হয়ে অফিসারদের সঙ্গে সেই কথাবার্ত্তা বলে। সেখানেও এমনি প্রতিপত্তি করে নিয়েছে যে, জেলে বসে হুকুম চালায়।"

ইয়াগরের ফুলিয়া-উঠা বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া মা নিকোলের কথা শুনিতেছিলেন।

এদিক-ওদিক চাহিয়া হঠাৎ নিকোলে বলিয়া উঠিল, "দেখো, ভয়ানক খিদে পেয়েছে, কিছু খেতে দিতে পার?"

"মা গো, দেখো তো সেলফের ওপর পাউরুটি আছে। ওটা সব ওকে দাও। তারপর বারাণ্ডায় গিয়ে বাঁ হাতে দ্বিতীয় দরজা যেটা পাবে—সেখানে গিয়ে কড়া-নাড়া দেবে। একজন স্ত্রীলোক বেরিয়ে আসবে তাকে বলবে—ঘরে খাবার য-কিছু জিনিষ আছে সমস্ত নিয়ে এখুনি এই ঘরে চলে আসতে।"

নিকোলে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল, "আহা, ও-সব কেন?"

"উত্তেজিত হয়ো না বন্ধু! যদি সে সবও আনে—তাহলেও তা খুব বেশী হবে না। আর হয়ত তার ঘরে কিছুই নেই।"

বারাণ্ডায় গিয়া নির্দ্দিষ্ট ঘরে মা কড়া নাড়িতেই দরজার ভিতর হইতে কিছুক্ষণ পরে নারী-কণ্ঠে একজন জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

চুপি চুপি মা বলিলেন, "আমি ইয়াগরের কাছ থেকে আসছি!"

কিছুক্ষণ পরে একজন দীর্ঘাকৃতি স্ত্রীলোক ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই আপনার?"

—"আমি ইয়াগরের কাছ থেকে আসছি—সে আপনাকে এক্ষুণি তার ঘরে যেতে বললে।"

আর একটু অগ্রসর হইতে নারীটি বলিয়া উঠিল, "ওঃ, আপনি! অন্ধকারে বুঝতে পারিনি! ইয়াগরের কি অসুখ বেড়েছে?"

—"বোধ হয়! সে কিছু খাবার নিয়ে যেতে বলেছিল—"

"সে তো এখন কিছু খায় না—খাবার কি হবে?" বলিতে বলিতে তাহারা দুই জনে ইয়াগরের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

বিছানার কাছে আসিতেই ইয়াগর বলিয়া উঠিল, "বন্ধু, পিতৃপুরুষদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করবার জন্যে আমি চললুম। আমার এই বন্ধুটি জেলের কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়ে চলে এসেছেন। এখন প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে—এঁর খিদে পেয়েছে—তার ব্যবস্থা কর। তারপর এঁকে দু-একদিনের জন্যে লুকিয়ে রাখা!"

ঘাড় নাড়িয়া তাহার জবাব দিয়া নারীটি রুগ্ন ব্যক্তির মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। গম্ভীর ভৎর্সনার সুরে বলিয়া উঠিল, "তোমার বকবকানি থামাও, ইয়াগর! তুমি জানো, বেশী কথা বলার তোমার কাছে কি মানে? ওঁরা যখন এলেন, তখনই আমাকে ডাকিয়ে পাঠান তোমার উচিত ছিল। দেখছি, ওষুধও খাওয়া হয় নি! আপনারা আমার ঘরে চলুন! এখনি হাসপাতাল থেকে লোক আসবে —ওকে নিয়ে যাবার জন্যে।"

মুখ বিকৃত করিয়া ইয়াগর বলিয়া উঠিল, "তাহলে, অবশেষে হাসপাতালেই যাচ্ছি?"

—"আমিও সেখানে যাব তোমার সঙ্গে!"

—"সেখানেও যাবে?"

—"চুপ করো!"

কোনও কথা না বলিয়া ইয়াগরের গায়ের কম্বলখানি ভাল করিয়া টানিয়া দিয়া ওষুধের শিশিটি তুলিয়া লইয়া কতখানি ওষুধ খাওয়া হইয়াছে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। তারপর নিকোলেকে ডাকিয়া যাইবার সময় মাকে বলিয়া গেল, "আপনি একটু থাকুন! আমরা এখন যাচ্ছি। আমি এক্ষুণি ফিরে আসছি। আপনি ইত্যবসরে এক-দাগ ওষুধ ওকে খাওয়ান।"

দরজার কাছে গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আর দেখুন, ওকে এক-দম কথা বলতে দেবেন না!"

তাহারা চলিয়া গেলে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ইয়াগর বলিয়া উঠিল, "অপূর্ব্ব নারী! আপনি এর সঙ্গে মিশে কাজ করে দেখবেন—কি পরিশ্রমই না করতে পারে! আমাদের সমস্ত ছাপার কাজ এই মেয়ে একা সব করে।"

—"কথা বলো না। বারণ করে গেলো! এই খেয়ে নাও—"

ওষুধ গলাধঃকরণ করিয়া একটা চোখ বুঁজিয়া সে বলিল, "কথা বলি আর নাই বলি, আমি যে মরবো, সেটা সুনিশ্চিত!"

তাহার সেই বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিতে করুণায় মায়ের চোখে জল ভরিয়া আসিতেছিল।

—"দুঃখ করো না মা! এই-ই নিয়ম, জীবন ভোগ করবার অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে মরবার দায়িত্ব নিয়েই আমরা এই পৃথিবীতে এসেছি!"

তাহার হাতের উপর হাত রাখিয়া মা বলিলেন,— "না, তুমি বেশী কথা বলো না!"

—"চুপ করে থাকার কোন মানে হয় না। চুপ করে থেকে আমার কি লাভ হবে? বাড়তি আর কয়েক সেকেণ্ড এই সব যন্ত্রণা-ভোগ—এই তো? তার জন্যে আমি একজন সত্যিকারের মানুষের সঙ্গে দুটো কথা বলার আনন্দটুকু হারাচ্ছি! আমার বিশ্বাস, এই পৃথিবী ছেড়ে যেখানে যাব সেখানে এখানকার মত মানুষের সঙ্গে আর কথা বলতে পারবো না।"

ক্রমশ তাহার কথা বাড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া মা বিব্রত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "এখনি মেয়েটি এসে আমাকে ধমকাবে—তুমি চুপ করো।"

"সে তোমাকে ধমকাবেই মা! কাউকে না ধমকিয়ে সে একদণ্ড থাকতে পারে না!"

কিছুক্ষণ পরে লুডমিলা ফিরিয়া আসিল। মায়ের কাছে আসিয়া বলিল, "বন্ধুটিকে কিছু নতুন কাপড়-চোপড় এক্ষুণি কিনে এনে দিতে হবে। এ যায়গায় বেশীক্ষণ থাকা ওর পক্ষে নিরাপদ নয়। আপনি যান, এক্ষুণি যা-হোক একটা পোষাক কিনে আনুন। সোফিয়াটা এই সময় থাকলে বড় সুবিধে হতো। লোক লুকোতে ও ওস্তাদ!"

ইয়াগরের দিকে চাহিয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাসপাতালে তোমার সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারি তো?"

লুডমিলা বলিল, "বেশ তো; আমরা দু'জনে পালা করে হাসপাতালে যাব! আপনি কিছু মনে করবেন না, আপনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ুন! পথে গুপ্তচরদের দিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন!"

মা যাইতে যাইতে গোপন-গর্ব্বে বলিলেন, "সে আমি জানি।"

কিছুক্ষণ পরে মা পোষাক কিনিয়া ফিরিয়া আসিলেন। শহরের সীমানা পর্য্যন্ত নিকোলেকে আগাইয়া দিবার ভার মায়ের উপর পড়িল।

নিকোলেকে পৌছাইয়া দিয়া মা যখন বাড়ী ফিরিতেছিলেন তখন শাশাঙ্কার সহিত পথে দেখা। তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী ফিরিতেই আইভানোভিচ বলিল, "আমি ইয়াগরদের ওখানে গিয়েছিলাম। তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। অবস্থা খুবই খারাপ। লুডমিলা তোমাকে এক্ষুণি হাসপাতালে যেতে বলেছে। নিকোলেকে নির্ব্বিঘ্নে পৌছে দিয়ে এলে তো?"

সারা দিনের ক্লান্তিতে মায়ের মাথা ঘুরিতেছিল। যাইবার সময় মায়ের হাতে একটা বাণ্ডিল দিয়া আইভানোভিচ বলিল, "এটা সঙ্গে নিয়ে যান—দরকার আছে।"

জামা-কাপড় বদলাইযা মা হাসপাতালে গিয়া উঠিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন, বালিস ঠেস্ দিয়া তাহাকে আড় করিয়া বসাইয়া রাখা হইয়াছে। সে তেমনি নিঃশঙ্কচিত্তে ডাক্তারের সঙ্গে রসিকতা করিতেছে।

"দোহাই তোমার বিজ্ঞানের। ডাক্তার, এখন একটু শুতে দাও।"

"না, এখন শুলে চলবে না।"

"আচ্ছা—তোমরা চলে গেলেই শোবো তা'হলে।"

মাকে ডাকিয়া লুডমিলা বলিল, "আপনি দেখবেন, ও যেন না শোয়। আমি কিছুক্ষণ পরেই আসছি।"

মা ছাড়া তাহারা সকলে চলিয়া গেল। চোখ বুঁজিয়া ইয়াগর বলিয়া যাইতে লাগিল—"একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে মৃত্যু ধীরে ধীরে যেন কুণ্ঠিত হয়ে আমার কাছে আসছে। হাজার হোক, বড় ভাল লোক ছিলাম—আমাকে নিয়ে যেতে মৃত্যুরও কুণ্ঠা হচ্ছে।"

তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে মা বলিলেন, "কথা বলো না, লক্ষীটি, ঘুমাও।"

"আচ্ছা তোমার কথাই শুনলাম।"

তাহার পাশে বসিয়া কখন ক্লান্তিতে মা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, একটা কিসের শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। জাগিয়া দেখেন, দরজা খোলার শব্দ হইতেছে। লুডমিলা ঘরে ঢুকিয়া ইয়াগরের কাছে আসিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "এ কি?"

ইয়াগর শান্তকণ্ঠে বলিল, "চুপ কর!"

তারপর একবার জোরে হাঁ করিল, মাথাটা তুলিয়া হাতটা আগাইয়া দিল। মা উঠিয়া হাতটা ধরিতে তাহার সমস্ত দেহ একবার জোরে কাঁপিয়া উঠিয়া পড়িয়া গেল। অস্ফুট স্বরে সে বলিল, "একটু হাওয়া."

ধীরে মাথাটি ঝাঁকিয়া কাঁধের উপর আসিয়া পড়িল। বিস্ফারিত নিষ্পলক চোখে ঘরের মৃদু প্রদীপের ছায়া কাঁপিতেছিল। লুডমিলা ভাল করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করিয়া বলিয়া উঠিল—"শেষ হয়ে গেছে।"

হঠাৎ চলিতে চলিতে মাথায় সজোরে আঘাত করিলে লোকে যেমন বসিয়া পড়ে লুডমিলা তেমনি অবশ হইয়া বসিয়া পড়িল। দুই হাত দিয়া মুখ চাপিয়া ধরিয়া নিরুদ্ধ আবেগে সে গুমরাইয়া উঠিল।

ইয়াগরের অবশ হাত দুইটি তাহার বুকের উপর রাখিয়া মাথাটি বালিশে নামাইয়া মা চোখের জল মুছিয়া লুডমিলার পাশে আসিয়া বসিলেন। সস্নেহে তাহার মাথাটি বুকে টানিয়া লইয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

মাথা তুলিয়া মায়ের বুকে মুখ রাখিতে তাহার ঠোঁট দুইটি কাঁপিয়া উঠিল।

—বহু দিন ধরে ওর সঙ্গে আমার পরিচয়। একসঙ্গে আমরা দুজনে নির্ব্বাসিত হয়েছিলাম। একসঙ্গে দুজনে পায়ে হেঁটে নির্ব্বাসনে গিয়াছিলাম—জেলে একসঙ্গে বসে দুজনে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাটিয়ে দিয়েছি।"

চীৎকার করিয়া কাঁদিবার জন্য তাহার অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু অশ্রুভরা সমস্ত আর্ত্তনাদ কণ্ঠে আসিয়া শুষ্ক হইয়া যাইতেছিল। দুটি বিশাল চক্ষু আরও আয়ত হইয়াছে—কিন্তু তাহাতে অশ্রু নাই। চুপি চুপি মায়ের মুখের কাছে মুখ আগাইয়া লইয়া সে বলে, "এমন সময় গিয়েছে, যখন সবাই ভেঙ্গে পড়েছে, বিরক্ত মনে হয়েছে—কিন্তু ওর অন্তরে ছিল অফুরন্ত আনন্দের ভাণ্ডার। হেসে, হাসিয়ে, ঠাট্টা করে একটা সত্যিকারের পুরুষ-মানুষের মত ও সমস্ত দুঃখ-কষ্টকে ঢেকে রাখতে পারতো! দুর্ব্বলকে জাগিয়ে, মাতিয়ে তুলতে পারতো। যেমন কোমল ছিল ওর অন্তর তেমনি সজাগ ছিল মন। সাইবেরিয়ায় লোকে আলস্যে মরে যায়—সমস্ত জীবনের প্রতি একটি অতি কুৎসিত ভঙ্গী সেখানে আপনা থেকে জন্মায় কিন্তু ও অদ্ভুত উপায়ে সেখানে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। ওর নিজের জীবনে যথেষ্ট দুঃখ-কষ্ট, লাঞ্ছনা ছিল কিন্তু আমি জানি, কোনও দিন কেউ ওর নিজের সম্বন্ধে একটা দুঃখের কথাও শোনে নি—কখনও না। আমিই তো সকলের চেয়ে ওর কাছে কাছে থাকতাম—কোনও দিন একটা কথাও শুনি নি। শরীর গিয়েছিল ভেঙ্গে, একান্ত

পরিশ্রান্ত—কিন্তু কোনও দিন অনুকম্পা, দয়া বা সেবা কিছুই কারুর কাছে প্রত্যাশা করে নি।"

ধীরে উঠিয়া শয্যার ধারে গিয়া ইয়াগবকে একবার চুম্বন করিল। তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া নিরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "বন্ধু, বিদায়, সমস্ত জীবন তোমারই মত নিঃশঙ্ক-চিত্তে এই দায়িত্ব বইবো—বিদায়!"

হাঁটু নত করিয়া মৃতকে অভিবাদন জানাইয়া মা লুডমিলার হাত ধরিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। বারাণ্ডা পার হইয়া দেখিলেন, নীরবে লুডমিলার চক্ষু হইতে অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতেছে।

পরের দিন মৃতের শেষ-ক্রিয়ার আয়োজনে মা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যা বেলা দুই ভাই-বোনে বসিয়া চা খাইতে খাইতে ইয়াগর সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেছিল, এমন সময় কোথা হইতে ঝড়ের মত শাশাঙ্কা আসিয়া উপস্থিত হইল! মুখ-চোখ তাহার আনন্দে উদ্ভাসিত, কপোল রক্তিম। কোথায় সে গম্ভীর, স্বল্প-বাক্, স্থির-দৃষ্টি নারী! তাহার বদলে অন্ধকারে অগ্নিশিখার মত এ কোন্ তরুণী! কিসের এক বিপুল আশা যেন তাহার সমস্ত দেহ-মনকে আজ বদলাইয়া দিয়াছে।

আইভানোভিচ গম্ভীর ভাবে শাশাঙ্কার মুখের দিকে চাহিয়া টেবিলে আঙুল ঠুকিতে ঠুকিতে বলিয়া উঠিল, "কি ব্যাপার, শাশা, আজ তোমাকে তো ঠিক তোমার মত দেখাচ্ছে না!"

অকুণ্ঠ হাস্যে শাশাঙ্কা বলিল, "না দেখাতেও পারে!"

সোফিয়া মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নতুন কিছু আশা পেইছিস, না কি রে?"

ঘাড় নাড়িয়া তেমনি স্মিতমুখে শাশাঙ্কা বলিয়া উঠিল, "সত্যি, ভাই পেয়েছি! সারা রাত ধরে কাল নিকোলের সঙ্গে কথা বলেছি। কি জানি কেন আগে ওকে আমার ভাল লাগতো না! কিন্তু কাল ওর সঙ্গে কথা বলে দেখলাম—ওর সম্বন্ধে আমার সমস্ত ধারণা ভুল হয়েছিল। ও আজ নিজেকে খুঁজে পেয়েছে! যে বন্ধুত্ব জীবনের গহনতম অন্ধকারে আলো জ্বালিয়ে দেয়, কেমন করে ওর অশিক্ষিত মনে তার স্পর্শ এসে লেগেছে।"

আজ শাশাঙ্কার মুখের চেহারা, তাহার কথা বলিবার ভঙ্গী, তাহার এই উচ্ছ্বাস, মায়ের বড় ভাল লাগিতেছিল।

শাশাঙ্কা বলিতেছিল, "দেখলুম জেলে যে-সব বন্ধুদের সে ফেলে রেখে এসেছে—তাদের চিন্তায় ও ডুবে আছে। জানো, আমাকে কি আশা দিয়েছে? জেল থেকে ওদের লুকিয়ে পালাবার বন্দোবস্ত করতে হবে! নিকোলে বলেছে, "বিশেষ কিছুই হাঙ্গামা নেই—অনায়াসে হয়ে যাবে!"

সোফিয়া মাথা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু তুই কি মনে করিস্, শাশা! জেল থেকে লুকিয়ে বার করে আনা কি সম্ভব হবে?"

মা চা পরিবেশন করিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল।

সোফিয়ার প্রশ্নে সহসা শাশাঙ্কার ভ্রূ আবার পূর্ব্বেকার মত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। সেই আনন্দ-উদ্দীপ্ত মুখ সহসা আবার গম্ভীর হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নিজের মধ্যে যেন সহসা হারাইয়া গিয়া গম্ভীর স্বরে শাশাঙ্কা বলিল, "এ যে সম্ভব, এ সম্বন্ধে নিকোলের কিন্তু বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সে যা সব বলেছে, তা যদি সত্যি হয়, তা হলে আমাদের একবার চেষ্টা করে দেখা উচিত! এটা আমাদের কর্ত্তব্য!"

শেষের কথাগুলি এমন অস্বাভাবিক জোরের সঙ্গে সে বলিয়া ফেলিল যে কিসের এক গোপন লজ্জায় তাহার গণ্ড রক্তিম হইয়া উঠিল। লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মা-ও তাহা লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া ফেলিয়াছিলেন। মনে মনে বলিতেছিলেন, "ওরে দুষ্টু মেয়ে!"

সোফিয়া ও আইভানোভিচ বুঝিয়াছিল সহসা শাশাঙ্কার এই লজ্জার হেতু কি? শাশাঙ্কার দিকে চাহিয়া তাহারাও সস্নেহে মৃদু হাসিয়া ফেলিল।

ধরা পড়িয়া যাওয়ার লজ্জা জোর করিয়া দূর করিবার জন্য মাথা তুলিয়া শুষ্ক কণ্ঠে শাশাঙ্কা বলিল, "আমি জানি কেন তোমরা হাসছো! তোমরা ভাবছো বোধ হয় যে, কোন ব্যক্তিগত কারণে আমার এ বিষয়ে এত আগ্রহ, না?"

শাশাঙ্কার কাছে উঠিয়া গিয়া কোমল কণ্ঠে সোফিয়া বলিল, "বেশ তো, তাতেই বা দোষ কি?"

উত্তেজিত, বিবর্ণ হইয়া শাশাঙ্কা বলিয়া উঠিল, "কিন্তু তা সত্যি নয়! তোমরা যদি এ বিষয়ে ভেবে দেখবার ভার নাও—আমি এই ব্যাপারে একদম থাকতে চাই না, থাকবোও না।"

আইভানোভিচ বাধা দিয়া বলিল, "থামো শাশা।"

নিজের অন্তর দিয়া মা শাশাঙ্কার অন্তর বুঝিয়াছিলেন। কাছে গিয়া আদর করিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া চুম্বন করিলেন। সোফিয়া শাশাঙ্কার পাশে গিয়া তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া হাসিয়া বলিল, "অদ্ভুত মেয়ে তুই!"

যেন তাহা স্বীকার করিয়া শাশাঙ্কা উত্তর দিল,

"অদ্ভুতই বটে! তবে ইদানীং কেমন বোকা হয়ে গিয়েছি। ছায়া আমার আদৌ ভাল লাগে না আর!"

মৃদু তিরস্কার করিয়াই আইভানোভিচ বলিয়া উঠিল, "খুব হয়েছে, থামো এখন! কাজের কথা আলোচনা করা যাক। যদি পালাবার বন্দোবস্ত করা সম্ভব হয়, তা হলে এ-সম্বন্ধে কোনও দ্বিতীয় মত থাকতেই পারে না। কিন্তু সকলের আগে আমাদের জানা উচিত, যাদের জন্যে এ চেষ্টা হচ্ছে, তারা এ ব্যবস্থা চায় কি না! ইতিমধ্যে একবার নিকোলের সঙ্গে আমার দেখা করাও দরকার।"

শাশাঙ্কা বলিল, "কাল আমি এসে জানিয়ে যাব, কোথায় কখন তার সঙ্গে দেখা হবে।"

ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে করিতে সোফিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে এখন কি করবে ঠিক হয়েছে?"

—"একটা নতুন ছাপাখানায় কম্পোজিটরের চাকরীর জন্যে চেষ্টা করা হচ্ছে। যতক্ষণ তা না হয়, আমাদের শহরের ধারে সরকারী বনের মালীর ঘরেই ওর থাকার বন্দোবস্ত হয়েছে।"

মা চায়ের বাসন পরিষ্কার করিতেছিলেন। আইভানোভিচ তাঁহার নিকটে গিয়া বলিল, "পরশু দিন পাভেলের সঙ্গে আপনার দেখা করতে হবে এবং দেখা করবার সময়, আমি একখানা চিঠি দেবো—সেইটে তাকে দিয়ে আসতে হবে। তার মতামতটা নেওয়া দরকার। বুঝলেন?"

মা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "বুঝেছি, নিশ্চয়ই বুঝেছি! ও আমি অনায়াসে পারবো! আমার তো ঐ কাজ!"

জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া শাশাঙ্কা বলিয়া উঠিল, "আমি তাহলে এখন চললুম।"

নীরবে, সেই আগেকার মত গম্ভীর মুখে শাশাঙ্কা সকলের সহিত করমর্দন করিল। ধীরে গুরুপাদক্ষেপে শাশাঙ্কা চলিয়া গেল। বহু চেষ্টার ফলে তাহার দুই চোখ যাইবার সময় শুষ্কই ছিল।

তাহার বিদায়-পথের দিকে চাহিয়া সোফিয়া মাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ-রকম একটি বউ কেমন লাগে তোমার মা?"

কাঁদিয়া ফেলিবার মত হইয়া মা বলেন, "একদিনও ওদের দু'জনকে যদি একসঙ্গে দেখে যেতে পারি!"

পরের দিন সকাল বেলা হাসপাতালের দরজায় জনকয়েক লোক দাঁড়াইয়াছিল—তাহাদের বন্ধুর মৃতদেহের প্রতি শেষ সম্মান দেখাইবার জন্য। গুপ্তচরেরা কান পাতিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। রাস্তার অপর পারে কোমরে রিভলভার লইয়া এক দল পুলিশ দাঁড়াইয়া সব লক্ষ্য করিতেছিল। দেখিতে দেখিতে হাসপাতালের দরজার সম্মুখে লোকের ভিড় জমিয়া উঠিতে লাগিল।

সেই জনতার মধ্যে মা-ও আসিয়াছিলেন। পরিচিত মুখগুলি খুঁজিয়া দেখিতেছিলেন এবং আপনার মনে ভাবিতেছিলেন—ওদের দল বলতে মাত্র এই ক'টি লোক!

এমন সময় হাসপাতালের দরজা খুলিয়া গেল। ফুলের মালা এবং লাল রিবনে মোড়া কফিন্ জনতার স্কন্ধে উঠিল। সমবেত সমস্ত লোক একত্র হইয়া সেই কফিন্‌কে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া মাথার টুপী খুলিয়া অভিবাদন করিল। সহসা সেই জনতা ভেদ করিয়া একজন দীর্ঘকায় পুলিশ পরিপার্শ্বিকতার দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া যেখানে শবাধারটি ছিল, তাহারই দিকে আগাইয়া চলিল। পিছনে তাহার কয়েক জন সৈন্য। শবাধারকে ঘিরিয়া ফেলিয়া তাহারা গোল হইয়া দাঁড়াইল। পুলিশ-অফিসারটি তীক্ষ্ণ গম্ভীর সুরে আদেশ করিলেন, "রিবন সরিয়ে নেওয়া হব।"

সহসা এই আদেশে জনতা চঞ্চল হইয়া উঠিল। পুলিশ-অফিসারটিকে ঘিরিয়া লোকে ভিড় করিতে লাগিল। ভিড়ের মধ্য হইতে একটি তরুণ কণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল, "নিপাত যাক এই অত্যাচারের পালা!" কিন্তু গণ্ডগোলের মধ্যে তাহার সেই একটি প্রতিবাদের শব্দ কোথায় ডুবিয়া গেল।

রিবন সরাইয়া লওয়ার হুকুমে মায়ের মনও সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার পাশে একজন দরিদ্রবেশী যুবক দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকেই ডাকিয়া মা বলিলেন, "দেখো তো বাছা, এ কেমন অন্যায়! বন্ধু মরলে নিজের মনের মতন করে কবর পর্য্যন্ত দেবারও উপায় নেই—এর মানে কি?"

গণ্ডগোল চেঁচামেচি উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। জনতার মাথায় শবাধার দোলার মত দুলিতেছিল। বাতাসে লাল সিল্কের রিবনগুলির উড়িবার বিচিত্র শব্দ সেই গণ্ডগোলের ঊর্দ্ধে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছিল।

পুলিশ এবং সৈন্যদের সঙ্গে আসন্ন সংঘর্ষের কথা ভাবিয়া মায়ের অন্তর ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। চলিতে চলিতে দু'ধারের লোককে ডাকিয়া তিনি বলেন, "কাজ কি বাপু! রিবনগুলো খুলেই না হয় দাও না। তাছাড়া এখন আর কি করা যায়, বল না?"

সহসা মা শুনিলেন একটি বলিষ্ঠ শব্দ সেই জনতার

ঊর্দ্ধে জাগিয়া উঠিল—"যাকে তোমরাই যন্ত্রণা দিয়ে মেরে ফেলেছ, তার এই শেষযাত্রায় আমরা কোন রকম ভাবে যেন আর উত্যক্ত না হই—এই আমাদের দাবী।"

মা শুনিলেন, পুলিশ-অফিসারটি হুকুম দিলেন, রিবনগুলো তলোয়ার দিয়ে ছিঁড়ে ফেলো। খাপ হইতে তলোয়ার খোলার শব্দে মা চক্ষু বুজিলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইতেছিল এখনি বুঝি সমস্ত জনতা গর্জন করিয়া উঠিবে। কিন্তু চক্ষু খুলিয়া দেখিলেন, গণ্ডগোল থামিয়া গিয়াছে, সকলে নীরব।

নিজেদের বীর্য্যহীনতার এই প্রকাশ্য প্রমাণে মুহ্যমান হইয়া মাথা নীচু করিয়া তাহারা আগাইয়া চলিল। সারা পথ ভরিয়া শুধু তাহাদের পদধ্বনির প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিতে লাগিল। নীরবে তাহারা এই অপমান সহ্য করিল কিন্তু তাহার বিষ-জ্বালা নীরবে প্রতি অন্তরে ধূমায়মান হইতে লাগিল। ক্রমশ পদধ্বনি যেন এক-সঙ্গে একতালে আরও গম্ভীর ছন্দে ধ্বনিয়া উঠিল; মাথা নীচু করিয়া যাহারা চলিতেছিল, মাথা সোজা করিয়া তাহারা চলিতে লাগিল। সকলের চক্ষু যেন স্থির, নিষ্করুণ হইয়া উঠিল।

যত বেলা বাড়িতে লাগিল, শীতের নিদারুণ হিম বাতাস ততই যেন তীব্র আবর্ত্তময় হইয়া উঠিতে লাগিল। পথের ধূলায় কুণ্ডলী পাকাইয়া, চোখে-মুখে চুল উড়িয়া আসিয়া, ছেঁড়া জামার ভিতর দিয়া বুকে ঘা দিয়া এক নির্ব্বান্ধব অন্ধকার আর আশঙ্কার আবহাওয়ায় সমস্ত জনতাকে ছাইয়া ফেলিল।

ফুটপাথ ধরিয়া মা যাইতেছিলেন। সমস্ত ব্যাপারটাই মায়ের ভাল লাগিতেছিল না। পুরোহিত নাই—শোকসঙ্গীত নাই—তাহার বদলে ভ্রূকুটি-কুটিল সব মুখ, গম্ভীর নীরব। এ কি-রকম শ্মশান-যাত্রা! তাঁহার মনে হইতেছিল, এই জনতা যেন কবর দিতে চলিয়াছে, ইয়াগরকে নয়, যেন কি একটা অন্য জিনিষকে, তাহার নাম তিনি জানেন না, তাহাকে তিনি আজও মন দিয়া ধরিতে পারেন নাই।

ক্রমশ জনতা গোরস্থানে আসিয়া পৌছিল। ভিতরে ঢুকিয়া একটা খোলা জায়গায় শবাধার নামান হইল। শবাধার নামানোর সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের লোক কবরের চারিদিকে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইল। অফিসারটি শব-বাহকদের একজনকে ডাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"সমবেত ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহিলাগণ, পুলিশের কর্ত্তার আদেশ অনুযায়ী আপনাদের জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে, কোনও বক্তৃতা এখানে হইতে পারিবে না—"

একজন যুবক আগাইয়া আসিয়া ধীর ভাবে বলিল, "আমি গোটা দুয়েক কথা বলবো। বন্ধু সব! আমাদের এই পরলোকগত বন্ধু এবং দীক্ষাদাতার কবরে দাঁড়িয়ে, এস আমরা নীরবে এই ব্রত গ্রহণ করি, যেন তাঁর অন্তরের বাসনার কথা আমরা না ভুলি। যে পাপ—যে স্বেচ্ছাতন্ত্র আমাদের আজ নিষ্পেষণ করে মেরে ফেলেছে, এই কবরে দাঁড়িয়ে নীরবে শপথ কর, যেন তার কবর খুঁড়তে একদিনও না আমরা বিরাম দিই।"

সহসা পুলিশ-অফিসার চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "গ্রেপ্তার কর!"

কিন্তু তাহার কথা সেই বিরাট জনতার চীৎকারের মধ্যে ডুবিয়া গেল। কিন্তু জনতা চীৎকার করিয়া উঠিল, "নিপাত যাক জার-স্বেচ্ছাতন্ত্র!"

বক্তাটিকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইতে পুলিশ দেখে, তাহাকে সকলে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

ক্ষণিক ভয়ে মুহ্যমান হইয়া মা চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। শুনিলেন, পুলিশের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। চারিদিকে এলোমেলো চীৎকার, মেয়েদের আর্ত্তনাদ! তাহার মধ্য হইতে যুবকটির শান্ত-গম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল,—'বন্ধুরা! শান্ত হও! নিজেদের এর চেয়ে বেশী মর্য্যাদা দিতে শেখো। আমি বলছি, আমাকে যেতে দাও।'

মা চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন—দেখিলেন রৌদ্রালোকে ক্ষণে ক্ষণে বেয়নেট ঝলসিয়া উঠিতেছে।

দৃঢ়কণ্ঠে যুবকটি আবার চীৎকার করিয়া উঠিল, "বন্ধুরা, অযথা শক্তি ক্ষয় কেন করছো? ভুলে যাচ্ছো, এখন আমাদের ধারালো করে তুলতে হবে হাতের তলোয়ারকে নয়, আমাদের মগজকে"

বেড়া ভাঙ্গিয়া লাঠি করিয়া লইয়া জনতা পুলিশের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ছিল—যুবকটির কথায় তাহারা লাঠি নামাইল। মা আচ্ছন্নের মত ভিড় ঠেলিয়া আগাইয়া যাইতেই দেখিলেন, আইভানোভিচ দুই হাত দিয়া জনতা সরাইয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছে,—"তোমরা কি একেবারে বুদ্ধিশুদ্ধি সব হারালে? থামো!"

ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতে দেখিলেন, তাহার একখানি হাত রক্তে লাল হইয়া গিয়াছে। উন্মাদের মত ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "আইভানোভিচ, এখান থেকে সরে যাও!"

—"কোথায় যাচ্ছেন আপনি—এগোলেই আপনাকে মারবে।"

মা সেইখানেই থামিয়া গেলেন। সোফিয়া আসিয়া

মায়ের কাঁধে হাত দিয়া তাঁহার দেহের ভার নিজের দেহের উপর লইল। তাহার আর এক হাতে একটি কিশোর ছেলে, বিশেষ ভাবে আহত। হাত ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টায় ছেলেটি বলিতেছে—"আমাকে ছেড়ে দিন। আমার কিছু হয় নি!"

মায়ের হাতে ছেলেটিকে দিয়া সোফিয়া বলিল,—"এই ছেলেটিকে দেখুন দেখি! এই রুমাল দিয়ে ভাল করে ব্যাণ্ডেজ করে ওকে বাড়ী নিয়ে চলুন! এখানে আপনাকে দেখতে পেলেই গ্রেফ্‌তার করবে। শীগ্‌গির এখান থেকে চলে যান!"

ছেলেটিকে সঙ্গে লইয়া মা গোরস্থান হইতে বাহির হইয়া একটা গাড়ী লইলেন।

আইভানকে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া মা দেখিলেন, সোফিয়ারা তাহার পূর্ব্বেই বাড়ী আসিয়া পৌছিয়াছে। সঙ্গে তাহাদের দলের ডাক্তারকেও লইয়া আসিয়াছে।

ডাক্তার আইভানের ক্ষতস্থান ধুইয়া দিয়া ওষুধ লাগাইয়া সেইখানেই তাহাকে সেদিনের মত শোয়াইয়া রাখিল। মায়ের সর্ব্বাঙ্গ রক্তের দাগে ভরিয়া গিয়াছিল। পোশাক পরিবর্ত্তন করিতে করিতে তিনি শুনিতেছিলেন, সোফিয়ার কথা বলিতেছে। লক্ষ্য করিলেন অদ্ভুত প্রশান্ত ভাবে তাহারা কথা বলিতেছে, কাজ করিতেছে যেন এমন বিশেষ কিছুই ঘটে নাই। সেই ভয়াবহ ঘটনার কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই তাহারা আবার আত্মস্থ হইয়া গিয়াছে। সত্যের আহ্বানে যে-কোনও ভয়াবহ কাজ অনায়াসে সম্পন্ন করিতে তাহারা সর্ব্বদাই নিজেদের প্রস্তুত এবং প্রশান্ত রাখিতে পারে। তাহাদের অন্তরের এই শক্তির কথা ভাবিতে ভাবিতে মা নিজের অন্তরে এক নূতন সাহস পাইলেন।

পোষাক বদলাইয়া সোফিয়ার সঙ্গে বসিবার ঘরে আসিয়া দেখেন, গোরস্থানের সেই ঘটনা লইয়া আর তাহারা আলোচনা করিতেছে না। যেন তাহা অতীতে, দূরে চলিয়া গিয়াছে। কাল সকালে কি নূতন কর্ত্তব্য পড়িয়া রহিয়াছে তাহারই আলোচনা হইতেছে। মুখে তাহাদের ক্লান্তির চিহ্ন কিন্তু চিন্তার অবসাদের বিন্দুমাত্র লক্ষণ নাই।

তাহারা নিজেদের কাজের সমালোচনাই করিতেছিল। আইভানোভিচ চিন্তিত ভাবে বলিতেছিল—"প্রত্যেক জায়গা থেকে আজ-কাল খবর আসছে যে, বই-পত্র পাঠাও! এতে আর চলে না! কিন্তু আজও পর্য্যন্ত আমরা একটা ভালো প্রেস দখলে আনতে পারলাম না। লুডমিলা একা খেটে খেটে মারা যেতে বসেছে। তাকে সাহায্য করবার একজন লোক না দিতে পারলে শীগ্‌গিরই শুনবো যে সে-ও বিছানা নিয়েছে।"

সোফিয়া নিকোলের কথা তুলিল। তাহার উত্তরে আইভানোভিচ বলিল, "ওকে এখন শহরে রাখলে চলবে না! নূতন ছাপাখানায় ও একবার ঘুরে আসুক। সেখানে ও ছাড়া আর একজন লোকের দরকার!"

শান্তকণ্ঠে মা বলিলেন, "আমাকে দিয়ে সে কাজ চলবে না?"

মায়ের দিকে সস্নেহে চাহিয়া সে বলিল, "আপনার পক্ষে সে ভয়ানক কষ্টকর হবে! শহরের বাইরে আপনাকে থাকতে হবে—পাভেলের সঙ্গে দেখা-শোনা করা তখন আর চলবে না—"

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মা বলিলেন, "পাভেলের দিক দিয়ে অবশ্য সেটা খুব ক্ষতিকর কিছু হবে না। আর আমার পক্ষে জেলে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করা এক যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার হয়ে উঠেছে। কোন কথা বলতে পারবো না। বোকার মত নিজের ছেলের সামনে চুপ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার চলে আসা!"

কিছুক্ষণ মায়ের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া আইভানোভিচ কি কাজ করিতে হইবে তাহা মাকে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, "মোটের উপর নতুন ছাপাখানায় যারা কাজ করবে, তাদের দেখাশোনার ভার আপনার ওপর থাকবে।"

মা হাসিয়া বলিলেন, "বুঝেছি সব। আমাকে তাদের সকলের রান্না করতে হবে। সে আমি কেন পারবো না?"

বিগত কয়েক দিনের ঘটনা মাকে ক্লান্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। শহরের বাহিরে অন্য কোথাও থাকিবার নূতনত্ব মায়ের ভাল লাগিতেছিল। তাই মা জেদ ধরিয়া বসিলেন—তিনি সেখানে যাইবেনই।

কথার মোড় ফিরাইবার জন্য আইভানোভিচ ডাক্তারকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ডাক্তার, তোমার রোগীর কথা ভাবছো নাকি?"

গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়িয়া ডাক্তার বলিল, "না, আমি ভাবছি, আমরা এত অল্প! পাভেল আর আন্দ্রিকে বুঝিয়ে জেল থেকে লুকিয়ে বার করতেই হবে। ওদের মতন দু'জন দরকারী লোক জেলের ভেতর চুপ করে বসে থাকলে একদম চলবে না!"

আইভানোভিচ চোখ নীচু করিয়া ঘাড় নাড়িয়া মায়ের দিকে চাহিলেন। তাঁহার সামনে তাঁহার ছেলে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে তাহারা কুণ্ঠাবোধ করিতেছে মনে করিয়া মা সে ঘর হইতে উঠিয়া গেলেন।

পরের দিন দ্বিপ্রহরে জেলে দেখা করিবার ঘরে মা বসিয়া আছেন। সামনে তাঁহার পুত্র পাভেল। হাতের মধ্যে সঙ্গোপনে নিকোলের লেখা পত্র। কোন্ ফাঁকে তাহা পাভেলের হাতে দিবেন সেই লক্ষ্য করিয়া আছেন।

—"আমি এখন বেশ ভাল আছি। তুমি ভাল আছ তো মা?"

—"এই এক রকম কেটে যাচ্ছে। আহা! ইগার মারা গেল সেদিন।"

বিস্মিত হইয়া পাভেল বলিয়া উঠিল, "সত্যি?"

বোকা সরল মেয়েমানুষের মত মা বলিতে লাগিলেন, "কবর দেবার সময় পুলিশের সঙ্গে হলো মারামারি, একজন লোক ধরাও পড়লো—"

সামনে চেয়ারে জেলের সহকারী ওভারসিয়ার বসিয়াছিলেন। হঠাৎ চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া ধমকাইয়া উঠিলেন—ও কি। "ও-সব কি কথা! বাদ দাও ও-সব কথা! বোঝো না, রাজনীতি সম্বন্ধে কোন কথা বলবার এখানে আইন নাই!"

মা চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কিছুই যেন বুঝিতে পারেন নাই, এমন ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "তা বাবা, রাজনীতির কথা তো আমি কিছুই বলি নি। আমি বলছিলাম একটা মারামারি হয়েছিল সেই সেদিন, তারই কথা। একজনের মাথাও ফাটিয়ে দিয়েছিল—"

—"হয়েছে, হয়েছে, থামো। তোমার ঘর-সংসারের কথা ছাড়া আর কোনো কথা তুলতে পারবে না।"

কথাগুলো বলিয়া যেই পিছন ফিরিয়া চেয়ারে বসিতে যাইবে অমনি মা পাভেলের হাতে পত্রটি গুঁজিয়া দিলেন। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া মা বাঁচিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর মা বলিয়া উঠিলেন, "কি কথা বলবো, তা তো বুঝতে পারছি না আর।"

পাভেল হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "আমিও জানি না, কি কথা বলবো!"

ওভারসিয়ারটি চেঁচাইয়া উঠিল, 'তবে ন্যাকামো করে দেখা করতে আসা কেন? যত কর্ম্ম-ভোগ!'

কিছুক্ষণ ধরিয়া তাহারা তাহাদের উভয়ের কাছে একান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় কথা বলিতে লাগিল। পাভেলের দিকে চাহিয়া মায়ের বড়ই ইচ্ছা হইতেছিল কোনও রকমে নিকোলের কথা তাহাকে যদি জানাইয়া যাইতে পারেন। পাভেল নিশ্চয়ই নিকোলের খবর জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া আছে।

অনেকক্ষণ চিন্তা করিবার পর মা বলিয়া উঠিলেন, "তোমার ধর্ম্ম-পুত্তুরের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।"

পাভেল নীরব বিস্ময়ে মায়ের চোখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মা মুখে আঙুল দিয়া নিকোলের মুখের বসন্তের দাগের কথা ইঙ্গিতে স্মরণ করাইয়া দিলেন।

—সে বেশ ভালই আছে। কোন রকম বিপদ-আপদ হয় নি। তোমার মনে আছে—কাজ কাজ করে সে কি পাগলামীই না করতো, একটা কাজও তার জোটবার সম্ভাবনা হয়েছে!"

পাভেল সমস্তই বুঝিল। আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় মাথা নত করিয়া সে মাকে অভিবাদন করিল। হাসিয়া বলিল, "ওঃ, তার কথা আমার আজ-কাল প্রায়ই মনে হয়।"

বাড়ীতে আসিয়াই দেখেন শাশাঙ্কা বসিয়া আছে। যেদিন মা পাভেলের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেন, ঠিক সেই দিন শাশাঙ্কা এখানে আসিত।

—"কেমন দেখে এলেন?"

—"সে বেশ ভালই আছে।"

—"চিঠিটা দিতে পেরেছিলেন?"

—"নিশ্চয়ই। রীতিমত কায়দা করে তার হাতে গুঁজে দিয়েছি।"

—"পড়লো নাকি?"

—"আচ্ছাই বোকা! সেখানে পড়বে কি করে?"

—"ওঃ! তাও তো বটে! আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। আচ্ছা, এখন এক হপ্তা অপেক্ষা করা যাক। আপনার কি মনে হয় সে এতে রাজী হবে?"

—"কি জানি। মনে হয় রাজী হবে। রাজী না হবার কারণ কি থাকতে পারে?"

অন্য কথা পাড়িয়া শাশাঙ্কা বলিল, "ছেলেটি কিছু খেতে চেয়েছিল, ঘরে—" মা তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে চলিতেই শাশাঙ্কা ডাকিল—"শুনুন,—" সহসা তাহার আঁখি-পল্লবের তলায় ছায়া ঘনাইয়া আসিল। ঠোঁট দুইটি কাঁপিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি কম্পিত-কণ্ঠে মায়ের হাত ধরিয়া সে বলিয়া উঠিল, "আমি জানি সে রাজী হবে না, কিন্তু আপনার পায়ে পড়ি কোন রকম করে তাকে বোঝান! বলবেন আমাদের কাজের জন্যে তাকে চাই-ই। তাকে না হলে চলবে না! আর, আমার মনে হয় জেলে তার ভয়ানক কি-একটা অসুখ হয়ত হবে—"

শাশাঙ্কার কথা বলিতে কষ্ট হইতেছিল। তাহার নিশ্বাস যেন আটকাইয়া আসিতেছিল। সহসা তাহার এই উচ্ছ্বাসে মা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। বুকে টানিয়া

লইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "জানিস তো মা, সে তার নিজের কথা ছাড়া আর কারুর কথা শোনে না—"

আলিঙ্গন-বদ্ধ অবস্থায় তাহারা উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। তারপর অতি সন্তর্পণে তাহার কাঁধ হইতে মায়ের হাতটি নামাইয়া দিয়া আত্মস্থ হইবার চেষ্টা করিয়া শাশা বলিল, "তা ঠিক! অ যাদের এ-রকম বোকার মত লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করা ঠিক নয়! শুধু মাথা গরম করা! সে যাক্, এখন ছেলেটিকে কিছু খেতে দেওয়া দরকার!"

মা খাবার লইয়া আইভানের পাশে গিয়া বসিলেন। সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাথার যন্ত্রণা কি এখনও সেই রকম আছে?"

—"ব্যথা বেশী নেই তবে মনে হচ্ছে যেন সব গুলিয়ে গিয়েছে। দুর্ব্বল লাগছে!"

শাশাঙ্কাকে দেখিয়া আইভানের সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। তাহার সামনে সে খাইতে পারিতেছিল না—ইহা লক্ষ্য করিয়া শাশাঙ্কা ধীরে উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া যে-পথ দিয়া সে চলিয়া গেল তাহার দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া সে আপনার মনে বলিয়া উঠিল, "সুন্দর!"

তাহার দিকে চাহিয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বয়স কত, বাছা?"

—"সতেরো!"

—"তোমার বাপ-মা কোথায় থাকেন?"

"গ্রামে। আমার যখন দশ বছর বয়স তখন আমি এখানে আসি। কমরেড, আপনার নাম কি জানতে পারি?"

যখন কেহ তাঁহাকে কমরেড বলিয়া ডাকিত তখন তাঁহার মুখে সহসা হাসি ফুটিয়া উঠিত, মন দুলিয়া উঠিত।

—"আমার নাম জেনে তোমার কি হবে?"

একটু লজ্জিত হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর সে বলিল,—"কেন জিজ্ঞাসা করছিলাম জানেন—আমাদের দলের একজন বন্ধু, সেই আমাদের সমস্ত বই-টই পড়ে শোনাতো—সে প্রায়ই পাভেলের মায়ের সম্বন্ধে গল্প করতো—পয়লা মে'র সমস্ত ঘটনা তার কাছ থেকেই শুনি—"

হাতে চামচেটা উঁচু করিয়া ধরিয়া সে বলিল, "আমরা এখানে আমাদের ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম—তাঁদের ওখানে যেতে পারিনি। কিন্তু আমি শুনলুম যে সেদিন তিনিও বেরিয়ে পড়েছিলেন—আমি সঠিক খবর জানি—আপনি বিশ্বাস করুন! সবাই বলে, সেই বুড়ী এক অদ্ভুত নারী!"

মায়ের সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল। বালকের সেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনিতে তাঁহার ভালই লাগিতেছিল কিন্তু অশোয়াস্তি বোধ হইতেছিল। আত্ম-প্রকাশ না করিবার চেষ্টা তাঁহাকে আরও বিপন্ন করিয়া তুলিতেছিল।

—"ও কি, কিছু রেখো না—খেয়ে নাও সব। বেশী করে খাও দেখি—কালই আবার দলে গিয়ে সকলের সঙ্গে চলবার শক্তি পাবে।"

সহসা মা উত্তেজিত হইয়া তাহার দিকে ঝুঁকিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তোমাদের মত নবীন সবল বাহু, তোমাদের মত স্বচ্ছ পবিত্র হৃদয়, এই আন্দোলন—এই সব শক্তির ওপর নির্ভর করছে! যা-কিছু পাপ, যা-কিছু নীচ, হেয় তা থেকে এই সব জিনিসই তো তোমাদের দূরে রেখেছে—"

এমন সময় সহসা বাহির হইতে দরজা খুলিয়া হাসিতে হাসিতে সোফিয়া ঘরে ঢুকিল। খোলা দরজা দিয়া এক ঝলক হেমন্তের হিম-বায়ু সেই সঙ্গে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

হিমে সোফিয়ার মুখের রক্ত যেন জমিয়া গিয়াছিল। হাসিয়া সে বলিয়া উঠিল, "বড়লোক বৌএর দিকে বর যেমন করে প্রথম প্রথম দৃষ্টি রাখে, গুপ্তচররা আমাকে ঠিক সেই রকম নজরে রেখেছে। এখানে আর থাকা চললো না।"

সন্ধ্যা বেলা চা-পান করিবার সময় সোফিয়া মাকে ডাকিয়া বলিল, "আবার সেই গ্রামে বই নিয়ে যেতে হবে। লুডমিলা এরি মধ্যে আরও তিনশো বই ছেপে ফেলেছে। মরবে—ওটা খেটে খেটে মরবে!"

—"যেতে তো সর্ব্বদাই প্রস্তুত! কখন যেতে হবে?"

—"যদি কালই যেতে পারেন তো ভাল হয়। কিন্তু কথা হচ্ছে, সে-বারে যে পথ দিয়ে গিয়েছিলেন এবারে সে-পথ দিয়ে আর যাবেন না। নিকোলস্ক হয়ে ঘোড়ায় চড়ে আপনাকে যেতে হবে। পথে তিনবার আপনাকে ঘোড়া বদলাতে হবে!"

—"তা না হয় হলো, কিন্তু তিনবার ঘোড়া বদলানো তো সহজ ব্যাপার নয়! খরচ হবে যে বিস্তর!"

—"খরচ বাড়ানোর পক্ষপাতী আমি আদৌ নই। তবে সেখানকার ব্যাপার মোটেই সুবিধের নয়। ধর-পাকড় সেখানে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে; রাইবিন বোধ হয়—বোধ হয় কেন নিশ্চয়ই গা-ঢাকা দিয়েছে। সেখানে যেতে ভয় করবে না তো আপনার?"

এই প্রশ্নে মা লজ্জিত এবং অপমানিত বোধ করিলেন। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "আমাকে কবে তোমরা ভীত দেখেছ? প্রথম দিন থেকেই আমার অন্তরে আমার জন্যে কোন ভয় ছিল না। আমার ভয় পায় কি না পায়, সে কথা জিজ্ঞেস করে কোন লাভ নেই। কিসের জন্য আমার ভয় পাবে? তারাই ভয় পায়—যাদের আগলে নিয়ে বসে থাকবার কিছু আছে। আমার কি আছে? শুধু একটি ছেলে। তারই জন্য আগে ভয় হতো, শঙ্কিত হয়ে উঠতাম। মনে হতো সে কি যন্ত্রণাই না ভোগ করবে! যন্ত্রণা যদি সে না ভোগ করে—তবে আমার আর কিসের ভয়?"

মায়ের কণ্ঠস্বরে সোফিয়া লজ্জিত হইল। অনুনয়ের কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি রাগ করলেন?"

—"না, রাগ করিনি। তবে একটা কথা তোমাদের বলি—তোমরা নিজেদের মধ্যে কাউকে এ-রকম করে আর জিজ্ঞাসা করো না—ভয় পাচ্ছ কি না।"

সোফিয়া অপরাধীর মত চেয়ার হইতে উঠিয়া মায়ের হাত ধরিয়া বলিল, "দেখুন, আর কোন দিন এ অপরাধ করবো না। আমাকে ক্ষমা করুন।"

মা আদরে সোফিয়াকে বুকে টানিয়া লইলেন। পরের দিনের যাত্রার আয়োজনের ব্যাপার লইয়া তিনজনে পরামর্শ করিতে বসিয়া গেল।

পরের দিন প্রত্যূষে একটি গাড়ী ভাড়া করিয়া মা নিকোলস্ক গ্রামের অভিমুখে যাত্রা করিলেন; সেখানে পৌঁছাইতে অপরাহ্ণ হইয়া গেল।

গাড়ী বিদায় করিয়া গ্রামের সরাইখানায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। চা আনিতে বলিয়া তিনি সরাইখানার জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। জানালার সামনে খোলা মাঠ। মাঠের ধারেই একটি বাড়ী। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে সেটি গ্রামের টাউন হল।

হঠাৎ বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে কোথা হইতে একটা কলরব ভাসিয়া আসিল। দেখেন, মাঠের মধ্য দিয়া গ্রামের পুলিশ-সার্জেন্ট জোরে ঘোড়ায় চড়িয়া চলিয়াছেন। অদূরে এক দল লোক জটলা করিয়া শব্দ করিতে করিতে আসিতেছে।

একটি ছোট মেয়ে আসিয়া মাকে চা দিয়া অভিবাদন জানাইল। টেবিলে ডিস্-কাপগুলি রাখিয়া বালিকাটি বলিয়া উঠিল, "একটা চোর এইমাত্র ধরা পড়েছে। এই দিকেই চোরটাকে নিয়ে আসছে।"

—"চোর? কি রকম চোর?"

—"তা আমি কি জানি।"

—"সে করেছিল কি?"

—"তা-ও আমি কি ক'রে বলবো, বাঃ! আমি শুনলুম্ ওরা বলাবলি করছে যে, একটা চোর ধরা পড়েছে। আমাদের চৌকিদার ছুটে বলে গেল—সে ব্যাটা ধরা পড়েছে।"

জানালার বাহিরে মা দেখিলেন, ক্রমশ লোকের ভিড় বাড়িতেছে। সকলেই টাউন হলের দিকে চলিয়াছে। তাড়াতাড়ি চা শেষ করিয়া কৌতূহল বশত মা টাউন হলের দিকে অগ্রসর হইলেন।

যখন টাউন হলের সিঁড়ির কাছ পর্য্যন্ত আসিয়াছেন, তখন সহসা তাঁহার মনে হইল যেন তাঁহার হাত-পা সমস্ত অবশ হইয়া গিয়াছে। নিশ্বাস বোধ হয় আর পড়িতেছে না। দেখিলেন, পিছ-মোড়া করিয়া হাত বাঁধিয়া পুলিশের লোকে রাইবিনকেই ধরিয়া আনিতেছে।

বহু কষ্টে আত্মসংবরণ করিবার চেষ্টা করিয়া মা সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। রাইবিনের আসার পথে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। রাইবিন ঠোঁট ন'ড়িয়া কি-যেন বলিয়া গেল। শব্দগুলি কানে আসিল, কিন্তু তাহার অর্থ মস্তিষ্কের শূন্য অন্ধকারের মধ্যে কোথায় রহিয়া গেল।

কোনও রকমে অন্তরের শঙ্কা লুকাইয়া রাখিয়া মা পাশের একজন কৃষককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে, কি?"

লোকটি বিরক্ত হইয়াই বলিয়া উঠিল, "যা হচ্ছে দেখতেই পাচ্ছ!" বলিয়াই লোকটি চলিয়া গেল।

ভিড়ের মধ্য হইতে একটি স্ত্রীলোক চেঁচাইয়া উঠিল, "ও বাবা! চোরটার চেহারা কি ভয়ানক! উঃ!"

সহসা রাইবিনের গম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল—"তোমরা শোন—আমি চোর নই! আমি চুরি করি না! আমি পরের জিনিসে আগুন জ্বালিয়ে দিই না। আমার অপরাধ, আমি অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিলাম—তাই এরা আমাকে ধরে নিয়ে এসেছে। যে-সমস্ত বইএ তোমাদের মত কৃষকের জীবনের সমস্ত সত্যি কথা লেখা থাকে—সে-সব বইয়ের জন্যেই আজ আমার হাত এই রকম করে বাঁধা। আমিই গ্রামে গ্রামে সেই সব বই বিলি করে বেড়িয়েছি!"

রাইবিনকে ঘিরিয়া জনতা আরও সঙ্ঘবদ্ধ হইল। তাহার ভয়লেশহীন কণ্ঠস্বর মায়ের দুর্ব্বলতাকে দূর করিয়া দিল। জনতার প্রত্যেকের মুখের দিকে মা ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। স্পষ্ট দেখিলেন, তাহারা সকলেই শঙ্কিত, সন্দিগ্ধ!

সহসা আবার রাইবিনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

সে বলিতেছে—"তোমাদের মত আমিও একজন কৃষক। আমার কথা বিশ্বাস কর—সেই সমস্ত বইয়ে যে-সব কথা লেখা থাকে তার প্রত্যেকটি অক্ষর সত্যি! আর জেনো—সেই সত্য প্রচারের জন্যে হয়ত আমাকে জীবন দিতে হলো। ওরা আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে মেরেছে—নির্ম্মম নির্দ্দয় ভাবে এবং আরও মারবে—যতক্ষণ না জানতে পারবে কোথা থেকে আমি সেই সব বই সংগ্রহ করেছি। কিন্তু আমার কথা মনে রেখো—মনে রেখো, দু'বেলার দু'টুক্‌রা রুটি সংগ্রহ করার চেয়ে সত্যকে বোঝা ঢের বেশী দরকারী।"

জনতার মধ্য হইতে একজন শঙ্কিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এ লোকটা বলে কি?"

আর একজন তাহার উত্তরে বলিল, "ওর আর ভয় কি? দু'বার তো আর মরবে না?"

জনতার উর্দ্ধে সহসা সার্জ্জেণ্টের মূর্ত্তি দেখা দিল। তিনি কমিশনারকে খবর দিতে গিয়াছিলেন। তাহাকে দেখিয়া জনতা সরিয়া দাঁড়াইল। টাউন হলের কয়েক ধাপ সিঁড়ির উপর উঠিয়া তিনি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"এখানে এত ভিড় কিসের? কি বকছে এই লোকটা?"

সিঁড়ির নীচের ধাপে রাইবিন দাঁড়াইয়াছিল। নামিয়া আসিয়া সার্জ্জেণ্টটি চুলের মুঠি ধরিয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "তুই কি বলছিলি, পাজী বদমায়েস?"

জনতা একেবারে নীরব হইয়া গেল। দুঃখে মা মাথা নত করিয়া রহিলেন। শুনিলেন, তবুও রাইবিন চেঁচাইতেছে।

"দেখ, তোমরা সবাই দেখ—যা বলেছিলাম তা সত্যি কি না!"

—"চুপ কর্" :—বলিয়া সার্জ্জেণ্টটি সজোরে রাইবিনের মুখে আঘাত করিল। রাইবিন ঘুরিয়া পড়িল তবুও সে বলিয়া উঠিল, "হাত বেঁধে রেখে ওরা এই রকম ভাবে নির্য্যাতন করে।"

ক্ষিপ্ত হইয়া সার্জ্জেণ্টটি রাইবিনের সর্ব্বাঙ্গে আঘাত করিতে লাগিল।

জনতার মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিল—"ও রকম করে মারবার কি দরকার?"

আর একজন বলিয়া উঠিল—"মেরো না, মেরো না ওকে!"

কমিশনারের আসিতে দেরী দেখিয়া সার্জ্জেণ্টটি তাঁহাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য চলিয়া গেল। সে গেলে জনতা সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওর হাত খুলে দাও!"

চৌকিদাররা বিপন্ন হইয়া পড়িল। অনবরত তাহারা চীৎকার করিতে লাগিল, "ওর হাত খুলে দাও!"

রাইবিন সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে জনতার দিকে চাহিয়া বলিল, "আমার হাত খুলে দাও, আমি পালাব না, কার কাছ থেকে পালাব? আমার সত্য আমার অন্তরে রয়েছে—তা থেকে আমি কোথায় পালাবো?"

জনতার উপর্য্যুপরি চীৎকারে চৌকিদার রাইবিনের হাত খুলিয়া দিল।

এমন সময় পুলিশ-কমিশনার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গম্ভীর ভাবে রাইবিনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দৃষ্টি দিয়া তাহার আপাদ-মস্তক মাপিয়া লইয়া রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপার কি? লোকটার হাত খোলা কেন?"

একজন চৌকিদার কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিল, "হাত বাঁধাই ছিল, তবে লোকেরা বড় গোলমাল করছিল—ওর হাত খুলে দিতে বলছিল—"

ঘুরিয়া জনতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "লোকে! লোকে কে? বাঁধ ওর হাত!"

তারপর নিজের কটিবদ্ধ অসিতে হাত রাখিয়া গম্ভীর ভাবে আদেশ দিলেন, "দূর করে দাও কুকুরদের।"

পুলিশের লোকেরা রাইবিনের হাত বাঁধিবার জন্য অগ্রসর হইল। রাইবিন বাধা দিল। বলিয়া উঠিল, "আমি পালাচ্ছি না—তোমাদের সঙ্গে মারামারিও করতে চাই না। কেন আমার হাত বাঁধছ—"

পুলিশ-কমিশনার অগ্রসর হইয়া রাইবিনকে সজোরে আঘাত করিল। রাইবিন চীৎকার করিয়া উঠিল, "ঘুসি মেরে সত্যকে মেরে ফেলতে পারবে না তোমরা!"

আবার আঘাত! রাইবিন কুৎসিত গালাগাল দিয়া উঠিল। রাগে উন্মাদ হইয়া কমিশনার ঘুষি মারিবার জন্য অগ্রসর হইতে রাইবিন মাথা নীচু করিয়া লইল। লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া কমিশনার ঘুরিয়া পড়িয়া গেল।

জনতার মধ্য হইতে একটা চাপা হাসি আর উল্লাসের রোল উঠিল।

ক্রমশ উদাস জনতা উদ্বেল হইয়া উঠিতে লাগিল। চোখের সম্মুখে সেই অত্যাচারে তাহারাও উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিল! একজন অগ্রসর হইয়া বলিতে লাগিল, "হুজুর, ও অপরাধ করে থাকে, ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিচার করুন। এ-রকম ভাবে মারবেন না!"

জনতার মধ্য হইতে বহু কণ্ঠে চীৎকার ধ্বনিয়া উঠিল, "দোহাই হুজুর, মারবেন না!"

রাইবিন হাত দিয়া মুখের রক্ত সরাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইতেই মায়ের চোখের উপর তাহার চোখ গিয়া পড়িল।

মা ভাবিতে লাগিলেন, আমাকে কি চিনতে পারলো?

মা তাহার দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িলেন। কিন্তু ফিরিতেই দেখিলেন একজন লোক তাহার দিকে স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। সহসা তিনি আপনাকে সামলাইয়া লইলেন।

একজন কৃষক রাইবিনের কানে কানে কি বলিল। তাহার উত্তরে রাইবিন বলিয়া উঠিল, "দুঃখ কিসের ভাই? জগতে আমি তো আর একলা নই? আজ আমি যেখানে আছি, কাল হয়ত আমি সেখানে আর থাকবো না কিন্তু সেইখানে থাকবে আমার স্মৃতি। আমার স্মৃতির মধ্যে বেঁচে থাকবে এই সত্য-সাধনার কথা!"

মায়ের মন বলিয়া উঠিল, রাইবিন আমাকে লক্ষ্য করেই কথাগুলো বলে গেল!

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মুখের ক্ষত হইতে ঝরিয়া-পড়া রক্ত সরাইয়া রাইবিন বলিতে লাগিল, "আজকে তারা দিলো একটা নীড় ভেঙে কিন্তু আমি জানি, এমনি শত শত নীড় গড়ে উঠছে, গড়ে উঠবে। তারপর একদিন আসবে যেদিন সেই সব নীড় থেকে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমরা বেরিয়ে পড়বে স্বাধীনতার অবারিত আকাশে—সেদিন আসবে মানুষের মহামুক্তির দিন!"

জনতার মধ্য হইতে একজন নারী এক বালতি জল লইয়া রাইবিনের মুখ ধোয়াইয়া দিতে লাগিল। তাহার নয়নে অশ্রু-ধারা!

আকাশে সন্ধ্যার মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছিল। এখানে আর জটলা করা উচিত নয় বিবেচনায় পুলিশের লোকেরা রাইবিনকে লইয়া গেল।

যে যাহার দল বাঁধিয়া আবার বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চলিল। একজন বৃদ্ধ কৃষক মায়ের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে আপনার মনে বলিতেছিল, "এখানে এই-ই ঘটছে নিত্য।"

গম্ভীর ভাবে তাহার কথায় সায় দিয়া মা বলিলেন, "দেখছি তো তাই!"

হঠাৎ লোকটি মায়ের দিকে ভাল করিয়া চাহিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি করেন?"

"আমি এখানে এসেছি পশম কিনতে!"

"ও-সব এখানে সুবিধে হবে না!"

হঠাৎ মায়ের মনে একটা মতলব আসিল। তিনি বেশ সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "একটা কথা আপনাকে বলতে চাই। আজ রাত্তিরের মত আপনার বাড়ীতে একটু আশ্রয় পেতে পারি?"

মাটির দিকে চাহিয়া একটু চিন্তা করিয়া নির্বিঘ্ন-ভাবে কৃষকটি উত্তর দিল, "রাত্তিরে থাকবেন? তাতে আর কি? তবে আমার বাড়ী যা আছে তা এক রকম থাকবার অযোগ্য।"

—"তাতে কি! কোন দিন ভাল বাড়ীতে থাকা আমারও অভ্যাস নেই।"

কৃষকটি আপাদমস্তক আর একবার মাকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া বলিল, "আপনি আমার বাড়ীতে আসতে পারেন।"

—"তাহলে একবার সরাইখানাটা হয়ে যেতে হবে।" সেখানে আমার একটা ব্যাগ আছে। যদি তুমি দয়া করে সেটা হাতে নাও!"

—"নিশ্চয়ই নেবো চলুন!"

পথে চলিতে চলিতে মায়ের কেমন মনে হইল যে, লোকটি বুঝিতে পারিয়াছে। ভাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, কোনও পরিবর্ত্তন নাই। অর্থহীন পরিবর্ত্তনহীন মুখভঙ্গী।

সরাইখানায় আসিয়া লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, "কই, আপনার ব্যাগ কোথায়?"

মা দেখাইয়া দিলেন। ব্যাগটি হাতে তুলিয়া লইয়া কৃষকটি সরাইখানার সেই বালিকাটিকে ডাকিয়া বলিল, "মেরিসা, খাওয়া হয়ে গেলে তুমি এঁকে আমার বাড়ীতে পৌছে দিও! ব্যাগটি দেখছি একেবারে খালি।"

আর কোনও কথা না বলিয়া সে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সরাইখানার দাম চুকাইয়া দিয়া মেয়েটিকে সঙ্গে লইয়া মা কৃষকটির বাড়ীর দিকে চলিলেন। পথে ভাবিতে লাগিলেন, লোকটা ধরাইয়া দিবে নাকি? না, তিনিই লোকটির কাছে সকল কথা খুলিয়া বলিবেন?

একটা জীর্ণ কুঁড়েঘরের সামনে আসিয়া দরজা ঠেলিয়া মেয়েটি ডাকিল, "ও কাকীমা, একজন লোক এসেছে বাইরে!" বলিয়া সে চলিয়া গেল।

গৃহকর্ত্রী আসিয়া মাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। কুঁড়েঘরটি ছোট কিন্তু তাহার ভিতরকার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মূর্ত্তি দেখিয়া মা বিস্মিত হইলেন। যে মেয়েটি

তাঁহাকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল তাহার বয়স বেশী নয়, সেই গৃহকর্ত্রী। নাম—তানিয়ানা।

ঘরের মধ্যে কাঠের টেবিলে একটি ল্যাম্প জ্বলিতেছিল। তাহারই আলোয় দেখিলেন, তেমনি অর্থহীন মুখে সেই কৃষকটি বসিয়া আছে। যতখানি দৃষ্টি যায়, ঘরের চারিদিকে একবার দেখিয়া লইলেন। ব্যাগটি কিন্তু দেখিতে পাইলেন না।

স্ত্রীকে ডাকিয়া সে বলিল, "শীগ্‌গির পিটরকে ডেকে আন তো!"

মা শঙ্কিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার ব্যাগটি কোথায়?"

বেশ সহজ ভাবে কৃষকটি উত্তর দিল, "নিরাপদ জায়গাতেই আছে। কিছুক্ষণ আগে সরাইখানায় মেয়েটার সামনে আমি বলেছিলাম যে ব্যাগটা খালি কিন্তু হাতে করেই বুঝেছিলাম রীতিমত ঠাসা ছিল ব্যাগটা।"

—"তাতে হয়েছে কি?"

যেখানে বসিয়াছিল, সেখান হইতে উঠিয়া কৃষকটি ধীরে মায়ের কাছে অগ্রসর হইয়া আসিল। তাঁহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কানে কানে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি লোকটিকে চেনেন?"

মা চমকাইয়া উঠিলেন কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিলেন —"হাঁ, আমি ওকে চিনি!"

কৃষকটি হাসিয়া উঠিল। বলিল, "তা আমি বুঝতেই পেরেছিলাম। আপনি মাথা নেড়ে ইসারা করলেন, আর সে মাথা নেড়ে তার উত্তর দিল। ব্যাপার দেখে আমি ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে কানে কানে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনাকে চেনে কি না! সে বললে, আমাদের চেনা অনেকেই এখানে আছে!" মায়ের মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া কৃষকটি বলিতে লাগিল, "একটা শক্ত মানুষ বটে! সত্যি কথা বলবার মত সাহস আছে ওর। কি মারটাই খেলে কিন্তু কথার এদিক্-ওদিক্ করলো না।"

কৃষকটির কথা শুনিয়া এতক্ষণে মায়ের অন্তরের সন্দেহ এবং শঙ্কা দূর হইল।

কৃষকটি পিছন দিকে হাত করিয়া মাথা দোলাইতে দোলাইতে ঘরময় পায়চারী করিতে লাগিল। হঠাৎ মায়ের দিকে ফিরিয়া বলিল, "ব্যাগটি তুলেই আমার কি মনে হয়েছিল জানেন, ব্যাগটিতে সেই সব বই আছে। সত্যি নয়?"

—"হাঁ। ওকেই দেবো বলে বইগুলো নিয়ে এসেছিলাম।" রাইবিনের সেই রক্ত-ঝরা মুখের কথা মনে পড়িতেই মায়ের চোখ জলে ভরিয়া আসিল। তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর কৃষকটি বলিল, "কিছু কিছু বই আমরাও পেয়েছি। কিন্তু খুব সামান্য; আমি নিজে ভাল পড়তে পারি না। আমার এক বন্ধু আছে, সেই আমাকে পড়ে শোনায়। খাঁটি কথা সব বইগুলোতে লেখে। আমার স্ত্রীও বেশ পড়তে জানে। এ সব ব্যাপারে তারই উৎসাহ বেশী।"

কিছুক্ষণ নিজেই কি চিন্তা করিয়া সে বলিল, "এখন বইগুলোর কি ব্যবস্থা করবেন ঠিক করেছেন?"

মা কৃষকটির দিকে চাহিয়া স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন, "আমি তোমাকে দিয়ে যাব।"

কিন্তু তখন বই বা ব্যাগের কথা কিছুই মায়ের মনের সামনে ছিল না। তাঁহার মানস-চক্ষের সম্মুখে রাইবিনের সেই রক্ত-ঝরা মুখ ক্ষণে ক্ষণে ভাসিয়া উঠিতেছিল। নীরবে তাঁহার দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল।

তিনি আপনার মনে বলিয়া উঠিলেন, "সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে মানুষকে দম বন্ধ করে কায়দায় ফেলে থ্যাংলাবে —বলবার জো নেই কিছু, জিজ্ঞাসা করবার জো নেই কিছু, অমনি প্রহার!"

কৃষক বলিয়া উঠিল, "শক্তি! অগাধ শক্তি! অগাধ শক্তি ওদের হাতে!"

"কোথা থেকে পায় তারা সেই শক্তি? আমাদের কাছ থেকেই তো! তাদের যা-কিছু শক্তি, তার সমস্ত জোগান দি তো আমরাই!"

এমন সময় বাহিরে পায়ের শব্দ হইল। পিটরকে সঙ্গে লইয়া কৃষক-পত্নী ঘরে ঢুকিল। কাহারও পরিচয় করাইয়া দিবার অপেক্ষা না করিয়া পিটর নিজেই বলিতে আরম্ভ করিল—"অনুমতি করুন নিজের পরিচয় আমি নিজেই দিই, আমার নাম পিটর! আমি আপনাদের ব্যাপার-কিছু বুঝি। আমি লিখতে-পড়তেও জানি, সুতরাং নির্ব্বোধ নই এ-কথা বলা যেতে পারে!"

মাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য পিটর বলিল, "আপনি নিশ্চিন্ত মনে থাকুন। আপনার ব্যাগ আমার বাড়ীতে রয়েছে। ষ্টিফেন আপনার কথা আমাকে গিয়ে বলতে আমি সব বুঝলাম। ওকেও বলে দিলাম এ সব ব্যাপারে, বুঝলে বন্ধু, একেবারে চুপটি করে থাকবে। মুখ দিয়ে একটিও কথা বার করো না। আপনি ভয় পাবেন না—সব ঠিক হয়ে যাবে!"

লোকটার সরল এবং স্পষ্ট কথায় মায়ের মন শান্ত হইয়া উঠিল।

সে মায়ের পাশে গিয়া বসিল। বলিল, ...
সম্বন্ধে আপনাকে আমরা যথেষ্ট সাহায্য করতে পারি। আমাদের এখন বই-ই চাই।"

ষ্টিফেন বলিয়া উঠিল, "উনি সবগুলোই আমাদের দিয়ে যেতে চান।"

উল্লাসে লাফাইয়া উঠিয়া পিটর বলিল, "চমৎকার! সমস্তগুলোবই ব্যবস্থা আমরাই করবো।"

গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত আন্দোলন-সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া আলোচনা চলিল। পরদিন সকাল বেলা ভোর না হইতেই তাতিয়ানা মাকে ঘুম হইতে তুলিয়া দিয়া শহরে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া আনিল।

বিদায় লইবার সময় আদর করিয়া তাতিয়ানার চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "সময় সময় কি রকম মজার ঘটনা সব ঘটে!"

তাতিয়ানা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

—"এই তোমাদের সঙ্গে আলাপ। এই রাত্রি-বাসের মধ্যে এই পরিচয় আশ্চর্য্য নয়?"

যথারীতি সম্ভাষণের পর মা বিদায় গ্রহণ করিলেন। বাড়ী ফিরিয়া কড়া নাড়িতে আইভানোভিচ আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

মাকে দেখিয়া আনন্দে সে বলিয়া উঠিল—"বাঃ, এত শীগ্‌গির কাজ সেরে চলে আসতে পরেলেন? ধন্য আপনি!"

ঘরের ভিতর ঢুকিতেই সে বলিল, "কাল রাত্তিরে এখানে সার্চ্চ হয়ে গিয়েছে। কেন যে হলো কিছুই বুঝতে পারলাম না। ভাবলাম, আপনিই বুঝি বা ধরা পড়েছেন। কিন্তু তখনই মনে হলো, আপনাকে ধরলে আমাকেও ধরে নিয়ে যেতো!"

খাবার-ঘরের একটা বেঞ্চে বসিয়া সে বলিতে লাগিল, "তবে আমার চাকরীর মাথা ওঁরা খেয়েছেন। যেখানে চাকরী করতাম, সেখানকার কর্ত্তাদের কাছে আমাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেবার হুকুম চলে গিয়েছে। অবশ্য তাতে আমি বিশেষ কিছুই দুঃখিত নই। আমার চাকরী কি ছিল জানেন? যে-সমস্ত কৃষকের ঘোড়া নেই—তাদের নামের তালিকা করা। তার জন্য আমি মাইনে পেতাম। মাইনে নিতে আমার লজ্জা হতো। যাদের ঘোড়াটি পর্য্যন্ত নেই তাদেরই টাকায় আমার মাইনে আসতো। নিজে হঠাৎ চাকরীটা ছেড়ে দিলে বে-মানান্ হতো—বন্ধুদের কাছে চাকরী ছাড়ার একটা কৈফিয়ৎ তো দিতে হবে।"

মা ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, একজন দৈত্য যেন ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া বাহিরের দেয়ালে অনবরত লাথি মারিয়াছে আর তাহার ধাক্কায় ঘরের ভিতরের সমস্ত জিনিষ ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে।

মায়ের ক্ষুব্ধ দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া আইভানোভিচ হাসিয়া বলিল, "তারা সরকারের কাছ থেকে অকারণে মাইনে নেয় না, সেইটে দেখিয়ে গিয়েছে।" রুটির টুকরো, নোংরা প্লেট, এলোমেলো বই, কাগজ, কয়লা সব এক জায়গায় করিয়া কে যেন চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়াছে।

—"তাঁরা বোধ হয় শীগ্‌গিরই আর একবার আসবেন। সেই জন্য আমি এ-সব আর গুছোই নি। সে যাক্, আপনার কি হলো বলুন?"

মা প্রথমে রাইবিনের কথা বলিতে লাগিলেন। মা দেখিলেন, আইভানোভিচ স্থির স্পন্দন-হীন ভাবে তাঁহার কথা শুনিতেছে। ক্রমশ তাহার মুখের চেহারা বদলাইতে লাগিল। এত গম্ভীর কঠিন মুখের চেহারা তাঁহার, মা আর কখনও দেখেন নাই।

মায়ের কথা শেষ হইলে গম্ভীর ভাবে আইভানো-ভিচ জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "আপনার ব্যাগ কোথায় রাখলেন?"

—"রান্নাঘরে।"

—"আমাদের দরজার কাছে একজন গুপ্তচর দাঁড়িয়ে আছে। এতগুলো বই আর কাগজ তার সামনে দিয়ে তো বার করে নিয়ে যাওয়া যাবে না! ভেতরেও লুকোবার উপায় নেই। আজ রাত্রেই আবার ওরা আসবে। তোমার ব্যাগ বই-পত্র দেখলেই তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে। নিরুপায়! কাগজগুলো সব পুড়িয়ে ফেলতে হবে।"

—"কি কাগজ পোড়াবে?"

—"আপনার ব্যাগে যা আছে।"

তিনি যে তাঁহার কার্য্যে সফল হইয়া আসিয়াছেন সে কথা এখনও বলেন নাই। একটা গোপন আনন্দে মায়ের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন, "ব্যাগে এক টুকরোও কাগজ নেই।"

তারপর মা বাকি সব কাহিনী বলিলেন। আনন্দে গদ-গদ হইয়া আইভানোভিচ বলিয়া উঠিল—"আমার নিজের মাকেও যতখানি ভালবাসতে পারি নি—তার চেয়ে ঢের বেশী তোমাকে ভালবাসি, মা! আমার এ উচ্ছ্বাসে কিছু মনে করো না। তুমি অপূর্ব্ব!"

উদ্বেল আনন্দের জোয়ারে মায়ের বুক ভরিয়া আসিয়াছিল। দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিয়া

পড়িতেছিল। তাহারই মধ্যে হাসিয়া তিনি বলিলেন, "আমার প্রত্যেক রক্তকণা দিয়ে তোদেরও যে আমি ভালবাসি।"

মায়ের পাশে আসিয়া সে বসিল। তাহার দিকে চাহিয়া ধীরে মা বলিলেন, "যদি পাভেল আর আন্দ্রিকে জেলের বাহিরে আনা যেতো—"

মাথা নত করিয়া আইভানোভিচ বলিল, "এ-কথা শুনলে আপনার কষ্ট হবে, কিন্তু আপনি তো পাভেলকে জানেন। সে এখন জেল থেকে কিছুতেই পালিয়ে আসবে না। সে চায় বিচার হোক—বিচারে যা শাস্তি হবার হ'ক। তারপর সাইবেরিয়া থেকে সে পালিয়ে আসবে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মা বলিলেন, "সে যদি মনে করে তাতে আন্দোলনের সুবিধে হবে, তবে সে তাই করুক।"

মায়ের মুখ দিয়া সেই কথা শুনিয়া আইভানোভিচ লাফাইয়া উঠিল। বলিল, "এই তো চাই মা! জানেন, এই কয়েক মুহূর্ত্ত যে আপনার সঙ্গে কথা হলো—এর মধ্যে আমার জীবনের সব চেয়ে সুন্দর মুহূর্ত্তগুলি থেকে গেল। এখন দরকার হচ্ছে, রাইবিনের ব্যাপারটা নিয়ে একটা ছোট্ট বই লেখা! সেই গ্রামেই প্রচার করতে হবে। আমি এখনই লিখে দেবো। যত তাড়াতাড়ি পারে লুডমিলা সেটা ছাপিয়ে ফেলবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—গ্রামে বিলি করবার ব্যবস্থা করবে কে?"

—"কেন আমি?"

—"না, আপনি আর নন। নিকোলেকে বলে দেখি।"

—"আমি তাহলে কি করবো?"

—"অনেক কাজ আছে। ভাববেন না।"

আইভানোভিচ কাগজ-কলম লইয়া তখনই লিখিতে বসিয়া গেলেন। মা ঘর গোছাইতে লাগিলেন। লেখা শেষ হইয়া গেলে কাগজ ক'খানি মায়ের কাছে দিয়া বলিল, "আপনি আপনার পোষাকের তলায় এগুলো রেখে দিন। মনে রাখবেন কিছুক্ষণ পরে পুলিশের লোক এসে আপনাকে সার্চ্চ করতে পারে।"

সন্ধ্যার দিকে ডাক্তার-বন্ধুটি আসিল। চঞ্চল ভাবে ঘরের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে বলিয়া উঠিল—"ব্যাপারখানা কি? কর্ত্তাদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? কাল রাত্তিরে সাত যায়গায় খানাতল্লাসী হয়ে গিয়েছে—আমার রুগীটি কোথায়?"

—"সে পরশু দিনই চলে গিয়েছে। এতক্ষণে হয়ত সে কোথায় দল বেঁধে বই পড়ে শোনাচ্ছে।"

—"বল কি হে? ভাঙ্গা মাথার খুলি নিয়ে, সে পড়ে শোনাবে কি হে?"

—"আমিও তাকে তাই বোঝাতে গিয়েছিলাম। কিন্তু সে কিছুতেই বুঝলো না? সে যাক্—এখানে আজ রাত্তিরে কয়েক জন অতিথি আসবার কথা আছে। তুমি এখন যাও।"

মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল—"আর কাগজগুলো একেই দিয়ে দিন। লুডমিলাকে দিয়ে দিবে।"

মা কাগজগুলি ডাক্তারের হাতে দিয়া দিলেন।

—"এই? আর কিছু কাজ আছে?"

—"না, লক্ষ্য রেখো—দরজায় গুপ্তচর দাঁড়িয়ে আছে।"

—"আমারও দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। এখন, বিদায়।"

রাত্রির অতিথির আগমন-অপেক্ষায় তাহারা দুইজনে পাশাপাশি বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে যাহাতে তাঁহার পাশে বসিয়া আছেন তিনি ছাড়া আর কেহ না শুনিতে পায় এমন ভাবে আইভানোভিচ গল্প করিতেছিল—তাহার যে-সব বন্ধু এখন সাইবেরিয়ায় আছে, তাহাদের কথা; যাহারা সাইবেরিয়া হইতে পলাইয়া আসিয়া গোপনে ছদ্ম-নাম লইয়া তাহাদের সঙ্গে কাজ করিতেছে তাহাদের সকলের কথা। সেই সব নামহীন বীরপুরুষদের অপরূপ কাহিনীর প্রতিধ্বনিতে অন্ধকার ঘরটি ভরিয়া উঠিল।

যাহাদের কখনও চোখে দেখেন নাই, সেই সমস্ত নাম-হীন নিঃশব্দ কর্ম্মীদের মূর্ত্তি, মায়ের কল্পনেত্রে সম্মিলিত হইয়া একটা বিরাট অতিকায় মানবের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। বীর্য্য এবং পৌরুষের সে যেন অক্ষয় ভাণ্ডার। ধীরে কিন্তু বিরাম-বিহীন ভাবে এই ধরণীর রাজপথ দিয়া সে চলিয়াছে, সে সত্য মৃতকে দেয় জীবন, সেই সত্যের বাণী প্রচার করিয়া, সকল শ্রেণীর মানুষকে সমান স্নেহে বরণ করিয়া—লোভ, অত্যাচার এবং মিথ্যাচার হইতে রক্ষা করিবার মহা আশ্বাস-বাণী তাহার প্রত্যেক পদক্ষেপে বাজিয়া উঠিতেছে।

গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া যখন পুলিশ আসিল না তখন তাঁহারা ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ভোর বেলার দিকে মা শুনিলেন, রান্নাঘরের দিকের জানালায় কে-যেন টোকা দিতেছে। বহুক্ষণ ধরিয়া ঠিক একই ভাবে আস্তে আস্তে শব্দ হইতে লাগিল। তখনও আকাশে অন্ধকার রহিয়াছে। তখনও শহর নিস্তব্ধ নীরব।

বিছানা হইতে উঠিয়া দরজার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?"

অপরিচিত কণ্ঠে একজন উত্তর দিল, "আমি।"

—"কে তুমি ?"

—"খুলুন না বলছি !"—কণ্ঠে করুণ মিনতি।

মা দরজা খুলিতেই ইগ্‌নেটি ঢুকিয়া মাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "তা'হলে ভুল করি নি মা'ঠাকরুণ। ঠিক জায়গায় আস্‌তে পেরেছি।"

মা দেখিলেন তাহার কোমর পর্য্যন্ত কাদায় ভরা। মুখ বিশুষ্ক, চোখ ঝিমাইয়া আসিতেছে।

দরজা বন্ধ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া সে চুপি-চুপি মাকে বলিল, "জানেন মা'ঠাকরুণ, আমাদের ওখানে বড় বিপদ হয়েছে।"

—"আমি তা জানি।"

ইগ্‌নেটি বিস্মিত হইয়া গেল। চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি জানলেন কি করে ?"

অল্প কথায় মা ইগ্‌নেটিকে ব্যাপার বুঝাইয়া দিলেন।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সবাইকে ধরে নিয়ে গিয়েছে ?"

—"সবাই তো তখন ছিলো না। পাঁচ জনকে ধরে নিয়ে গেছে। আমি র'য়ে গেছি। ব্যাটারা নিশ্চয়ই আমাকে খুঁজছে। খুঁজুক গে যাক্। আমি আর ওখানে ফিরে যাচ্ছি না। ওখানে এখনও সাত জন পুরুষ আর একটি স্ত্রীলোক আছে। তারা সবাই কাজের লোক, বিশ্বস্ত।"

মা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেমন করে এ বাড়ী খুঁজে পেলে ? এতদূর পথ এলেই বা কি করে ?"

কোটের হাতা দিয়া মুখটা একবার মুছিয়া লইয়া সে বলিল, "বনের ওধারে আপনার মনে আছে আমাদের আলকাৎরার কারখানা। হুজুরেরা রাত্তিরে সেইখানে এসে জড় হয়। কিন্তু তার বাগানের মালী এসে রাইবিনকে খবর দিলো—তারা এসেছে। সাবধান! রাইবিন কি দমবার পাত্তর। খুড়ো তক্ষুণি আমাকে ডেকে বললে, ইগনেটি দৌড়ে শহরে যা। তোর মনে আছে সেই বুড়ীর কথা ? তার কাছে একটা চিঠি নিয়ে যেতে হবে। বলেই তাড়াতাড়ি কি একটা লিখে আমার হাতে দিয়ে বললে—ব্যাস—বেরিয়ে পড় এইবার। বেরিয়ে ছুটে বনের মধ্যে এসে ঢুকলাম। ঝোপের ভেতর দিয়ে হামগুড়ি দিয়ে চলতে লাগলাম। চলতে চলতে শুনতে পেলাম তারা আসছে—তারা পায়ের শব্দে বন ভরে উঠেছে। শব্দ শুনে মনে হলো অনেক লোক—ভাঁড়ারে ইঁদুর পড়ার মত চারিদিকে শব্দ উঠছে। অনেকক্ষণ ধরে ঝোপের মধ্যে চুপ করে বসে রইলাম। আমার কাছ দিয়েই তারা পেরিয়ে গেল। তাদের পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেলে আবার উঠে দাঁড়ালাম। দু'রাত্তির আর এক বেলা ধরে না খেয়ে না দাঁড়িয়ে হেঁটে চলে এসেছি। হপ্তাখানেক আর পা তুলতে পারবো না।"

কথা বলবার সময় তাহার চোখ দুইটি মাঝে মাঝে আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল, মনে হইতেছিল, এই ব্যাপারে সে নিজের উপর রীতিমত খুসী হইয়াছে।

—"হাত-পা সব ধোও। একটু গরম চা তোমার এক্ষু'ণ খাওয়া দরকার।"

—"দাঁড়াও, মা'ঠাকরুণ, তার আগে চিঠিটা তোমায় দিই।" এই বলিয়া বহুকষ্টে হাত দিয়া ধরিয়া পা'খানি একটা বেঞ্চির উপর রাখিল। ধীরে ধীরে কাদায়-ভরা পা-জড়ানো ন্যাকড়া খুলিতে লাগিল।

এমন সময় আইভানোভিচ ঘরের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই ইগ্‌নেটি শঙ্কিত হইয়া যেই পা মাটিতে রাখিয়া দাঁড়াইতে যাইবে, অমনি কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া গেল। তাহার পা একেবারে অবশ হইয়া গিয়াছিল।

তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া বসান হইল। তাহার ভয় দূর করিবার জন্য আইভানোভিচ অগ্রসর হইয়া অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ কমরেড ? কিছু মনে করো না ভাই, আমি তোমার পায়ের বাঁধা খুলে দিচ্ছি !"

এই বলিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আইভানোভিচ পায়ের বাঁধন খুলিয়া দিতে ইগ্‌নেটি নিজের পায়ের চেহারা দেখিয়া নিজেই বিস্মিত হইয়া উঠিল। বলিল, "বাঃ !"

আইভানোভিচ তাহার পায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "এক্ষুণি স্পিরিট দিয়ে ভাল করে ঘসে দিতে হবে।"

তাহার কথায় লক্ষ্য না করিয়া ইগ্‌নেটি মাকে ডাকিয়া পায়ের ন্যাকড়ার ভিতর লুকানো চিঠিটি মাকে দিল। মা আইভানোভিচকে চিঠিটি পড়িতে বলিলেন।

"মা, এ ব্যাপার যেন নীরবে সহ্য করে যেও না। সেই মহিলাটি যিনি তোমার সঙ্গে এসেছিলেন, এই দরিদ্র কৃষকদের জন্য আরও বই লিখতে তাকে বলো। এই আমার শেষ অনুরোধ। রাইবিন।"

বিষণ্ণ সুরে মা বলিয়া উঠিলেন, "টুটী টিপে ধরেছে, তবুও সে—"

যেন কোনও মহান্ দৃশ্য এখনি চোখের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল, তাহারই প্রতি সম্ভ্রম দেখাইবার জন্য

আইভানোভিচ বলিয়া উঠিল, "চমৎকার! এই তো সুন্দর, মাথাকে দেয় নাড়', অন্তরেও জাগিয়ে দেয় সাড়া।"

ইগ্‌নেটি নীরবে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়াছিল। মায়ের দুই চোখ দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল। নীরবে রান্নাঘর হইতে এক টব গরম জল লইয়া আসিয়া ইগ্‌নেটির পায়ের কাছে বসিয়া তাহার পা ধরিবার জন্য হাত বাড়াইলেন।

বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া ইগ্‌নেটি তাড়াতাড়ি বেঞ্চির ভিতরে পা ঢুকাইয়া বলিয়া উঠিল, "এ আপনি কি করছেন?"

"শীগ্‌গির পা-টা দাও।"

ইগ্‌নেটি বেঞ্চির তলায় যতদূর পা যায় ঢুকাইয়া দিল। তাহার কণ্ঠস্বর হঠাৎ ধরিয়া গেল। সে কাতর ভাবে বলিয়া উঠিল, "এ কি, এ কি আপনি করছেন! এ কি আপনার উচিত!"

মা কোনও কথা না বলিয়া ইগ্‌নেটির পা ধরিয়া গরম জল দিয়া ধুইতে লাগিলেন। বিস্ময়ে এবং সঙ্কোচে ইগ্‌নেটি পাথর হইয়া গেল।

আইভানোভিচ স্পিরিট আনিবার জন্য চলিয়া গেল। মা নিকোলস্ক গ্রামে যে দৃশ্য দেখিয়াছিলেন ইগ্‌নেটিকে তাহার কথা বলিতে লাগিলেন। সেই নির্মম প্রহারের কথা শুনিয়া ইগ্‌নেটি অবাক হইয়া বলিয়া উঠিল, "তা কি কখনও হতে পারে!"

মনে মনে সেই দৃশ্য স্মরণ করিয়া সে বলিয়া উঠিল, "ঐ জন্যে লোকগুলোকে দেখলেই আমার ভয় করে—সাক্ষাৎ যমদূত।"

এমন সময় আইভানোভিচ এক শিশি স্পিরিট আনিয়া রান্নাঘরে উনানে কয়লা দিবার জন্য গেল। তাহার দিকে চাহিয়া ইগ্‌নেটি জিজ্ঞাসা করিল, "ভদ্দর লোক নাকি?"

—"আমাদের দলে ভদ্দর লোক, ইতর লোক কেউ নেই! সকলেই কমরেড।"

অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া ইগ্‌নেটি বলিয়া উঠিল, "অনেক কিছু বুঝি না আমরা।"

—"কি বোঝ না তোমরা?"

—"একদিকে দেখি এই ভদ্দর লোকেরাই আমাদের চাবুক মারছে, আর একদিকে দেখি এরাই আবার আমাদের পা ধুইয়ে দিচ্ছে। এ দুয়ের মধ্যিখানে কি আছে, কে জানে?"

সহসা ঘরের দরজা সজোরে খুলিয়া গেল। আইভানোভিচ সেই খোলা দরজার কাছে দাঁড়াইয়া উঠিল।

"মধ্যিখানে কারা আছে জানো? যে হাত তোমাদের গায়ে চাবুক তোলে সেই হাত-ধোওয়া জল যারা দু'বেলা প্রসাদ বলে গ্রহণ করে—আর যাদের পিঠে চাবুক পড়ে তাদেরই রক্ত চুষে যারা আবার খায়—মধ্যিখানে আছে তারা।"

ইগ্‌নেটি সম্ভ্রমে আইভানোভিচের দিকে মাথা তুলিয়া চাহিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর বলিল, "ঠিক তাই।"

কিছুক্ষণ মালিশের পর ইগ্‌নেটি পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইল। বেশ স্বচ্ছন্দে ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিল। খুশী হইয়া বলিয়া উঠিল, "এ যে একেবারে নূতন পা হয়ে গেল! সত্যি, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ আপনাদের।"

হঠাৎ খুব গম্ভীর মুখ করিয়া সে আপনার মনে বলিয়া উঠিল, "কি করে ধন্যবাদ জানাতে হয়, তাও জানি না ভাল করে।"

আহারের সময় টেবিলে ইগ্‌নেটি বলিতে আরম্ভ করিল, "কাগজ-পত্তর সব আমিই বিলি করতাম। হাঁটতে আমার মতো আর দুটি নেই! খুড়ো আমাকে ডেকে বাণ্ডিলটা হাতে দিয়ে বলতো—এইবার এগুলো বিলি করে দিয়ে এসো। মনে থাকে যেন, যদি ধরা পড়ো', তা হলে তুমি একা—এ কাজে তোমার জানা-শোনা আর কেউ নেই। তথাস্তু বলে আমি বেরিয়ে পড়তাম।"

—"আচ্ছা, কত লোকে বই নেয়?"

—"যারা পড়তে পারে তারাই নেয়। অনেক বড়লোকও বই নিয়ে পড়ে। অবশ্য তারা আমাদের কাছ থেকে নেয় না। আমাদের হাতে এ-সব বই দেখতে পেলে তখনই লোহার বালা গড়িয়ে হাতে পরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে।"

আইভানোভিচ নূতন লেখাটা বিলি করবার কথা তুলিল।

—"রাইবিন সম্বন্ধে নতুন যে কাগজখানা লেখা হয়েছে, সেগুলো গ্রামে পৌঁছে দেবার কি করা যায় এখন?"

ইগ্‌নেটি জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "এরি মধ্যে লেখা হয়ে গেল?"

—"নিশ্চয়ই!"

মা হাসিয়া বলিলেন, "কিছুক্ষণ আগেই না বলেছিলে, গ্রামে আর ফিরবে না—পুলিশ দেখলে তোমার ভয় করে?"

একটু মুস্কিলে পড়িয়া দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে ইগ্‌নেটি উত্তর দিল, "বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। একটু বিশ্রাম করবো ভেবেছিলাম। তাই বলেছিলাম গ্রামে আর ফিরবো না। আর ভয়ের কথা বলছো। ভয় পায় সত্যি। তবে ভয়, ভয়; কিন্তু কাজও তো আবার কাজ। আপনারা হাসছেন? ভয় পায়—সে তো সত্যি কথা—তা বলে কাজ করবো না? আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে ভয় করে না? তবুও যদি দরকার হয় তাও পড়তে হবে তো।"

—"কিন্তু তোমাকে সেখানে যেতে হবে না।"

—"তা হলে আমি কি করবো? কোথায়ই বা আমি যাবো?"

—"তোমার বদলে সেখানে আর একজন লোক যাবে। তুমি তাকে পথ-ঘাট সব বাৎলে দেবে।"

কিছুক্ষণ মৌনী থাকিয়া অনিচ্ছাসত্বে যেন সে মত দিল। "আচ্ছা, তাই হক!"

—"তোমাকে একটা পাসপোর্ট দেওয়া হবে। সেই পাসপোর্ট নিয়ে তোমাকে একটা কোনও বনের মালী হয়ে থাকতে হবে।"

কিছুক্ষণ কি ভাবিযা সে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "ও কাজ আমি করবো কি করে। চাষারা লুকিয়ে বন থেকে প্রায়ই কাঠ কাটতে আসে। ধরা পড়লে তাদের তো পুলিশে দিতে হবে। সে আমি কি করে করবো?"

মা এবং আইভানোভিচ হাসিয়া উঠিলেন।

—"তোমার ভয় নেই। যাতে তাদের ধরিয়ে না দিতে হয়, তার ব্যবস্থা আমি করে দেবো।"

মা আপনার মনে বলিয়া উঠিলেন, "হায় রে মানুষের জীবন। দিনে পাঁচ বার চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ে; পাঁচ বার আবার সেই পোড়া চোখে হাসি ফুটে ওঠে।"

গভীর রাত্রি। বনের মধ্যে এক কাঠের ঘরে নিকোলে এবং ইগ্‌নেটি মুখোমুখী বসিয়া। ইগ্‌নেটি চাপা-গলায় বলিতেছিল—"মধ্যিখানের জানালায় চার বার?"

—"চার বার।"

—"প্রথমে তিন বার এই রকম করে টোকা মারবে।" টেবিলের উপর মধ্যম আঙুলের টোকা দিয়া সে দেখাইয়া দিল।

—"তারপর একটুখানি থেমে আর একবার টোকা মারবে। একজন চাষী এসে দরজা খুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করবে—ধাই-এর কাছ থেকে আসছো বুঝি। তুমি অমনি বলবে যে, হাঁ, আমি ধাই-গিন্নীর কাছ থেকেই আসছি। আর কিছু করতে হবে না। সে-ই তখন সব করবে।"

তাহাদের এই সব গোপন ইঙ্গিতের কথা শুনিতে শুনিতে মা হাসিতেছিলেন। মনে মনে ভাবিতে-ছিলেন, এরা এখনও ছেলেমানুষ।

—"তা হলে ভুলে যাবে না তো হে? প্রথমে মুরাটতে যাবে। সেখানে দাদা ঠাকুরের খোঁজ করবে, তারপর—"

নিকোলের স্মৃতি-শক্তির উপর অযথা সন্দেহ করিয়া ইগ্‌নেটি আবার গোড়া হইতে সঙ্কেতগুলি বলিয়া যাইতে লাগিল। তারপর হাত বাড়াইয়া নিকোলের সহিত করমর্দ্দন করিয়া সে বলিল—"এখন তাহলে আমি যাই।"

মা বলিলেন, "অন্ধকারে বাড়ী চিনে যেতে পারবে তো?"

—"নিশ্চয়ই।"

মাকে নিভৃতে পাইয়া নিকোলে উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "জেল থেকে ওদের বার কবে নিয়ে আসার ওরা কি ঠিক করলো?"

—"ওরা কাল সব ঠিক করবে বলেছে।"

—"ওদের তুমি একটু বুঝিয়ে বলো। তোমাকে আমি বলছি তুমি দেখো কত সহজ ব্যাপার। জেলের পিছন দিকে পাঁচিলের কাছে একটা ল্যাম্প-পোষ্ট আছে—বোধ হয় দেখে থাকবে। ল্যাম্প-পোষ্টের সামনেই খানিকটা খালি জায়গা পড়ে আছে আর তার বাঁ দিকে কবর। ডান দিকে রাস্তা—রাস্তার পর শহর। ব্যাপারটা হবে এই রকম, একজন ল্যাম্প পরিষ্কার-করা লোক কাঁধে মই নিয়ে, যেমন নিয়ম, ল্যাম্প পরিষ্কার করতে আসবে। মইটা যেমন জেলের গায়ে রোজ ঠেকিয়ে রাখে তেমনি করে রাখবো। খানিকটা মইটার ওপর উঠে, ল্যাম্প পরিষ্কার করতে করতে পাঁচিলের দেওয়ালে একটা হুক টাঙিয়ে একটা দড়ির মই হুকে আটকে পাঁচিলের ওপারে ফেলে দেবে। তারপর সে চলে আসবে। জেলের ভেতর তাঁদের জানিয়ে দিতে হবে কবে কখন এই ব্যাপার ঘটবে। তখন তারা ইচ্ছে করে জেলের মধ্যে একটা গণ্ডগোল তৈরী করবে। গণ্ডগোলের মধ্যে তারা দুজনে দড়ির মই বেয়ে সরে পড়বে। তারপর তো আমরা আছিই। মনে রাখবেন, দিনের বেলা এ কাণ্ডটা ঘটাতে হবে। দিনের বেলা জেল থেকে কয়েদী পালাবে, এ কথা কেউ সন্দেহ করতে পারবে না।"

—"এ তো বিশেষ কঠিন বলে মনে হচ্ছে না।"

—"না, কঠিন মোটেই নয়। আমি দড়ির মই, হুক, এবং ল্যাম্প পরিষ্কার-করা লোক সব তৈরী করে রেখেছি। আমি যাঁর আশ্রয়ে আছি এই বুড়ো—এই বুড়ো যাবে মই ঘাড়ে করে।"

বাহিরে ভারি পায়ের শব্দ এবং সেই সঙ্গে কাশির শব্দ শোনা গেল, নিকোলে বলিয়া উঠিল, "ভূতটা আসছে!"

দরজা খুলিতেই টব মাথায় একটি বৃদ্ধ লোক ঘরের ভিতর আসিয়া নবাগত লোক দেখিয়া অভিনন্দন করিল।

—"ঐ ওকে জিজ্ঞাসা কর তুমি, মা!"

বৃদ্ধ রুক্ষ স্বরে বলিয়া উঠিল, "আমাকে? আমাকে আবার কি জিজ্ঞাসা করবে?"

—"সেই জেল থেকে ওদের বার করে আনার কথা।"

—"ওঃ!"

নিকোলে তাহাকে পরখ করিয়া দেখিবার জন্য বলিল, "ইয়াকুব, এই সহজ ব্যাপার ইনি সম্ভব বলে বিশ্বাস করেন না।"

—"হুঃ! বিশ্বাস করেন না মানে বিশ্বাস করতে চান না। তুমি আর আমি বিশ্বাস করতে চাই, আমরা বিশ্বাস করি। এ তো সোজা-কথা—হাঙ্গামা কোথায় এর মধ্যে?"

মা বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সেই নুয়ে-পড়া বৃদ্ধটির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "নিকোলে, তুমি তো জানো, এ ব্যাপারে আমার কথাই শেষ কথা নয়।"

—"তা জানি। কিন্তু আপনি ওদের বুঝিয়ে বলুন। আমি যদি একবার বেরুতে পারতাম! জোর করে ওদের মত করাতাম।"

খানিকক্ষণ চিন্তা করিয়া মা বলিলেন—"তুমি ভুলে যাচ্ছ নিকোলে, এ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত করার ভার পাভেলের ওপর।"

বৃদ্ধটি চুপ করিয়া শুনিতেছিল। জিজ্ঞাসা করিল, "পাভেল কে হে?"

—"আমার ছেলে।"

ঘাড় নাড়িয়া পাইপে তামাক গুঁজিতে গুঁজিতে সে বলিল, "তার নাম আমি শুনেছি। আমার ভাইপোটা প্রায়ই তার নাম বলতো। সে ব্যাটাও জেলে। শুনছি হারামজাদারা তাকে সাইবেরিয়াতে পাঠাবে।"

পাইপটি ধরাইয়া ঘরের মেঝের দু'ধারে থুতু ছড়াইতে ছড়াইতে বৃদ্ধ বলিল, "তাহলে উনি চান না। বেশ, ভাল কথা। ওঁর নিজের ছেলে, তার সম্বন্ধে উনি যা ভাল বোঝেন তাই করবেন। যার যেমন ইচ্ছে তাকে তাই করতে দেওয়া উচিত। জেলে বসে [illegible] ক্লান্ত হয়ে পড়েছ? বেরিয়ে আসতে চাও? [illegible] চলে আসতে তোমার ক্লান্তি লাগে? এসো না, [illegible] থাক। তোমার সর্ব্বস্ব লুঠ করেছে? করেছে, চুপ করে বসে থাকো। তোমাকে মেরেছে? মারুক, সহ্য করো। তোমাকে মেরে ফেলেছে? বেশ, মরে থাকো। আমি আমার ভাইপোটাকেই সরাবো।"

ভোর বেলা মা বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।"

রবিবার দিন জেলে পাভেলের সহিত আবার দেখা হইল। হাতে একটা কাগজের কুচি লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে জেলের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আসিবার সময় পাভেল বলিল, "রাগ করো না, মা!"

মা বুঝিলেন চিঠিতে কি লেখা আছে। কাতর অনুনয়ের দৃষ্টি লইয়া পুত্রের মুখের দিকে চাহিলেন। কিন্তু সে-মুখে কোনও উত্তর ফুটিয়া উঠিল না। বাড়ীতে আসিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে চিঠিটা আইভানোভিচের হাতে দিলেন। সে পড়িতে লাগিল—

'কমরেড, আমরা এ রকম ভাবে পালাতে চাই না। আমরা পারি না, আমাদের দুজনের মধ্যে কেউ না। আমরা যদি এ রকম ভাবে পালিয়ে যাই, তা হলে আমাদের সহযাত্রী বন্ধুদের শ্রদ্ধা আমরা হারাবো। তার চেয়ে, নতুন যে কৃষকটি ধরা পড়েছে তাকে উদ্ধার করবার চেষ্টা তোমরা ভাবো। তার জন্যে যদি তোমরা কষ্ট পাও, তোমাদের সে কষ্ট সার্থক হবে। এখানে তার জীবন দুর্ব্বহ হয়ে উঠেছে। প্রতি মুহূর্ত্তেই একটা-না-একটা ঝগড়া বাধছে আর শাস্তি পাচ্ছে। এরই মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা অন্ধকার সেলে আটকে রাখা তার হয়ে গিয়েছে। তার জন্যে আমরা সবাই যতটুকু পারি চেষ্টা করি। মাকে বুঝিয়ে বলো—তিনি হয়ত সব বুঝবেন। মাকে একটু দেখো। পাভেল।'

মা সোজা হইয়া বসিলেন। পুত্রগর্ব্বে তাঁহার বুক ভরিয়া আসিল। সংযত স্থির কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "আমাকে বোঝাবার কি আছে? বরঞ্চ ও যা বলেছে—রাইবিন সম্বন্ধে ভেবে দেখা যাক, তাকে কি করে জেল থেকে বার করা যায়!"

স্থির হইল এ সম্পর্কে সমস্ত ভার শাশাঙ্কা লইবে।

কিছুক্ষণ পরে লুডমিলা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া ঘোষণা করিল যে, সামনের সপ্তাহে বিচারের দিন পড়িবে। স্থির সংবাদ! সেদিনই বিচার শেষ হইয়া যাইবে। শাস্তি নাকি ইহারই মধ্যে স্থির হইয়া গিয়াছে।

সুনিশ্চিত বেদনার আগমন-লগ্নের অসহ্য অপেক্ষায় মাত্র একটি দিন, নিদারুণ দুর্ভাবনা আর আশঙ্কার মধ্যে কাটিল। দ্বিতীয় দিনও সেই ভাবে অতিবাহিত হইল। তৃতীয় দিন শাশাঙ্কা আসিল।

সব ঠিকঠাক। আজই এক ঘণ্টার মধ্যে!

আইভানোভিচ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এত-শীগ্‌গির! এরি মধ্যে সব ঠিকঠাক হয়ে গেল?"

"কেন দেরী হবে? শুধু বাকি ছিল একটা লুকোবার জায়গা ঠিক করা আর একটা নতুন পোষাক সংগ্রহ করা। আর যা কিছু, সে সমস্ত ভার তো সেই বুড়ো ইয়াকুব নিজে নিয়েছে। নিকোলে আর আমি ছদ্মবেশে ওখানে থাকবো। গায়ে একটা ওভারকোট, মাথায় একটা টুপি চাপিয়ে, ওকে আমরা নিয়ে যাবো।"

জানালার কাছে দাঁড়াইয়া চাপা-গলায় তাহারা কথা বলিতে লাগিল। শাশাঙ্কা বলিতেছিল—"বুড়োটা ওর ভাইপোকেও বার করে আনবার বন্দোবস্ত করেছে। তবে দড়ির মইটা যেখানে থাকবে—জেলের ভেতর থেকে সেটা দেখা যায়। অন্য অনেকে না ওদের সঙ্গে চলে আসে।"

তাদের কথাবার্তা শুনিয়া মায়ের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সহসা তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমিও যাব!"

আইভানোভিচ মাকে বুঝাইয়া বলিল, "লক্ষ্মীটি মা, আপনি সেখানে যাবেন না। মিছিমিছি ধরা দিয়ে কি লাভ বলুন?"

তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে মা জেদ করিয়া বলিলেন, "না, আমি যাবই!"

শাশাঙ্কা মায়ের দিকে অগ্রসর হইয়া ঘাড় দোলাইয়া বলিয়া উঠিল, "তবুও আশা করেন, আসবে? আমি আপনাকে বলছি, মা, সে কখনও পালাবার চেষ্টা করবে না।"

শাশাঙ্কাকে জড়াইয়া ধরিয়া তবুও মা বলিয়া উঠিলেন, "সে যাই হক, বাছা, তবুও তোদের সঙ্গে আমাকে নিয়ে চল!"

শাশাঙ্কা বুঝিল, মা যাইবেনই।

"কিন্তু দেখুন, আমরা তো কেউ একসঙ্গে যাবো না! আপনাকে যেতে হলে একলা সেখানে যেতে হবে। ধরুন, কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, সেখানে কি করতে গিয়েছেন, কি বলবেন?"

তাহারা রাজী হইয়াছে এই আনন্দে মা বলিয়া উঠিলেন, "সে তখন আমি দেখবো'খন!"

এক ঘণ্টা পরে মা জেলের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন হঠাৎ ঝড় বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। মাথার উপর নীল সাগরের ভেলা বায়ুতাড়িত হইয়া পবন বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।

মা পিছন দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সমস্ত শহর ঝড়ে আর ধূলিতে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। সম্মুখে সেই কবর-ভূমি। তাহারই দক্ষিণে, তিনি যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন তাহার মাত্র সত্তর ফিট দূরে, কারাগার। কবর-ভূমির ধার দিয়া দুই জন সৈনিক ঘোড়ায় লাগাম ধরিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছে। ইহারা দুই জন ছাড়া সে-সময় সেখানে আর একটিও প্রাণী ছিল না।

সেখানে আসিবার একটা কিছু কারণ বাহির করিবার তাগিদে হঠাৎ মা সোজা সৈনিক দুইটির দিকে অগ্রসর হইলেন। তাহাদের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, এধারে একটা ছাগল আসতে দেখেছ তোমরা?"

তাহাদের একজন উত্তর দিল, "না!"

ছাগল খুঁজিতে খুঁজিতে তাহাদের ছাড়াইয়া কবর-ভূমির প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হইলেন। মাঝে-মাঝে আড়চোখে দক্ষিণ এবং পিছন দিকে চাহেন। কিছুদূর অগ্রসর হইতেই সহসা তাঁহার পা যেন ধরিয়া আসিল। সর্ব্বদেহ কাঁপিয়া উঠিল। দেখিলেন, কারাগারের অপর দিক হইতে একজন দীর্ঘকায় বৃদ্ধ লোক আসিতেছে! তাহার কাঁধে একটি ছোট্ট মই। মা পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, সৈনিক দুইটি ঘোড়াটাকে লইয়া ঘুর-পাক খাওয়াইতেছে। সামনে চাহিতেই দেখিলেন, জেলের দেওয়ালের গায়ে তখন মই লাগাইয়া সে উপরে উঠিয়াছে। তাহার পর আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে দেখিলেন, রাইবিনের মাথা পাঁচিলের উপরে দেখা দিল, তাহার পর, তাহার সমস্ত দেহ। তাহার পিছনে আর একজন লোক সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিল। আর একজন লোকের মূর্ত্তি দেখা গেল কিন্তু সে সিঁড়ি দিয়া আর নামিল না। পাঁচিলের ওপারে কারাগারের মধ্যেই সে অদৃশ্য হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে বাগানের উল্‌টো দিক দিয়া শহরের পথে তাহারা অদৃশ্য হইয়া গেল।

মা কানে আর কিছু শুনিতে পাইতেছিলেন না। চারি দিক হইতে নানা রকম শব্দের টুকরা তাঁহার কানে আসিয়া বাজিতেছিল। কোথায় অনবরত কে বাঁশী বাজাইতেছে, কাহারা চীৎকার করিতেছে, চারি দিকে শব্দের ঝড় বহিয়া যাইতে লাগিল। অদূরে দেখিলেন, পুলিশের লোকেরা ছুটাছুটি করিতেছে।

একজন পুলিশ কনেষ্টবল দৌড়াইয়া আসিয়া মাকে

ডাকিয়া বলিল, "এই দাঁড়া বুড়ি। এখান দিয়ে দাড়ি-ওয়ালা একটা লোককে দৌড়ে যেতে দেখেছিস্?"

—"হ্যাঁ, দেখেছি হুজুর, এই বাগানের ভিতর দিয়ে ছুটে চলে গেল!"

আবার বাঁশী বাজিল। চারি দিক হইতে লোক ছুটিয়া বাগানে ঢুকিল।

বাড়ী ফিরিয়া আসিতেই আইভানোভিচ মাকে আনন্দে জড়াইয়া ধরিল। বলিল, "ভালয় ভালয় ফিরে এসেছেন তাহলে? কি রকম কি হলো?"

—"মনে হচ্ছে সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নে সমস্ত হয়ে গিয়েছে"

যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেক খুঁটিনাটিটি বলিতে আরম্ভ করিলেন।

আইভানোভিচ বলিয়া উঠিল, "আপনাদের বরাত ভালো। ভগবানই জানেন, আপনার জন্যে আমার কি দুর্ভাবনাই না হচ্ছিল। এখন শুনুন, বিচারের দিন ঠিক হয়ে গিয়েছে। আপনি বিচারের জন্যে কোনও ভয় পাবেন না। যত শীগ্‌গির ওটা চুকে যায়, পাভেল তত শীগ্‌গির ছাড়া পাবে। সাইবেরিয়ায় ওকে আমরা যেতে দেবো না। পথ থেকেই ওকে সরিয়ে ফেলবে!"

ব্যাকুল হইয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি জজদের কাছে ভিক্ষাস্বরূপ কিছু চাইতে পারি না?"

আইভানোভিচ লাফাইয়া উঠিয়া ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "ছিঃ, মা, কি বলছেন আপনি? আমাদের এ রকম করে অপমান করবেন না।"

মা লজ্জিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমাকে ক্ষমা কর তোমরা। আমি সত্যিই ভয় পেয়েছি! কিসের যে ভয় তা বুঝতে পারি না। মনে হয় তারা পাভেলকে অপমান করবে। বলবে হয়তে, 'এই চাষার ছেলে!' আর সে যে ছেলে—তখনি হয়ত রেগে কি যা-তা একটা উত্তর দেবে—আন্দ্রিটাও আছে—জ্ঞান হারাতে ওদের এক মিনিটও সময় লাগে না, হয়ত তখন এমন একটা কাণ্ড করে বসবে যাতে এমন শাস্তি হবে যে আর হয়ত ওদের জীবনে দেখতেই পাবে না।"

বহুক্ষণ ধরিয়া নানা ভাবে মা তাঁহার অন্তরের এই অসহায় দুর্ব্বলতার কথা আইভানোভিচকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু আইভানোভিচ যে বুঝিল তাহা তাঁহার মনে হইল না।

বিচারের দিন অন্য সকলের সহিত মাও আদালতে বিচার-গৃহে গিয়া বসিলেন। তাঁহার পাশে যে নারীটি বসিয়াছিল মাকে আসিতে দেখিয়াই সে মুখ বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিল, "তোর ছেলেটাই তো আমাদের ছেলেটার মাথা খেলো!" মা চাহিয়া দেখিলেন, সাময়লভের মা।

বৃদ্ধ সিজভও আসিয়াছিল। সাময়লভের মাকে তিরস্কার করিয়া সিজভ বলিয়া উঠিল, "চুপ্ কর নাটালিয়া।"

মা নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ আতঙ্কে চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন। জানালাগুলি প্রায় ছাদের কাছে গিয়া লাগিয়াছে। সেখান হইতে শীতের দিনের মৃদু ম্লান আলো ঘরে আসিয়া পড়িতেছে। সামনের দুইটি জানালার মধ্যখানে জারের একটি প্রকাণ্ড ছবি—সোনালী ফ্রেমটি ঝিক-ঝিক করিতেছে। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ দেখিলেন, একজন লোক আসিয়া গম্ভীর ভাবে কি বলিয়া গেল আর সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সিজভের হাত ধরিয়া মা-ও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বাম দিকের কোণে একটি বড় দরজা খুলিয়া গেল। এক জন বৃদ্ধলোক ঢুলিতে ঢুলিতে আসিয়া চেয়ারে বসিল। তাহার পিছনে চার-পাঁচ জন আরও লোক আসিল। কিছুক্ষণ পরে পুলিশের পোষাক-পরা এক জন লোক কি সব বলিল। বৃদ্ধ লোকটি গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়িয়া দুইটি ঠোঁটের ফাঁক দিয়া চিবাইয়া বলিলেন, "আরম্ভ হক—"

সিজভ মার কানে কানে বলিয়া উঠিল, "দেখ দেখ।"

মা দেখিলেন, ঘরের আর এক দিকের দেয়ালের গা হইতে আর একটি দরজা খুলিয়া গেল। একটা তারের বেড়া-দেওয়া যায়গার ভিতরে খোলা তলোয়ার হাতে প্রথমে একজন সৈনিক প্রবেশ করিল। তাহার পিছনে সারি বাঁধিয়া আসিল, পাভেল, আন্দ্রি, ফিডিয়া, সাময়লভ, গুসেভরা দুই ভাই, বুকিন, সোমভ, আর দুইটি ছেলে, তাহাদের নাম মা জানিতেন না। মাকে দেখিয়া পাভেল মৃদু হাসিয়া অভিবাদন জানাইল—আন্দ্রি মুখ ভ্যাঙচাইতে লাগিল। মায়ের মনে হইল, তাহাদের হাসিতে যেন ঘরের গুমোট কাটিয়া গেল।

মায়ের কানের কাছে মুখ লইয়া চুপি চুপি সিজভ বলিয়া উঠিল, "দেখছো, ছোঁড়ারা কি রকম শক্ত রয়েছে। একটুও কাঁপছে না।"

এমন সময় গুরুগম্ভীর কণ্ঠে চীৎকার করিয়া কে হাঁকিয়া উঠিল, "চুপ কর সব!"

দেখিতে দেখিতে সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

বিচার আরম্ভ হইল। বৃদ্ধলোকটি আসামীদের দিকে না চাহিয়া অস্পষ্ট স্বরে কি প্রশ্ন করিতেছিল—মা আদৌ বুঝিতে পারিতেছিল না। পাভেল তাহার

কথার উত্তর দিতেছিল—শান্ত, গম্ভীর ভাবে, অতি স্বল্প কথায়। বিচারক এবং বিচার-সংক্রান্ত যে সমস্ত লোক সেখানে সমাগত হইয়াছিল, মা তাহাদের মুখের দিকে অনেকক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া দেখিলেন। দেখিয়া তাঁহার স্পষ্ট ধারণা হইল যে, ইহারা কখনই নিষ্ঠুর হইতে পারে না; ইহাদেব মুখে নিষ্ঠুরতা বা বীভৎসতার তো কোন লক্ষণ নাই।

পোসিলেনেব মত রঙ-করা মুখ একটি লোক অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া কি বলিয়া গেল। তারপর চার জন উকিল আসামীদেব কাছে গিয়া কি পরামর্শ করিতে লাগিল।

প্রথম বৃদ্ধ লোকটির পাশে আর একজন বিচারক বসিয়াছিলেন। স্ফীতকায় দেহটি আর্মচেয়ারে যেন ধরিতেছিল না। তাঁহার পাশে লাল গোঁপওয়ালা আর একজন লোক চেয়ারে মাথা ঠেসান দিয়া চোখ বুঁজিয়া কি ভাবিতেছিল। দ্বিতীয় বিচারকেব পিছনে শহরের মেয়র বসিয়াছিলেন। স্ফীতোদরটিকে ওভার-কোট দিয়া ঢাকিয়া রাখিবার ব্যর্থ চেষ্টায় বিব্রত হইয়া পড়িতেছিলেন।

সহসা মা শুনিলেন, পাভেল ক্রুদ্ধ স্বরে সকলকে শুনাইয়া বলিতেছে, আসামী আর বিচাবক বলে এখানে কেউ নেই। এখানে আছে শুধু বন্দী আর বিজেতা!

সমস্ত ঘর একেবারে নীরব হইয়া গেল। মা শুধু শুনিতে পাইতেছিলেন—বিচারকের হাতের কলম চলার শব্দ এবং তাঁহার নিজের হৃৎস্পন্দন।

প্রথম বিচারকটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আন্দ্রি নাখোদকা, তুমি দোষ স্বীকার করছো—"

কে যেন কাহার কানে বলিল, "এই, এইবার ওঠ্।"

আন্দ্রি ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। গোঁপে হাত বুলাইতে বুলাইতে একবার আড় চোখে বিচারকদের দেখিয়া লইয়া রুক্ষ স্বরে বলিয়া উঠিল, দোষ স্বীকার কিসের জন্যে কেনই বা করতে যাবো? কাউকে হত্যা করিনি, চুরিও করিনি। যে জীবনধারার মধ্যে থাকলে মানুষ হত্যা আর চুরি করতে বাধ্য হয়—আমি শুধু জানিয়েছি যে সে-জীবন-ধারার সঙ্গে আমার কোনও যোগ নেই।

বৃদ্ধ বিচারকটি স্পষ্ট স্বরে জোরে বলিয়া উঠিল, "তোমার অত কথা আমরা শুনতে চাই না। শুধু বলো, হ্যাঁ কি না!"

আন্দ্রি ফিডরের দিকে চাহিয়া বলিল, "ফিডর, তুমি উত্তর দাও।"

এক লাফ দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া ফিডর বলিল, "আমি আবার কি বলবো! কোন কথা এখানে আমি বলতে চাই না! কি অধিকার আছে এঁদের আমাদের বিচার করবার?"

স্থূলোদর বিচারকটি ঘাড় বাঁকাইয়া বৃদ্ধ বিচারকটির কানে কানে কি বলিলেন। তিনি মাথা তুলিয়া আসামীদের একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া মাথা নীচু করিয়া কি লিখিতে লাগিলেন। তারপর আবার কিছুক্ষণ ধরিয়া একটানা ভাবে কি বলিয়া যাইতে লাগিলেন। বক্তৃতার শেষে সরকারী উকিল কয়েক জন লোককে ডাকিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল। একজন সৈন্য আসিয়া সাক্ষ্য দিল। সে বলিল, "পাভেলকে ওদের দলের সর্দার বলে ওরা মানে!"

বৃদ্ধ বিচারকটি ঘাড় নাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আর নাখোদকা?"

—"সেও একজন সর্দার!"

বিচারকদের দিকে চাহিয়া মায়ের মনে হইতেছিল, তাহারা সকলেই যেন অবসন্ন, অসুস্থ। তাহাদের অঙ্গ সঞ্চালনে, কথাবার্তায়, প্রত্যেক ভঙ্গীতে মনে হইতেছিল, একটা রোগতিক্ত পাণ্ডুর অবসন্নতা যেন তাহাদের গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে।। তাহাদের ভঙ্গী দেখিয়া বেশ বোঝা যাইতেছিল, এই পুলিশ, কনেষ্টবল, উকিল, পেয়াদা, এই আদালত, এই বাধ্য হইয়া আর্মচেয়ারে বসিয়া থাকা এবং যে সমস্ত ব্যাপাব তাহারা আগে হইতেই জানে, তাহার সম্বন্ধে গম্ভীর ভাবে এই সব প্রশ্ন করা—সমস্তই যেন এক অতি জঘন্য বিরক্তিকর ব্যাপার! তাঁহাদের দেখিয়া ভয় করিবার পরিবর্তে মায়ের মনে হইতেছিল দয়া করাই উচিত।

আসামীদের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহারা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করিতেছে, আদালতে কি হইতেছে, তাহার প্রতি তাহাদের বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই। বিচারক, এটর্ণী, উকিল, পুলিশ ইহাদের কোন কথার সঙ্গে যেন তাহাদের কোনও যোগ নাই।

দ্বিপ্রহরে কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য আদালতের কার্য বন্ধ হইল। ঘর খালি করিয়া সকলকে বাহির করিয়া দেওয়া হইল।

মা শুনিলেন, তাঁহার পাশেই কে যেন বলিতেছে, "বাঁ দিকের এই মেয়েমানুষটি?"

আর একজন তাহার উত্তরে বলিল, "হাঁ!"

মা ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, দুইটি লোক তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কি কথা বলিতেছে। তাহাদের কোথায়

যেন দেখিয়াছেন, কিছুতেই স্মরণ করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

কিছুক্ষণ পরে পেয়াদা হাঁকিল, "আসামীদের যারা আত্মীয় তারা টিকিট দেখিয়ে ঢোক!"

পিছন হইতে কে বলিয়া উঠিল, "টিকিট? এ কি সার্কাস না কি!"

আবার বিচারগৃহে যে যাহার আসনে আসিয়া বসিল। বিচারকদের আসার সঙ্গে সঙ্গে আবার সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আবার বসিল। আদালতে বসিতেই সরকারী উকিল বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিল।

তাহার বক্তৃতা শুনিয়া বৃদ্ধ সিজভ অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিল, "মিথ্যে কথা সব!"

আসামীরা তেমনি নিজেদের মধ্যে গল্প লইয়াই ব্যস্ত ছিল। তাহাদের সম্বন্ধে কি বলা হইতেছে তাহা শুনিবার জন্য তাহাদের কোনও আগ্রহ ছিল না।

মা বিচারকদের দিকে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া মায়ের স্পষ্ট ধারণা হইল যে এই বক্তৃতা শুনিতে তাঁহাদের কাহারও ভাল লাগিতেছে না।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ সরকারী উকিলের বক্তৃতা শেষ হইয়া গেল। মাথা নীচু করিয়া বিচারকদের অভিবাদন জানাইয়া তিনি আপনার আসনে গিয়া বসিলেন।

আইভানোভিচ আসামীদের পক্ষ হইতে একজন উকিল ঠিক করিয়াছিল। তিনি কিছুক্ষণ বলিবার পর সহসা আসামীদের দিক হইতে পাভেল উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে সেই ভাবে হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া সকলে নীরব হইয়া গেল।

পাভেল গম্ভীর ভাবে বলিয়া উঠিল,—"আপনাদের এই আদালতে দাঁড়িয়ে আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করতে উঠি নি, আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চাইও না। আমি শুধু সেই বিচারককে গ্রাহ্য করি, যে বিচার আসবে আমাদের দলের তৈরী আদালত থেকে। তবুও কয়েকটা কথা বলতে চাই। যে-কথা আপনারা কিছুতেই বুঝতে পারছেন না, সেটা একটু আমি বুঝিয়ে দিতে চাই।"

সহসা তাহার সেই গম্ভীর স্থির স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে সমস্ত ঘর থম্‌থম্‌ করিয়া উঠিল। সে ধ্বনি সহসা সেই বদ্ধ ক্ষুদ্র আবেষ্টনীর মধ্যে প্রান্তরের সীমাহীনতাকে আনিয়া দিল। মা দেখিতেছিলেন, তাঁহার পুত্র যেন সম্মুখ হইতে সকলকে দূরে সরাইয়া দিয়া একা এক অপরূপ মহিমায় সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। পাভেল বলিতেছিল:

"আমরা সাম্যবাদী! তার মানে আমরা ব্যক্তিগত সম্পত্তির চিরশত্রু। আমরা বুঝেছি, এই অর্থ-সংগ্রহের মোহই মানুষের কাছ থেকে মানুষকে দূরে রাখে, পরস্পরকে আঘাত করবার জন্যে পরস্পরের হাতে তুলে দেয় শাণিত অস্ত্র, জাগিয়ে তোলে হাজার রকমের সমাপ্তিহীন স্বার্থের সংঘর্ষ! আমরা জানি, এই ব্যক্তিগত অর্থ-সংগ্রহের মোহে মানুষ নিজেদের কাজকে সমর্থন করিয়ে নেবার জন্যে নানা রকমের মিথ্যে কথা তৈরী করে ঢাকতে চায় তাদের অনাচারকে, প্রবঞ্চনাকে, সমস্ত মিথ্যাচারকে। যে সমাজ মানুষকে শুধু মনে করে অর্থ বাড়াবার একটা কল মাত্র, সে সমাজ কখনও আমাদের মিত্রভাবে গ্রহণ করতে পারে না—আমরাও কখন তার রীতি-নীতি মানতে পারি না! এই রকম সমাজের বিধি-বিধান থেকে মানুষকে দেহের দিক দিয়ে, তার মনের দিক দিয়ে সকল রকমে মুক্তি দেবার জন্যে আমরা চাই যুঝতে এবং আমরা যুঝবোও।

—"আমরা মজুর! একটা ছোট্ট খেলনা থেকে পাহাড়প্রমাণ কল পর্য্যন্ত সমস্তই আমাদের শ্রমে তৈরী হয়। প্রত্যেক লোকই আমাদের কাজে লাগাতে চায়, শুধু তাদের নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে! আজ আমরা তাই চাই সেই স্বাধীনতা, যা কালক্রমে সমস্ত শক্তি এনে দেবে তাদেরই হাতে, যারা হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছে এই সভ্যতাকে। আমাদের মূলমন্ত্র হচ্ছে—শক্তির অধিকার থাক সকলে; ঐশ্বর্য্য উৎপন্ন করবার সমস্ত রকম জিনিসের ওপর থাক সকলের অধিকার; আর সেই সঙ্গে এই হোক নিয়ম, প্রত্যেক লোককে হবে নিজের হাতে শ্রম করতে।"

—"এই আমাদের কথা! দেখছেন, আমরা বিপ্লবী নই!"

বৃদ্ধ বিচারকটি বলিয়া উঠিলেন, "অত বেশী কথা বলবার কি দরকার?"

পাভেল সোজা হইয়া দাঁড়াইল। তাহার নীল চোখে একটা কোমল করুণ আভা ফুটিয়া উঠিল। সে বলিতে লাগিল:

—"যত দিন ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে, তত দিন আমরা এই রকম বিদ্রোহী হয়ে থাকবো। যত দিন এক দল লোক শুধু খেটে খাবে, আর এক দল শুধু হুকুম চালাবে, তত দিন আমরা থাকবো বিদ্রোহী। সম্পত্তি চায় সংরক্ষণ। কি প্রাণান্ত চেষ্টা না করতে হয়

সম্পত্তিতে সংরক্ষণ করতে। এই প্রবৃত্তি মানুষকে এতদূর পেয়ে বসে যে, তার দাস হয়ে পড়ে। অন্তরের দিক্ দিয়ে হয়ে যায় ক্রীতদাস। যে সমস্ত অভ্যাস এবং সংস্কার আপনারা তৈরী করেছেন, তার ভার এক তিল নামাতে আপনারাই পারেন না—মনের দিক দিয়ে আমরা তো মুক্ত! জীবন থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রেখে আপনারা জগৎকে করে তুলেছেন বিচ্ছিন্ন, ভেদ-ক্লিষ্ট; এই বিচ্ছিন্নতাকে দূর করে আমরা জগৎকে সমগ্র সম্পূর্ণ করতে চাই।"

কয়েক সেকেণ্ড থামিয়া পাভেল আপনার মনে বলিয়া উঠিল,—"এবং তা হবেই।"

তারপর কয়েক বার আপনার মনে শেষের কথাগুলি আবৃত্তি করিতে করিতে সে বলিয়া উঠিল, "আমার বক্তব্য শেষ হয়ে গেছে। তবে শেষে এইটুকু বলতে চাই, ব্যক্তিগত ভাবে আপনাদের অপমান করা আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। বরঞ্চ, এই প্রহসনের অনিচ্ছুক দর্শক হিসাবে এখানে থাকতে বাধ্য হয়ে, আপনাদের মুখের যে চেহারা দেখলাম তাতে আমার মনে আপনাদের প্রতি করুণাই হচ্ছে।"

বিচারকদের দিকে না চাহিয়াই পাভেল বসিয়া পড়িল। ধীরে আন্দ্রি আগাইয়া আসিল। বিচারকদের আহ্বান করিয়া আন্দ্রি বলিয়া উঠিল, "আসামী পক্ষের ভদ্রমহোদয়গণ—"

ক্রুদ্ধ হইয়া চীৎকার করিয়া স্থূলকায় বিচারকটি বলিয়া উঠিলেন, "তোমার সামনে বসে কোর্ট, আসামীদের উকিল নয়!"

আন্দ্রির চোখে দুষ্টুমির হাসি ফুটিয়া উঠিল। মা সে হাসি ভাল করিয়া জানিতেন। আন্দ্রি বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "তাই নাকি? না বোধ হয়। আপনারা বিচারক তো নন—আপনারাই তো আসামীদের—"

—"সাক্ষাৎ কেসের সঙ্গে জড়িত নয় এমন কোন কথা বলতে পারবে না।"

—"সাক্ষাৎ ভাবে যা এই কেসের সঙ্গে জড়িত? আচ্ছা তাই হবে, আমি তা হলে ভাবতে পারি যে আপনারা হচ্ছেন সত্যিই বিচারক, স্বাধীন, সাধু—"

"তোমার চরিত্র-ব্যাখ্যানের কোন প্রয়োজন নেই!"

"প্রয়োজন নেই—বলেন কি, মশাই? আচ্ছা মনে করুন, আপনার সামনে দুটো দল দাঁড়িয়ে আছে। এক দল বলছে—ওরা আমাদের সর্বস্ব হাতিয়ে নিয়েছে। অপর দল বলছে—হাতিয়ার আছে, তাই হাতাবার অধিকারও আমাদের আছে—"

"গল্প আমরা শুনতে চাই না।"

"বুড়ো লোকদের তো গল্প শুনতে ভাল লাগে!"

"তোমার ভাঁড়ামী বন্ধ কর! তুমি বসো! কথা বলতে পারবে না আর।"

আন্দ্রি ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া বসিয়া পড়িল। সাময়লভকে উঠিতে দেখিয়া বৃদ্ধ বিচারকটি বলিয়া উঠিল, "তুমি বসো, তুমি কোনো কথা বলতে পারবে না।"

সাময়লভ তখন বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, "এইমাত্র সরকারী উকিল আমাদের বর্ব্বর, সভ্যতার শত্রু বলে গালাগাল দিলেন। আমি শুধু তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, তাঁদের সভ্যতাটা কি রকম? তোমরাই নারীর নারীত্বকে নষ্ট করেছ, মানুষকে এমন জায়গায় নিয়ে ফেলেছ যেখানে চুরি-চামারি করতে সে বাধ্য—মদের মধ্যে তাকে ডুবিয়ে রেখেছো—এই তো তোমাদের সভ্যতা! আমরা সত্যিই এই সভ্যতার শত্রু! তবে আমরা শ্রদ্ধা করি আর এক সভ্যতাকে, তার স্রষ্টাদের তোমরা অনন্ত নির্য্যাতন দিয়েছ, নির্ব্বাসনে পচিয়ে মেরেছ—পাগল ক'রে দিয়েছ—"

"এখনও বলছি চুপ কর।"

সাময়লভ বসিলে ফিডরের ডাক পড়িল। শামপেনের বোতলের ছিপির মত লাফাইয়া উঠিয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে সে বলিয়া উঠিল, "আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যা শাস্তি দাও—যেখানেই নির্ব্বাসনে পাঠাও, আমি পালাবই, নিশ্চয়ই পালাবো, পালিয়ে এসে আবার—"

তাহাকে জোর করিয়া বসাইয়া দেওয়া হইল।

তাহাদের মধ্যে আর কেহ কোন কথা বলিল না। বৃদ্ধ সিজভ মাকে ডাকিয়া বলিল, "এবার রায় দেবে!"

মা সচকিত হইয়া উঠিলেন! কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ বিচারকটি একটানা সুরে কি বলিয়া গেলেন—মা বুঝিতে পারিলেন না।

সিজভ বলিল, "নির্ব্বাসন!"

মা শুষ্ক কণ্ঠে বলিলেন, "ও আমি জানতামই।"

বিচারকগণ উঠিয়া গেলেন। আসামীদের বেড়ার কাছে তাহাদের আত্মীয়েরা শেষ দেখা করিবার জন্য আসিল। মা আসিয়া পাভেলের সহিত দেখা করিলেন। অন্য সকলের মতই খাওয়া, কাপড়-চোপড়, স্বাস্থ্য সম্বন্ধেই অতি সাধারণ কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন! কিন্তু তাঁহার অন্তরে সহস্র কথা জাগিয়া উঠিতেছিল, তাঁহার নিজের সম্বন্ধে, শাশাকার এবং তাহার সম্বন্ধে। কিন্তু কথার অন্তরালে অন্তঃসলিলা ধারায় মত তাঁহার অন্তরে আজ অপূর্ব্ব এক কলনাদিনী স্নেহক্ষীরধারা বহিয়া চলিয়াছিল—তাহার উজ্জ্বল গতি যেন তিনি আর

সহ্য করতে পারছিলেন না। কেমন করিয়া পাভেলকে বুকের অতি নিকটতম স্থলে রাখা যায়, কেমন করিয়া জানান যায় যে, তাহাকে ভালবাসিয়া বৃদ্ধার অন্তর ভরিয়া গিয়াছে, কি করিলে সে সন্তুষ্ট হইবে!

মা বলিলেন, "অল্প বয়সের ছেলেদের বিচার করবার জন্যে বুড়োদের বিচারক করা ঠিক নয়।"

হাসিয়া পাভেল উত্তর দিল, "তার চেয়ে যাতে অল্প বয়সের ছেলেদের আদালতে না আসতে হয় আর বুড়ো লোকদের না বিচার করতে বসতে হয়, জীবন সেই ভাবে নতুন করে সাজানো ভাল নয়?"

মা দেখিতেছিলেন, লিটল্ রাশিয়ান সকলের সঙ্গে কথা বলিতেছে। পাভেলের চেয়ে তাহার স্নেহের প্রয়োজন বেশী, তাহা মা বুঝিতেন। আগাইয়া গিয়া তাহার সহিত কথা বলিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই পুলিশের লোক আসিয়া তাহাদের লইয়া গেল! আদালত হইতে বাহির হইতে বিস্ময়ে দেখেন, কখন ক্লান্ত নগরীর উপর রাত্রির ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। পথে লণ্ঠনের আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে, আকাশে জ্বলিয়া উঠিয়াছে তারার প্রদীপ।

আদালতের চারিদিকে দল বাঁধিয়া সংবাদের জন্য লোক ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাঁহাদের দেখিয়া তাহারা আগাইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

সিজভ ঘাড় নাড়িয়া মাকে বলিল, "লক্ষ্য করেছ নিলোভনা, লোকে জিজ্ঞাসা করছে।"

একটা পথের বাঁকে হঠাৎ কয়েক জন যুবক এবং যুবতী মাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। বিচারের ব্যাপার তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল। তাহার মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "যদি অনুমতি দেন, আপনার হাত একটু স্পর্শ করবো।"

বলিতে বলিতে সকলেই হাত বাড়াইয়া দিল। মা সকলের সঙ্গে কর-মর্দন করিলেন। কে বলিয়া উঠিল, "আপনার ছেলে পুরুষত্বের আদর্শ হয়ে থাকবে!"

কে একজন চীৎকার করিয়া উঠিল, "দীর্ঘজীবী হোক রুশ-শ্রমিকেরা।"

চারিদিক হইতে বহু কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল, "দীর্ঘজীবী হোক শ্রমিকেরা!" কাছেই কম্পিত কণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল, "শোন কমরেডরা, একটা রাক্ষস আজ রাশিয়ার লোকদের গ্রাস করে ফেলছে—তার নাম হলো স্বেচ্ছাতন্ত্র! তারই উদরের তলহীন গহ্বরে আজ আবার কয়েক জন—"

সিজভ মায়ের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া বলিল, "চল, বাড়ী ফেরা যাক এখন!"

শাশাঙ্কা স্থির করিয়াছিল, পাভেলের সঙ্গে সে-ও নির্বাসনে যাইবে। নির্বাসনে তাহাদের দুই জনের জীবন একসূত্রে বাঁধা হইবে।

ঘরের মধ্যে নিবিড় হইয়া বসিয়া তাহারা সেই কথাই আলোচনা করিতেছিল। শাশাঙ্কা ঘন ভ্রূ তুলিয়া জানালার বাহিরে দূর আকাশের দিকে চাহিয়াছিল।

মা বলিতেছিলেন, "তারপর তোদের যখন ছেলে হবে, আমিও তখন তোদের কাছে গিয়ে থাকবো। এখানে যেমন আছি, সেখানে তার চেয়ে আর কি খারাপ থাকবো! পাভলুসা একটা কাজ যোগাড় করে নেবে—ও ঠিক তা পারবে—"

আপনার মনে কি চিন্তা করিতে করিতে শাশাঙ্কা বলিয়া উঠিল, "কিন্তু সে তো সেখানে বরাবর থাকবে না—তাকে তো চলে আসতে হবে—আর সে চলে আসবেই!"

"তা কি করে হয়? ধর, যদি তখন ছেলেপুলে হয়—তাদের ফেলে—"

"সে যখন হবে তখন দেখা যাবে। যদি তাই হয়, আমার দিক দিয়ে আমি বলতে পারি, আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে আটকে রাখতে চাইবো না। যে-কোন মুহূর্ত্তে স্বাধীন-ভাবে যা ইচ্ছে তাই সে করতে পারে। আমি তার কমরেড—হ্যাঁ, স্ত্রীও বটে কিন্তু তার জীবন যে-পথে যাত্রা করেছে, সেখানে আমাদের সেই সম্বন্ধটাকে সচরাচর স্বামি-স্ত্রীর যে সম্বন্ধ হয়, সে ভাবে আমি দেখতে চাই না। তাকে ছেড়ে দিতে আমার কষ্ট হবে জানি কিন্তু তবুও তা করতে হবে। আর সে ভাল রকমই জানে, স্বামীকে সিন্দুকের টাকার মত আমি দেখি না—"

তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া মা বলিলেন, "এত সইতে পারিস্ তুই!"

মায়ের বুকে মাথা লুকাইয়া মৃদু হাসিয়া শাশা বলিল, "সে অনেক দূরের কথা! এখন আর আমার কষ্ট কি! আমি তো কোনো ত্যাগ করছি না। আমি জানি, আমি কি করছি এবং তার ফলাফল কি হবে তাও আমি জানি। তাকে যদি আমি সুখী করতে পারি তবেই আমি সুখী হবো! আমার একমাত্র কামনা হচ্ছে তার শক্তিকে বাড়িয়ে তোলা—আমার স্নেহ, আমার ভালবাসা দিয়ে তাকে ভরিয়ে রাখা। আমি জানি, আমি তাকে যতখানি ভালবাসি সেও আমাকে ঠিক ততখানি ভালবাসে। তার কাছে আমি যে অর্ঘ্য নিয়ে যাব সেও আমাকে প্রতিদানে সেই অর্ঘ্য দেবে।

আমরা দু'জনে দু'জনকে এমনি করেই পরিপূর্ণ করে তোলবার চেষ্টা করবো। তাতে যদি প্রয়োজন হয় ছাড়াছাড়ির, ক্ষতি কি, বন্ধুর মত তাকে দেব মুক্তি।"

হঠাৎ আইভানোভিচ এক রকম ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। পরিশ্রান্ত, ব্যস্ত। বলিয়া উঠিল :

"শাশাঙ্কা যত দিন সুস্থ আছো, এখানে আর এসো না। শীগগিরই এখান থেকে বেরিয়ে পড়ো—আমার মনে হচ্ছে, আজই আমাকে এখানে গ্রেফ্‌তার করবে। ছুটো চর পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি গন্ধে বুঝতে পারি, এ বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই। হ্যাঁ, আর একটা কথা। এই নাও পাভেলের বক্তৃতাটা—এটা গিয়ে লুডমিলাকে দেবে—শীগগিরই যেন ছাপিয়ে ফেলে। আর দেখ মা, তোমাকেও এ-জায়গা ছাড়তে হবে। আজ রাত্রে তোমার এখানে থাকা চলবে না। তোমাকেও গ্রেফ্‌তার করতে পারে। ধরা পড়লে কাগজ বিলি করবে কে?"

আইভানোভিচ একান্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাকে এখনই যেন সকল-কিছু ছাড়িয়া যাইতে হইবে—অথচ কোথাও কিছুই যেন গুছান হয় নাই।

মা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কেন ধরবে? তোর হয়ত ভুল হয়েছে ভাবতে—"

"এ বিষয়ে আমার ভুল হয় না। তুমি লুডমিলার কাছে যাও—তার অনেক কাজে লাগতে পারবে তুমি। পাপের স্পর্শ থেকে যত দূরে থাকতে পারো, ততই ভালো।"

"বেশ, তাই হবে।"

সেই রকম ব্যস্ত হইয়াই আইভানোভিচ বলিল, "যাও, কিন্তু একটা কথা মনে রেখো। লুডমিলার কাছে যে ছেলেটা থাকে, তাকে কাল এই বাড়ীর সামনে যে মুটেটা বসে থাকবে তার কাছে আমার খবরের জন্যে পাঠাবে। লোকটি বড় ভালো—আমার একজন বিশেষ বন্ধু। আচ্ছা, তোমরা এখন বিদায় হও। দেরী করা আর ভাল নয়।"

পথে বাহির হইয়া শাশাঙ্কা মায়ের কানে কানে বলিল, "ঠিক এই রকম সহজ ভাবেই ও মৃত্যুকে বরণ করে নিতে পারে। যখন মৃত্যু ওর দরজায় আসবে, তখন ঠিক এই রকম একটু তাড়াহুড়ো করবে—তার পর দরজা খুলে—সে সামনে এসে যখন দাঁড়াবে, চশমাটা একবার ঠিক করে নিয়ে শুধু বলবে—চমৎকার! চলো। তারপর চির-নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়বে।"

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া শাশাঙ্কা বিদায় গ্রহণ করিল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, "যদি দেখেন লুডমিলার দরজাতেও গুপ্তচর ঘুরছে—তাহলে ওখানে না গিয়ে সোজা আমার কাছে চলে আসবেন।"

"সে আমি জানি।"

কয়েক মিনিট পরে মা লুডমিলার ছোট্ট ঠাণ্ডা ঘরটিতে বসিয়া আছেন। ঘরের মধ্যে বসিয়া মা ভাবিতে চেষ্টা করিতেছিলেন ইহার মধ্যে কোন্‌খানে ছাপা হয়। রাস্তার দিকে তিনটি জানালা। ঘরের মধ্যে একটি সোফা। বইয়ের সেল্‌ফ। দেওয়ালে ফটোগ্রাফ আর ছবি। মায়ের বেশ মনে হইতেছিল, কোথায় যেন কি লুকান আছে। কোথায় যেন গোপন পথ আছে, অথচ কোথায় যে তাহা সম্ভব মা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না।

লুডমিলার গম্ভীর কঠোর মূর্ত্তি দেখিলেই মা বিব্রত হইয়া পড়িতেন। একটা কালো রঙের পোষাক ফিতা দিয়া জড়ান। আপনার মনে লুডমিলা সমস্ত ঘর ধীরে পায়চারী করিতেছিল।

মা বলিয়া উঠিলেন, "একটা দরকারে তোমার কাছে এসেছি।"

"দরকার ছাড়া কেউ তো আমার কাছে আসে না।"

তাহার কণ্ঠস্বরে এক নূতন সুর শুনিয়া মা ঘাড় তুলিয়া চাহিলেন। লুডমিলা হাসিয়া হাত বাড়াইতে পাভেলের বক্তৃতাটি তিনি তাহার হাতে দিলেন।

"এটা আজই ছাপাতে হবে বলে পাঠিয়েছে ওরা।"

তারপর মা আইভানোভিচের কথা পাড়িলেন। গ্রেফতারের সম্ভাবনায় সে কি রকম আয়োজন করিতে ব্যস্ত—ছেলেটিকে কাল তাহার সন্ধানে পাঠাইবার কথা সমস্তই বলিলেন।

পাভেলের বক্তৃতাটি কোমরে গুঁজিয়া রাখিয়া সে বলিয়া উঠিল, "চুপ করে ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করা আমি বুঝি না। যারা আমাকে আঘাত করলো, তার আঘাত থেকে আত্মরক্ষা করবার অধিকার নিশ্চয়ই আমার আছে! আঘাত যে করে, আঘাতই সে প্রত্যাশা করে। ধৈর্য্য! ধৈর্য্য আমি বুঝি না!"

এতক্ষণ সে পাভেলের বক্তৃতা পড়ে নাই। ষ্টোভের আগুনের কাছে গিয়া তাহা পড়িতে আরম্ভ করিল। পড়িতে পড়িতে সহসা মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। পড়া শেষ করিয়া বলিল, "চমৎকার! এই তো চাই! যদিও এখানে সেই সব ধৈর্য্যের কথা আছে, তবু এ বক্তৃতা যেন কবরের আগে ড্রামের আওয়াজ! ড্রাম যে বাজিয়েছে, তার পাকা হাত, একথা মানতেই হবে!"

কিছুক্ষণ সে আপনার মনে কি ভাবিল। তারপর

বলিল, "আপনার ছেলের সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলতে চাই না। তার সঙ্গে আমার আজও পর্য্যন্ত কখনও চাক্ষুষ পরিচয় নেই! কিন্তু তবুও আমি জানি, আপনার ছেলে এক অপূর্ব্ব মানুষ। বয়স তার অল্প বটে কিন্তু মহাপুরুষের প্রাণ আছে তার দেহে। ও-রকম ছেলের মা হওয়া ভালো বটে কিন্তু বড় ভয়ানক!"

সোজা লুডমিলার মুখের দিকে চাহিয়া মা বলিলেন, "ভয়ানক আর কিছু নেই! এখন সবই ভালো!"

লুডমিলা হাত দিয়া অতি স্নেহে মায়ের চুল আঁচড়াইয়া দিতে লাগিল। মা দেখিলেন, একটা প্রাণ-ভরা আনন্দের বন্যাকে সে মুখে-চোখে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে।

মৃদু হাসিয়া সে বলিল, "তাহলে ছাপার ব্যাপারে আপনি আমাকে সাহায্য করছেন?"

"নিশ্চয়ই!"

"আচ্ছা, আপনি একটু ঘুমিয়ে নিন্। আমি ততক্ষণে এটা কম্পোজ করে দেখি। আমি তো আর আজ রাত্তিরে ঘুমোবো না। যদি দরকার দেখি, আপনাকে ঘুম থেকে তুলবো'খন। শোবার সময় আলোটা নিবিয়ে শোবেন।"

সামনের অগ্নিকুণ্ডে দু'খানা কাঠ দিয়া তাহারই পাশের দেয়ালে একটা ছোট্ট দরজা খুলিয়া সে অদৃশ্য হইয়া গেল। সেই দিকে চাহিয়া মা আপনার মনে বলিয়া উঠিলেন, "বাইরে থেকে কি কঠিন মেয়ে কিন্তু ভেতরটা ওর জ্বলছে। এত চেষ্টা করেও তা লুকোতে পারে না। প্রত্যেকেই ভালবাসে, ভালবাসতে চায়! ভাল যদি না বাসো, জীবনে তবে কি দরকার!"

আলো নিবাইয়া মা শুইয়া পড়িলেন।

পরের দিন লুডমিলা ছেলেটিকে আইভানোভিচের সন্ধানে পাঠাইয়া জানিতে পারিল, পুলিশ সত্যই তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার আসিয়াও সেই খবর দিল।

ডাক্তার বলিল, "সে আমাকে তোমাদের এখানে দেখা করতে বলে দিয়েছে।"

"এখানে এসে তোমার যে বিশেষ কোন সুবিধে হবে বলে মনে হয় না। কাল রাত্তিরে জনকতক ছেলে পাভেলের বক্তৃতাটি হেকটোগ্রাফে প্রায় পাঁচশো ছাপিয়েছে। ওরা চায় আজ রাত্তিরেই এই শহরে ওগুলো বিলি করতে। কিন্তু হেক্‌টোগ্রাফের ছাপা শহরে বিলি করতে নেই। শহরের লোকেরা একটু ভালো ছাপা নইলে পড়ে না। ওগুলো বরঞ্চ অন্য কোথাও যদি—"

মা বলিয়া উঠিলেন, "ওগুলো আমাকে দাও, আমি নাটাশার কাছে নিয়ে যাই!"

পাভেলের কথা পৃথিবীময় ছড়াইয়া দিবেন, যেখান দিয়া পাঁয়ে-হাঁটা পথ গিয়াছে, সেখানেই তাহার কথাকে তিনি পৌঁছাইয়া দিবেন—এই বাসনা প্রবল ভাবে তাঁহার অন্তরকে পাইয়া বসিয়াছিল।

পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া ডাক্তার বলিল, "সে মন্দ কথা নয়! এখন বারোটা বেজে বারো মিনিট হয়েছে। ট্রেণ ছাড়বে দুটো পাঁচ মিনিটে। আপনি সন্ধ্যে নাগাদ সেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারবেন। কিন্তু বিপদ তো সেখানে নয়!"

"বিপদ কিসের?"

"বিপদ হচ্ছে এই, আপনি হলেন আইভানোভিচের খুড়ি। তার গ্রেফতারের ঘণ্টা খানেক আগে আপনাকে আর দেখা গেলো না। আপনাকে দেখা গেলো তার পরের দিন নাটাশাদের গ্রামে। সেখানে সেই রাত্রেই কাগজগুলো বিলি হলো। আপনার গলায় দড়ি পড়তে এক মিনিটও দেরী লাগবে না!"

তাহাদের আশ্বাস দিয়া মা বলিলেন, "তা কেন? আমি সেখানে গিয়েছি বুড়ো সিজভের সঙ্গে দেখা করতে—অনেক দিনের বন্ধু। আমারও ছেলে যেমন নির্ব্বাসনে গিয়েছে, তারও ভাই-পো তেমনি নির্ব্বাসনে গিয়েছে। মনের দুঃখে তার ওখানেই গিয়েছিলাম বলবো।"

"বেশ, তাই হোক।" বলিয়া ডাক্তার চলিয়া গেল।

ডাক্তার চলিয়া গেলে দুইটি নারী বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। মায়ের হাত তুলিয়া ধরিয়া লুডমিলা ঘরের মধ্যে আবার পায়চারী করিয়া বেড়াইতে লাগল। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মায়ের হাত ধরিয়া করুণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তুমি মা ভাগ্যবতী! জান, আমারও একটি ছেলে আছে? তার বয়স এখন তেরো হলো। তার বাপের সঙ্গে সে থাকে। তার বাবা হলো সরকারী উকিল। বাপের মতন সেও একদিন হয়ত সরকারী উকিল হবে—যাদের জন্যে আমি আজ প্রাণ দিয়ে গেলাম—আমার ছেলে হয়ত একদিন তাদেরই দেবে নির্য্যাতন। আমার ছেলে আমারই শত্রু হয়ে বাড়ছে। ছদ্মনামে আজ আট বচ্ছর ধরে বাস করছি—আট বচ্ছর তাকে আর দেখি নি।"

জানালার কাছে বাহিরের নিষ্প্রভ ম্লান আকাশের

দিকে চাহিয়া বলিল, "সে যদি আমার পাশে থাকতো —তাহলে আমার বুকে আজ কত জোর বাড়তো, জানো মা? আমারই শত্রু হয়ে সে বাড়ছে—এই চিন্তা আমাকে মেরে ফেলছে! তার চেয়ে যদি জানতাম যে সে মরে গিয়েছে—"

"ছিঃ বাছা!"

তুমি বুঝবে না মা! তুমি সুখী। মা আর ছেলে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে—জগতে এ দৃশ্য সচরাচর ঘটে না—এ অপূর্ব্ব!"

নিজের আনন্দের মধ্যে মা সহসা তলাইয়া গেলেন। বলিয়া উঠিলেন, "সত্যিই এ অপূর্ব্ব! এ এক নতুন জীবন। কোথায় ছিলাম—দেখি হঠাৎ কখন সকলে গিয়েছি আত্মীয় হয়ে।"

লুডমিলাকে বুকে টানিয়া লইয়া প্রিয় মন্ত্র উচ্চারণ করিবার মত মা বলিতে লাগিলেন, "ছেলেরা বেরিয়েছে আজ জগতের পথে—আমি আজ শুধু দেখছি, বুকের মাণিকেরা চলেছে পৃথিবী জুড়ে সকলে একসঙ্গে এক পথে। তারা চলেছে, পায়ের তলায় দলে চলেছে, যা-কিছু মিথ্যা, যা-কিছু অন্যায়, যা-কিছু হীন; তুলে নিচ্ছে সবাইকে, নিচ্ছে তাদের চলার পথে। যৌবন আছে তাদের, শক্তি আছে তাদের, অজেয় শক্তি তাদের, তারা শুধু চায়—সুবিচার! তাদের মধ্যে একজন বলেছিল, আমরা জ্বালিয়ে তুলবো নতুন সূর্য্য—সত্যি তারা জ্বালিয়ে তুলেছে নতুন সূর্য্য। তারা বলছে, সকল মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তুলবো একটা হৃদয়কে—সব ছেঁড়া-খোঁড়া প্রাণ জোড়া দেবো আমরা একটা সুতো দিয়ে!"

জানালার বাহিরে মেঘমুক্ত সূর্য্যের দিকে আঙুল দেখাইয়া মা বলিয়া উঠিলেন, "ঐ সূর্য্য, আর এই বুকে আর এক সূর্য্য জাগবে—এত সুন্দর সূর্য্য ঐ আকাশে কখনও আসে নি—মানুষের, সকল মানুষের কল্যাণের মহাদ্যুতিতে সমুজ্জ্বল এক নতুন সূর্য্য। তার আলোতে এই পৃথিবীর যা-কিছু আছে, সব ভরে উঠবে আলোয়!"

বহুদিনের ভুলিয়া-যাওয়া প্রার্থনার সুর অন্তরে জাগিয়া উঠিল। হৃদয়-অগ্নি-কুণ্ড হইতে স্ফুলিঙ্গের মত তাহারা বাহির হইয়া পড়িল!

—প্রেমের এই আলো ছেলেরা পৌছে দেবে সব জায়গায়! নতুন মেঘের রঙে তারা রাঙিয়ে দেবে জীর্ণ যা-কিছু আছে! তাদের অন্তরে যে অনির্ব্বাণ হোম-শিখা জ্বলে উঠবে—তাতে তারা পবিত্র করে তুলবে—সব কিছু! তাদের প্রেমে আসবে নতুন জীবন। সে-প্রেম কে রোধ করবে? কোথায় সে শক্তি যা তার শক্তিকে বাধা দিতে পারবে? এই পৃথিবী নিজে সেই প্রেমকে জন্ম দিয়েছে—সমস্ত জীবনধারা চায় তার জয়! কে থামাবে তার গতিকে?

সহসা ক্লান্ত হইয়া মা বসিয়া পড়িলেন! উত্তেজনায় তাঁহার চৈতন্য অবশ হইয়া আসিতেছিল।

"কি বললাম, কিছু অন্যায় বলি নি তো?"

লুডমিলা মাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "অন্যায়? এর চেয়ে সত্যি আর কিছু হতে পারে না!"

বিদায়ের সময় মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া লুডমিলা বলিল, "জানেন, আপনার মুখ দেখলে কি মনে হয়?"

"কি?"

"খুব উঁচু পাহাড়ের ওপর প্রথম সূর্য্যোদয়!"

ট্রেণে চড়িবার সময় মা স্পষ্ট বুঝিলেন, তাহার পিছনে পিছনে লোক আসিতেছে। গাড়ীতে বসিয়া লক্ষ্য করিতেন যে, একজন লোক তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছে। ভাবিলেন, 'তা হলে এইখানেই ধরা পড়বো? কিন্তু লোকগুলোর কি হবে? এত শ্রম নষ্ট হয়ে যাবে?'

একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামিতে মা দেখিলেন, গাড়ীর লোকটি নামিয়া গিয়া ষ্টেশনের একজন লোককে কি বলিল। সে-লোকটি কোনও রকম সঙ্কোচ না করিয়া তাঁহার পাশে আসিয়া বসিয়া তাঁহার দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া রহিল।

অস্বস্তি বোধ করাতে মা ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও-রকম করে চেয়ে দেখছো কি?"

"হুঁ—চোর! বুড়ো হয়ে মরতে বসেছে—তবুও—"

তীব্র আঘাতের মত কথাগুলি মায়ের বুকে গিয়া বিঁধিল। তাঁহার চোখের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী যেন দুলিয়া উঠিল, তিনি উঠিয়া দাড়াইলেন—তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আমি চোর নই, মিথ্যাবাদী!"

অঙ্গের আবরণস্বরূপ যে চাদরখানি ছিল, তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। বুকের ভিতর হইতে কাগজগুলি বাহির করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়া তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কে কোথায় আছ, শোন!"

দেখিতে দেখিতে চারিদিকে চীৎকার পড়িয়া গেল, উৎসুক জনতা মজা দেখিবার জন্য ঘিরিয়া দাঁড়াইল!

ষ্টেশনে নামিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমার ছেলে পাভেল, রাজনৈতিক অপরাধে কাল নির্ব্বাসনে গিয়েছে। এই তার বক্তৃতা। যাবার সময় তোমাদের

জন্যেই সে এই সব কথা বলে গিয়েছে। আমি এসেছি তোমাদের কাছে, তার কথা বিলি করবার জন্যে!"

দেখিলেন, সেই কাগজ একখানা পাইবার জন্য লোকে কাড়াকাড়ি লাগাইয়া দিয়াছে। তাহাদের ডাকিয়া মা বলিয়া উঠিলেন, "সারা দিন খেটে তোমরা কি পাও, জানো? অনাহার, ব্যাধি আর নির্য্যাতন। আমাদের জীবন রাত্রির মত ঘোর অন্ধকার, ভয়ঙ্কর সব দুঃস্বপ্নে ভরা!"

সহসা সেই কৌতূহলী জনতা ভেদ করিয়া দুই জন সৈনিক আগাইয়া আসিয়া মায়ের হাত ধরিল।

মা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "আমার ছেলে যা বলে গিয়েছে—তোমরা তা বিশ্বাস করো! সে তোমাদেরই মত একজন সামান্য মজুর ছিল—কিন্তু তার আত্মা সে তোমাদের মত বিক্রী করে নি!"

সহসা বুকে সজোরে ঘুষি আসিয়া লাগিল। মা ঘুরিয়া পড়িয়া গেলেন। পুলিশের লোক আসিয়া জনতা ভাঙ্গিয়া দিতে লাগিল।

একজন সৈনিক গায়ের জামা ধরিয়া মাকে তুলিয়া ধরিল। মা বলিতে লাগিলেন, "তোমাদের সমস্ত শক্তি এক জায়গায় জড় কর!"

বেশ ভাল করিয়া ঝাঁকানি দিয়া সৈনিকটি গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "চুপ কর!"

"কিছু ভয় করো না। কাউকে ভয় করো না। সারা জীবন ধরে নিঃশব্দে তোমরা যে অত্যাচার সহ্য করো, তার চেয়ে বেশী অত্যাচার আর কেউ দিতে পারে না!"

হাত ধরিয়া সৈনিকটি মাকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল।

—"যে নির্য্যাতন প্রতিদিন তিল তিল করে অন্তরকে মেরে ফেলে তার চেয়ে বড় নির্য্যাতন আর কিছু নেই।—"

মায়ের গালে সজোরে একটি চড় পড়িল। অচৈতন্য হইয়া তিনি পড়িয়া গেলেন।

—"মৃত্যুকে পার হয়ে এসেছে যে-সত্য তাকে কেউ আর মারতে পারবে না!—"

অচৈতন্য অবস্থার মধ্যে তিনি শুধু অনুভব করিতেছিলেন, অনেকে মিলিয়া তাঁহাকে ধাক্কা দিতেছে, ঘাড়ে পিঠে আঘাত করিতেছে। কোথায় যেন একটা দরজা খুলিয়া গেল। ধাক্কা দিয়া সজোরে দরজার ভিতর তাঁহাকে কে ফেলিয়া দিল। দরজার উপর দেহের ভর দিয়া দাঁড়াইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "রক্তের বন্যা যদি বইয়ে দাও—তবু সত্যকে ডোবাতে পারবে না!—"

সজোরে কে তাঁহার হাতের উপর আঘাত করিল।

—"মূর্খের দল! দিন দিন নিজেদের বোঝা নিজেরাই বাড়িয়ে চলেছিস্—একদিন সেই ভারে আপনারাই নুয়ে পড়বি!—"

কে একজন গলা টিপিয়া ধরিল। অস্ফুট স্বরে মা বলিয়া উঠিলেন, "হায় রে হতভাগার দল!"

কার্ল য়্যাণ্ড আন্না

হের লিওনার্ড ফ্রাঙ্ক



"কার্ল উণ্ড আন্না"—এই নামে গল্পটি প্রথম জার্ম্মাণীতে প্রকাশিত হয়। লেখক—হের লিওনার্ড ফ্রাঙ্ক। এই গল্পটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রাঙ্ক জার্ম্মাণ সাহিত্যিকের সর্ব্বোচ্চ জাতীয় সম্মান, "জার্ম্মাণ একাডেমী অফ লেটারস"-এর সদস্য মনোনীত হন।

এই গল্পটিতে যুদ্ধের পরবর্ত্তী য়ুরোপের সামাজিক জীবনের যে ছবি পাওয়া যায়, আমাদের চোখে তা ভয়াবহ এবং বিসদৃশ লাগলেও, য়ুরোপকে সেই জীবনের ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। সেই মহা পরিবর্ত্তনের পটভূমিকার শিল্পী মানব-মনের অপরিবর্ত্তনীয় সেই পরম তৃষ্ণা, যাকে প্রেম বা কামনা বলে যুগে যুগে মানব কখনো গৌরবান্বিত, কখনো লাঞ্ছিত করে এসেছে, তারি এক বিচিত্র প্রকাশ···দুটি নর-নারীর জীবনের ভেতরে ফুটিয়ে তুলেছেন।

জগতের সমস্ত কাহিনী হ'ল, দুটি মানুষের পরস্পর কাছে আসবার ইতিহাস। কত কবি, কত নাট্যকার, কত কাহিনী-রচয়িতা কত কত অসংখ্য ভাবে সেই এক মূল কাহিনীকে ভেঙ্গে-চুরে নব নব রূপ দিয়ে গিয়েছেন। বর্ত্তমান কাহিনীটিও সেই এক কাহিনীর আর এক নব্যতম প্রকাশ···সম্পূর্ণ এক নতুন আবেষ্টনী ও পরিপার্শ্বিকতার মধ্যে।

অনুবাদক।

কার্ল য়্যাণ্ড আন্না

প্রথম অধ্যায়

য়ুরোপ আর এশিয়া যেখানে এসে মিশেছে···

তারি সীমান্ত দেশে···বিরাট প্রান্তর···যোজনান্ত প্রান্তর···আকাশের দিগন্তরেখায় গিয়ে মিশেছে···

তারি উর্দ্ধে···আকাশে শুধু দেখা যাচ্ছিল, একটি ছোট্ট কালো দাগ···যেন একটি ছোট্ট পাখী···

তার নিম্নে···সেই বিরাট প্রান্তরে ছিল, মাত্র দুটি প্রাণী···দুটি নির্ব্বাসিত মানুষ···বন্দী···

আকাশের সেই ছোট্ট কালো দাগটা নীচের দুটি প্রাণীর দিকে ঘণ্টায় একশো মাইল বেগে ছুটে আসছিল···

তবুও নীচের দুটি মানুষের কাছে মনে হচ্ছিল, সেই কালো দাগটি যেন নিশ্চল ভাবে আকাশের গায়ে লেগে আছে···ঠিক একই জায়গায়···

তারা দুটি প্রাণী যেখানে ছিল, আকাশ আর পৃথিবী সেখানে এমনি বিরাট···সীমাহীন···

প্রায় পনেরো মিনিট কাল এমনি দ্রুত অগ্রসর হয়ে আসবার পর, নীচের লোক দুটি বুঝল, দিগন্ত-রেখার সেই কালো দাগটি, একটি চলমান এরোপ্লেন···

এরোপ্লেনের পাইলট উর্দ্ধ থেকে নীচে চেয়ে দেখল, শূন্য প্রান্তরে, কোথাও কেউ নেই, মাটিতে শুধু ক্রসের চিহ্নের মতন একটা মোটা কালো দাগ···বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত···কেন? তারা ভেবে তা স্থির করতে পারল না···

দুটি লোক, দিনের পর দিন ধরে মাটিতে ট্রেঞ্চ কেটে চলেছে···বন্দিদশায় সেই হ'ল তাদের কাজ··· আকাশ থেকে তাই কালো ক্রসের চিহ্নের মতন দেখাচ্ছে···

এরোপ্লেনটি অগ্রসর হতে হতে সহসা পশ্চিমমুখো হয়ে ফিরে গেল। পনেরো মিনিট পরে আবার একটি ছোট্ট কালো দাগের মতন হয়ে দিগন্তরেখার আড়ালে মুছে গেল।

সেই সীমাহীন প্রান্তরের বৈচিত্র্যহীন বিশালতার মধ্যে দুটি প্রাণী আবার একাকী মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল।

কেন যে তাদের ওপর এই অতি দীর্ঘ ট্রেঞ্চ কাটবার ভার দেওয়া হয়েছে, তা তারা জানত না। যুদ্ধের আরম্ভের মুখেই তারা বন্দী হয় এবং বন্দী হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের দুজনকে এই প্রান্তরে চালান দেওয়া হয়। সঙ্গে এক মাসের খোরাক আসে; এবং সেই সঙ্গে একটা টিনের চালা, চাকার ওপর বসান···ইচ্ছা করলে সেই চালাটিকে টেনে যেখানে খুসী নিয়ে যাওয়া যায়। সেইটিই হ'ল, তাদের ঘর···মাথার ওপরে একটা আচ্ছাদন।

কোন প্রহরী নেই···কোন পাহারা নেই···আজ চার বছর ধরে তারা দুটি প্রাণী সেই জনহীন প্রান্তরে শুধু মাটির পর মাটি কেটে চলেছে! চোখ বুজে নীরবে ঘাসের ওপর শুয়ে দিন চলে যায়···কিন্তু কিছু না করে মানুষ কি করে থাকতে পারে? তখন কোদাল নিয়ে তারা মাটি কাটতে থাকে···বিরামবিহীন ভাবে কাজ করে চলে···যতক্ষণ না অবশ হয়ে পড়ে···

প্রায়ই মাথার ওপর দিয়ে আহারের অন্বেষণে পাখীরা দল বেঁধে উড়ে যায়···শত-সহস্র কণ্ঠময় ঝিল্লী আর পতঙ্গ-ধ্বনিতে প্রান্তরের নীরবতা আরও সুগভীর হয়ে ওঠে···মনে হয়, ধরণী যেন জীবনের মধ্যাহ্ন-লগ্নে এসে নীরবে দাঁড়িয়ে শুধু কান পেতে শুনছে···

কোদালের মুখে একটা পোকা কাটা পড়ে। মাটি থেকে তার ছিন্ন দেহটিকে তুলিয়া আকাশে ছুঁড়ে দেয়···মাটিতে পড়বার আগে কোন চলন্ত পাখী উড়তে উড়তে এসে তা মুখে করে নিয়ে আবার উড়ে চলে যায়···

—আমি যখনি বিছানায় শুতাম, বিছানার ভেতর দিকে দেয়াল ঘেঁসে শুতাম···সে শু'ত আমার পাশে বিছানার সামনেটাতে। ভোর বেলায় কখন সে বিছানা ছেড়ে চলে যেত, জানতেই পারতাম না···এমনি মৃদু··· এমনি কোমল ছিল তার স্বভাব···

—বহুবার তোমার মুখে শুনেছি একথা…যতক্ষণ না কারখানার বাঁশী বেজে উঠত, ততক্ষণ তোমার ঘুম ভাঙত না…

—হাঁ, হাঁ…রোজ ঠিক একই সুর বাজত…

দু'জনার মধ্যে একজন বিবাহিত, আর একজনের বিবাহের অবকাশের আগেই যুদ্ধে যোগদান করতে হয়।

বিবাহিত লোকটি কোদাল হাতে মাটি কেটে চলেছিল…তার সঙ্গীটি মাটিতে বসে দূরের দিকে চেয়েছিল, মাঝে মাঝে অন্তমনস্ক ভাবে ঘাস ছিঁড়ে মুখে চবাচ্ছিল এবং তেমনি অন্তমনস্ক ভাবে তার কথার উত্তর দিচ্ছিল।

—আমি মাঝে মাঝে ভাবি, এটা কি রকম করে হ'ল…তার বুকের কাছটা অত শাদা…আর তার ঠোঁট, তার হাত, তার পায়ের রঙ…কি বলেছিলে…ব্রঞ্জের মত ঘোরালো?

বিবাহিত লোকটি কোন উত্তর দেয় না। অনেকক্ষণ পরে শুধু বলে, তাকে কাছে পেলে, ও-সব কিছুই চোখে পড়ে না।

আধ-ঘণ্টা আবার নীরবে চলে যায়…

বিবাহিত লোকটি বলে, মাঝে মাঝে আমি কিছুতেই তার চেহারাটা ভাল করে মনে করতে পারি না…চার বছর আগে…কি রকম হয় জান, কার্ল? সব যেন কি রকম ঝাপসা-ঝাপসা লাগে, লাইনগুলো স্পষ্ট যেন দেখতে পাই না…কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, যখন স্বপ্নে তাকে দেখি, তাকে যেন জ্যান্ত দেখতে পাই…এত জ্যান্ত যে তার স্পর্শ পর্য্যন্ত পাই…

কার্ল বলে, আমি জানি তাকে কেমন দেখতে। তার চাল-চলন-ঢঙ…সব…আমি তার সব কিছু জানি…

—কিন্তু তুমি তো কোন দিন তাকে স্বচক্ষে দেখ নি…

একটু থেমে আবার বলে, ঐ এরোপ্লেনটা যদি নেমে আমাদের নিয়ে যেত…হয়ত তার কাছে পৌছে যেতাম…উঃ! বার বছর। ভগবান্। এ কি কারুর সহ্য হয়?"

কার্ল বলে, তবুও তোমার সান্ত্বনা যে জগতে এমন কেউ আছে, যে তোমার কথা ভাবে!

—তা নিশ্চয়! তা তুমি বলতে পার। নিশ্চয়ই!

দূরে দিগন্তরেখার দিকে চাহিয়া কার্ল বলে, তোমার জন্তে অন্তত একজন দাঁড়িয়ে আছে…তোমার অপেক্ষায়…কিন্তু…আমি…আমি যখনি ভাবতে যাই…ভাববার পর্য্যন্ত কিছু পাই না…কোন আশ্রয় নেই শূন্য…

—সত্যি যে দাঁড়িয়ে আছে আমারি অপেক্ষায়…যদি সে এখনো পর্য্যন্ত বেঁচে থাকে…

কার্ল হঠাৎ চীৎকার করে বলে উঠল, হাঁ…হাঁ…সে বেঁচে আছে…সে নিশ্চয়ই বেঁচে আছে…

দূর-দিগন্ত-রেখার দিকে সে চেয়েছিল, তার দৃষ্টিতে মনে হচ্ছিল যেন দিগন্ত-রেখার বাইরেও যেন সে সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল…যে নারীকে সে কখনো জীবনে দেখেনি, তাকে যেন সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে…যে-ঘরে সে কখনো পা ফেলেনি, সেই ঘরে সে দেখছে, সে-নারী ধীরে মৃদু-চরণে ধূলা পরিষ্কার করে ফিরছে…চার বছরের সঞ্চিত ধূলা…সেই পুরানো বিছানা…তার আচ্ছাদন…ময়লা হয়ে গিয়েছে…তার বদলে নূতন আচ্ছাদন পাতছে…একটু ঝুঁকে আছে দাঁড়িয়ে…সে-সব যেন দেখতে পাচ্ছে…ঘরের কোন্ দিকে দরজা…দরজার কোন্ দিকে শোবার খাট…বালিশগুলির রঙ, চেহারা, সাইজ…সে সব জানে…আজ চার বছর ধরে সে শুধুই শুনেছে…

হঠাৎ কার্ল চীৎকার করে বলে, রিচার্ড…রিচার্ড…আমি কি বলছি শোন…যদি সে…তোমার স্ত্রী…এখুনি এখানে আসে…তাহলে তুমি একবারের জন্তে…মাত্র একবারের জন্তে…

রিচার্ড শুধু বিহ্বলের মত বলে, যদি সে এখানে আসে…

যেন এ ধারণাটা তার কল্পনারও অতীত।

—বল, বল…আমি যা জিজ্ঞাসা করছি…তুমি তা জান…বল, তার উত্তর তুমি দেবে?

অনেকক্ষণ ধরিয়া সে একদৃষ্টিতে কার্লের দিকে চেয়ে রইল, তারপর বলল, হয়ত পারি আমারি মতন দুরবস্থাতে তুমিও তো আছ…কিন্তু তারপর যদি তুমি ও-কথা উচ্চারণ মাত্র কর…তাহলে এই কোদাল দিয়ে তোমার মাথা গুঁড়িয়ে দেব…

—আমি ভাবছি তোমার সেই কারখানার বাঁশী এখনো তেমনি বাজে কি না?

একটা চলমান মেঘের ছায়া তাদের দুজনার ওপর এসে পড়ল। কোথাও খুব কাছে মাত্র একটি ফড়িঙ ডাকছিল। তাহাও ক্রমশ থেমে গেল। সেই সর্ব্বগ্রাসী নীরবতার মধ্যে সেই দুটি প্রাণী যেন শুনছিল, তাদের ধমনীতে রক্ত-প্রবাহের চলাচলের শব্দ…দূরে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছিল…তারি বিদায়-রশ্মিতে খণ্ড-খণ্ড প্রান্তর তপ্ত স্বর্ণের মত জ্বলছিল…

—কিন্তু আন্না? সে কখনই তাতে রাজী হবে না। সে আমাকে ছাড়া কাউকে চায় না! আমি

জানি আন্নার জীবনে দ্বিতীয় পুরুষের স্থান নেই··· আমি তোমাকে অনেক বার গল্প করেছি···সেই আমাদের মিলনের প্রথম রাত্রি···আমাকে কি বিপদেই না পড়তে হয়েছিল···তখন সে সবে তেইশে পড়েছে··· আমি তো তোমাকে সব বলেছি···বোঝ···কি বিপদেই আমাকে পড়তে হয়েছিল···

কার্ল বলে, কিন্তু তোমারি কথা সত্যি, তা কে বললে? চার বছর—দু'-এক দিনের কথা নয়···ইতি-মধ্যে যে সে আর কারুর সঙ্গে বাস করছে না, একথা তোমাকে কে বললে? মানুষের দেহ তো? তোমার নিজের কথা ভেবে দেখ না···এখানে না হয় ফড়িঙ ছাড়া আর কিছুই নেই···ধর, এখানে যদি গুটিকতক মেয়েই থাকত, তুমি কি এরকম ভাবে আন্নার চিন্তা নিয়েই শুধু পড়ে থাকতে?

রিচার্ড বাধা দিয়ে বলে, আচ্ছা, একটা কথা বলি, তা হলে তুমি হয়ত বুঝতে পারবে?

সে কথা কার্ল আরও বহুবার শুনেছে, কিন্তু রিচার্ডের ধারণা যে, হয়ত তা বলা হয় নি।

সে বলে, এ-কথা হয়ত তুমি জান না···শোন··· আন্না আর আমি যখন প্রথমে এসে শহরে ঘর ভাড়া নিলাম···দিব্যি একটা ছোট্ট ঘর জুটে গেল···ভাড়া করে সমস্ত ফার্ণিচার নেওয়া হ'ল···

—জানি, মাসে আট মার্ক করে ভাড়ার কিস্তী হয়···

—হাঁ···ঠিক সেই সময় আমার পড়ল ডাক···তার আগে আমাদের দুজনার কথা হয়েছিল···পয়সা-কড়ি তো কিছু নেই···এই ঘরটুকু আঁকড়ে আমরা দুজনে থাকব···আমি জানি আজ সেই ঘরটুকু আঁকড়ে থাকতে তার কত কষ্ট হচ্ছে···

—হয়ত সেই জন্যেই···

—কিন্তু তাতে তোমার কি? কেন রাত-দিন তুমি ঐ এক কথা বল? ছিঃ! লজ্জা করে না, ও-রকম কুৎসিত কথা বলতে? আন্না আমার স্ত্রী··· তাকে আমি জানি···

তারপর বহুক্ষণ ধরে তাদের মধ্যে আর কোন কথাবার্তা হয় না। দূর-দিগন্তে নীরবে সূর্য্য অস্ত যায়। শুধু আকাশ-পৃথিবী ব্যেপে জেগে ওঠে প্রান্তর-পতঙ্গের একস্বরা গুঞ্জনধ্বনি। নীরবে কোদাল পরিষ্কার করে নিয়ে তারা কাঁধে তুলে নেয়। অন্ধকারে টিনের আটচালার দিকে অগ্রসর হয়।

পরের দিন তাদের মাসকাবারী খোরাক আনবার তারিখ। সেখান থেকে পুরো এক দিনের পথ হেঁটে গেলে, বন্দীদের জন্য একটা তাঁবু আছে। সেই তাঁবু থেকে রসদ নিয়ে আসতে হয়। প্রথম মাসে যাবার সময় ঘাসে জোর করিয়া পা ঘসে ঘসে যেতে হয়েছিল, পথের নিশানা রাখবার জন্য। কিন্তু এক মাস পরে ঘাসের মধ্যে আবার সে পথ হারিয়ে যায়। বহু কষ্টে পথের সন্ধান করে, দিক লক্ষ্য রেখে তবে চলতে হয়।

এবারে তাঁবুতে পৌছানোর পর দেখা গেল, সেখানে আরো কয়েক জন বন্দী এসেছে।

গার্ড তাদের দুই জনাকে সামনে দাঁড় করিয়ে তীক্ষ্ণভাবে নিরীক্ষণ করল···দুজনাই সমান দীর্ঘ··· মুখের রঙ সমান তামাটে হয়ে গিয়েছে···চার বছরের সঞ্চিত দাড়ি আর গোঁফে দুজনার মুখের ছাপ প্রায় এক হয়ে গিয়েছে···

গার্ড রিচার্ডের নাম ধরে ডাকল, তোমাকে এদের সঙ্গে এখুনি যেতে হবে···

রিচার্ড যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল। এখানে আর নয়···অন্য কোথাও···তা সে যেখানেই হ'ক···কার্লের কাছে একটা বিদায় নেওয়া যে প্রয়োজন, তা তার মনেই হ'ল না···সোজা নতুন বন্দীদের সারিতে গিয়ে দাঁড়াল···

গাড়ী প্রস্তুত ছিল···রিচার্ড চলে গেল অনির্দ্দেশ্য নতুন কারাগারের দিকে···কার্ল একা ফিরল আর এক শূন্য প্রান্তরে···

দ্বিতীয় অধ্যায়

কিন্তু কার্ল আর সেই শূন্য প্রান্তরে ফিরল না···এ প্রান্তরের তো শেষ আছে···সে হাঁটতে আরম্ভ করল··· দীর্ঘ যাত্রার শেষে প্রান্তরের অপর প্রান্তে আন্না দাঁড়িয়ে আছে···

প্রান্তর পার হয়ে সে যাবে···চার বছর ধরে যে-ঘরের প্রত্যেক অণু-পরমাণুর বর্ণনা সে শুনেছে, সেই ঘরে···দরজা পার হয়ে দশ পা গেলেই বিছানার মাথার দিকে জানালা···খোলা জানালার রেলিং ধরে আন্না দাঁড়িয়ে আছে···যাকে কখনো সে চোখে দেখে নি···এই চার বছরের নির্জ্জনবাসের মধ্যে তার কল্পনায় সে তাকেই তার একান্ত মর্ম্মসঙ্গিরূপে গড়ে তুলেছে··· চার বছরের নিভৃত চিন্তার সঙ্গে আন্নার মূর্ত্তি জীবন্ত হয়ে তার মনে গেঁথে গিয়েছে···মনে মনে সে যত তার কাছ থেকে দূরে যেতে চেষ্টা করেছে, ততই সে দেখে, অন্তরের অন্তরতম স্থলে তাকেই কেন্দ্র করে এই চার বছর সে বেঁচে আছে···আজ তার দেহ-মনকে উদ্বেল

করে জেগে উঠেছে তীব্র বাসনা···কা'কেও জীবন্তরূপে কাছে পেতে, কারও কাছে জীবন্তরূপে নিজেকে ধরা দিতে।

দিনের পর দিন সে নীরবে লক্ষ্য করেছে, রিচার্ডের মতই তার দেহের গঠন, তাদের দু'জনার দেহের রঙ এক···আশ্চর্য্যের ব্যাপার, রিচার্ডের মতই তার কেশবহুল ভ্রূ ঈষৎ বাঁকা···দিনের পর দিন, তার নিজের অজ্ঞাতে সে রিচার্ডের মতন হবার জন্যই এই চার বছর ধরে চেষ্টা করে এসেছে···

আন্নার নিকট সে যাবে, সে তারই স্ত্রী···সে তার স্বামী···সে-ই রিচার্ড!

এই চার বছর ধরে রিচার্ডের প্রতিদিনের কথা শুনে শুনে আন্নার অতীত জীবনের সমস্ত কথা, তার বিবাহিত জীবনের সমস্ত কথা, তার প্রত্যেকটি অঙ্গ··· সে যেন প্রত্যক্ষ ভাবে সব জানে। আর্ত্তযৌবন মনে মনে যে ঘরের স্বপ্ন দেখে, আন্নাই তার সেই ঘর। সে তাকে ভালবাসে···তাকে ছাড়া তার অস্তিত্ব সম্ভব নয়···

তিন মাস পরে যে উপস্থিত হ'ল, যে-সহরে আন্না বাস করে। তিন মাস ধরে চোরের মত সঙ্গোপনে সে রাত্রির অন্ধকারে অন্ধকারে হেঁটেছে···ধরা পড়বার আশঙ্কায় দিনের বেলায় বনে-জঙ্গলে লুকিয়ে কাটিয়েছে···জীবন তুচ্ছ করে এক সীমান্ত থেকে আর এক সীমান্তে এসেছে···এই তিন মাস ধরে একদিনও সে নিশ্চিন্তে চোখ বুঁজতে পারে নি।

তিন মাস এমনি ভাবে হেঁটে সে তার ঘরে ফিরছে—হাঁ, তার ঘরে সে ফিরছে···

বহু বছর প্রবাসের পর, লোকে যে উৎসুক আগ্রহের আনন্দে ঘরে ফেরে, কার্ল তেমনি উৎসুক আনন্দে রাস্তা চলতে লাগল···এ সহরে সে আর কখনো আসে নি··· কিন্তু তার রাস্তাঘাট সে সব চেনে···বাড়ীর নম্বরও তার জানা···আর বেশী দূর নেই···এখনি তার ঘরে গিয়ে সে উপস্থিত হবে···চার বছর ধরে আপনার মনে যে ঘর সে গড়ে তুলেছে···

দু'নম্বর ফ্লাট দোতলার সিঁড়ি থেকে উঠে বাঁ ধারে···প্রথম দরজাটা ছেড়ে···দ্বিতীয় দরজা···

কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠতেই দেওয়ালে লোহা দিয়ে নানা রকমের ছবির আঁক-কাটা চোখে পড়ল··· রিচার্ডের আঁকা···রিচার্ড বহু দিন এই ছবিগুলির কথা বলেছে···

কয়েক ধাপ ওপরে ওঠবার পর, সে যেন আর অগ্রসর হতে পারল না···পেছন ফিরে দাঁড়াল···হঠাৎ ক্ষুধার জ্বালায় তার পেটে মোচড় দিয়ে উঠল···এখন নয়, সে একটু পরে ফিরে আসবে···ফিরতেও পারল না···আর একটু দূরেই আন্না দাঁড়িয়ে আছে···সে আরও দু'ধাপ ওপরে উঠল···বাঁ ধারের প্রথম দরজা পার হয়ে দ্বিতীয় দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল···

দরজা ভেতর থেকে বন্ধ···দরজায় আন্নার নাম লেখা···রিচার্ডের নিজের হাতের লেখা···আবছা, মলিন হয়ে গিয়েছে···তবুও স্পষ্ট পড়া যায়···

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সে কল্পনায় দেখল, আন্না গ্যাসের উনুনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে···পেছন থেকে তার গ্রীবার অনাবৃত অংশটা দেখা যাচ্ছে··· মাথাটা একটু উনুনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে···হঠাৎ সে উনুন ছেড়ে টেবিলের কাছে এল···তার পায়ের শব্দ যেন সে শুনতে পাচ্ছে···একটা সম্পূর্ণ দেহের পরিপূর্ণ গতির ছন্দ···দরজা খুললেই সে দেখতে পাবে।

এই চার বছরের নিভৃত ধ্যানে আন্নার প্রতিমূর্ত্তি তার কাছে এত পরিচিত হয়ে গিয়েছিল যে, সহসা যদি ভিড়ের মধ্যে একবার তাকে সে চকিতে চলে যেতে দেখে, তা হলে তৎক্ষণাৎ তাকে সে চিনে নেবে···

আবেগে ও উদ্বেগে তার সর্ব্বশরীর কাঁপছিল··· দু'হাতের মুঠি দিয়ে সে জামার "কলার" চেপে ধরল··· তারপর দেখে সে কখন তার নিজের অজ্ঞাতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে যেতে চেষ্টা করছে···কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সে দেখে যে আবার আন্নার দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে···কড়া নাড়ছে···বাইরে থেকে কল··· ঘুরিয়ে সে আপনিই দরজা খুলে ফেলেছে···

—আন্না!

আন্না জানালার কাছে দাঁড়িয়েছিল···চমকে সে ঘরের মাঝামাঝি ছুটে এল···কি মনে করে টেবিল হতে একটা প্লেট তুলে নিল···

কার্ল নীরবে চেয়ে দেখছিল কল্পনার সব চেয়ে রঙীন স্বপ্নের চেয়ে ঢের বড় একটা জীবন্ত দেহের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ···সেই তো জীবন! কার্লের সর্ব্ব-শরীরের মধ্য দিয়া তীব্র তড়িৎ-শিহরণ স্পন্দিত হ'ল··· দু'চোখ দিয়ে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল···সে ডাকল,—আন্না···চেয়ে দেখ, আমি এসেছি!

কার্লের চোখে আনন্দের সেই আলোতে আন্নার ভয় কেটে গেল···সে যেন খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে সরল কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করল,—কে তুমি?

আন্নার পরনে সাধারণ সুতির একটা নীল রঙের ফ্রক ছিল···বহু দিনের ব্যবহারের ফলে বুকের কাছটার রঙটা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। ভারি সরল মুখখানি,

কিন্তু অতি স্পষ্ট···প্রকৃতি যেন নিজের হাতে সে মুখখানি গড়ে তুলেছে এমন ভাবে যে দেখলেই বুঝতে দেরী হয় না যে, সেই মুখের পেছনে একটা সরল মন আছে, মমতায় চির-উষ্ণ, সংসারের জটিলতায় আজও যা অমলিন রয়ে গিয়েছে।

আন্নার সেই বিস্মিত প্রশ্নের উত্তরে কোন কথা না বলে কার্ল তার পিঠের বোঁচকাটা সামনের একটা জীর্ণ চেয়ারে রাখল···চেয়ারটা এ-পাশ ও-পাশ নেড়ে আন্নাকে শুনিয়ে বলল, চেয়ারগুলিতে আবার রঙ করতে হবে দেখছি···তোমার মনে আছে··· কেনবার সময়ই আমি বলেছিলাম, এ-রঙ বেশী দিন টিকবে না···

আন্নার সহসা মনে পড়ে গেল যে, এই চেয়ারখানা কেনবার সময় তার স্বামী ঠিক ঐ কথাই বলেছিল। এই কথা স্মরণ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আন্নার বিহ্বলতা যেন হাজার গুণ বেড়ে গেল।

—তা হলে তুমি দেখছি, আমাকে চিনতে পার নি?

আন্না শুধু বিহ্বল ভাবে জিজ্ঞাসা করে, কে তুমি?

কার্লের সমস্ত মুখ পাংশু হয়ে এল···তার জিভ··· ঠোঁট ভেতর থেকে যেন শুকিয়ে যাচ্ছিল···স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সে তবু বলল, আমি রিচার্ড···

সহসা সেই উত্তর শুনে আন্না যন্ত্রচালিতের মত কয়েক পা ঘরের মধ্যে পিছিয়ে গেল। কোন রকমে কম্পিত-কর টেবিলের ওপর চেপে ধরে সে অর্দ্ধোচ্চারিত ভাবে বলল, আমার স্বামী? না, কখখনো না···তুমি আমার স্বামী নও!

আবেগে কার্লের জানু আপনা থেকে নত হয়ে পড়ল। আন্নার দিকে আরও দুই পা অগ্রসর হয়ে সে আন্নার কাছে বসে পড়ল···কাতর ভাবে তার মুখের দিকে চেয়ে শুধু ডাকল, আন্না!

আন্নার পা সে স্পর্শ করতে পারল না···কিন্তু তার কাতর কণ্ঠস্বর আন্নার অন্তর স্পর্শ করল।

ভাগ্য যখন তার কঠিনতম আঘাত করে, তখনো যেমন নারী নীরবে জীবনের প্রাতদিনের ছোটখাট কাজগুলি করে চলে, তেমনি সেই সর্ব্বনাশা লগ্নে আন্না আপনার মনে ঘরের মধ্যে তার প্রতিদিনের ছোটখাট সেই কাজে সহসা মন দিল···জানালার পর্দ্দাটা একটু সরিয়ে দিল···নুণের বাটিটা তুলে স্বস্থানে রেখে দিল··· ঘরের মেঝেতে তিনটে জ্বালান দেশলায়ের কাটি পড়েছিল, কুড়িয়ে তাদের টেবিলের এক কোণে রেখে দিল···তার পর যা করবার ছিল, যেন তা সমস্তই ফুরিয়ে গিয়েছে···মাথা নীচু করে নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়িয়ে রইল··

হঠাৎ কি মনে করিয়া পাশের রান্নাঘরে একবার গেল···তারপর তৎক্ষণাৎ আবার ফিরে এল···তার দুগ্ধশুভ্র গণ্ডে যেন রক্তের ছোপ লেগে গিয়েছে···

সে শুনছিল, সেই অপরিচিত লোকটি বলছে, আন্না, আমার কথা বিশ্বাস কর···তুমি যদি না বিশ্বাস কর, জগতে আমি যাব কোথায়? তুমি জান, আনা, তুমি ছাড়া জগতে আর আমার কেউ নেই।

তার স্বামী তাকে এমনি আদর করে 'আনা' বলত···রাত্রির নিস্তব্ধতা আর তার অন্তর ছাড়া সে কথার সুর তো আর কেহ জানত না!

কার্ল ভাবছিল, তার সামনে দাঁড়িয়ে, তার জীবনের সমস্ত সুখ···তার জীবনের সমস্ত দৈন্য··· ভাবতে ভাবতে জীবনের উষ্ণ রক্তধারা জোয়ারের বেগে তার ধমনীতে প্রবাহিত হয়ে উঠল···এ মিথ্যা কি তার জীবনে সত্য হবে না?

তেমনি কাতর ভাবে কার্ল বলল, আনা, তুমি··· তুমিই একমাত্র আমার স্ত্রী!

আন্না স্পষ্ট বুঝতে পারলে, যে লোকটি এই মুহূর্ত্তে তার সামনে দাঁড়িয়ে, তার স্বামী বলে নিজের পারচয় দিচ্ছে···সে মিথ্যাবাদী···কিন্তু তবুও তার কণ্ঠস্বরের মধ্যে কি একটা জিনিস বেজে উঠছিল, যাতে আন্নার মন চঞ্চল হয়ে উঠল···দু'হাত দিয়ে বুক চেপে সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে, কিন্তু এ কে? এমন করে তার মনের মধ্যে আসবার সাহস সে কোথা থেকে পেলে?

যন্ত্র-চালিতের মত আন্না সামনের ভাঙ্গা টেবিলটার কাছে এগিয়ে গেল···ড্রয়ার টেনে একটা পুরানো পোষ্ট-কার্ড বের করল···তার অক্ষরগুলো প্রায় ঝাপসা হয়ে এসেছে···

পোষ্টকার্ডখানা সে তেমনি যন্ত্র-চালিতের মত কার্লের হাতে দিল···দেবার সময় অস্ফুট স্বরে সে বলে উঠল, চার বছর আগে···ঠিক চার বছর আগে···

চার বছর আগে সেই পোষ্টকার্ডখানি তার কাছে আসে···সামরিক বিভাগ থেকে···

কার্ল পড়তে আরম্ভ করল—

"তোমার স্বামী ১৯১৪ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ করতে করতে রণক্ষেত্রেই মারা গিয়েছেন।"

কার্ল পড়ে চিঠিটা বার বার করে উল্টেপাল্টে দেখল, আবার পড়ল···

—আন্না···আমি বলছি···এ মিথ্যে কথা···ভুল··· ভুল সংবাদ···

এই বলে তার হাতখানি আন্নার দিকে বাড়িয়ে··· ক্ষীণ হেসে বলে উঠল,—এমনি ধারা কত ভুল যে সামরিক অফিস থেকে করে···পরে হয়ত তারা আবার সংশোধন করে···কিন্তু তখন···আন্না বিশ্বাস কর··· আমি নিজে বলছি···এ ভুল···ভুল···

ক্ষণকালের জন্যে এক মহা-আনন্দের উন্মাদনায় তার দেহের মধ্যে শিরায়-উপশিরায় রক্তের তরঙ্গে জোয়ার বহে যায়, আন্না তো কই হাত ছাড়িয়ে নিল না!

আন্নার দুই চোখে ছিল ভয়···সেই সঙ্গে ছিল অসহায় নারীর উন্মাদ আশা···মৃত্যু-জয়ী আশা···যার ভরসায় প্রিয়তমের মৃতদেহ আঁকড়ে থেকেও সে ভাবে, এখনি হয়ত বন্ধ দরজা খুলে যাবে, আসবে তার প্রিয়!

নিরুপায় দেখে সে অন্য কথা পাড়ল, খুব ক্ষিদে পেয়েছে, না?

পরক্ষণেই মনে হ'ল, ছিঃ, ছিঃ, এ প্রশ্ন সে কাকে করল? চেঁচিয়ে লোক-জন ডাকবে?

কিন্তু তার দু'হাত কখন ছুরিটা ধরেছে···রুটি কেটেছে···খানিকটা মাখন পড়ে ছিল, রুটিতে মাখিয়েছে···সামনে একটা আপেল পড়ে ছিল, সেটা কি ছাড়িয়ে দেবে?

—এরি মধ্যে সব ভুলে গেলে, আন্না?

সহসা তার দেহের সমস্ত রক্ত যেন কিসের একটা ধাক্কায় ওপরে উঠে তার মুখে ছড়িয়ে পড়ল···যন্ত্রচালিতের মত আপেলটা নিয়ে খোসা ছাড়িয়ে, টুকরো টুকরো করে কেটে প্লেটে সাজিয়ে দিল···

জীবনে এই প্রথম···মমতাময়ী নারী সশরীরে তার সামনে দাঁড়িয়ে তারই সেবার আযোজন করছে···নারী ···যে-নারীকে দিনের পর দিন ধ্যানে সে অন্তরের অন্তরলোকে পেয়েছে···জীবনে এই প্রথম···

হঠাৎ চোখ তুলে ওপরে চাইতেই, আন্না দেখল, ক্ষুধিত আর্ত্ত লোকের বিষণ্ণ মুখে ক্ষুন্নিবৃত্তির আশার আনন্দ···নিজের অজ্ঞাতসারে আন্না প্লেটটি একটু এগিয়ে দিল···

—সে চামচেটা কি হ'ল গো?

আন্না বিহ্বল হয়ে তার মুখের দিকে চাইল···

—সেই যে···যেটার মাঝখানের দাঁড়টা দুমড়ে গিয়েছিল···

যন্ত্রচালিতের মত আন্না ড্রয়ারের কাছে গিয়ে ড্রয়ার টানল, ভেতর থেকে একটা চামচে বার করল'···হাঁ··· তার মাঝখানের দাঁড়টা দুমড়ে আছে···

—হাঁ···ঐ তো···ঐটেই তো!

পরিতৃপ্ত মুখে আগন্তুক প্লেটের সামনে গিয়ে বসল···

আন্না সামনের ভাঙ্গা চেয়ারটার ওপর বসে পড়ল··· তখন তার চারদিকে স্বপ্নের ঘোর···

ঘরে ক্ষীণ আলোয় দীপ জ্বলছিল···দরজা বন্ধ··· তার বাইরে যেন সমস্ত পৃথিবী বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে··· ডান দিকে শয্যা···সেই পুরোনো খাট···

বহু বৎসর ধরে দুটি প্রাণীকে যদি মুখোমুখী একত্র জীবন যাপন করতে হয়···তা হলে প্রত্যেকের অভ্যাস, চলা-ফেরা, কথা বলার ঢঙ, ওঠা-বসার কায়দা··· প্রত্যেকটি ছোট-খাট খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত দু'জনের রপ্ত হয়ে যায়···

কার্ল ছুরি নিয়ে যখন রুটি কাটছিল, আন্না লক্ষ্য করছিল, ঠিক রিচার্ড যে ভাবে ছুরি ধরত, যে ভাবে রুটির মধ্যে ঢুকিয়ে টানত···তার সামনের লোকটি অবিকল সেই রকম ভাবে ছুরি দিয়ে রুটি কাটল···ঠিক তেমনি প্রত্যেক রুটিটা সমান চার টুকরো করল··· স্বপ্নের মধ্যে আন্না আরো ভীত, আরো বিহ্বল হয়ে উঠল···একি ভয়ঙ্কর জাগর স্বপ্ন···

এত দিন সে তার স্বেচ্ছাকৃত নির্জ্জনতার মধ্যে নিজের হাতে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়ে তুলেছিল···আজ সহসা এই লোকটি সে-প্রাচীর ভেঙ্গে তার নিভৃত আত্ম-প্রতারণার মূলে আঘাত করেছে, তার অশ্রুজলে, তার আকুতিতে, তার উত্তপ্ত দৃষ্টিতে, সে সহসা জাগিয়ে তুলেছে তার মধ্যে, জীবনের আকাঙ্ক্ষা···প্রাণের ক্ষুধা ···এনে দিয়েছে অকস্মাৎ আলোড়ন...যুক্তি দিয়ে যা এতদিন ধরে সে দূরে সরিয়ে রেখেছিল···যুক্তিহীন প্রাণের মুক্তি···নিজের মনে আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে সে কখন নিজের মনে ভাবতেও ভুলে যেতে লাগল···ভাবার চেয়ে সেই চকিত ক্ষণে সে দেখে, মন যেন তার চাইছে বিশ্বাস করে নিতে···

—কাল সোমবার না? কালই বেরুব একটা চাকরীর সন্ধানে···

আন্নার মনে কেন যেন বলে উঠল, তা হলে তো বাঁচি, রোজ কারখানায় এ দুর্ব্বল দেহকে নিয়ে আর যে যেতে পারি না···কিন্তু···

হঠাৎ সে চীৎকার করে বলে উঠল, কিন্তু কেন তুমি আমাকে বোঝাতে চাইছ যে তুমি আমার স্বামী? কেন, কেন?

—শোন···শোন···আন্না!

—না···না···তুমি জান না···তাকে আমি কখনো ভুলতে পারি না···তাকে ভুলতে পারি না···

তীব্র ঈর্ষার কশাঘাতে কার্লের মন দুলে উঠল··· সেই অনুপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে, সে বুঝল, তাকে

রীতিমত সংগ্রাম করে জিততে হবে···এই কিছুক্ষণ আগে যে নারীকে মনে হয়েছে যে জয় করেছি, যদি তাকে হারাতে হয়···না, না···কার্ল প্রকাশ্য ভাবে মিথ্যার আশ্রয় গহণ করল···তাকে পেতেই হবে··· সামনের প্লেটটা হাত দিয়ে একটু সরিয়ে রেখে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে কার্ল ঘরটার চারিদিকে একবার দেখে নিল···

—একি জানলার পর্দাগুলো! নতুন কিনেছ, না?

তোমাতে আর আমাতে লাজারাসের দোকান থেকে নক্সা-ওয়ালা যে হলদে পর্দাগুলো এনেছিলাম···মনে আছে, বুড়ো লাজারাস চশমা তুলে বলেছিল, যাক্, আমিই না হয় দু'পয়সা ঠকলাম···মনে পড়ছে?

—হাঁ···কিন্তু···

—মনে আছে, মাসকাবারী যখন শোধ করব বললুম, তখন···

—এই চার বছর ধরে আমি শোধ করেছি···

কার্ল কপাল থেকে আঙুল দিয়ে ঘাম মুছে আন্নার দিকে চাইল···

রিচার্ডের ছিল এটা একটা মুদ্রা

—যা হবার হয়ে গিয়েছে, আন্না···আর ধার নয়··· নতুন করে আমরা আবার আরম্ভ করব···আস্তে আস্তে আবার আমরা আমাদের নীড় গড়ে তুলব···আন্না···মুখ তোল···চেয়ে দেখ আন্না···

আন্না তেমনি মাথা নীচু করে মাটির দিকে চেয়ে রইল···কার্ল আস্তে আস্তে তার কাছে গিয়ে, ধীরে, অতি ধীরে, তার মাথার চুলের ওপর হাত বোলাতে লাগল···কার্ল স্পষ্ট অনুভব করল যে, আন্নার দেহ-লতা কাঁপতে কাঁপতে ক্রমশ স্থির নিশ্চল হয়ে গেল

কি মনে করে আন্না চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল··· তার দেহের রেখা তখন যেন একটু কোমল হয়ে এসেছে···সে কি তা বুঝেছিল? অসহায় কাঁপন যেন ছন্দোবদ্ধ দোলায় পরিণত হয়ে আসছিল...কার্ল কি তা লক্ষ্য করেছিল?

আপনার মনে সে টেবিলটা পরিষ্কার করতে লাগল···

ঘরের এক কোণে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে কার্ল তাই দেখছিল।

কার্লের সমস্ত মন তখন দেহের প্রান্তে এসে কাঁপছিল···যদি একটা ভুল হয়ে যায়, যদি কোন বেসুরো তার বেজে ওঠে · বিষাক্ত তরবারির মত তা সেই মুহূর্তেই চিরকালের মত তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেবে···

কার্ল সর্ব-ইন্দ্রিয় দিয়ে আন্নাকে লক্ষ্য করছিল··· টেবিল এমন কিছু আগোছালো ছিল না যে তাকে অমন করে গোছাতে হবে···সে তো কোন কথা বলে নি···অথবা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে কোনও শব্দ করে নি···তবুও কাজ করতে করতে হঠাৎ চোখ তুলে সে মাঝে মাঝে কার্লকে দেখছিল···টেবিলের কাজ হয়ে গেলে, সে সটান জানালার কাছে চলে এল··· একবার কি মনে করে পর্দাটা নামিয়ে দিল···আবার তক্ষুণি পর্দাটা তুলে দিল···

কে যেন আশার বাণী কার্লের কানে কানে বলে গেল···দেখছ না···সে তো চেষ্টা করছে···নিজেকে মানিয়ে নেবার জন্যে···কার্ল চুপ করে আর থাকতে না পেরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগল···আ[illegible] উত্তর না দেবার অনেক রকম চেষ্টা করে হঠাৎ কথ[illegible] সব প্রশ্নেরই অনর্গল উত্তর দিয়ে যেতে লাগল··· কোথায় এখন কাজ করে, কত মাইনে পায়···দিনে ক[illegible] ঘণ্টা কাজ করতে হয়···ইত্যাদি···ইত্যাদি···

কিন্তু প্রশ্নের তো একটা শেষ আছে! হঠা[illegible] *কার্লের সব প্রশ্ন যেন ছুটতে ছুটতে এসে হাঁফি[illegible] অচেতন হয়ে পড়ে গেল···*

আন্নারও আর কোন কাজ ছিল না। প্রশ্নের উত্তর দেবার সময়, একটা না একটা কাজকে আশ্রয় করে সে উত্তর দিয়ে এসেছে ··আহত ভগ্নজানু মানুষ যেমন ভর দিয়ে চলবার জন্যে একটা কিছু অবলম্বন চায়!

আন্না, মনে মনে জানে, এবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়া···সারা দিনের ক্লান্তির ক্ষণিক বিরাম···কিন্তু···

বিছানায় না গিয়ে সে দেয়ালে অঙ্গ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল···চুপচাপ···

দুজনেই প্রতিমুহূর্তে বুঝছিল যে, এভাবে দুজনে আর বেশীক্ষণ নীরবে থাকা যায় না ··নীরবতা যেন আঘাত করছে···অসহ্য নীরবতা···মূঢ় নীরবতা···

হঠাৎ কার্ল বলে উঠল···জান গো আন্না···

ঠিক যে-ভাবে বিছানায় যাবার সময় তার স্বামী তাকে ডাকত, জান···আমার কাছে সবশুদ্ধ পঁয়ত্রিশটা পেনিং, [মুদ্রা] আছে···

আন্না কি তা জানতে চেয়েছিল? না তো!

তেমনি দেয়ালে পিঠ ঠেসান দিয়ে আন্না নীরবে আঙুল তুলে ইঙ্গিত করল, ঐ বিছানা···ইচ্ছে করলে শুতে পারেন!

তারপর বিছানাটাকে একবার ভাল করে দেখে নিয়ে তাড়াতাড়ি ড্রয়ার টেনে একটা পরিষ্কার চাদর বার করল···বিছানার ময়লা চাদরটা টেনে খাটের তলা[illegible]

ফেলে দিল…বালিশের ওয়াড়গুলো বদলিয়ে দিল… বহুদিন কোন পুরুষের জন্যে সে শয্যা প্রস্তুত করে নি।

তারপর আবার তেমনি দেয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড়াল…

কার্ল দেখল, আন্নার মুখে আবার ভয়ের মেঘ…

ধীরে ধীরে আলোর কাছে উঠে গিয়ে কার্ল বলে, আলো নিবিয়ে দিই!

আন্না কোন উত্তর দিল না।

কার্ল আলো নিবিয়ে দিল…ঘর অন্ধকার হয়ে গেল…সে অন্ধকারে শুধু শোনা যেত লাগল, দুটি প্রাণীর বক্ষ-স্পন্দনের শব্দ!

নীরবে কার্ল শোবার জন্যে গায়ের জীর্ণ মলিন কোটটা খুলে ফেলল…অন্ধকারে তার কান আছে… আন্নার দিকে সেখান থেকে কোন শব্দ আসে কি না! ধীরে ধীরে কার্ল বিছানায় গিয়ে গা এলিয়ে দিল, আন্না কি করছ?

কোন উত্তর নেই।

—আন্না, তুমি কি শুয়েছ?

কোন উত্তর নেই।

সে আবার জিজ্ঞাসা করে, আন্না, তুমি কি শুয়েছ?

—হাঁ!

সমস্ত শরীর পাথর করে আন্না বিছানায় গিয়ে শুয়েছে…কিন্তু চোখ বুঁজতে পারে নি…

কার্ল সেই অন্ধকারে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল, দুটি বড় বড় চোখ চেয়ে আছে…সে-দৃষ্টির কি অর্থ?

বাইরে থেকে তখন ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত শহরের মথিত আর্ত্তনাদ, দমকা হাওয়ার মত, মাঝে মাঝে ঘরে এসে ঢুকে পড়ছিল…তারি উত্তপ্ত সশব্দতায় ঘরের সেই তুহিন-নীরবতা যেন গলে অন্ধকারকে আরো গাঢ় করে তুলছিল…

পাছে কোন শব্দ করলে, ধরা পড়ে যেতে হয়, সেই ভয়ে আন্না কাঠ হয়ে বিছানায় শুয়েছিল…শব্দ আজ কি বিরাট অর্থময়! ভাষাহীন নিরর্থক শব্দ…হয়ত পাশ ফিরতে গিয়ে খাটের একটু শব্দ…তাও হয়ত অন্তরঙ্গতার সম্ভাবনা বহন করতে পারে…

কার্ল সেই শব্দটুকুর জন্যে সর্ব্ব দেহ দিয়ে যেন শুনছিল…

কিন্তু নিজেরই অজ্ঞাতে কার্ল ঘুমিয়ে পড়ল…আন্না যখন বুঝতে পারল যে, তার ঘরের সেই রাত্রির সঙ্গীটি যখন স্পষ্ট নাক ডাকাচ্ছে…তখন সে আস্তে আস্তে একবার পাশ ফিরল…

কত দিন…কত সপ্তাহ…কার্ল ভাল করে ঘুমোয় নি…সুন্দরী নারীর নিজে হাতে পাতা শুভ্রকোমল শয্যা …কারাবাসক্লান্ত মাংসপেশীকে যাদুমন্ত্রের স্পর্শে ঘুম পাড়িয়ে দিল…কোথায় দিগ্‌দিগন্ত জোড়া শূন্য মাঠ… অজানা সব বুনো পথ…পাহাড় আর পাথরে বন্ধুর দেশ… দীর্ঘ দুর্ভেদ্য কানন…বরফ-জমা আঁকা বাকা-নদী…ঘুমের মধ্যে মগ্ন চৈতন্যের পটে টুকরো টুকরো আলোক-চিত্রের মত তখন ভেসে ভেসে চলেছে…তার মধ্যে হঠাৎ দেখা গেল, তার বালককাল…বহু বার যার স্বপ্ন তার মন দেখে এসেছে…দশ বছরের একটি ফুটফুটে ছেলে, তার বাবার হাত ধরে শহরের রাস্তা দিয়ে চলেছে…শহর ছাড়িয়ে মাঠ ছাড়িয়ে…পাহাড়ে পথে বুনো ফল কুড়িয়ে কুড়িয়ে নেচে নেচে, চলেছে…সেখান থেকে ফেরবার সময় গাঁয়ের সরাইখানায় তারা এসে থামল…একটা বড় গাছের তলায় তারা বসল…আশে-পাশে কারা সব আসছে, চলে যাচ্ছে…

কার্ল শুনতে পেল তার বাবা সরাইখানার মালিকের মেয়ের সঙ্গে ঠাট্টা করে কি যেন বললেন…কার্ল চমকে উঠল…কার্লের বাবা উঠে মেয়েটিকে হাত ধরে টানছে…

কার্ল চীৎকার করে উঠল, ওর গায়ে তুমি হাত দিও না…ও যে আন্না!

তাড়াতাড়ি তিনি হাতটা নিলেন সরিয়ে…

তারপর সেই সরাইওয়ালার কন্যা কার্লের কাছে এসে, তার কাঁধের ওপর হাত রেখে…এক বাটি টাটকা গরম দুধ তার মুখের সামনে ধরল…

যখন তার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল, এক পরম পরিতৃপ্তিতে তার দেহ-মন দেখে ভরে গিয়েছে…

আন্না তখনো ঘুমুচ্ছে…

সহসা এক অনির্ব্বচনীয় মহা-দায়িত্বের প্রেরণায় সে উদ্বেল হয়ে উঠল…স্তব্ধ-বিস্ময়ে সে শুনতে লাগল… নিদ্রিতা নারীর তনু-স্পন্দিত দেহের রহস্য…

অসীম কৃতজ্ঞতায় আপনা থেকে তার মাথা নত হয়ে গেল।

তৃতীয় অধ্যায়

পরের দিন ঘুম ভেঙ্গে চোখ খুলতেই কার্ল দেখে, সকাল বেলাকার রোদে ঘর ভরে গিয়েছে…ঘরের কোণে গ্যাসের উনুনে কেটলীতে জল গরম হচ্ছিল…তার একটা একঘেয়ে শব্দ উঠছে…পাশ না ফিরে সে মন দিয়ে সব যেন একবার অনুভব করে নিতে চাইছিল…

কিছুক্ষণ পরে একটু পাশ ফিরে দেখে, আন্নার বিছানা খালি, আন্না কখন উঠে চলে গিয়েছে···বালিশে, বিছানায়, ওল্টানো লেপে তখনো প্রমাণ রয়েছে, রাত্রিতে সে ঐখানে শুয়ে ঘুমিয়েছিল···আন্না···তার সঙ্গে, এক ঘরে, রাত্রিতে, ঐখানে শুয়ে ঘুমিয়েছিল ··

এমন সময় বাইরে থেকে কথা কানে এল···

—চারটে ? চারটে তো তুমি কোন দিন নাও না ···রোজ তো তুটো করে দিয়ে যাই !

কার্ল একটু ঘাড় বেঁকিয়ে দেখল, রুটিওয়ালা তার রুটির ঝুড়ির ভেতর থেকে আর তুখানা রুটি বার করে আন্নার হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তাহলে এবার থেকে চারখানা করে দিতে হবে ?

কার্ল সর্ব্বমনপ্রাণ দিয়ে শুনতে চেষ্টা করল, আন্না কি উত্তর দেয় ! কিন্তু মুখ ফুটে আন্না কোন জবাবই দিল না।

ঘাড় তুলে কার্ল কিন্তু দেখতে পেল, ঘসা কুঙ্কুমের মত লজ্জার লাল রঙে আন্নার মুখ ছেয়ে গিয়েছে··· পরিষ্কার, মুক্তোর মত সাজানো দাঁতগুলো, ঈষৎ-বিভিন্ন ঠোঁটের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে···দাঁতগুলোও যেন চাপা হাসি হাসছে···

রাত্রিতে সে ভাল করে দেখতে পায়নি, সকালে তাই ঘুমভাঙা চোখে সে একদৃষ্টিতে আন্নাকে দেখছিল, তুধের মত গায়ের রঙ···মাথার চুলগুলো যেন খুব পাতলা লাল রঙে ছোপানো···কি ঘন··· নাকের তুদিকে, চোখের তলায়···গুটি কয়েক করে ছোট ছোট দাগ···

কার্ড-বক্স কারখানায় তুবেলা নানা রকম হাতের কাজ করতে করতে, হাতের আঙুল থেকে সমস্ত গড়নটা সজীব হয়ে গিয়েছে···বিদ্যুৎবস্তু···যেন কোন সম্ভ্রান্ত নারীর মৃণাল-হস্ত···

পায়ের দিকে নজর পড়তে, কার্ল দেখল, কল্পনায় সে যে তুটি ছোট ছোট পা দেখতে পেত···সেই পা··· আজ আন্না পুরোনো স্লিপারটা না পরে, তার সব চেয়ে ভাল স্লিপারটি পরেছে···গায়ে গ্রীষ্মকালের দরুণ পাতলা একটি ফ্রক পরেছে···তার ভেতর থেকে তার দেহের সীমান্ত রেখা সূর্য্য-কিরণে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে···দেখা যাচ্ছে নগ্নতার স্বাভাবিক নিষ্কলুষতা···

বিছানা ছেড়ে সে উনুনের কাছে যখন উঠে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন রুটি হাতে করে আন্না ঘরে ঢুকছে···

পেছন না ফিরেও সে বুঝতে পেরেছে যে আন্না ঘরে এসেছে···উনুনটা জায়গায় জায়গায় ভেঙ্গে গিয়েছিল··· আন্নাকে শুনিয়ে, সে আপনার মনে বলে উঠল, যুদ্ধে যাবার আগে, এটাকে ঠিক করে যাব ভেবেছিলাম···

কথাটা সে কিন্তু যত জোরে বলবে ভেবেছিল, ততটা জোরে বলতে পারল না···আন্না ঘরে এসেছে···এই কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে তার কণ্ঠস্বর কেমন করে যেন নরম হয়ে গেল···

কার্ল সোজা আন্নার দিকে ফিরে চাইল। নারী ···মহিমময়ী···কার্লের মনে হ'ল যেন আন্না প্রভাতের সমস্ত ফুলের সুরভি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে···যেন তার সর্ব্ব-অঙ্গে ফুল···

আন্না দাঁড়িয়ে আছে···খোলা দরজা দিয়ে সূর্য্যের আলো তার পিঠে এসে পড়েছে···সে দাঁড়িয়ে আছে··· ভোর বেলাকার সদ্য-দোহন-করা তুধের মত তাজা···

হঠাৎ তার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে কার্ল নিজের সার্টের বোতামটা লাগিয়ে দিল···বুকের কাছটায় সার্টটার বোতাম খোলা ছিল···তার ভেতর দিয়ে রোদে-পোড়া কেশবহুল বুকটা দেখা যাচ্ছিল···

সেই সার্ট···একটি ট্রাউজার ··আর বেল্ট···কয়েক দিন আগে, পথে আসতে আসতে, এক নদী পড়ে, সেই নদীতে সার্ট আর ট্রাউজার ধুয়ে পরিষ্কার করে নেয়···

সেই সময় নিজের দেহও সেই নদীর জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে নেয়···কিন্তু তবুও তার গায়ে লেগেছিল, দূর পথের গন্ধ···অজানা নদী···অজানা অরণ্যের গন্ধ··· দূর পথের একটা আলাদা গন্ধ·· তাই নিয়ে সে আবার এসেছে সভ্যতার মধ্যে···যেখানে আছে শয্যা···আছে নারী···আছে আন্না—

কার্ল কতক্ষণ চেয়ে ছিল, তার আন্দাজ ছিল না··· হঠাৎ তার চমক ভেঙ্গে গেল···

সে শুনল, আন্না, তাকে অভিবাদন করছে, সু-প্রভাত···

তার দেহ, তার চলা, তার গায়ের রঙ, সেই সকাল বেলা···সকলের সঙ্গে যেন তার কণ্ঠস্বরের এক অপূর্ব্ব সঙ্গতি ছিল।

কার্ল কি উত্তরে বলেছিল, সুপ্রভাত ?

সে দেখল, আন্নার তু'হাত জোড়া···এক হাতে তুধের বাটি ··আর এক হাতে রুটি ··একটু নীচু হয়ে সে তুধের বাটিটা আগে রাখল···নীচু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার তুগ্ধশুভ্র দেহের অন্তরঙ্গতা যেন ঝলক দিয়ে উঠল···

অতি সন্তর্পণে সে টেবিলটা গোছাতে লাগল·· যেন কোন্ অন্তরঙ্গ বন্ধু নিমন্ত্রণে আসবে···এক ভাবে সাজিয়ে সন্তুষ্ট না হয়ে আর এক ভাবে সাজায়···দেখে ঠিক হ'ল কি না···

সে কি জানে, জানালায় দাঁড়িয়ে একজন পুরুষ অপলক দৃষ্টিতে তাকে দেখছে?

গত রাত্রির সেই আকস্মিক বিহ্বলতা, অনিশ্চয়তা দ্বন্দ্বের ছাপ, সকালে আর আন্নার মুখে ছিল না···এক রাত্রির মধ্যে যেন সে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়ে গিয়েছে ···ঘুমের মধ্যে যেন সে পেয়েছে আশ্বাস, যার জোরে সকালে সে এসে দাঁড়িয়েছে, নতুন জীবনের দরজায়··· তার সর্ব্ব-অঙ্গ বলছে, আমি প্রস্তুত···

আন্না ঘরের মধ্যে নড়ে-চড়ে, কাজ করে···কার্লের চোখ সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে···যেন তার নড়া-চড়ার সঙ্গে তার চোখের দৃষ্টি জীবন-মরণ-চুক্তিতে বাঁধা আছে···হঠাৎ কখন কাজ করতে করতে আন্না তার সামনে দিয়ে চলে যায়···কথা বলতে গিয়ে কার্ল কথা খুঁজে পায় না···

টেবিল তৈরী···আন্না কথা বলে টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ায়···চোখ তুলে কথা না বলে সে ডাকে··· কার্ল এগিয়ে আসে···

উন্মাদের মত সে আন্নাকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে···ঝড়ে যেমন অরণ্য কেঁপে ওঠে, সে আলিঙ্গনে আন্নার দেহ তেমনি ওঠে কেঁপে···আন্নার হাত দুটি সে নিজের কণ্ঠে নিজে তুলে নেয়···কাঁপতে কাঁপতে আন্না পাশের চেয়ারে বসে পড়ে, বলে, খেয়ে নাও আগে!

কার্লের মনে হয়, সেই তিনটি কথার মধ্যে রয়েছে আশ্বাস···

মাথা নীচু করে কার্লের জন্যে রুটীতে সে মাখন দেয়···একবার তার দিকে চোখ তুলে ডিসটা এগিয়ে দেয়—নিজে কিছু মুখে করতে পারে না···নিজের কোলের ওপর দুটি হাত রেখে, তারই দিকে চেয়ে থাকে···

—কি সুন্দর তোমার হাত দুটো···যেন রাজরাণীর হাত!

হঠাৎ বিব্রত হয়ে সে উঠে দাঁড়ায়···একেবারে জানালার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে··· চেয়েই থাকে···

কার্ল টেবিল ছেড়ে ধীরে ধীরে জানালার দিকে তার কাছে যায়···তখনো তার দেহে কাঁপছে আন্নার দেহ-কম্পনের প্রতিধ্বনি···ধীরে ধীরে দুই হাত দিয়ে সে জড়িয়ে ধরে আন্নার তনু-দেহকে···নির্ব্বাক্··· নিস্পন্দ···তারা দাঁড়িয়ে থাকে আলিঙ্গনবদ্ধ···

মাঝে মাঝে কার্ল চোখ তুলে যখন চায়, দেখে, বুকের কাছে, আন্নার দুটি পাতলা ঠোঁট কাঁপছে···বার বার সে নিজের ঠোঁট দিয়ে সেই কম্পমান ঠোঁট দুটিকে শান্ত করাতে চেষ্টা করে··· কিন্তু তবু কোন কথা কেউ বলে না···

দু'জনের দেহের মাঝখানে শুধু এক টুকরো ফ্রকের কাপড়ের ব্যবধান···ফ্রকটা যেন আন্নার দেহের সঙ্গে এঁটে রয়েছে···আস্তে আস্তে ফ্রকের বোতামে আঙুল নিয়ে খেলা করতে করতে সে বোতাম দেয় খুলে···

ক্ষীণ হাসি হেসে আন্না নিজের হাতে জানিয়ে দেয়, বোতাম আসলে আছে কাঁধের কাছে···বন্ধনহীন আবরণ আপনি যায় পড়ে···

সারা বিছানায় তখন রোদটা এসে পড়েছে···

কার্লের দৃষ্টি যায় খোলা দরজার দিকে···

দুজনে তেমনি ভাবে অগ্রসর হয়, দরজার দিকে···

কার্ল ভেতর থেকে দরজা দেয় বন্ধ করে···

সেই সঙ্গে অনুভব করে···এত দিন ধরে নির্জ্জনে যে প্রিয়তমার ধ্যান করে এসেছে···আজ তার পূর্ণ-সম্মতি ···তার দেহে বাণীহীন আবেদনে এলিয়ে পড়েছে···

চতুর্থ অধ্যায়

আন্না যে-বাড়ীতে একটা ছোট্ট ঘর নিয়ে বাস করতো, সেখানে এক জায়গায় সেই রকম আর দু'খানা বাড়ী ছিল, একই পাঁচিলের মধ্যে···কারখানার শ্রমিকদের কোয়ার্টার···সেই দু'খানা বাড়ীতে সেই সময় প্রায় একশো ঘর শ্রমিক বাস করত···

আগুন লাগলে সন্ত্রস্ত ভেড়ার দল যেমন গা-ঘেঁসা-ঘেঁসি করে এক জায়গায় জড় হয়ে পড়ে, তেমনি মহাযুদ্ধের অগ্নিকাণ্ডে তারা সবাই এক জায়গায় একই ভয়ে, একই ভাবনায়, একই দুঃখ-দৈন্য-লাঞ্ছনার মধ্যে গা-ঘেঁসাঘেঁসি করে বাস করত···তাদের সকলের ভাষা এক, ভৎর্সনা এক, মুখের চেহারাও এক হয়ে আসছিল···

হঠাৎ এ-ঘর সে-ঘর ও-ঘর থেকে ছোট ছোট শিশুর কান্না জেগে উঠত···বর্ষায় যেমন জলা থেকে ব্যাঙের ঘোঙানি জেগে ওঠে···কখন কখন তাদের বিভিন্ন শিশুকণ্ঠের কাতর কান্না একসঙ্গে একই সময়ে ঐক্যতান সঙ্গীতের মত বিরাট হয়ে উঠত···কয়েক মিনিট ধরে চলত শিশুকণ্ঠের কান্নার কোরাস···সারা দিন-রাতের মধ্যে এমন খুব কম সময় থাকত, যখন তাদের এই কান্না শোনা না যেত···

যেদিনকার কথা আমরা বলছি, সেদিনটা ছিল রবিবার···তাদের সেই কান্নার কোরাস ঠিক তেমনি

জমে উঠেছিল…তার সঙ্গে আবার মাউথ-অর্গান বাজছিল…

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে প্রায় প্রাপ্তবয়স্ক একটি মেয়ে তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে, গায়ের লেপটা ছুঁড়ে ফেলে দিল…জানালার কাছে একটা বাইসাইকেলের বেল্ লাগান ছিল…আঙুলের যত জোর ছিল, তাই দিয়ে সেটা বাজাতে লাগল…

দেখতে দেখতে নাইট-গাউন-পরা আর একটি মেয়ে তার সামনে আর একটা খোলা জানালায় এসে দাঁড়াল…তারও জানালার সঙ্গে একটা বেল্ লাগানো ছিল, সেটা টিপে ধরে, আর হাত টেলিফোন রেসিভারের মত করে, বলে উঠল, হাঁ বল, আমি এল্‌ফি কথা বলছি…

—গুড্-মর্ণিং এল্‌ফি…আমি আল্‌মা…রাত কেমন কাটল ?

—ওঃ, আলমা…তব্ ভাল…সকাল বেলা খবরটা নিলি !

এলফি আর আলমা…দুজনে খুব ভাব…সামনা-সামনি ঘর…জানালায় দাঁড়িয়ে তারা যে-যার ঘর থেকে যেন টেলিফোনে কথা বলছে…

—আজ, কি পরবি আলমা ? আমি ভাবছি, নীল রঙের পোষাকটা পরব !

—তা বেশ…আমি ভাই আজ সেই হলদে রঙের পোষাকটা পরব…

তাদের কথা শুনলে মনে হয়, তাদের যেন নানা রঙের নানা পোষাক আছে কিন্তু আসলে তা নয়… রবিবার বা উৎসবের দিনে পরবার মত তাদের একটি করেই পোষাক আছে…এলফির নীল…আলমার হলদে …মাঝে মাঝে অবশ্য তারা এ-ওর পোষাক বদল করে …এলফি পরে হলদে…আলমা পরে নীল…

এলফি বলে, আজ সন্ধ্যেয় ছবি দেখতে যাব কেমন ? উঃ…ওপরে কি ভয়ানক গোলমাল হচ্ছে…

ওপরে একটা ঘরে কে রেকর্ড বাজাচ্ছিল…মার্চের রেকর্ড…যে-সঙ্গীতের তালে তালে য়ুরোপের ঘর খালি করে ছেলেরা সব বেরিয়ে চলে গিয়েছে…

—না ভাই…অসম্ভব…এত গোলমালের মধ্যে ফোন করা…না…এখন কেটে দিচ্ছি…আবার পরে তোকে ডাকব'খন…কেমন ?

এলফি তার সাইকেলের বেল্‌টা টিপে দিল… রেকর্ডের চেঁচামিচি ছাপিয়ে উঠে হঠাৎ থেমে গেল… সঙ্গে সঙ্গে জানালা থেকে মেয়ে দুটি অদৃশ্য হয়ে গেল…

নীচে…সেই আবর্ত্তের যেন তলদেশে…সিমেন্টের প্রাঙ্গণের ওপর বসে একটা চার বছরের ছেলে… আকাশের দিকে মুখ তুলে আপনার মনে চেঁচিয়ে ছড়া কাটছিল…

"মেরীর হয়েছে একটা ছেলে,
কেউ জানে না তার বাপের নাম"

আন্নার ঘরের দরজার বাইরে থেকে কে যেন কড়া নাড়ল…আন্না ধড়মড়িয়ে বিছানা থেকে উঠতে যায় হাত দুটো বুকের ওপর চেপে…দরজার এক ফাঁক থেকে খবরের কাগজটা ঘরের ভেতর এসে পড়ে…

কার্ল বলে, কিন্তু তুমি বদলে গিয়েছ, আন্না… আগে তোমার কি রকম লজ্জা করত…

কার্ল ঘরের ওপরের দিকে চেয়ে যেন মনে করতে চেষ্টা করে, আন্না আগে কি রকম বেশী লজ্জিত হ'ত… তার সঙ্গে ছুঁতে বসতে আগে আরো যেন কি রকম কুণ্ঠিত হয়ে পড়ত…

—মনে নেই তোমার আন্না, তুমি তার কি জবাব-দিহি দিতে ? তোমার শোয়াও বদলে গিয়েছে অনেকখানি…

নিজের অজ্ঞাতে, ভেতর থেকে কিসের তাড়নায় আন্না কার্লের কাছ থেকে দূরে সরে আসতে চেষ্টা করে…অবাক হয়ে যায়, তার সম্বন্ধে এ অন্তরঙ্গ খবর এ জানল কি করে ? আন্না তো নিজের মনে ভাল করেই জানে, এ খবর সে নিজে ছাড়া জানতে পারে, মাত্র আর একজন…তবে ?

তার সমস্ত মুখটা অনির্ব্বচনীয় বিস্ময়ে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে…হঠাৎ যেন তার মন থেকে সব রকম ভাবনা-চিন্তা নিমেষে শূন্য হয়ে যায়…যেন কে খুব ধারালো ছুরি দিয়ে চিন্তার অংশটুকু তার দেহ-মন থেকে কেটে বাদ দিয়ে দিল…

—সম্পূর্ণ আলাদা !

এই বলে কার্ল আন্নাকে তার নিজের কাছে আবার টেনে নেয়…তার মাথাটা টেনে নিয়ে তার ডান কাঁধের ওপর রাখে…বলে, মনে পড়ে…ঠিক এই রকম…

সহসা তার মাথাটা যেন অবশ হয়ে পড়ে যায়… ঠিক এই ভাবে…এই শয্যায়…তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে…রিচার্ডের সঙ্গে তার শয্যাজীবন কেটে গিয়েছে…এ সংবাদ রিচার্ড ছাড়া জগতে আর কেউ জানে না, জানতে পারে না…অন্তরের অন্তস্তল থেকে ধীরে তার মুখ দিয়ে সেই পরিচিত প্রিয়নাম বেরিয়ে আসে, রিচার্ড ! তার সমস্ত চৈতন্য দিয়ে সে বিশ্বাস

করে নেয়···যার জন্যে সে এতদিন ধরে তপস্যার মতন করে অপেক্ষায় ছিল···সেই আজ রয়েছে তার পাশে··· সর্ব্ব-কুণ্ঠা-মুক্ত হয়ে তার মনের চোখের সামনে তখন অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ যেন এক ধারায় বিলুপ্ত হয়ে যায়···

তারপর কয়েক ঘণ্টা ধরে আন্না মনে মনে নিজের মনকে নানা ভাবে বোঝাতে চেয়েছে, কার্ল ই তার স্বামী। কতক্ষণ আপনার মনে সে এই ভাবে সংগ্রাম করেছে, তার কোন ধারণা ছিল না, তবে সে বুঝল··· জোর করে হয়ত কোন বিশ্বাস মনের ওপর ফেলে দেওয়া যায় না···কিন্তু মনের ভেতর থেকে নিজের অজ্ঞাতসারে যে-সব কথা ঠেলে ওপরে আসতে চায়, তাদের অন্তত বাধা দিয়ে রাখা যায়···

যখনি তার মনের ভেতর থেকে, এই কথাটা ভেসে উঠতে চায় যে, কার্ল তার স্বামী নয়···তখনি সে যেন স্পষ্ট বুঝতে পারে, দেহের ভেতরে, যেখানে লোকে বলে, মন আছে, সেখানে যেন কি আলোড়ন হয়ে গেল···দেহের সমস্ত শক্তি যেন সেই এক জায়গায় এসে জমা হ'ল···দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকে বাধা দেবার জন্যে যেমন করে অবরুদ্ধ নগরে শেষ-চেষ্টায় নাগরিকরা তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে সমবেত হয়···

কার্লের মনে সে-সব ভাবনার কোনও রেখা পর্য্যন্ত ছিল না···এত দিন ধরে নিজের নির্জনতার মধ্যে যে-নারীর ধ্যানমূর্ত্তি সে কল্পনা করে এসেছে, আজ বাস্তবে, সে তার পাশে, তার শয্যাসঙ্গিনী···তার প্রেমস্পর্শে কার্লের অন্য সব চেতনা বিলুপ্ত হয়ে গিয়াছে···তাই সে আপনার মনে আন্নাকে আদর করতে করতে যতই আনন্দে বিভোর হয়ে উঠেছিল···ততই তার মন খুঁজে খুঁজে এমন সব জিনিস বার করে আন্নার সামনে ধরছিল ···যাতে তার এবং সেই সঙ্গে আন্নার ভবিষ্যৎ জীবনের এমারৎ পাকা ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারে···

সে অর্থাৎ রিচার্ড···এই শহরে এসে মাত্র সপ্তাহের জন্যে কিফ এণ্ড গ্রাফের কারখানায় কাজ করে···কিন্তু সেখানকার অবস্থাগতিক দেখে সে বুঝেছে যে, সেখানে কাজ করা চলবে না···বড় কম মাইনে দেয়···

হঠাৎ কি একটা কথা মনে পড়ায়, আন্না শিউরে উঠল···কিন্তু সে-শিহরণ নব-জাগ্রত অনুরাগের ওপর ক্ষণিকের জন্যে যেন ভেসে আবার ডুবে গেল···

* * * *

দুপুর-বেলার খাওয়া-দাওয়ার জন্যে কিছু জিনিস-পত্র কেনা দরকার···আন্না ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়িতে পা দিতে তার মনে হ'ল, এ যেন অপর কোন বাড়ীর সিঁড়ি···পা দিয়ে সিঁড়িগুলো যেন অনুভব করতে করতে সে নামে না···এ তো সেই সিঁড়ি···তবে এমন বদলে গেল কেন? ঠিক তেমনি কত মেয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে, নামছে···তারাও যেন বদলে গিয়েছে···

বাড়ী ছেড়ে সে রাস্তায় এসে পড়ল···যে-ঘরে এতক্ষণ ছিল, সে-ঘরের হাওয়া এখানে নেই···সকাল বেলাকার রোদে পথ ঝিকমিক করছে···এ কি সেই পথ? পথের দুধারে ফুটপাথে, সেই লোকের ভিড়··· তার সামনে দিয়ে একটা বুড়ী মাথায় একটা মোট নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে চলে গেল...ছেলেরা পথে দৌড়চ্ছে ···চেঁচামিচি করছে···রাস্তার বাঁ দিক ঘেঁসে একটা মাংসের গাড়ী ক্যাঁচ-ক্যাচ শব্দ করে চলেছে···হাঁ··· মাংস তো তাকে কিনতে হবে···একজনের নয় দুজনের ···দুজনের কত লাগবে? মনে মনে সে হিসেব করে··· কিন্তু যদি কম হয়?

—না···তুমি আর সিকি পাউণ্ড বেশী দাও··· লোকটি কতটা খাবে কে জানে? লোকটি···নিশ্চয়ই লোকটি···অপরিচিত···অতিথি···কে সে? কোথা থেকে এল? কেনই বা এল? তার আর আন্নার মাঝখানে খরবেগে বয়ে চলেছে অপরিচয়ের নদী··· তার জন্যে আন্নারই বা এত ভাবনা কিসের? সে তো মাত্র এসেছে···একদিন! আর এই চার বছর··· যে, আন্না প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্ত···একলা···সম্পূর্ণ একলা কাটিয়েছে···মাত্র কাল, সে এসেছে···সম্পূর্ণ অপরিচিত···

—না···তুমি কিছু হাড়ও দাও—ব্রথের জন্যে!

আচ্ছা, কেন তার এমন হ'ল? কি করে কাল সকাল বেলা এমনটি ঘটল? সম্ভবই বা হ'ল কি করে? সম্পূর্ণ অজানা লোক···কি ভয়ঙ্কর! যেন তার চারদিকে সহসা দাবানল জ্বলে উঠেছে···এমনি আতঙ্কে আন্না চেয়ে ওঠে···

ফেরবার সময় পথে এক পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে আন্নার দেখা হ'ল···

—ময়দার আবার দর চড়ে গিয়েছে···কি হবে বল' তো, আন্না?

আন্না ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

—অবাক কাণ্ড! বাঁচব কি করে?

বন্ধুটি চলে যায়। আন্না বাড়ীর কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়ায়···ভয়ে! ঘরেতে লোকটা বসে আছে! মনে মনে কল্পনা করে, যদি ঘরে ঢুকে দেখে, কেউ নেই···আন্না যেন বাঁচে। ঘরে বসে আপনার মনে

একলা একলা সে ভেবে দেখবে···সে কাল ভাবেনি কেন ? ভাববার সময় সে তো পায়নি···ঘরে যদি সে থাকে, তাহলে ও তো আর ভাববার সময় পাবে না··· !

সেই মুহূর্ত্তে আন্নার যে মনোভাব হয়েছিল, প্রত্যেক নারীরই তা হয়···এডভেঞ্চার শেষ হয়ে গেলে, যখন সেই আকস্মিকতার আবেষ্টনের বাইরে, তারা পথে এসে দাঁড়ায়, পথের হাওয়া-বাতাস যখন গায়ে লাগে···তখন হঠাৎ তাদের সমস্ত উন্মাদনা হিম হয়ে যায়···তখন তারা যে কি করে এল, কেনই বা এল, তা ভেবে ঠিক করতে পারে না···

বাড়ীর ভেতর ঢুকে সে একতলার সিঁড়ির কাছে হঠাৎ থেমে গেল···এই এত বড় পৃথিবীর মধ্যে থেকে হঠাৎ একদিন কে একটা লোক বেরিয়ে এল···এল তো একেবারে আমার ঘরের ভেতরে এবং সকলের চেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার যে, আমার জীবনের সব অন্তরঙ্গ কথা তার জানা···যা আমি জানি না···আমার সম্বন্ধে সে-খবরও তার জানা···কাল রাত্তিরে শোবার সময়, উঃ কি করে আমার দ্বারা সম্ভব হ'ল, তাও তো বুঝতে পারছি···আমার দেহে কোথায় কি তিল আছে, তাও পর্য্যন্ত বলে দিল···কে সে ? আমি যে-সব কথা ভুলে গিয়েছিলাম, আমার জীবনের সেই সব কথা কি করে সে পারল স্মরণ করিয়ে দিতে ?

সিঁড়ির পৈঠার ওপর দাঁড়িয়ে আন্না একদৃষ্টিতে দেয়ালের চিত্রবিচিত্র কাচের শার্সিগুলোর দিকে চেয়ে ছিল···

নিজের ঘরে না গিয়ে, চারতলায় তার যে বন্ধুটি আছে, সেখানে যাবে ? সেখানে অন্তত সব পরিচিত··· চার বছর ধরে যেমন দেখে আসছে তেমনি সব ঠিক আছে···তাকে অন্তত সব কথা সে তো জানাতে পারে। হয়ত এ বিপদ থেকে কি করে উদ্ধার পাওয়া যায়, তার মতলব সে দিতে পারে! কিন্তু তার নিজের ঘরে সেই লোকটার জামা আলনায় ঝুলছে··· আবার সব গোলমাল হয়ে যায়···চিন্তার-ধারা হঠাৎ কিসের ধাক্কায় যেন অন্য পথে ছুটতে থাকে···

আচ্ছা···লোকটা ঘরে এতক্ষণ কি করছে ? যখন আন্না ঘরে ঢুকবে, লোকটাকে কোথায় দেখতে পাবে ? জানালার কাছে ? সত্যিই তো···জানালার পর্দাগুলো নতুন···পুরোনো পর্দা যখন তারা দুজনে কিনেছিল···সে আর রিচার্ড···তারপরই তো রিচার্ড যুদ্ধে চলে যায় এবং তার মৃত্যু-সংবাদ সামরিক বিভাগ থেকে তার কাছে আসে···নিশ্চয়ই···নিশ্চয়ই সে মরে গিয়েছে ! তাই যদি হয়, তবে কিসের আশ্বাসে সে এই চার বছর ধরে, এত লাঞ্ছনা, এত দৈন্য, এত প্রলোভনের মধ্যে অপেক্ষা করে ছিল ? কিন্তু···"খুব সস্তায় কিস্তি মারলেন"···পর্দাটা যখন তারা কেনে, সত্যিই তো দোকানদার, অক্ষরে অক্ষরে ঐ কথাগুলো বলে ছিল···এ লোকটা জানল কি করে ? আন্না তো ভুলে গিয়েছিল, দোকানীর চেহারাটা কি রকম···এই লোকটাই তো তা মনে করিয়ে দিল···হাঁ···ঠিক সেই চেহারা···

মাত্র কাল···মাত্র কাল যার সঙ্গে দেখা হয়েছে··· সে কি কখনো আমাকে এ ভাবে আন্না বলে ডাকতে পারে ?

আন্না বাইরে থেকে ঠেলতেই ঘরের দরজা খুলে গেল···তার মনের মধ্যে হঠাৎ কে যেন গর্জ্জন করে উঠল, জালিয়াৎ···লোকটা একটা আস্ত জালিয়াৎ··· আর তারই সঙ্গে কাল রাত্রিতে···দুর্ব্বার রাগ আর লজ্জা আর ক্ষোভে আন্নার বুক যেন ভেঙে খান্-খান্ হয়ে গেল···

চোখ তুলে চেয়ে দেখে···

লোকটা বিছানার চাদর বদলে ড্রয়ার থেকে একটা ফর্সা চাদর বিছানায় বিছিয়েছে···খাবার টেবিলটি অগোছালো ছিল···ঠিক রিচার্ড যেমন খাবার আগে টেবিলটা সাজাতো, তেমনি করে সাজিয়ে রেখেছে··· আন্না আলাদা যে বিছানায় শুয়েছিল, পুরুষ হস্তে সে বিছানাটিও ঝাড়াপোঁচা হয়েছে···সমস্ত ঘরটা যেন বদলে গিয়েছে···লোকটা ঝাঁটা নিয়ে মেঝে থেকে ময়লাগুলো দরজার কাছে এক জায়গায় জড় করে রাখছিল···

রিচার্ড নিত্য নিজের হাতে এটি করত···কর্ত্তব্য হিসেবে। কিন্তু আজ যে-করছে, তার মুখের চেহারা আলাদা···সে শুধু নিত্য-নৈমিত্তিক কোন কর্ত্তব্য করছে ···তা নয়···কিসের গোপন আনন্দে এই সামান্য কাজে তার সারা মুখখানি উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে···

আন্নার মনে এই কয়েক মুহূর্ত্ত আগে যে দুর্ব্বার চিত্তবিক্ষোভের তরঙ্গ এসেছিল···আনন্দ উজ্জ্বল-মুখ গৃহকর্ম্মরত সেই পুরুষটির মুখের দিকে চেয়ে তা তেমনি হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল···রাগ করতে আর যেন তার ইচ্ছা করল না···

মনে পড়ল, ভোর বেলা, লোকটি কি ভাবে তাকে আদর করেছিল···রিচার্ড ছাড়া সে-ভাবে আদর তাকে আর কেউ করতে পারে না···কারণ রিচার্ড ছাড়া আর কেই বা জানে, তার আনন্দের গোপন-কথাগুলি··· নিজের মনে যেন সে পরম-আশ্বাস পেল, কাল রাত্রিতে

যাকে সে দেহ দিয়েছে, সে তারই রিচার্ড···তারই স্বামী···

কিন্তু ঝাঁটা-হাতে ঐ যে লোকটি তার দিকে চেয়ে গোপনে গর্ব্বে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে···সে কি রিচার্ড? কখনই হতে পারে না···অতীত আর বর্ত্তমান, তার মনে এমন ভাবে রয়েছে, যে, সে ইচ্ছে করলেই, তাদের এক স্রোতে বহাতে পারে না।

বহুদিন পরে আজ যেন সে রিচার্ডকে অতি স্পষ্ট ভাবে তার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে···এমন স্পষ্ট ভাবে সে আর কোন দিন রিচার্ডকে দেখেনি···তার সামনে যে লোকটি রয়েছে, তার সঙ্গে রিচার্ডের কত পার্থক্য! সে কত শান্ত···কত মৃদু···কাল রাত্রিতে এ লোকটি যে-ভাবে তার সঙ্গে কথা বলেছে···রিচার্ড তার সঙ্গে সে ভঙ্গীতে কথা বলে নি···রিচার্ডকে সে জানে···রিচার্ড কখনো তীব্র হতে পারে না···আন্না ইতিমধ্যেই দেখেছে···এই লোকটি ইচ্ছা করলে, কি তীব্র হতে পারে!

তাহলে, কাল রাত্রিতে আন্না কি উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল? শয্যায় পাশাপাশি শুয়ে কি করে সে বিশ্বাস করল যে, যে তার দেহের দ্বারে ভিখারী, সে তার স্বামী···তার রিচার্ড? অথচ, এ সত্য তো সে অস্বীকার করতে পারে না যে, কাল যে-প্রেম-স্পর্শ সে পেয়েছিল, সে কোন নতুন লোকের হতে পারে না···যে প্রেমের অন্তরঙ্গতায় কাল রাত্রিতে সে আত্মসমর্পণ করেছিল, সে রিচার্ডের ছাড়া আর কারুর হতে পারে না···সেই তার স্পর্শ···সেই তার অনুভব···সেই তার বাহু···সেই তার চুম্বন···কই···তখন তো এক মুহূর্ত্তের জন্যেও মনে হয় নি যে, অপরিচিত···সুতরাং বেদনাদায়ক! এবং সেই মুহূর্ত্তে সে তার মনের অবচেতন-দেশে অবতরণ করে দেখল, সেখানেও তো বেদনাদায়ক বলে মনে হচ্ছে না! কাল রাত্রির অভিজ্ঞতা তাকে এত পীড়া দিত না··· এত গ্লানিজনক মনে হ'ত না···যদি··· তার সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে···সে দাবী না করত, যে, সে রিচার্ড!

—ওগো···কি করছ? ও-সব কাজ তোমাকে করতে হবে কেন?

ঠিক তার কথা···প্রত্যেকটা অক্ষর···তার প্রতিটি ভঙ্গী! আন্না চীৎকার করে উঠে বলে, কেন আপনি ও-রকম করে কথা বলছেন?

বিদ্যুৎ-ঝলকে আন্না তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে তেমনি তীব্র কণ্ঠে বলে উঠল, আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি···আপনি আর মুখ দিয়ে উচ্চারণ করবেন না যে, আপনি আমার স্বামী! শুনছেন? আর কখখনো বলবেন না! বলতে বলতে রাগে তার দু'চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে অশ্রুধারা···

—কিন্তু আজ সকাল বেলাতেই···তুমি নিজে বলেছ···আমি তোমার স্বামী···তুমি আমাকে রিচার্ড বলে ডেকেছ···তুমি···আমি অবিচ্ছেদ···আন্না!

—না···না···তা হতে পারে না···জীবনে তোমাকে এই আমি প্রথম দেখলাম···মাত্র কাল···আমার স্বামী··· তিনি হয়ত আজও জীবিত···

—বেশ···তাই যদি হয়···যদি সে ফিরেই আসে, তা হলে কি হবে? তুমি ভাবছ?

সহসা কার্লের চোখে এত দিনের পুঞ্জীভূত বন্যতা বিদ্যুৎ-ঝলকে জ্বলে উঠল···সে চীৎকার করে বলে উঠল···আমি জানতে চাই না···কে ফিরবে···কে ফিরবে না···আমি শুধু জানি···তুমি আর আমি···অবিচ্ছেদ!

হঠাৎ এতখানি জোরে কথা বলার ফলে, কথার শেষে সে যেন অবসন্ন হয়ে পড়ল। তার মুখের কঠিন রেখাগুলো হঠাৎ যেন সঙ্কুচিত হয়ে কোমল, কাতর হয়ে পড়ল। নীরবে, যেন আপনার মনে, সে বলে উঠল···ভবিতব্যতা···আন্না···এ হ'ল ভবিতব্যতা! মৃদু কণ্ঠস্বর বটে কিন্তু তার মধ্যে সন্দেহ নেই, অনিশ্চয়তা নেই!

সহসা আন্নার দিকে দৃষ্টি পড়তে, কার্ল দেখে, আন্না প্রায় হেসে ফেলবার মত মুখের ভাব করেছে। উত্তেজনার উদগ্র উন্মাদনায় সে ভুলে গিয়েছিল, সে নিজেকে কতখানি হাস্যকর করে তুলেছিল। বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে তখনো সে দাঁড়িয়ে ছিল··· এবং সে এত কাঁপছিল যে, একটা অবলম্বনের জন্যে কখন যে ঝাঁটাটা হাতের মুঠোতে ধরেছে, তা তার লক্ষ্যই ছিল না। তার আবেগের আন্তরিকতায় আন্না আবার যেন দমে গেল···যা এত কাছে···এবং যা এত একান্ত···তাকে অস্বীকার করতে তার মন পারল না···

রাগ, পরাজয় এবং নারীসুলভ আত্মসমর্পণের বাসনা, এই তিনটি জিনিসে মিলে তার মনে শুধু এই কথাই জাগিয়ে তুলেছিল···কেন তুমি, নিজের কল্পনায়, অবাস্তব একটা অতীতকে সৃষ্টি করে তোমার আমার মাঝখানে নিয়ে আসছ···কেন এই স্বামিত্বের দাবী?

দাবী! এই একটি কথার মধ্য দিয়ে তার মনে আবার দাবাগ্নি জ্বলে উঠল···এতো অত্যাচার! যা মিথ্যা, তার দাবীর এত বাড়াবাড়ি···নিজের অজ্ঞাতসারে সে নিজের মনের কথা মুখে বলে ফেলল, অসম্ভব!

জানালার কাছে বসে, সে প্লেটে তরকারি কেটে রাখছিল···ভেতরের অবরুদ্ধ রাগের একটা বাণীহীন

প্রকাশের জন্তে তার মন রীতিমত যাতনা পাচ্ছিল··· কোন কথা না বলে, তরকারির প্লেটটা অপ্রয়োজনীয় জোরে সরিয়ে রেখে, সেখান থেকে উঠে গিয়ে, আর একটা কি তরকারি নিয়ে অনাবশ্যক ভাবে তাকে টুকরো টুকরো করতে লাগল···

কিন্তু কেনই বা সে অকারণ রাগ দেখাতে যাচ্ছে? সে তো অনায়াসেই মনে করতে পারে, ঘরে কেউ নেই! তার কত কাজ বাকি! মন স্থির করে, সে উনুনের কাছে গেল···রান্নার জিনিসপত্রগুলো একটার পর একটা সাজাতে লাগল···কি একটা কাপড়ে লেগে গেল, ঝেড়ে-ফেলে দিল···কিন্তু তার নড়া-চড়া, হাব-ভাব দেখে, এ-কথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে সে একলা ঘরে যদি থাকত, তা হলে সে কখনই ও-রকম ভাবে নড়ত-চড়ত না···ঘরে যে আর একজন কেউ আছে, যার অস্তিত্ব সে অস্বীকার করতে চায়···সেই অস্বীকার করবার চেষ্টাব তার প্রত্যেক অঙ্গ-ভঙ্গীতে কিন্তু ফুটে উঠছিল যে, ঘরে আর একজন এমন লোক রয়েছে, যার অস্তিত্ব সে অস্বীকার করতে পারছে না···

কার্ল নীরবে দাঁড়িয়ে দেখছিল···এক হাত তার মাথার চুলের মধ্যে দিয়ে সে ভাবছিল···মনের মধ্যে তার চলেছিল তীব্র আলোড়ন···

—তা হলে···তুমি যদি অসম্ভবই ভাব···তা হলে, বেশ···আবার আমি ফিরে চললাম···পথে···

প্রায় তার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল কিন্তু বহু কষ্টে সে তা রোধ করে নিল···আবার পথে! পথের সমস্ত জ্বালা তখনো রক্তের কণায় কণায় মিশিয়ে আছে··· সেই নির্জন বন্দিজীবনের ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গতার বিভীষিকা!

মনে পড়ল, একদিন রিচার্ডকে সে বলেছিল··· আগে রোজ প্রশ্ন করতাম, এ কি করে সহ্য করব? রোজ প্রশ্ন করতাম···কিন্তু উত্তর তার কোনই পেতাম না···মাটির পোকা···মাটি না হলে যে থাকতে পারে না···তাকে বুকে হেঁটে পার হতে হবে লক্ষ লক্ষ মাইল মরুভূমি···বালি···আর বালি···এই হ'ল আমার জীবন!

সে জানত, তার মধ্যে যে বিপুল শক্তি আছে, তাতে একটা নয়, দশটা জীবন ভরিয়ে তোলা যায়। কিন্তু একা তা বয়ে বেড়ানো, অসম্ভব! একজন কেউ চাই···যাকে আঁকড়ে সে পারে থাকতে···নইলে···এই জীবনী-শক্তি—এই প্রচুর প্রাণ—এ তার বিধাতার সব চেয়ে বড় অভিশাপ!

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে সে বিছানায় শুয়ে পড়ল। সে চলে যেতে পারে, হয়ত চলে যাওয়াই উচিত, কিন্তু সে জানে, আবার তাকে ফিরে আসতে হবে কাল।

হঠাৎ শুনল তার দিকে মুখ না ফিরিয়ে আন্না বলছে, হয়ত কেন, নিশ্চয়ই আপনি জানেন, আমার স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ শুনে আমার বন্ধুদের আমি কি বলেছিলাম? বলুন···জানি · আমার বিয়ের আগে কি করতাম···কি খেতাম···বলুন···আপনি সবই জানেন···হয়ত···

—সে আর বলতে পারল না—রাগের মাথায় সে বলতে চাইলছিল যে, হয়ত আমি জন্মাবার আগেকার খবরও আপনি আমার জানতেন!

ধীরে, গম্ভীর ভাবে, শান্তকণ্ঠে কার্ল উত্তর দিল, না··· জানি না···তবে এটুকু জানি···বিয়ের আগে তুমি কি রকম মেয়ে ছিলে! খুব বেশী বায়না করতে না···কিছু না পেলেই যে হাত-পা ছুঁড়তে হবে এমন মেয়ে তুমি ছিলে না···মা যখন চুল আঁচড়ে দিতে দিতে অন্য পাঁচজনের সঙ্গে কথা বলতেন, তুমি ছট্‌ফট্ করতে না···তুমি জানতে, যা অন্য মেয়েরা জানে না · ধৈর্য্য ধরে থাকতে ·· তুমি হাসতে···কিন্তু জানতে না, কেন হাসছ··· এমনি ভাবে তুমি ক্রমশ বড় হলে···তোমার রঙ ধরল··· যেমন বড় হবার সময় আপেলে ধরে রঙ—

আন্নার দিকে না চেয়েই কার্ল বলে চলেছিল··· হঠাৎ মাথা তুলে আন্নার দিকে চেয়ে কাতর কণ্ঠে সে বলে উঠল, চিরকাল কামনা করে এসেছি···কি যেন কি একটা ঘটবে···তুমি হয়ত জান না, কামনা কাকে বলে, মন-প্রাণ দিয়ে কামনা···

আন্নার শৈশব কবে হারিয়ে গিয়েছিল, জীবনের উত্তাপে। আজ সহসা আর একজনের প্রেম-উদ্দীপ্ত কল্পনার মধ্য দিয়ে, জীবনে এই প্রথম সে দেখা পেল, তার শৈশবের! তাব কুমারী-দিনগুলি ··

কার্লের কথা শেষ হতে না হতে আন্না বলে উঠল, এ আপনি কি বলছেন?

কার্ল ভাবে, আমার কল্পনায় আমি আমার সত্যকে গড়ে নিয়েছি—সেই তো সত্য! সে বলে চলে, যখন তুমি তোমার স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ পেলে···অবশ্য···সে সংবাদটা মিথ্যে! আমি জানি তোমার মনে কি আঘাত লেগেছিল···কিন্তু আমি তো তোমাকে জানি···এটা যে তোমার ভাগ্যে হয়েছে, তা তুমি ভাবতেই পার নি··· এ যে হতে পারে, তা-ও তুমি ভাব না। যদি তুমি মনে করে থাক যে, সে-সংবাদ তুমি বিশ্বাস করেছ··· তা-ও ঠিক নয়···তুমি বিশ্বাস করতে পার না··· তারপর দিনের পর দিন চলে গিয়েছে···তার সঙ্গে তুমিও চলে এসেছ···দিনের পর দিন, কেন যে চলে

এসেছ···তা জান না···শুধু সেই দিন থেকে চলার আড়ালে আছে মনের নীরব আকুতি···হয়ত আসবে··· হয়ত কেউ আসবে···তাই না?

আন্নার নিজের মনের চেহারা এতদিন পরে সে যেন হঠাৎ তার সামনে দেখতে পেল···এমন করে কেউ তো আর তাকে দেখে নি! রিচার্ডের ব্যবহারে তার ওপর অসন্তুষ্ট হবার কিছু ছিল না···রিচার্ডও তাকে কোন দিন ভুল বোঝে নি···তবে···আজ যেন হঠাৎ আন্নার মনে হ'ল, রিচার্ড কি সত্যিই তাকে চিনত··· যেমন করে চিনতে চাইছে···রিচার্ডের নাম নিয়ে যে লোকটা এখন তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে! সংসারের খুঁটি-নাটি ছাড়া, মনে তো পড়ে না, তারা দুজনে আর কোন কথার আলোচনা করত কি না। মনে মনে আন্না তার জীবনের এই দুটি লোককে পাশাপাশি রেখে বিচার করে দেখবে বলে স্থির করতেই···হঠাৎ তার এক নিদারুণ লজ্জা এল···লোকটাকে জালিয়াৎ বলে এতখানি ঘেন্না করা কি তার ঠিক হয়েছিল? তার চেয়ে স্বতন্ত্র কিছুর পরিচয় সে কি দেয় নি?

এই সামান্য কয়েক ঘণ্টার অভিজ্ঞতা, আন্না নিজের মনে, আবার বিচার করে দেখতে লাগল। এই লোকটির চোখের চাউনিতে হঠাৎ তার নিজের মধ্যে যে-সব খালি জায়গায় লুকিয়ে পড়েছিল···যা সে নিজের কাছেও নিজে লুকিয়ে রেখেছিল, সেগুলো যেন চোখের সামনে স্পষ্ট অনাবৃত হয়ে উঠল···সামান্য একটা কথা, একটা দৃষ্টি, কণ্ঠস্বরের সামান্য একটা ভঙ্গী, যেন তীব্র জিজ্ঞাসার মত তার মনে এসে ঘা দিয়েছে·· কাল রাত থেকে সে যেন পরম বিস্ময়ে সহসা আবিষ্কার করেছে, তার নিজের মধ্যে, অজানা সব দেশ, বিরাট সব শূন্য মাঠ···ক্ষণে ক্ষণে তার মধ্যে কি এক নবতর চেতনা জেগে উঠেছে···কিন্তু স্বভাবতই সে বড় ধীরে চলে ·· দ্রুত লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে সে চলতে পারে না···

কোন দিন কোন মুহূর্তে সে নিজেকে প্রতারণা করে নি···তার প্রত্যেকটি কাজ, তার চলা-বসা, শোয়া-ওঠার সঙ্গে ছলনার কোন সম্পর্ক ছিল না···সেই মুহূর্তে তার স্পষ্ট মনে হ'ল যে, অতীতের সঙ্গে যেন তার জীবন ছিন্ন হয়ে গেল···যে-জীবন ছিল রিচার্ডের সঙ্গে বাঁধা···স-জীবন এতদিন পরে যেন খোলসের মত তাকে ছেড়ে পেছনে পড়ে গেল···

কিন্তু কার্ল জোর করে সে খোলস পেছন থেকে তুলে এনে, তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চায়···সে বলে, সে রিচার্ড···কিন্তু তখন আন্নার মন সে খোলসকে ফেলে দিয়েছে·· যতই কার্ল নিজেকে জাহির করতে যায়, যে সে রিচার্ড···আন্নার মন ততই বিরক্ত হয়ে ভাবে, যা মৃত, তা কেন জোর করে সে বয়ে বেড়াবে···যা পিছনের, তাকে আবার সামনে নিয়ে সে কি করে এগুবে···তাই সে কার্লের সমস্ত আবেদন তিক্ত ক্রোধে প্রত্যাখ্যান করল·· কিন্তু সে-প্রত্যাখ্যানের আড়ালে তার নব-জাগ্রত মন কেঁদে উঠল ··এতদিন পরে তার মনের মধ্যে যে সব শূন্য মাঠ তার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে, তা কি ভরাট হবে না? মিথ্যে আগাছা দিয়েই কি তা ভরাট করতে হবে? না··· সে তা পারে না···তার চেয়ে থাক্···শূন্য মাঠ দিগন্ত-সীমায় আকাশের দিকে চেয়ে···

ক্রমশ তার মনে হ'ল যেন তার মন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে আসছে···দুঃস্বপ্নে যেমন নিদ্রিত ব্যক্তি ভয় পায়, অথচ নড়তে-চড়তে পারে না, তেমনি এক মহা দুঃস্বপ্নে জাগ্রত অবস্থায় সে অনড় জড় হয়ে এল···

নিজেকে রিচার্ড বলে দাবী করে, কার্ল আন্নার অতীত জীবনকে শুধু যে জাগিয়ে তুলেছিল, তা নয়··· তার সামনে তাকে বিরাট শক্তিশালী করে তুলে ধরেছিল···যে-শক্তি প্রত্যাখ্যান হয়ে তাকেই আঘাত করল। কিন্তু কার্ল যে-মন নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিল, সে মন নিয়ে তার অন্য কিছু ভাবাও সম্ভব ছিল না।

যে-নারী একদিন আর এক পুরুষের সঙ্গে এতখানি অন্তরঙ্গ ভাবে জীবন যাপন করে এসেছে, সে কখনই তার আন্না হতে পারে না···তার আন্না আর সে···চিরকাল ধরে যে দুজনে দুজনকে পেয়ে এসেছে···সে তার মনের মধ্যে তাই এক অপরূপ মিথ্যাকে সৃষ্টি করে নিজেকে রিচার্ড বলে আন্নার অতীত জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছে...তার কাছে, সেই মিথ্যাই একমাত্র সত্য··· একমাত্র সত্য যে, সে আর আন্না অতীতের অবিচ্ছেদ জীবন কাটিয়ে এসেছে···আন্না বাস্তবে যে-অতীতকে ফেলে দিতে চায়, কার্লের কাছে সেইটেই মিথ্যে।

এমনি ভাবে, তাদের দুজনের মাঝখানে যতই দিন যেতে লাগল, ততই একটা অদৃশ্য প্রাচীর যেন রোজ উঁচু···একটু একটু করে, আরো, আরো উঁচু হয়ে উঠতে লাগল।

কার্ল সারা দিন বাইরে কাজের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। বিকেল হয়ে সন্ধ্যার পর যখন বাড়ী ফিরে আসে, তখন দেখে, তারই তৈরী বাধা পাথর থেকে পর্বত-প্রমাণ হয়ে তার রাত্রির পথকে আচ্ছন্ন করে আছে··· সে বাধাকে ঠেলে ফেলে দিতে গেলে, তার সত্তাই চলে যায়···কামনা থেকে কামনাই চলে যায়···

ক্রমশ তারা দুজনে একই ঘরে, একই আবেষ্টনীর মধ্যে বাস করতে করতে এমন এক জায়গায় এসে পড়ল, যেখানে তারা দুজনেই দেখে যে, ভেতর থেকে তাদের প্রাণের নির্ঝরিণী শুকিয়ে এসেছে···এমন কি দুটো কথা বলা···চোখ তুলে চেয়ে একবার দেখা··· একটা স্পর্শ···অসম্ভব !

ষষ্ঠ অধ্যায়

এক দিকে আন্না খুব সতর্ক হয়ে থাকত। কার্ল কখন ঘরে আসে, কখন ঘর থেকে বাইরে যায়, তা সে সকলের কাছ থেকে সংগোপন রাখতে চায়। তাই যাওয়া-আসা সম্পর্কে আন্না কার্লকে অতি সন্তর্পণে নড়া-চড়া করতে বাধ্য করেছিল। কার্ল যে রাত্রি বেলায় সেই ঘরে শোয়, এ কথা লুকোতে আন্নাকে প্রাণান্ত হ'তে হ'ত। তবু লুকোতে হ'ত।

আন্নার বন্ধু মেরী তার দিদির সঙ্গে সেই চত্বরেই আর এক বাড়ীর চারতলায় থাকতো। ছোট্ট একটি ঘর···কোন রকমে লোহার খাটখানি তাতে ধরে··· চেয়ার-টেবিল রাখবার জায়গা পর্য্যন্ত নেই···ঘরের দেয়ালের সঙ্গেই জলের কল···বিছানার ওপর বসেই কল সারতে হয়···

এক'দিন রবিবার বিকেল বেলা আন্না বন্ধুর ঘরে তার লোহার খাটের নীচের দিকে বসে আছে···মেরী খাটের আর এক পাশে বাইরে যাবার জন্যে সম্পূর্ণ নগ্নাবস্থায় পোষাক বদলাচ্ছিল···পাশের ঘরে মেরীর দিদির "মানুষটি" মেঝের ওপর শুয়ে তখনো ঘুমুচ্ছিল··· মেরীর দিদির স্বামী যুদ্ধে লড়াই করছিলেন···ওদের ঘরটা একটু বড়···কারণ, সেই ঘরে, আরো তিনটি প্রাণীকে থাকতে হয়···দিদির প্রথম দুই ছেলে, একজনের বয়স আট, আর একজনের নয়···এবং তৃতীয় প্রাণীটিও শিশু···দিদির মানুষটির দরুণ আর একটি ছেলে···প্রথম ছেলে-দুটি একটা ভাঙ্গা টানা-গাড়ী নিয়ে খেলা করছিল···

ছেলে দুটি চেষ্টায় ছিল কি করে পেরাম্বুলেটারটিকে রূপান্তরিত করে "ট্রাকে" পরিণত করা যায়। তার জন্যে তারা হাতুড়ি নিয়ে একে একে তার এক একটা অংশের ওপর তাদের ইঞ্জিনীয়ারিং প্রতিভার পরখ করছিল। সেই শব্দে লোকটির ঘুম ভেঙ্গে গেল··· চোখ চাইতে ছেলে দুটির সেই কাণ্ড দেখে চীৎকার করে উঠল···তার চীৎকারে ছেলে দুটির মা, কোথায় কাজ করছিল, ভিজে পোষাকে ঘরে ছুটে এল···সেই গোলমালে ঘুমন্ত শিশুটিও ঘুম ভেঙ্গে মাতৃস্তন্যের জন্যে তারস্বরে নিবেদন জানাতে লাগল···

"ছেলেটাকে একটু দেখতে পারো না"···ঝংকার দিয়ে তিনি বক্ষের বাম স্তন মুক্ত করে শিশুকে শান্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন···

—বলি···জন্ম তো দিতে পেরেছিল···

ব্যাপারটাকে ইচ্ছাকৃত বলা যায় না···জীবনের যে-সব ঘটনাকে এক্সিডেন্টের পর্য্যায়ে ফেলে মানব-মন নিশ্চিন্ত থাকে, মেরীর দিদির এই তৃতীয় শিশুটির আবির্ভাবও সেই এক্সিডেন্টের পর্য্যায়ে পড়ে···মহা-যুদ্ধের ফল···এর জন্যে ব্যক্তিবিশেষকে দায়ী করা চলে না···

শহরে তখন রীতিমত স্থানাভাব···ঘর-বাড়ী সব সামরিক বিভাগের দখলে···লোকটি বহুদিন পথে-ঘাটে দিন কাটিয়ে বহু চেষ্টায় মেরীর দিদির ঘরে একখানা খাট ভাড়া পায়। রাত্রি বেলায় সেই খাটে সে শুয়ে থাকত। মাঝখানে একটা টেবিল থাকত দুই খাটের মাঝখানে পার্টিশান। রাত্রি বেলায় ঘরে আলো জলত না···লোকটি দিনের বেলায় বাইরে হোটেলে খেত··· সেই পয়সাটা মেরীর দিদিকে দেওয়ার ফলে, মেরীর দিদি তাই থেকে তার খাদ্য এবং নিজের অসহায় শিশুদেরও খাদ্যের সংস্থান করতে লাগল· ক্রমশ দুটো খাটের মাঝখান থেকে টেবিলটা সরে গেল···

মেরীর ঘরে তখনে মেরীর পোষাক পরা শেষ হয় নি।

নীচের তলা থেকে তুমুল ঝগড়ার একট ঝাপটা ওপরে আসে। কে যেন তারস্বরে চীৎকার করছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আর একটি কণ্ঠও তেমনি চেঁচিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথমটি পুরুষের, দ্বিতীয়টি নারীর।

—আবার সুরু হয়েছে ওদের! প্রত্যেক দিন ঝগড়া করে মরবে···অথচ ছাড়াছাড়ি হবে না!

যে মেয়েটির কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল, তার অপরাধ সে আর একটি নতুন লোকের সন্ধান করেছে··· অন্তত পুরুষটির তাই বিশ্বাস। মেয়েটির যিনি আসল কর্তা···তার স্বামী···তিনি যুদ্ধে। তখন এই ধরণের ব্যাপার স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। বহু নারীকে এই পথ অবলম্বন করতে হয়েছিল। এবং এ সম্বন্ধে কেউ কিছু গোপন করবার চেষ্টা করত না। মেরী আন্নাকে তাই বলছিল, এই বাড়ী ক'খানায় দিনের পর দিন, সে নিজের চোখে যে সব কাণ্ড দেখেছে···লজ্জা আর ঘৃণা···অবসাদ আর অসুখ

…অসহ্য বেদনার সঙ্গে অসম্ভব করুণা…নিষ্ঠা…ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার অভিনয় চলেছে…প্রত্যেক ঘরে ঘরে যে বেদনা সইতে দেখেছি…তার কোন মানে হয় না…যে জঘন্য পাশবিকতা দেখেছি…তাকেও ধিক্কার করতে পারি না…

আন্না মনে মনে শঙ্কিত হয়ে ওঠে…মেরী কি জানে, এ অভিনয়ের মধ্যে তারো অংশ আছে?

মেরী বলে, স্বামী যুদ্ধে চলে গেল…ফিরবে কি আর ফিরবে না…কে একজন পুরুষ এসে দরজায় ঘা দিল… অমনি তাকে পাশে নিয়ে এসে বহাল করলাম…কোন্ মেয়ে না তা করছে?

আন্না ভেতরে ভেতরে শিউরে ওঠে।

নীচে আন্নার ঘরে, কার্ল বন্ধ দরজা-জানালার ভেতরে নীরবে কয়েদীর মত চুপ করে বসেছিল… কয়েদীর মত শিখেছিল, কি করে বন্ধ-ঘরে অপেক্ষা করে থাকতে হয়!

পাশের ঘর থেকে মেরীর দিদির কণ্ঠস্বর এবার আরো স্পষ্ট ভাবে শোনা যাচ্ছিল। তার স্বামীর খবর এসেছে, সে শীগ্‌গির ফিরে আসছে!

লোকটি বলে উঠল, যখন তোমার স্বামী বাড়ী ফিরে এসে এই সব দেখবে…তখন কি ভেবেছ, সে হেসে তোমাকে বুকে টেনে নেবে?

নীচে উঠোনে তখন মানুষের ভিড়…অর্দ্ধনগ্ন শিশুর দল হাতে, মুখে, গায়ে ময়লা…হাঁপানি রোগীর মত বাঁকা-পিঠ শুষ্ক-শীর্ণ মেয়ের দল…কারুর গায়ের পোষাক আস্ত নেই…পুরুষদেরও সেই দশা…চোখ দুটো যেন কোথায় গহ্বরে ঢুকে গিয়েছে…হঠাৎ তারা উঠোনে জটলা বেঁধে কি করছে?

নীচের ঘরে এক বুড়ো হাঁপানি রোগী ছিল…তার শ্বাস ওঠবার মতন হওয়ায় সকলে মিলে তাকে বাইরে হাওয়ায় টেনে নিয়ে রেখে দিয়ে এসেছে—জটলা করে তারা দেখছে, একজন তীরন্দাজ তীর ছোঁড়ার কায়দা দেখাচ্ছে…

হঠাৎ আল্‌মার জানালার সাইকেলের বেল্ সশব্দে বেজে উঠল। সামনের জানালায় এল্‌ফিকে দেখা গেল।

—ওরে আন্নার ঘরে সেই লোকটা আবার এসেছে …খাওয়া হয়েছে?

—হাঁ!

—কি খেলি আজ?

—দুটো শুক্‌নো মূলো!

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, তারা হাত-ধরাধরি করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে…

আল্‌মা যে উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলেছিল, তা ব্যর্থ গেল না। মেরী বিস্মিত হয়ে জানালার কাছে এসে মুখ বাড়িয়ে দেখে, আন্নার ঘরে খোলা জানালার পাশে কে একজন দাঁড়িয়ে আছে।

—হাঁ, আন্না! কে রে ও লোকটা…তোর ঘরে?

আন্না একটা যা-হোক কিছু উত্তর দিতে চেষ্টা করল …কিন্তু কি উত্তর দেবে ভেবে না পেয়ে সে নীরব হয়েই রইল। যতই সে নীরব হয়ে থাকে, ততই তার মনে হয়, এইমাত্র মেরী যে কথা বলছিল, তার নীরবতা তো তারি সমর্থন করছে…ভাবতে ভাবতে আন্না কোন কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। কোথায় যাবে? ঘরে! ঘরে নিশ্চয়ই কেউ অপেক্ষা করে আছে…আজ আর বাইরে থেকে ঘরে ঢুকতে ঘরটাকে খালি মনে হয় না…মনে হয় না নিরর্থক…

তার স্বামী কি সত্যই আজও জীবিত? লোকটা ঠিক তেমনি দাবী করে চলেছে যে, সে-ই তার স্বামী, তার রিচার্ড…এবং এমন ভাবে সে সেই দাবী করে চলেছে যে, বাইরের প্রমাণের দিক থেকে তাকে অগ্রাহ্য করবার কোন উপায় নেই। কিন্তু কেন সে বোকার মতন এই দাবী করে চলেছে? এ অন্যায় অভ্যাস সে কি বদলাতে পারে না? না…যেমন করেই হোক্…তার এ অভ্যাস থেকে তাকে ছাড়াতে হবে… তার সৃষ্টিকে ভেঙ্গে সে সৃষ্টি করবে…

নিশ্চয়ই…সে তাই করবে…কিন্তু যদি তার স্বামী এখনো না মরে থাকে? তাহলে? তাহলে কি করে সম্ভব হবে. না…হতে পারে না…তাহলে তা কখনই হতে পারে না… মনে মনে এতদিন ধরে যে ঘৃণা দিয়ে অন্য সব মেয়েকে সে দেখেছে এবং যার জোরে এতদিন ধরে সে নিজেকে নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ, স্বতন্ত্র রাখতে পেয়েছে সে কি এমনি তুচ্ছ জিনিস, যা আর একজন ভুলিয়ে কেড়ে নেবে? রিচার্ড তো তার মনে তেমনি রয়েছে…চোখ বুজলেই সে দেখতে পায়…তার সেই চোখ…সেই কাতর চাহনি…সেই তার দীর্ঘ সবল বাহু… যা একদিনের জন্যেও কোন-কিছু অন্যায় স্পর্শ করে নি …তার ওপর…কি অগাধ বিশ্বাসই না ছিল আন্নার ওপর…সে যখন ছিল…আন্না ছিল সম্পূর্ণ…ছিল স্বতন্ত্র …ছিল নিরাপদ…

ঘরে ঢুকে আন্না বলে, বেড়াতে যাব…ইচ্ছে করে তো…আসতে পারেন!

কার্ল বলে, যাব!

সেই সঙ্গে মাথা নত করে নিজের পোষাক যেন নিজে দু'চোখ দিয়ে তন্ন-তন্ন করে দেখে।

—আমার স্বামীর একটা শাদা কলারওয়ালা জামা আছে…পরতে পার…

—আমি চাই না…আমি কিছুই চাই না!

আন্না নিজের মনে বলে, না…তুমি আমাকে ছাড়া আর কিছুই চাও না…আমার স্বামীর কোন জিনিস তুমি নেবে না…শুধু আমার স্বামীর কাছ থেকে নেবে …আমাকে…

—তুমি জান, সে এখনো জীবিত…সেদিন তুমি নিজেই বলেছ…তবু তুমি আমাকেই স্ত্রী বলে চাও…

ঘাড় নেড়ে সে শুধু বলে, জীবিত কি মৃত…তাতে আমার কিছু যায়-আসে না…

তারপর পরম নিশ্চিন্ত ভাবে, যেন জগতে কোথাও কেউ তার কথায় কোন প্রতিবাদ করতে পারে না, এমন ভাবে সে বলে উঠল, ঐ যে পর্দাগুলো…মনে পড়ে যেদিন কেনা হয়েছিল…দোকানদারটার খোপটা কি রকম ছোট ছিল…তুমি কিছুতেই হাসি চেপে রাখতে পারছিলে না…তারপর তর্ক হ'ল…তার কপালে সেই দু'টো কালো দাগ নিয়ে তোমাকে ঘুরে এসে আমি দেখিয়ে দিলাম…

আন্নার সমস্ত শরীর যেন রাগে গর্-গর্ করে উঠল, আবার তার সেই অতীতকে ও-রকম করে টেনে এনে তার সামনে রাখা!

সে চীৎকার করে বলে উঠল, আমি জানতে চাই না…কোথা থেকে ঐ খবরটুকু তুমি সংগ্রহ করেছিলে …তবে…আমার ঘেন্না করে…তুমি যা করছ…তাতে ঘেন্নায় আমার শরীর জলে যায়!

কার্লের মুখ যেন ছাই-এর মত শাদা হয়ে গেল… যে অপরাধ করেনি…অপরাধের বোঝা যখন তার অসহায় স্কন্ধে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়…তখন তার যেমন মুখের অসহায় করুণ চেহারা হয় সহসা কার্লের সমস্ত মুখখানি তেমনি এক অসহায় বিবর্ণতায় ভরে গেল।

আন্না ঝড়ের মতন ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। কার্লও তার সঙ্গে চলল। পথে তারা দুজনে পাশাপাশি চলে। কারুরই মুখে কোন কথা নেই।

রবিবার বিকেল বেলায় যারা বেড়াতে বেরিয়েছিল …হঠাৎ তাদের চিরাভ্যস্ত একঘেয়েমীর মধ্যে তারা তাদের দুজনকে দেখে উল্লসিত হয়ে উঠল…চিরপরিচিত একঘেয়ে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে হঠাৎ একটা জীবন্ত নতুন কিছু দেখলে, চোখ যেমন আপনা থেকে জলে ওঠে… তেমনি তাদের দুটিকে পাশাপাশি দেখে, পথচারীদের চোখে এক সজীব কৌতুক জেগে উঠল…সে দৃষ্টি যেন বলছে, আহা, কি সুখী ওরা!

আন্না…নবীনা…নিজের তেজে সমুজ্জ্বল…তার পাশে কার্ল…দীর্ঘ, বলিষ্ঠ দেহ…রুক্ষ মূর্ত্তি…মাথায় একরাশ চুল…এলোমেলো…গায়ের সার্ট মলিন…ছিন্ন …সেই ছিন্ন আবরণের ভেতর থেকে দেখা যাচ্ছে, তার সজীব পরিপুষ্ট দেহ…পাতলা ছাইয়ের ভেতর জলন্ত অঙ্গারের মত…

তারা চলেছিল শহরের দিকে…এই প্রথম তারা দুজনে একসঙ্গে বাইরে বেরিয়েছে…এই দিনটির জন্যে কার্ল তিন মাস ধরে পাহাড়-পর্ব্বত, বন-জঙ্গল…কত নগর-গ্রাম…পায়ে হেঁটে এসেছে…তার পাশে গিয়ে দাঁড়াবে বলে…আজ সত্যিই সে চলেছে, পাশে তার কামনার ধন…আন্না…

মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে সে একটু পেছনে পড়ে যাচ্ছিল…হাঁটবার সময় আন্নাকে কেমন দেখায়, তাই দেখবার জন্যে। জনশূন্য সেই তেপান্তর মাঠে দিনের পর দিন ধ্যানমূর্ত্তিতে সে আন্নাকে যে-ভাবে দেখত, হঠাৎ এই জনাকীর্ণ শহরের পথে, সেই অপরাহ্নে, সেই অপরূপ ধ্যানমূর্ত্তি তার চোখের সামনে জেগে উঠল… দেহ-হীন এক অপরূপ নারী যেন জন্মান্তর পার হতে তার প্রিয়তমের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আসছে…সে আসছে…কার্ল অপেক্ষা করে থাকবে…সহস্র বর্ষ অপেক্ষা করে থাকবে…কিন্তু যখন দেখা পেল…এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করতে পারল না…

হঠাৎ একটা পথের বাঁকে এসে, আন্না মুখ ফিরিয়ে কার্লের দিকে চাইল…তার মুখে যেন কিসের আনন্দের আভাস…যেন কোন পরিচয়ের বাণী উচ্চারণের অপেক্ষায় মুখের রঙের সঙ্গে মিশিয়ে আছে…যেন বহুদিন আগে, ঠিক এইখানে…এমনি সময়ে… সে এমনি পেছন ফিরে দেখেছিল…হঠাৎ তার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল…তাই কি…

কার্ল বুঝল, আন্না কি বলতে চাইছিল। বুঝতে তার এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হ'ল না, কেন না ঐ এক চিন্তাকে কেন্দ্র করে তার মন দিবারাত্রি ঘুরে বেড়াচ্ছিল। স্মিতহাস্যে সে উত্তর দিল, হাঁ এইখানেই—

—তুমি বলতে চাও, এর আগে এখানে…তুমি আর আমি এসেছিলাম?

উত্তর দেবার আগেই কার্ল দেখল, তারা দুধারে গাছ-ভরা এক অপরূপ রাস্তায় এসে পড়েছে…শহরে ঢুকবার পথ…গাছ আর ছায়ায় ভরা অপরূপ বীথি… বহু দিন ধ্যান-নেত্রে কার্ল যেন এই ছায়াবীথিকেই

দেখেছে…দেখেছে…তার জন্যে আন্না অপেক্ষা করে আছে…তাই সে বলে, ঠিক এইখানে আর একবার তুমি এসেছিলে…এমনি সন্ধ্যা হয়ে আসছে…গাছে গাছে তখন এমনি ফুল ধরেছে…তুমি গাছের তলায় আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলে…

রিচার্ড কোন দিন তাকে এ কথা বলে নি। তবুও সে জানত, এটা সত্যি। সে দেখেছে, আন্নাকে এই গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকতে। সে দেখেছিল তার মনে …তাই সেই দেখা আজ সত্য হয়ে দেখা দিল তার কথায়।

আন্নার বাঁ দিক ঘেঁসে কার্ল চলেছিল। আন্নার মনে হ'ল, তার বাঁ দিকে সমস্ত দেহটার মধ্যে যে কি স্নিগ্ধ উত্তাপ সে অনুভব করছে…সে উত্তাপে যেন সব গলে যাচ্ছে…সামনের রূঢ় বাস্তবতা সে উত্তাপে গলে গলে যাচ্ছে…বাধা যা ছিল তা যেন দগ্ধ কর্পূরের মত উবে গেল…তার পরিবর্তে…মনের অচেতন-লোক থেকে বেরিয়ে এল…এত দিনের পুঞ্জীভূত লুক্কায়িত আমি…বহু পথ বালুর মধ্যে অদৃশ্য থেকে, হঠাৎ এইখানে যেন তাদের মনের দুটি ধারা আবার এক হয়ে তটে তটে পরিপূর্ণ ভাবে প্রবাহিত হয়ে চলল।

আন্নার মনে কোন ভাবনার বালাই ছিল না। ভাবা, বিশ্লেষণ করা, তারপর গ্রহণ করা…এ ধরণে আন্নার মন গঠিত হয় নি। তার মন সহজে যা অনুভব করত, সহজেই সে তা বিশ্বাস করত। এক অপূর্ব্ব আনন্দের অনুভূতিতে তখন তার মন ভরে উঠেছিল…তার সম্পূর্ণ স্বাদ নেবার জন্যে, তার মনের সেই আনন্দ-অনুভূতিকে বাইরে প্রকাশ করবার একটা নামের প্রয়োজন ছিল… সহজেই তার মন থেকে সেই নাম উচ্চারিত হয়ে এল, রিচার্ড!

কার্লের মনে যে প্রেম-চক্র সে নিজের হাতে গড়ে তুলছিল, তার শেষ-চক্রটুকু যেন আন্নাই সম্পূর্ণ করে দিল…সত্যিই…সেই তো রিচার্ড…আন্নার মন তো তাই বলল…তাই পরিপূর্ণ আত্মনিমগ্নতায় কার্ল উত্তর দিল, আমি তোমায় ভালবাসি!

সেই অনুভূতির রসে তাদের দুজনের পথ-চলা যেন একই ছন্দে বেজে উঠল!

—তা হলে, এবার বল, আন্না…একটি ছোট্ট শিশু …বল, তাকে চাও কি না?

আন্নার প্রেম-রক্ত অধর সন্ধ্যার বনকুসুমের মত যেন আপনা থেকে তার মধু-দ্বার খুলে দিল…চোখের পাতা ভারী হয়ে ক্রমশ বুঁজে এল…

সেই রক্ত-অধরে নিজের অধর রেখে কার্ল বার বার সেই প্রশ্ন করে…আন্না কোন উত্তর দিতে পারে না… তার অনুচ্চারিত উত্তর শুধু অধরের স্পন্দনে ধরা দেয়…

ততক্ষণ তারা সেই নগর-বীথিকার ভেতরে এসে পড়েছে…কার্ল পরিচিত দৃষ্টিতে চারিদিকে চায়…যেন বহুদিন আগে…এইখানে সে আর আন্না এসেছিল… তাদের সেদিনকার উপস্থিতি যেন বৃক্ষপল্লবে পল্লবে রয়ে গিয়েছে…

উদ্যানের জনবিরল অংশে এক বৃহৎ গাছের তলায় তারা দুজনে এসে বসল…এত কাছাকাছি…এত পরস্পর পরস্পরের কাছে…যেন ভবিতব্যতা আজ দুটি অন্তরের একান্ত চাওয়ার শক্তিতে পরাভূত হয়ে গিয়েছে …যেন তাদের মনের আকুতি দিয়ে তারা সেই পরম-ক্ষণে যে মুহূর্ত্তটি সৃষ্টি করেছে…তাতে জীবনের সব ভুল-ভ্রান্তি কোথায় তলিয়ে গিয়েছে…তার পরিবর্ত্তে আর এক নতুন জীবন জেগে উঠছে…যে-জীবনের আদিতেও তারা ঠিক এমনি ভাবে ছিল…যে-জীবনের পরিণতিও যেন সেই মুহূর্ত্তেই নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছিল…

এমন সময় কিছুদূরে আর এক গাছের তলায় এক শ্রমিক-পরিবার এসে বসল। স্বামি-স্ত্রী এবং সঙ্গে অনেকগুলি ছেলেপুলে…স্ত্রীটি সঙ্গে যে-সব খাদ্য নিয়ে এসেছিল, মোড়ক থেকে যেই সেগুলি খুলতে যাবে, অমনি নীড়ে আগত পক্ষী-মাতাকে ঘিরে ক্ষুধার্ত্ত পক্ষি-শাবকের মত ছেলের দল চেঁচামেচি করে উঠল…

সহসা তাদের চমক ভেঙ্গে গেল…সেই শিশু-কলরবে আবার বাস্তব জগৎ যেন ধাক্কা মেরে তাদের জাগিয়ে দিল…এতক্ষণ আন্না কিছু ভাববার অবকাশ পায় নি…বাইরের জগতের ধাক্কায় তার মনের অনুভূতি তলিয়ে গিয়ে আবার জেগে উঠল চিন্তা…কিন্তু এই বিপুল পৃথিবীর বিরাট জনতার ইতিহাসে লক্ষ জনের মধ্যে সে সৌভাগ্য একজনের মাত্র জীবনে দেখা দেয়… আজ তার জীবনে সে মহা সৌভাগ্য দেখা দিয়েছে… সে ভালবেসেছে…সেই আদিম অনিবার্য্য আবশ্যকীয়তা, যার জন্ম কোন্ অপরিজ্ঞাত নক্ষত্রলোকে কেহ জানে না, তাকে আজ সম্পূর্ণতার আয়ত্তে টেনে নিয়েছে…

সে শক্তি বিচার করে গ্রহণ করে না…চেয়ে দেখে না যে আকাঙ্ক্ষিত, তার স্বরূপ কি, তার চরিত্র কি, তার পরিবেশ কি…আপনাতে আপনি সে সম্পূর্ণ …সে আছে…তার কাছে তাই একমাত্র সত্য… জগতের সব চেয়ে গুরুভার জিনিসের চেয়ে যে গুরু… আবার সুরভির মত যে দেহহীন লঘু…পরমাণুর চেয়ে যা সূক্ষ্ম…আবার পৃথিবীর চেয়ে যা বিরাট…যা মানুষকে নিয়ে যেতে পারে আনন্দের তুঙ্গ-শৃঙ্গে…অথবা

তাকে ডুবিয়ে দিতে পারে বেদনার অতল সিন্ধুতলে··· সেই আদিম অমীমাংসিত রহস্য, লক্ষ নারীর অন্তর প্রত্যাখ্যান করে, আজ তারই উপবাস-শুদ্ধ অন্তরে রাজসমারোহে আবির্ভূত হয়েছে···আজ এই মুহূর্তে, তার চিন্তায়, তার ভাবনায়, তার অন্তরের অন্তরতম স্থলে, এমন কোন শক্তি নেই যে তাকে সে অস্বীকার করতে পারে···

সেই বাগানের এক কোণে ছিল সরকারী ব্যাণ্ডের জায়গা···রোজ আটটার সময় সেখানে ভ্রমণকারীদের চিত্তবিনোদনের জন্যে ব্যাণ্ড বাজে···এতক্ষণ তারা লক্ষ্য করে নি যে, সেই ব্যাণ্ড শোনবার জন্যে নিয়মিত শ্রোতার দল এসে উপস্থিত হয়ে গিয়েছে···আশে-পাশে চারদিকে লোকের ভিড়···কার্ল লক্ষ্য করে···তারা যেন তাদের দুজনের দিকে চেয়ে আছে···থাকুক ··তাদের দুজনের মিলনের নদী তখন তাদের অন্তরে এসে গভীর নীরবতায় মিলে গিয়েছে···তার প্রশান্তির মধ্যে তারা যেন মগ্ন হয়ে গিয়েছে···তাই, এই প্রকাশ্য আত্ম-পরিচয়ের প্রথম সঙ্কোচের হাত থেকে কার্ল যেন নিজেকে অনেকখানি মুক্ত বোধ করছিল···এমন কি, তার মনে এক গোপন গর্ব্ব উঁকি-ঝুকি দিয়ে উঠছিল··· এমন বরেণ্য নারীকে পাশে নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবার গর্ব্ব···সুন্দরী নারীকে জয় করার পুরুষের প্রাথমিক গর্ব্ব ···বাইরের জগতের ঘাত-প্রতিঘাতের অস্তিত্বের কাছে তখন বিলীন হয়ে গিয়েছিল। চারিদিকে সেই প্রাণের কোলাহলের মধ্যে, তারা দুটি প্রাণী, সকলের অজ্ঞাতে, নীরবে পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করবার এবং সেই সঙ্গে আপন করে পাপের সংগ্রামে উন্মত্ত হয়েছিল··· কখনো আহত হয়, আবার পরক্ষণেই একটি চাহনিতে, একটি স্পর্শে, সে আঘাতের অমৃত-প্রলেপ পায়···এই জয়···এই পরাজয়···এমনি ধারা সেই প্রাণের কোলা-হলের মধ্যে চলেছিল তাদের জয়-পরাজয়ের খেলা!

দূরে বেঞ্চিতে ক্রমশ লোক ভরে উঠল···একটা বুড়ো লোক একরাশ রঙীন বেলুন নিয়ে···এক বেঞ্চি থেকে আর এক বেঞ্চিতে যাতায়াত করে বেড়াচ্ছে···

তারা উঠে আবার যে-পথ দিয়ে এসেছিল, সেই পথে ফিরল···সমস্ত পথটা তাদের সদ্যোজাত চেতনায় তখনো ভিজে···চলতে যেন পায়ে-পায়ে তা লেগে যাচ্ছে···দুজনেই মনে মনে তা অনুভব করছিল···দুজনে চলেছে···অতি ধীর পাদক্ষেপে, নীরবে···তারা দু'জনেই জানে, তারা দু'জনের জন্যেই···

হঠাৎ আন্না ফিরে দাঁড়াল···বৃহৎ পাহাড়ের গায়ে বাধা পেয়ে ছোট্ট পার্ব্বত্য নদীটি যেন ভেঙ্গে পড়ল···এ যেন বড় অকস্মাৎ, বড় দ্রুত···কই, এখনো তো কিছুই মীমাংসিত হয় নি? তবে? অমীমাংসিত রহস্যের অন্ধকার মৃত্যু-অধিক বেদনায় তাকে ক্ষিপ্ত করে তোলে ···কেন এ আবরণ? কেন এ অন্ধকার? নিজের মধ্যে আবার চলে তোলপাড়···কোথা থেকে ঝড়ের মতন কি একটা যেন তার মনকে টেনে নিয়ে জোর করে বলাতে চায়, *বিশ্বাস কর, ঐ লোকটা যা বলছে, সব কিছু বিশ্বাস কর! অতীতে যা হয়ে গিয়েছে, সমস্ত মুছে ফেলে দাও!*

কখন তারা বাড়ীর সামনে এসে পড়েছে·· *দরজার গোড়ায় যে দুটো কুকুর ছিল, তারা যেন তাদের দেখে, সোহাগে এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ল*···এবার এলফির পরনে হলদে পোষাক···আলমার গায়ে নীল··· বেড়াবার সময় হ্রদের ধারে তারা বদলে নিয়েছে···

তারা সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। একটা লোক ওপর থেকে নামছিল! আন্নাকে দেখে, হঠাৎ থেমে লোকটি বলে, বরাৎ ভালো···আন্না ··সবুরে মেওয়া ফলে দেখছি ···কন্‌গ্রাচুলেশন্‌স!

লোকটি থামে না···সিঁড়ি দিয়ে নীচে চলে যায়।

আন্না ওপরে ওঠে···নীচে থেকে শুনতে পায়, মরা মানুষও ফিরে আসে···সচরাচর ঘটে না···তবে আশ্চর্য্য নয়···এমনো ঘটে!

সেই সঙ্গে শোনা যায়, এলফির চীৎকার, আমি কাল রাতে শুনেছি!

যে লোকটা আন্নার পাশ দিয়ে নীচে নেমে গেল, সে তখন একতলার সিঁড়ির মাঝামাঝি পৌঁছেছিল, জিজ্ঞাসা করল, কার কাছ থেকে শুনেছ?

আন্না শোনে, উত্তর আসে, মিসেস্ বশ-এর কাছ থেকে···

মিসেস্ বশ সেই বাড়ীগুলোর একটাতে থাকত··· সেই চারখানা বাড়ীর প্রত্যেক ঘরে যা-কিছু হয়, সে নাকি তার সবই জানতে পারে···এবং যার শোনবার দরকার, সে তার কাছ থেকে সবই শুনতে পায়।

আন্না ভাবে, তা হলে? সবই তো জানাজানি হয়ে গিয়েছে!

নিজের ঘরে না গিয়ে সে সোজা তার বন্ধু মেরীর ঘরে গিয়ে ওঠে। একেবারে মেরীর বুকে। মুখে মুখ রাখতে, দেখে, মেরীর মুখ চোখের জলে ভিজে···

মেরী বলে, আমাকেই তুই বলিস্ নি···আমি ছাড়া বাড়ী শুদ্ধ সবাই জানে···! আমার কাছ থেকে তুই গোপন করলি? রিচার্ড···রিচার্ড ফিরে এসেছে···

উঃ! কি ভয়ঙ্কর মেয়ে তুই…আমি এক্ষুণি তার সঙ্গে দেখা করব…

ঘর থেকে বেরিয়েই সিঁড়ি…অন্ধকার…

আন্না অস্ফুট স্বরে কি বলে…মেরী তা শোনে, কি শোনে না…নিজের অন্তরের আনন্দে সে বলে ওঠে, ও! আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে!

আন্নার মনও আজ আনন্দের ভারে নুয়ে পড়েছিল …হাঁ…আনন্দের ভারে…তার ভার যে কতখানি, আন্না তাই ঠিক করে উঠতে পারছিল না—

ঘরের সামনে এসে, ঠেলতেই দরজা খুলে গেল—অন্ধকার ঘর—তখনো আলো জ্বালা হয় নি…নীরবে সে আলো জ্বেলে দিল…

আন্না বলতে পারত, সেই আলোতে তাদের সামনে যে লোকটিকে দেখা গেল, সে তার স্বামী নয়…তার প্রণয়ী…তাতে পৃথিবীর কোথাও কিছু যেত-আসত না…বিশেষত সেই চারখানা বাড়ীর পাঁচিলের মধ্যে…সবাই জানে, যাদের স্বামী যুদ্ধে চলে গিয়েছে, তারা প্রকাশ্য ভাবে সকলের সামনে অন্য লোক নিয়ে ঘর চালাচ্ছে…এটা এত স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে গিয়েছিল যে, সে-সম্বন্ধে কেউ কিছু ভাবতও না—

আন্না এ কথাও যদি বলত, তাদের সামনে সেই লোকটি…সত্যিই তার স্বামী—এত দিন পরে ফিরে এসেছে…তাকে মিথ্যাবাদী বলে কেউ প্রতিবাদও করতে পারত না…কারণ, যুদ্ধে চলে যাবার মাত্র আট দিন আগে, তারা এই বাড়ীতে আসে…এবং সে ক'দিনের মধ্যে রিচার্ড একটি প্রাণীর সঙ্গেও আলাপ-পরিচয় করে নি…তাকে কেউ চিনতও না…তার ওপর, চার বচ্ছর চলে গিয়েছে—

কিন্তু তার মনে তখন সে-সব চিন্তাই ছিল না…সামনের লোকটির সঙ্গে তার কি সম্পর্ক, এইমাত্র তা নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে, তারা দুজনে দুজনকে মনের মধ্যে নিকটতম করে পেয়েছে…সেই অনুভূতিই তখন আন্নার দেহ-মনকে আচ্ছন্ন করেছিল—তার সামনে যে লোকটি রয়েছে, তার নাম রিচার্ড কি না…সে কথার কি প্রয়োজন? সে তো বুঝেছে, সে মিথ্যা কিছুই বলে নি।

তার নিজের মনের দিকে চেয়ে সে দেখে, সেখানে যে অনুভূতি জেগেছে, যে অনুরাগ এসেছে, তাও তো মিথ্যে নয়! সে পেয়েছে…আনন্দ…সহজ, স্বচ্ছ, পরিপূর্ণ আনন্দ…ভাবুক না তারা সবাই…সে-ই তার স্বামী, ফিরে এসেছে আবার…তাতে যদি আজ এই নব-জাগ্রত চেতনা তাকে আনন্দ দেয়… তাতেক্ষতি কি? ক্ষতি কি, সবাই তারা জানুক…তার মন যা জানতে চায়…হাঁ…এই তার স্বামী…এতদিন পরে, তার প্রতীক্ষার তপস্যার অন্তে ফিরে এসেছে, তার তপস্যার ধন!

আন্না নীরবে দাঁড়িয়ে দেখে, কার্ল কি ভাবে মেরীকে তার হাত এগিয়ে দিল…

—আমার বন্ধু, মেরী…

কার্ল বিন্দুমাত্র বিচলিত হ'ল না…আনন্দের আলোর রঙ তার মুখে-চোখে…মেরীর মনের আনন্দ হাসিতে ফেটে পড়ে…সে আনন্দ যেন ঘরের চারদিকে এক অপরূপ রঙ বুলিয়ে দেয়…কি সুন্দর জীবন! জীবন কি সুন্দর!

আজও অপরাহ্ণ-শেষে সেই চারখানি বাড়ীর নীচের চত্বর থেকে বহু মানবের সম্মিলিত কুৎসিত চীৎকারের বীভৎস ধ্বনি তেমনি ওপরে উঠছিল… কিন্তু আন্না আজ তা শুনতে পাচ্ছিল না…তার মনে হচ্ছিল…যেন বাষ্পের মত এক স্নিগ্ধ নীরবতা চারদিক থেকে তাদের ঘিরে রেখেছে…তার মাঝখান থেকে, কোন্ ঘরে যেন কারা বেহালা বাজাবার জন্যে তার ঠিক করছিল…কোথায় ছেলেরা হাতে-তৈরী খেলার বাজনায় টুং-টাং করছিল…দোতলায় যে মজুরটি থাকে, রোজ সন্ধ্যা বেলায় কাজ থেকে ফিরে এসে, সে তার ভাঙা পিয়ানোতে বসে…আজও সে সেই ভাঙা পিয়ানো বাজাচ্ছিল…কিন্তু কি করে আজ, সেই সব বিচ্ছিন্ন টুকরো টুকরো সব সুর…এক হয়ে…এক অপূর্ব্ব সঙ্গীতের মত তাদের কানে এসে লাগছিল…

তারা তিনটি প্রাণী আনন্দমগ্ন চিত্তে তাই শুনছিল… এমন সময় মেরীর দিদির চার বছরের সেই ছেলেটি জানালার কাছে এসে চেঁচিয়ে সেই একটা ছড়া গেয়ে উঠল…

"ওদের বাড়ী ছেলে হয়েছে, কেউ জানে না তার বাপের নাম"

চারদিকে বাজনা বাজছে…সে না গেয়ে কি পারে? তার গলায় যত জোর ছিল, সে চেঁচাতে লাগল… সেই একটি ছড়া…চার বছরের জীবনের দান…

সপ্তম অধ্যায়

কার্লকে প্রথম দেখার পর থেকে, কার্লকে মনে মনে গ্রহণ করার আগে পর্য্যন্ত আন্নার মনে যে রহস্য অমীমাংসিত অবস্থায় তাকে নিত্য নির্য্যাতিত করছিল, জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর থেকে, আন্না দেখল, সে

ব্যাপারের অনেকটা মীমাংসা তার প্রতিবেশীরাই করে দিতে এল। আন্না যেন এই নিষ্ঠুর আত্ম-বিশ্লেষণের হাত থেকে কিছু রেহাই পেল।

আন্নার প্রতিবেশীরা কার্লের প্রসঙ্গে বলতে আরম্ভ করল, আন্নার স্বামী। আন্না শোনে···যখনই কার্ল সম্বন্ধে কথা ওঠে···তারা বলে, ও···আন্নার স্বামী তো···সে···ইত্যাদি, ইত্যাদি···ছেলেরা কার্লকে দেখলেই ডাকে, হের রিচার্ড!

দোকানী, মুদী, রুটিওয়ালা, দুধওয়ালা সবাই আন্নাকে তাদের মনের আনন্দ সংবাদ জানিয়ে বলে, এ কম আনন্দের কথা নয় যে, তার স্বামী এত দিন পরে ফিরে এল!

পড়শী মেয়েরা তাকে বাহবা দেয়, ধন্যি তোর মন, আন্না! তুই অপেক্ষা করেছিলি, ভগবান তাই তোকে সুখী করলেন!

নিজের ওপর এক নতুনতর শ্রদ্ধা যেন আন্না নিজেই অনুভব করে···যেন তার পরীক্ষার ফল সে পেয়েছে···

সকালে-সন্ধ্যায সিঁড়ি দিয়ে ওঠবাব নামবার সময় লোকে কার্লকে অভিবাদন করে, হের রিচার্ড বলে··· মেরী তো ইতিমধ্যে যেন একটু তার প্রেমেই পড়ে গিয়েছে···তাই সে অধিকার পেয়েছে, সোজা তাকে রিচার্ড বলে ডাকবার। কয়েক দিনের মধ্যে কার্ল দেখল যে, সবাই তাকে রিচার্ড বলে ডাকে···সে রিচার্ড···আন্নাও ডাকে, রিচার্ড···সেই নাম ধরে ডাকতে ডাকতে সেই নামের আড়ালে আন্নার মনে রিচার্ড সম্বন্ধে তার অনুভূতিও সহজ হয়ে এসেছে···

এখন আর আন্নাকে কারখানায় শরীর পাত করে খাটতে যেতে হয না। তার স্বামীর একটা কাজ জুটে গিয়েছে···প্রত্যেক শনিবার কাবখানার হপ্তা দেওয়া হয়···বাড়ী এসে কার্ল তাব প্রত্যেকটি পেনি আন্নার হাতে তুলে দেয়—তারপর ছোট ছেলেদের মত প্যাণ্টের বেল্‌টটা একটু উঁচু দিকে টেনে তুলে ধরে, হাসতে হাসতে তার সামনে হাত বাড়িয়ে ধরে···আন্না পকেট-খরচের জন্যে যা দেবার তাকে দেয়···

আন্না যে বিছানায় শুত, সেটা দুজনের পক্ষে যথেষ্ট। কার্ল দেয়ালের দিক ঘেঁসে শুত—কারণ, রিচার্ডের সেই অভ্যাস ছিল। ভোর না হতেই আন্না কখন পাশ থেকে উঠে যেত, সে জানতে পারত না—সকাল বেলাকার জলখাবার তৈরী করে সে তার স্বামীকে জাগাত···ঘুম থেকে উঠেই কার্ল দেখত, জলখাবার তৈরী—যেন অনাদিকাল থেকে এই চলে আসছিল···

রিচার্ডকে একদিন আন্না যা দেবে বলেছিল—আজ সে তার সেই কথা রাখতে পেরেছে···সে তিন মাস অন্তঃসত্ত্বা···কোন কিছু তুলতে গেলেই তার স্বামী হাঁ-হাঁ করে ওঠে···কোন ভারি জিনিস নাড়াচাড়া করা তার বারণ···বিকাল বেলা কারখানায় কাজ থেকে ফিরে এসে, কার্ল নীচে থেকে কাঠ কেটে ওপরে নিয়ে আসত···নিজে ন্যাতা নিয়ে ঘরের মেঝে পরিষ্কার করত···

পৃথিবীতে এক ধরণের লোক আছে, যারা, যখন তাদের জীবনের চারিদিকে সুবাতাস বইতে থাকে, তারা আপনা থেকে তাতে সায় দেয়···তাদের চোখে, মুখে, কথায় প্রত্যেক অঙ্গ-ভঙ্গিতে ফুটে ওঠে, সে শুভসংবাদ। মেয়েদের বেলাতেও তাই···তারা যখন যাকে ভালবাসে, তাকে অন্তরঙ্গ করে পায়, তাদের চেহারায় বিজ্ঞাপনের মত যেন তা ফুটে ওঠে···প্রতিদিন যেন তাদের সৌন্দর্য্য বেড়েই চলতে থাকে···চোখে যেন কিসের জ্যোতি আলোর শিখার মত জ্বলতেই থাকে··· আন্নাকে দেখলে, সে কথা সবাই জানতে পারত··· এমন একটা স্বতন্ত্র রূপ তার দেহে ফুটে উঠেছে, যাকে কিছুতেই এড়িয়ে যাওয়া যায় না। শুধু তাদের বাড়ীতে নয়, পথে ঘাটে সর্ব্বত্র, পথচারী পথিক, চলতে চলতে, এই মেয়েটিকে দেখে, হঠাৎ যেন একটু দাঁড়িয়ে যায়···বিস্ময়ে তার দিকে চোখ তুলে চায়···

দিনের মধ্যে একশো বার আন্না যেন আনন্দে বিহ্বল হযে পড়ত···যখনই সে দেখত, তার লোকটি তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, সে কি কথা বলছে···সবই তার অপরূপ লাগত···মনে মনে সে ভাবত, কবে কখন সে কি কথা বলেছিল, কি ভাবে আদর করেছিল, কি ভাবে কাছে টেনে নিযেছিল, ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ-মনে শিহরণ জাগত···আন্নার সমস্ত জীবন যেন সঙ্গীতের মত বেজে উঠল···

লোকটির অনুরাগ, যেমন ছিল প্রবল, কামনায় তীব্র···তেমনি ছিল কোমল, স্নিগ্ধ···যেন তাকে সর্ব্বদাই আগলে নিযে আছে···মার ভালবাসার মত। ঘরে, পথে, কারখানায় যাবার সময়, কারখানা থেকে ফেরবার পথে, কারখানার ভেতরে, কাজ করতে করতে, কাজের অবসরে, সে সর্ব্বদাই অনুভব করত, আন্নাকে···তার সমস্ত চেতনা ডুবে গিয়েছিল আন্নার মধ্যে···তার জীবন, সেই তো আন্না···তারই রক্ত আন্নার রূপ নিয়ে বাইরে ফুটে উঠেছে···সেই আনন্দের অনুরাগে পরম নিশ্চিন্ত হয়ে সে ছিল···সে বুঝেছিল, আন্না তাকে ভালবাসে···

সন্ধ্যার অবসরে সে অলস হয়ে বসে থাকত না···

একদিন যন্ত্রপাতি নিয়ে সে অনেক নাড়াচাড়া করেছে ···আজ আবার সেই কাজে তার নতুন অনুরাগ এসেছে···যন্ত্র নিয়ে ভাঙ্গা-গড়া করতে করতে ইতিমধ্যে সে একটা নতুন কল তৈরী করে ফেলেছে···এবং সেটা বিক্রী করে কয়েক শো মার্কও আন্নার হাতে তুলে দিয়েছে···সামনেই টাকার দরকার···তাদের দু'জনের মধ্যে যে তৃতীয় আর একটি প্রাণী আসছে···

সন্ধ্যা বেলা কারখানা থেকে বাড়ী ফেরবার মুখে, সে কল্পনা করত, ঘরে গিয়েই দেখতে পাবে, আন্না তার অপেক্ষায় বসে আছে···ভাবতে ভাবতে তার মনে হ'ত, তার মনের ভেতর যেন অমৃত-সাগর উথলে উঠছে··· সেই চেতনায় তার সমস্ত পথ-চলা ভরে থাকত···

ঘরের দরজায় যখন এসে দাঁড়াত, তখন তার মনেই হ'ত না যে, এতখানি পথ সে হেঁটে এসেছে···এমন অনেক সময় হ'ত যে, সে যখন ঘরে ঢুকত, আন্না তখন ঘরে থাকত না। কিন্তু কার্লের তা মনে হ'ত না। আলনায় তার পরিত্যক্ত পোষাকের দিকে চেয়ে, টেবিলের ওপর চায়ের কাপটা দেখে, তার মনে হ'ত, আন্না রয়েছে···আন্না রয়েছে, তাই তো কাপড়টা ও-রকম ভাবে ঝুলছে···আন্না রয়েছে, তাই তো জানালাটা ও-রকম ভাবে খোলা রয়েছে···

যখন আন্না এসে ঘরে ঢুকত, সে চুপটি করে বসে থাকত···শুধু তার দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করে ফিরত, তার সর্ব্বাঙ্গ যেন লেহন করত···জানালা থেকে এক ঝলক হাওয়া এসে, হঠাৎ তার কপালে গুচ্ছি-কতক চুল এনে ফেলে দিত···তাতেই আনন্দে তার মন ভরে উঠত···যেন জগতের কি এক চরম চিন্ময় ভাব চোখের সামনে ঘটে গেল···আনন্দে সে ভরে উঠত···

আন্না তা বুঝত···সে যে বুঝেছে, কথায় সে জানাতে পারত না···হঠাৎ উনুনের কাছে যাবার সময়, তার লোকটির চুলে একবার হাত বুলিয়ে দিয়ে যেত··· গায়ের জামাটার খোলা বোতামটা লাগিয়ে দিত···

কোন কোন দিন হয় ত সে জিজ্ঞাসা করত, কোথায় ছিলে গো ?

আন্নার মুখে কথা শোনবার আনন্দের জন্যেই যেন এ-প্রশ্ন করা। তাই তেমনি আনন্দের সুরে আন্না উত্তর দেয়, জান, মুচীর কাছে গিয়েছিলাম···তোমার ছেঁড়া জুতোটা মেরামত করিয়ে আনলাম···

কার্ল যেন শুনত, আন্না বলছে, ওগো আমার জীবনের চেয়ে তুমি যে আমার প্রিয় !

সেই ঘরে পা দেওয়ার আগে পর্য্যন্ত কার্লের জীবন ছিল, সীমাহীন তেপান্তর মাঠে নিঃসঙ্গ···শুধু জীবন বহন করার বেদনায় নিত্য-ক্ষুব্ধ···তাই আজ তার প্রতি লোমকূপ থেকে যেন আনন্দ-বিজ্ঞপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে··· আমি একা নই···আমি একা নই···

সেই দুটি প্রাণী যে তাদের আশে-পাশের অন্য সব লোকদের চেয়ে স্বতন্ত্র···তার একমাত্র কারণ যে, এই দুটি প্রাণী, নিজেদের অন্তরে সত্যি অনুভব করতে পেরেছে যে তারা সুখী···সেই অনুভূতি এনে দিয়েছে, তাদের জীবনে একটা স্বচ্ছ সুগভীরতা···যেখানে তারা আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ···

দিবস-রাত্রির আলো-অন্ধকারের স্পর্শ তারা যেন নিজেদের মনের রঙের সঙ্গে মিশে অনুভব করত···সে এক আলাদা রাত্রি···সে এক আলাদা সূর্য্য···সেই সূর্য্যের আলো···সেই রাত্রির জ্যোৎস্নায়···তারা অবিচ্ছেদ···তাদের সামান্য স্পর্শের মধ্যে দিয়ে তারা যেন বুঝতে পেরেছে, জীবনের গূঢ় অর্থ, যা অধিকাংশ লোকের জীবন এড়িয়ে চলে যায়।

অতি নগণ্য জিনিস, তারই মধ্যে কার্ল দেখতে পেত বিরাটের রূপ···তার কোমরের কাছ থেকে গাউনটা কেমন ভাঁজ কেটে নীচে নেমে এসেছে··· সেই সামান্য একটা আকস্মিক কাপড়ের ভাঁজ···তার কাছে যেন অন্তহীন প্রেমের রেখাচিত্র···তার চুলটা ঘাড়ের কাছে কেমন যেন অলস ভাবে এসে পড়ে থাকত···সেই অত্যন্ত স্বাভাবিক কেশ-বিন্যাসের মধ্যে যেন নিখিলের সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সে দেখতে পেত···

তারা দু'জনেই কেউ বেশী কথা বলত না। দু'জনেই কেউ বেশী কথা বলতে পারত না। তাদের ছিল দু'জোড়া পা, যা ঠিক একই তালে পড়ত···বক্ষঃ-স্পন্দন···যার ছন্দের মধ্যে কোন গরমিল ছিল না··· হাসি···ফলের পক্কতার মত যা মুখে আপনি ফুটে থাকত···তারা ছিল দরিদ্র···হয়ে উঠল ধনী···অসীম বিত্তশালী···

হঠাৎ কাজ করতে করতে, আন্না উঠে দাঁড়াত··· দেখত, সেই সঙ্গে কার্লও উঠে দাঁড়িয়েছে···তার কিছু বলবার আগেই কার্ল বলে উঠত, হাঁ,···তাহলে চল···একটু বেড়িয়েই আসি···

নীরবে কখন যে তাদের মনে মনে এ-রকম পরামর্শ হয়ে যেত—তারা নিজেরাই জানতে পারত না—

সেই শহর, তার পথ-ঘাট, বাগান, শহরের শেষে আকাশ-ছোঁয়া গাছে-ভরা বন, সব যেন তারা পেয়ে গিয়েছিল···পেয়ে গিয়েছিল কেন না তারা দুজন দুজনকে পেয়েছিল···

হঠাৎ এই পরিপূর্ণ আনন্দের মধ্যে এক দুর্ঘটনা ঘটে গেল…

ঘটনাটা তাদের জীবনে নয়…তবু জীবন তো সত্যি স্বতন্ত্র নয়…

একদিন তারা দুজনে রেলের লাইন ধরে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল, ক্লান্ত হয়ে তারা দুজনে যখন ঘরে ফিরল, দেখে, মেরী কাঁদছে…

তার দিদির স্বামী কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে হঠাৎ বাড়ী ফিরে আসে…ঘরে ঢুকে সেই নতুন শিশুটিকে দেখে সে কোন কথা আর বলে নি…অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছেলেটাকে দেখল…তারপর যেমন এসেছিল…তেমনি চলে গেল…

ঘরে আলো জ্বালা হ'ল। আলোর নীচে তিনটি প্রাণী চুপ করে বসে রইল…মেরীর দুই চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ছিল…

—আমরা কখনো ভাবি নি যে, উনি হঠাৎ এমনি করে চলে আসবেন!

আন্না একবার কার্লের দিকে চাইল, তারপর চোখ তুলে মেরীর দিকে চাইল।

আপনা থেকে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, এ-ছাড়া উনি আর কি করতে পারতেন? ওঁর স্ত্রী…

আন্নার মনে হল, বুকের ধুক্‌ধুকুনিটা যেন গলার ভেতর হঠাৎ এসে থেমে গেল…

মেরী তেমনি কাঁদতে কাঁদতে বলে, এই তো সেদিন মোজারের স্বামী ফিরে এল…তার সঙ্গে যে লোকটা বাস করছিল, সে শুধু দিন কয়েকের জন্যে সরে গেল… এই তো সেদিন হের হোস্‌লার ফিরে এল…তিন সপ্তাহ তার ছুটি ছিল…এসে দেখল, এখানকার পোষ্টঅফিসের একজন কর্ম্মচারী তার স্ত্রীর সঙ্গে রয়েছে…কি আর করবে? সে তিন সপ্তাহের জন্যে পাশে একটা ঘর নিয়ে রইল…তারা তিনজনে দিব্যি রইল…

আন্না প্রতিবাদ করে বলে, কিন্তু এই তো সেদিন হের লিনেট ফিরে এল…বউটাকে মারতে মারতে প্রায় আধ-মারা করে ফেলে দিয়ে গেল…ব্যাপারটা অত হালকা করে উড়িয়ে দিয়ো না, মেরী!

—উড়িয়ে না দিয়ে কি করি! এর জন্যে দায়ী কে?

কিছুক্ষণ থেমে আবার সে বলে ওঠে, কিন্তু যাবে কোথায়? আবার ফিরে আসবে, আমি তোকে বলছি, আন্না…তখন একবার আমি দেখে নেব…

—তিনজনে একসঙ্গে…?

হঠাৎ আন্না কার্লের দিকে চায়…কার্ল একটিও কথা বলে নি…তার চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হয় যেন তার দৃষ্টি ঘরের মধ্যে নেই…

আন্নার বুকের ভেতর তেমনি ধুক্‌ধুকুনি যেন বেড়েই চলেছে…

নিজের চোখের জল মুছে মেরী বলে, রিচার্ড, তোমাদের এখানেই একটু কফি তৈরী করে খাব… আপত্তি নেই তো?

মেরীর মনটা ছিল হালকা ছিপির মতন। এই জলে ডুবে গেল, আবার ভেসে উঠল। লোকে যখন মুখ ভার করে থাকত—তার হাসি থামত না…আবার লোকে যখন ঠাট্টা করছে, হঠাৎ দেখা গেল, তার চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ছে…

আপনার মনে সে কফি তৈরী করতে লেগে গেল…

কার্লের দৃষ্টি ছিল বাইরে…বহু দূরে চলে গিয়েছিল …য়ুরোপ আর এশিয়ার মাঝখানে যেখানে ছিল তেপান্তর মাঠ…যেখানে মানুষের সাড়াশব্দ নেই…

আন্না দুহাত দিয়ে তার নিজের গলাটা টিপে ধরল …মনে হ'ল সেখানে এসে যেন তার বুকটা আটকে গিয়েছে…

মেরী কফি তৈরী করে খেয়ে চলে গেল…

কার্ল নিজের মনে একটা যন্ত্রের অসমাপ্ত মডেল তৈরী করতে লেগে গেল…তার কাজে মন দেখে মনে হয় যেন, শেষ না হলে সে আর কিছু করবে না…

দুজনেই ভেতরে ভেতরে কাঁপছিল, যেন অজানা ভাগ্যের ঝাপটে তারা দুজনেই ভেতর থেকে নড়ে উঠেছিল…সেদিন রাত্রি বেলা শয্যায় তারা দুজনে দুজনার বুক আঁকড়ে পড়ে রইল…তারা জানে, ভাগ্য হয়ত তাদের অমৃত এনে দিতে পাবে, হয়ত অমৃতের বদলে মৃত্যু দিতে পারে…কিন্তু তাদের একজনের কাছ থেকে আর একজনকে ছাড়িয়ে নিতে পারে না…তাদের মনে পাপের বা অন্যায়ের কোন চেতনা ছিল না…

কয়েক দিন পরে সামরিক বিভাগ থেকে মেরীর দিদির কাছে চিঠি এল, তার স্বামী যুদ্ধে মারা গিয়েছে…খবরটা মহল্লার মধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। যারা আজ পর্য্যন্ত মেরীর দিদিকে কোন একটা বিরূপ কথা বলে নি, সেই খবর শুনে, তারা সকলেই মেরীর দিদিকে গালাগাল দিতে লাগল… তাকে দেখলে পেছন থেকে লোকে টিটকিরি দেয়… যেন তার স্বামীকে সে-ই তাড়িয়ে মেরে ফেলেছে… এমন কি বেনামী চিঠিতে লোকে তাকে গালাগাল দিতে লাগল…

মেরীর দিদির লোকটি সমস্ত ব্যাপারই বুঝল…তার

চাল-চলন সমস্ত যেন কাঠ হয়ে এল···যেন অপরাধের সমস্ত বোঝার অংশ সে সজ্ঞানে বয়ে বেড়াচ্ছে···ঘরের ভেতরও তারা দুজনে কম কথা বলত ইদানীং···নিতান্ত দরকারী কথা না হলে, তারা কথা বলত না···তবে জীবন যেমন চলত···তেমনি চলতে লাগল···লোকটিও তেমনি আসত, যেত, খেত, শুত···স্ত্রীলোকটিও নিজের কাজ-কর্ম্ম করত···এমন ভাবে কয়েক সপ্তাহ চলে গেল ···তারপর আবার আগেকার সেই স্বাভাবিক জীবন ফিরে এল···মেরীর দিদির স্বামীর মৃতদেহ সকলের স্মৃতি থেকে মুছে গেল।

ঠিক তেমনি সিঁড়ি থেকে ওঠবার-নামবার সময় বাসিন্দারা লোকটিকে আগে যেমন অভিবাদন জানাত, তেমনি অভিবাদন জানাতে লাগল ··মেরীর দিদি যে কি ভয়ঙ্কর স্ত্রীলোক, সেকথাও ক্রমশ কম শোনা যেতে লাগল···মেরীর দিদির ছেলেদের সঙ্গে মহল্লার অন্য সব ঘরের ছেলেদের ঝগড়া প্রায় তেমনিই হ'ত। তবে ইদানীং যখন মেরীর দিদির ছেলে দুটি তাদের মার স্বপক্ষে ঝগড়া করে অন্য ছেলের দলকে প্রায় হটিয়ে দিত, তখন বিপক্ষ দল আর কিছু না পেয়ে বলে উঠত, তোদের মা তো···বেশ্যা···

আন্না খোলা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে সব শুনত···

অষ্টম অধ্যায়

খোলা ড্রয়ারের সামনে আন্না দাঁড়িয়েছিল···সে বিছানায় শুয়েছিল, হঠাৎ কি মনে করে, বিছানা ছেড়ে ড্রয়ারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল···একদৃষ্টিতে সেই ড্রয়ারের ভিতর চেয়ে রইল···কেন যে চেয়ে রইল···তা সে নিজেই জানে না···

কিছুক্ষণ পরে যন্ত্রচালিতের মত ড্রয়ারের ভেতর হাত দিয়ে সে একখানা পুরানো পোষ্টকার্ড বার করল ···তার কালির আঁচড় প্রায় ঝাপসা হয়ে গিয়েছে···চার বছর আগে, তার স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ জানিয়ে সামরিক বিভাগ তাকে যে পোষ্টকার্ড দিয়েছিল···পোষ্টকার্ডখানি হাতে তুলে নিয়ে নীরবে সে যেন তার অক্ষরগুলো বার বার করে পড়তে লাগল···মনে হ'ল সোজা তার বুকের ভেতর দিয়ে কে যেন তপ্ত লৌহ-শলাকা বিঁধে দিল···সে বার বার করে যন্ত্রচালিতের মত বহুবার-পড়া সেই পোষ্টকার্ডখানি আবার বহুবার করে পড়তে লাগল···

হঠাৎ আন্নার মনে হ'ল, যে-কোন মুহূর্ত্তে ত সে ঘরে এসে পড়তে পারে···সেই সম্ভাবনার চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে আবার শান্তি নেমে এল···সে-ই ত তার সব ···সে···যে তার সব-কিছু জানে···শুধু তার বিবাহিত জীবন নয়···বিবাহিত জীবনের আগে···শৈশবে··· যেখানে সে যা-কিছু করেছে···সে তো তার সব জানে ···জগতে তার সম্বন্ধে অপর আর কেউ যা জানে না, এমন কি সে নিজেও যা জানে না···তা ঐ লোকটি জানে···জানে, কেন না সে তাকে ভালবেসেছে···তার ভালবাসার মধ্যে দিয়েই তো সে তাকে জেনেছে···সেই তো সত্য পরিচয়···তা ছাড়া অন্য কিছু সম্পর্ক, অবাস্তব, অসম্ভব···

পোষ্টকার্ডে তখনো লেখা ছিল, "১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর যুদ্ধে নিহত"···শুধু ঐটুকুই স্পষ্ট ছিল, আর সব ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল···খবরটা কি সত্য নয়? তবে কেন লোকটি বলেছিল, সামরিক বিভাগের ভুল ···ভুল যদি করে থাকে, কি ভুল করেছিল তারা? তার স্বামী যে মৃত, সেইটে ভুল? না, অন্য কিছু? হঠাৎ আন্নার মনে হ'ল, সমস্ত মাথাটা ভারী হয়ে এসেছে···এত ভারী যে সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না ···কোন রকমে টলতে টলতে, হাতের কাছে যা পেল, তাই ধরে, বিছানার কাছে এল···বিছানায় এসে সে পড়ে গেল···সেইখানেই সেই অবস্থায় অবসন্ন হয়ে সে কখন ঘুমিয়ে পড়ল···

ঘড়িতে ছ'টা-সাতটা বেজে গেল···স্বপ্নহীন সুগভীর নিদ্রায় সে তখন ডুবে গিয়েছে···দেহ, স্বচ্ছ···লঘু··· পিয়ন এসে দরজার গায়ে চিঠি ফেলবার ফাঁক দিয়ে আস্তে একখানা চিঠি দিয়ে গেল···ঠিক সেই সময়, সুগভীর নিদ্রার মধ্যে স্বপ্নের সূচনা হয়েছে···নিস্তব্ধ রাত্রিতে যেমন হঠাৎ বজ্রের প্রথম ধ্বনি জেগে ওঠে··· তেমনি তার অসাড় দেহের মধ্যে কিসের যেন আলোড়ন জেগে উঠল···চমকে সে উঠে বসল···ভীতসন্ত্রস্ত পায়ে দরজার কাছে এগিয়ে গেল···মেঝেতে একটা চিঠি পড়ে রয়েছে···চিঠিটা আগাগোড়া লোহার তার দিয়ে মোড়া ···রিচার্ডের কাছ থেকে এসেছে···

তাড়াতাড়ি চিঠিটা তুলতে গিয়ে দেখল, নিজে রিচার্ড দাঁড়িয়ে রয়েছে···একটা বিরাট আলোর পাঁচিলের বাইরে···রিচার্ড দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তার কাঁধের ওপর মাথা নেই···চোখ চেয়ে কিন্তু আন্নার দিকে দেখছে···আন্না দেখতে চেষ্টা করছে, চোখ দুটো-কোথায়···এমন সময় অদৃশ্য ঠোঁট তার নড়ে উঠল··· আন্না স্পষ্ট শুনল, রিচার্ড বলছে, কাঁটা-চামচেটা দাও।

সেই কাঁটা-চামচে···যেটার একটা দাঁত ছোট হয়ে গিয়েছিল···আন্না তার হাতে হাত দিল···কিন্তু হাতটা দেখতে পেল না···রিচার্ড চেয়ারে বসে রুটী কাটতে লাগল···নিদ্রার মধ্যে আন্না চমকে উঠল···নিশ্চয়ই স্বপ্ন···কিন্তু রিচার্ডের মাথা কোথায়? অসহ্য যন্ত্রণায় সে চেঁচিয়ে উঠল···আমি আর ঘুমোব না···না··· জাগতেই হবে···জাগবার জন্যে চেষ্টা করতে সে আবার পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল···দেখে, রিচার্ড তার কাছে এগিয়ে এসেছে···আদর করে তাকে বল্ছে···আমি বুঝি গো বুঝি···এতে কিছু যায়-আসে না···ভবিতব্যতা ···আর একটু ঘুমও···এখনি উঠো না···সে আবার ঘুমিয়ে পড়ল···কিন্তু মনে পড়ে গেল চিঠিটা···চিঠিটা খোলা হয় নি···কি আছে তাতে···সে তাড়াতাড়ি উঠে চিঠিটা খুলতে গেল···

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল ··দরজার দিকে চেয়ে দেখে, মেঝেতে একটা চিঠি পড়ে রয়েছে···সে কি এখনো স্বপ্ন দেখছে? না···স্বপ্ন তো নয়···সে উঠে ভয়ে ভয়ে চিঠিটা তুলে নিল···নানা রকমের লাল-নীল দাগ কাটা···নানা দেশের ষ্ট্যাম্পমারা···চিঠিটা খোলাই ছিল ··রিচার্ডের হাতে লেখা···কি আছে চিঠিতে? পড়তে তার সাহসে কুলোল না···তাড়াতাড়ি সেটাকে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলবার জন্যে গ্যাসের উনুনের কাছে গেল···

"আন্না প্রিয়তমে, আমি এখনো জানি না, আমি কাদের কয়েদী···ইংরেজদের···না···জাপানীদের···তবে আমি এখন বন্দী অবস্থায় এক জাহাজে···ছাগল-ভেড়ার মত তারা আমাদের কয়লা-ঘরে পুরে রেখেছে··· জাহাজের খোলে সেই কয়লা-ঘরে যে কি অসহ্য গরম··· তা তুমি অনুমান করতে পারবে না ··আমাদের সঙ্গে আর একটা জাহাজ চলছিল ··পরশু দিন মাইন্ লেগে সেখানা ডুবে গিয়েছে···যদি আমি সেই জাহাজে থাকতুম···চারদিকে মাইন্ ছড়ানো···তার মধ্যে দিয়ে আমাদের জাহাজ চলেছে···কোথায় চলেছে আমরা কেউ-ই জানি না···আমাদের সঙ্গে একজন ডাচ্ম্যান ছিল···সে ছাড়া পেয়ে তার দেশে যাচ্ছে···সেই জন্যে তার হাতে এই চিঠি দিলাম···যদি কোন ভাবে এই চিঠি তোমার হাতে পড়ে···তা হলে···জেনো···এই কথা জানাবার জন্যে···তোমাকে দেখছি···আমার ছোট্ট আন্নাকে আমি ঠিক আগে যে ভাবে দেখতুম···আজও ঠিক সেই ভাবে দেখি···এবং আমাদের নিজের হাতে সাজানো সেই ঘরটিতে যদি আবার কখনো গিয়ে দাঁড়াতে পারি···সেই আশাতেই বেঁচে আছি···"

চিঠিটা মাত্র তিন মাস আগে লেখা হয়েছে··· পোড়াতে গিয়ে আন্না পোড়াতে পারল না···পড়তেই হ'ল···তার সর্ব্ব-অঙ্গ যেন পাথরের মত হিম হয়ে গেল···যেন এই মুহূর্ত্তে তার চোখের সামনে দিয়ে বজ্র ভেঙ্গে পড়ল···চিঠিটা থেকে একটা তীব্র গন্ধ আসছিল···সেই গন্ধ নাকের ভেতর দিয়ে তার শরীরে ঢুকে সমস্ত ভেতরটা তোলপাড় করে তুল্ল···আস্তে আস্তে চিঠিটা সে তাকের একধারে যেখানে শিশি-বোতলগুলো ছিল, সেখানে রেখে দিল···দেহের ভেতরে জঠরে ভ্রূণ-শিশু নড়ে উঠল···মনে পড়ল, এখনো তো দোকান থেকে জিনিস-পত্র আনা হয় নি···যে-কোন মুহূর্ত্তে তার রিচার্ড কাজ থেকে বাড়ী ফিরে আসবে··· দোকানগুলো তো বন্ধ হয়ে যায় নি? বাড়ী এলে, তার রিচার্ড ক্ষিদেয় এক দণ্ড দাঁড়াতে পারে না···কিন্তু চিঠিটা···? চিঠিটা লিখেছে রিচার্ড···দোকান যদি বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে, ডিমওয়ালাদের বাড়ীতে যেতে হবে···যদি আমি সেই জাহাজে থাকতুম···দোকান বন্ধ হোক···মাখনওয়ালার ডেয়ারী অনেক দেরী পর্য্যন্ত খুলে রাখে···

ভাবতে ভাবতে নীচের তলায় চলে এসেছিল··· হঠাৎ কি মনে করে সে আবার ফিরে দাঁড়াল··· সাধারণত যে ভাবে সিঁড়ি দিয়ে ওঠে, তার চেয়ে তাড়াতাড়ি উঠতে লাগল···দরজা খুলে ঘরে ঢুকে আবার চিঠিখানা টেনে বার করল···বার বার করে পড়তে লাগল···নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হয়েছে···এ ভুল···এক টুকরো কাগজ···তাতে পেনসিলে লেখা কতকগুলো কথা···শুধু কথা···কোন্ অতীত জীবনের কথা···যে-জীবনের কথা ছিল পোষ্টকার্ডে···বহু যুগ আগেকার অতীত এক জীবন ··কতকগুলো কথা, সে কি বদলে দেবে, ভেঙ্গে দেবে, তার আজকের এই জীবন···যা জীবনের মত সহজ, সুন্দর, স্বাভাবিক হয়ে আজ তার কাছে ধরা দিয়েছে? "আমাদের নিজেদের হাতে সাজানো সেই ঘরটিতে, আমার আন্নার সামনে গিয়ে যদি আবার দাঁড়াতে পারি···"

সে তো দোকানে যাবার জন্যে বেরিয়েছিল··· তবে···ঘরে কি করে এল? সে কি নীচে গিয়েছিল? রাস্তায়? দোকানে? হাঁ সে তো দোকানেই দাঁড়িয়ে··· কিন্তু তার মনে, সে তখনো তার ঘরে দাঁড়িয়ে সেই চিঠিখানা পড়ছে···সে কোথায়?

ডেয়ারীর মালিক, তারই মতন একজন স্ত্রীলোক, বলে উঠল, আজ তোমাকে কেমন যেন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে, আন্না···আর ভাই···মেয়েদের জীবনে

ওঠা-নামা লেগেই আছে···এইমাত্র তোমার স্বামী এসেছিল···আমি জানি তোমার এখন কি হচ্ছে··· আমারো তো পেটে তিন-তিনটে এসেছে···তবে ভয় করবার কিছু নেই···তোমার শরীর তো তেমন দুর্ব্বল নয়···

কার্ল তত্তক্ষণে বাড়ী ফিরেছিল। দেখে, দরজা বন্ধ। আন্না বেরিয়ে গিয়েছে। তালা খুলে ঘরে ঢুকল। ঘরে ঢুকতেই কার্বলিক এসিডের মত একটা গন্ধ তার নাকে এল···সেই চিঠিটার গন্ধ··ঘরের চার-দিকে সে আতঙ্কে চেয়ে দেখে···কি হ'ল? আন্নার কোন বিপদ ঘটেনি তো?

আন্না তখন ডেয়ারীওয়ালীকে জিজ্ঞাসা করছিল, আমার স্বামী এসেছিলেন কেন?

—সেই দুধের কথা বলতে···তোমার জন্যে যে দুধটা যায়···সেটা যেন খাঁটী হয়···তা বাছা কিছুতেই তাকে বোঝাতে পারি না ··

হঠাৎ আন্নার মনে পড়ল, ইতিমধ্যে তো সে বাড়ী ফিরেছে···ঘরে ঢুকেছে তাড়াতাড়ি সে ফিরল···সে স্পষ্ট দেখতে পেল, তার রিচার্ড দরজার সামনে মুখ গম্ভীর করে দাঁড়িয়ে আছে···সেই চিঠিটা··আন্না ঠিক করল···সে বলবে···রাস্তায় আসতে আসতে সে নিজের মনে বল সংগ্রহ করে নিল···যদি ভয়ঙ্কর এসে থাকে, তা হলে তাকে এড়িয়ে গেলে তো চলবে না···তার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াতে হবে···

—

নবম অধ্যায়

কার্ল তখনো দরজার সামনে দাড়িয়েছিল। তার মনে শুধু এই ভয় হচ্ছিল, তার অসাক্ষাতে হয়ত আন্নার একটা কঠিন কিছু রকম বিপদ ঘটেছে··হয়ত অকাল-প্রসবের বেদনায় সে মারা গিয়েছে···ভাবতে ভাবতে তার মনে হ'ল, সে যেন রেল-লাইনের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে···তার সামনে দিয়ে তীব্র বেগে একটা এঞ্জিন আসছে···ভাগ্য ··

এমন সময় পায়ের শব্দে সে ফিরে দাঁড়াল···আন্নার পায়ের শব্দ··আন্নার ছাড়া এ পায়ের শব্দ আর কারুরই হতে পারে না···

—এই যে···আন্না···আমার আন্না··কি হয়েছে আন্না?

দরজার সামনে তারা দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে··· সোজা তার মুখের দিকে চেয়ে আন্না বলে, আমার স্বামীর কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছি···

কার্লের মনে পড়ে গেল···একদিন তারা যখন দুজনে একসঙ্গে সেই জনমানবহীন তেপান্তর মাঠে কারা-জীবন যাপন করত, কার্ল জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা, ধর, তোমার এই দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে তোমার স্ত্রী যদি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে আর একজনের সঙ্গে থাকে··· রিচার্ড সেদিন উত্তরে যা বলেছিল, তার কানে বাজতে লাগল···তাতে তোমার কি? আন্না যা করে সে আমি বুঝব···তুমি ও-সব নোংরা কথা উচ্চারণ করবার কে হে? তার মনে পড়ল, সে ক্ষিপ্ত হয়ে হাতের কোদালটা তুলেছিল···কার্ল দেখল, সেই কোদালটা যেন আন্নার মাথার ওপরে ঝুলছে···

কিন্তু আন্না কি সত্যই তাকে প্রতারিত করেছে? এ যে এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার! আন্নাকে ধরে সে ঘরের ভিতর নিয়ে এল···আন্না হাতের কাগজের পুঁটলী টেবিলের ওপর রেখে দিল···নীরবে চেয়ারে বসে সে কার্লের মুখের দিকে চেয়ে রইল···যেন তার বলবার আর কিছু নেই···ভাগ্যকে···ভাল-মন্দ নির্ব্বিচারে যে-ভাবে গ্রহণ করতে হয়···যেন সে সেই ভাবে গ্রহণ করেছে···তার মুখের প্রত্যেক নীরব রেখা এই কথাই স্পষ্ট করে বলছিল, যা আসে আসুক, আমার আর দ্বিতীয় পথ নেই···যদি ফিরে এসে, সে আমাকে মেরে ফেলে, আমি বাধা দেব না তাতেও···পালাব না···

কার্লও পালাবে না···পুরুষ মানুষ সে···বহু সংগ্রাম, বহু দ্বন্দ্ব, ভাগ্যের সঙ্গে অহর্নিশ হাতাহাতি করে, সে এই ভবিতব্যতাকে চরম আশ্রয় বলে গ্রহণ করেছে···এবং সে-সংগ্রামের শেষে যদি মৃত্যু আসে, আসুক···মৃত্যু···সে বরঞ্চ ভালো···কিন্তু আন্নাকে ছেড়ে দেওয়া···সে কখনই হতে পারে না···

সে আজ সব কথা আন্নাকে বলে···বাইরের অন্ধকার তখন ঘরে এসে অন্ধকারে ঘরের আর সব ছেয়ে ফেলেছে···কার্ল বলে আন্না শোনে···

চার বছর ধরে সেই নির্জন তেপান্তর মাঠ···দিনের পর দিন···শুধু দুটি প্রাণী মুখোমুখি···সে নির্জনতায় আর কিছু নেই···গ্রীষ্মের দিনে মাঠে···শীতের দিনে কয়েদী-তাঁবুতে···কোন কথাই আজ সে গোপন করল না···প্রতিদিন···প্রতি-মুহূর্ত্ত তাদের মধ্যে যে-সব কথা হ'ত···আন্না স্থিরনেত্রে শুনে চলেছিল···কি করে রিচার্ডের মুখ থেকে আন্নার কথা শুনতে শুনতে সে তার নিজের মনে, আন্নার ধ্যান-মূর্ত্তি গড়ে তুলেছিল···আজ কোন কথাই সে গোপন করবে না···সে চায় তার মনকে আজ স্বচ্ছ-নগ্নরূপে আন্নার সামনে তুলে ধরতে··· তার চোখের সামনে প্রেমকে মহীয়ান্ করে তুলে

ধরতে···যে-প্রেম আছে তাকে ছাড়িয়ে তার সমস্ত অস্তিত্বকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে···

মাঝে মাঝে আন্না প্রশ্ন করে, সে উত্তর দেয়, যেন সে নিজেকেই উত্তর দিচ্ছে এমন ভাবে···

"একদিন রিচার্ড আমাকে বললে, আন্না আমার ভাল লাগে ··যেমন ভাল লাগে প্রত্যেক অনুরক্ত স্বামীর তার সাধ্বী স্ত্রীকে···এবং আমি জানি···সে-ও আমাকে ঠিক তেমনি ভালবাসে···যেমন ভালবাসে প্রত্যেক সাধ্বী স্ত্রী তার অনুরক্ত স্বামীকে···আমি জানি, আন্না আমার সেই সাধ্বী স্ত্রী···সেই দিন, সেই মুহূর্ত্তে, সহসা আমি তোমাকে দেখতে পেলাম, আন্না···তুমি দাঁড়িয়ে আছ বন-বীথির এক পাশে···ঠিক সেই বন-বীথির এক পাশে যেখানে তোমাতে আমাতে বেড়াতে গিয়েছিলাম···তুমি অপেক্ষা করে দাঁড়িয়েছিলে···তোমার চার পাশ দিয়ে সন্ধ্যা নেমে আসছে···সেখানে তুমি ছাড়া আর কেউ কোথাও নেই···যেই তোমাকে দেখলাম···সেই দেখার আলোয় দিব্যমূর্ত্তিতে তুমি আমার মনে আবির্ভূত হলে···তোমাতে আমার সমস্ত মন ছেয়ে গেল···তুমি অপেক্ষা করে আছ···তুমি আমারই জন্য অপেক্ষা করে আছ···আমিই তোমার রিচার্ড···সেই মুহূর্ত্ত থেকে, দিবসে, নিশীথে, স্বপ্নে, জাগরণে, তুমি আমার সঙ্গে আছ, আমি তোমার সঙ্গে আছি··· সেইক্ষণ থেকে তোমাকে চিনেছি, দেখেছি··· তোমার অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ সমস্তই স্পষ্ট দেখেছি···

আপনা থেকে আন্নার চোখ বন্ধ হয়ে আসে··· আপনা থেকে সে কার্লের দিকে এগিয়ে যায় ··ওঠে ওষ্ঠ দিয়ে নীরবে দেহগন্ধময় সেই অন্ধকারে তারা বসে থাকে···এই পরিপূর্ণ মিলনের দ্বারে মহাকাল যেন ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে···এ পরম মুহূর্ত্ত মানব জীবনে বড় দুর্ল্লভ, কেন না ছায়ার মত তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে, জীবন-যাপনের জড়বেদনা··· শুধু এক নিমেষের এ দুর্ল্লভ মুহূর্ত্ত···তারপর, চক্ষের নিমেষ ফেলতে যতটুকু সময় লাগে, তারই মধ্যে আবার সুরু হয়ে যায় মহাকালের অন্ধ অভিযান···নির্ম্মম··· নিষ্ঠুর···

আন্না বলে, যদি সে না দেয়, তাহলে তো আমরা থেমে যাব···

অন্ধকারের বুকে চোখ রেখে কার্ল বলে, থেমে যাব···হয়ত সেই হবে আমাদের একমাত্র পথ-চলা···

এক নিমেষের জন্যে তারা দুজনে একসঙ্গে অনুভব করে, মৃত্যুর বেদনা···সেই অনুভূতিটুকুর মধ্যে আবার ক্ষণিকের জন্য জেগে ওঠে···জীবন-বৃন্তে সেই তুষারশুভ্র পরম-ক্ষণ···

রাত্রির আহারের আয়োজনে প্রতিদিনের অভ্যাস-মত, আন্না নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চায়···কার্ল চলে যায় তার অসমাপ্ত কাজ শেষ করে আসতে···কিন্তু সেই রান্না, সেই থালা-বাটি ধোয়া-মাজা, সেই নিত্য-নৈমিত্তিক খাওয়া-দাওয়া, কাজ-কর্ম্ম, মনে হয় যেন তাদের স্বাভাবিক ভারটুকু পর্য্যন্ত আর নেই···যেন প্রত্যেক জিনিস তার অস্তিত্বের মূল্যটুকু পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে ···সেই দিন থেকে তাদের জীবনের পরিধি যেন দুদিক থেকে এসে একটা ফাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে রইল ··কিসের যেন অপেক্ষায়···সেই দিন থেকে তাদের জীবন হ'ল শুধু অপেক্ষা করে থাকা···যে অপেক্ষার মধ্যে জীবন আপনা থেকে আপনি নিঃশেষিত হয়ে যায়···

কার্ল বার বার করে সেই চিঠিখানা পড়ে···দুই হাতের মুঠী দিয়ে মাথার চুল ধরে সে এক দৃষ্টিতে সেই চিঠির দিকে চেয়ে থাকে, যেন সেই কয়েক ছত্র লেখার মধ্যে কি এক দুরূহ জিনিসের সে সন্ধান করছে···

অর্দ্ধস্ফুট ভাবে সে পড়ে, "আমরা চলেছি··· চারদিকে মাইন ছড়ানো···" হঠাৎ তার অচেতন-রাজ্য থেকে কি এক সংগোপন ইচ্ছা রক্তের মধ্যে দিয়ে ভেসে ওঠে···

—হয়ত···

সে আর বলতে পারে না।

আন্না বুঝতে পারে, সে কি বলতে গিয়ে বলল না ···আপনা থেকে তার চোখ দুটো মাটির দিকে নত হয়ে আসে···

তারা দুজনেই বুঝল, সহসা তারা জীবনের এমন জায়গায় হাত দিয়ে ফেলেছে, যেখানে অপরাধ আপনা থেকে ফেটে পড়ে, কালো আলকাৎরার মত।

দুটি পাথরের মূর্ত্তির মত তারা দুজনে দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে উপরের দিকে চাইল ··অন্ধকারে যে জায়গায় এসে তাদের দুজনের দৃষ্টি এক হয়ে মিলে গেল, সেখানে দেখে, রিচার্ডের দাবীর ঊর্দ্ধে তাদের ভালবাসার অম্লান শতদল ফুটে রয়েছে ·সেই চেতনার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মন থেকে রিচার্ডের মৃত্যুর সংগোপন আকাঙ্ক্ষা মুছে গেল এবং তারা প্রস্তুত হ'ল, যদি দামই দিতে হয়, নিজেদের মৃত্যুমূল্যে তা চুকিয়ে দিতে···

দুটি প্রাণীর এই যে নিঃশেষ মিলন, যার স্পর্শে আপনি ফুটে ওঠে জীবনের অব্যক্ত সব অর্থ, কোথা থেকে এনে দেয় পরম শক্তি, যার বলে, শত দুঃখ-দৈন্য,

ঝড়-ঝঞ্ঝা, এমন কি ক্ষুৎ-ব্যাধি ও মৃত্যুকেও তুচ্ছ করে সে বলে, আমি আছি, সেই চরম সত্য।

দেখতে দেখতে এল নভেম্বর মাস। সমগ্র য়ুরোপের ওপর একটা পাতলা বরফের চাদর কে যেন বিছিয়ে দিল, তার তলায় রক্তের নদী চলতে চলতে বরফের মত জমাট হয়ে গেল···সারা য়ুরোপের শ্মশান-ক্ষেত্রের ওপর মৃতদেহদের কে দিল ঢেকে···রাজা সিংহাসন হারাল···বংশকে বংশ উচ্ছিন্ন হয়ে গেল··· গত দিবসের সৌধশালিনী নগরীর ভগ্নস্তূপে স্তূপে বন্য শার্দ্দূলের মত ঘুরে বেড়াতে লাগল, ক্ষত-বিক্ষত দেহে সৈন্যের দল···

মানুষের দেহ নিয়ে যুদ্ধের কারবার···সে কারবারে মাঝে মাঝে চলতে থাকে বন্দী মানুষের আদান-প্রদান ···আন্নাদের মহল্লায় খবর এল··য়ুরোপে সুরু হয়েছে বন্দীর আদান-প্রদান···ছাড়া পেয়ে কয়েকজন ফিরেও এল তাদের মহল্লায়···কার্ল আর আন্না নীরবে অপেক্ষা করেছিল···হয়ত এই মুহূর্ত্তেই রিচার্ড দরজা ঠেলে ঘরের ভেতর এসে দাঁড়াবে···তারা তাই দরজার দিকে চেয়ে অপেক্ষা করে আছে···আজ না হয়, কাল···কাল না হয়, এক সপ্তাহ পরে···এক মাস পরে···এক বছর পরে···সে ফিরে আসবে···হয়ত না-ও ফিরে আসতে পারে···তারা চেয়ে থাকে···

কার্লের সমস্ত ভাবনা, তার সমস্ত চেতনা যেন জল থেকে বরফের মত জমে হিম হয়ে গিয়েছিল··· গতিহীন, অসাড়···সে ভাবে, মৃত্যু···সে তো ভাল··· কিন্তু বিচ্ছেদ···সে মৃত্যুর চেয়ে মারাত্মক···আন্না মনে মনে কামনা করত, সে চরম আশঙ্কার লগ্ন দ্রুত এগিয়ে আসুক···যা হবার তা হয়ে যাক···এই আশা আর অবাঞ্ছনীয় মৃত্যুর অনিশ্চিত দোলায় নিশি-দিন দোলা অসহ্য।

প্রতিবেশিনীরা এসে তাকে শোনাত, যারা ফিরে এসেছে, তাদের সংসারে কি নিদারুণ সব কেলেঙ্কারী হচ্ছে···সেদিন শুনল, কাদের ঘরে এমন ব্যাপার হয়েছে যে, যে-কোন মুহূর্ত্তে একটা খুনোখুনি হয়ে যাবে। সমস্ত বাড়ী সেই আতঙ্কে যেন দুলছে···

কার্ল যে কাজ করছিল, সে কাজটা প্রায় যাবার মতন হয়েছে···তার মালিকরা তাকে দূরে আর একটা কোন্ কারখানায় তাদের দরকারে পাঠাবে বলে তাকে জানায়, সে যেতে রাজী হয় নি···কাজে যাবার জন্যে বাড়ী থেকে বেরিয়ে রাস্তায় দাঁড়ালেই তার মনে হয়, যদি ইত্যবসরে রিচার্ড বাড়ীতে ফিরে আসে··· সারা দিন সেই অনিশ্চিত বেদনার আশঙ্কায় সে কাজে ভাল করে মন দিতে পারে না···এমন কি নিদ্রাতেও সেই চিন্তা স্বপ্ন হয়ে তাকে আচ্ছন্ন করে রইল···

একদিন সকাল বেলা কারখানায় যাবার জন্যে সে ট্রামে উঠেছে···কিছুদূর যাবার পর হঠাৎ চমকে উঠল ···সে যেন স্পষ্ট দেখল, তাদের পাশ দিয়ে ঘরমুখো যে ট্রাম চলে গেল, তাতে রিচার্ড বসে আছে···

সে যেন স্পষ্ট দেখতে পেল···তাড়াতাড়ি ট্রাম থেকে নেমে পড়ল···রাস্তায় নেমে পাগলের মত সে ছুটতে আরম্ভ করল···ঐ তো সামনে আর এক মোড়ে সৈনিকের পোষাক-পরা কে যেন নামল···সে দ্রুত··· আরো দ্রুত চলতে লাগল···লোকটা তো তাদেরি বাড়ীর দরজায় ঢুকল···তাড়াতাড়ি দরজার সামনে এসে দাঁড়াতেই কার্লের মনে হ'ল, তার বুকে যেন সজোরে হাতুড়ির ঘা দিচ্ছে··ঐটুকু দরজার আড়াল, সে যেন কাটিয়ে ঢুকতে পারছে না তাহলে, সে যা দেখেছে, তা ভুল নয় ··সেই চরম লগ্ন তাহলে এতদিন পরে এল··· মন্ত্রমুগ্ধের মত ধীরে ধীরে সে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল···ঘরের দরজার সামনে এসে আবার সে দাঁড়িয়ে গেল···সমস্ত দেহ তার ঝিম্‌ঝিম্ করছে···দরজাটুকু ঠেলে ভেতরে ঢুকবে সে শক্তি পর্য্যন্ত তার নেই···

সে জানে না···কখন দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকেছে ···চারদিকে চেয়ে দেখেছে···কই, ঘরে তো কোন সৈনিক নেই···আন্না একা খোলা জানালার কাছে বাইরের দিকে চেয়ে অপেক্ষায় রয়েছে···নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার মত···সে-ও অপেক্ষা করে আছে···হঠাৎ তাকে সেই ভাবে ফিরে আসতে দেখে, আন্না আদৌ বিস্মিত হ'ল না···তেমনি নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে দেখল, কার্লের মুখ মড়ার মুখের মত বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে···

কোন কথা না বলে, কার্ল জানালার কাছে এগিয়ে গেল, নীরবে আন্নার মুখখানি একবার তার বুকের মধ্যে টেনে নিল···তারপর তেমনি নীরবে আবার বাইরে চলে এল···

কারখানার দেরী হয়ে গিয়েছে···

দশম অধ্যায়

চাঁই-চাঁই বরফ ঠেলে, ধীরে, অতি ধীরে, পরিতৃপ্ত অজগরের মত, একটা বৃহৎ ট্রেন চলেছে···এত বৃহৎ যে এক ষ্টেশনে তার এঞ্জিন আছে, পেছনের শেষ গাড়ীটা তখনো শেষ ষ্টেশনের লোক তাদের চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে···

যুদ্ধের ফেরৎ সৈন্যরা বাড়ী ফিরে আসছে…ট্রেণের বাইরে থেকেই বোঝা যায়…তাদের বোঁচকা, বন্দুকের ডগা…আটাশোঁটা সব বেরিয়ে আছে…

"মাত্র দশটি ঘোড়ার জন্যে" যে কামরাখানা, সেটাতে উঠেছে অন্তত তার দশগুণ ঘোড়-সওয়ার…সারা ট্রেণে নিয়মমত জায়গা ছিল তিন হাজার লোকের…সেখানে ফিরছে দশ হাজার লোক…দশ হাজার সৈন্য…ঘর-মুখো মানুষের দল…

সেই অসম্ভব বোঝা নিয়ে অসম্ভব, কুৎসিত বরফের দেশের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে ট্রেণ চলেছে…

এঞ্জিনের যা সাধারণ গতি-বেগ তার দশ ভাগের এক ভাগও নেই…কখন ছাড়বে, কখন পৌঁছবে…আজ আর তার কোন ব্যবস্থা নেই…টাইম্-টেবিল ছাপানো আছে এই মাত্র…

চলতে চলতে এঞ্জিন প্রায়ই থেমে যায়…তারপর ড্রাইভার এঞ্জিন থেকে নেমে অনেক কসরৎ করে সামনের রাস্তা পরিষ্কার করে, তবে এগোয় …পুরোনো এঞ্জিন…তার খাদ্যও আজ সম্পূর্ণ জোটে না…কয়লার সঙ্গে অর্দ্ধেক বালি আর পাথর…

লাইনের ধারে ধারে একজন লোক সাইকেল করে ট্রেণের সঙ্গে সঙ্গেই যাচ্ছিল…মাঝে মাঝে ট্রেণের আরোহীরা তার সঙ্গে ভাষার আদান-প্রদান করছিল… সে-ও নিশ্চিন্ত ভাবে, তাদের সঙ্গে আলাপ করতে করতে চলেছে…

—তা তো হবেই…

—বিপ্লব! বিপ্লব!

—তার আর বাকি কি!

—সব বদলে যাবে…

—নিশ্চয়ই!

মাঝখানে ট্রেণটা হঠাৎ থেমে গেল…

সাইকেল-শুদ্ধ সে ট্রেণে উঠে পড়ল…

টিকিটের বালাই নেই…টিকিট-চেকারও নেই। কামরাগুলোর ভেতর মানুষের দেহের বাসি গন্ধ…তার সঙ্গে সস্তা সিগারেট বা সিগারেটের ধোঁয়া মিশে একটা চলন্ত ছোটখাটো নরকের আবহাওয়া তৈয়ারী করেছে…

জানলার কাছে একজন সৈনিক বসেছিল…এদিক্-ওদিক্ চেয়ে তার পকেট থেকে একটা চকোলেট বার করল…যে-দেশের মধ্যে চলেছে, সেখানে চকোলেটের গন্ধ-বাষ্প পর্য্যন্ত নেই…যে-দেশে এখনো চকোলেট পাওয়া যায়, এ সেই দেশ থেকে বহু কষ্টে সংগৃহীত জিনিস…বহু মূল্য তার…কাউকে না দিয়েই সে খায়… কিন্তু সকলের দৃষ্টি এড়াতে পারে না…

—হ্যালো! আরে…চকোলেট খাচ্ছ? কোথায় পেলে?

—ইস্…চকোলেট!

আর একজন জিজ্ঞাসা করে, আসল?

পাশের সহযাত্রী বলে, দেখি একটু শুঁকে! দেবে কি না দেবে ভাবতে ভাবতে, পাশের যাত্রীটি চকোলেটটি টেনে নিয়ে শুঁকে দেখে…তার অধিকাংশ দেহটি তখনো রূপোলী কাগজে মোড়া…সকলের দৃষ্টি সেই চকোলেটের ওপর…যেন নরকের আকাশে একটা তারা উঠেছে…

চুপ্‌চাপ্…কেউ কোন কথা বলে না…কিন্তু প্রত্যেকের মুখ-চোখ যেন সেই এক পাত চকোলেটটুকুর জন্যে কত কথা বলতে চাইছে…বলতে পারছে না…

যার চকোলেট্, সে কি সৌভাগ্যশালী লোক! লোকটা বুঝতে পারে না, কি করবে…পকেট থেকে একটা ছোট ছুরি বার করে, তাই একটু একটু করে খানিকটা চকোলেট কাটল। তারপর সেই এক এক টুকরো, কোন কথা না বলে, সহযাত্রীর হাতে দিল… এতটুকু যে প্রত্যেকের আঙুলে লেগে রইল…তারপর বাকি পাতটুকু পকেটে রেখে দিল।

কে একজন বলে উঠল, রেখে দিলে যে?

—ছেলেদের জন্যে…বাড়ীতে অনেকগুলো ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে আছে আমার…

কেউ আর কিছু বলে না। লোকটা জামার ভেতর থেকে একটা ময়লা ফটো বার করে দেখায়, তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে তার স্ত্রীর ফটো। যেন তাকে জবাব দেবার জন্যে, অন্য সব সৈনিকেরা নিজের জামার ভেতর পকেটে হাত দেয়…প্রত্যেকেই বার করে একখানা করে ফটো…তাদের চেহারা, পোষাক, সব কিছুর যতই ময়লা, পুরোনো…

এর ফটো ও টেনে নিয়ে দেখে…ওর ফটো সে টেনে নিয়ে দেখে…এই ভাবে ফটোগুলো হাতে হাতে সারা কামরায় ঘুরে বেড়ায়…সেই সঙ্গে সকলে এক-সঙ্গে বলতে আরম্ভ করে, যে যার সংসারের গল্প… উচ্ছ্বাস, স্মৃতি, হা-হুতাশ…

কি-হতে-পারত, কি হ'ল না…শুকনো কণ্ঠস্বর ভিজে আসে সবাই বলে…কেউ শোনে…কেউ শোনে না…ঘর-ছাড়া মানুষের দল মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে চলেছে ঘরের দিকে…সঙ্গে তাদের কিছুই নেই… আছে শুধু ঘরে-ফেরবার আকুল বাসনা…

চকোলেটের সৌভাগ্যশালী মালিকের সামনেই

রিচার্ড বসেছিল…রিচার্ড তার ফটোখানা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে, তার হাতে ফেরৎ দিয়ে দিল…তার বদলে নিজের জামার পকেট থেকে সেই-ই কোন ফটো বার করতে পারল না…

"ঐটেই আমার মস্ত-বড় ভুল হয়ে গিয়েছিল… আমার স্ত্রীর একখানাও ফটো সঙ্গে ছিল না…এই ক'বছর ধরে তার জন্যে কম অনুতাপ হ'ত…একদিন… দুদিন নয়…চার চার বছর…এখন কি রকম দেখতে হয়েছে…কে জানে…?

তার শেষের কথার উত্তরে কে একজন রসিকতা করে বলে উঠল…ফিরে গিয়ে দেখবে…"ঠিক স্বাভাবিক অবস্থাতে"ই আছে !

একদল সৈনিক হেসে উঠল। ট্রেণটা হঠাৎ যেন ধাক্কা খেয়ে নড়ে উঠল…তার পরেই থেমে গেল… এমনি করেই সে এগিয়ে চলেছে…আবার ট্রেণের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলতে থাকে…বসবার জায়গায় যে সবাই বসে আছে, তা নয়, বস্তা, লাগেজ…তারই ওপর পিঠে পিঠ দিয়ে তারা বসে চলেছে…দরজার দিকটা তো বস্তায় আর লাগান বন্ধ…

ট্রেণটা কোথায় এসে থামল দেখবার জন্যে রিচার্ড কোন রকমে জ'নালার ফাঁকের ভেতর দিয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়ল…পা ছাড়িয়ে হাঁটবার চেষ্টা করল…যেন দেখছে পাগুলোর চলবার শক্তি আছে কি না… বস্তাবন্দী হয়ে এত দূরের পথ আসতে আসতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব প্রায় অসাড় হয়ে এসেছে…

রিচার্ডের মতন প্রত্যেক কামরা থেকে কেউ না কেউ নামলই। তারা প্রত্যেকেই মাটিতেই পা দিয়ে, সর্ব্বাঙ্গ এলিয়ে হাই তুলে, হাত-পা ছুঁড়ে দেখে নিল, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সব যথাস্থানে আছে কি না…

রিচার্ডের হেঁটে দেখবার একটা বিশেষ কারণ ছিল…কারণ, ছাড়া পাবার কিছুদিন আগে, হঠাৎ তার একটা পা জখম হয়ে যায়…পায়ের ওপর দিয়ে একটা ভারী লোহার চাকা চলে যায়…

খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে কয়েক পা এগিয়ে গেল… সামনেই শাদা বরফের চাঁই…তার ওপর গিয়ে দাঁড়িয়ে …দূরে কি-যেন দেখবার চেষ্টা করলো…সারা দেহ থেকে, ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের দেহের যে-সব স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দিয়েছিলেন, মহাযুদ্ধ যেন তা চেঁছে-ছুলে বার করে নিয়েছে…শাদা বরফের চাঁই থেকে যখন সে আবার ট্রেণের দিকে ফিরে আসছিল, তখন মনে হচ্ছিল যেন, পৃথিবীর গহ্বর থেকে ক্ষুধার্ত্ত আদিম বন্য প্রাণী দুর্ভিক্ষের তাড়নায় যেন হামাগুঁড়ি দিয়ে আবার পৃথিবীর ওপর দিয়ে চলেছে…কুৎসিত বীভৎস…

তবুও সে ভাবে…আর ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই সে গিয়ে দাঁড়াবে…সেই ঘরে…তার আন্নার সামনে…

ঠিক সেই সময় আন্নাকে ধাই আশ্বাস দিচ্ছিল… ভয় নেই…সব ঠিক আছে…সব ঠিক আছে…

যদিও তার দেহে কোন বিশেষ যন্ত্রণা হচ্ছিল না, কিন্তু কার্ল কিছুতেই শুনল না, একজন পাস-করা ধাত্রীকে নিয়ে এসে তাকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখাল…

—চমৎকার স্বাস্থ্য…দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়… উঃ,…যে সব কেস আমাকে রোজ দেখতে হয়…তার তুলনায় তোমার দেহ তো অপ্সরীর দেহ !

বৃদ্ধা ধাত্রী হাসতে হাসতে বলে…

পরিপূর্ণ নগ্নদেহে আন্না শুভ্র বিছানায় শুয়েছিল… ঘরেতে আপেল সিদ্ধ হচ্ছিল…তার মধুগন্ধে ঘরটা ভরে গিয়েছিল…

এদিকে রিচার্ড…একগাল দাড়ি…আর জটা-পড়া চুল নিয়ে কামরার জানালার মধ্যে দিয়ে মুখ বাড়াল… দুটো হাত ভেতরে দিয়ে ঢুকিয়ে দিতে কয়েক জন সহযাত্রী ধরে টানল…বন্য জন্তুর মত লাফিয়ে রিচার্ড আবার গাড়ীর ভেতর ঢুকল…

সন্ধ্যের মুখে ট্রেণটা একটু একটু করে শহরের মধ্যে ঢুকতে আরম্ভ করল…শহরের আশে-পাশে ছোট-খাট বাড়ীর পাশ দিয়ে…কারখানাগুলোর গা ঘেঁসে… কার্ল তখন সেই কারখানার কোন একটা কারখানাতে বসে ভাবছিল…

সারা পথ গাড়ীর ভেতর সকলে একসঙ্গে এসেছে…কথায় কথায় প্রত্যেকের মনের খবর প্রত্যেকেই জেনেছে…

কথা আর কথা আর কথা…কিন্তু গাড়ীটা যতই শহরের কাছে এগিয়ে আসতে লাগল…ততই তাদের কথাবার্ত্তা যেন ক্রমে কমে আসতে লাগল…

কথার বদলে তারা যেন কেমন করে এ-ওর মুখের দিকে চায়…কথা তারা আর বলতে পারে না…তাদের মন চলে গিয়েছে…তাদের বাড়ীতে…তাদের ঘরে… যারা তাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে…অন্তত অপেক্ষা করে যাদের থাকবার কথা…তাদের মধ্যে…

রিচার্ডের এক অসাধারণ ঐশ্বর্য্য ছিল…সে হ'ল তার অস্বাভাবিক মানসিক স্থৈর্য্য…কোন সুখ…বা কোন বেদনা হঠাৎ তাকে বিচলিত করে তুলতে পারত না…একটা সীমা ছিল, যার মধ্যে তার মন কোন সুখ

বা কোন দুঃখেই জ্বলে উঠত না···অন্তত বাইরে তার প্রকাশ কেউ দেখতে পেত না···

কারা-জীবনের প্রতিদিনকার যে লাঞ্ছনা, সীমাহীন যে তিক্ত বেদনা, নিমেষে নিমেষে যা মানুষের দেহ-মনকে কুরে-কুরে খেয়ে ফেলে, যা তার অধিকাংশ সহযাত্রী বন্দী-বন্ধুদের মন থেকে আত্মমর্য্যাদার শেষ চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত ধুয়ে-মুছে ফেলে দিয়েছিল, তাকে কিন্তু ভেতর থেকে এতটুকুও ছুঁতে পারে নি।

যতক্ষণ সে বুঝত, তার সহ্যের সীমা-রেখার মধ্যে সব আছে, ততক্ষণ তার ভাব-হাব দেখে বোঝবার কোন উপায়ই থাকত না যে, তার মনে কোন কিছু ঘটছে। সে নিজেও মনে করত যে, তেমন কিছুই ঘটে নি।

তার মনে পড়ে, শুধু একবার তার মনের সেই বাঁধ ক্ষণিকের জন্যে ভেঙ্গে গিয়েছিল।

সারা দিন মাঠে মাটি কেটে, শ্রান্ত-ক্লান্ত-ভগ্নদেহে যখন সন্ধ্যা বেলা সে ছাউনীতে ফিরে এসেছিল সেদিন পাথরের থালা তুলে যেই সে খেতে যাবে···অমনি··· বিনা কোন কারণে, প্রহরীটা এসে, তার হাত থেকে থালাটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দিল···সামান্য সেই কয়েদীর খাদ্য ধূলোয় ধূলো হয়ে গেল···তার ওপর বুট-শুদ্ধ পা তুলে দিয়ে লোকটা চীৎকার করে বলে উঠল···কুড়িয়ে খা···খা কুড়িয়ে···কুকুর···

রিচার্ড স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে ছিল···এমন সময় সজোরে সেই লোহার থালাটা তুলে তার মুখে আঘাত করল··· খাবার থালায় নিজের মুখের রক্ত লেগে লাল হয়ে গেল···

তখন তার মুখের চেহারা দেখে বোঝবার অবশ্য কোন উপায় ছিল না যে, তার মনের ভেতর তখন কি হচ্ছিল···একটা এঞ্জিন—অনেক দিন ধরে যেন তা অচল হয়ে পড়েছিল···হঠাৎ তার একটা যন্ত্রের ওপর আজ চাপ পড়েছে···

সে ধীরে ধীরে সেখান থেকে সরে গেল···খুব জোরেও নয়···খুব আস্তেও নয়···প্রতিদিন যেমন ভাবে সে চলে···কিছু দূরে একটা জায়গায় একটা মস্ত বড় লোহার কুড়ুল পড়েছিল···আস্তে আস্তে সেই কুড়ুলটা তুলে নিল···

তার মনে তখন সে স্থির করে ফেলেছে যে, সেই কুড়ুল দিয়ে প্রহরীটাকে সেইখানেই মেরে ফেলবে···সে জানে, তার আধ ঘণ্টা পরে তাকেও মরতে হবে··· কিন্তু সে নিরুপায়···যতক্ষণ তার সহ্যের সীমার মধ্যে ছিল, সে সহ্য করেছে···এখন তার মধ্যে যে-সব কল-কব্জা নড়ে উঠেছে···তার ওপর কোন অধিকার তো তার নেই···সুতরাং ফলাফল সম্বন্ধে ভাববারও তার কোন প্রয়োজন নেই···সহ্য করাও তার পক্ষে যেমন সহজ স্বাভাবিক ছিল, আজ সেই প্রহরীটাকে মেরে ফেলাও তেমনি সহজ, স্বাভাবিক···

তেমনি ধীরে ধীরে সে ফিরে এল···কুড়ুল তুলে দেখে···লোকটা সেখানে নেই···সেখান থেকে চলে গিয়াছে···

রাত্রির শেষ প্রহরে সে আবার আসবে···রিচার্ড তার অপেক্ষায় তেমনি দাঁড়িয়ে রইল···ভাগ্যক্রমে লোকটি সেই রাত্রিতেই বদলি হয়ে গিয়েছিল—

—

একাদশ অধ্যায়

ট্রেণ থামল···চারিদিকে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল···

রিচার্ড সহযাত্রী বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আস্তে আস্তে ষ্টেশন থেকে বেরুল···

তার চলার ছন্দ থেকে বোঝবার কোন উপায়ই ছিল না যে, সে চলেছে এতদিনের পুঞ্জীভূত অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার প্রেরণায়···আনন্দে, উদ্বেগে, আকুলতায় তার উপবাসী চিত্ত ভরপুর!

চার বছর ধরে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সে আন্নাকে ধ্যান করেছে···তার সঙ্গে মিলন-বাসনায় চার বছর ধরে সে আকুল-জীবন যাপন করেছে···সেই চার বছরের সঞ্চিত অনুরাগই তাকে শিখিয়েছে অপেক্ষা করে থাকতে—

অপেক্ষা করে থাকতে থাকতে তার মন যেন আন্নার সত্তায় লীন হয়ে গিয়েছিল—তার মন তো আন্নাকে পেয়েই গিয়েছিল, তপস্যার মধ্য দিয়ে সাধক যেমন তার ইষ্টকে পায়।

তাই জাগতিক এই মিলনের জন্য তার বিশেষ তাড়াতাড়ি ছিল না···সে তো জানতই যে তার লক্ষ্য ঠিকই আছে···এবং সে সেইখানেই গিয়ে পৌছবে···শুধু মাঝে মাঝে, তার এই পর্ব্বত-স্থির বিশ্বাসের মধ্যে, কি যেন সন্দেহ, কি যেন ভাবনা খড়ের কুটোর মত উড়ে চলে যেত···বৃহৎকায় ঐরাবতের চারদিকে লঘুপক্ষ পতঙ্গের মত···

ষ্টেশন থেকে বাড়ী সুদীর্ঘ পথ···ট্রাম চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে···পায়ে হেঁটেই রিচার্ড চলে···

এদিকে আন্না টেবিল সাজিয়ে দেখে রুটি নেই··· রুটি কিনতে সে বেরিয়েছে···সারা দিন সে উদ্বেগে কাটায়···সন্ধ্যা হলে, তার মন একটু স্থির হয়, কেন না, সেই সময় কার্ল কারখানা থেকে ফেরে।

রাস্তার যেতে যেতে একটা খালি গাড়ী তার পাশ দিয়ে চলে গেল…তাকে খুঁড়িয়ে চলতে দেখে গাড়োয়ান গাড়ীটা থামাল…

—ঐ পথেই যাচ্ছি…উঠে পড়তে পার।

রিচার্ড খোলা গাড়ীর পেছন দিকটায় খুঁড়িয়ে ওঠে…

বাড়ীর কাছাকাছি এসে রিচার্ড গাড়ী থেকে নামে, গাড়ীটা অন্য রাস্তা দিয়ে চলে গেল…

বাকি পথটুকু হেঁটেই আসতে হ'ল…দরজার সামনে যখন এল…তখন মেরী আর মেরীর দিদির সেই লোকটি সেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছে…রিচার্ড ভাল করে বাড়ীটা একবার দেখে নিল…সেই বাড়ী…সবই ঠিক আছে…শুধু একটু পুরানো হয়ে গিয়েছে…

রিচার্ডকে সেই ভাবে বাড়ীর দিকে চেয়ে থাকতে দেখে, লোকটি জিজ্ঞাসা করে, আপনি কি এ বাড়ীতে কাউকে খুঁজতে এসেছেন?

মেরী একবার লোকটির দিকে ভাল করে চায়… বিরাট দেহ…কিন্তু যুদ্ধ যেন ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে… আসল ইস্পাৎ…কিন্তু চটা উঠে গিয়েছে…

রিচার্ড তার স্বাভাবিক সরলতায় উত্তর দেয়, খুঁজছি তো নিশ্চয়ই…আমার স্ত্রীকে খুঁজছি…

—আপনার স্ত্রী?

—হাঁ…আন্না! সে কি এ-বাড়ী ছেড়ে দিয়েছে?

—না…ছাড়ে নি…কিন্তু…

মেরী যেন আর কিছু বলতে পারে না…যেন সে সেখান থেকে নড়তেও পারে না…

পাশ দিয়ে তখন সেই বাড়ীরই আর একজন ছোকরা এসে পড়েছিল। সে কথা মেরী বলতে পারল না, সে হাসতে হাসতে বলে উঠল,—কিন্তু আন্নার তো একসঙ্গে দুজনের সঙ্গে বিয়ে হয় নি…

রিচার্ড শুনতে পায় নি, সে তখন বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়েছে, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে…

আন্না তার ঘর থেকে শোনে, কে যেন ওপরে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে…এ রকম ভারী আওয়াজ কার?

ঘরের দরজা খোলাই ছিল…সেই খোলা দরজা দিয়ে আন্নাকে দেখা যাচ্ছিল…তার নিজের রূপের ওপর যেন আর একটা রূপের পর্দা পড়েছে…রূপ ভেঙ্গে পড়েছে…রূপ ভেঙ্গে পড়বার আগে, গর্ভিণী নারীর যে অসামান্য রূপ ক্ষণকালের জন্যে দেখা দেয়…

আন্না ঘাড় ফিরে দেখে, প্রায় সমস্ত দরজাটা জুড়ে, কে একজন অপরিচিত লোক দাঁড়িয়ে…তার গায়ের রঙ যেন পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছে…তার ছেঁড়া ময়লা জামা, দাড়ি-গোঁপ-না-কাটা মুখ…সমস্ত দেহের অবসন্ন ভঙ্গী থেকে পর্য্যন্ত যেন একটা পচা গন্ধ বেরুচ্ছিল…

কেউ কোন কথা বলল না। আন্না নীরবে শুধু চোখ দিয়ে প্রশ্ন করল…তার চোখ স্থির হয়েই রইল…

একবার চকিতে সে লোকটি যেন ঘরটিকে ভাল করে দেখে নিল, তারপর জিজ্ঞাসা করল, এ কি আন্না, তুমি আমাকে চিনতে পারছ না?

আন্না তো তাকে জানে না। রাস্তায় সহস্র লোকের মধ্যে সে যদি তার পাশ দিয়ে চলে যেত, আন্না তো চিনতে পারত না। আন্না তো তাকে জানে না…তবে জেনেছে যে…সে নিশ্চয়ই সে! আন্নার মনে হ'ল, তার দেহের সমস্ত রক্ত যেন তীব্রবেগে পা থেকে মাথার দিকে চলেছে…তার জামার তলায় গায়ের চামড়ার ওপর থেকে যেন একটা গরম বাষ্প উঠছে…

লোকটি বিছানার কাছে এগিয়ে গিয়ে, দুটি হাত বাড়িয়ে দিল। যন্ত্রচালিতের মত আন্না তার হিম-শীতল আঙুলগুলো তার ওপর দিল…রিচার্ড সন্তুষ্ট হয়ে গেল…তাদের ছিন্ন সম্পর্ক চার বছরের পরে এই একটু ছোঁয়ায় আবার জোড়া লেগে গেল…

এক বন চুল…তার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা মুখ লুকিয়ে আছে…সেই মুখটা ক্রমশ তার মুখের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল…আপনা থেকে আন্নার মাথাটা পেছন দিকে সরে গেল…

—বড্ড নোংরা…বুঝেছি…তা…কম পথটা তো নয়।

এতক্ষণ তার হাতের বাণ্ডিল হাতেই ছিল…এইবার সে আস্তে আস্তে পুঁটলীটা সামনের চেয়ারের ওপর রেখে দিল, যে চেয়ারের ওপর কয়েক মাস আগে, কার্ল ঠিক এমনি একদিন তার পুঁটলী রেখেছিল… গায়ের ময়লা কোটটা খুলে আলনার রাখতে গিয়ে তার মনে হ'ল, সেই পরিষ্কার ঝকঝকে ঘরের সঙ্গে তার ময়লা কোটটা যেন বড়ই বিসদৃশ লাগছে…আলনাতে রাখতে গিয়ে রাখতে পারল না…অথচ কোটটাকে নিয়ে কি করবে, তা-ও ঠিক করে উঠতে পারল না…

আর একবার সে ঘরটার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিল…চোখে তার আনন্দের আভাস…সেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, শুভ্র ঘরে, সেই সুন্দরী নারীর সহবাসে, আবার বসবাস করবার সম্ভাবনার আনন্দে সে চোখের দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল…আন্নার দিকে ভাল করে চাইতে, তার আনন্দ উছলে উঠল, আন্না আমার আন্না…কতদিন ধরে তোমাকে অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছে…আজ

আমি বুঝছি হঠাৎ তুমি বিস্মিত হয়ে গিয়েছ···সে অপেক্ষা করা শেষ হয়ে গিয়েছে, আন্না···

যখন রিচার্ড আসে নি···যখন তার আগমন-আশঙ্কায় প্রতি মুহূর্ত্ত তাকে উদ্বেগে কাটাতে হয়েছে, সে ভেবে স্থির করে রেখেছিল যে, যে-মুহূর্ত্তে রিচার্ডের স'ঙ্গ দেখা হবে···সেই মুহূর্ত্তেই সব কথা সে তাকে জানিয়ে দেবে···কিন্তু আজ যখন দেখা হ'ল, সে কোন সত্য কথাই বলতে পারল না,···নীরব থেকে সে সত্যকে ফিরিয়ে দিল। এতদিন পরে, রিচার্ডের স'মনা-সামনি দাঁড়িয়ে, সে আজ বুঝতে পারল, তার যা ঘটে গিয়েছে সে-ব্যাপারটির গভীরতা কতখানি···

তার বাক্-শক্তি যেন সম্পূর্ণ ভাবে চলে গিয়েছিল···আর কি কথাই বা সে বলবে···তার তো বলবার কোন কথাই ছিল না···ঝগড়া করবারও কিছু ছিল না···

রিচার্ড এতক্ষণ বাদে নিজে বিস্মিত হয়ে পড়ে···দেখে, আন্না যেন হঠাৎ মড়ার মত বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে···আন্না সেই অবস্থাতেই উঠে দাঁড়াল···তার সামনে দিয়ে দরজার কাছে এল···সেখান থেকে বাইরে চলে গেল···

সিঁড়ি দিয়ে···উঠোন পেরিয়ে···রাস্তায় ছুটে···আন্না চলে···সেখান আছে কার্ল···

দ্বাদশ অধ্যায়

কার্ল সেদিন ট্রাম পায়'নি বলে অলি-গলি দিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরছিল···

সেই ছোকরাটি যে মেরীর মুখের কথা নিয়ে বলেছিল, আন্নার তো একসঙ্গে দুজনের সঙ্গে বিয়ে হয় নি···সে ছোকরা তখনো দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল···কার্লকে বাড়ীতে ঢুকতে দেখে, সে মৃদু হেসে উঠল। তার সঙ্গে আরো দুজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের সে সেই কথা বলছিল। কার্লকে দেখে, তাদের শুনিয়ে সে বলে উঠল, তা হলে এখন কি হবে?

বাড়ীর বহু লোক তখন জেনে গিয়েছিল যে, আর একজন সৈনিক ফিরে এসেছে, সে না কি বলেছে, আন্না তার স্ত্রী!

যেদিন থেকে সেই দুটি প্রাণী জেনেছিল যে, রিচার্ড ফিরে আসবে··ফিরে আসতে পারে···সেই দিন থেকে এক অজানা আতঙ্ক তাদের দুজনকে এক অবাস্তব নতুন পৃথিবীতে টেনে নিয়ে গিয়েছিল···সেই মায়া-জগতে তারা দুটিতে এমন ভাবে মিলে-মিশে ছিল যে, সেখানে জগতের আর কারুরই প্রবেশ করবার স্থান ছিল না, তাদের দুজনের মাঝখানে এতটুকুও ফাঁক ছিল ন', যার মধ্যে আর অন্য কিছু এসে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে···সেখানে, সামান্য কথা একটু ছোঁয়া, একটু যাওয়া···সবই ছিল যেন নিবেদন···প্রেমের নীরব ঘোষণা···

একতলার সিঁড়ির ওপরে আসতেই কার্লের গতি যেন আজ আপনা থেকেই মন্থর হয়ে গেল···পরক্ষণেই মনে হ'ল, আন্না যেন ব্যাকুল হয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করছে···

তাড়াতাড়ি ওপরে ওঠে, সে ঠেলে দরজা খুলল···তার মনে হ'ল তার পায়ের শব্দ আন্নার কাছে পৌঁছে গিয়েছে···আন্নার প্রেমের নীরব আকুতি বাতাসে তার কাছে চলে এসেছে···

কিন্তু ঘরের মধ্যে যেতেই সে বিস্ময়ে স্থির হয়ে গেল···সে বিস্ময়ের কোন তুলনা নেই···যেন এইমাত্র যে উঠোন দিয়ে ঘরে ঢুকেছি···সেই ঘর থেকে আবার বেরোতে গিয়ে দেখি, কোথাও কিছু নেই, উঠোন নেই, মাটি নেই···মহাশূন্য!

রিচার্ড বিস্মিত হয়ে বলে উঠে, তুমি!

কিন্তু তার ভেতরে চাঞ্চল্যের কোন চিহ্ন বাইরে ছিল না।

রিচার্ড বলে, আমি ভাবতেই পারছি না যে আবার তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল···এবং এত শীঘ্র···আমি মিনিট তিনেকও হয়নি···এই ঘরে এসেছি···আমি বলছি···না···আগে তুমি বস···

এই বলে চেয়ারটা দেখিয়ে দেয়···

—চেয়ারে না বস···বিছানায় বসতে পার!

কার্লের সারা দেহ-মন জানতে চাইছিল, আন্না কোথায়। কিন্তু কিছুতেই সে প্রশ্ন কেন যেন সে করতে পারল না···সে বসল···চেয়ারে নয়···বিছানায়···

মানুষে যা সইতে পারে না, নীরবে তা সহ্য ক'রে, মানুষে যা বইতে পারে না, নীরবে তা বহন ক'রে, তার লৌহ-দেহ আজ তাকে তার লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছে···

কার্লের দিকে চেয়ে সে প্রশ্ন করে চলে, তা হলে তুমিও এখানে থাক? কিছু খেয়েছ? কখন ফিরলে? এখনো খাও নি কেন? মনে হচ্ছে, আন্না এখনি ফিরে আসবে···দেখছ না খাবার তৈরী···দুজনেই খাওয়া যাবে···

কোন উত্তর পায় না···তবু প্রশ্ন করে চলে···তার সামনে টেবিলে খাবার সাজানো···সবে তৈরী হয়েছে···নাকে তার সুঘ্রাণ আসছে···ছোট ছেলে যেমন করে

তার ক্রিস্মাস্ উপহারের দিকে চেয়ে থাকে, রিচার্ড তেমনি করে টেবিলের খাপের দিকে চেয়ে থাকে··· মাঝে মাঝে কার্লের দিকে চোখ তুলে চায়···সে চাউনি যেন বলে, এই দেখ, তোমাকে বলেছিলাম, আন্নার কথা ···এখন মিলিয়ে নাও···এই আমার আন্না···

কার্ল দেখে, রিচার্ড তার পুঁটলী খুলে একে একে তার সব জিনিস বার করে গুছোতে থাকে···যেগুলো একটু ফর্সা, সেগুলো ড্রয়ার খুলে ভেতরে রাখে··· ময়লাগুলো টেনে জড় করে চেয়ারের তলায় রেখে দেয়···

—আন্না সব কেচে সাফ করে দেবে···নিজের হাতে ···সোডা দিয়ে অবশ্য ফুটুতে হবে···

আপনার মনেই সে বলে চলে···তার পরিচিত ঘর ···তার কোথায় কি আছে যেন সে সব জানে···এটা টেনে দেখে···ওটা টেনে দেখে···

—কি···কোটটা খুলে ফেল না···আরাম হবে··· মনে কর, এ তোমার নিজেরই ঘর···ওঃ···সত্যি তোমাকে দেখে বড় খুশী হলাম···

কার্ল শুনেই যায়···

কিন্তু সে শুধু শুনতে চায়, আন্না কোথায়? কিছুতেই সে প্রশ্ন আর সে করতে পারে না···মনে মনে ভাবে···তুমি ভাবছ, এ ঘর তোমার···এ ঘরে আমি আগন্তুক আর তুমি গৃহ-স্বামী···না···এ ভুল ভেঙে দেব ···নিশ্চয়ই···

এই সঙ্কল্প করার সঙ্গে সঙ্গে তার মনের মধ্যে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তা যেন দূর হয়ে গেল··· সে যেন এতক্ষণ পরে স্বাভাবিক ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারল···সে বুঝল, তার সামনে জীবন-মৃত্যুর সংগ্রাম...হয় সংগ্রামে জিতে বাঁচতে হবে···নয়, মরতে হবে···তার মাঝামাঝি আর কিছু নেই···সুতরাং নিশ্চল নির্বাক্ হয়ে বসে থাকার কোন মানে নেই···

সে নিজের মনে এই ভাবে শক্তি সংগ্রহ করে নেয়···

এমন সময় কার্ল দেখে, আন্না আসছে···

আপনার অজ্ঞাতসারে সে চীৎকার করে উঠল, এই য়···এই যে···আন্না···

সেই কথা কয়টির পেছনে যে মহা-আলোড়ন ছিল, রিচার্ড তা বুঝতে পারে না···

আন্না কোন রকমে ঘরে এসে দাঁড়াল, তার সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম ঝরে পড়ছে, চোখ দুটো যেন আরো বিস্ফারিত হয়ে গিয়েছে, মাথার সামনের সমস্ত চুল ঘামে গালে এসে লেগে রয়েছে···

অর্দ্ধস্ফুট স্বরে সে যেন জিজ্ঞাসা করে, বল না, সে কি এখানে আছে?

রিচার্ড অবাক হয়ে যায়···কে···কাকে খুঁজছে আন্না···

আন্না টলতে টলতে রিচার্ডের দিকে এগিয়ে যায়, তারপর কি মনে করে ফিরে কার্লের দেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে···কার্ল দুই বাহু দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে···

সেই বাহুবন্ধনের মধ্যে যেন কার্ল এতক্ষণ পরে জীবনের স্পন্দন খুঁজে পায়···তার পৃথিবী যেন তার পায়ের তলা থেকে সরে গিয়েছিল···এতক্ষণ পরে আবার সেই পরিচিত পৃথিবীতে সে যেন পা দিয়ে দাঁড়ায়···

রিচার্ড তাদের কাছে এগিয়ে আসে, তখনো সে কিছুই বুঝতে পারে না···

—কি হ'ল? আন্না···আন্না···

আন্নার যতটুকু শক্তি অবশিষ্ট ছিল, তাই দিয়ে কার্লের বাহুবন্ধন থেকে সে নিজেকে মুক্ত করে···কিন্তু সোজা দাঁড়াতে না পেরে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়···

কার্ল সোজা রিচার্ডের দিকে চেয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলে, তুমি আন্নাকে ছেড়ে দাও···

তার মানে? রিচার্ড বোঝবার চেষ্টা করে···যেন বহু দূর থেকে কি একটা জিনিসের আভাস সে দেখতে পাচ্ছে···তাকে ভালো করে দেখতে গেলে, যেন তার আরো কাছে যেতে হবে···তারই অবসরে সে ভাবে··· যদি তাই-ই হয়···তা হলে এইখানে···ওদের দুজনকেই একসঙ্গে পুঁতে ফেলব···কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে, আন্না যদি মরে যায়, আন্না যদি চলে যায়···তা হলে···

নিজেকে সামলে নিয়ে রিচার্ড জিজ্ঞাসা করে, এ-সবের মানে কি?

কেউ কোন উত্তর দেয় না···

—কি···উত্তর দাও···আন্না···বল···এ-সবের মানে কি? আন্না···

কোন উত্তর নেই···

রিচার্ড আন্নার দিকে এগিয়ে চলে···

কার্ল মাঝখানে এসে দাঁড়ায়···

বলে, আন্না···আমার স্ত্রী···আমি বলছি সব··· শোন···

হঠাৎ রিচার্ডের চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবী যেন অন্ধকার হয়ে যায়···যখন আবার তার দৃষ্টি ফিরে এল··· সে দেখে···আন্না···অন্তঃসত্ত্বা···

রিচার্ড চীৎকার করে ওঠে, ওঃ···বুঝেছি··· বুঝেছি···পশু···

কিন্তু বাইরে রাগের আর কোন চিহ্ন নেই···ঠিক যেমন ছিল না···যেদিন রিচার্ড সেই প্রহরীটিকে খুন করবার জন্যে কুড়ুল আনতে গিয়েছিল···

সেই ঘরের কোণেও একটা কুড়ুল ছিল···রিচার্ডের নিজের হাতে তৈরী···সেই কোণেই ছিল···যেখানে বরাবর থাকত···রিচার্ড ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হয়···ভাবে···আন্না অন্তঃসত্ত্বা···এবং ঐ পাজী বদমায়েসটার দরুণ আমাকে বোঝাতে চায়···কি বোঝাবে? আন্না? অন্তঃসত্ত্বা? তার পেটে ছেলে? তবুও সে আন্না···তাকে ক্ষমা করা চলে···কি ঐ লোকটা···কখ্‌খনই না···

রিচার্ড ঘরের কোণের দিকে এগিয়ে চলে··· ঐটুকু তো দেহ···এক আঘাতেই সব শেষ হয়ে যাবে···

কিন্তু রিচার্ড জানত না, তাকে আঘাত করবারও অস্ত্র ছিল···সে-অস্ত্রে সে-ও অসহায় ভাবে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে···সে জানত না···কোথায় আছে সে অস্ত্র··· সে আঘাত···

আন্না এগিয়ে গিয়ে রিচার্ডের সামনে দাঁড়ায়··· বলে···

—ওকে মারতে পারবে না···ওকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না···মারতে হয়, আমাকে মার··· রিচার্ড···

বলতে বলতে সে ভেঙ্গে পড়ল···আপনার মনে লোকে যেমন মন্ত্র জপে, তেমনি করে আন্না বার বার বলতে লাগল, জানি না, কেমন করে হ'ল, তবে হ'ল··· এই জানি···

—ওকে ছাড়া বাঁচতে পারবে না? তবে আমি? আমাকে চাও না আন্না?

—আজ আমি নিরুপায়!

আর আঘাত করবার ক্ষমতা তার ছিল না···তার বদলে আহত হয়ে সে নিজেই ভেঙ্গে পড়ছিল···অরণ্যে কাঠুরিয়ার হাতের লৌহের আঘাতে যেমন করে বনস্পতি ভেঙ্গে পড়ে···

টলতে টলতে টেবিলের সামনে এসে পড়ল···কোন কিছুই বিশ্বাস করতে তার মন চাইছিল না···

—তুমি পার না···তুমি···আন্না···কেন পার না? কেন পার না, আন্না? শুধু ওকে···শুধু ওকেই তুমি চাও?

মুমূর্ষু লোক শেষ নিশ্বাসটুকু নেবার জন্যে যেমন করে নিজের সমস্ত দেহ-যন্ত্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে, তেমনি রিচার্ড, যদিও বুঝেছিল যে তার নিশ্বাস আয়ু-শ্বাসটুকুও নিয়ে গিয়েছে, তবুও তখন নিজের মনের সঙ্গে সংগ্রাম করে চলেছিল···

—বল···বল···আমাকে বল···আমি বুঝতে চাই··· জানতে চাই···বল···

সে জোর করে ওঠবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না—

—আমি জানতে চাই···আমাকে বল···

তারপর আর কোন কথা সে বলল না···নীরবে দেয়ালের দিকে চেয়ে চেয়ারে বসে রইল···

তারা দুজনে তার দিকে যায়···

ঘরের জিনিস-পত্র গোছাতে আরম্ভ করে···রিচার্ড কোন কথা বলে না···তার চোখের পাতাও পড়ে না··· জিনিস-পত্র গোছাতে গোছাতে আন্না অতর্কিতে রিচার্ডের সামনে গিয়ে পড়ে···কিন্তু রিচার্ড তাকে স্পর্শ করবারও চেষ্টা করে না···তারা নীরবে তাদের জিনিস-পত্র গুছিয়ে চলে···

ভয়ে ভয়ে মেরী এসে দরজায় দাঁড়ায়···কেউ কোন কথা বলে না···মেরী নীরবে তাদের সাহায্য করে··· সেই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতায় যোগদান করতে তারও মন কাঁদে না···

প্রেম নিষ্ঠুর···তার চেয়ে নিষ্ঠুর শক্তি জগতে আর কিছু নেই···তার আলোয় আর সব-কিছু পুড়ে যায়··· সে চেয়েও দেখে না···তীব্র ভক্তি, অগাধ স্নেহ, অকুণ্ঠ ত্যাগ···তার মারাত্মক আত্ম-প্রীতির কাছে কিছুই নয়···সে যাকে চায়···সে ছাড়া জগতে আর কাউকে সে চায় না···সে যা চায়···তা ছাড়া জগতে আর কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করে না···

রিচার্ডের সামনেই তাদের চলে-যাওয়ার আয়োজন করতে লাগল···রিচার্ড একটি কথাও মুখ দিয়ে উচ্চারণ করল না···তার চোখের সামনে···ছায়াছবির মত ভেসে ভেসে চলেছিল···তার অতীত দিনের স্মৃতি···আন্নার সঙ্গে তার জীবনের শত শত খণ্ড স্বর্গ···একবার সে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল···শেষবার চেষ্টা করে দেখবে···বোঝাবে···আন্না কি বুঝবে না? কিন্তু মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না···সে আধার আহত পারাবতের মত চেয়ারে লুটিয়ে পড়ল···

যা নেবার, তা শেষ হয়ে গেল। তারা প্রস্তুত···চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত···

কার্ল পুঁটলীটা তুলে নিল।

আন্না দরজার কাছে এসে ফিরে দাঁড়াল···

—রিচার্ড!

—যাও!

এই তার মুখ দিয়ে এই প্রথম কথা বেরুল। দরজা দিয়ে তারা দুজনে চলে গেল ··শুধু মেরীর দু'চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ছিল···

সিঁড়ি দিয়ে নামতে, দু'পাশে বাড়ীর সব লোক···

তারা কি বললে ··তারা দুটি প্রাণী কিছুই শুনতে পেলে না···

দরজার কাছে আসতে, সমস্ত বাড়ী যেন বিদ্রূপ করে উঠল···

তাদের কানেই পৌঁছল না···

রাস্তা দিয়ে নেমে সোজা তারা চলল···দুজনে পাশাপাশি···কারুরই মুখে কোন কথা নেই···

তারা চলেছে···অনন্ত রহস্যলোকের দিকে···ভাল-মন্দ সব-কিছুর বাইরে···যেখানে তারা অবিচ্ছেদ···

সম্পূর্ণ